সুবর্ণবণিক্ সমাচার

(সচিত্র মাসিকপত্র)

ত্রয়োদশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ হইতে কার্ত্তিক ১৩৩৬ সাল

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কার্য্যালয়

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুবর্ণবণিক্ সমাচার—১৩শ বর্ষ

সূচী

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
অর্থসমস্যা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ	...	৪৪১
আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ, বি এল্	...	৫০১
আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ, বি এল্	...	৭১
আমাদের আর্থিক অবস্থা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ	...	৭৬
আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ, বি এল্	...	২৯০
আল্‌বেরুণীর ভারত-বর্ণনা	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৫২২
ইংরেজের চিত্রভবনের দ্বারে	মোসাফের্	...	৪৩৩
ইচ্ছা মৃত্যু	শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৬৩৩
উদ্বোধন	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	...	৩৪৭
উন্নতি না অবনতি ?	শ্রীনিতাইচাদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৬৩১
উপবীত আন্দোলন	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসু এম্ বি এ এ	...	৪১২
এঙ্গাস্ ওয়াট্‌সন্	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ	...	৬২৩
কণ্টকে গড়িল বিধি	শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়		৬৩৪
কলিকাতায় টিউব রেলওয়ে		...	৪৯৫
কবি অক্ষয়কুমারের কাব্য	শ্রীমতীরত্নমালা দেবী	...	১৮৫
কারবারের কথা	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	...	৩৯১
কাহিনী	শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ	...	৩৪৮
গৃহিনীর কাণ্ড	শ্রীমতী তমাললতা বসু	...	৬২২
জাগরণ	শ্রীমতী শৈলবালা দাসী	...	৫৬৪
জাতি-বিজ্ঞান	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	৬০
জাতীয় সংবাদ	৩৫, ৯৩, ১৬৯, ২২২, ২৮০, ৩০৭, ৩৮৯, ৪৩৬, ৪৯৭, ৫৫০, ৫৯২, ৬৪৬		
জীবতত্ত্বের অ-আ	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	...	১২, ১৭৮
জীবজীবনের ক্রমবিকাশের গল্প	ঐ	...	২৪৪
জার্ম্মাণীতে কয়েকদিন	শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, বার-এট্-ল	...	৬০১
টাকাকড়ি	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	...	১
তমলুকে প্রস্তাবিত সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী ও কেন্দ্র সমিতি	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ	...	১৫৫

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
তৃষ্ণা	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ		৬৪, ১৯৮, ২৪৯, ৩০২, ৩৬৩, ৪৭২, ৫২৭, ৫৭৮
দুঃখিনী	শ্রীমতী রেণুকণা বসু	...	২৯৮
দেবদর্শনান্তে	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	...	২৪৩
দিগন্তের পারে	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল	...	৩৫৫
ধনকুবের রকেফেলার	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম এ	...	৫৫৩
নারী	শ্রীমতী রেণুকণা বসু	...	৪৬০
নিয়তির দূত	শ্রীসত্যনারায়ণ পাল	...	১৮৯
নিশ্চিন্ত	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	...	৬২১
নোট বা কাগজের মুদ্রা	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	...	২২৯
পঞ্চপুষ্প (সংগ্রহ)			২১, ৭৯, ১৬৬, ২০৬, ২৬০, ৩২১, ৩৭০, ৪২২, ৪৮১, ৫৪৭, ৫৮৭, ৬৪০
পরলোক গত রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুর	জনৈকবন্ধু	...	২৭৫
পাটলীপুত্রে	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৫৭১
পোর্টসান লাইট্	শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি এল্	...	৪১৬
প্রতীক্ষা	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এল্	...	৬০
প্রাণিজীবনের ক্রমবিকাশ	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	...	৩৯৬
প্রাচীন পদাবলী	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস বি এ, সাহিত্যভূষণ	...	৫২
প্রার্থনা	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	২৯২
প্রেমের বাঁধন	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ	...	৪০৩
প্রেরিত পত্র			৪৩, ১০৮, ১৪৮, ২১১, ২৭৪, ৩৩৯, ৩৮২, ৫৫২, ৫৯৮
পুরস্কার	শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি এল্	...	৫০৩
ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৪১৮
বঙ্গে শ্যামাপূজা	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	..	৪৭
বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী		...	১৩৫
বাউনি বাঁধা ও সুও দুও পর্ব্ব	শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেবশ্রেষ্ঠী	..	২৯৬
বিপ্রলব্ধ	শ্রীমতী আশালতা দাস রত্নপ্রভা, সাহিত্যভারতী	...	৮
ব্যাঙ্কযোগে যুবক বাঙ্গালা (মোলাকাৎ)		...	৩১১
ভোরের পাখী	৺রসময় লাহা	...	৫১
বৃন্দাবনে চৌষট্টি মহান্তের সমাজ বাড়ী	শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	...	৩৫৩
বাঙ্গালার প্রাণিসত্ত্ব	শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি	...	৩৫৬
মানব জীবন	শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ	...	৪৯
মুক্তি	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি এল্	...	১৬
ম্যাডাম টুসো	শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, বার এট্-ল	...	৩৪৩
লখিন্দরের বাসর-ঘর	শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেবশ্রেষ্ঠী	...	৪৫৫

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউজিয়াম মোসাফের		...	৪৮৭
লণ্ডনের সমাজ সেবা	মোসাফের	...	২৯
লণ্ডনে আহারের স্থান	"	...	৯০
লণ্ডনের পার্ল্যামেণ্ট ভবন ও কাউন্টিকাউন্সিল	"	...	১৬২
লণ্ডনের পুলিশ ও স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড	"	...	২১৭
লণ্ডন বন্দর	"	...	২৫৬
লণ্ডনের বিদেশী বাসিন্দা	"	...	৩৩৩
লণ্ডনের দৃশ্যবৈচিত্র্য	"	...	৩৭৯
লণ্ডনের মিউজিয়াম	"	...	৫৪২
লণ্ডনের লাইব্রেরী	"	...	৫৯৩
লণ্ডনের ডক্	"	...	৬৪৪
শান্তিপুর সাহিত্যসভার সভাপতির অভিভাষণ	রায় ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বিএ, ডিলিট্	...	২৮১
শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী (স্বপ্নলোকে মোলাকাৎ)		...	৪৭৭
শেষরক্ষা	শ্রীরমেশচন্দ্র শীল বি এল্	...	২৩৫
সবিতা	শ্রীমতী রত্নমালা দেবী	...	৪৪৩
সপত্নী	শ্রীরাজেন্দ্রলাল পুরী	...	৫৬৮
সম্পদ বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্ এ	...	১১৩
সপ্তগ্রাম	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	...	৫৭৬
সমালোচনা			৪৫, ২২, ৩৪১, ৪৩৯
সুইডেনের শিল্পবাণিজ্য	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ বি এল	...	১৭৫
সুবর্ণবণিক্	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ	...	৬৩০
সুবর্ণবণিক্ তত্ত্ব	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক		৪০৯, ৪৫৫, ৫২০, ৫৬৫, ৬২৭
সুবর্ণবণিকের উপনয়ন	শ্রীসুরেশচন্দ্র সংখ্যবেদান্ততীর্থ	...	২০৪
সুভাষিত সংগ্রহ	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস বি এ	...	২৯৩
স্বর্গীয় অমৃতলাল দে	ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা	...	৫, ৪৯১, ৫২৯, ৬১৭
স্বর্গীয় রসময় লাহা	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, সাহিত্যভূষণ, কবিরত্ন	...	২৪১
স্বর্গীয় সুদামচন্দ্র শীল	শ্রীননীগোপাল দে	...	৭৮
স্মৃতিবাসরে	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	...	৫১৬
সৃষ্টি রহস্যের অন্তরালে	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	...	৫৫৯
রাঢ় দেশে সুবর্ণবণিকের বসতি বিস্তার	শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেবশ্রেষ্ঠী	...	৪০২
হাড়্মা সাঁওতাল	শ্রীসত্যনারায়ণ পাল	...	৫৫
হুয়েনৎসাঙের ভারত ভ্রমণ	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৪৬১
হেন্‌রী ফোর্ড	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ	...	৫৩৪

সুবর্ণবণিক্ সমাচার

(সচিত্র মাসিকপত্র)

ত্রয়োদশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ হইতে কার্ত্তিক ১৩৩৬ সাল

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কার্য্যালয়

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুবর্ণবণিক্ সমাচার—১৩শ বর্ষ

সূচী

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
অর্থসমস্যা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ	...	৪৪১
আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ, বি এল্	...	৫০১
আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ, বি এল্	...	৭১
আমাদের আর্থিক অবস্থা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ	...	৭৬
আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ, বি এল্	...	২৯০
আল্‌বেরুণীর ভারত-বর্ণনা	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৫২২
ইংরেজের চিত্রভবনের দ্বারে	মোসাফের্	...	৪৩৩
ইচ্ছা মৃত্যু	শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৬৩৩
উদ্বোধন	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	...	৩৪৭
উন্নতি না অবনতি ?	শ্রীনিতাইচাদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৬৩১
উপবীত আন্দোলন	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসু এম্ বি এ এ	...	৪১২
এঙ্গাস্ ওয়াট্‌সন্	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ	...	৬২৩
কণ্টকে গড়িল বিধি	শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়		৬৩৪
কলিকাতায় টিউব রেলওয়ে		...	৪৯৫
কবি অক্ষয়কুমারের কাব্য	শ্রীমতীরত্নমালা দেবী	...	১৮৫
কারবারের কথা	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	...	৩৯১
কাহিনী	শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ	...	৩৪৮
গৃহিনীর কাণ্ড	শ্রীমতী তমাললতা বসু	...	৬২২
জাগরণ	শ্রীমতী শৈলবালা দাসী	...	৫৬৪
জাতি-বিজ্ঞান	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	৬০
জাতীয় সংবাদ	৩৫, ৯৩, ১৬৯, ২২২, ২৮০, ৩৩৭, ৩৮৯, ৪৩৬, ৪৯৭, ৫৫০, ৫৯২, ৬৪৬		
জীবতত্ত্বের অ-আ	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	...	১২, ১৭৮
জীবজীবনের ক্রমবিকাশের গল্প	ঐ	...	২৪৪
জার্ম্মাণীতে কয়েকদিন	শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, বার-এট্-ল	...	৬০১
টাকাকড়ি	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	...	১
তমলুকে প্রস্তাবিত সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী ও কেন্দ্র সমিতি	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ	...	১৫৫

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
তৃষ্ণা	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ ৬৪, ১৯৮, ২৪৯, ৩০২, ৩৬৩, ৪৭২, ৫২৭,৫৭৮		
দুঃখিনী	শ্রীমতী রেণুকণা বসু	...	২৯৮
দেবদর্শনান্তে	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	...	২৪৩
দিগন্তের পারে	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল	...	৩৫৫
ধনকুবের রকেফেলার	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম এ	...	৫৫৩
নারী	শ্রীমতী রেণুকণা বসু	...	৪৬০
নিয়তির দূত	শ্রীসত্যনারায়ণ পাল	...	১৮৯
নিশ্চিন্ত	শ্রীগিরিজাকুমার বসু	...	৬২১
নোট বা কাগজের মুদ্রা	শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন	...	২২৯
পঞ্চপুষ্প (সংগ্রহ)	২১, ৭৯, ১৬৬, ২০৬, ২৬০, ৩২১, ৩৭০, ৪২২, ৪৮১, ৫৪৭, ৫৮৭, ৬৪০		
পরলোক গত রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুর	জনৈকবন্ধু	...	২৭৫
পাটলীপুত্রে	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৫৭১
পোর্টসান লাইট্	শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি এল্	...	৪১৬
প্রতীক্ষা	শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এল্	...	৬০
প্রাণিজীবনের ক্রমবিকাশ	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	...	৩৯৬
প্রাচীন পদাবলী	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস বি এ, সাহিত্যভূষণ	...	৫২
প্রার্থনা	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	২৯২
প্রেমের বাঁধন	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ	...	৪০৩
প্রেরিত পত্র	৪৩, ১০৮, ১৪৮, ২১১, ২৭৪, ৩৩৯, ৩৮২, ৫৫২, ৫৯৮		
পুরস্কার	শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি এল্	...	৫০৩
ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৪১৮
বঙ্গে শ্যামাপূজা	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	..	৪৭
বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী		...	১৩৫
বাউনি বাঁধা ও সুও দুও পর্ব্ব	শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেবশ্রেষ্ঠী	..	২৯৬
বিপ্রলব্ধ	শ্রীমতী আশালতা দাস রত্নপ্রভা, সাহিত্যভারতী	...	৮
ব্যাঙ্কযোগে যুবক বাঙ্গালা (মোলাকাৎ)		...	৩১১
ভোরের পাখী	৺রসময় লাহা	...	৫১
বৃন্দাবনে চৌষট্টি মহান্তের সমাজ বাড়ী	শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা	...	৩৫৩
বাঙ্গালার প্রাণিসত্ত্ব	শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি	...	৩৫৬
মানব জীবন	শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ	...	৪৯
মুক্তি	শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি এল্	...	১৬
ম্যাডাম টুসো	শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, বার এট্-ল	...	৩৪৩
লখিন্দরের বাসর-ঘর	শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেবশ্রেষ্ঠী	...	৪৫৫

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউজিয়াম মোসাফের		...	৪৮৭
লণ্ডনের সমাজ সেবা	মোসাফের	...	২৯
লণ্ডনে আহারের স্থান	„	...	৯০
লণ্ডনের পাল্যামেণ্ট ভবন ও কাউণ্টিকাউন্সিল	„	...	১৬২
লণ্ডনের পুলিশ ও স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ড	„	...	২১৭
লণ্ডন বন্দর	„	...	২৫৬
লণ্ডনের বিদেশী বাসিন্দা	„	...	৩৩৩
লণ্ডনের দৃশ্যবৈচিত্র্য	„	...	৩৭৯
লণ্ডনের মিউজিয়াম	„	...	৫৪২
লণ্ডনের লাইব্রেরী	„	...	৫৯৩
লণ্ডনের ডক্	„	...	৬৪৪
শান্তিপুর সাহিত্যসভার সভাপতির অভিভাষণ	রায় ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বিএ, ডিলিট্	...	২৮১
শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী (স্বপ্নলোকে মোলাকাৎ)		...	৪৭৭
শেষরক্ষা	শ্রীরমেশচন্দ্র শীল বি এল্	...	২৩৫
সবিতা	শ্রীমতী রত্নমালা দেবী	...	৪৪৩
সপত্নী	শ্রীরাজেন্দ্রলাল পুরী	...	৫৬৮
সম্পদ বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল	শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্ এ	...	১১৩
সপ্তগ্রাম	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	...	৫৭৬
সমালোচনা			৪৫, ২২, ৩৪১, ৪৩৯
সুইডেনের শিল্পবাণিজ্য	শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ বি এল	...	১৭৫
সুবর্ণবণিক্	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ	...	৬৩০
সুবর্ণবণিক্ তত্ত্ব	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক		৪০৯, ৪৫৫, ৫২০, ৫৬৫, ৬২৭
সুবর্ণবণিকের উপনয়ন	শ্রীসুরেশচন্দ্র সংখ্যবেদান্ততীর্থ	...	২০৪
সুভাষিত সংগ্রহ	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস বি এ	...	২৯৩
স্বর্গীয় অমৃতলাল দে	ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা	...	৫, ৪৯১, ৫২৯, ৬১৭
স্বর্গীয় রসময় লাহা	শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, সাহিত্যভূষণ, কবিরত্ন	...	২৪১
স্বর্গীয় সুদামচন্দ্র শীল	শ্রীননীগোপাল দে	...	৭৮
স্মৃতিবাসরে	শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত	...	৫১৬
সৃষ্টি রহস্যের অন্তরালে	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু	...	৫৫৯
রাঢ় দেশে সুবর্ণবণিকের বসতি বিস্তার	শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেবশ্রেষ্ঠী	...	৪০২
হাড়্মা সাঁওতাল	শ্রীসত্যনারায়ণ পাল	...	৫৫
হুয়েনৎসাঙের ভারত ভ্রমণ	শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন	...	৪৬১
হেন্‌রী ফোর্ড	শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ	...	৫৩৪

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সাল { ১ম সংখ্যা

টাকাকড়ি

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

আমরা গত বারে ধন-দৌলতের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা সচরাচর টাকাকড়ি ও ধনদৌলতের কথাই একসঙ্গে বলিয়া থাকি। "টাকাকড়ি" শব্দ আমরা প্রায়ই ধনদৌলতের সহিত এক সঙ্গেই ব্যবহার করি। চলিত ভাষায় উহা একার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অমুক লোকের "টাকাকড়ি" আছে বলিলে তাহার "ধন-দৌলত" আছে ইহা বুঝাইয়া থাকে। কারণ টাকাকড়ি ধনদৌলতেরই একটা নিদর্শন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাজারে যে দ্রব্যের খরিদ-বিক্রয় হয়, লোক যাহা টাকা-পয়সা দিয়া খরিদ করে তাহাই ধন। টাকা-পয়সা দিয়া যাহার মূল্যের পরিমাণ হইয়া থাকে, তাহাই ধন। সুতরাং ধনদৌলত ও টাকাকড়ি ঠিক এক কথা নহে। জরিপের জমি আর মাপের ফিতা এক জিনিষ নহে। উভয়ের পার্থক্য অনেক। সেইরূপ ধনদৌলতের সহিত টাকাকড়ির পার্থক্য অনেক। কারণ টাকা-পয়সার দ্বারাই ধনদৌলতের পরিমাপ হইয়া থাকে। আমরা যখন বলি যে, নলিনীবাবুর লাখ টাকার সম্পত্তি বা ধনদৌলত আছে, তখন নলিনীবাবুর যে এক লক্ষ টাকা নামক রজত মুদ্রা আছে, তাহা নিশ্চিত বুঝিব না। নলিনীবাবুর একখানি বাড়ী আছে, তাহার মূল্য ২০ হাজার টাকা,……একটু জমিদারী আছে, তাহার মূল্য ৩০ হাজার টাকা। গাড়ি ঘোড়া আছে তাহার মূল্য ৫ হাজার টাকা। এইরূপ তৈজসপত্র, আসবাব প্রভৃতি সকল জিনিষের এবং ব্যাঙ্কে মজুদ টাকা মূল্য খতাইয়া হিসাব করিয়া দেখি যে, তাঁহার সম্পত্তি বা ধনদৌলতের পরিমাণ লক্ষ টাকা। ধনদৌলতের মাপটা হয় টাকায়; কিন্তু ধন-দৌলত আর টাকা এক নহে। তবে জমি মাপের ফিতার সহিত জমির যে সম্বন্ধ, টাকাকড়ির সহিত ধনদৌলতের ঠিক সেই সম্বন্ধ নহে। ফিতা জমির একটা অঙ্গ নহে;

উহা জমি ছাড়া একটা স্বতন্ত্র জিনিষ। টাকাকড়ি কিন্তু ঠিক তাহা নহে। টাকাকড়ি ধনদৌলতেরই অঙ্গীভূত। এখানে ঠিক গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় টাকাকড়ির দ্বারাই ধন-দৌলতের মাপ হইয়া থাকে। তবে আজ কাল যেরূপ নোট ও ভাক্ত মুদ্রা প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে প্রচলিত মুদ্রার সহিত ধনদৌলতের সম্বন্ধ প্রায় জরিপের ফিতার সহিত জমির যেরূপ সম্বন্ধ, সেইরূপই হইয়া আসিতেছে। সে কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলিব। এই প্রবন্ধে আমরা টাকাকড়ি বলিতে প্রচলিত মুদ্রাই বুঝিব। যাহা দিয়া আমরা বাজারে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ জিনিষ কিনিতে পারি, তাহাই টাকাকড়ি বা প্রচলিত মুদ্রা।

এখন জিজ্ঞাস্য এই টাকাকড়ি বা প্রচলিত মুদ্রার স্বরূপ কি? তাহার কার্য্যই বা কি? টাকাকড়ির সহিত আমরা যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই না কেন, উহার আসল রূপ বা সংজ্ঞা কি, তাহা আমরা অনেকেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমরা অথচ জানি যে, আমাদের দেশে সরকারী টাকশালে এক ভরি ওজনের রাজা বা রাণীর মুখ অঙ্কিত, রৌপ্য নির্ম্মিত এবং চক্রাকার যে বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাই টাকা। উহার দ্বারা লোক জিনিষের বিকি-কিনি করিয়া থাকে; যে ব্যক্তি কোন জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকে, সে তাহার জিনিষের বদলে টাকা বা তাহার ভগ্নাংশ আধুলি, সিকি, দোয়ানি, আনি বা পয়সা পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কোন জিনিষ ক্রয় করিতে যায় তাহাকে পকেটে টাকা-পয়সা লইয়া বাজারে যাইতে হয় এবং তাহার বদলে তাহাকে তাহার আবশ্যক দ্রব্য কিনিতে হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, টাকা-পয়সা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার ও বেচিবার যন্ত্র। টাকা পয়সা পণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পণ্য।

এই ব্যাপার সকলেই জানেন। কিন্তু কেবল এইটুকু জানিলেই মুদ্রার স্বরূপ বুঝা যায় না। উহার ভিতরে অনেকটা জটিলতা বা ঘোরপ্যাঁচ আছে। উহা বুঝিতে হইলে জনসমাজে কি প্রকারে মুদ্রা প্রচলিত হইল, তাহা জানা আবশ্যক। সেই জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে সেই কথারই আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলিয়া থাকেন যে, মানুষ প্রথমে অত্যন্ত অসভ্য ছিল। তাহারা বন্য জন্তুর ন্যায় জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ও পর্ব্বতগুহাতে বাস করিত। তাহারা তখন বন্য বৃক্ষের ফল-মূল আহরণ করিয়া এবং অরণ্যচর পশু হনন করিয়া প্রাণ ধারণ করিত। সুতরাং বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তুর যেরূপ টাকাকড়ির কোন প্রয়োজন হয় না, সেই অবস্থায় মানুষেরও কোন টাকাকড়ির প্রয়োজন হইত না। একটা বাঘ বা ভালুকের সম্মুখে যদি টাকা বা মোহর ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বাঘ-ভালুক যেমন উহার কদর বুঝে না, মানুষও সেই অবস্থায় টাকা-কড়ির বা প্রচলিত মুদ্রার কোন আবশ্যকতাই বুঝিত না। খোলাকুচি প্রভৃতি যেমন আমাদের নিকট নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন, টাকাকড়িও তেমনই আদিম মানুষের নিকট নিষ্প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু মানুষের এই বন্যভাব স্থায়ী হইল না। মানুষ নানা কারণে এক স্থানে বসবাস করিতে থাকে। বাধ্য হইয়াই যে তাঁহারা ঐরূপ করিতে থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কি ভাবে মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা এস্থানে করিব না। সে কথা অর্থ-বিদ্যার বহির্ভূত, একটি স্বতন্ত্র বিদ্যার অন্তর্গত। প্রথম মানুষ বানর বা গরিলার ন্যায় জঙ্গলে বসবাস করিতে থাকে, পরে ক্রমে আত্মরক্ষার জন্য বন্যভাব পরিহার করিয়া দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে এবং চাষ-আবাদ করিতে আরম্ভ করে। তখন মানুষ সর্ব্বপ্রকারে বন্যভাব পরিহার করিতে পারে নাই। যাহার গাছে যাহা ফলিত আর চাষে যাহা জন্মিত, সে তাহাই খাইত এবং তাহা খাওয়াইয়া পরিবার প্রতিপালন করিত। তখনও মানুষ জাঙ্গল অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা বনের এক এক স্থানে ক্ষুদ্র পরিবার ও সামান্য জ্ঞাতি গোষ্ঠী লইয়া বসবাস করিত। পশু শিকার করাই তাহাদের প্রধান পেশা ছিল। ক্রমে তাহারা সে ভাবটি ছাড়াইয়া সভ্যতার পথে আরও একটু অগ্রসর হইল। তখন তাহারা নানা জনে নানা প্রকার জিনিষ উৎপন্ন এবং সংগ্রহ করিতে থাকিল। সমাজের সভ্যতার সেই আদি যুগে লোক নানা প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন অনুভব করিতে থাকিল। এক

জনের পক্ষে নানা প্রকার জিনিষ প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইতে লাগিল। কাজেই সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম-বিভাগ করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। তখন কেহ বা সামান্য রকমের প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে, কেহ বা ধানের চাষ, কেহ বা গমের চাষ, কেহ বা শিকারে মন দিল। এই সময় সেই আদিম সমাজে লোক পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের দ্রব্যের বিনিময় করিতে আরম্ভ করিল। যাহার কয়েক খণ্ড মৃগচর্ম্ম আছে, কিন্তু যব বা ধান্য নাই, কিন্তু যবের বা গমের প্রয়োজন আছে, সে যাহার মৃগচর্ম্মের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত যব বা ধান্য আছে এমন লোকের নিকট যাইয়া তাহার নিকট হইতে মৃগচর্ম্মের বদলে যব বা ধান্য লইয়া আসিত। এই প্রকারে সমাজে জিনিষের বদলে জিনিষ লইবার প্রথা চলিত হইয়া গেল।

কিন্তু তাহাতেও ঘোর অসুবিধা ঘটিতে থাকিল। কাহার কোন দ্রব্য অতিরিক্ত আছে এবং কোন দ্রব্যের অভাব আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। মনে করুন ঘোষপুরের তারকনাথের ধান অনেক আছে, কিন্তু গম নাই। তাহার গমের কিছু প্রয়োজন উপস্থিত হইল। গয়েষপুরের হরির অনেক গম আছে। এরূপ অবস্থায় তারককে নানা স্থান খুঁজিয়া হরিকে বাহির করিতে হইবে। হরি যদি ধানের বদলে গম দিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে ঐ খানেই তারকের প্রয়োজন মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু হরি যদি বলে যে তাহার যথেষ্ট গম আছে, তাহার কয়েকখানি মৃগচর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা হইলে তারকের আর এক দফা অসুবিধা উপস্থিত হইল। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি ধানের বদলে মৃগচর্ম্ম দিতে পারে, এরূপ লোককে তারকের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। ইহাতে লোকের দারুণ কষ্ট এবং অসুবিধা ঘটিত। লোক প্রয়োজনের সময় আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিত না। এই অসুবিধা ভোগ করিয়া লোক বুদ্ধিপূর্ব্বক এক উপায় সাব্যস্ত করিল। তাহারা হাটের পত্তন করিল। নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের মধ্য ভাগে তাহারা সুবিধামত স্থানে আপনাদের বিনিময়ের যোগ্য জিনিষগুলি লইয়া উপস্থিত হইত। সে স্থানে বড় বড় গাছতলায় তাহারা জিনিষ লইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন মত পণ্যের অদল-বদল করিত, সেই স্থানটির নাম হইল হাট। ইহাই হাট বা গঞ্জ উৎপত্তির আদি কথা। সপ্তাহে একদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই হাট বসিত। তখন লোকের অভাব বড় অল্প ছিল। সুতরাং হাটে এত রকমারি জিনিষ আমদানী হইত না। লোকের যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহারই বিকিকিনি হইত। জিনিষের সহিত জিনিষের বিনিময়ই সেই বিকিকিনির উপায় ছিল। তখন খরিদ-বিক্রয়ের মধ্যস্থলে বিনিময়সাধক মুদ্রা ছিল না।

কিন্তু ক্রমশঃ মানুষ সভ্যতার পথে যত অগ্রসর হইতে থাকিল, ততই খরিদ-বিক্রয়ের জিনিষের রকমারি বাড়িতে লাগিল। কাজেই জিনিষের সহিত জিনিষের বিনিময়-সাধনে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে থাকিল। মনে করুন সন্তোষ বাবু এক জোড়া ভেড়া কিনিতে হাটে আসিলেন। কিন্তু হাটে সেদিন অধিক লোক ভেড়া বেচিতে আইসে নাই। যে দুই একজন ভেড়া বেচিতে আসিয়াছে, তাহারা মেষের বদলে ছোলা চায়। সন্তোষের ছোলা নাই, ধান আছে। এরূপ অবস্থায় সন্তোষকে কোন ছোলাওয়ালার কাছে যাইয়া ধান্য দিয়া ছোলা কিনিতে হইবে, অথবা মেষ বিক্রেতাকে ধান্যের পরিবর্ত্তে মেষ বিক্রয় করিয়া আবার সেই ধান্য দিয়া ছোলা কিনিতে হইত। ইহাতে লোকের নানা অসুবিধা ঘটিত। তখন লোক পরামর্শপূর্ব্বক বিনিময়-সাধনের জন্য সকলের আবশ্যক একটা পণ্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাহারই সহিত জিনিষের বদল করিতে আরম্ভ করিল। কোন দেশে সৈন্ধবলবণ, কোন দেশে ধান্য, কোন দেশে গম বিনিময়-সাধনের মধ্যবর্ত্তী পণ্য বলিয়া গৃহীত হইল। সভ্যতার আদিমকালে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী লোক কড়ির অলঙ্কার ব্যবহার করিত। সুতরাং অনেকের কড়ির বিশেষ প্রয়োজন হইত। কোন কোন অঞ্চলে সেই জন্য কড়িই বিনিময়-সাধনের মধ্যবর্ত্তী পণ্য বলিয়া গৃহীত হইল। অর্থাৎ উহা মধ্যবর্ত্তী পণ্যরূপে এখনকার মুদ্রার মত ক্রয়-বিক্রয়ের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ভারতে দ্রাবিড়ী জাতিরাই প্রথমে কড়ি

বিনিময়সাধক দ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ফলে কড়িই বোধ হয় আদিমুদ্রা। টাকার সহিত কড়ি শব্দ-সংযুক্ত হইয়া সেই অতীত কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে।

ক্রমে সভ্যতা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, সমাজে ততই জটিলতার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল। লোক কৃষিজ পণ্যের উপর শিল্পজ পণ্যও উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতে শিখিল। এখন কড়ির দ্বারা আর বিনিময় সাধন সুবিধাজনক বোধ হইল না। অভাবই উন্নতির জনক। লোক তখন ধাতুদ্রব্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিনিময়ের কার্য্য চালাইতে থাকিল। কোথাও লৌহ, কোথাও তাম্র প্রভৃতি ধাতুর তাল বিনিময়সাধক বস্তু বলিয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। আমাদের এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে নিষ্ক নামক সুবর্ণখণ্ডই ক্রয়-বিক্রয়-সাধক বস্তুরূপে ব্যবহৃত হইত। অধ্যাপক আর্ণেষ্ট নাইস বলেন যে, এসিয়াবাসীরাই সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুবর্ণ ও রজতকে অঙ্গুরীয়ের আকারে প্রস্তুত করিয়া তাহাই মুদ্রা-রূপে ব্যবহার করিত। ভারতে সুবর্ণই 'নিষ্ক' নামে অভিহিত হইত। সাষ্টং শতং সুবর্ণানাং নিষ্কমাহুর্ধনং তদা এই শ্লোকাংশ হইতে মনে হয় ১ শত ৮ পল পরিমিত সুবর্ণই নিষ্ক নামে অভিহিত হইত। কিন্তু এই নিষ্কের ওজন সকল সময় একরূপই ছিল কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। মিসরে তাম্রখণ্ডই প্রথম মুদ্রারূপে চলিত ছিল। লোক তাম্রখণ্ডের বিনিময়ে পণ্য খরিদ-বিক্রয় করিত। আমার বিশ্বাস খুচরা খরিদ-বিক্রয়ে আমাদের দেশে কড়ি ও তাম্রখণ্ড (ঢেবুয়াই) পূর্ব্বে মুদ্রারূপে প্রচলিত হয়।

সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত যেমন শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল, সেইরূপ লোকের প্রতারণা করিবার বুদ্ধিও দেখা দিতে লাগিল। সুতরাং মুদ্রাতেও বোধ হয় ভেজাল চলিতে লাগিল। তাহাতে ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে থাকিল। তখন সাব্যস্ত হইল যে, রাজা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও মূল্যবিশিষ্ট ধাতুতে আপনার নাম মুদ্রিত করিয়া তাহাই মুদ্রারূপে প্রচলিত করিবেন। উহাতে রাজার নাম মুদ্রিত থাকে বলিয়া উহার নাম হইয়াছে মুদ্রা।

পাশ্চাত্য মুদ্রার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এশিয়া-স্থিত গ্রীসেই প্রথম মুদ্রা প্রচলিত হয়। লিডিয়ার রাজগণ ফোসিয়া নামক স্থানে প্রথম সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত করেন। তৎপরে আর্গনের রাজা ফেইডন (Pheidon) এজিনা নগরে প্রথম রজত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীকশাসিত সমস্ত রাজ্যেই মুদ্রা প্রচলিত হয়। খৃষ্ঠ পূর্ব্ব ২৬৩ অব্দে রোমকরা রজত মুদ্রা এবং ২০৭ অব্দে সুবর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন। ব্যাবিলোনিয়াতে প্রথম নোটের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পণ্যের সহিতই পণ্যের বিনিময় হইয়া থাকে। তবে একটা সুবিধাজনক পণ্যকে সকলে যুক্তি করিয়া তাহাদের সাধারণ বিনিময়সাধক পণ্য ধার্য্য করে। নতুবা ক্রয়-বিক্রয়ে ঘোর অসুবিধা ঘটে। যে পণ্যকে মধ্যবর্ত্তী বা সর্ব্বসাধারণের বেচা-কেনার সাধক পণ্য বলিয়া ধার্য্য করা হইয়া থাকে, তাহার কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। সে গুণগুলি এই :—

(১) উহার মূল্য স্থির থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মূল্যের প্রায় তারতম্য হয় না, তাহাই ক্রয়-বিক্রয়-সাধক পণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

(২) যে পণ্যের মূল্য অধিক এবং যাহা অতি সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ পণ্যই মধ্যবর্ত্তী পণ্য হইবার যোগ্য।

(৩) যে পণ্য সকলে চাহে, অর্থাৎ সকলে যে পণ্য রাখিতে ইচ্ছা করে, সেই পণ্যই মধ্যবর্ত্তী বিনিময়সাধক পণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

(৪) যে পণ্য সহজে নষ্ট হইবার নহে, এবং যাহা বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে, তাহাই বিনিময়-সাধক পণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ধাতুই বিনিময়সাধক পণ্য হইবার যোগ্য। ধাতুর মধ্যে সুবর্ণ এবং রৌপ্য এই দুই ধাতুর মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থির থাকে। এই দুই ধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান ধাতু। উহা সহজে নষ্ট হয় না বা উহাতে মরিচা

ধরে না। উহা বহুকালই সঞ্চিত রাখিতে পারা যায়। সেই জন্য এই দুই ধাতুই মুদ্রার ধাতু বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। সুতরাং মুদ্রা বা টাকা-কড়ির সংজ্ঞা এই :

(১) মুদ্রা বিনিময় সাধনের জন্য নির্ব্বাচিত মধ্যবর্ত্তী পণ্য (Madium of Exchange)

(২) মুদ্রা দ্রব্য মূল্যের পরিমাণ নির্দ্দেশক (Measure of Value)

(৩) উহা মূল্যের তারতম্য স্থির করিবার মানদণ্ড (Standard of Value)

(৪) উহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের উপায় (Store of Value)

এই মুদ্রাই টাকাকড়ি। ইহার অন্যান্য কথা ও নোটের কথা পরে বলিব।

স্বর্গীয় অমৃতলাল দে

ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(১৩৩৪, শ্রাবণ সংখ্যার ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

(৩)

অমৃতলাল সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় ও বলিবার ভঙ্গীতে লোকে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া সাধারণে কিরূপ তৃপ্তি-লাভ করিত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে উপলব্ধি হইবে,—

"The unfailing urbanity and courtesy he displayed, and the keen intelligence of his conversation made such a marked impression on all those who came into contact with him that *to meet him once was to remember him always.*"* ইহার উদাহরণস্বরূপ Indian Royal Chronicle পত্রিকায় যে বিশিষ্ট ঘটনাটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই—একবার Indian Daily News পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া একটি *Conversazione*তে আগমন করেন; সন্ধ্যার সময় সভা আরম্ভ হইয়াছে, সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ অমৃতলালের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। বক্তৃতা সমাপ্তির পর সভাভঙ্গ হইয়া গেলে, সকলেই সভা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু Indian Daily News পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় অমৃতলালকে লইয়া সেইখানেই তাঁহার ইতিপূর্ব্বে-প্রদত্ত বক্তৃতার আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। আলোচনায় উভয়ে এরূপ তন্ময় ও নিমগ্ন যে, রাত্রি অধিক হইতে থাকিলেও, সেদিকে তাঁহাদের উভয়ের কাহারও কোন প্রকার লক্ষ্য নাই। পরদিন প্রভাতে যখন আপিষে যাওয়ার ডাক পড়িল, তখন সম্পাদক মহাশয়ের স্মরণ হইল যে, রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে।†

অমৃতলাল যখন Presidency Collegeএ পড়েন, তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার সেই বক্তৃতার সমালোচনা পাঠ করিয়া অমৃতলালের এক শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক ক্লাসে অন্যান্য কথার পর ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"Here in this class we have some orators like Cicero and Demosthenes, whose praise is sounded by the public press, and who are learned enough to teach me."‡

* Indian Royal Chronicle vol. XXIV, February, 1911, p. 22.

† Ibid., p. 22.

‡ Ibid., vol. XXIII, February, 1911, p. 22.

Statesman পত্রিকার সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী পরলোকগত Robert Knightএর সহিত কার্য্য-ব্যপদেশে অমৃতলালের পরিচয় হয়; তিনি অমৃতলালের সহিত আলাপে এবং তাঁহার গুণরাশি-দর্শনে মুগ্ধ হন। অমৃতলাল প্রায়ই নাইট সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইতেন এবং নাইট সাহেবও নানা সাময়িক বিষয় লইয়া অমৃতলালের সহিত সময়ে সময়ে আলোচনা করিতেন।

ভারতের সমস্ত অভিজাত-সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য অমৃতলাল ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে The Royal Society of India নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাতে তাঁহাদের সুখদুঃখ অভাব-অসুবিধা প্রভৃতি লইয়া পরস্পরের সহিত আলোচনা এবং ভাবের আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পান, এই সমিতি স্থাপন দ্বারা অমৃতলাল তাহারই ব্যবস্থা করেন। কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত Calcutta Conversazione টিকেও এই সমিতির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, যখন অমৃতলালের বয়স মাত্র ২২ বৎসর, তখন তিনি পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নের ফলে দেশীয় সামন্তরাজগণের মধ্যে অনেকে এই ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষক হন। এই সময় হইতে ব্যবসায়ের উন্নতিমূলক নানা প্রকার নূতন নূতন চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইতে থাকে। কিসে ব্যবসা বিস্তৃত হইবে, ব্যবসা-উন্নতির মূল কোথায়, কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে অর্থ লাভের সহিত ব্যবসায় সুনাম অর্জ্জন করা যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও উপযুক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি এ বিষয়ে ক্রমশঃ নিপুণতা লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের নবোন্মাবিনী শক্তি ব্যবসা ক্ষেত্রে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। সততার ও সতর্কতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন।

ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া অমৃতলাল কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত হন। পুস্তক কয়খানির বিক্রয়াধিক্য তাঁহার ভবিষ্য উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেয়। পুস্তক-প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি London Printing Works নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পরে এই ছাপাখানার নাম Caclutta Printing Company রাখা হয় এবং ৭১নং বেন্টিক ষ্ট্রীটে ইহার কার্য্যালয় স্থাপিত হয়।

অমৃতলাল কয়েকখানি ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় সর্ব্বপ্রথম ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Price Current প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি News of the World প্রকাশ করেন। ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইত এবং তিনিই ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রে সংক্ষেপে পৃথিবীর বহু সংবাদ বাহির হইত। সে সময়ে পত্রিকাখানি সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। ১৮৮৩-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় International Exhibition হয়, তখন তিনি Exhibition Gazette নামক পত্রিকা বাহির করেন। ইহাতে তিনি প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং প্রদর্শনীর সকল জিনিষের বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে প্রকাশিত হইত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলাল The Indian Royal Chronicle পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্র ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হইবে। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক—উভয়ই তিনি। ভারতের অভিজাত সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ, তাঁহাদের ইতিহাস ও বিবরণ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে এই পত্রিকায় চিত্র সহ প্রকাশিত হইত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ দেশীয় সৈন্য-দিগের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য Military Standard পত্রিকা বাহির করেন। ইহাও সাপ্তাহিক আকারে বাহির হইত। ভারতের তাৎকালীন সমর-সেনাপতি (Commander-in-Chief) ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্য-জীবন কেবল পত্রিকা-সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি নানা বিষয়ে ইংরাজীতে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কেবল সুবক্তা বলিয়া নয়, সুলেখকরূপেও তিনি সাধারণের নিকট আদৃত হন।

তাঁহার সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধে Indian Royal Chronicle বলেন—"His social, moral and religious convictions and speculations found utterance in works on a variety of subjects, which at all events showed the author's intrepidity and profound learning." তাঁহার স্থাপিত পুস্তকালয় Lewis & Co. হইতে সর্ব্বসমেত প্রায় ১০।১৫ খানি পুস্তক প্রকাশের সন্ধান পাই। এগুলির মধ্যে কতক তাঁহার নিজের রচিত এবং কতক তাঁহার সম্পাদিত।

তিনি ইংরেজী পদ্যে একখানি গ্রন্থ ও একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। একখানি Royal Jubilee in India, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ইহা রচিত হয়। দেশীয় রাজগণ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ জুবিলী উপলক্ষে যে সব উৎসবাদির আয়োজন করেন, এই গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার পদ্যে রচিত পুস্তিকার নাম—**The Calcutta Police Court.** ইহা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির বিবরণের কতকটা আভাষ ইহার প্রচ্ছদ-পত্র হইতে পাওয়া যায়—

A Serio-Comic Poem,
Containing
Sketches of Magisterial decisions
humourously illustrated,
Reporter's life in Court.
Attorneys' and Pleaders' whims of Law
et hoc genus omne

সে যুগের পুলিশ কোর্টের বেশ রসাত্মক বর্ণনা এই ছোট কবিতা পুস্তিকার ভিতর পাওয়া যায়।

অমৃতলাল শিক্ষা বিস্তারের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অসমর্থ ও দরিদ্র শিক্ষার্থিগণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি অন্ধ, অনাথ, বিধবা ও অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য Amrita Charitable Fund স্থাপন করেন।

অমৃতলালের আধ্যাত্মিক জীবনও উন্নত ছিল। তিনি মাঝে মাঝে পরলোকতত্ত্ব ও যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। সাধু বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে নিকটে পাইলে তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি যেন কিসের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বদিনের একটি উক্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। হঠাৎ একটিবার মাত্র চীৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠেন—"I have got it. I shall now die contented." এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া Indian Royal Chronicle বলেন—"Up to the very end he retained his consciousness, always meditating on the Omnipotent, and the smiling feature of his countenance showed that, as a result of his practice in Yoga, he was in communion with the Infinity and inwardly got something that preserved his coolness, cheerfulness and smiling attitude."

তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, মনের বল এবং উৎসাহও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। হটাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ৪।৫ দিন মাত্র অসুখে ভুগিয়া, তিনি ৬৬ বৎসর বয়সে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার পরলোকগমনের পর Indian Royal Chronicle পত্রে, তাঁহার সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয় তাহাতে দেখা যায়—"His charity was a perennial stream that was evidenced every day. The money value is small compared with the kindliness with which the gifts were bestowed and the warm sympathy that promoted the gifts."

* * * *

"We know we are but voicing his own sentiment when we finish this brief notice with the hope that all that was lofty, pure and elevated in his ideals and actions may find many to emulate and follow amongst his beloved countrymen."

অমৃতলালের ইউরোপীয় বন্ধুগণ ও সংবাদপত্রসমূহও তাঁহার বিয়োগে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ১৮ বৎসর পরে, গত ১লা মাঘ (১৩৩৪) ভোর ৪ ঘটিকার সময়, ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করেন।

ক্রমশঃ

বিপ্রলব্ধ

শ্রীমতী আশালতা দাশ, রত্নপ্রভা, সাহিত্যভারতী

—ক—

পৈতৃক শৈলেশ্বর নামটি আধুনিক রুচি অনুযায়ী নয় বলিয়া উদীয়মান তরুণ কবি বাছিয়া বাছিয়া একদিন আপনার নামকরণ করিয়া ফেলিল শৈবাল স্যান্নাল।... শৈবাল মানে যাহাই হউক না কেন নামটি বড়ই শ্রুতিমধুর, এক কথায় মো-লায়েম।

লোকে তাহাকে বলিত কবি।...যদিও তার বহু যত্নে লেখা অমূল্য (?) কাব্য-রত্নরাজি বাংলা দেশের অর্ব্বাচীন (?) সম্পাদক কর্ত্তৃক অমনোনীত হইয়া ফেরৎ আসিত···তথাচ সে কবি।...যে হেতু তার চোখে সর্ব্বদাই রিমলেশ চশমা শোভা পাইত...দ্বিতীয়তঃ···তার কণ্ঠের মৃদু-মধুর স্বর শুনিয়া দূর হইতে তাকে নারী বলিয়াই ভ্রম হইত। তৃতীয়তঃ তার কলেজের নোটের এক পাশে অন্যথা পাঠ্যপুস্তকের মার্জ্জিনে প্রায়শঃই দুই এক লাইন কবিতা দেখা যাইত। বলা বাহুল্য...কবিতাগুলিতে বিরহের হা হুতাশের অন্ত থাকিত না।...ইহার জন্য একদিন কলেজের প্রফেসর নাকি সর্ব্বসমক্ষে কবিবরকে...থাক।

এতগুলি গুণ (?) বিদ্যমান সত্ত্বেও যিনি কবি আখ্যায় ভূষিত হন নাই...উচিত তাঁহার—সহর ছাড়িয়া সুন্দরবনে গিয়া কাব্য সাধনা করা।

গল্প লিখিতে বসিলে যেমন ভাল 'প্লট' চাই···তেমনি উদীয়মান তরুণ প্রেমিক কবিদেরও একটি করিয়া মানস লোকের স্বপ্ন-সুন্দরীর বিশেষ আবশ্যক।...কিন্তু হা'রে!

এই না পাওয়ার দুর্নিবার বেদনাই তো বিরহী প্রাণে নিত্য নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে···এ বেদনা যে চিরন্তন শাশ্বত।

কবির হিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল...কোথায় তাহার তরুণ চিত্তলোকের গোপনচারিনী শোভনা মানসী...আর কতদিন...কতকাল তোমার প্রতীক্ষায় দিবসের পর দিবস প্রহরের পর প্রহর কাটাইব গো...? দেখা দাও—দেখা দাও প্রিয়া!

মেসের রুদ্ধ জানালা মুক্ত করিয়া কবি উদাস নেত্রে নীল আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে...ব্যর্থ হৃদয় ভাঙ্গিয়া মুষড়িয়া পড়ে...কই···কই সে একখানি রূপে ঢলঢল, সুহাস সুকোমল সুন্দর মুখের দুইটি ডাগর আঁখির সলাজ মধুর দৃষ্টি...! একখানি পুষ্পপেলব সুকুমার তনুলতা...দুইখানি মৃণাল তুল্য বাহুবল্লরী...নাইরে নাই··· ।...কবির আহার গেল...নিদ্রা—তাও আসে না...পরাণ জুড়িয়া শুধু চিন্তা... কতদিনে তার সাধনা সিদ্ধ হইবে!

—খ—

'তুমি কোন পথে এলেগো পথিক চিনি নাই তোমারে
হঠাৎ স্বপন সম দেখা দিলে...''

সুরের ধারা কবির মর্ম্মে মর্ম্মে পৌঁছাইল।...মুখ তুলিয়া চাহিতেই কবির উৎসুক কৌতুহলী জোড়া আঁখির দৃষ্টিতে ত্রস্তা আরক্তআননা এক তন্বী চকিতে সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে গানও বন্ধ হইয়া গেল।

সারাদিন কবি জানালার আশে পাশে ঘুরিল—কিন্তু বৃথারে বৃথা...পলকে প্রলয় ঘটাইয়া সে চলিয়া গিয়াছে...হায় আর কি দেখা দিবেনা··· ?

বন্ধু আসিয়া কহিল—"ওহে কবিবর, ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি—আমার 'টিউসনী'টা কর্ব্বে তুমি ?"

শৈবাল বিরক্ত হইল—বন্ধুর এই অসময়ে আসিয়া বাস্তবের তীব্র আর্ত্তনাদ শোনাইবার জন্য। স্বরে প্রচুর বিরক্তি ঢালিয়া উত্তর ছিল—"কো-থা-য় ?"

"বেশী দূর নয় হে—ঐ সুমুখের লাল বাড়ীটায়।"

সুমুখের ওই লাল রঙের বাড়ীটায়···যার প্রতি কক্ষে কক্ষে নিমেষের-দেখা তরুণীর পায়ের পরশ লাগিয়া-আছে... যার কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতে ওই বাড়ীটির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরের স্বপ্ন-লোক রচিয়া উঠে···সেই বাড়ীতে কবির সাদর আমন্ত্রণ...বিধাতা কি এতদিনে তাহার পরে প্রসন্ন হইলেন গো ?

উৎসুক হইয়া কবি ধরা গলায় কহিল—"পড়াতে হবে কাকে ?"

বন্ধুবর মৃদু হাসিয়া কৌতুক হাস্তে উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিকে তুলিয়া কহিল—"দু'টি ছোট্ট মেয়েকে—একটীর নাম লিলী... অপরটীর নাম শেলী...। বেশীদিনের জন্যে নয় হে—এই দিন সাতেকের জন্যে। হ্যাঁ...তোমার কাজের ক্ষতি যদি হয় তো বল ভাই।"

—'বিলক্ষণ'।...কাজের ক্ষতি এ'তো সৌভাগ্য ?...

'যথালাভ'—এই ভাবিয়া কবি উদ্বেলিত স্বরে কহিয়া উঠিল—"কবে থেকে যাব ?"

"কবে কি—কালই···আমি আজই যাচ্ছি।"

বন্ধু সীতেন গুপ্ত একজন নামজাদা সাহিত্যিক। প্রতি মাসে যে কোন পত্রিকার পাতা উল্‌টাইলেই সীতেন গুপ্তের নামটি আগে চোখে পড়ে।

কবি সীতেনের হাতে হাত রাখিয়া মৃদু স্বরে কহিল— "ওই বাড়ীতে প্রত্যহই তুমি যাবার অধিকার পেয়েছ—? ভা-গ্য-বা-ন্...!"

সীতেনের ওষ্ঠাধরে শুধু তৃপ্তি পূর্ণ হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

—গ—

কবি উঠিয়াছে আজ রাত না পোহাইতেই। তখনও ভোর-গগনের প্রান্ত হইতে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ দীপ্তিটুকু ম্লান হইয়া আসে নাই। নীল আকাশের বুকে তখনও উজ্জ্বল নীহারিকা-পুঞ্জ আঁখি মেলিয়া জাগিয়া ছিল। ইতিমধ্যেই কবির স্নান সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাহির-বারান্দায় কবি তখন ছোট্ট হাত-আয়নাখানি সুমুখে রাখিয়া প্রসাধনে রত। মাঝে মাঝে তার চঞ্চল নেত্র দুইটি গৃহ মধ্যস্থ সুপ্তি-মগ্ন মুখ-গুলিতে দৃষ্টি বুলাইয়া সন্তর্পণে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ই-স, কি দীর্ঘ অলস এই বেলাটা,...গতি কি মন্থর... সারারাত পথ চলিয়া যেনো অবসাদে শ্রান্ত হইয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।...কতক্ষণ কাটিল।...হাতে বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবি হরষিত মনে পুনরায় দর্পণে আপনার সদ্য ক্ষৌর হিমানী ও পাউডার শোভিত মার্জ্জিত মুখখানি দেখিয়া লইয়া ঈপ্সিত স্থানের উদ্দেশে যাত্রা সুরু করিল।

প্রাসাদ তুল্য ভবন তাদের···।···দরিদ্র কবি ক্ষুণ্ণমনে নিজের বেশ-ভূষার প্রতি বারেক চাহিয়া প্রবেশ করিল।··· দ্বারবান সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কবিকে পাঠ-কক্ষে লইয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

···পর্দ্দার অন্তরালে ও কাহার অলঙ্কারের মৃদু সিঞ্জন ? তাহার দুই কাণ যেন জুড়াইয়া গেল। সহসা ও কি ও···? ও কাহার কণ্ঠস্বর···

"তোমায় চোখে দেখার আগে
তোমার স্বপন চোখে লাগে
বেদন জাগে গো
আমি না চিনিতেই ভালবেসেছি।"

"কবি তন্ময়!···তাহার সারাটি চিত্ত তখন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অদৃশ্য কক্ষে···অপরিদৃষ্টা লাবণ্যময়ী তন্বীর পদতলে যেনো এক কণা করুণা মাগিয়া লুটাইতেছিল।

*　*　*　*　*　*

"মাষ্টার মশায়? ও মাষ্টার মশায়?"

সুদূর স্বপ্ন লোক হইতে কবি যেন একটি ধাক্কায় কঠিন ধরার বুকে আছড়াইয়া পড়িল।

সুমুখের ছাত্রীটিকে সস্নেহে কাছে টানিয়া শৈবাল মুগ্ধ কণ্ঠে কহিল—"কি বলছ খুকী?" গুচ্ছ গুচ্ছ রুক্ষ চুলগুলি কপোল হইতে সরাইয়া ছাত্রীটি বিরক্তি ভরে কহিল—"আঃ...খুকী আবার কি? আমার নাম তো লিলী···। মাষ্টার মশায়, বেলুচীস্থান কোথায়?"

অন্যমনস্ক 'মাষ্টার মশায়' উত্তর দিলেন—"অ্যাঁ, বেলুন, আর লুচীর স্থান কোথায়? সেতো রান্নাঘরে খুকী।"

গান সহসা থামিয়া পড়িল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে কাহার কোমল কণ্ঠের কৌতুকপূর্ণ হাস্য উচ্ছল ঝর্ণার মত ছুটিয়া আসিল। কবিবর অপ্রতিভ!...ক্ষণ পরে পাশের ঘর হইতে তীক্ষ্ণ অথচ মধুর কণ্ঠে বাজিল···'লিলী শেলী... উঠে আয়।'

দুই ভগ্নী নাচিতে নাচিতে পর্দ্দা ঠেলিয়া চলিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় মুখ নত করিয়া বসিয়া উড্ পেন্সিল দিয়া সাদা খাতাটার পাতায় অনাবশ্যক অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন।

শেলী তার লাল রিবণে বাঁধা লম্বা বেণীটা দোলাইয়া পর্দ্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া তরুণ কণ্ঠে বলিল—"আজ আর পড়বোনা মাষ্টার মশায়···দিদি বলছেন।"

মাষ্টার মহাশয়ের দুই কর্ণমূল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। ললাট প্রান্তে বিন্দু বিন্দু স্বেদ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। রুমালে মুখ মুছিয়া ভাবিতে লাগিলেন...তাইত, কি বিষম ভুলই করিয়া বসিলাম। ধ্যেৎ! প্রথম দিনেই অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়িলাম। না জানি ওই শিক্ষিতা সুগায়িকা বিদুষী মেয়েটি তাহাকে কি মনে করিল।

কবি আর ভাবিতে পারিল না। রাজপথে আসিয়া মনে মনে কহিলেন—"যাক্...চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই··· হাতে এখনও গোটা ছয়দিন আছে··দেখা যাক, ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে।"

—ঘ—

পরের দিন।—

কবি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পৌছিয়া পর্দ্দা সরাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তার কবিচিত্ত সাফল্যের আনন্দে উচ্ছ্বসিয়া মাতিয়া উঠিল।···সম্ভবতঃ ইনিই লিলীর দিদি...যেন একখানি সৌন্দর্য্যের নিখুঁত প্রতিমা···বিশ্বের রূপ-ভাণ্ডার উজার করিয়া বিশ্ব-শিল্পী যেন একান্তে বসিয়া ইহার গঠন সৌকুমার্য্য দিয়াছেন।

উনিশটি বসন্তের সুষমা-মণ্ডিত চারু দেহ-লতাখানি ঘিরিয়া একখানি কচি পাতার রঙের সাড়ী সোহাগে কণ্ঠ জড়াইয়া পিছনে লুটাইতেছে। সুরভি স্নিগ্ধ আর্দ্র অলকগুলি পিঠ ছাড়াইয়া সাপের ফণার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া পায়ের কাছে নামিয়া আসিয়াছে। কবির দুই চোখ ভরিয়া উঠিল...এই—এইতো তাহার বহুজনমের চির ঈপ্সিতা মানস প্রতিমা।

খুট্ করিয়া দ্বারে শব্দ হইতেই চকিতা তরুণী ফিরিয়া দাঁড়াইল—এক মুহূর্ত্ত—এক মুহূর্ত্ত পরেই তরুণীর শুভ্র আনন আরক্ত হইয়া উঠিল···চক্ষের নিমিষে তরুণী অন্তর্হিতা হইল।

শৈবাল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই মুহূর্ত্তে একখানি চিঠির কাগজ লইয়া লিখিল

'মানসী আমার,

তোমার অনবদ্য সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

···ওগো বসন্তের একগাছি ফুলমালা সুন্দরী মানসী আমার, রূপমুগ্ধ দীন ভিখারীকে বিমুখ করিয়া ব্যথা দিওনা··· রাণু। উত্তর দিয়া ধন্য করিবে এ আশা করিতে পারি?

গুণমুগ্ধ—দীন ভক্ত

'শৈ'

—ঙ—

সপ্তাহ কাটিল। কোন উত্তরই নাই। কবি প্রত্যহই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অধীর বক্ষে প্রতীক্ষা করে...হয়ত একখানি ছোট্ট লিপি...হয়ত দুই চারিটি কথা...হয়ত একটু আশার

ক্ষীণ আভাষ...কিছুই পাওয়া গেলনা। কবির Dutyও ফুরাইল... কাল সীতেন আসিয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করিবে... হা'রে ভাগ্য!

বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ধোওয়া রাত...কবি শৈবাল ব্যর্থ জীবনখানি লইয়া ছাত্রী দুইটিকে পাঠ বলিয়া গৃহে ফিরিতে ছিল···এমন সময় একখণ্ড কাগজের টুকরা হাওয়ার বুকে ভর করিয়া উড়িয়া আসিয়া তার পায়ের উপর পড়িল। কবির বুক দুলিয়া উঠিল। হেঁট হইয়া কাগজ খানি তুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

প্রিয়বর

কাল প্রভাতে আমাদের চায়ের টেবিলে যোগ দিও—সেই খানেই সকল কথা হইবে···

অঞ্জলী

অঞ্জলী! অঞ্জলী...অলি···কি সুন্দর নামটি...কবি তৃষিত অধর দুখানি 'অঞ্জলী' নামটির পরে ধীরে ধীরে নত করিয়া একটি চুম্বন দিয়া স্পন্দিত বক্ষে ফিরিয়া আসিল।

পরের দিন প্রভাতে শৈবাল সাজসজ্জা সমাপনান্তে 'মানসী'র নিমন্ত্রন রাখিতে ছুটিল। তাহার চিত্ত তখন হরষ আবেগে মাতিয়া উঠিয়াছে···মর্ম্ম বীণায় নূতন মধুর ঝঙ্কার উঠিয়াছে—হৃদয় যেন বাতাসের স্তরে স্তরে ভাসিয়া স্বপ্ন-লোকে বিচরণ করিতেছিল।

চোখের স্বপ্ন যখন কাটিল—তখন বিস্ময়-শঙ্কিত নেত্রে দেখিল...সে বারান্দা পার হইয়া ড্রয়িংরুমে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে—সেখানে অতিথি সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য দুইটি প্রাণী পাশাপাশি হাতে হাত রাখিয়া নীরবে বসিয়া আছে···সম্মুখের টেবিলে প্রাতরাশ সজ্জিত।

শৈবালের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। স্তম্ভিত কবিকে সচকিত করিয়া সীতেন সশব্দে হাস্য করিয়া কহিয়া উঠিল—"কবি কি এখন ধ্যানস্থ নাকি!···অলি, ইনিই আমার প্রিয় বন্ধু কবিবর শৈবাল স্যান্নাল, আর শৈবাল—ইনি আমার অন্তরের সর্ব্বময়ী, ভাবী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অঞ্জলী দেবী।

কবি আহত হইয়া দৃষ্টি নত করিল···তাহার কাণ দুইটি যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। সীতেন ও অঞ্জলীর সুস্মিত আননের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিবার ক্ষমতাও তাহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।...মনে হইল তাহার—পৃথিবী দ্বিধা হও মা আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপমানের জ্বালা জুড়াই।

অঞ্জলী কবিকে বিপন্মুক্ত করিয়া মধুর হাসিয়া কহিল—"বসুন না শৈবালবাবু...আপনি যে এঁর বন্ধু তা শুনেছি আমি কালই, ওঁকে কালই আপনার চিঠি খানা দেখাই এবং রেখে দিতে বলি—আজ সকালে উনি বল্লেন আপনি আমাদের তো পর নন, কাজেই একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দেওয়া উচিত। উনি তো কাল রাত্রেই আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন শুনলুম···ওঁর চিঠি পান্‌নি?"

অঞ্জলীর ভদ্রতাপূর্ণ বিনয় বাক্য শুনিয়া শৈবালের চিত্ত কৃতজ্ঞতার ভারে নুইয়া পড়িল। সে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল—"আপনি···আপনি যে সীতেনের বাগদত্তা···আমি তা জান্‌তাম না, আমায়—আমায় মার্জ্জনা করুন।"

তার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।···

অঞ্জলী এইবার স্বল্প গম্ভীর হইয়া বলিল—"না না মার্জ্জনা চাইবার দরকার নেই। তবে আপনারা শিক্ষিত হ'য়েও নারীর মান-মর্য্যাদা রেখে যে সব সময় চল্‌তে পারেন না, এইটাই সবচেয়ে দুঃখের বিষয়। একজন অপরিচিতা কুমারীর সম্ভ্রম নিয়ে খেলা করা—"

সহসা অঞ্জলী স্মিতমুখে কহিল—"যাক্‌গে···ওসব বাজে কথা। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম আমরা, কিছু মনে কর্ব্বেন না। এই আপনার দুষ্টু বন্ধুটির যত কীর্ত্তি।"

অঞ্জলী সীতেনের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া মুখ নত করিল। সেও হাসিল···।

শৈবালের মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। কোন রকমে দেওয়াল চাপিয়া কাতর নয়নে সে সীতেনের পানে চাহিয়া স্খলিতকণ্ঠে কহিল—"তবে আমি আসি সীতেন?"

উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া কবি যুক্তকরে অঞ্জলীকে একটা শুষ্ক অভিবাদন জানাইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া ভাবিল—"ইহার অপেক্ষা দুই ঘা' মার খাইলে তাহার ঠিক শাস্তি হইত।"

পিছন হইতে যুগল দম্পতির ব্যঙ্গপূর্ণ হাস্য যেন তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত তার মর্ম্মস্থলে আসিয়া বিঁধিল।

সীতেন তখনও ডাকিয়া বলিতেছিল—"ওহে পালাও

কেন···আচ্ছা ধরে আনতে যেন জানিনি, নয়? ওহে কবি-বর···২৫শে বোশেখ এসে ফাঁকি দিওনা যেন···আজকের মিষ্টিটা পাওনা···সেদিন 'ডবল' ক'রে আদায় ক'রো।"

কবি ততক্ষণে আপনার শয্যায় পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। হা'রে অভিশপ্ত জীবন···হা'রে ছলনাময়ী নারী!

জীবতত্ত্বের অ-আ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

[৫]

আমাদের পূর্বপুরুষরা যে চার পায়ে চল্‌তেন, সে বিষয়ে আর সংশয় নেই। দুই পায়ে মাটিতে ঋজু হয়ে' দাঁড়াতে শিশুর যেমন দশ-বার মাস লাগে, তেমনি করে' সোজা হয়ে' দাঁড়াতে মনুষ্য জাতটারও আরো দশবারো পুরুষ কেটে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যে-দেহ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল্ থাক্‌ত, তা আস্তে আস্তে সমকোণ রচনা করে' খাড়া হয়ে উঠেছে। তাতে করে' আমাদের পূর্ব-পুরুষদের অস্থি-সংস্থান, মাংসপেশী, ফুস্‌ফুস্, পেটের ভিতরকার যন্ত্রগুলি সব অল্পবিস্তর বদ্‌লাতে হয়েচে। এই খাড়া হবার প্রধান সহায়ক আমাদের মেরুদণ্ড। যারা একটু আঘাতেই নুইয়ে পড়ে, যারা দেহ-মনে দুর্বলতা প্রকাশ করে, তাদের আমরা বলি—"এ রে, তোর শিরদাঁড়া মোটে শক্ত নয়।" মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় এর আগেই আপনাদের দিয়েছি। শিশুরা প্রথমে হামাগুড়ি দেয়, তারপর দাঁড়াতে শেখে; আমাদের মানুষ-জাতটারও ক্রম-বিকাশ যে এইভাবে হয়েচে—তার জলন্ত সাক্ষ্য ওই শিশু।

আমাদের বুকের মধ্যখানে একখানা ছুরীর মতো শক্ত পাতলা চ্যাপ্টা হাড় আছে, তার নাম হ'ল বক্ষোস্থি (Sternum)। কেউ আমাদের বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে এলে ঘাব্‌ড়ে যাওয়া উচিত নয়, কারণ বিধাতাই জন্মের আগে থেকে আমাদের বুকের মাঝখানে একখানা ছুরী বিঁধিয়ে রেখে দিয়েছেন। অর্দ্ধ বলয়াকারে এক একখানি পঞ্জরের হাড় মেরুদণ্ড থেকে উদ্গত হয়ে' পিঠ ও বুকের এক পাশ ঘিরে এই বক্ষোস্থিতে এসে লেগে রয়েছে। জন্মাবার সময় মানুষের বারো জোড়া পঞ্জরাস্থি থাকে। কারো বা তেরো জোড়া, কারো বা এগারো জোড়াও হয়; তাতে করে' সেই বিশিষ্ট মানুষটির জীবন-ধারণে কোনো প্রকার অসুবিধা হয় না।

সাধারণতঃ সাত জোড়া পঞ্জরাস্থি বক্ষোস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে; কারো ছ' জোড়া, কারো বা আট জোড়াও এই রূপ যুক্ত থাকে। বাপের সাতটি পুত্র ও পুত্র-বধূ যেন এক সংসার-ভুক্ত। আর বাকী পাঁচ জোড়া—তারা যুক্ত সংসারের ধার ধারে না, তারা বক্ষোস্থির সঙ্গে জোড়া লাগে না, তাদের নাম মুক্ত পঞ্জর। উচ্চ শ্রেণীর পশুদের মধ্যে এই মুক্ত পঞ্জর প্রায়ই বেশ স্পষ্ট কার্য্যকরী অবস্থায় থাকে। মুক্ত পঞ্জরাস্থিগুলি যুক্ত পঞ্জরের মতো বড় নয়, বিভিন্ন আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। এ গুলি আমাদের যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতির উপর দিয়ে আস্তৃত। একটু আলঙ্কারিক ভাষায় বলি যে, দেহ-পিঞ্জরের ভিতর আমাদের প্রাণ-পাখী থাকতে পারেন, কিন্তু দেহের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সুকোমল যন্ত্রদুটি—শ্বাসযন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্—এই পঞ্জরের পিঁজরের মধ্যেই চর্ম্মের ঘেরাটোপ্ দিয়ে ঢাকা রয়েছেন। মানুষের সমাজেও দেখতে পাবেন—যাঁরা আমাদের সংসারের সব চেয়ে আবশ্যকীয়, সব চেয়ে সুকোমল, তাঁদেরকেই পিঁজরের ভিতর আট্‌কে পর্দার আড়ালে রাখ্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা চলে।

আমাদের পায়ের কতকটা ছবি আমরা বানরের মধ্যে দেখ্‌তে পাই; তবে তাদের আঙ্গুলগুলো আরো লম্বা লম্বা। মানুষের মধ্যে পায়ের পাতা ও আঙ্গুল ক্রমশঃ বেঁটে হয়ে' আসছে। হয়ত এমন এক সময় উপস্থিত হবে, যখন আমাদের আর মাটিতে পা পড়্‌বে না, অবশ্য অহঙ্কারের জন্যে নয়—অশক্ততার জন্যে। আপাততঃ যা দেখি, তাতে করে' বুঝা যায় যে, আমাদের সব আঙ্গুলগুলোর চেয়ে জোরালো পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা, আর সব চেয়ে দুর্ব্বল কনিষ্ঠাঙ্গুলিটা। কিন্তু বানর বা মানবাকৃগ কপি অথবা অন্য কোন জন্তুদের মধ্যেই পায়ের আঙ্গুলের পরস্পরের মধ্যে স্থূলত্ব ও শক্তিমত্বার তারতম্য দেখা যায় না। বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আমাদের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটির বেবাক অনিষ্ট করতেই আমাদের পরাপ্রকৃতি বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কারণ ওটি ক্রমশঃ বেশ ছোট হ'তে আরম্ভ করেছে—লক্ষ্মীছাড়ার সংসারটা যেমন হয় আর কি! আমাদের প্রত্যেক আঙ্গুলে তিনখানি হাড়ের টুক্‌রোর মধ্যে দু'টি করে অস্থি-সন্ধি আছে। কিন্তু এখন হিসেব নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর প্রতি তিন জনের মধ্যে এক জনের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটির পূর্ব্ব-কথিত একটি সন্ধির বিচ্ছেদ হয়েছে, অর্থাৎ একটি হাড়ের টুকরা কমে গিয়েছে। একে ত আপনা আপনিই এই ছোট আঙ্গুলটি ছোটতর হয়ে যাচ্ছে, তার উপর আঙ্গুল-টেপা আঁট্‌-শাঁট জুতো পরে' আমরা এই ব্যাপারটাকে আরো সুগম করে দিচ্ছি।...

আমাদের শরীরের এক এক দিকে ৩১০টি করে' ছোট, বড়, মাঝারী আকারের মাংস-পেশী আছে। প্রথমতঃ, আমাদের দেহের "দেহত্ব" বজায় রাখ্‌বার, দ্বিতীয়তঃ দেহের ভারসাম্য অব্যাহত রাখ্‌বার, তৃতীয়তঃ দেহের কর্ম্ম-দ্যোতনা ফুটিয়ে তোল্‌বার প্রধানতম উপাদান এই পেশীগুলি। পেশীগুলি আছে বলেই আমরা হাঁট্‌তে পারি, দৌড়ুতে পারি বা হরিসঙ্কীর্তনে দু বাহু তুলে নাচ্‌তে পারি, মুখ ফাঁক করে আহার কর্ত্তে পারি, আবার কলম দিয়ে লিখ্‌তে পারি, দরকার মতো পাঞ্জা কষ্‌তে বা কারো পিঠে দু' ঘা বসিয়ে দিতেও পারি; যদি চ পেশীসকলের এই কর্ম্ম-প্রেরণা আসিচে নাড়ীতন্ত্র মারফৎ খোদ্ মস্তিষ্ক বাহাদুরের নিকট থেকে। শরীরের উপরিভাগে যে সব পেশী আছে, সেগুলি আমাদের ইচ্ছাধীন—পুরাতন ভৃত্যটির মতো আমাদের কথায় উঠে বসে; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে যকৃৎ, প্লীহা, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোমল যন্ত্রগুলির পেশী আমাদের মনের তাঁবে নয়—একেবারে আইরিশ ফ্রি ষ্টেট্। প্রধান প্রধান পেশীগুলির নাম ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটু জ্ঞান প্রত্যেক মানুষেরই থাকা উচিত। এখানেও কিছু দিতে পার্‌তাম; কিন্তু সামান্য কিছু বুঝিয়ে বল্‌তে গেলেও অন্ততঃ ৪।৫ খানি পৃষ্ঠা ব্যয়িত হবে, এই দুর্ভিক্ষের বাজারে তা কম নয়। তেস্তাৎ নামক একজন ফরাসী শারীরসংস্থানবিৎ শরীরের সব পেশীগুলির নাম ও তাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর্‌তে গিয়ে তাঁর একখানি আধুনিক বইয়ের ৯০০ খানি বড় বড় পৃষ্ঠা ভরিয়ে ফেলেছেন।

বানরের চপলতা দেখে আমরা অবাক্ হয়ে যাই। এর কারণ, তাদের পেশীগুলি অত্যন্ত কর্ম্ম-প্রবণ। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, বানরে হাসতে পারে না, কারণ তাদের মুখের পেশীগুলি তেমন স্পষ্ট ও পুষ্ট নয়। তবে দাঁত বার করাকেই যদি আপনারা হাসা বলেন, তবে তাতে এরা আমাদের চেয়েও মজবুত; কিন্তু মুখ-পেশীর মধুর সঙ্কোচ-প্রসারণে যে প্রসন্ন ভাবটি ফুটে উঠে, সেটি এদের মধ্যে একান্ত দুর্লভ।

আমাদের শরীরের মধ্যে যতগুলি পেশী আছে, তার এক চতুর্থ সংখ্যক আছে আমাদের মুখে ও ঘাড়ে; আমাদের সমগ্র দেহ-মনের সব কর্ম্ম ও চিন্তার একটা চিত্র প্রতিফলিত হ'তে পারে এই মুখে। এই মানুষের মুখের পেশীগুলি যেন এস্রাজের তার, যে-কোন ঝঙ্কার ইচ্ছা কর্লে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের মুখের পেশীগুলি কিন্তু অপেক্ষাকৃত সাদা-সিধা রকমের। ঘোড়ার বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে আমরা তার চোখের জ্যোতি লক্ষ্য করি; কুকুরের হাসি বা দুঃখের আয়না তার চোখেই। তবে অনেক উচ্চ শ্রেণীর জীবজন্তুরই মুখের উপর চর্ম্মাবৃত একটা পাতলা কম্বলের টুক্‌রার মত পেশী থাকে; মুখের উপর মাছি টাছি বস্‌লে ঐ পেশীটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে

তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। মুখের ধারে তাদের আর একটা পেশী আছে, যেটার সাহায্যে কর্ণচুটোকে অল্প-বিস্তর আন্দোলিত করতে পারা যায়। মানবানুগ বানররা (apes) মানুষের মতো ললাটদেশ সঙ্কুচিত করতে পারে। শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্যে বা আনন্দের আতিশয্যে তারা কপাল এইরূপ রেখান্বিত করে। আমাদের নাকের ও মুখ-বিবরের চারিপাশে যে সকল ছোট ছোট বিচিত্র রকমের পেশী আছে, তারা মানুষের আপনাকে প্রকাশ করার ধাঁজটি বজায় রাখে। মন হয় ত যে জিনিসটি গোপন করতে চায়, এরা হয়ত মুখ দিয়ে সেগুলি বার করে' দেয়। খুব দক্ষতা অর্জন করলে আমরা মুখের পেশী দিয়ে হৃদয়াবেগ ঢাকতে পারি। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, তত এই স্বাধীন পেশীগুলির উপর তার প্রভাব বাড়ছে; তাই সমাজে গিয়ে যখন বুকফেটে কাঁদতে ইচ্ছে কচ্ছে, তখন আমরা স্মিত হাস্য দিয়ে তাকে চমৎকার ঢাকতে পারি।

আমাদের হাত দুখানা মুক্ত স্বাধীন; কারণ তারা দেহের অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশী যদৃচ্ছা নড়তে পারে। এই স্বাধীনভাবে নড়তে চড়তে পারার প্রধান কারণ যে, দেহকাণ্ডের সঙ্গে পুরোবাহু উদুখল সন্ধি দ্বারা যোড়া লাগানো; এটা সব চেয়ে সরল সহজ সন্ধি এবং এর দ্বারা প্রত্যঙ্গটিকে চতুর্দিকে খুশীমতো বেশ ঘুরানো-ফিরানো যায়। আমাদের দেহ-সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র বাহু-যুগলই 'ডোমিনিয়ান্ ষ্টেটাস্' পেয়েছে। হাতের স্বাধীনতার আর একটা বড় হেতু এই যে, এর মধ্যে নানা আকার ও প্রকারের মাংস-পেশী আছে। যার মধ্যে এই পেশীগুলি যত বেশী সংখ্যায় বিদ্যমান্ ও যত বেশী পুষ্ট, তার হাতের স্বাচ্ছন্দ্য গতি তত অধিক। আমাদের পূর্বগ প্রাচীনতম মানুষরা চার পায়ে চলতেন্—একথা এবারকার মুখপাতেই আপনাদের বলেছি। কিন্তু চার পা না বলে' চার হাত বললেই অধিক শোভন হয়। কিন্তু সেকালে হাতের পেশীবৈচিত্র্যের এত বালাই ছিল না; মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, তার পেশীর বাহার ততই বাড়ছে। জীবতাত্ত্বিকরা হিসাব করে' ঠিক করেছেন, প্রায় কুড়ি লক্ষ বৎসরকাল যাবৎ আমরা চার হাতে হাঁটা ছেড়ে' দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখেছি।

আমরা মাতার গর্ভে থাকতে থাকতেই প্রকৃতি দেবী আমাদের বৃদ্ধি পাবার জন্য একটা আন্তরিক শক্তির মূলধন আমাদের মধ্যে দিয়ে দেন। অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে বুঝে-সমঝে ঐ শক্তি খরচ করতে পারলেই দেহের দিক্ দিয়ে আমরা একটা আদর্শ মানুষরূপে খাড়া হতে পারি। আমরা যখন প্রথম মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত হই, তখন এই বৃদ্ধি-শক্তির মাত্র শতকরা ২ ভাগ খরচ হয়; বাকী ৯৮ ভাগ অব্যাহত থাকে।

জন্মাবার সময় আমাদের যে ওজন থাকে, ৬ মাস পরেই তা দ্বিগুণ হয়ে' উঠে। একটা নব-প্রসূত বাছুর দ্বিগুণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় ৫০ দিনের মধ্যে; কুকুর ছানা হয়—আট দিনের মধ্যে। জীবনের প্রথম বৎসরটায় আমরা যে হারে বাড়ি, সারা জীবন-ভর, আমরা সে হারে বাড়তে পারি না। বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত 'বাড়' হয়; কারো কারো এই বাড় অতি অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত চলতে পারে। তারপর অকিঞ্চিৎকরভাবে কমতে থাকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন পর্য্যন্ত। ষাটের পর থেকেই ভাঙার গান সুরু হয়; দেহ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার—চার নদীতেই তখন দ্রুত ভাঁটা পড়তে থাকে।

শিশু যখন থেকে হাঁটতে সুরু করে, তখনই বুঝতে হবে যে, সে লম্বায় কুড়ি থেকে অন্ততঃ বত্রিশ ইঞ্চি হয়েছে। তারপর যোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ফি বৎসরে গড়পড়তা অন্ততঃ দু ইঞ্চি করে' উচ্চতায় বাড়ে। মেয়েরা সাধারণতঃ তেরো বৎসর বয়সে এবং ছেলেরা যোল বৎসর বয়সে সব চেয়ে উচ্চতায় বাড়ে। চৌদ্দ থেকে যোল বছরের মধ্যে বালকদের দেহ অন্ততঃপক্ষে সাতইঞ্চি বেশী প্রলম্বিত হয়। মেয়েরা লম্বায় যতটা বাড়বার তা আঠারো বৎসরের মধ্যেই বাড়ে এবং ছেলেরা পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই তা শেষ করে ফেলে। তারপর কেউ কেউ আরো তিন চার বৎসর পর্য্যন্ত অতি সামান্য মাত্রায় বাড়তে পারে।

উচ্চতা ও গুরুত্বা নিয়েই মানুষের বৃদ্ধির আদৎ বিবেচনা। পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত মানুষ লম্বায় বাড়ল বটে; কিন্তু উনত্রিশ বছর পর্য্যন্ত সে ভারে বাড়ল। ত্রিশ পার হয়ে যে ভারী হয়, গায়ে মাংস লাগার জন্যে প্রায়ই তার ওজন

বাড়ে না, চর্বি হওয়ার জন্যে বাড়ে। সে বাড়্‌কে আমরা 'মরণ-বাড়' বল্‌লেও কিছু ক্ষতি নেই!

খনা বলেছেন—মানুষ এক শ' কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচতে পারে। কিন্তু জীব-তাত্ত্বিকরা বল্‌ছেন—মানুষের বাঁচা উচিত ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত। আমাদের দেশে আগে অনেক বুড়োই দেখা যেত, যাঁরা এক শ' বছর বয়সে হেঁটে তীর্থযাত্রা করেছেন। এখনো ম্যালেরিয়ার রাক্ষসী-প্রেমে হাবুডুবু খেয়েও দু একটি বুড়ো একশ বছরের চৌকাঠ মাড়িয়ে যান। নোয়াখালিতে একজন ১১০ বছরের বুড়ো দেখা গেছে। বর্মায় ১০৫ বৎসরের ডাকাত-তাড়ানো এক বীর বুড়ীর খবর সম্প্রতি পাওয়া গেছে। বিলাতের টমাস পার্‌ ১৫২ বৎসর জীবিত ছিলেন—এটা গঞ্জিকা-পুরাণের কথা নয়, ঐতিহাসিক সত্য। সেদিন ১৫২ বছরের একজন চীনা বৃদ্ধের কথা পড়লুম। তাঁর নাতির নাতি তস্য নাতি নিয়ে পরিবারে ১৮০ জন লোক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অষ্টম পক্ষে বিবাহ করেছেন—স্ত্রীর বয়স সবে পঁচিশ। বুলগেরিয়াতে লোক-সংখ্যার অনুপাতে শত-জীবীর সংখ্যা বেশী। পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা এবং সধবার চেয়ে বিধবারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবিনী হয়।

হ্বাইজ্‌ম্যান্ (Weismann) বলেন, জীবের দৈহিক আয়তন বা গুরুত্ব অনুসারেই যে তার পরমায়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি হয়—ঐ কথা ঠিক নয়। কোনো কোনো স্তন্যপায়ী জন্তুর স্বাভাবিক আয়ু মাত্র ২ বৎসর পর্য্যন্ত; আবার কোনো কোনো ক্ষুদ্র পতঙ্গ বাঁচে সতেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। কুকুর কুড়ি বৎসরেই একেবারে বুড়িয়ে যায়; আবার এক একটা তোতা পাখী ১১৭ বৎসর বয়সেও ঘাড় নেড়ে নেড়ে মৃদু মৃদু কপ্‌চায়। একশ ত্রিশ বৎসরের বেশী কোনো হাতীকে বাঁচ্‌তে দেখা যায় নি। কিন্তু এক একটা কচ্ছপকে পাকা সাড়ে তিন শ বছর বাঁচতে দেখা যায়। কলিকাতার চিড়িয়াখানার বড় কচ্ছপটার যে বয়স, সারা পৃথিবীর সব চেয়ে বুড়ো মানুষটার বয়স তার চেয়ে নিশ্চয় অনেক কম।

জীবজন্তু বা মানুষ যতদিন জনন-কার্য্য সমাধা করতে পারে বা কর্ম্মঠ জীবন যাপন কর্ত্তে পারে—ততদিনই যে সে বাঁচবে, এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম প্রকৃতির রাজ্যে নেই। অনেক বুড়োকেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কাল সরকারী পেন্সন্ ভোগ করতে দেখা গিয়াছে। মানুষ সহবাস-শক্তি-হীন হলেই যে বুড়ো হল, তারও কোন মানে নেই। কোনো বুড়ো অষ্টাশি বৎসরে পুত্র-সন্তান কোলে করেন, আবার কোনো যুবক বিবাহের পরদিনই রতিশক্তিহীন হয়ে পড়েন। প্রকৃতি দেবীর জটিল আইন-কানুন বোঝা বড় কঠিন ব্যাপার।

বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেহ-ব্যবস্থার মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। মেরুদণ্ড ধনুকের মতো বাঁকতে সুরু করে, কাযেই অবশেষে উচ্চতা প্রায় ইঞ্চি তিনেক কমে যায়। হাঁটুর কাছটা দুমড়ে যায়। পেশী-গুলো গুটিয়ে যায়, চর্বিগুলো গলে যায়, চামড়া সঙ্কুচিত থলথলে হয়ে পড়ে। কাঁধের, বুকের, গালের হাড় বেরিয়ে পড়ে। ধমনীগুলোর স্থিতিস্থাপকতা গুণ নষ্ট হয়—ক্রমশঃ শক্ত হয়ে' যায়। রক্তের সঞ্চাপ বৃদ্ধি পায়। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়; অল্প বয়সে মিনিটে ৭২, এ সময় প্রায় ৮০ বার স্পন্দন। দাঁত পড়ার দরুণ হজম-শক্তিও হ্রাস পায়, মস্তিষ্কের ওজনও সুস্পষ্ট কমে যায়। স্ত্রীলোকদের পঞ্চাশের পরই স্ত্রী-সুলভ কমনীয়ত্বটুকু নষ্ট হতে থাকে; কারো কারো মুখে লোম বাহির হয়। সমস্ত শরীরের যন্ত্রগুলি দীর্ঘ দিন ক্রিয়াশীলতার মধ্য দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে এমন একটা ক্ষয়ের সীমায় এসে পড়ে, যখন দেহের কারখানার ফোরম্যান্ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শুষ্ক ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠে—"আউর নহি সক্‌তা।" কল তখনি থেমে যায়, এবং তারই নাম মৃত্যু!

মুক্তি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল বি এল্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পুলিশ পথ ছাড়িয়া দিতে তারক আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইল। উস্ক-খুস্ক চুলগুলায় তার জটা পাকাইবার উপক্রম হইয়াছে। পরণের ময়লা কাপড়-জামা ও মুখচোখের ভাব দেখিলে মনে হয়, যেন এইমাত্র সে কোন শ্মশান হইতে মড়া পোড়াইয়া উঠিয়া আসিতেছে! হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিই তারক রায়?"

তারক মাথা উঁচু করিয়া কহিল,—"হ্যাঁ হুজুর! আর, ওই আমার ভাই সুধাংশু। এসিয়াটিক ব্যাঙ্কের তিন হাজার টাকা চুরি করেছিলুম আমি, আমার ভাই নয়!"

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এই কথা সরলভাবে স্বীকার করিতেছ?" পরে সুধাংশুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এ কথা ঠিক?"

সুধাংশুর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তারক বলিয়া উঠিল,—"হুজুর! ও মিথ্যা ব'লেচে, হয়ত' এখনো বল্‌বে! আপনি ওই চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করুন, যেদিন টাকা চুরি যায়, ঠিক তার একদিন পরে আমি ওকে দু'হাজার টাকার নোট দিই!"

মিঃ বাসু তখন চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে তাহা সমর্থন করিল। হাকিম তখন দুই ভাইকেই হাজতে রাখিতে বলিয়া দিয়া পরদিনের জন্য মোকদ্দমা মুলতুবি রাখিয়া টিফিনে চলিয়া গেলেন।

* * * *

পরদিন সন্ধ্যার আঁধার তখন রাস্তায় রাস্তায় গাঢ় হইয়া আসিতেছে। শ্রান্ত অলস চরণে সুধাংশু কোর্টের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া অমলের পানে দৃষ্টি তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"তাইত, এ কোত্থেকে কি কর্লেন অমলবাবু?"

অমল বলিল,—"কি আবার কর্লুম? নির্দ্দোষ হ'য়েও যে তোমায় এত কষ্ট সহ্য কর্‌তে হোল, সেইটেই বড় দুঃখের কথা!"

সুধাংশু নীরব রহিল। দুইজনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। অমল বলিল,—"সত্যি, তোমার মন যে উঁচু তা আমরা কেউ জানিনি! ওই হতভাগাটার জন্যে কেন তুমি সব ছেড়ে শাস্তি নিতে যাচ্ছিলে?"

"কেন?" সুধাংশু শুধু এই কথাটাই আবৃত্তি করিয়া নীরব রহিল। অমল বলিল,—"কৈ, তোমার স্ত্রীর খবর জিজ্ঞাসা কচ্চ না যে সুধাংশু?"

"কি জানি! এমন আশ্চর্য্যভাবে মুক্ত হ'য়েও যেন আজ আমি একবিন্দু আনন্দ পাচ্চি না! আচ্ছা, দাদার নিশ্চয়ই জেল হবে, কি বলেন অমলবাবু?"

"তা তাতেই বা দুঃখ কি? পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে!"

সুধাংশু এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া কহিল,—"হাঁ, তা হবে। কিন্তু দুঃখ যে কি, তা আপনি কেমন' করে বুঝ্‌বেন অমলবাবু? আপনি বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে!"

গাড়ী আসিয়া অমলের বাড়ীর সাম্‌নে থামিল। দুইজনে নামিয়া আসিতে অমল সুধাংশুর হাত ধরিয়া কহিল,—"ভেতরে এস।" কিন্তু সুধাংশু কি ভাবিতেছিল; বলিল,—"না অমলবাবু, বাড়ী ত' যাবোই! তার চেয়ে আমি একবার লালবাজার হাজতে চল্লুম। ভেতরে খবর দিন্—আমি একবার—"বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। অমল তার হাত ধরিয়া বলিল,—"ওহে, বুঝ্‌চ' না সেখানে তার দেখা পাওয়া এখন অনেক ঝঞ্ঝাট! তার চেয়ে কাল দুজনে একসঙ্গে যাবো'খন! এস। বাড়ীর ভেতর বাবা বড্ড ভাব্‌চেন।"

সুধাংশু আর কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা

খানিকটা সমতল পড়ো জায়গার পাশে একখানি ছোট বাড়ী। রাণীগঞ্জের লাল সুন্দর টালীতে বাড়ীখানি ছাওয়া, চারিপাশে কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ঘেরা, আর তার ভিতরে বেশ ছোট্ট একখানি ফুলবাগিচা! প্রত্যূষের অরুণাভা যখন সর্ব্বপ্রথম অনতিদূরের শ্যামল গিরিগাত্র উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, তখন এই ছোট ফুলভরা বাগিচাখানিকে বুকে করিয়া এই আবাস যেন আনন্দে সজীব হইয়া উঠে! আবার শান্ত নিশীথের বিমল জ্যোৎস্নার নীচে যেন ইহা এক সুখতন্দ্রায় বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকে। প্রকৃতির স্বচ্ছ উদার স্নেহের সবটুকুই যেন এই প্রান্তরের মাঝে ছোট বাড়ীখানিকে দিবারাত্রি ঘিরিয়া থাকে। সম্মুখে কি একটা নদী বিস্তৃত বালুকা-গর্ভের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঝির্-ঝির্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সমস্ত প্রকৃতি যখন ধ্যানমগ্নার মত নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে, তখন এই শীর্ণ জলরেখার একঘেয়ে ঝঙ্কারটুকু যেন কি একটা ঘুম পাড়ানিয়া গানের মত কাণে বাজিতে থাকে।

প্রভাতের বাতাসটুকু সেদিন ভারী স্নিগ্ধ হইয়া বহিতেছিল। বেড়ার মধ্যস্থ ছোট ফটকের একধারে একটা স্তম্ভের গায়ে হেলান্ দিয়া একটি লোক সেই নীলোজ্জ্বল পাহাড়টার পানে তাকাইয়াছিল। তার পরণে একখানি কালাপাড় ধুতি, গায়ে গেঞ্জী, পায়ে চটিজুতা। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ফিরিয়া সিঁড়ির নিকট আসিয়া বসিল। সেই সময়, একটি ছোট মাস ছয়েকের ছেলেকে বুকে করিয়া একটি উনিশ-কুড়ি-বছরের মেয়ে সন্তর্পণে আসিয়া পিছন হইতে তার কোলের উপর ছেলেটিকে শোয়াইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। লোকটি পিছন না ফিরিয়াই বামবাহু দ্বারা যুবতীকে বন্দিনী করিয়া ফেলিয়া ক্রোড়স্থ খোকার মুখে একটি গভীর চুম্বন করিল। পরে হাসিয়া বলিল,—"চুমুটা কিন্তু খোকা একাই পেলে!"

যুবতীর শুভ্র গণ্ডদুটি গোলাপের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিল,—"তা পা'ক্! কিন্তু, আসল জিনিষটা ত' দেখ্‌লে না?"

—"কি অনি! বাঃ বাঃ সত্যিই তো! খোকাকে যে আজ দিব্যি বাবুটি সাজিয়ে এনেছ' দেখ্‌চি!"

—"এই টুপীটা আমি নিজে বুনিচি! আর, তোমায় বল্‌চি এতদিন ধরে, সেই কাপড়ের টুকরোটা কেটে দাও আমি সেলাই করি!"

সুধাংশু হিতহাস্যে কহিল,—"মাপ করো অনি; দরজীর কাজ আজ পর্য্যন্ত শিখিনি, ওটি আমি পার্‌বো না!" লজ্জিতা অনিলা বলিল,—"যাও! ছেলের একটা জামা কেটে দিলেই যেন দরজী হ'তে হয়!"

"কি মুস্কিল! না জান্‌লে কাট্‌বো কেমন করে' বলত?"

"বেশ, না দাওগে!...তা হ্যাঁগা, আজ ত' আর তুমি বেরুবে না?"

"বেরুব' না কি গো! তবে, হ্যাঁ, একটু বেলায় বেরুব বটে!"

"বেলায় ত? আচ্ছা, একটা কথা বল্‌বো?"

"কি?"

"আজ অমন চুপ্‌টী করে 'একা বসে' এতক্ষণ ভাবছিলে কি বল ত?"

সুধাংশু হাসিয়া কহিল,—"কি আবার ভাব্‌বো?"

"নিশ্চয় ভাব্‌ছিলে! খোকাকে কোলে দিতে তবে বাবুর মুখে হাসি বেরুল। বল না কি ভাব্‌ছিলে?"

সুধাংশু উদাসস্বরে কহিল,—"সে অনেক কথা অনি! সে অনেক পুরোনো কথা কেন জানি-না আজ হঠাৎ সেই সব দু'বৎসর আগেকার কথা আমার মনে পড়ে' যাচ্ছে!"

অনিলা শুষ্কমুখে কহিল,—"কেন, কি হয়েচে?" সুধাংশু তাহাকে আদর করিয়া কাছে টানিয়া নিয়া কহিল,—"কি! অমন করে' মুখ শুকোলে যে? আর তো এখন আমাদের সে ভয় নেই?"

"কি ভয়?

"সেই যখন দুবৎসর আগে আমরা দুজনে কাটোয়ায় বাস কর্‌ছিলুম, তখন যেমন আমাদের মাথার ওপর—"

"মাগো! সে ভয় যেন শত্রুরও না হয়! ভাব্‌তেও এখন গা শিউরে ওঠে!"

"সত্যি অনি! এখন যেন আমারও বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের জীবনে এত কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়েচে! এবিষয়ে আমাদের কেউ কম যায় না! বরং বেশী সহ্য কর্‌তে হয়েচে তোমাকেই।"

"ছাই! তুমি কত কষ্ট পেয়েছ বল ত? পরের জন্তে তোমায়"—

সুধাংশু বাধা দিয়া বলিল,—"পর নয় অনি, নিজের ভাই! আজ সেই ভাইকেই যে আমার বার-বার মনে পড়্‌চে!" অনিলা ইহার পর কি বলিবে তাহা হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না। সুধাংশু একটু থামিয়া বলিল,—"অনি! যতই সে আমাদের কষ্ট দিয়ে থাক্ সে আমার ভাই! তার সেই শোচনীয় মৃত্যুর কথা আমি কখনো ভুল্‌তে পারবো না। যত বড় দুষ্কর্ম্মই সে করে' থাক্, শেষে কিন্তু মনে তার যে অনুতাপের আগুণ জ্ব'লে' উঠেছিল, তার দামও ত' এ সংসারে বড় কম নয়।" বলিয়া একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল,—"সেদিন যখন অমলবাবুকে নিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলুম, তখন একবার স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সে আত্মহত্যার বিষ সঙ্গে নিয়ে তবে পুলিশের হাতে ধরা দিয়েচে! গিয়ে দেখি, জেলের ভেতর খানিকটা বড় উঠানে তার মরা দেহটাকে তারা শুইয়ে রেখেচে, ডোমটা বল্লে, আগের রাত্রেই সে বিষ খেয়েছিল!……অনি! সেদিন সেই মৃত দেহের ভেতর হ'তে দাদার সেই অনুতপ্ত ভারগ্রস্ত হৃদয়খানা যেন আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছিলুম।" বলিয়া সে অনেকক্ষণ আবিষ্টের মত চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া রহিল।

অনিলা তাড়াতাড়ি খোকাকে তাহার বাহুর মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—"ওগো, শীগ্‌গীর ধর একবার একে! আমি আস্‌চি—"বলিয়া উঠিয়া পলাইবার যোগাড় করিতে সুধাংশু বুঝিতে পারিল, তার আঁচলখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"দুষ্টুমী ক'রোনা অনি!…আচ্ছা, আর ভাব্‌বো না; তুমি পালিয়ো না।"

"কি কর্‌বো তবে?"

"অন্য কিছু গল্প কর।" বলিয়া সুধাংশু উঠিয়া হাতের নিকট ফুল-গাছটা হইতে একটী গোলাপ ছিঁড়িয়া খোকার বুকে বসাইবার যোগাড় করিতেই অনিলা বলিয়া উঠিল,—"ওমা, ওকে ফুল পরাচ্ছ কি গো! এখনো যে ওর ভুজ্‌নো হয়নি? তুমি যেন কি!"

সুধাংশু তার মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—"পরাতে নেই?"

"না।"

"ইস্, ভারী গিন্নি গো!"

"নয়ত' কি! তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি!"

সুধাংশুর কতকগুলা পুরাণো কথা মনে পড়িয়া যাইতে সে বলিল,—"কি জানো? ভাত রাঁধ্‌তে, হাতে গরম ফ্যান্ পড়ে গেলে চুণ-স্যাকরা দিতে, এই সব?"

"যাও! কি যে কথা তোমার!" বলিয়া অনিলা অপর কথা পাড়িয়া কহিল,—"আচ্ছা, পরশু যে খোকার ভুজ্‌নো তা, এদের কারুর আস্‌বার তো কোনো গা'ই দেখ্‌চিনে।"

"কাদের? অমলবাবু তো লিখেচেন, তাঁর ছেলের ব্যামো; আর দু'চার দিনের ভেতরই কর্ত্তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ; তাই আস্‌তে পারবেন না! সে সব চুকে-বুকে গেলে বৌঠান্‌কে নিয়ে একদিন খোকাকে দেখে যাবেন!"

অনিলা একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—"তা না-হয় হোল! কিন্তু আমার দিদিরই বা রকম কি? পর-পর তিন চার-খানা চিঠি এলাহাবাদের ঠিকানায় দেওয়া হ'ল, একটারও তো জবাব এল না!"

সুধাংশু অন্যমনস্ক হইয়া কহিল,—"কি জানি!"

"এই দু'বচ্ছরের ভেতর একবারও তাঁদের আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার ফুর্‌সৎ হোল না! খোকার ভুজ্‌নো, অত করে লিখে পাঠালুম—না, সত্যি, আমার কিছু ভাল লাগ্‌চে না!"

সুধাংশু কোন কথা না বলিয়া কাছের একটা কামিনী গাছের ডাল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পরে হঠাৎ একটা অবান্তর কথা আনিয়া ফেলিয়া কহিল,—"আচ্ছা, কৈ, খোকার কি নাম হবে তা তো এখনো ঠিক করা হোল না?"

অনিলা একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল,—"কেন, সে তো আমি ঠিক করিচি!"

"কি শুনি? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রেই একেবারে ঠিকঠাক্! কি নাম শুনি?"

"শ্রীমান্ পরেশনাথ রায়।"

সুধাংশু গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"কি রকম? পরেশ ভট্‌চায্যির ছেলে পরেশনাথ রায়?" স্নিগ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া অনিলা কি কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা সুধাংশু তাহাকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করিয়া তার শুভ্রগণ্ডে একটী চুম্বন দিয়া বলিল, "সত্যিই তুমি পাগ্‌লী!"

·········আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, গুরুপ্রসাদবাবুর চেষ্টায় পশ্চিমের কোন কয়লার খনিতে একটা সুবিধাজনক কার্য্য যোগাড় করিয়া সুধাংশু এই বিজন প্রদেশের শান্তিময় কুটীরখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রথম জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট-ঝঞ্ঝা কাটিয়া গিয়া স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়নদীতে যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের বাতাস জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার বুঝি আর কোনকালেই শেষ ছিল না। কয়েক মাস হইল, বিধাতার আশীর্ব্বাদে প্রস্ফুটিত পারিজাতের মত এই খোকাটি আসিয়া তাহাদের মুঞ্জরিত প্রণয়তরুটিকে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছে।—

নিতান্ত বালিকাটির মত স্বামীর আদরে গলিয়া গিয়া অনিলা মনে মনে বলিল,—"আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরদিন আমি তোমার কাছে এম্‌নি পাগ্‌লীই থাকৃতে পারি!" বলিয়া হেলিয়া পড়িয়া স্বামীর বুকের উপর নিজের মাথাটী রাখিতে গিয়া হঠাৎ শশব্যস্তে সরিয়া বসিল। সাম্‌নের রাস্তা দিয়া একখানা গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল; এবং একটু পরেই তাদেরই ফটকের সাম্‌নে একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া থামিয়া পড়িতে তাহারা দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনিলা অস্ফুটে কহিল,—"কে এল গা?" বলিয়া গাড়ীর জানালা দিয়া একজনকে মুখ বাড়াইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"এঁ্যা, দিদি যে!"

সুধাংশু তার চাকরাণীটাকে ডাকিয়া গাড়োয়ানের সাহায্যে ছাদের জিনিষ-পত্র নামাইয়া লইল। ভিতর হইতে রাণী নামিয়া একেবারে অনিলার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। অনিলা একমুখ হাসিয়া বলিল,—"বাবাঃ! ধন্যি মানুষ তুমি দিদি!—এস।" রাণী কোন উত্তর না দিয়া খোকাকে অনিলার কোল হইতে তুলিয়া নিয়া তাহার গালে মুখে চুমু দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আসিল। অনিলা বলিল,—"জামাইবাবু এসেচেন? আমার মণ্টুবাবু?"

রাণী খোকাকে আদর করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই কহিল,—"সবাই এসেচে।"

অনিলা তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইয়া কহিল,—"বোস। মুখ হাত ধুয়ে জিরোও একটু। বরাবর কি এলাহাবাদ থেকে আস্‌চ?"

"হুঁ।"।

আরও দু'একটা কথা হইতে ঝি সেখানে আসিয়া পড়িল। অনিলা তাহাকে বলিল,—"তুমি বাছা বাইরে এক বাল্‌তি জল আর এই গামছা আর কাপড়খানা দিয়ে এসে খোকাকে একবার ধর। আমরা ততক্ষণ কাপড়টা কেচে আসি।"

ঘেরা কুয়াতলার ভিতর দিদিকে লইয়া আসিয়া অনিলা বলিল,—"আমি জল তুলে দিই, তুমি চান্ করে' নাও।... আচ্ছা, সত্যি বল ত' দিদি, এতদিনের মধ্যে তোমার কি একটিবারও আমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌তো না?"

রাণী শানের উপর পা ঘষিতে ঘষিতে বলিল,—"তোমার কি মনে হয়?"

"তা করতো।"

রাণী এবার গাঢ়স্বরে কহিল,—"তবে? সব জেনে শুনে কেন ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিস্ বোন? আসা কি আমার একার ইচ্ছাতেই হয় অনু? যার আসাটা সব চেয়ে বেশী দরকার, সে যদি না আস্‌তে চায়—"

"কে?" বলিতে বলিতে হঠাৎ অনিলার মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে অন্যমনস্ক হইয়া কহিল,—"জামাইবাবু বুঝি এখানে আস্‌তে চাইতেন না?"

"না।" অনিলা তেমনি অন্যমনস্কের মত কহিল,—"কেন দিদি?"

রাণী একবার তার বিস্মিত দৃষ্টি ভগ্নীর মুখের উপর তুলিয়া কহিল,—"কেন কি বোন্? কি ছেলেমানুষের

মত কথা বল্‌চিস্? এত শীগ্‌গীর তুই সব কথা কেমন করে' ভুলে গেলি যে,—"

অনিলা নীরবে এক বাল্‌তী জল কুয়া হইতে উপরে তুলিয়া কহিল,—"না দিদি, একেবারে ভুলিনি এখনো! কিন্তু, ওই সব কথাগুলো বুকে পুষে' রাখার চেয়ে ভুলে যাওয়াই ত' সব চেয়ে মঙ্গল!"

এবার রাণী মুখ তুলিতে অনিলা দেখিল, তার দুই চোখের কোনে যেন রাশি রাশি অশ্রুভার সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। রাণী বলিল,—"সেই ভরসাতেই ত' আমি তাকে জোর করে' এখানে নিয়ে এসেচি বোন্! তোর কাছে ক্ষমা চাওয়াই তার প্রধান উদ্দেশ্য,—আর সেইটেই এখন তার সব চেয়ে বেশী দরকার।......বল্, তুই ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বি ত?" বলিতে বলিতে সে আর তার কাতর অশ্রু সংযত করিতে পারিল না।

অনিলাও কান্না চাপিয়া কহিল,—"নাও, কি কর দিদি! শীগ্‌গীর চান্ করে নাও।"

ও বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া দুইজনে স্নান সারিয়া ভিতরে আসিল। খানিক পরে শয়নকক্ষের একটা খোলা জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনিলা বোধ করি আজ এই দুই বৎসর পরে একান্ত ম্লানমুখে শূন্যপানে চাহিয়া ভাবিতেছিল। পিছন হইতে সুধাংশু কহিল,—"অপূর্ব্ববাবু আর মণ্টু যে বাইরে বসে' রয়েচে অনি, তাদের ডেকে কিছু খেতে দাও! এই বুঝি তোমার অভ্যর্থনা?"

অনিলা হঠাৎ তার উদাস শূন্যদৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া পরে একটুখানি সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, দিই! মণ্টুকে পাঠিয়ে দাও এখানে!"

—"কেবল মণ্টুকেই?"

—"না না, জামাইবাবুকেও!" বলিতে বলিতে অনিলা নতমুখে স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া নাড়িতে লাগিল।

সুধাংশু কহিল,—"কি?"

অনিলা তেমনি নতমুখে ক্ষীণ বিপন্নস্বরে বলিল,—"বলে দাও না গো, কি বল্‌ব' আমি তাঁকে! কি বলে—"

সুধাংশু আদর করিয়া কহিল,—"ছি অনি! আজ এত দুর্ব্বল হচ্চ কেন?"

অনিলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও এইখানে!" একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বুকের মধ্যেই আট্‌কাইয়া গিয়া ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল। সে তেমনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা পিছনে কা'র পদশব্দ শুনিয়া দেখিল, সাম্‌নে অপূর্ব্ব ও মণ্টু! সে আসিয়া মণ্টুকে বুকে তুলিয়া নিয়া কহিল,—"এস বাবা আমার, মাণিক আমার!"

অপূর্ব্ব চোরের মত ঘাড় হেঁট করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—"বসুন জামাইবাবু!"

অপূর্ব্ব ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিল,—"হ্যাঁ, এই বসি—বসি—" বলিয়া সে কোনক্রমে সেই মাদুরখানার একটা পাশে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সমস্ত ঘরখানা নিতান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে অপূর্ব্ব তেমনি মাথা না তুলিয়াই পকেট হইতে কি একটা বাহির করিয়া যেন অনেক চেষ্টায় বলিয়া ফেলিল,—"অনি! তো—তোমার দিদি এই হারছড়াটি তোমার খোকাকে—"

বাধা দিয়া অনিলা মৃদু হাসিয়া কহিল,—"দিদি দিয়েচেন? কেন, তুমি নও বুঝি?"

অপূর্ব্বর মুখখানা দুই কাণ পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে একবার অনিলার মুখের পানে চাহিয়া পরে পুনরায় নতমুখে কহিল,—"আমি—আমি? আমার দেবার অধিকার কি এখনো কিছু আছে অনিলা?"

—"অধিকার নেই? কি বল্‌চ' জামাইবাবু? তাহ'লে—তাহ'লে তুমি আমাদের—আমার খোকাকে পর ভাব্‌ছ বুঝি?"

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত—অথচ এক দৃঢ়স্বরে অপূর্ব্ব কহিল,—"পর? না—না—তাতো আমি ভাবি না? কিন্তু, তুমি—তুমি কি এখনো আমায়—তুমি কি সব ভুলে আমায় ক্ষ—ক্ষমা কর্‌তে পেরেছ অনু?"

অনিলা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—"ক্ষ-মা?...হ্যাঁ জামাইবাবু! দিদির কাছে আমি সব শুনিচি।...তা, আমার ক্ষমাই যদি

এখন আপনার একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, তাহ'লে শুনুন্ আজ আমি প্রাণ খুলে আপনাকে ক্ষমাই কর্‌লুম! বসুন আপনি, ব'সো বাবা মণ্টু, আমি তোমাদের খাবার নিয়ে আসি!" বলিয়া অনিলা পরিপূর্ণ হৃদয়ে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সম্পূর্ণ।

পঞ্চপুষ্প

বালকের বীরত্ব

কয়েক দিন পূর্ব্বে দিনাজপুরের বালুঘাটে একটি ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকের অদ্ভুত সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আত্রেয়ী নদীতে পূর্ণ জোয়ারের সময়ে কয়েকটি বালক স্নান করিতেছিল। সুবোধ মজুমদার নামক একটি বালক স্নান করিতে করিতে স্রোতের ধাক্কায় দূরে গিয়া পড়ে এবং জলের ভিতরে তলাইয়া যাইতে থাকে। সুরেশ মজুমদার নামক আর একটি বালকের সুবোধের মত অবস্থা হয়। এই ব্যাপার দেখিয়া ১৪ বৎসরের বালক ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তরণ দিয়া মগ্নপ্রায় বালক দুটির নিকট পৌঁছে এবং তাহাদিগকে তীরের দিকে লইয়া আসে। কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক আর একজন বালকও ফটিককে সাহায্য করে। সাহায্যকারিগণ প্রায় তীরের নিকটে আসিয়া হাঁফাইয়া পড়ে। তখন তাহাদিগকে পচা গুহ নামক একজন ১০ বৎসরের বালক গিয়া বাঁচায়। পচা উমেশ গুহ নামক আর একজন বালককেও বাঁচাইয়াছে। বালকদিগের এইরূপ বীরত্ব সকলেরই প্রশংসার যোগ্য। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, বালকদের এই পরোপকার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হউক।

সঞ্জীবনী

জেলাবোর্ডের চিকিৎসা ব্যয়

১৯২৬-২৭ সনের বঙ্গের জেলাবোর্ডের কার্য্যবিবরণীতে উক্ত হইয়াছে,—ডাক্তারী সাহায্য ও সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আলোচ্য বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ২১লক্ষ ৬৯হাজার টাকা; পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ২০ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য বর্ষে ২৩টি নূতন ডাক্তারখানা খোলা হইয়াছে। জিলাবোর্ড ৫০৮টি ডাক্তারখানার সমগ্র খরচ নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং ৩৪৬টিতে সাহায্য দান করিয়াছেন। ইউনিয়ান বোর্ডও অনেক ডাক্তারখানা চালাইয়াছেন। কালাজ্বর দমনের জন্য ২৪ পরগণা, হাওড়া, রাজসাহী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বহু জিলাবোর্ড বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে কালাজ্বরের চিকিৎসার জন্য ৪॥ হাজার টাকা ব্যয় যে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩ হাজার টাকা সরকার দিয়াছেন।

কতিপয় জিলাবোর্ড ধাত্রী-শিক্ষার কেন্দ্র খুলিয়াছেন ও শিশু প্রদর্শনীতে পুরস্কার দিয়াছেন। ২৪ পরগণা জিলাবোর্ড ৩ জন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে পল্লী গ্রামে প্রাথমিক ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পাঠাইয়াইয়াছিলেন। বাঁকুড়া জিলাবোর্ড কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শিক্ষাসমাচার

মাছে মানুষে

বিক্রমপুরের আড়িয়ল বিলে বোয়াল মাছে একটি মানুষ গিলিয়াছে। বিলটি অতি বিস্তৃত—পদ্মার অতি নিকটে অবস্থিত। বর্ষায় পদ্মার জলস্রোত বিলে যাইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মৎস্যও পদ্মা হইতে বিলে চলিয়া যায়। তখন সেখানে মাছ ধরিবার জন্য নানাস্থান হইতে লোক

আসে। সম্প্রতি একজন মুসলমান শিকারী রাত্রে বৃহৎ একটি বোয়াল মাছের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। 'জুতির' দ্বারা কোপ মারিয়াই সে জলে লাফাইয়া পড়ে। অমনি বোয়াল মাছটি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার মাথাটী গিলিয়া ফেলে। পরদিন অন্যান্য শিকারীরা বিলের মধ্যে মাছ ও মানুষ উভয়কে মৃতাবস্থায় পাইয়া শ্রীনগর থানায় লইয়া যায়। বোয়াল মাছটির দৈর্ঘ্য ৭।০ ফুট অর্থাৎ পাঁচ হাতেরও অধিক ছিল বলিয়া শুনা যায়।

নীহার

দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয়

ভারতবর্ষে ১৮৭৭ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত ৫০ বৎসরে ২২টি বড় দুর্ভিক্ষ হওয়ার ফলে প্রায় ৮ কোটী নরনারী মারা গিয়াছে।

নীহার

পল্লীগ্রামে দুর্ভিক্ষের কারণ

কলিকাতায় কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না কেন? চাউলের মণ ১০৲ টাকা ও কাপড়ের জোড়া ৫৲ টাকা হইলেও কলিকাতার লোকে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করে না। বরঞ্চ খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, মোটর গাড়ী, রেস্তোরাঁ, থিয়েটার, সিনেমা, এ সকল বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু মফস্বলের সহরে ও পল্লীগ্রামে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব উৎপাতের দরুণ অজন্মা ও ফসলের অভাব হইলে পল্লীবাসীরাই না খাইয়া মরে, কলিকাতার লোকের গায় আঁচড়টি লাগে না। ইহার কারণ কি? কলিকাতায় মফস্বল হইতে শুধু শস্যাদি খাদ্যদ্রব্যই আসে না, পল্লীবাসীর টাকাও কলিকাতায় চলিয়া আসে। তাহার একটি প্রণালী দেখাইয়া দিতেছি। গত তিন চারি বৎসর ধরিয়া কলিকাতার কতকগুলি থিয়েটার কোম্পানী বাংলা দেশের মফস্বল সহরে ও পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র যাইয়া অভিনয় করিয়াছে। এমন মেলা কোথাও হয় নাই, যেখানে কলিকাতার থিয়েটার না গিয়াছে। তাহার উপর জমিদার, রাজা ও মহারাজদের বিবাহ, পুত্রের অন্নপ্রাশন, পুণ্যাহ প্রভৃতি উৎসবে কলিকাতা হইতে থিয়েটার নেওয়া চাইই। এই সকল থিয়েটার দেখিবার প্রলোভন সামলাইতে না পারিয়া পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। থিয়েটার কোম্পানী এইরূপে পল্লীগ্রামের বহু সহস্র টাকা লুটিয়া লইয়া আসিয়াছে। এখন তাহার ফলেই বাংলার মফস্বলে, সহরে ও পল্লীগ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। আজ গ্রামের লোকেরা দুই চারি পয়সা রোজগারের জন্য রিলিফ ওয়ার্কে যোগ দিয়াছে। কিন্তু থিয়েটারে পয়সা না উড়াইলে বুঝি আজ অন্ততঃ মোটা ভাতকাপড়ও জুটিত। এই সকল অসার আমোদ-প্রমোদে অর্থ ব্যয় করার বিরুদ্ধে আমরা যথা সময়ে লিখিয়া পল্লীবাসীদিগকে সচেতন ও সাবধান করিয়াছি। কিন্তু আমাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। এই ভাবে অর্থের অ-সম পরিব্যাপ্তি ঘটাতেই দুর্ভিক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। কলিকাতা যে টাকা মফস্বল হইতে শোষণ করিয়া আনিয়াছে, তাহা এখন ফিরাইয়া দিয়া দুর্ভিক্ষ দমন করুক,—অর্থনীতিক সাম্য স্থাপন করুক।

সঞ্জীবনী

শ্রমিক আন্দোলনে শিল্পের সর্ব্বনাশ

ভারতবর্ষে আজকাল যত বস্ত্রের প্রয়োজন তাহার শতকরা ৬৭·৩ ভাগ ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অবশিষ্ট বস্ত্র বিদেশ হইতে আসে। গত কয়েক মাস ধরিয়া বোম্বাইতে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে কাপড়ের কলগুলিতে ধর্ম্মঘট হইয়াছে এবং তাহার ফলে বিদেশ হইতে অধিক কাপড় আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদিগের দেশের শিল্প ইউরোপের মত দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। ইহা ব্যতীত প্রায় সকল শিল্প সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা না থাকায় এবং বিদেশ হইতে সেই শিক্ষা লাভ করিতে বাধা পাওয়ায় আমাদিগকে অনেক বিষয় পুনরাবিষ্কার করিতে হইতেছে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষের শিল্প এখনও শৈশব অবস্থায় আছে, উহার অনেক উন্নতির

প্রয়োজন, অধিকতর মূলধন প্রয়োজন এবং শতাব্দী ধরিয়া একাগ্রচিত্তে শিল্পের উন্নতির চেষ্টা প্রয়োজন।

কিন্তু ইহার মধ্যে যদি ধর্ম্মঘট আসিয়া প্রবেশ করে, তবে দেশে শিল্পের উন্নতি করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। শিল্পের উন্নতি না হইলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না, দেশের লোকের চিরদারিদ্র্য ঘুচিবে না। ভারতবর্ষে শিল্পের এরূপ শৈশব অবস্থায় যদি শ্রমিক আন্দোলন, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি বাধা আসিয়া পড়ে, তবে দেশের শিল্পের আর উন্নতি করা সম্ভব হইবে না কারণ দেশীয় শিল্প মাত্রেরই মূলধন অল্প। সেই সকল স্থানে পরে অনেক মূলধন লইয়া বিদেশী ব্যবসায়ী আসিয়া ঐ ব্যবসা আরম্ভ করিতেছে। তাহারা আসিয়া অধিক মূলধনের জোরে অধিক বেতন দিয়া শ্রমিকদিগকে সুখী করিতে পারে কিন্তু তাহাতে দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে, গত বৎসর বোম্বাইর ১৩টা কাপড়ের কল শ্রমিক আন্দোলনের ফলে বন্ধ হইয়া গেল। এক একটি মিলের সর্ব্বাপেক্ষা কম মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা ধরিলে ১৩টা মিলে আমাদিগের শ্রমিকদিগকে খুশী করিতে যাইয়া ৩৯০ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়াছে। এক একটি কাপড়ের কল তৈয়ারী করিতে কত বিপুল পরিশ্রম, কত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহার সমস্তই বিনষ্ট হইল। কোথায় দেশের শিল্প বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা উচিত তাহা না করিয়া ঐ সকল মিল শ্রমিকদিগকে উচ্চস্তরে রাখিবার চেষ্টায় অর্থব্যয় করিয়া আন্দোলনকারিগণ মিলের অনিষ্ট করিয়াছে। শ্রমিকগণ সাধারণতঃ আপন গৃহে যেভাবে থাকে সেইভাবে তাহাদিগকে রাখিয়া বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের কেবল স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে এবং শিল্প ও কারখানার প্রসার ও উন্নতি হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণের উন্নতি করা প্রয়োজন। আজ জার্ম্মাণীর শিল্পের উন্নতি হইতে পারিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণী তাহার যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য যে অর্থ মিত্রদল দাবী করিয়াছিল তাহা দ্রুত প্রদান করিতে পারিতেছে। বোম্বাইর দেশীয় মিলের উপর আন্দোলনকারিগণ সমগ্র শক্তি প্রদান করিতেছে তাহার ফলে দেশীয় কাপড়ের কল বন্ধ হইতেছে কিন্তু গঙ্গাতীরে পাটের কলসমূহ, যাহার মালিক ইংরাজ, তাহার কয়টা বন্ধ হইয়াছে? দেশবাসীর সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে। জামশেদপুরে তাতার বৃহৎ লৌহের কারখানা ভারতবর্ষে মাত্র একটি; সেই কারখানার সর্ব্বনাশের চেষ্টা হইতেছে। দক্ষিণ ভারতে শ্রমিকগণ একাধিক রেল ধ্বংস করিয়া অনেককে আহত করিয়াছে এবং এইরূপে শ্রমিকগণ সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতেছে। আর আমরা মধ্যবিত্ত লোক, মূক ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমরা জনসাধারণকে এখনও অবহিত হইতে বলিতেছি।

সঞ্জীবনী

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দিবার নিমিত্ত এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। আশাকরি অবিলম্বে ইহা কাউন্সিলে আলোচিত হইবে।

দেশীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনে বাংলা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন সাহায্য করেন না, এইরূপ অভিযোগ পূর্ব্বাবধি রহিয়াছে। বাংলা গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত একটি শিল্প-বিভাগ আছে। কিন্তু তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের শিল্প-বিদ্যালয়গুলিতে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা ও কুটির-শিল্প বিষয়ে উদ্যোক্তাদিগকে উপদেশ প্রদান করা—ইহাই প্রধানতঃ উক্ত বিভাগের কার্য্য। ইহাতে ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কোন সুবিধা নাই।

১৯২৩ সালে মাদ্রাজে ও বিহার প্রদেশে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার জন্য আইন প্রণীত হয়। তাহার ফলে উক্ত দুই প্রদেশে ক্রমশঃ শিল্পের উন্নতি সাধিত হইতেছে। বাংলাদেশে এতদিন এইরূপ কোন আইন হয় নাই। স্যার প্রভাসচন্দ্র যে আইন রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রবর্ত্তিত হইলে বাংলাদেশেও শিল্প বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

যে সকল কারণ শিল্পোন্নতির বিরোধী, তন্মধ্যে মূলধনের অভাবই প্রধান। অর্থাভাবে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

উঠিতে পারে না। এমন কোন দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই, যাহা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে পারে। অনেক স্থলে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের অভাবে জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী নষ্ট হইয়া যায়। এমন অবস্থায় এই নূতন আইনে যেরূপ বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই প্রধান অন্তরায় দুরীভূত হইবে।

এই আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কোন দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে তাহার মোট সম্পত্তির মূল্যের উপর শতকরা ৭০ টাকা হিসাবে ঋণ প্রদান করিবেন। উক্ত ঋণ ২০ বৎসরের মধ্যে শোধ করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট জামিন হইয়া কোন ব্যাঙ্ক হইতে যাহাতে প্রয়োজনমত অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়, তাহারও বন্দোবস্ত করিবেন।

কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অংশীদারগণ যে পরিমাণ টাকার অংশ লইবেন, গবর্ণমেণ্ট বেশীর পক্ষে সেই পরিমাণ টাকার অংশ ক্রয় করিতে পারেন।

এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পের অর্থাভাব দুর করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শিল্পোন্নতির আর এক বাধা, আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ। একটি উপযুক্ত কারখানা করিতে হইলে জমি, কাঁচামাল, কয়লা বা কাঠ, জল প্রভৃতি সুবিধাজনকভাবে পাওয়া চাই। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট এই সকল জোগাইবার ভার গ্রহণ করিবেন।

যাহাতে কলকব্জা ও যন্ত্রাদি অল্প মূল্যে পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিবেন। অনেক সময়ে দেখা যায় কোন কারখানার মালিক একেবারে নগদ মূল্য দিয়া কলকব্জা ক্রয় করিতে পারেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে যে, গবর্ণমেণ্ট কারখানার মালিকদিগকে ঐ সর্ত্তে কলকব্জা আনাইয়া দিবেন যে, মালিকেরা মাসে মাসে উহার ভাড়া দিবে। পরে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে চুক্তিমত টাকা দেওয়া হইলে পর ঐ সমস্ত কল-কব্জা উক্ত মালিকের দখলে আসিবে।

এই সকল ব্যবস্থা ব্যতীত আরও অনেক সুবিধা এই আইনের বলে পাওয়া যাইবে। বাংলার শিল্পের উন্নতির চেষ্টায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাইবেন।

যাহাতে এই প্রস্তাবিত বিল শীঘ্র আইনে পরিণত হয়; তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সঞ্জীবনী

চট্টগ্রামে ছাতার বাঁট তৈয়ারী

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ছাতার বাঁটের উপযোগী নলজাতীয় বাঁশ পাওয়া যায়। ঐ সকল বাঁশ কলিকাতায় চালান হইয়া আসে। কলিকাতায় ছাতার বাঁট তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। এই বাঁট তৈয়ারীর সকল কার্য্যই হাতে করা হয়। সুতরাং ইহা কুটীর-শিল্পের মত প্রচলিত আছে। সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এক প্রকার নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ঘরে বসিয়া সহজে ও অল্প সময়ে ছাতার বাঁট তৈয়ারী ও তাহাতে ছাপ দেওয়া হইবে। চট্টগ্রামে একটি ছাতার বাঁটের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখন হইতে আর চট্টগ্রামের বাঁশ কলিকাতায় চালান হইবে না। চট্টগ্রামে অল্প ব্যয়েই ছাতার বাঁট তৈয়ারী হইবে। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠা দ্বারা চট্টগ্রামের ও তন্নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহের বহু লোকের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইয়াছে। চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও অপরাপর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই শিল্প-ব্যবসায়ে বিশেষ উৎসাহ দিতেছেন।

সঞ্জীবনী

৫০০০০ হাজার টনের ভাসমান ডক্

সিঙ্গাপুর নৌবহরের জন্যে প্রস্তুত ভাসমান ডক, ২১শে জুন তারিখে মেসার্স সোয়ান, হাণ্টার, উইগ্‌হাম, রিচার্ডসন লিমিটেড কোম্পানীর কারখানা হইতে ক্লাইড্ নদীর মধ্য দিয়া সিঙ্গাপুর অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে। ঐ ভাসমান ডক্ দেখিবার জন্য ক্লাইড নদীর তীর লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ১৫০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত এই ভাসমান ডক্‌কে টানিয়া লইয়া যাইবে। এই ডকে সর্ব্বাপেক্ষা

বৃহৎ তিনখানি রণতরী পাশাপাশি বাঁধিয়া রাখা চলিবে এবং ৮৬০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ভাসমান ডক ১৪ই নভেম্বর সিঙ্গাপুর পৌছিবে। এই সুদীর্ঘ পথের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাষ্পীয় পোতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং কেবলমাত্র, আলজিয়ার্স, মাল্টা ও পোর্ট সৈয়দে কয়লা লওয়া হইবে।

২০০০ ফিট দীর্ঘ কৃত্রিম রেলপথ

লণ্ডন হইতে কয়েক মিনিটের পথ দূরে সেপার্টনের নিকটবর্ত্তী লিট্‌ল্‌টন পার্কে মডেল এণ্ড এক্সপেরিমেন্ট্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স সমিতির সভাপতি সার এডওয়ার্ড নিকোল এক কৃত্রিম রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গ্রেট্ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ তাঁহার পরীক্ষাগারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সংস্করণে বৃহৎ সংস্করণের অবিকল প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। টেমস নদীর ধার দিয়া, মেইডেন হেড, রেডিং ও উইল্‌ট্‌সায়ার উপত্যকার মধ্য দিয়া রেলপথ পেন্‌ঝেন্‌স্‌এ শেষ হইয়াছে। সিগ্‌নেল গৃহ, ষ্টেসন, বাসগৃহ প্রভৃতি সমস্তই রেলপথের ধারে ধারে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকমালা এই রেলপথের উপর নিপতিত হইয়া ইহাকে ঠিক লণ্ডনের যাদুঘরে রক্ষিত কৃত্রিম আগুনের মত দেখায়। সমস্ত রেলপথের কার্য্য একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সুইস্ বোর্ডের উপর নির্ভর করে।

সার এডোয়ার্ড তাঁহার নিজের জমীতে যে রেলগাড়ী চালাইতেছেন তাহা ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর। এই রেলপথের এঞ্জিন "স্কচ এক্সপ্রেস্" গাড়ীর এঞ্জিনের ক্ষুদ্র সংস্করণ, ইহা ৩২জন যাত্রীসহ ঘণ্টায় ২৫ মাইল চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড দান

মহামান্য ভারত সম্রাট্ নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই গৃহসমূহ ১,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে সার জেমি বুট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি জীবনের প্রথম ভাগে এক রাসায়নিকের দোকানে সামান্য কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ তিনি ৪০০০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন; ২৫০ একর জমিতে ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুক্ত বাতাসে স্নানাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ১০টি ফুটবল খেলিবার ক্ষেত্র, ১২টি ক্রিকেট ক্ষেত্র, ৩৬টি টেনিসক্ষেত্র, ৩টি বোলিং গ্রীণ, ২টি পুটিং গ্রীণ, একটি নাচক্ষেত্র, আর ১৬ একর জমির উপর এক বৃহৎ হ্রদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া শয্যাগত থাকিলেও সমস্ত কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর রাখিতেন।

সামরিক ব্যয়-সঙ্কোচে লয়েড জর্জ্জ

সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে মিঃ লয়েড জর্জ্জ বলেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে সামরিক বিভাগে বাৎসরিক ৭৭,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইত। বর্ত্তমান বৎসরে ১১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে। ইহা অনুচিত। জাতিসমূহ চিরদিন যুদ্ধ করিবে না এবং যে জাতি চিরদিন যুদ্ধ করিবে না, তাহার পক্ষে এত অধিক অর্থব্যয় সমীচীন নহে। সুতরাং এই অতিরিক্ত ৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় কেন? ইহা পাগলামী মাত্র। এই সামরিক ব্যয় সংকোচ দ্বারা উদ্বৃত্ত অর্থ অন্যান্য সমস্যার সমাধানে ব্যয়িত হইলে দেশের অনেক উপকার হইবে এবং বৃটিশ জাতি শান্তির পথে সমগ্র ইয়োরোপকে পরিচালিত করিতে পারিবে।

আকাশ-পথে ভারতীয় যুবক

বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ করৎকারের পুত্র মিঃ আর কে করৎকার ক্রয়ডন হইতে এরোপ্লেনে করাচী আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি ষ্ট্যাগলেন এরোড্রোমে ১৮ মাস আকাশযান চালনা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি অবসর সময়ও আকাশযান-চালনার কৌশল শিক্ষায় অতিবাহিত করেন। তিনি আকাশযানে পিতৃগৃহ-দ্বারে অবতরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ইংলণ্ডযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত স্থানসমূহে অবতরণ করিয়া ১৫ দিনে করাচী পৌছিবেন:—

ক্রয়ডন হইতে ব্রুসেল্‌স্ (২২৫ মাইল), ফ্রাঙ্কফোর্ট (২০০ মাইল), প্রেগ্ (৩০০ মাইল), বিয়েনা (২০০

মাইল), বুডাপেস্ত (১০০ মাইল), বেলগ্রেড্ (২০০ মাইল) বুখারেস্ত (৩০০ মাইল), কনষ্টাণ্টিনোপল্ (২৫০ মাইল) এলেপ্পো (৫০০ মাইল), বাগদাদ্ (৪৫০ মাইল), বসোরা (২৭৫ মাইল), বুশায়ার (২৫০ মাইল), করাচি (১০০০ মাইল) মোট ৪২৫০ মাইল পথ এই ভ্রমণে অতিবাহিত হইবে।

তাঁহার আকাশযানের এঞ্জিন ৩৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া স্থানে স্থানে তাঁহাকে কিছু সময় বিশ্রাম করিতে হইবে। যদি তিনি এই ভ্রমণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তবে দেশবাসীর মধ্যে আকাশমার্গে ভ্রমণের জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই।

ইংলিশম্যান

ওয়েষ্ট এণ্ডে কৃত্রিম আকাশ-যুদ্ধ

লণ্ডনে বোমা

একটি খণ্ডযুদ্ধে ৪০ খানা আকাশযান

গত আগষ্ট মাসে ৭০ খানি আক্রমণকারী আকাশযান এবং ৭২ খানা প্রতিরোধকারী আকাশযানে এক কৃত্রিম যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ ক্রমশঃ ভীষণাকার ধারণ করিতেছিল এবং অবশেষে আক্রমণকারীদলের এক অংশ লণ্ডন নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সন্ধ্যা ৭ টার সময় বেকটন্ পেট্রোল ডিপোতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং ৭-৩০ মিনিটের সময় ওয়েষ্ট এণ্ডে ৪০ খানা আকাশযানে একখণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। রাত্রি দশটার সময় নৈশ আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। ১১টার সময় কয়েকখানি বৃহৎ আকাশযানকে লণ্ডনের উপকণ্ঠে আকাশমার্গে দেখা গিয়াছিল। ২০ মাইল দূরে থাকিতে বীক্ষণকারী আলোকের তীব্র ছটায় সমস্ত আকাশযান লণ্ডনবাসীদের নেত্রগোচর হইতে থাকে এবং প্রতিরোধকারী আকাশযানসমূহ তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য গমন করে। রাত্রি ৩টার সময় আক্রমণকারী আকাশযানসমূহ প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া লণ্ডনের উপর দিয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়।

এসেক্সদলে বীক্ষণকারী আলোকযন্ত্রে একজন শ্রমিক 'ডাইনেমো'তে কাজ করিতেছিল, একজন বীমাকোম্পানীর কেরাণী শব্দ নির্ণায়কের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং একজন সূত্রধর বীক্ষণকারী আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। এই সমস্ত লোক সানন্দে সাগ্রহে লণ্ডন নগরীকে সম্ভাবিত আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সারা রাত্রি ধরিয়া বীক্ষণকারী আলোকের কার্য্য শিক্ষা করে।

কাপ্তেন্ লোয়েনষ্টীন

বেলজিয়ান ধনী কাপ্তেন লোয়েনষ্টীনের মৃত্যুর এক নূতন রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারিশের বিচারক-মণ্ডলীর নিকট ডাক্তার পল তাঁহার শব-ব্যবচ্ছেদের পরীক্ষার মতামত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, মৃত কাপ্তেনের পাকস্থলীতে বিষাক্ত দ্রব্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বৃটিশ ও বেল্‌জিয়ান গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত লোকসমূহ সমবেত ভাবে এই বিষয়ের তদন্ত করিবেন।

তাঁহার সম্পত্তি

কাপ্তেন লোয়েনষ্টীন তাঁহার বিধবা পত্নীর জন্য ৫,৫০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বমাসে ইণ্টার ন্যাসনাল হোল্ডিং এণ্ড ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী ৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির মূল্য ১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

সবাক্ চলচ্চিত্র

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডাউনিং ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার উদ্যান গৃহে বিশিষ্ট ৬জন লোকের সম্মুখে প্রায় ১৫ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতা বৃটিশ টকিং পিক্‌চার্স্ লিমিটেড্ কোম্পানী অবিকল কণ্ঠস্বর সহ ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করিয়াছে। এইবার সবাক্ চলচ্চিত্রে বৃটিশ কোম্পানী আমেরিকান কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল।

পর্দ্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

প্রাচ্যের মুসলমান জগতের এক ভ্রমণকারী সম্প্রতি ২০,০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার এক

বিবরণে লিখিয়াছেন যে, সমস্ত মুসলমান জগতের নারী পর্দ্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা আর পর্দ্দার অন্তরালে অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে স্বীকৃত নহে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তুরস্কে প্রথম পর্দ্দার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয়, তখন অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় পরিভ্রমণ অপরাধরূপে গণ্য ছিল, কিন্তু আজ কনষ্টান্টিনোপল্ ও আঙ্গোরার রাজপথে প্যারিশের ফ্যাসানে প্রস্তুত পোষাক পরিয়া তুর্কী রমণী অনবগুণ্ঠিত বদনে স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করিতেছে। সিরিয়াতে সেদিন নারীরা অবগুণ্ঠন মুক্ত হইয়া রাজপথে বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পুলিশ বাধা দেওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্যালেষ্টাইনে দুইটি মুসলমান রমণী অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া মুফ্‌তির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং কোরাণের কোথায় পর্দ্দা প্রথার উল্লেখ আছে তাহা দেখাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণ ক্ষেপিয়া গিয়া ঐ স্ত্রীলোক দুটিকে আক্রমণ করে; ফলে তাহারা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। আরবে এইরূপ কোন আন্দোলন সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ইরাকে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের নামমাত্র অবগুণ্ঠন থাকে। তেহারাণের রাজপথে অপরাহ্ণে ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে রমণীরা মুখ-মণ্ডলের অংশমাত্র আবৃত করিয়া বাহির হয় এবং বাজারে বা ট্রামে কথা বলিবার প্রয়োজন হইলে তাহাও সময়ে সময়ে খুলিয়া ফেলে। সম্প্রতি ভারতবর্ষেও পর্দ্দার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। মহিলাদিগের কন্‌ফারেন্সের সভানেত্রী ভূপালের ভূতপূর্ব্ব বেগম পর্দ্দাপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, পর্দ্দাপ্রথা ভারতীয় নারীর উন্নতিপথের অন্তরায়। আফগানিস্থানের রাণী সোরিয়ার অনবগুণ্ঠিতভাবে ইয়োরোপ ভ্রমণে এই ভাব আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কুমারী অমিয়া গাঙ্গুলী

ঢাকা নিউ গার্ল স্কুলের ছাত্রী কুমারী অমিয়া গাঙ্গুলী ঢাকার শান্তি-সঙ্ঘ-সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ৩৫ মিনিট সময়ে তিনি অন্যান্য পুরুষ প্রতিযোগিগণের সহিত দুই মাইল সন্তরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার গবর্ণর এই প্রতিযোগিতার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং কুমারী অমিয়াকে কয়েকটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। এই বালিকাটির বয়স মাত্র ১০ বৎসর।

প্রবাসী

বাণিজ্যবাহী জাহাজে বাঙ্গালী নাবিক

বোম্বাইর ডাফরিন জাহাজে ভারতীয় যুবকদিগকে নাবিকের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বরিশালের শ্রীমান্ অমিয়াংশু চৌধুরী এই জাহাজে একমাত্র বাঙ্গালী হিন্দু নাবিক। এক বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াই ইনি ক্যাডেট্ ক্যাপ্টেন (শিক্ষানবিস্‌দের নেতা) হইয়াছেন।

প্রবাসী

মহিলা-শিল্পপ্রদর্শনী

বহরমপুরের মহিলা-সমিতির উদ্যোগে বিগত ২২শে ও ২৩শে আগষ্ট সেখানে এক মহিলা শিল্প প্রদর্শনীর অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীতে মহিলাদিগের প্রস্তুত নানাপ্রকার সূচী-শিল্প ও অন্যান্য জিনিষ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মাতৃমন্দির

বাঙ্গালীর অর্থকরী শিক্ষা

উচ্চ শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর বাঙ্গালী ছাত্রদের যে একটা অতিরিক্ত মোহ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং আর্ট বা সায়েন্সের ডিগ্রী লাভের জন্য বা আইন পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য ছেলেরা এখন আর তত ব্যস্ত নহে। আইনের ব্যবসায় যে অধিকাংশ স্থলেই লোকের প্রতিভা ও বিদ্যাবুদ্ধির অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই হয় না, এ সত্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের লোক বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। ঠেকিয়া শেখার মত অভিজ্ঞতা আর কিছুতেই হয় না। সেই জন্যই আইন কলেজে ছাত্রসংখ্যা এত দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আর্ট বা সায়েন্সের

ডিগ্রী সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। ডিগ্রীধারী যুবকদের পথে পথে উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হয়। সে বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে ডিগ্রীহীন উমেদারদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দেশের যুবকেরা এসব কথা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

এই কেরাণীগিরি শিক্ষার ফলে জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী পরাস্ত হইতেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই বিদেশী ও অ-বাঙ্গালীদের হস্তে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। যে বাঙ্গালী একশত বৎসর পূর্ব্বেও একটা প্রধান ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া গণ্য ছিল, তাহারাই এখন ব্যবসায়ে "আনাড়ি" বলিয়া অপবাদগ্রস্ত। অন্যদিকে কলকারখানার বিদ্যায় ও আধুনিক যুগের কার্য্যকরী বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় বাঙ্গালী বহু পশ্চাতে। একদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্য দিকে কল-কারখানা, এই সব বিষয়ে বাঙ্গালীকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে এমন শিক্ষা চাই। বর্ত্তমান যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কেবল মাত্র সাহিত্যবিষয়ক (লিটারারী) শিক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিয়া, যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রভৃতি আধুনিক যুগোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষা পাইয়া যুবকেরা জীবন-সংগ্রামের যোগ্য হইয়া উঠে, তাহাই করিতে হইবে। স্কুল-কলেজে, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে, আইন ক্লাসে ছাত্র কমিয়া যাইতেছে বলিয়া হা হতাশ করিয়া লাভ নাই, বরং উহাকে "যুগসঙ্কেত" মনে করিয়া নূতন পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতিকে পরিচালিত করিতে হইবে।

আনন্দবাজার

বিদেশে ইংরেজ-রপ্তানি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বৃটেনের উপরি লোক-সংখ্যা সরাইয়া দিবার জন্য ১৯২২ সনে এম্পায়ার সেট্‌লমেন্ট অ্যাক্ট পাশ করা হয়। ঐ আইনের বলে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ১৫ বৎসর ধরিয়া প্রতি সন উপনিবেশসমূহে ইংরেজদের চাকুরী-বাকুরী ও বসতি-স্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া খরচ করিতে অধিকারী। গত ছয় বৎসরে ১৮০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে ইংরেজ সরকার এ বাবদে ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন।

কোন বিলাতী কাগজ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে বৃটেন জব চারণক, ক্লাইভ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি উপনিবেশ-স্থাপনকারীর আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ইংলণ্ডের বেকার-সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের প্রতি বর্গমাইলে ৭০০ শতের বেশী লোক বসবাস করে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে মাত্র দুইজনের কিঞ্চিৎ বেশী লোক বসবাস করে। কানাডার বর্ত্তমান লোক-সংখ্যা এক কোটি মাত্র এবং অষ্ট্রেলিয়ার লোক-সংখ্যা মাত্র ৫০ লক্ষ।

তিন বৎসর পূর্ব্বে কানাডা ও ইংলণ্ডের মধ্যে মাইগ্রেশান সম্বন্ধে এক চুক্তি হয়। ইহার দ্বারা ইংলণ্ড হইতে কানাডায় এক একটা গোটা পরিবারকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট প্রতি পরিবারকে ৩০০ পাউণ্ড করিয়া সাহায্য দিয়া তিন হাজার ইংরেজ পরিবারকে কানাডা পাঠাইয়া দেন। ইহাতে ফল খুবই ভাল হইয়াছে। ইংরেজ- আরও দুই হাজার পরিবারকে কানাডা চালান করিবে।

স্যর রবার্ট হর্ণ সম্প্রতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আজ আমাদের ঘরে অনেক উপরি লোক জমিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহাদের অন্নসংস্থানের কোন ব্যবস্থাই বিলাতে নাই। ডমিনিয়নস্‌গুলিতে অফুরন্ত ভাণ্ডার ও সুযোগ-সুবিধা পড়িয়া রহিয়াছে; আর ঐ সকল দেশের লোক-সংখ্যাও কম। ইংরেজ তুমি যেখানে সুবিধা পাও সেখানে তল্পি-তল্পা লইয়া যাত্রা কর।" অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী ব্রুস বলিয়াছিলেন 'বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যের একমাত্র সমস্যা মানুষ, অর্থ ও বাজার।' আজ গ্রেট্ বৃটেন ও ডমি-নিয়নসকে জ্ঞানীর মত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লোক-সংখ্যা বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

আর্থিক উন্নতি

লণ্ডনের সমাজ-সেবা

লণ্ডন একটা বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র। এই স্থলে আসিলে ইংরেজ জাতি ও সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। পৃথিবীতে যেখানে যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ লক্ষিত হয়, সেগুলিকে অগ্রসরতম দেশমধ্যে বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইয়োরোপের ২।৩টা দেশে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক বিজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে। এই প্রসারের চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করিবার পক্ষে লণ্ডন বিদেশ-যাত্রীদের তীর্থ-স্থান স্বরূপ।

লণ্ডনে দেখিবার উপযুক্ত বিষয় অনেক আছে। বৃটিশ পার্ল্যামেন্ট (মাদার অব্ পার্ল্যামেন্ট বলিয়া কথিত হয়), উহার ঘরবাড়ী ও কার্য্যপ্রণালী দেখিবার মত জিনিষ। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল, বৃহৎ সওদাগরী আফিসসমূহ, বীমা-কোম্পানীগুলি যথা, (লয়েড্‌সের মেরিন, ফায়ার ইত্যাদি), পুলিশ, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, লণ্ডন-বন্দর, রেস্তোরাঁ, হোটেল, ক্লাব, স্ত্রীলোকদের ক্লাব, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিল্প-স্কুল ও কলেজসমূহ, রাজপ্রাসাদ, প্রাসাদ তুল্য শত শত অট্টালিকা, খেলাধুলা (ক্রীড়া, ব্যায়াম ইত্যাদি), হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, জনসেবা, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, জুলোজিকাল গার্ডেন, থিয়েটার, সিনেমা, যানবাহন ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আছে যাহা হইতে বৃটিশদের কার্য্য কি প্রকার ও তাহারা কি ভাবে জীবন যাপন করে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আর তৎসঙ্গে ঐ দেশের লোক যে কতদূর আধুনিক হইয়াছে ও তাহাদের তুলনায় আমরা কিরূপ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে সমস্ত দেশ অগ্রসর হইয়াছে, সেগুলির সহিত আমাদের অবস্থা সর্ব্বদা তুলনা করা দরকার। তাহা হইলে আমাদের মনে ঐরূপ অগ্রসর হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে এবং অনেক বিষয়ে আমরা যে পশ্চাৎপদ তাহা তুলনায় বুঝিতে পারিয়া সেই সেই বিষয়ে উন্নতিলাভের জন্য সচেষ্ট হইতে পারিব।

লণ্ডনের হাসপাতাল

সংখ্যায়, বদান্যতায় ও প্রাণবত্তায় লণ্ডনের হাসপাতাল-সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীনকালের স্মৃতি-মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কোন কোনটি ৮০০ বৎসর যাবৎ দাঁড়াইয়া বহু লোকের সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে।

কোথা হইতে টাকা আসে

হাসপাতালের আয়ের উপায় অনেকগুলি, কিন্তু প্রধান উপজীব্য আয় হইতেছে ধনী ও মধ্যবিত্তদের চাঁদা বা এককালীন দান। যাহারা আর্থিক জীবনে বিশেষ কৃত-কার্য্যতা লাভ করিয়াছে তাহারা অনেক সময় রুগ্ন ও পীড়িতদের সেবার জন্য আবার কতকাংশ দিয়া সমাজের ও দশের ঋণ পরিশোধ করে।

লণ্ডনের হাসপাতালগুলি একবার ঘুরিয়া আসিলে বুঝা যাইবে সেখানে বহু দক্ষ ও অভিজ্ঞ নরনারী ঐকান্তিক যত্ন ও মনোযোগের সহিত জনসেবার জন্য ব্রতী হইয়া আছে। ইহারা আপনাদের সকল প্রকার সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করিয়া অবিরত চেষ্টা করিতেছে কিরূপে আর্ত্ত ও পীড়িত নরনারীর দুঃখ-মোচন ও স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধি হয়।

কোন হাসপাতালেরই সঞ্চিত অর্থ অধিক নহে, কোন কোনটার কিছুই নাই।

সাধারণতঃ যে কোন একটা হাসপাতালের হিসাবের বহির দিকে তাকাইলে মনে হইবে, উহা অচিরে অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কোন হাসপাতালকেই পাততাড়ি গুটাইতে দেখা যায় না। বছরের পর বছর প্রত্যেকে আপন কর্ত্তব্য নীরবে সম্পন্ন করিয়া যায়।

হাসপাতাল শাসনের মূলমন্ত্র এই যে নিরাশার কোন কারণ নাই। নিরাশ হইলে চলিবে না। তারপর আরম্ভ হয় ট্রাষ্টি ও সেক্রেটারিদিগের সজাগ দৃষ্টি ও অপূর্ব্ব কর্ম্ম-

তৎপরতা, ছাপাখানার কাজের আর বিরাম থাকে না। জনসাধারণকে অনবরত চিঠি, সার্কুলার, আবেদন ইত্যাদি প্রেরণের দ্বারা আপ্লুত করিয়া ফেলা হয়। রবিবার ছুটির দিন, সেদিন মনে করাইবার জন্য চিঠিপত্র পাঠাইবার দস্তুর নাই। কিন্তু সেদিনও রক্ষা নাই। গীর্জায় ধর্ম্মযাজক দুঃস্থদের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য টুপি উল্টাইয়া ধরিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন; রবিবারে যেসব কাগজ প্রকাশিত হয় সেগুলির স্তম্ভে আবেদন পত্রও বাহির হয়।

লণ্ডনের হাসপাতাল লইয়া অনুসন্ধান করিতে বসিলে বৃটিশ জাতির কয়েকটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। প্রথমতঃ বহু ইন্‌ফার্ম্মারি বা হাসপাতাল ব্যক্তি বিশেষের অর্থে বা যত্নে সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেগুলিকে জীবিত রাখিয়াছে সর্ব্বসাধারণ নিজ নিজ চাঁদা দিয়া। দ্বিতীয়তঃ রোগীর আবাসস্থান বলিয়া হাসপাতালকে তাচ্ছিল্য করা হয় না, সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা কোঠাবাড়ী তৈরির জন্য যত্ন ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করা হয় না; আর প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে সেজন্য সকলপ্রকার বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ-করা কর্ত্তৃপক্ষগণের ধর্ম্মস্বরূপ।

গ্রেট্ বৃটেনে স্বেচ্ছাদান দ্বারা চালিত recognised হাসপাতালের সংখ্যা ৯০০। কিন্তু লণ্ডন ও লণ্ডনেতর হাসপাতালগুলির ভিতর একটা পার্থক্য আছে। লণ্ডনের বাহিরে যে সব হাসপাতাল আছে সে গুলির আয়ের উপর জয়েন্ট কাউন্সিল অব্ দি অর্ডার অব সেণ্ট জন অব্ জেরুজিলাম ও বৃটিশ রেড্‌ক্রস্ নামক প্রতিষ্ঠানদ্বয় অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। আর লণ্ডনের হাসপাতালগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য আছে কিং এডওয়ার্ড হাসপাতাল ফাণ্ড (King Edward Hospital Fund). এটা হইল স্থায়ী দান। ইহা ছাড়া বিশেষ দানও আছে। যেমন, পেন্‌সন মন্ত্রীর বরাদ্দ টাকা, চাঁদা ইত্যাদি, শিশু ও মাতৃমঙ্গল, মেডিকেল স্কুল, ডাক্তারি কাজ ও ব্যাধির হাত হইতে রক্ষার উপায় ইত্যাদি বাবদ সরকার-প্রদত্ত টাকা।

বুঝা যাইতেছে লণ্ডনের রোগ-সেবার ব্যাপারটা বহুল পরিমাণে বে-সরকারী। দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ও অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও ইহারা দাঁড়াইয়া আছে।

লণ্ডনের সর্ব্বপুরাতন হাসপাতাল

লণ্ডনের সর্ব্বপুরাতন হাসপাতালের নাম বার্কেলমি হাসপাতাল। ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ:—রাজা প্রথম হেনরীর এক বয়স্য রোমে তীর্থযাত্রা করিলে সেখানে ক্যাম্পানা জ্বরে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। এই জ্বরের প্রকোপে তিনি পীড়িত ও দুঃস্থদের শারীরিক যন্ত্রণার কথা বুঝিতে সমর্থ হন। তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া রোগীদের জন্য 'পান্থশালা' নির্ম্মাণ করাইবেন। তাহারই ফলে এই বার্কেলমি হাসপাতালের উদ্ভব হয়। তিনি রাজার নিকট হইতে দশ বছরে জমি ইত্যাদি বাবদ সনন্দলাভ করিতে সমর্থ হন।

এই হাসপাতাল নির্ম্মাণ বাস্তুশিল্পের এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা বহু উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান সময়ে পৌছিয়াছে। কিন্তু বরাবর সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। রাজার অত্যাচার, জন সাধাণের আক্রমণ কোন কিছুতেই ইহার কাজ বাধা পায় নাই।

ইহার সহিত বহুদিন যাবৎ একটা মেডিকেল স্কুল সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত। ইহা হইতে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারের উদ্ভব ঘটিয়াছে। রক্ত-সঞ্চালন আবিষ্কারক উইলিয়াম্ হার্ভে, জন এবারনেমি, সার জেম্‌স প্যাগেট্ এইখানে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল ও গায়

টেম্‌স নদীর অপর তীরের দুটি হাসপাতালের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, দুইটাই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। প্রথম, সেণ্ট টমাস হাসপাতাল। পূর্ব্বে ইহা সাউথ ওয়ার্কে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইহা নির্ম্মিত হয়। এখানকার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের সেবাধর্ম্মের কথা সর্ব্বজনবিদিত। পুরাতন আবাসভূমিতে স্থানের সঙ্কুলান হইত না বলিয়া নূতন স্থানে ইহাকে উঠাইয়া আনা হয়। প্রতি বৎসর যক্ষ্মা রোগী এখানে সেবা পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়,

(Guy) গায় হাসপাতাল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গায় নামে এক পুস্তক বিক্রেতা বই বেচিয়া অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি কোনদিন বিলাসিতা করেন নাই, অত্যন্ত সাদাসিধা জীবনযাপন করিতেন ও কষ্টে দিনযাপন করিতেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধন-সঞ্চয়। পরে সমগ্র সঞ্চিত ধন তিনি এই হাসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য দান করেন। তাঁহার নামে একটি মেডিকেল স্কুলও প্রতিষ্ঠিত আছে। সেটি বেশ ভাল ভাবে চলিতেছে।

অন্যান্য হাসপাতাল

এইরূপ উল্লেখযোগ্য আরও ১০।১২টা হাসপাতালের নাম করা যাইতে পারে। মিডলসেক্সে এক নূতন প্রণালীতে হাসপাতালের কাজ চলানো হইতেছে। স্থানীয় মজুরদিগের প্রত্যেককে সপ্তাহে ৩ পেন্স বা তত্তুল্য কিছু চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদা দিলে তাহার নিজের ও পরিবারের জন্য সেবা পাইবার অধিকার জন্মে। যে পরিবারে ধন ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নাই, সে পরিবার স্বভাবতঃই কম মনোযোগের পাত্র হয়। কিন্তু এইরূপ পরিবারেও দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় লোকেরা এখানে আসে। প্যাডিংটন হাসপাতালে স্ত্রীলোকদিগকে শুশ্রূষা ও ডাক্তারি বিদ্যা শিখানো হয়। গ্রেস ইন্‌রোডে রয়্যাল ফ্রী হাসপাতাল স্ত্রীলোকদের জন্য স্থাপিত ও স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পরিচালিত।

লণ্ডনে বহু প্রকারের হাসপাতাল দেখা যায়। সাধারণ রোগিগণের আশ্রয় স্থান, ক্যানসার ও যক্ষ্মার বিশেষ চিকিৎসালয়, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তদ্রূপ হাসপাতাল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নির্ম্মিত হাসপাতালসমূহ (যেমন, গ্রেট ওর্‌মাণ্ড ষ্ট্রীটে), বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত মাতৃমঙ্গল আলয় ও নানাবিধ কর্ম্মচারীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল (যেমন, গ্রীন্‌ উইচের নাবিকদের হাসপাতাল) লণ্ডনের বিশেষত্ব ও গৌরব প্রচার করিতেছে। হাসপাতালগুলি ঘুরিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে মানবকে রোগযন্ত্রণা ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহস্র সহস্র নরনারী কিরূপ সুশৃঙ্খলতা ও নিপুণতার সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় হাসপাতালের অত্যাবশ্যকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি হওয়ায় বিশেষ বিশেষ হাসপাতালের উদ্ভব হয়। হাসপাতালের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক নিত্যনৈমিত্তিক, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন যে হাসপাতালের কাজ সর্ব্বদা অব্যাহত থাকে। বিগত কয়লা ধর্ম্মঘটের সময় লণ্ডন অনেকবার আলোক ও কয়লাহীন হইয়াছিল। তাহাতে অনেক অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখিতে হয়। কারণ, অন্ধকারে কেহ এই কাজ করিতে সাহস করে না। ইহাতে কত লোকের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে সহজেই অনুমেয়। এইজন্য হাইড পার্ক কর্ণারে স্থিত সেণ্ট জর্জ্জেস হাসপাতালের লোকেরা গত কয়লা ধর্ম্ম-ঘটের সময় ঝুড়ি ও কোদালি লইয়া কয়লা আনিয়াছে। জন হাণ্টার এই প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার ছিলেন; তিনি পরীক্ষার জন্য নিজ দেহে এক ভয়াবহ পীড়ার বিষ পুরিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সমাজ-সেবার নানা পথ

স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির নাম এদেশে বহু লোকের কাছে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠান সারা জগতে আপনাদের কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়া মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই ধরণের কাজ চার্চ্চ আর্ম্মি ও বার্ণাডো হোম্‌ও করে। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অসহায়দিগকে আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে 'বার্ণাডোস্ হোম্‌স্' এর প্রতিষ্ঠা হয়। এ পর্য্যন্ত এক লক্ষ পাঁচ হাজারের অধিক অনাথ শিশু এই 'হোম্‌' গুলিতে প্রতিপালিত হইয়া মানুষ হইয়াছে। প্রতিনিয়ত আট হাজার বালকবালিকা এই সকল 'হোমের' আশ্রয়ে বাস করে। বর্ত্তমান 'হোম্‌'-অধিবাসীদিগের মধ্যে ১২০৩ জনের বয়স ৫ বৎসরের কম ৪২২ জন বিকলাঙ্গ ও রুগ্ন এবং ১০৮৭ জন একটু অধিক বয়স্ক—এই শেষোক্তগণ নানারূপ শিল্প-শিক্ষায় নিযুক্ত আছে। বিগত মহাযুদ্ধের আরম্ভ কাল হইতে ২০০০০ হাজারের অধিক বালকবালিকা এখানে স্থান পাইয়া সযত্নে লালিত পালিত হইয়াছে এবং

উপযুক্ত শিক্ষা লাভের পর সমাজের মধ্যে দশ জনের একজন হইয়া সগৌরবে জীবন যাপনের সুযোগলাভ করিয়াছে। এগুলির প্রত্যেকটির উদ্ভব লণ্ডনে হইয়াছে।

স্যাল্‌ভেশন্ আর্ম্মি ১৮৬৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাঁহারা অগ্রণী হইয়া সমাজিক দুর্দ্দশা দূর করিবার কাজে নামিয়াছিলেন, গোড়ায় তাঁহাদিকে অশেষ অত্যচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, মারধোর পর্য্যন্ত খাইতে হইত। কর্ম্মবীর জেনারেল বুথ তদানীন্তন তিমিরাচ্ছন্ন ইংল্যাণ্ডকে পথ দেখাইবার জন্য গত শতাব্দীতে প্রাণপনে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরিশ্রম সফলতা লাভ করে। যাঁহারা তাঁহার "লাইফ্ অ্যাণ্ড লেবার ইন্ লণ্ডন—হাউস্ টু হাউস্ সার্ভে ওয়ার্ক ইন্ ডিউরি লেন" (লণ্ডনের জীবন ও মজুরি—ডিউরি লেনের দোরে দোরে ঘুরিয়া কাজ) পড়িবেন, তাঁহারা স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির সম্বন্ধে বহু কথা জানিতে পারিবেন। লণ্ডন সিটি মিশনারি, ক্লার্জিম্যান ও রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত—ইঁহারাই স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

এই সব প্রতিষ্ঠানের লোকেরা যাহাদের জন্য খাটিতেন, প্রথম প্রথম তাহারা ঐ কর্ম্মীদের অবিশ্বাস ও ঘৃণার চোখে দেখিত। যে মানুষ পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকে তুলিয়া ধরা, তাহার সম্মুখে এক সুখময় জীবনের আভাস উপস্থিত করা ও তাহাকে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত করা সহজ কথা নয়। কর্ম্মীরা বহু প্রকারে নির্য্যাতিত হইলেও হাল ছাড়িয়া দেন নাই। ক্রমে ক্রমে কর্ম্মীরা ইহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন, সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিলেন। আশ্রয় দানের ব্যবস্থা এক বড় সমস্যা। অল্প ভাড়ায় আলোবাতাস পূর্ণ স্থানে যাহাতে ইহারা ভালভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়, সেজন্য লণ্ডনের অস্বাস্থ্যকর বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া, নূতন গৃহ নির্ম্মাণ আবশ্যক হইয়া পড়িল। পীবডি ট্রাষ্ট (Peabody Trust) ইত্যাদি এই কাজের ভার লওয়ায়, স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মির বিকাশলাভ হইয়াছে। লোককে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার কাজ অনেকটা সফল হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়-অবস্থার কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল স্থান বাছিয়া লইয়া সেখানে থাকিয়া ছাত্রছাত্রীরা লোকজনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়। সমাজ-সেবায় সমাজের সকল প্রকার নরনারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার চেষ্টা অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। সেজন্য যে সব নরনারী ইহাদের মধ্যে বসবাস করিয়া ইহাদের সুখ-দুঃখের কথা জানিতে পায়, তাহারাই যথার্থ ভাবে ইহাদিগকে জীবনের পথ দেখাইয়া দিতে সমর্থ হয়। এইরূপে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবক-যুবতীরা স্বেচ্ছায় শ্রম জীবন বরণ করিয়া সামাজিক আইন কি ভাবে করিলে ভাল হয়, তাহা জানিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে ও দিয়া থাকে।

সমাজ-সেবার স্বরূপ

স্বতঃই এ প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, সমাজ-সেবকেরা লণ্ডনে কিরূপ কাজের ভার নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। লণ্ডনের পুলিশ আদালত ও কারাগারে আসিলে দেখা যাইবে যে মিশনারীরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য মিটাইবার উদ্দেশ্যে, বা গৃহহীন অনাথ বালকবালিকাকে কারাগার হইতে রক্ষা করিবার ও কাজ জোটাইবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। অনেক সময় ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বয়ং এইরূপ ঘটনায় মিশনারীদের হাতে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া বিচারালয়ের বাহিরে সুমীমাংসার প্রত্যাশা করেন।

পুলিশ-কোর্ট-মিশনারীরা স্ত্রী ও পুরুষে, বহু নরনারী ও বালকবালিকাকে বিফল জীবন হইতে সফল জীবনে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। চার্চ্চ অব্ ইংল্যাণ্ড মাদক নিবারণী সমিতিও বহু কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। মিশনারীদের সামাজিক কাজ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অসাধারণ রকমের। ইঁহাদের প্রচেষ্টাতেই "প্রবেশন অব্ অফেণ্ডার্স্ অ্যাক্ট্" আইনরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইন সামান্য সামান্য অপরাধে অপরাধী বহু লোকের নবজীবনের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছে। কোন

পড়ায় তাহার বিচার আরম্ভ হইবে ও জেলে যাইতে হইবে। তাহাকে জেলে না পাঠাইয়া মিশনারীদের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল। ছেলেটি "প্রবেশনে" রহিল, অর্থাৎ তাহাকে মিশনারীর কাছে রীতিমত নিজের কথা সর্ব্বদা জানাইতে হইবে। অন্যদিকে মিশনারীদের কর্ত্তব্য হইতেছে এই সব ছেলেদের কাজ জোটাইয়া দেওয়া। ইহারা জেলে গেলে সেখানে ইহাদের ভরণ-পোষণের খরচ রাষ্ট্রকে যোগাইতে হইত। সেটা বাঁচিয়া যায়। তা ছাড়া বহু ব্যক্তি সৎপথে জীবিকা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পায়। চার্চ্চ আর্ম্মি ও স্যাল্‌ভেশন আর্ম্মিরও এই সব ছেলেদের অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে।

অপরাধ গুরু হইলে ছেলেটিকে হয়ত জেলে যাইতে হয়। তখনও মিশনারীরা হাল ছাড়িয়া দেন না। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ইঁহারা জেলের বেসরকারী পরিদর্শকরূপে জেলে জেলে ঘুরিয়া বেড়ান—চার্চ্চ আর্ম্মির লোকেরাই এবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম অনুমতি পাইয়াছিলেন। সদয় ব্যবহার ও নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা ও উপদেশ দ্বারা ইঁহারা ধীরে ধীরে এই পরিত্যক্ত হতভাগ্যদের সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ইঁহাদের সাহায্য শীঘ্র আবশ্যক। কোন ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ৬ মাসের জন্য জেলে গেল। তাহার স্ত্রীপুত্রদের কি অবস্থা হইবে? কে সাহায্য করিবে? গাড়োয়ান জেলে গেলে তাহার স্ত্রী কোনপ্রকার সাহায্য না পাইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া ঘোড়া ও গাড়ী বেচিয়া ফেলিতে হইবে। এই ৬ মাসের জন্য বা তদ্রূপ সময়ের জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান এইরূপ পরিবারসমূহের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, ডাম ফ্রেণ্ডস্ লীগ্ (বোবা বন্ধুদের সমিতি), আর, এস, পি, সি, এ, ও চার্চ্চ আর্ম্মির কাজ এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

নিরাশ্রয় নরনারী

গভীর রাত্রিতে লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের মতন স্থানে আশ্রয়বিহীন নরনারী বসিয়া রাত্রি যাপন করে। ভোরের দিকে পিকাডেলিতে গেলেও দেখা যায় যে, এখানে সেখানে বেঞ্চে অথবা গাছের তলায় নিরাশ্রয় নরনারী বসিয়া আছে। ইহাদের ঘর নাই, সমাজ নাই, আত্মীয় বলিয়া কেহ নাই। ইহারা প্রত্যেকে এক রকম নিরানন্দ ও আশাহীন জীবন যাপন করিতেছে। তাহারা এতই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য লেশমাত্র উদ্যম তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। ইহাদের অভাব এত বেশী যে, লোকের কাছে কখনো কখনো দিয়াশলাই বা চুরুট চাহে। ইহারা দাগী অপরাধী নয়। কারণ দাগী অপরাধী হইবার মত সাহস ও শক্তি ইহাদের নাই—ভিক্ষাও ইহাদের পেশা নয়, ভিক্ষুকেরা ইহাদের অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন। ইহারা সমাজ পরিত্যক্ত, আশাবিহীন অলস নরনারী। ইহাদের দেখিলে স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন আসে যে, ইহারা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করে? লণ্ডনের রাস্তায় জনসাধারণের নিকট হইতে দুপয়সা আদায় করিয়া লইবার হাজারো পথ আছে। রাস্তাঘাটে হারাণো দ্রব্য কুড়াইয়া বা খারাপ মুদ্রা উঠাইয়া লইয়া বা শিশি-বোতলের ছিপি বেচিয়া ইহারা কখনো কখনো ২।১ পেনি উপার্জ্জন করে। কিন্তু হাতে অল্প কিছু অর্থ জমিলেই ইহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কাফিখানার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভ্যাস আছে। আশা কোন ভদ্রলোক যদি দয়া করিয়া কিছু খাইতে দেন। এইরূপে কাহারও কাহারও ভাগ্যে খাদ্য দ্রব্য জোটে। কেহ বা দু'একটা রৌপ্যমুদ্রা লাভেও সমর্থ হয়। কোন সহৃদয় মজুর কখনো বা ইহাদের হাতে কিছু দিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু শয়নের সমস্যাটাই বিশেষ গুরুতর। লণ্ডনে অনেক শস্তা লজিং হাউস্ আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক শয্যা পিছু দিনে দিতে হ'ত ৪ পেন্স বা।০ আনা।

উপরি কথিত নিরাশ্রয় নরনারীরা বরং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে, তবু স্যালভেশন আর্ম্মি বা চার্চ্চ আর্ম্মির কাছে যাইতে চাহে না। কিন্তু সমাজ-সেবার কেন্দ্রগুলি সেজন্য চুপ্ করিয়া থাকে না। ইহাদিগকে অন্ততঃ এক রাত্রির মতও থাকিবার জায়গা দিবার জন্য অনেকগুলি স্থানের ব্যবস্থা আছে। যথা, পুরুষদের জন্য ব্ল্যাক

ফায়ারের প্রকাণ্ড স্যালভেশন আর্মি শেলটার, পরিত্যক্ত লোকদের জন্য মর্ণিং পোষ্ট হোম্, বণিফেয়ার ষ্ট্রীটে চার্চ্চ আর্মি হোম (এখানে টেম্‌স নদীর তীরস্থ মেট্রোপলিটান এসাইলাম বোর্ড হইতে ১০টা রাত্রে লোকদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়), গ্রেট্ পিটার ষ্ট্রীট্ স্যাল্‌ভেশন আর্মি হষ্টেল, নিউ চার্চ্চ আর্মি সেন্টার, মেয়েদের জন্য—বেলভিডিয়ার রোডে ও ইয়র্ক রোডে চার্চ্চ আর্ম্মির আশ্রয়স্থান দ্বয়, চার্চ্চ আর্মি হাউস (৫০ জন বৃদ্ধা এইখানে দিয়াইশলাই বেচিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে), চার্চ্চ আর্মি হোম মার্ব্বল আর্চ।

এই সব নরনারীর আশ্রয় স্থানের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যে সব লোক অন্ধকূপের ন্যায় স্থানে বাস করিত তাদের চমৎকার বাড়ী ও হষ্টেল নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এখন নিঃসহায় নরনারী লণ্ডনে যত, তাহার তুলনায় এই আশ্রয়গুলি সংখ্যায় যথেষ্ট নয়।

এই গেল নিরাশ্রয়দের জন্য প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত। নরনারী যাহাতে আদৌ এইরূপ অবস্থায় পতিত না হয়, তাহার জন্যও লণ্ডনে প্রচেষ্টার অন্ত নাই। ভাল বেষ্টনী ও ভাল সংসর্গ দ্বারা মানুষকে সর্ব্বদা সৎপথে আনন্দময় জীবন-যাপন করিবার সাহায্য করা হইতেছে। ওয়াই এম্ সি এ ও ওয়াই ডব্লিউ সি এ'র কথা সকলেরই জানা আছে। চার্চ আর্ম্মির রেসিডেন্‌শিয়েল ক্লাবগুলিও উল্লেখযোগ্য।

অ্যাকটন্—মাতৃহীন বালকবালিকার বাসগৃহ।

মেরিলিবোন—কার্য্যরত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকার চিকিৎসার স্থান—সমুদ্রতীরে "আর্ম্মিহোমে" বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ প্রেরিত হয়।

কিংগ্‌স্—ক্লিয়ারমণ্ট মিশন—এইস্থানে স্ত্রীলোকেরা বাহিরে কাজে যাওয়ার সময় তাহাদের শিশুগণকে রাখিতে পারে। দরিদ্রলোকের মোকদ্দমার তদ্বিরের ব্যবস্থা আছে।

মোসাফের্

জাতীয় সংবাদ

পাণিহাটি মহোৎসব

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পানিহাটিতে কৃপা করিয়া পদার্পণ করিয়া পানিহাটিকে মহাপবিত্র করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে আজ ৪০০ শত বৎসর কাল যাবৎ সেই পবিত্র স্মরণ মহোৎসব সমাধা হইয়া আসিয়াছে। আগামী ২৫এ কার্ত্তিক রবিবার (১১ই নভেম্বর) সেই দিন। ঐ দিনে গঙ্গাতীরে পবিত্র বটবৃক্ষরাজ মূলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণ মহোৎসব সম্পাদিত হইবে। তৎসংশ্লিষ্ট একটি অভিনব বৈষ্ণব প্রদর্শনী খোলা হইবে। উক্ত দিনে মহোৎসবক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় সদলে উপস্থিত হইয়া কালোপযোগী মধুর "গৌরাঙ্গ লীলা" কীর্ত্তন করিবেন। বহু ভগবদ্ভক্ত মনীষী ও গায়কবৃন্দ মহোৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন। ভক্তমণ্ডলীর নিকট করজোড়ে নিবেদন, তাহারা সদলে কৃপা করিয়া মহোৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণগানে ভুবন ভরাইয়া দিউন।

দ্রষ্টব্য—ই, বি, রেলের শিয়ালদহ (কলিকাতা) হইতে সোদপুর ভাড়া মধ্যমশ্রেণী যাতায়াত—৵১৫। তথা হইতে মহোৎসব-তলী মাত্র এক মাইল পথ। ই, আই, রেলের কোন্নগর ষ্টেশন হইতে গঙ্গার ধার ১ মাইল পথ মাত্র। গঙ্গার পূর্ব্ব পারে মহোৎসব-তলা। ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়।

দূরাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রসাদ পাইবার এবং রাত্রি বাসের স্থানের বন্দোবস্ত আছে।

জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য পত্রাদি, প্রদর্শনীর জন্য বৈষ্ণব জগৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি, সকল প্রকার সাহায্য এবং দান নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীনটবর দত্ত, সহঃ সম্পাদক, শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির
পোঃ পানিহাটি (২৪ পরগণা) অথবা
৭, দুর্গাপিতুড়ি লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

যুবরাজপুর বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ সম্মিলন

গত ১০ই আশ্বিন রাত্রি ৭টার সময় যুবরাজপুর সুবর্ণবণিক্ সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উহাতে উপস্থিত হইয়া স্বজাতীয় পূর্ব্ব গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত বি এ নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন ঃ—

শ্রদ্ধেয় বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ মহোদয়গণ,

আর বৃথায় কালক্ষেপ ক'রে দিন দিন অবনতির সোপানে নাম্‌বেন না; সত্বর মুখ ফিরিয়ে চক্ষুঃ মেলে দেখুন, কলিকাতা, হুগলি, চুঁচুড়া প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ স্বজাতিবর্গ কেমন স্বর্গীয় আলোকে জাগরিত হ'য়ে বিপ্লব-তরঙ্গপূর্ণ হিন্দুসমাজ-সাগরের বক্ষে জাতীয় তরণী বিজয়-গৌরবে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ছেন! আসুন, আমরাও ঐ ধর্ম্মের অণুতে গঠিত—শাস্ত্র ও ইতিহাসের মতে অভিষিক্ত—সর্ব্বোপরি প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূতপদরজঃস্পর্শপূত জাতীয় তরণী রক্ষার্থে আমাদের সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করি।

পূজনীয় সমাজ-নায়কগণ, আপনারা গ্রামে গ্রামে স্বজাতিগণকে একত্র আহ্বান ক'রে এক একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করুন।—স্বর্গীয় মহাত্মা কুঞ্জলাল মল্লিক দেবভূতি সঙ্কলিত "সুবর্ণবণিক্" পুস্তক ও বিশ্ববিখ্যাত বৈষ্ণব-শাস্ত্রনিচয় হইতে পাঠ উদ্ধৃত ক'রে সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়ে দি'ন।

✓ সুবর্ণবণিক্ সঙ্ঘ যে বিশুদ্ধ বৈশ্যবর্ণান্তর্গত, তাহাতে আর কা'রও সন্দেহ নেই। অতএব শীঘ্র যা'তে পঞ্চদশ দিন অশৌচবিধি ও যজ্ঞসূত্র স্বজাতিবর্গ গ্রহণ করেন সে বিষয়ে আপনারা ঐকান্তিক চেষ্টা করুন, নিজেরা অগ্রণী হ'য়ে পঞ্চদশাহাশৌচ ও যজ্ঞসূত্র গ্রহণ ক'রে সর্ব্ব-সাধারণ সমক্ষে আদর্শ আর্য্য বৈশ্যরূপে বিরাজ করুন।

দেশের ও জাতির আশা ও আশ্রয় "সুবর্ণবণিক্" এই গৌরব-আখ্যায় ভূষিত বৈশ্যতরুণসঙ্ঘ! আপনারা প্রবুদ্ধ হউন—সম্মিলিত শক্তির দ্বারা সমাজ-নারায়ণকে জাগরিত করুন। সর্ব্বশক্তিমানের প্রসাদে আপনাদের বর্ত্তমান্ ও ভবিষ্যৎ দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হবে—সমাজ আপনাদের ক্রোড়ে ধারণ ক'রে গৌরবান্বিত হবে।

স্ত্রী জাতির মধ্যে যা'তে শিক্ষার প্রচার হয়, সমাজের দুঃস্থ পীড়িত ব্যক্তিগণ সাময়িক সাহায্য লাভ কর্‌তে পারে, তার জন্য আপনারা "সাহায্য-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করুন। নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রচারক পাঠিয়ে স্বজাতিগণকে জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করুন—সারা বাংলাদেশে "থাক্-মিল-নির্ব্বিশেষে" সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে সামাজিক একতার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করুন। ওঁ স্বস্তি।

অবশেষে সমাজের হিতকর কয়েকটি প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে বিপুল হরিধ্বনি সহ সভা ভঙ্গ হয়।

সুবর্ণবণিক যুবকের সৎসাহস

গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে কলিকাতা বাবুঘাট ভাগীরথী সঙ্ঘের সম্পাদক বহুবাজার দুর্গাচরণ পিতুড়ির লেন নিবাসী ও কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের জনৈক উদ্যোগী সভ্য শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও জনৈক নিমজ্জমান হিন্দুস্থানীর জীবন রক্ষা করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই সকলের অনুকরণীয়। তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত সেই লোকটির সাহায্যে অগ্রসর না হইলে যে শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইত তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় দীননাথ দত্ত

আজ আমরা নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে একটী মর্ম্মন্তুদ সংবাদ স্বজাতীয় পাঠকগণের গোচরে আনিতেছি। স্বজাতির একান্ত শুভানুধ্যায়ী, জাতির মঙ্গলব্রতে নিয়োজিতপ্রাণ, কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানের মূর্ত্তিমান অবতার সমাজ-সেবক দীননাথ দত্ত মহাশয় গত ১০ই আশ্বিন বুধবার প্রত্যুষে মরধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের পথে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। দীননাথ বাবুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধপ্রায় হইয়াছিলেন। মৃত্যুর সপ্তাহ পূর্ব্বেও আমরা তাঁহার কোনও সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাই নাই। প্রায় মাসাধিক কাল তিনি সামান্য দন্তরোগে ভুগিতেছিলেন, তাহার জন্য তাঁহার পরিপাক শক্তির কিছু ব্যতিক্রম হইতেছিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনান্ত হইবে ইহা কেহই আশঙ্কা করেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে হঠাৎ তিনি এপোপ্লেক্সি রোগে আক্রান্ত হয়েন এবং তাহাতেই অনতিকাল মধ্যে তাঁহার প্রাণান্ত হয়।

সামাজিক কার্য্যে আমরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দীননাথ বাবুর নিপুণহস্তের কর্ম্মসূচনা দেখিতে পাই। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তিনি প্রায়ই প্রবাসে থাকিতেন সেই জন্য সামাজিক আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি যোগদানে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু যে সময় হইতে তিনি কলিকাতা সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন তখন হইতেই পূর্ণ মাত্রায় সমাজের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক বৎসর তিনি সমাজের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। সেই সময়ে সমাজের আর্থিক অবস্থা ততদূর সচ্ছল ছিল না এবং সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদককে সমস্ত কার্য্য নিজেই সম্পন্ন করিতে হইত। আফিসের কার্য্যের আধিক্য বশতঃ প্রায়ই তাঁহাকে অনেক কাজ বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইত। সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সমাজের কার্য্যাবলী যথাসময়ে শেষ করিতেন। কোনরূপ কার্য্য ফেলিয়া রাখা তাঁহার স্বভাব-সুলভ প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

সমাজের উন্নতিকল্পে এবং জাতির তথ্য নিরূপণ জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বৈবাহিক পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া সামঞ্জস্য বিধান জন্য স্বজাতির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জেলার স্বজাতিগণের তালিকা সংগ্রহ করিয়া সমাচারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার স্বজাতি-বৃন্দের একখানি ডিরেক্টারি সঙ্কলন করিবার জন্য তিনি

বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার সম্পাদকত্বে সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়, পরে কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদকরূপে তিনি উপর্য্যুপরি সাত বৎসর ইহার কার্য্য পরিচালনা করেন। সম্মিলনীর খুলনা অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি নাগপুরে ছিলেন। কিন্তু স্বজাতিগণের সমবেত আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তিনি সুদূর প্রবাস হইতে খুলনায় আগমন করিয়াছিলেন এবং সেই-দূরদেশে থাকিয়াও কিরূপ তথ্যপূর্ণ প্রাঞ্জল অভিভাষণ লিখিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

দীননাথ বাবু উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তাঁহার মতিগতি আধুনিক বিকৃত ভাবাপন্ন ছিল না। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং সনাতন ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি হঠকারিতাব্যঞ্জক সাময়িক আন্দোলনের অথবা সামাজিক রীতিনীতি বিচারবিমূঢ়চিত্তে পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না; স্বজাতির মধ্যে বর্ত্তমানে উপনয়ন সংস্কারে তাঁহার সহানুভূতি ছিল না!

দীননাথ বাবু ভারত গবর্ণমেণ্টের হিসাব দপ্তরে একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি প্রথমে একজন কেরাণীরূপে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়েন কিন্তু নিজ কর্ম্মকুশলতায় তিনি ডেপুটি অডিটর জেনেরালের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক দেশীয়ের ভাগ্যে এই পদলাভ ঘটিয়া থাকে। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রচলিত ফরমসমূহ সংশোধন করিবার জন্য কয়েক বৎসর বিশিষ্টপদ প্রদান করেন এবং তিনিও নিপুণতার সহিত উক্ত কার্য্য যথাযথ সম্পাদন করিয়া প্রভূত সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। যখন মহামতি মেষ্টন সাহেবের অধীনে একটী কমিটী এদেশে তদন্তে আসিলেন সেই সময়ে দীননাথ বাবু উক্ত কমিটির সম্পাদক মনোনীত হইয়া দেশে দেশে তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহার কার্য্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। মাত্র দেড় বৎসর পূর্ব্বে তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহার বিপুল শ্রম ও অধ্যবসায় লব্ধ পেনসন তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না।

দীননাথ বাবু একজন নীরব কর্ম্মী ছিলেন। কোন সভাসমিতিতে নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তিনি কখনও বক্তৃতা দিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। স্বজাতীয় সভাসমিতির প্রত্যেকটীর সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বালকগণের মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চার প্রসারের জন্য তিনি ছোট বড় অনেকগুলি লাইব্রেরীর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করিতেন। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে তিনি কোনও সভাসমিতির অধিবেশনে অনুপস্থিত হইতেন না এবং ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ে আগমন করিতেন—ইহাও দীননাথ বাবুর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দীননাথ বাবু নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবলে বলীয়ান ছিলেন। কোনও বিষয়ের বিচার কালে তাঁহার অনন্যসাধারণ ধীশক্তি-প্রসূত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইত। আমাদের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে, জাতির ঘোরতর সমস্যার সন্ধিক্ষণে দীননাথ বাবুর ন্যায় স্থিতপ্রজ্ঞ মনীষীর অন্তর্দ্ধান জাতির সমূহ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আমরা বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে, দীননাথ বাবু সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জাতীয় কার্য্যে পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিবেন; কিন্তু করাল কাল নির্ম্মম হস্তে আমাদের সে আশালতা ছিন্ন করিয়া দিল। আমাদের অভিশপ্ত সমাজের প্রতি জানি না কেন যে, বিধাতার কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে যাহার ফলে আমরা অনতিকাল মধ্যে একটি একটি করিয়া চারিটি রত্ন—মাণিকলাল মল্লিক, সাক্ষীগোপাল বড়াল, সুদামচন্দ্র শীল ও দীননাথ দত্ত—হারাইলাম। দীননাথ দত্ত মহাশয়ের পরলোক গমনে সমাজ-সুমেরুর আর একটি স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল। ভগবান জানেন—আমাদের সাম্প্রদায়িক জীবনে এই অভাব আর পূর্ণ হইবে কি না।

৺দীননাথ দত্ত শোকসভা

২০শে আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ৮নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থ কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ মন্দিরে ৺দীননাথ দত্ত মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে

শোক প্রকাশের জন্ত এক সভা আহুত হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি, শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ সেন, আই এস্ ও, রায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপদ দত্ত বি এল্, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত বি এল্, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত দেবভূতি বি এ, শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস, শ্রীযুক্ত ননীলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত কালঞ্জর মল্লিক দেবভূতি, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল দেবভূতি, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, শ্রীযুক্ত মণিমোহন শীল, শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্ এবং শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ এই শোকসভায় সমবেত হইয়াছিলেন।

সভারম্ভে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল বলেন,—"৺দীনবাবুর মৃত্যুতে আমাদের সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল, তাঁহার দ্বারা কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত, বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা তাঁহারই মস্তিষ্কপ্রসূত। সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত সুবর্ণবণিক্‌কে লইয়া এই উৎসবের ব্যবস্থা তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় সফল হইয়াছে এবং তিনিই এই পথের পথ-প্রদর্শক। আমরা এখানে স্বর্গীয় আত্মার শোক প্রকাশের জন্ত সমবেত হইয়াছি এবং সম্ভবতঃ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে কিন্তু আমার মনে হয় তিনি যে প্রতিষ্ঠান আমাদের হস্তে ন্তস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করাই তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্মৃতি রক্ষা। তিনি পরলোক হইতে আমাদিগকে শক্তি সঞ্চার করুন যেন আমরা সম্মিলনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি। আমার আর বলিবার শক্তি নাই, শোকে আমি মুহ্যমান—আমার মুখে কথা নির্গত হইতেছে না, আমি প্রস্তাব করি শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ সেন মহাশয় এই শোকসভায় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করুন।"

তৎপরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে নারায়ণবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অতঃপর নিম্নলিখিত শোক সঙ্গীত গীত হয় :—

বাতাস ছেয়ে করুণ সুরে
বাজে বিষাদ রাগিণী।
বেদনা ব্যথিত হৃদয় পুরে
তোমার অভাববাণী॥
শূন্য শূন্য শূন্য আসন তোমার পূজারী
গভীর দুঃখে মরম ব্যথা উঠে গুমরি।
প্রতিভা আলো কোথা লুকালো
আঁধার মন্দির আজি।
হেথায় তব পূজা অপূর্ণ
শ্রীহীন ফুলের সাজি॥
দীননাথ! দীন যে আমরা না আছে যোগ্য ডালি
মনের বনে অর্ঘ্য কুসুম উদ্দেশ্যে দিই ঢালি—
প্রেরণা দানে জাগাও প্রাণে
বরষি আশীষ বাণী।
সমাজ সাধনে রাজে নয়নে
সৌম্য মূরতি খানি॥

সঙ্গীতান্তে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত বি এল্ বলেন—"দীনবাবুর অকাল মৃত্যুতে সুবর্ণবণিক্ জাতি, বিশেষতঃ কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি যে একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন, আমি তাঁহার সহযোগীরূপে তাহা সম্যক্ অবগত আছি। তিনি আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছেন, আমরা সেই পথে চলিয়া যদি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি, তবেই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা হইবে এবং আমার মতে তাহাতেই তাঁহার স্মৃতি ঠিক বজায় থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত (হাওড়া) বলেন—"দীনবাবু ১৬ বৎসর ধরিয়া সমাজের পরিচালনা করিয়াছেন; বর্ত্তমানে সমাজ সাবালক হইয়াছে; সুতরাং যে দেবতা আমাদের পরিচালনার জন্ত আসিয়াছিলেন, তিনি কার্য্য শেষে স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা সেই দেব-প্রদর্শিত পথে চলিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস বলেন,—"৺দীনবাবু নেতা

এবং সমাজপতি ছিলেন। তিনি সুবর্ণবণিক্ সমাজকে রেজেষ্ট্রী করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করেন। এই সমাজের স্থায়িত্বকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। অনেকে বলেন, তিনি একটু গর্ব্বিত ছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার কোন গরিমা কোন দিন দেখি নাই। তিনি সকলের সহিত সমভাবে মিশিতেন, আমার অসুখের সময় তিনি আমার বাড়ী গিয়া খবর লইতেন এবং নিজে বাড়ী চিনিতেন না বলিয়া পূর্ণবাবুকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বিনয় এবং অমায়িকতার আধার ছিলেন।"

শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক বলেন—"৺দীনবাবু বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি শশিভূষণ দে বালক বিদ্যালয় ও রাজরাজেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য আন্তরিক সাহায্য করিতেন। দীনবাবুর আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, তিনি প্রত্যেক সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি "সুবর্ণবণিক্ ডিরেক্টরী" প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহাতে বাধা দান করিয়াছে। এখন ঐ আংশিক কার্য্য যাহাতে পূর্ণ হয় তাহা করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক বলেন,—"আজ এই শোক সভা ৺দীনবাবুর স্মৃতিতর্পণের জন্য আহুত হইয়াছে; তবে সভ্য সংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইলেও উহা ঠিক হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমানে কাল—পিতৃ পক্ষ—পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য সকলেই তর্পণ বা শ্রদ্ধাঞ্জলিদান করিয়াছেন, সুতরাং এই সময়ে ৺দীনবাবুর স্বর্গস্থ আত্মার তর্পণের জন্য সভাহ্বান উপযুক্তই হইয়াছে; স্থানও যথাযোগ্য নির্ণীত হইয়াছে—সুবর্ণবণিক্ সমাজ মন্দির; এবং পাত্রও সকলেই উপযুক্ত—সকলেই সমাজের কল্যাণকামী। কাজেই এই ত্রিধারার অপূর্ব্ব সম্মিলনে তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি যথাযোগ্যরূপেই অর্পিত হইবে। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা বড় একটা করিতেন না। তিনি নির্ভীক, উদারচেতা, সত্যপ্রিয় এবং একনিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্রের বিবাহে সামাজিক একীকরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত না হওয়ায় আমি তাঁহাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"সমাজের এক অঙ্গের দ্বারা একীকরণ সম্ভব নহে; অর্দ্ধাঙ্গিনীদের শিক্ষিতা করুন, তবেই সমাজে একীকরণ আপনাআপনি হবে; নতুবা যতক্ষণ অর্দ্ধাঙ্গিনীরা অশিক্ষিতা থাকবেন, ততক্ষণ কিছুই হবেনা।" তিনি অত্যন্ত সমাজিক ছিলেন; যে তাঁহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিত, তিনি তাহার সঙ্গে ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। আমার পুত্রের বিবাহে তিনি উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে মিষ্টিমুখ করিবার জন্য অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া স্বহস্তে মিষ্টান্ন বাড়ী লইয়া আসিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের দ্বারা পাঠাইতে চাহিলে বলিয়াছিলেন—"আপনি আমার বাড়ীতে গিয়া যেভাবে নিজের হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন, আমিও তাহাই করিব।" তাঁহার অহমিকা ছিল না—সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেন। বাস্তবিক তিনি সরলতা ও সহৃদয়তার আদর্শ ছিলেন। তাঁহার মনের বল ও দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। তিনিই কেন্দ্র সমিতির স্রষ্টা; অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাজের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। তাঁহার সংস্থাপিত কেন্দ্র সমিতির চেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়, তাহার চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।"

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন বলেন—"তিনি যেরূপ সরকারী কার্য্যে উচ্চপদ ও সম্মানলাভ করিয়াছেন, আমাদেরও সেইরূপ সম্মান লাভ করিবার চেষ্টা করা দরকার। দীনবাবুর আর একটা বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি সভা পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।"

রায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সেন বাহাদুর বলেন—"৺দীনবাবু সমাজের মেরুদণ্ড ছিলেন। তিনি চুঁচুড়াবাসী এবং আমিও চুঁচুড়াবাসী। আমি তাঁহাকে তাঁহার বাল্য ও ছাত্র জীবন হইতে জানি। তখন হইতে তিনি নির্ভীক, সত্যবাদী, সরল, চরিত্রবান্ এবং বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি একবার যাহা ধরিতেন তাহা সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না। এন্ট্রেন্স পরীক্ষার দিন তাঁহাকে ৭টার সময় বেড়াইতে দেখিয়া একজন বলিয়াছিলেন—"পরীক্ষার সময় বেড়াইতেছেন?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন—"পরীক্ষা দশটার সময়, এখন কি?" অর্থাৎ তিনি পরীক্ষার জন্য বহু পূর্ব্ব

হইতে প্রস্তুত ছিলেন। কর্ম্ম-জীবনেও তিনি সমস্ত কার্য্য নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন। সহকারীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তাঁর মধ্যে এত গুণের সমাবেশ ছিল বলিয়াই তিনি ভারত গবর্ণমেন্টের ডেপুটি অডিটার জেনারেল হইতে পারিয়াছিলেন। জাতির উন্নতির জন্ত তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তিনি শুধু সুবর্ণবণিক্ জাতির নহেন, বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন। আজ সকলেই সেই মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্ত বদ্ধ পরিকর হউন।"

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত বি এ, বলেন—"তিনি যে শুধু—বড় লোকের বা মধ্যবিত্তের ছিলেন, তাহা নহে। তিনি দরিদ্রেরও ছিলেন। তিনি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র—আমিও সেই স্কুলের ছাত্র। তিনি যে উচ্চ কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, খুব সম্ভবতঃ তাহা তাঁহার শিক্ষক শিবচন্দ্র সোমের নিকট হইতে প্রাপ্ত। অনেকে উচ্চপদে আরোহণ করিয়া জাতিকে ভুলিয়া যান, কিন্তু তিনি উচ্চপদে আসীন হইয়াও জাতিকে ভুলেন নাই; জাতির উন্নতির জন্ত দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন। খুলনা সম্মিলনে যাইবার সময় তিনি মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন; তাহাতে দেখিয়াছি, তিনি দিনরাত পরিশ্রম করিয়া তাহার বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু কখনো পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হন নাই,—সর্ব্বত্র হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কেন্দ্র সমিতির ক্ষুদ্র সভ্যরূপে তাঁহার মৃতদেহের অনুগমন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি। আজ তাঁহার স্মৃতিবাসরে সমস্ত সভ্য অন্তরে অন্তরে তাঁহার আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করুন।"

শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর কাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ বলেন—"তাঁহার সঙ্গে আমার একদিন মাত্র সামান্ত সময়ের জন্ত আলাপ হইলেও তিনি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত বিদ্বজ্জনবরেণ্য ছিলেন, তাঁহার মহানুভবতার বর্ণনা সম্ভব নহে।"

অতঃপর এক সন্ন্যাসী, তিনি গরিবকে দান করিতেন বলিয়া তাঁহার শোক সঙ্গীত গান করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলেন—"কোন শোক সভার সভাপতিত্ব করা শুভ কর্ম্ম নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তারা দীনবাবুর সম্বন্ধে যাহা বলেছেন, তাহার বেশী বলবার কিছু নেই, তবে তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্ম ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ। তখন হইতেই তাঁহার সরলতা এবং অমায়িকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু সরল এবং অমায়িক হইলেও কাহারো খোসামোদ তিনি করিতেন না। অনেক ভারতবাসী তাঁহার প্রমোসনে বাধাদান করিলেও তিনি কখনো সাহেবদের খোসামোদ করেন নাই—নিজ গুণে উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি পাঠ করেন—

(ক) বঙ্গের সুসন্তান, সমাজের একনিষ্ঠ কর্ম্মী দীননাথ দত্ত মহাশয়ের আকস্মিক লোকান্তরে সুবর্ণবণিক্ সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, তজ্জন্ত এই সভা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(খ) উক্ত প্রস্তাবের এক খানি অনুলিপি দীননাথ বাবুর পুত্র শ্রীমান সুশীলকুমার দত্তকে প্রেরণ করা হউক।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করেন, অতঃপর সভাপতিকে ধন্তবাদ প্রদানানন্তর সভা ভঙ্গ হয়।

পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির

কলিকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে ৫ এবং ৫।১ নং ওলাইচণ্ডী রোডে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত, ইহাতে ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

খ্যাতনামা ধনী মতিলাল শীলের অন্যতম উত্তরাধিকারী মাণিকলাল শীল মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহকল্পে পৃথক করিয়া রাখিয়া যান। উইলের সর্ত্তানুসারে ঐ বিদ্যালয়ে টেক্‌নিকেল শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকিবে এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি বোর্ডিংএ ১২টি দরিদ্র ছাত্রকে বিনাব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে এবং তাহাদের অন্যান্য যাবতীয়

ব্যয় বহন করা হইবে। ঐ টাকার সুদ হইতেই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে।

এই বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ইহার টেক্‌নিক্যাল বিভাগে নিম্নলিখিত ৮টি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে : (১) সীবন ও কর্ত্তন শিল্প বা দরজীগিরি (২) পুস্তক বাঁধাই (৩) বেত্র-শিল্প (৪) লৌহশিল্প ও ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং (৫) মৃৎশিল্প (৬) দারুশিল্প বা ছুতারগিরি (৭) চিত্রবিদ্যা (৮) বয়ন ও সূত্রনির্ম্মাণ।

বিদ্যালয়ের সাধারণ বিভাগের ছাত্রদিগকে এই ৮টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ২টি বিষয় লইতে হয়। শুধু টেক্‌নিক্যাল বিভাগেও ছাত্র লওয়া হইয়া থাকে। এই সব ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে সাধারণ বিভাগেও এক অথবা একাধিক বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারে। সকল বিভাগেই ছেলেরা সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী করিতেছে।

এই বিদ্যালয়ে তৈরী বেতের সুট্‌কেশ, চেয়ার, বাস্কেট, বেতের কাজ করা ছড়ি, কাঠের চৌকী, কলমদানি, বড় ছুরি ও চাকু, বাঁধানো পুস্তক, লিখিবার প্যাড্, সার্ট, পাঞ্জাবী, জামার ছিট, মশারির থান ও মশারি, ডাষ্টার, ব্লাকবোর্ড ক্লিনার, মাটির খেলানা, বাক্স, রিলিফ ম্যাপ ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ দেখিয়া বিশেষরূপে আশা করিতে পারা যায় যে, এই বিদ্যালয়টির দ্বারা বেকার-সমস্যা-পীড়িত মধ্যবিত্তশ্রেণীর খানিকটা উপকার হইবে।

ছাত্রদের তৈরী জিনিষগুলি বিক্রী হইলে মুনাফাটা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকগুলি ছাত্র এইভাবে বেশ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থায় তাহাদের উৎসাহ খুবই বাড়িবার কথা।

সঙ্গীত ও বাদ্যাদি শিক্ষা দিবার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। এজন্য একজন পৃথক শিক্ষক আছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিত ভাবে ক্লাস হইয়া থাকে। তথায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং এক্‌সপেরিমেণ্ট দেখান হয়। স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। এ বিষয় দুইটিই বাধ্যতামূলক।

ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে ছাত্রদিগের নিকটে নানারূপ অত্যাবশ্যক ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে বক্তৃতা করা হয়। তজ্জন্য বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ও অনেকগুলি শ্লাইড্ আছে।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন—যিনি বুকের উপর হাতী রাখিতে পারেন, এক সঙ্গে দুইখানা মোটর গাড়ী ধরিয়া রাখিতে পারেন, মাংসপেশীর আকুঞ্চনাদিতে যাঁহার নৈপুণ্য অদ্ভুত—এই বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক। ছেলেদের খেলিবার জন্য বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী সুবিস্তৃত টালা পার্কে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় তাহারা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়াদি করিয়া থাকে।

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ২০০০ পুস্তক আছে। জানা গেল তাহার মূল্য অন্যূন ১৫,০০০ হাজার টাকা হইবে। প্রতিমাসে লাইব্রেরীর কলেবর বর্দ্ধিত করা হইতেছে। লাইব্রেরীতে কয়েকখানা 'রেয়ার'বুক (দুষ্প্রাপ্য বই) আছে।

প্রত্যহ শিক্ষক এবং ছাত্রগণের সমবেত প্রার্থনার পর বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের দিকে যে কর্ত্তৃপক্ষের সুতীক্ষ্ণ নজর আছে আর একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাহা বুঝা যাইবে। ছেলেদের মাসিক প্রোগ্রেস্ রিপোর্টে তাহাদের শরীরের ওজনটাও লিখিয়া অভিভাবকদের নিকটে পাঠান হয়। তজ্জন্য ওজন করিবার একটি সুন্দর যন্ত্র আছে। উহার উপরে দাঁড়াইলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ওজনটা ঠিক পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে মাসে একবার করিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বোর্ডিংএ অল্প বয়স্ক এবং দরিদ্র ১২টি ছেলের বিনা খরচে থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা আছে। এই ছেলেরা খাওয়া ও থাকার খরচ ব্যতীত পুস্তক, কাপড়-চোপর, বিছানাপত্র, চিকিৎসা ও গৃহ-শিক্ষকের খরচও বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে পাইয়া থাকে। উহাদের এক্‌সকার্শান ইত্যাদির ব্যয়ও ঐ তহবিল হইতেই দেওয়া হয়। বোর্ডিংএর ছেলেদের নৈতিক চরিত্র ও স্বাস্থ্যের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ নজর আছে বুঝা গেল। সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করা এবং বিকাল বেলা খেলা ও ব্যায়াম করা বাধ্যতামূলক। ছেলেদের আহারের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মৎস্য ও দুগ্ধের ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন বিষয় জানিতে হইলে উপরি উক্ত ঠিকানায় বিদ্যালয়ের রেক্টর শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার বি এল্ অথবা হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আর্থিক উন্নতি

চুঁচুড়ায় বৈশ্যাচার মতে শ্রাদ্ধ

চুঁচুড়া সহরে সম্প্রতি বৈশ্যাচার অনুসারে পঞ্চদশ দিবসে কয়েকটি শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

(১) ষণ্ডেশ্বরতলার সুবিখ্যাত পাল বংশীয় মথুরানাথ পাল মহাশয়ের পরলোক গমনে তাঁহার পুত্রগণ পঞ্চদশদিবসে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের কুলপুরোহিত পুজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যচরণ হালদার এই কার্য্যে যোগদান করিয়া স্বজাতি মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

(২) উক্ত বংশেরই কোন মহিলার পরলোকগমনে তাঁহার প্রায় সকল জ্ঞাতিই পঞ্চদশাহে অশৌচান্ত করিয়াছেন।

(৩) কামারপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অভয়চরণ শীল তাঁহার স্বর্গগত পিতা অম্বিকাচরণ শীলের শ্রাদ্ধকার্য্য পঞ্চদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

সুবর্ণবণিক্ জাতির অকৃত্রিম হিতৈষী পুজনীয় শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় কৃতীর কুলপুরোহিত।

এতদ্ব্যতীত এখন অত্র সহরে অনেকেই বৈশ্যমতে জননাশৌচান্ত করিতেছেন।

বিজয়া

(১)

রহিলেও দূরে দূরে, আজি এ পরাণ-পুরে,
সূক্ষ্ম কায়া ল'য়ে এস, আজ যে যেথায়।
বুকের মাঝারে টানি', হেসে কহি প্রীতিবাণী,
ঈর্ষা ভুলি' কোলাকুলি করি বিজয়ায়।

প্রণত:

দশমী
১৯।৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

শ্রীতুলালচাঁদ শীল
ঘুঁটিয়াবাজার, হুগলী।

(২)

মৃণ্ময়ী মায়েরপূজা, আনিতে হয়েছে মানা
যে দুঃখ পেয়েছি মনে, সে কথাত কেউ জানেনা
"জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে"
একথা শিখেছি সবাই, সাধক রামপ্রসাদ গুণে।
তাই মানসোপচারে পূজা, করেছি নবরাত্রি দিনে
দয়া কোরো দয়াময়ি মা! মতিহীনে আর গতিহীনে।
কে কোথায় করেছে কিবা মা তোমার করুণা বিনে?
ধ্যান করে তোর অভয়পদ, অভাগা তাই রাত্রি দিনে।
পূজার কদিন কেটে গেছে, আজি এ বিজয়া দিনে
সবার সাথে মিল্‌তে মাগো! সাধ হয়েছে মনে মনে।
প্রিয় পরিজন যত, আছে দেশে দেশান্তরে
মায়ের আশীষ মাগে অধম যুক্তকরে সবার তরে।

"সুখে থাকো ভুলোনাকো"

বিজয়া দশমী ১৩৩৫
কলিকাতা,
১৯।৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

ইতি,
তোমাদের শ্রীমণিমোহন মল্লিক

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী

আমরা তমলুক সুবর্ণবণিক্ সমিতির পত্র দুইখানি প্রকাশ করিলাম। উক্ত সমিতির সম্পাদক মহাশয় বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহারা তমলুক মহকুমায় যে সম্মিলনীর অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করিলেন। যাহাতে সম্মিলনীর অধিবেশন বন্ধ না হয় কেন্দ্র সমিতি তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

প্রেরিত পত্র*

তমলুক সুবর্ণবণিক্ সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে প্রাপ্ত তিনখানি পত্র প্রকাশিত হইল।

(১)

মাননীয় সুবর্ণবণিক্ সমাচারের

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

দয়া করিয়া এই পত্র দুইখানি পাঠপূর্ব্বক আপনার সমাচারে ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীঅধরচন্দ্র দাস

সম্পাদক, তমলুক সুবর্ণবণিক্ সমিতি।

(২)

শ্রীশ্রীহরি জীউ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ

মহাশয়, বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর গত কলিকাতা অধিবেশনে আমাদের স্থানীয় কয়েকজন সভ্য গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মেদিনীপুর হইতে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের উৎসাহে এবং আশ্বাস বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বর্ত্তমান বৎসরে সম্মিলনীকে আমাদের তমলুক মহকুমায় আহ্বান করেন। প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর আমাদের দেশে ফসল ভাল না হওয়ায় লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় কিন্তু তথাপি স্থানীয় সভ্যগণকে কোন প্রকারে উৎসাহিত ও সম্মত করা হইয়াছিল। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ স্বজাতিগণের অভিমত জানিয়া বুঝা গেল এ সম্বন্ধে তাঁহাদের তদ্রূপ উৎসাহ নাই এবং তাঁহাদের নিকট আর্থিক সাহায্যও আশাপ্রদ নহে, অধিক কি মেদিনীপুর টাউনবাসী স্বজাতিগণ যাঁহাদের উপর আমরা অত্যন্ত নির্ভর করিয়াছিলাম এবং যাঁহাদের আশ্বাস বাক্যে আমরা তমলুকে সম্মিলনী আহ্বান করিয়াছিলাম এখন তাঁহারাই ঐ সম্বন্ধে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন; সুতরাং সম্মিলনীর তমলুক অধিবেশন সম্বন্ধে প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব।

দ্বিতীয়তঃ উপনয়ন সম্বন্ধে আমাদের জেলাবাসী স্বজাতিগণ, যতদূর বুঝা যায়, প্রায় সকলেই অনিচ্ছুক সুতরাং উক্ত প্রস্তাব লইয়া ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া সম্মিলনীর মহৎ উদ্দেশ্য পণ্ড না হয় এবং স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট উপহাসাস্পদ্ ও লাঞ্ছিত হইতে না হয় তাহাও বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

তৃতীয়তঃ অধিবেশনের সভাপতি মনোনয়ন সম্বন্ধে স্থানীয় স্বজাতিগণের আন্তরিক ইচ্ছা যাহাতে এমন একজন গুণী ব্যক্তি সভাপতি মনোনীত হন, যিনি বিভিন্ন সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত এবং যাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আমাদের মফস্বলবাসী অনুন্নত স্বজাতিগণের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের ঘৃণার ভাব কমিয়া যায় এবং আমরাও তাহাদিগকে দেখাইতে পারি যে, আমরা হীন অবস্থাপন্ন হইলেও আমাদের স্বজাতির মধ্যে এরূপ কর্ম্মবীর, জ্ঞানী ও দানশীল রহিয়াছেন যাঁহাদের যশঃসৌরভ ভারতবিস্তৃত। তমলুকে সম্মিলনী আহ্বান করার প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের তাহাই, এ সম্বন্ধে বসন্তবাবু ও বিপিনবাবু কেন্দ্র-সমিতির গত অধিবেশনে যাইয়া মৌখিক আপনাকে সকলই বলিয়াছেন। তাহাতে আপনারা বলিয়াছেন যে, আপনাদের কয়েকজন মেদিনীপুরে যাইয়া চেষ্টা করিবেন। আপনারা মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন কি না? যদি যাইয়া থাকেন কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন জানাইলে সুখী হইব। তমলুকে প্রায় কুড়ি কিম্বা ত্রিশ ঘর সুবর্ণবণিকের বাস। তন্মধ্যে ৩।৪ ঘর কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন, অবশিষ্টগুলিকে দৈনিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হয় সুতরাং তাঁহাদের নিকট আর্থিক সাহায্য বেশী কিছু আশা করা যায় না। মেদিনীপুরের স্বজাতিগণের নিকট বিশেষ আর্থিক সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলাম এবং তাঁহারাও আশা দিয়াছিলেন কিন্তু এখন

* মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নহেন।

সে আশাও নিরাশায় পরিণত হইয়াছে। আমরা কয়েকজন মেদিনীপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে স্বজাতিগণের মধ্যে অনেকে বলিলেন সম্মিলনীর আগামী অধিবেশনে প্রধান কার্য্য হইল—"উপনয়ন গ্রহণ", অন্য কোন কার্য্য হউক কিম্বা না হউক। আমাদের মনে হয় উক্ত কারণেই মেদিনীপুরবাসী স্বজাতিগণের সম্মিলনীর প্রতি আস্থা নাই, উপরোক্ত নানারূপ কারণে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং এ সম্বন্ধে আপনাদের সদুপদেশ প্রার্থনা করি, আশা করি শীঘ্র পত্রের উত্তর দানে বাধিত করিবেন। ইতি

বশম্বদ

শ্রীঅধরচন্দ্র দাস

সম্পাদক, তমলুক সুবর্ণবণিক্ সমিতি।

(৩)

মাননীয় কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ। মহাশয়, আজ অত্যন্ত নৈরাশ্য-ব্যথিত-চিত্তে ভগ্নপ্রাণে এই নিদারুণ পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম, দৈব বিড়ম্বনায় বিভিন্ন স্থানবাসী স্বজাতি-নারায়ণগণের সংসর্গ ও সেবাজনিত আনন্দলাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না, জানি না ভগবান্ কোন মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য আমাদিগকে এ সুখলাভে বঞ্চিত করিলেন, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

যে মেদিনীপুর টাউনবাসী স্বজাতিগণের উৎসাহে ও আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়া আমরা তমলুকে সম্মিলনী আহ্বান করিয়াছিলাম বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদেরই সম্মিলনীর প্রতি অনাস্থা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন, আমাদের ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন সমাজের সুধীজনবরেণ্য বিশ্রুতকীর্ত্তি, সুযোগ্য সভাপতি মনোনীত হইবেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা, এবং উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে জেলাবাসী সুবর্ণবণিক্‌গণের বর্ত্তমান সময়ে অনিচ্ছা প্রকাশ হেতু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা গত ১লা আশ্বিন সোমবার তারিখে আপনার নিকট একখানি পত্র লিখিয়া আপনাদের সদুপদেশ প্রার্থনা করি। অনেক দিন উক্ত পত্রের উত্তর না পাইয়া পুনরায় ১৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার তারিখে আর একখানি পত্র লিখি, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও উত্তর এমন কি প্রাপ্তিসংবাদ পর্য্যন্ত পাইলাম না।

আগামী সম্মিলনীতে উপনয়ন সম্বন্ধে আলোচনা হইলে মতানৈক্য বশতঃ যে বিভিন্নদলের সৃষ্টি হইয়া এক ভীষণ গোলযোগের উৎপত্তি হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তদ্দ্বারা সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যতটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনেক পশ্চাতে পতিত হইতে হইবে এবং সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রতি (কলিকাতার ন্যায় সহরের কথা বলিতে পারি না) আমাদের মফস্বলস্থ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে, যেখানে মুষ্টিমেয় সুবর্ণবণিকের বাস সেখানে তাহাদিগকে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে। এই সাম্যমৈত্রীর যুগে বিভিন্ন জাতি একতাবদ্ধ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সুবর্ণবণিক্‌গণ যে এইরূপ ভাবে বৃথা দলের সৃষ্টি করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে ইহা কল্পনা করিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়।

তমলুক একটি ক্ষুদ্র টাউন, এখানে প্রায় ২০।৩০ ঘর সুবর্ণবণিকের বাস তন্মধ্যে মাত্র ৩।৪ ঘর কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন; সুতরাং অন্য সম্প্রদায়ের উপর আমাদের কি শিক্ষা কি সঙ্গতি কোন বিষয়ে প্রতিপত্তি নাই। এ অবস্থায় তমলুকের ন্যায় জায়গায় উপনয়ন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইলে আমাদিগকে বিশেষ উপহাসাস্পদ্ ও অপমানিত হইতে হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাষ অনেক দিক্ দিয়া পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান বৎসর আমরা তমলুকে সম্মিলনী আহ্বানের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলাম। ইতি সন ১৩৩৫ সাল তারিখ ২৪ আশ্বিন।

শ্রীঅধরচন্দ্র দাস

সম্পাদক, তমলুক সুবর্ণবণিক্ সমিতি।

মাননীয় সুবর্ণবণিক্ সমাচারের
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, কলিকাতা তথা বাঙ্গলা ও সমগ্র ভারতবর্ষে, আমাদের স্বজাতীয় মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সে সকল দাতব্য ঔষধালয়, সেবাশ্রম, অবৈতনিক বিদ্যালয়, পাঠাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের সংখ্যা কত, কোথায় অবস্থিত, যে মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাঁহার নাম ও ঠিকানা, কোন্ সালে প্রতিষ্ঠিত, বর্ত্তমান পরিচালকের নাম ও ঠিকানা জানিতে প্রার্থনা করি। কৃপা করিয়া জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। ২৩এ আশ্বিন ১৩৩৫ সাল।

বিনীত
শ্রীনটবর দত্ত
৭ নং দুর্গাপিতুড়ি লেন, কলিকাতা।

উক্ত বিষয়ে যিনি যাহা জানেন, জানাইলে সমাচারে প্রকাশিত হইবে—কার্য্যাধ্যক্ষ।

সমালোচনা

পরিমল—পরিমল দেবী প্রণীত ও মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, লিখিত ভূমিকা সম্বলিত, ৭৯+১।৶০ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০আনা, প্রাপ্তিস্থান ৪৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরিমল কবিতাগ্রন্থ; কিন্তু এ কবিতায় কামনা-লালসা-উন্মাদনার ছায়া নাই;—আছে একটা শান্তির স্নিগ্ধ মন্দাকিনীধারা—হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য-কালিমা ধৌত করিয়া প্রাণে অনাবিল ভূমানন্দের আভাস প্রদান করে। পড়িতে পড়িতে পাঠকের চিত্ত সংসারের আশা-বাসনা-অধ্যুষিত কল-কোলাহল অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির বিজন নেপথ্যে মহামহানের চরণতলে ছুটিয়া যায়।

'অর্ঘ্য' প্রদান করিয়া কবি 'দেখা' পেয়েছেন চির সুন্দরের—সে কোণ 'সবুজ বনে', 'চাঁপার ছায়ায়'; অমনি বলিতেছেন—

"তোমার পায়ে সব বিলায়ে নিঃস্ব হয়ে যাব।"

নববর্ষে—কবি অশ্রু-হাসিতে ব্যথিত নহেন; তবে ভিক্ষা করিতেছেন—

"শুধু দিও শক্তিটুকু মোরে,
যাহা দিলে তাহা বহিবার।"

'সুনীল যমুনাতীরে' বাঁশরী বাজিয়া উঠিল, রাধার হৃদয়-তন্ত্রী সেই সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। আর—

"বাণী মানি পরজয়, চরণে লুটায়ে রয়
সুধু মৃদু মধু হাসি অধরে রাজে।"

দীর্ঘ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কবি বাঞ্ছিতের চরণ-তলে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া বলিতেছেন—

"ঝরে-পড়া কামিনীর মত, ঝরে-পড়া বকুল সমান
চরণ-কমলতলে ছায়া-ঘেরা নদীকূলে নিঃশেষি আপন।

তারপর কবি হৃদয় সংসারের বাধাবন্ধ দূর করিয়া অনন্তের যাত্রী হইয়াছেন। জানেন না কবে যাত্রা শেষ লইবে—শুধু চলিয়াছেন—অন্তহীন বিরামহীন এ পথের পথ চলা—

শুধু জানি—কার আবাহন
টুটি মোর নিশীথ স্বপন,
আমারে এনেছে ডাকি—"

ছন্দের জড়তাহীন অবাধ গতি, ভাষার সরলতা পরিমলকে প্রকৃতই উপভোগ্য করিয়াছে। কবির বাণী-মন্দির-পথ-যাত্রা সফল হউক।

ধ্রুব—শ্রীমতী মনোরমা দেবী প্রণীত এবং মহামহো-

পাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। পৃষ্ঠা—৩৪ ; মূল্য—আটআনা। ১১নং কলেজ স্কোয়ার হইতে এন্ এম্ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—স্বর্ণরচিত শিল্পের বাঁধাই।

পুস্তকের প্রথমেই ধ্যান-নিরত ধ্রুবের একটি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই চিত্রে প্রথমেই মন ধ্রুবের একাগ্র সাধন দর্শনে তাহার প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। পরে ক্রমশঃ যতই পুস্তকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়, ততই ধ্রুবের বালকসুলভ সরলতায় মন-প্রাণ অভিভূত হয়। তার পর বিবিধ কষ্ট স্বীকারের পর কঠোর সাধনার অবসানে, দুর্য্যোগময়ী তামসী রজনীর তিরোধানে দিব্য-প্রভা-বিলসিনী ঊষার রক্তিমছটার মত সিদ্ধি যখন মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেয়, যখন নারায়ণ—পদ্মপলাশলোচন হরি ধ্রুবের সম্মুখে আসিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন, তখন আমাদেরও মনে হয়, ধ্রুবের সঙ্গে সঙ্গে বলি—

"স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

এইভাবে পাঠকের চিত্তকে স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার ক্ষমতা লেখিকার অসাধারণ। বিশেষতঃ মুনি-বালকগণের সহিত খেলাধূলার সময় ধ্রুবের যে নির্লিপ্ত উদাসীন স্বভাব লেখিকা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই মনোরম।

সুনীতি-চরিত্রও পাঠকের মন করুণা-রসে আপ্লুত করে। কিন্তু লেখিকার সর্ব্বপ্রধান কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, রচনা কৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি দেখাইয়াছেন, একটি কল্পিত ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশে উত্তানপাদকে কলঙ্ক মুক্ত করিয়া—মহাকবি কালিদাস যেরূপ মহাভারত হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়া দুর্ব্বাসার অভিশাপ-জনিত বিস্মৃতির আবরণ সৃষ্টি করিয়া মহারাজ দুষ্মন্তকে দুরপণেয় কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, লেখিকাও সুনীতিকে স্বামীর সত্য রক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করাইয়া উত্তানপাদকে স্ত্রৈণ কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন। পরিশেষে, সুরুচি চরিত্রও অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমে ঈর্ষায় দগ্ধ হৃদয়ে সুরুচি সুনীতির বনবাস প্রার্থনা করিলেও, যখন দেখিল তাহাতে বাঞ্ছিতকে পাওয়ার চাইতে হারাণর সম্ভাবনাই বেশী হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সুপ্ত নারীত্ব জাগিয়া উঠিল, তখন বুঝিল স্বামীর সুখই তাহার সুখ, তখন সে সুনীতিকে ফিরাইয়া আনিতে চলিল।

পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরস। আমরা আশা করি লেখিকা এইরূপ আরো শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের এক মহা অভাব দূর করিবেন।

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)—৺কাশীরাম দাস বিরচিত এবং মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃত মহাভারত এবং বর্ত্তমান মহাভারতের তুলনা করিয়া বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রাচীন পুঁথি হইতে সঙ্কলিত, তবে মাত্র আদি পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য পর্ব্ব পাওয়া গেলে গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ হইত। এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় সুবর্ণবণিক্‌কুলভূষণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি এইচ ডি মহোদয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি উত্তরোত্তর উক্তরূপ কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিয়া দেশের ও দশের অশেষ উপকার সাধন করিবেন। এই পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত।

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসীর এলবাম—

এই এলবামে সুবিখ্যাত আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসীর বিরাট কারখানার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সুদৃশ্য আর্ট পেপারে সুন্দর ছাপা। এই এল্‌বামে আমরা দেখি কিরূপে সামান্য অবস্থা হইতে অর্দ্ধ শতাব্দীরও অল্প সময়ের মধ্যে, কেবলমাত্র সততা ও পরিশ্রমের বলে একটা বিরাট্ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে। দেশবাসী প্রত্যেকের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা উচিত।

জ্যোতিষের মূলসূত্র—শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি প্রণীত এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৬০, মূল্য ১॥০ টাকা।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার জ্যোতিষের দুরূহ সূত্রগুলির একটা সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রহের কারকতা, ভাববিচার প্রভৃতির এক অভিনব ব্যাখ্যা তিনি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু প্রত্যেক বিষয়টির

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন এবং কি প্রকারে প্রত্যেক গ্রহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সফলতা-বিফলতার ভিতর দিয়া নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করে, তাহারও যুক্তি-পূর্ব্বক অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ইংরেজী হইতে নূতন গ্রহ দুইটি (নেপচুন ও হর্সেল) বরুণ ও প্রজাপতি নামে অনূদিত করিয়া কিরূপে তাহাদেরও শক্তি এবং কারকতা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হয়, তাহা দেখাইবার চেষ্টা আমাদের করিয়াছেন—এই দুইটি গ্রহের বিষয় ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই হিসাবে ইহাকে একটা নব বিষয়ের অবতারণা বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কেন্দ্র-কোণ বিচারের যে নব পদ্ধতি তিনি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক।

উলা বা বীরনগর—শ্রীসুজনলাল মিত্র মুস্তোফী প্রণীত ২১২ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকে সমৃদ্ধিপূর্ণ প্রাচীন গণ্ডগ্রাম উলা কিরূপে মহামারীর প্রকোপে পড়িয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন কালের রীতিনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার প্রভৃতি বহু বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।　　　　শ্রীহে. বি. সে.

বঙ্গে শ্যামাপূজা

শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত

১

অতি ঘোর আঁধারেতে আবরিত দশ দিশি ;
মলিন তারকাকুল—গগনেতে নাহি শশী।
ভীষণা প্রকৃতি আজি ; বঙ্গের সাধকগণ
হেন অমানিশা ঘোরে কা'র করে আবাহন ?
আজি শ্যামাপূজা বঙ্গে—তাই সবে আত্মহারা,
চৌদিকে উঠিছে ধ্বনি ভেদি' ব্যোম—"তারা, তারা"।

২

কত শত বর্ষ ধরি' করি' কত আয়োজন
সেবিছে তোমারে মাগো, তোমার তনয়গণ।
শ্মশানে শবের বুকে নির্ভয়ে আসন পাতি'
সাধক জপিছে মন্ত্র একা বসি' সারারাতি।
সাধনায় সিদ্ধি হয় শুনিয়াছি ভবদারা,
তবপদ সেবি মাগো, আজ মোরা সিদ্ধি হারা,

৩

আদ্যাশক্তি নামে তুমি খ্যাত এই চরাচরে
তাই কি সন্তান তব এত অল্প বল ধরে ?
ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষের, বন্যার করাল গ্রাসে—
বরষে বরষে যায় কত লক্ষ যমবাসে !
তাদের রক্ষিত দেবি শক্তি যদি নাহি হয়,
কি হেতু তুলেছ দুটী কর তব—বরাভয় ?

৪

শুনিয়াছি পুরাকালে তারিতে ভকতকুল
দুর্জ্জয় অসুরকুলে করেছিলে মা, নির্ম্মূল।
আজিও করেতে খড়্গ অরিমুণ্ড শোভা পায় ;
সেই শত্রুনাশী শক্তি এবে তব কোথা হায় ?
কাল পরিবর্ত্তনেতে কালী হ'ল শক্তিহীন ;
হায়রে বাঙ্গালি, জাতি, তোর ভাগ্যে কি দুর্দ্দিন !

৫

শুনেছি শ্মশান ভূমি তব অতি প্রিয় স্থান ;
তাই কি সোণার বঙ্গে করিতেছ মা, শ্মশান ?
শবের আসন বড় প্রিয় তব জানি শিবে,
আসন রচিছ তাই সন্তানগণের শবে ?
স্বচক্ষে দেখিছ দেবি, সন্তানের সর্ব্বনাশ !
তবুও কি শোভা পায় তব মুখে অট্টহাস ?

৬

কে বুঝে তোমার লীলা ? তব তত্ত্ব বুঝা ভার !
তা' বলে' কি সন্তানের নাহি মাগো, অধিকার—
জানিতে কি পাপে হ'ল আজি বঙ্গ এত দীন—
সংসার-সমরক্ষেত্রে সকলের চেয়ে' হীন ?
নিরীহ কেরাণীকুল বঙ্গের ভরসা স্থল !
আজীবন শক্তি পূজা করে' হায়, এই ফল ?

৭

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তব পদে যাচি' তারা,
তোমার তনয়গণ চিরদিন হ'ল সারা !
দূরে থাক্ চতুর্ব্বর্গ—স্বর্গ সুখ নাহি চায় ;
দু'বেলা দু'মুঠো যেন পেট ভরে' খেতে পায় !
নীরোগ, সবল দেহ, ধর্ম্মে যেন থাকে মন—
তার চেয়ে বেশী তা'রা করেনা'ক আকিঞ্চন।

৮

প্রকৃত সাধক বুঝি বঙ্গভূমে নাহি আর ?
নহিলে হ'তই হ'ত দুঃখের যে প্রতীকার।
সাজায়ে প্রদীপ মালা—জ্বালায়ে আতস বাজী—
বৃথা মোরা আঁধারেতে এলোকেশী মায়ে খুঁজি !
খুঁজিলে আঁধার হৃদি ভকতির দীপ জ্বেলে'
কালো রূপে আলো-করা মার কোল পে'ত ছেলে।
দূরে যেত দৈন্য, ক্লেশ, দেশব্যাপী হাহাকার ;
নিৰ্জ্জীব সজীব হ'ত বরিষণে সুধাসার !

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরলোকগত দীননাথ দত্ত।

জন্ম—
২৬শে আশ্বিন, ১২৭৭।

মৃত্যু—
১০ই আশ্বিন, ১৩৩৫।

প্রতিভা প্রেস—কলিকাতা।

১৩শ বর্ষ | পৌষ, ১৩৩৮ সাল | ২য় সংখ্যা

মানব-জীবন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব দেখে বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার সম্মুখে শব্দ-স্পর্শ-রূপরস-গন্ধভরা বিচিত্র দ্রব্য-সম্ভার লইয়া তাহার নবনীত-কোমল মনকে আহ্বান করিতেছে—বিশাল আকাশে অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, মহাসমুদ্রের অনন্ত লহরীমালা, পর্ব্বতমালার তরঙ্গায়িত শৃঙ্গ-রাজি গাম্ভীর্য্যের বিরাট্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান; বিস্ময়ে মন ভরিয়া উঠে; আবার বনরাজিনীলা বেলাভূমি দূর চক্রবালে অনন্তের সীমারেখা টানিয়া দেয়; কি যেন একটা অসীম গোপন রহস্য মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; প্রজাপতি যেমন গুটি ভেদ করিয়া মুক্ত বাতাসে আসিয়া দেখে একটা অনন্তের মাঝখানে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার মন, মানুষ তেমনি সত্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এ বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক রহস্যের গোপন-গহন বনে পথহারা পথিক—মানব—সত্য কি জানিবার জন্য উৎসুক হয়।

প্রথমে তাহার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি; কিন্তু যখন দেখে, স্বপ্ন ও বিভ্রম (hallucination) সত্য নহে, তখন মনে হয় এই আপাতঃ সত্যরূপে প্রতিভাত এ সমস্তের অন্তরালে এমন কিছু আছে, যাহাকে জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না;—"অনেন বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি।"—সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, সমস্ত মিথ্যা ও বিভ্রম দূরে পলায়ন করে, তখন মানব সেই বস্তু বা সত্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই সত্য ঈশ্বর; এবং ঈশ্বরকে জানিবার উপায় ধর্ম্ম।

পরিবার

বিশ্বের মাঝে আসিয়া দেখি, আমি ত একা নহি। পিতা মাতা ভাই ভগ্নি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত আমি সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আমার ধর্ম্মসাধন ত একা সম্ভবপর নহে। পরিবারের অন্তর্গত আমি—পরিবারকে বাদ দিয়া কি

প্রকারে চলিব ?—আমার আত্মসম্পূর্ত্তি (Self-realisation) বা ধর্ম্মলাভ পরিবারের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। সুতরাং পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যপালনই আমার প্রথম ধর্ম্ম।

সমাজ

তারপর সমাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিবার সমাজের অন্তর্গত; পরিবারের অঙ্গরূপে আমি সমাজেরও অঙ্গ। সুতরাং সমাজের উন্নতির চেষ্টা করাও আমারই কর্ত্তব্যের অন্তর্গত এবং ধর্ম্ম। কাজেই আমার আমিত্বের গণ্ডী আর একটু সরিয়া গেল—আমি একটা বৃহত্তর মানবতার মধ্যে লীন হইয়া গেলাম।

রাষ্ট্র বা দেশ

অতঃপর রাষ্ট্র বা দেশ তাহার কর্ত্তব্যের অনুশাসন লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। সমাজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং আমি রাষ্ট্রেরও অঙ্গ। কাজেই রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল দেখাও আমার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম।

বিশ্ব-মানবতা

কর্ত্তব্যের গণ্ডী আরও সরিয়া গেল। আরও বৃহত্তর মানবতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল আমার সম্মুখে—রাষ্ট্র বিশ্ব-মানবতার মধ্যগত; সুতরাং বিশ্ব-মানবতার প্রতিও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে; সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনও ধর্ম্মের অনুশাসন।

ঈশ্বর

সর্ব্বশেষে যিনি এই বিশ্ব-মানবতার মধ্য দিয়া আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করেন, যিনি একা হয়েও বহু, ক্ষুদ্র হয়েও মহৎ, স্থির হয়েও পরিবর্ত্তনশীল, সেই ঈশ্বরের প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য, তাহাই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম। কিন্তু সে ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া ক্ষুদ্র ধর্ম্মকে অবহেলা করিলে চলিবে না। কারণ সেই ধর্ম্মও ঈশ্বরের প্রেরিত। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লাইটাস্ বলিয়াছেন,—"মানবীয় আইনকানুন ঈশ্বরেরই অনুপ্রেরণা।" অতএব পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব-মানবতার মধ্য দিয়াই আমাকে ঈশ্বরে পৌঁছিতে হইবে। ইহার কোনটিকে বাদ দিলে চলিবেনা।

বর্ণাশ্রম

এই ধর্ম্ম লাভের জন্যই মহামতি মহর্ষি মনু বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্যক্ পালনের দ্বারা আমরা ক্রমশঃ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বমানবতা ও ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া আত্মসম্পূর্ত্তি (Self-realisation) লাভ করি।

বর্ণধর্ম্ম

কর্ম্ম এবং গুণানুসারে আর্য্যগণ চারিটি বর্ণে বিভক্ত। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।" গুণ এবং কর্ম্মানুসারে এই বর্ণবিভাগকে হিন্দু-শাস্ত্রে ঐশ্বরীয় কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সকল লোকের স্বভাব ও কার্য্যক্ষমতা এক হইতে পারে না। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যানুসারে সকল লোক একই রকম কার্য্য ভালও বাসেনা। সুতরাং যে যাহা ভালবাসে, যাহার প্রকৃতি যাহা চায়, তাহাকে সেই কার্য্য করিতে দিলে যেমন তাহার দ্বারা সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, যে সে কার্য্য ভালবাসে না, তাহার দ্বারা কখনও তাহা সম্ভবপর নহে। এবং প্রকৃতিগত কার্য্যের দ্বারাই লোক পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বমানবতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরে লীন হইবে বা আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করিবে। কিন্তু প্রত্যেক বর্ণেরই উদ্দেশ্য আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ—কেবল ব্রাহ্মণই মুক্তি বা আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করিবে, অন্য জাতি করিবে না, তাহা নহে; যে যে কাজই করুক না কেন, যদি সে তাহার প্রকৃতিগত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তবে কেহই তাহার আত্মসম্পূর্ত্তি রোধ করিতে পারে না। সেই হেতু প্রত্যেক বর্ণের নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন ধারণ এবং আচার পালন প্রকৃতিগত গুণের পরিচায়ক; পরন্তু উহা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও আত্মসম্পূর্ত্তি লাভের উপায় মাত্র।

আশ্রমধর্ম্ম

ব্রহ্মচর্য্য এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের দ্বারা আমরা পারি-

বারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি। বানপ্রস্থের দ্বারাই আমরা ক্ষুদ্র সসীম গণ্ডী ছাড়াইয়া অনন্তের বিশালতার আভাস্ পাই। এই আশ্রমেই আমরা বিশ্ব-মানবতার সহিত প্রথম পরিচিত হই—আমি শুধু পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ নহি। নিখিল বিশ্বের আত্মার সঙ্গে আমার আত্মা তারহীন তড়িৎবার্ত্তার মত সন্নিবদ্ধ। এই মহতী বাণীর আভাস্ মাঝে মাঝে গার্হস্থ্য আশ্রমের মধ্যে আমাদের প্রাণে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তর্পণ মন্ত্রে—

"ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।"

শুধু আমার পিতৃপুরুষ নয়, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ আমার প্রদত্ত জলে তৃপ্ত হোক।

তারপর সন্ন্যাসাশ্রমে আমরা দেখি—সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অন্তরালে অজর, অমর, অক্ষয় অবিনশ্বর শাশ্বত শান্তির আধার ব্রহ্মের বিকাশ এই বিশ্ব-জগৎ,—অণুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অগণিত সৌরমণ্ডল পরিশোভিত বিশ্ব যাহার আত্মসম্পূর্ত্তি লাভের বা লীলার উপকরণ; আমি সেই মহামহান ব্রহ্মের অংশ; তখন বুঝি আমার মালিন্য নাই, কামনা-বাসনা নাই, চির নির্ম্মল, চির পবিত্র, চির শাশ্বত আমি—হে দেবদেব সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ তোমার চরণে আত্ম নিবেদন করি—সার্থক হোক আমার মানব-জীবন।

ভোরের পাখী

শ্রীরসময় লাহা

ভোরের পাখী, ভোরের পাখী গাইছ কোথায় গান
এমন শ্যামল কুঞ্জ ছেড়ে রৈলে কোথায় ভুলে?
ভোরে ভোরে বেড়াই ঘুরে সেই অশথ্থমূলে,
ভাসে না আর সে প্রেরণা—আকুল করা প্রাণ।
ভোরের পাখী, ভোরের পাখী কর শান্তিদান
উষার আলোয় শান্ত সবুজ মুক্ত মাঠের কূলে
মুক্তাঝরা শিশিরমালা দুর্ব্বাশিরে দুলে,
তোমার অভাব জাগায় কি ভাব, বাড়ায় অভিমান।
এ বিরহ তত্ত্বময় কি? কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞান,—
কে আমারে বুঝিয়ে দেবে কোথায় ওরে পাখী?
গানের সুরে জড়িয়ে আছে কি অমিয় তান,—
যাহার মায়ায় লুব্ধ এ মন, কাঁদ্‌চে থাকি থাকি;
শুধায় শুধু মিলন-তৃষায় প্রতি মর্ম্ম-স্থান
দেখা দিয়ে ভোরের পাখী বাঁধ্‌বে মিলন-রাখী?

প্রাচীন পদাবলী

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস বি এ, সাহিত্যভূষণ, কবিরঞ্জন

জ্ঞানদাস

১। যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যাথা পাই
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি।

২। তুমি মোদের এক যে সম্বল।

৩। হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি।

৪। কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহুঁ না পাই॥

৫। ঘন ঘন তুমি বাহিরে চাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥

৬। লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়।

৭। রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

৮। রজনী শাঙণ ঘন দেয়া গরজন
ঝিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিদ্ যাই মনের হরিষে॥

৯। হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়।

১০। কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি।

১১। এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।

১২। রূপ দেখি আঁখি, না পালটি গো।

১৩। একই পরাণ দেহ ভিন্ ভিন্।

১৪। রাধাবদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা॥

১৫। আঁখি পালটিতে নহে পরতীত

১৬। কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে।

১৭। রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈগেল॥

১৮। লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর।

১৯। যে দেশে পরাণ বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥

২০। দশদিন দুরজন, একদিন সুজনক।

২১। বয়স কিশোর মোহন ঠাম।
নিরখি মুরছি পতিত কাম॥

২২। তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনা দশদিক হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপতপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম॥

২৩। রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম।

২৪। অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।

২৫। জ্ঞানদাসের কেবল ভরসা
ও রাঙ্গা দু'খানি পা।

২৬। এতদিন নাহি জানি, লোকমুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গবাস ছাড়, যৌবন পাতল কর,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥

২৭। হরিণী পালাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে।

২৮। হাতে কি চাঁদের পরশ পাও?

২৯। এইত চন্দনের ফোটা কেবা নাহি পরে।
তোমার কপালগুণে ঝলমল করে

৩০। অন্তর বাহির সমতুল।

৩১। ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি।

৩২। চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।

৩৩। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

৩৪। আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল।

৩৫ পরাণ অধিক　　হিয়ার পুতুলী
　　নিমিখে নিমিখে হারা।

৩৬। দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন্।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥

৩৭। কিবা সে মোহনরূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে॥

৩৮। আমার বন্ধুয়া　　আন বাড়ী যায়
　　আমার আঙ্গিনা দিয়া।

৩৯। বন্ধুর হিয়া　　এমন করিলে
　　না জানি সেজন কে।
আমার পরাণ,　　করেছে যেমন
　　এমন হউক সে॥

৪০। প্রতি অঙ্গে গরল ভরা জীয়াইবে কিসে।

৪১। দারিদ ঘটভরি পায়ল হেম।

৪২। অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পাণী তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বদন মধুবার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার।

৪৩। লাখ লছমি যৈছে　　চরণে লোটায়ই
　　তাহে এত বিরকতি তোর।

৪৪। যার লাগি তেয়াগিনু ঘর।
সে কেন ভাবয়ে ভিনপর॥
যারে লাগি কুলে দিনু ছাই।
তারে কেন দেখিতে না পাই॥

৪৫। যে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদবদনে কেনে আমারে পোড়াও॥

৪৬। কহইতে বচন বচন আধহারা।

৪৭। মরণ অধিক ভেল এছার জীবন।
তো বিণু দগধে যেন দাবানলে বন॥

৪৮। পদাঘাত কৈনু কোন্ ভুজঙ্গ মাথায়।

৪৯। আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।

৫০। এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি।

৫১। দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥

৫২। সময় বসন্ত　　কান্ত দূর দেশে।

৫৩। সোণার বরণ দেহ।
　　পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥

৫৪। পূর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপম।

৫৫। সুখের লাগিয়া　　এঘর বাঁধিনু
　　আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে　　সিনান করিতে
　　সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া　　চাঁদ সেবিনু
　　ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া　　অচলে চড়িনু,
　　পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে　　দারিদ্র বেড়ল
　　মাণিক হারাণু হেলে॥
[এই মধুর পদটী চণ্ডীদাসেও আছে]

৫৬। মুড়াব মাথার কেশ　　ধরিব যোগিনী বেশ
　　যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এহেন যৌবন　　পরশ রতন
　　কাচের সমান ভেল

৫৭। দিবস দিবস করি　　মাস বরিখ কত গেল,
　　বরিখে বরিখ কত ভেল।

৫৮। তোমায় আমায়　　একই পরাণ
　　ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে　　বাহির হইয়া
　　কিরূপে আছিলা তুমি।

৫৯। পাঁজরে কাঁটিয়া সিঁদ।

৬০। আর না করিব আঁখির আড়।

৬১। বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া,　　যেখানে পরাণ
　　সেখানে তোমারে থোব।

ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব
সুখ না চাহিব আর ॥

৬২। অন্তের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।

৬৩। বিরহ অনলে, দহয়ে অন্তর
ভস্ম না হয় দেহ।

৬৪। কলিযুগে করিলে কীর্ত্তন সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ ॥

৬৫। মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল্ কল্
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥

৬৬। (ক) সজনী অপরূপ নিরমিল ধাতা।
[অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী]

(খ) দরশে পরশ সুখ দাতা। [ঐ]

(গ) হিয়ার ভিতরে টানিয়া টানিয়া
কাতারে পরাণ কাটে। [ঐ]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

জন্ম—১১১৯ সন
মৃত্যু—১৬৮২ শকাব্দ

১। চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ॥

২। সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥
মান অপমান সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।

৩। একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুণের কপালে আগুণ।

৪। উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী, দেখে আসে জর লো।
উমার মুখে চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শনের নূড়া
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো।
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার।
কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো ॥

৫। যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই।

৬। হাবাতে যগুপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।

৭। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ ॥

৮। জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥

৯। পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে ॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্ত নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায় ॥

১০। ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।

১১। বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।

১২। বিননিয়া চিকনিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥
চক্ষে জিনি মৃগভালে মৃগমদ বিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু ॥
অরুণের রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্তের ভঙ্গিমা ॥

১৩। জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥

১৪। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

১৫। যদি করি বিষপান তথাপি না যাবে প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়
চিরজীবী করিলা গোসাঞি ॥

১৬। মাতঙ্গ পড়িলে চরে পতঙ্গ প্রহার করে,

"এই দুঃখ পরাণে নাহি সহে।
১৭। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার।
১৮। খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।
১৯। বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥
২০। অতি বড় বৃদ্ধ পতি　সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
২১। বিনানিয়া বেণীর শোভায়
সাপিণী তাপিণী তাপে বিবরে লুকায়।
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কিছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
২২। যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
২৩। হায় বিধি পাকা আম দাঁড় কাকে খায়।
২৪। অপরাধ করিয়াছি　হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
২৫। বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী। *
২৬। আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি!
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
২৭। নীচ যদি উচ্চ ভাষে　সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।
২৮। সতিনী বাঘিনী　শাশুড়ী রাগিণী
ননদি নাগিনী বিষের ভরা।
২৯। একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥
৩০। যার কর্ম্ম তারে সাজে　অন্যলোকে লাঠি বাজে।
৩১। যশোর নগর ধাম　প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
৩২। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে!
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥
৩৩। সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন্ তিনি॥
৩৪। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

হাড়্মা সাঁওতাল†

শ্রীসত্যনারায়ণ পাল

মঙ্গলাপাতার জঙ্গলের শেষপ্রান্তে শীলাবতী নদীর বাঁধের নিকট হাড়্মা সাঁওতালের লতাপাতা-ঘেরা ছোট একখানি কুটীর। সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী শালবন, পশ্চাতে স্বচ্ছ-সলিলা শীলাবতী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিতা। তখন সন্ধ্যা, সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর হাড়্মা এই খাইতে বসিয়াছে, সম্মুখে পরিবেশনরতা স্ত্রী মাধু। এ কয়দিন এই রকম ভাবে হাড়্মার এক সন্ধ্যা আহার হইতেছে, কেননা যে জমিতে হাড়মা চাষ করে সেই জমিটী তাহার কুটীর হইতে পাকা চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখন আবাদের সময় অনেক জমিতে বীজ ধান রোপণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, হাড়্মার জমীতে লাঙ্গল পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই; তাই কয়দিন হইতে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জমিতে লাঙ্গল দিতে হইতেছে।

আর এক থালা ভাত হাড়্মার পাতে ঢালিয়া দিয়া মাধু ধীরে ধীরে বলিল—"রোজ এক সন্ধ্যা খেলে ক'দিন বাঁচ্বি?"

* এই লাইনটি উল্লেখ করিয়া ৺মাইকেল একটি মোকদ্দমা জিতিয়াছিলেন—মধুস্মৃতি।

† সত্য ঘটনা—লেখক।

এক গ্রাস ভাত কোঁত করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া হাড়ুমা জবাব দিল—"কি কর্ব্ব বল্, জমীটা ঠিক না করে ত' আর আস্‌তে পারিনি, কতদিনের পতিত জমী, রোদ্দুরে পুড়ে পুড়ে শক্ত পাথরের মত হয়ে গেছে, লাঙ্গল কি বসে? গোরু দুটোকে ঠেঙ্গিয়ে দেখ্ না হাতটা লাল হয়ে যায় নি?" এই বলিয়া উচ্ছিষ্ট হাতখানিকে জিহ্বা দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেখাইল।

মাধু আস্তে আস্তে বলিল—"তুই এক কাজ কর্, রাজার কাছে যা, তোকে ত লগ্দী কর্ব্ব ব'লেছিল, তুই ত শুনলিনি তোর বরাতে এক সন্ধ্যা খাওয়া আছে, আমি কি কর্ব্ব বল্।"

ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটি জল উদর-গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া হাড়ুমা বাবরী চুল সমেত মাথা নাড়িয়া বলিল—"কি বল্‌লি চাকরী কর্ব্ব? বাপ, ঠাকুর্দ্দা যা কখনও করে নি, তুই স্ত্রী হয়ে তাই আমাকে কর্ত্তে বল্‌ছিস্, এমন রাগ হচ্ছে যে হোতলটা দিয়ে তোর মাথাটা ভেঙ্গে দি।"

মাধু কোন জবাব দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হেউ হেউ করিয়া চার পাঁচটা ঢেকুর তুলিয়া হাড়ুমা বলিল—"তোর চাকরীর মাথায় মারি বিশ ঝাড়ু, ভারী লোভ দেখাচ্ছিস্ লো, লগ্দীর চাকরীতে ত কত সুখ, আজ রাজার হুকুম হল যা কলসী করে জল এনে জালা ভর্ত্তি কর্, কাল ব'লে ব'সবে, যা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে আয়, পরশু বল্‌বে এই এঁটো বাসনগুলো মাজ, এই ত তোর লগ্দীর কাজ, অমন চাকরীর মুয়ে আগুন জ্বেলে দি।"

মাধু আর স্থির থাকিতে পারিল না তাই জবাব দিল—"বলিহারী তোর বুদ্ধিকে, লগ্দীর বুঝি ওই কাজ?

"তবে?" বড় বড় চোখ ঘুরাইয়া হাড়ুমা জিজ্ঞাসা করিল—"লগ্দীর ও কাজ নয়? তাহলে কি কাজ বল্?"

"মাথায় পাগড়ী বেঁধে রাজার বাড়ী পাহারা দিতে হয়, কোন পরিশ্রম নেই, পেট ভঁরে রাজভোগ খাবি আর গোঁপে চাড়া দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াবি, তুই ত চাকর নস্ যে বাসন মাজ্‌বি, কাট কাট্‌বি, জল তুলবি।"

একজন সামান্য স্ত্রীলোকের কাছে ঠকিয়া গিয়া হাড়ুমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল—"ও রকম ভাবে চাকরী কর্লে যে কুঁড়ে হয়ে যাব মাধু, আর কি খাট্‌তে মন লাগবে, তারপর রাজা যদি জবাব দেয় তখন কি কর্ব্ব বল দেখি।"

"তবে খেটে মর্‌গে যা, এক সন্ধ্যা খেলে মানুষ ক'দিন বাঁচবে?"

"তুই এক কাজ কর্ না, দুপুর বেলা মাঠে ভাত দিয়ে আসতে পার্‌বি নি, তা হলে খুব ভাল হয়, আর ক'দিন গেলেই বৃষ্টি নামবে, মাটি ভিজে গেলে আর কি ভাব্‌না বল্ না, তখন কি আর এক সন্ধ্যা খাব?"

"তুইত বেশ বল্‌লি, চারক্রোশ রাস্তা হেঁটে তোকে ভাত দিয়ে আসবো, আবার চারক্রোশ ভেঙ্গে বাড়ী এসে কখন মাটি কাট্‌তে যাই বল দেখি?"

"তবে আর কি কর্‌বি? দেখ্‌ছি এক সন্ধ্যে খাওয়াই আমার বরাতে আছে।"

"তুই যদি বলিস ত ধাংড়ার হাতে ভাত পাঠিয়ে দি, সে রাস্তাঘাট চিনে যেতে পারবে খুব, ছেলে মানুষ হলেও তার খুব সাহস, দেখলি নি এই মোটে আট বছর বয়সে সেদিনে কেমন একটা বাঘের বাচ্চা ধরে এনেছিল?"

হো হো করিয়া হাসিয়া হাড়ুমা জবাব দিল—"আমার ছেলে ত! তার সাহস হবে না ত কার হবে? দেখ্ মাধু ক'দিন তার হাতেই ভাত পাঠিয়ে দিস্ বুঝ্‌লি।"

হাত মুখ ধুইয়া হাড়ুমা তেলাই বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। মাধু তারপর হাড়ুমার পাতে খাইতে বসিল।

(২)

তার পরের দিন হইতে ধাংড়া রোজ মাঠে হাড়ুমার ভাত লইয়া যায়। বনের সব রাস্তা তার জানা ছিল না, একদিন দেখাইয়া দিতেই ধাংড়া সব রাস্তা চিনিয়া ফেলিয়াছিল। রোজ দুপুর বেলা ভাতের থালাটিকে গামছা দিয়া বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইত, কখনও বা মাথায় করিয়া লইয়া যাইত; আবার সন্ধ্যার আগেই বাপ-বেটা একসঙ্গে ঘরে ফিরিত। ছেলের সাহস দেখিয়া হাড়ুমা আনন্দে অস্থির; ধাংড়াকে বুকে লইয়া তার কতখানি জমী আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিত, অতখানি জমীতে ফসল

হইলে সমস্তই যে তাহার প্রাপ্য এ কথাটাও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিত। বালক ধাংড়া কতক বুঝিত, কতক বা বুঝিত না।

সেদিন একটু মেঘলা করিয়াছিল, কিছু পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, রৌদ্রের ঝাঁঝ ততটা নাই। হাড়্মা উত্তর দিকের জমীটা লাঙ্গল দিয়া গরু ছুটিকে ছাড়িয়া দিল, পরে হাতমুখ ধুইয়া গাছতলায় বসিয়া ছেলের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, ক্রমে মধ্যাহ্ণ উত্তীর্ণ প্রায় তবু ধাংড়ার দেখা নাই; হাড়্মা এক দৃষ্টে পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। মাঝে মাঝে তাহার মনের কোণে যেন কি একটা অনিশ্চিত অনিষ্টাশঙ্কা দুঃস্বপ্নের মত উঁকি মারিতেছিল।

দু এক ফোঁটা বৃষ্টির জল গাছের পাতা গড়াইয়া টপ টপ করিয়া হাড়্মার মাথায় গায়ে পড়িল; তারপর মুষলধারে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়, ভীষণ ঝড়, বনের বড় বড় গাছ ঝড়ে স্থানভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সমস্ত বন ধুলায় ধুলাচ্ছন্ন—কোনদিকে দৃষ্টি চলে না; আবার সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টি! মনে হইল যেন প্রলয় উপস্থিত! চড়্ চড় শব্দে বজ্রপাত হইতেছে, তদুপরি সৌদামিনীর ক্ষীণ হাসি, গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন! গাছতলায় দাঁড়াইয়া হাড়্মা বুঝিতে পারিল ধাংড়া ঝড়বৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।

হাড়্মা আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছেলের জন্য মন হু হু করিয়া উঠিল। কিন্তু এ দুর্য্যোগে কেমন করিয়া যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। বিশ্বধ্বংসকারী ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া যাওয়া, আর মৃত্যু আলিঙ্গন করা একই, কিন্তু মন ত বুঝিতেছে না; ধাংড়ার কথা চিন্তা করিয়া হাড়্মা ঝড় বৃষ্টি মানিল না, বজ্রকেও উপেক্ষা করিল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল,—ভয় নাই, উৎকণ্ঠায় হৃদয়ের সমস্ত শোণিত হিম হইয়া গিয়াছে, তবু ভ্রূক্ষেপ নাই; অচল অটল প্রায় হাড়্মা, সৃষ্টিবিধ্বংসী দুর্য্যোগ ভেদ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

সহসা হাড়্মার শ্রবণ-বিবরে মেঘমন্দ্র স্বরে বাজিয়া উঠিল "বাবা!"

কে ও? কার ও কণ্ঠ স্বর? কে বাবা বলে ডাকলে? ধাংড়া না? হাড়্মা উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া ডাকিল—"ধাংড়া!"

বিরাট্ মসীবরণা প্রকৃতির শূন্য গহ্বর হইতে প্রলয়কারিণী ঝঞ্ঝার গম্ভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল শ ন্ ন্ ন্ ন্ ন্!

আবার বহুদূর হইতে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হাড়্মার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"বাবা!"

এ নিশ্চয়ই ধাংড়ার কণ্ঠ স্বর। হাড়্মা নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইল তার বুকের ধন ধাংড়া ঝড়বৃষ্টিতে ভিজিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাই কাতর কণ্ঠে "বাবা বাবা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। হাড়্মা প্রাণভেদী চীৎকারে জানাইয়া দিল—"ধাংড়া, এই যে বাবা আমি, ওইখানেই দাঁড়া, কোথাও যাস্ নি ধন, আমি যাচ্ছি।"

আরও দূর বহুদূর হইতে সিক্ত পত্রপল্লবপুঞ্জের আবরণ ভেদ করিয়া কে যেন অস্পষ্ট স্বরে কাতর কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা! বাবা!!"

উল্কাবেগে হাড়্মা শব্দের অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিল। কিন্তু হাড়্মার বোধ হইল যেন ধাংড়ার স্বর আরও দূরে, সুদূর দিগন্তের কোলে মিশিয়া যাইতেছে। যতদুর যায় ধাংড়ার স্বরও ততদূরে পিছাইয়া যাইতেছে। হাড়্মা অমিত বিক্রমে ছুটিতেছে আর—চীৎকার করিয়া—বলিতেছে "ধাংড়া, দাঁড়া বাবা!"

বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ, আবার বন সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছে, কই কোথাও ত ধাংড়া নাই আর ত বাবা বলিয়া ডাকিতেছে না, কোথায় গেল? ধাংড়া! ধাংড়া!

(৩)

ক্রমে বৃষ্টি থামিয়া গেল; ঝড়ের প্রকোপও কমিয়া গেল। সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন; তখনও সেই জনমানবহীন জঙ্গল মধ্যে হাড়্মা "ধাংড়া ধাংড়া" বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। জঙ্গলের প্রান্ত সীমানায় ধাংড়ার পদচিহ্ন দেখিয়া হাড়্মা দ্বিগুণ উৎসাহে চিহ্ন ধরিয়া চলিতে লাগিল—তারপর দেখে আর ত ধাংড়ার পদচিহ্ন নাই, তার বদলে গোল গোল কার পায়ের দাগ! এ দাগ ত ধাংড়ার নয়—তবে? সহসা সামনে চাহিয়া দেখে এক

বৃহৎকায় ব্যাঘ্র ধাংড়াকে মুখে করিয়া লইয়া সুদূর বনের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে!—গামছায় বাঁধা ভাতের থালাটি তখনও ধাংড়ার মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে! হাড়্মার সর্ব্বশরীর স্বেদজলে অভিসিক্ত হইল,—"ধাংড়ারে, বাঘের মুখে প্রাণ দিলি বাবা" বলিয়া সশব্দে হাড়্মা জমীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দেখে ধাংড়াকে লইয়া বাঘ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটায় বনের অনেকখানি অংশ ভরিয়া গিয়াছিল! হাড়্মা রক্তের দাগ ধরিয়া আবার ঝঞ্ঝার মত উড়িয়া চলিল। বুকের মধ্যে বোধ হইল কে যেন সুতীক্ষ্ণ শরে হৃদপিণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতেছে, অসহ্য জ্বালা সমগ্র শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া হাড়্মা উদ্ভ্রান্তবেগে সমস্ত বনের ভিতর খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চাহিয়া দেখিল শিকার মুখে করিয়া বাঘ লীলাবতী নদীর বাঁধ হইতে এক লম্ফে রাজার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিল। হাড়্মা বুঝিতে পারিল এবার বাঘকে কোন মতেই সহজে ধরা যাইবে না। শোকে অভিভূত হইয়া হাড়্মা বুকখানাকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"ধাংড়া রে তোর প্রাণ যে এরূপভাবে যাবে, স্বপ্নেও ত জানিনা বাবা, হায়, হায় পোড়া পেটের জন্য তোকে বাঘের মুখে নিক্ষেপ করেছি। চোখের উপর দিয়ে ছেলে নিয়ে গেল কিছুই কর্ত্তে পাল্লেম না। না না বাঘকে নির্ব্বিঘ্নে যেতে দেব না আর একবার চেষ্টা কর্ব্ব।"

নক্ষত্রবেগে হাড়্মা মঙ্গলাপাতার প্রাসাদ অভিমুখে ছুটিয়া গেল! তখন রাত্রি অধিক হয় নাই—মহারাজ এই মাত্র আহার শেষ করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন। হঠাৎ শুনিলেন কে যেন রাজা বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। মহারাজ চমকাইয়া উঠিলেন; তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দেখিলেন —"হাড়্মা।"

তর্ তর্ করিয়া মহারাজ নামিয়া আসিলেন। রাজাকে দেখিয়া হাড়্মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—

"রাজা তোর জঙ্গলের বাঘ আমার ধাংড়াকে নিয়ে গেছে রে, বাছা আমার বাবা বাবা বলে চীৎকার কর্চ্ছে, দে রাজা শীঘ্র বাঘকে ঘিরে দে।"

হাড়্মার কাতর ক্রন্দনে মহারাজের স্নেহকোমল মন করুণায় বিগলিত হইল; তিনি সস্নেহে হাড়্মার গায়ে হাত বুলাইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"কাঁদিস্ না হাড়্মা এখনই বাঘকে ঘিরে ফেল্‌ছি।"

রাজাজ্ঞায় পঞ্চাশজন শিক্ষিত বন্দুকধারী পল্টন তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইঙ্গিত মাত্র তখনই তাহারা মঙ্গলাপাতার জঙ্গলের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া ফেলিল। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে সমগ্র অরণ্যানী থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শিকার মুখে করিয়া বাঘ কোন দিকে যাইতে পারিল না, এমন কি শিকার ভক্ষণের সময়ও পাইল না—যে দিকে ছুটে সেই দিক্ দিয়া গুড়ুম্ গুম শব্দে গুলি ছুটিয়া আসে। ব্যাঘ্র বিব্রত হইয়া পড়িল—প্রাণভয়ে ঝোঁপের মধ্যে শিকার লইয়া গুঁড়ি মারিয়া রহিল।

মহারাজ স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্দুক হস্তে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন—অগ্রে ভৈরব মূর্ত্তিতে হাড়্মা জ্বলন্ত মশাল হস্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। গাছের ডালে রক্তাপ্লুত বস্ত্রখণ্ড দেখিয়া হাড়মা থমকিয়া দাড়াইল, মশালের আলোকে পরীক্ষা করিয়াই হাড়্মা "ধাংড়া রে ধাংড়া রে কি কর্লি বাপ" বলিয়া বস্ত্রখণ্ডটিকে বুকের উপর রাখিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিয়া বলিল—"রাজা এই আমার ধাংড়ার কাপড়—দুর্গাপূজার সময় বাবাকে কিনে দিয়েছিলেম অহো হো!"

মহারাজের চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, পুত্রশোকার্ত্ত হাড়মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া তিনি নিজেই কাঁদিয়া ফেলিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হাড়্মা তোর ধাংড়া আর নেই, কেন আর কাঁদছিস্? স্থির হ' তোর পুত্রঘাতীকে অক্ষত দেহে কিছুতেই ছেড়ে দেব না; এখনই গুলি কর্ব্ব।"

লাফ দিয়া হাড়্মা হুঙ্কার করিয়া বলিল—"তুই বাঘকে গুলি করে মার্‌বি তা হবেক নি রাজা। তুই তাকে ঘিরে দে, আমার ধাংড়ার রক্ত যেমন করে চুষে খেয়েছে তারও রক্ত মাংস হাড় যা কিছু আছে কড় কড় করে চিবিয়ে খাব, দে রাজা বাঘকে ঘিরে!"

জঙ্গলের চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চাশটী বন্দুক একযোগে—

গুড়ুম গুম্ শব্দে অনল উদ্গীরণ করিল। ঝোপের মধ্যে ব্যাঘ্ররাজ স্থির থাকিতে পারিল না, লম্ফ দিয়া পলায়ন করিতে গিয়া একেবারে শীলাবতী নদীগর্ভে নিপতিত হইল।

খল খল অট্ট হাস্য করিয়া ভীমরূপী হাড়্মা মশাল দূরে নিক্ষেপ করিয়া একেবারে নদীগর্ভে বাঘের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শীলাবতীর বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া মহারাজ বন্দুকধারী পল্টনদিগকে গুলি ছুড়িতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হাড়্মার আকুল প্রার্থনা, তাঁহার প্রাণের ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল "দে রাজা বাঘকে ঘিরে।" অন্ধকারে নদীগর্ভে দৃষ্টি চলে না—রাজাজ্ঞায় অনেকগুলি মশাল জ্বলিয়া উঠিল। রাজা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন হাড়্মার কি অমানুষিক শক্তি! ক্ষুদ্র বিড়ালশিশুকে মানুষ যেরূপ অবলীলাক্রমে করায়ত্ত করিয়া ফেলে অমিত বিক্রম-শালী হাড়্মা অতবড় হিংস্র বন্য ব্যাঘ্রকে মুষ্ঠাঘাতে নির্জীব করিয়া ফেলিল; তারপর—স্পন্দনহীন ব্যাঘ্রকে নদীর কিনারায় আনিয়া এক কামড়ে উহার গলার মাংস বিদীর্ণ করিয়া গলনির্গত রুধির ধারা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মহানন্দে পান করিতে লাগিল। মৃত ব্যাঘ্রের উষ্ণ শোণিত সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া হাড়্মা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর সহসা "ধাংড়ারে বাপ আমার কোথায় পড়ে আছিস্ বাপ, তোকে যে একদণ্ড বুক থেকে নামাই নি, আজ তুই ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছিস্" বলিয়া এক লম্ফে বাঁধ ডিঙ্গাইয়া যেখানে ধাংড়ার মৃতদেহ পড়িয়াছিল সেই খানে ছুটিয়া গেল।

ধাংড়ার রক্তাবৃত উলঙ্গ শবদেহ বুকে লইয়া হাড়্মা উদাস মনে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল—"এর মধ্যে অতদূরে চলে গেছিস্, আয় আয় আর একবার সেই রকম বাবা বলে ডাক—ধাংড়া রে বাপ আমার—তুই যেখানে গেছিস তোর বাপকেও নিয়ে চল—তোকে হারা হয়ে হাড়্মা এক লহমা স্থির থাকতে পার্ব্বে না।"

দক্ষযজ্ঞের পর মহাদেব যেরূপ ছিন্ন সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তের মত ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, হাড়্মাও সেইরূপ ধাংড়ার শবদেহ বুকে লইয়া গভীর জঙ্গল মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

ভগ্ন হৃদয়ে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

* * * *

তারপর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে; মহারাজ জঙ্গল মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও হাড়্মাকে দেখিতে পান নাই। হাড়্মার করুণ কাহিনী যখনই মনে উদয় হইত, মহারাজ অশ্রুত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেই এক গ্রীষ্মের রজনী, মহারাজ কক্ষের সমুদয় বাতায়ন খুলিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, হঠাৎ এক করুণ সুরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন জঙ্গলের পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়াইয়া কে যেন উদাস প্রাণে ডাকিতেছে—"ধাংড়ারে বাপ আমার, কত দীর্ঘ দিন তোকে দেখি নি বাপ, আয় বাবা একবার আমার বুকে আয়"। সে স্বর বহুদূর পর্য্যন্ত করুণ বেদনা ছড়াইয়া অনন্তের পথে মিশিয়া গেল। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

আজ ও নিশীথের সুপ্ত পল্লীর গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া উদাস বসন্ত বায়ুর মৃদুল হিল্লোলের সমবায়ে, ঝিল্লীর গম্ভীর মন্দ্রের সমভিব্যাহারে, ক্রন্দনরত শিশুর উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনির সঙ্গে, দূরাগত নির্ঝরিণীর অশ্রান্ত কলতানের সাহচর্য্যে কে যেন গহন কাননের শ্যামপল্লবপুষ্পবিদীর্ণকারী কণ্ঠে গগন-পবন কম্পিত করিয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে প্রাণের গোপন ব্যথা বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া দিয়া ডাকে—"ধাংড়ারে! ধাংড়ারে!"

প্রতীক্ষা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি এল্

আহা তাই হোক,—তাই হোক।
তৃষিত চাতক চাহিলই শুধু
এক কণা জল—নাই হোক্।
আশায় আশায় কাটিল জীবন
তাই হোক্।
এ জীবনে রব তপস্তা রত
ফিরে জনমেরি লাগি'
ফিরে জনমেও পাব না তোমারে
তৃষিতই রব জাগি?

তাই যদি হয় তাই হোক্ তবে
কোটি কোটি যুগ এই দাস রবে
তোমারি হে প্রিয় প্রতীক্ষা রত
তবু দরশন লবে;
তবু পাবে সে তোমারে একান্ত ক'রে
একদা, এ আশা র'বে।
মিটিবে মিটিবে মিটিবে তিয়াসা
চিরদিন প্রাণ ক'রে॥

জাতি-বিজ্ঞান

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(১)

বিবর্ত্তন-বাদ

বিবর্ত্তন বা Evolution বলিতে বিকাশ বুঝায়। বস্তুর অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার বিকাশই বিবর্ত্তন। বিবর্ত্তনের প্রক্রিয়ায় বস্তু নানা অংশে বিভক্ত হয়, এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত কোন শক্তির প্রভাবে সেই বিভক্ত অংশ সকল পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এমনভাবে কার্য্য করে যে, বহুত্বের মধ্যে একত্ব রক্ষিত হয়।

জগতের গঠন ও ইতিহাস সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যায়, ততই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জগৎ বিবর্ত্তনের প্রক্রিয়ায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। মানবের উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাসের সহিত পৃথিবীর উৎপত্তি ও উন্নতির ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূপৃষ্ঠস্থ স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবী-পৃষ্ঠে প্রাণি-জীবনের ইতিহাস ত্রিশ কি চল্লিশ কোটি বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ প্রায় চল্লিশকোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রাণি-জীবনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু প্রকৃতি-তত্ত্ববিদের হিসাবে পৃথিবীতে জীবের জীবন-কালের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প। সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোকের সম্ভাবিত (probable) স্থিতিকাল গণনা করিয়া তাঁহারা কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, পৃথিবীতে জীব-জীবনের সূত্রপাত মাত্র দুই কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, এবং কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত এক কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীব ছিল না। এ সম্বন্ধে আর একটি হিসাবও আছে—পৃথিবীর প্রাথমিক যুগের সমুত্তপ্ত প্রস্তরাবরণ, জল বায়ুর দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে যে সময় লাগিয়াছে, পণ্ডিতেরা সেই সময়ের একটা হিসাব

করিয়াছেন, এবং সেই তপ্ত প্রস্তরাবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্থলে, জীবের বাসোপযোগী sedimentary স্তর পড়িতে যে সময় লাগিয়াছে, তাহারও একটা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে। এই হিসাবানুসারে দেখা গিয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের স্তরাবলি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ফুট গভীর। এক এক ফুট স্তর পড়িতে যদি এক এক শতাব্দ লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীতে জীব জীবনের ইতিহাসের গণনা দুই কোটি যাট লক্ষ বৎসরের কম হয় না।

সমুদ্রের জল এখন যেরূপ লবণাক্ত, সেইরূপ লবণাক্ত হইতে, সমুদ্রে যে পরিমাণ লবণ সঞ্চিত হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা একেবারেই সঞ্চিত হয় নাই। তাহা সমুদ্রের জলে ক্রমশঃ কি পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে, মানুষ তাহারও একটা হিসাব করিয়াছে। সেই হিসাবানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সমুদ্রের বয়স নয় কোটি বৎসরের কম নয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই সকল গণনায় কিছুই ঠিক পাওয়া যাইতেছে না। পণ্ডিতেরা এখন ক্রমশঃ বুঝিতেছেন যে, এই ভাবের গণনায় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া—যায় না। কিন্তু Radiumএর আবিষ্কার হওয়ার পর, এইরূপ গণনার একটা সুযোগ হইয়া পড়িয়াছে। Radium হইতে অনবরত আলোক এবং উত্তাপ বিনির্গত হয়। এই প্রক্রিয়ায় Radiumএর অণুসকল ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া ভৌতিক শক্তিতে পরিণত হয়। Radiumএর অণুসকলের যে ভাবে এবং যে পরিমাণে বিচ্যুতি হয়, তাহার একটা হিসাব করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, পৃথিবীতে জীব-নিবাস অন্ততঃ চল্লিশকোটি বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের হিসাবই, Radium-সংক্রান্ত হিসাবের দ্বারা সমর্থিত হয়। ভূপৃষ্ঠ যে এক সময় উত্তপ্ত এবং তরল ছিল, ইহা এখন সর্ব্ববাদি-সম্মত মত। এই তরল ভূপৃষ্ঠ কঠিন হইয়া সমুত্তপ্ত প্রস্তরাবরণরূপে (igneous rock) পরিণত হয়। তারপর পৃথিবীর উপরিভাগের বাষ্প যখন জলে পরিণত হয়, এবং পৃথিবীর উপরে বায়ুমণ্ডল প্রস্তুত হয়, তখন সেই জল পৃথিবী-পৃষ্ঠে বর্ষিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ নদী এবং সমুদ্রে পরিণত হইয়া পড়ে। নদী এবং সমুদ্রের জল প্রবহমান হইলে, এবং বায়ুমণ্ডলস্থ বায়ুও প্রবহমান হইলে, জল এবং বায়ুর সংঘর্ষে ভূপৃষ্ঠস্থ কঠিন প্রস্তরাবরণ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জলের স্রোতে পৃথিবীর কঠিন প্রস্তর আবরণ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া বালি এবং কর্দ্দমে পরিণত হইতে লাগিল এবং সেই বালি এবং কাদা স্রোতের বশে সমুদ্র এবং হ্রদের তলায় যেখানে সুবিধা পাইল সঞ্চিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর জনক সূর্য্য। পৃথিবীর জন্মকালে পৃথিবী যখন সূর্য্য হইতে উৎপন্ন ও উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন পৃথিবী মণ্ডলাকার উত্তপ্ত তরল বাষ্পপিণ্ড। পৃথিবী তখন জীব-বাসের উপযোগী ছিল না। তারপর সেই মণ্ডলাকার উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ডের মধ্যখণ্ড, চতুঃপার্শ্বস্থ মণ্ডলাকার অংশ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। মধ্যখণ্ড ক্রমশঃ শীতল হইয়া কঠিন হইতে থাকে, কিন্তু মধ্য-খণ্ডের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী মণ্ডলাকার বাষ্পরাশি, আর এক ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মধ্যখণ্ডের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী মণ্ডলাকার বাষ্পরাশি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বারি-বাষ্প এবং বায়ুমণ্ডলে পরিণত হইল। বারিবাষ্প জলরূপে, শীতলতা-বশতঃ কঠিনতাপ্রাপ্ত মণ্ডলাকার মধ্যখণ্ডের উপর বর্ষিত হইয়া, উহাকে হ্রদ-নদী-সমুদ্র-সমাকীর্ণ ভূপৃষ্ঠে পরিণত করিল। ইহাই পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব ইতিহাস। এখন পৃথিবী কোন্ সময়ে, কেমন করিয়া জীবকুলের নিবাসভূমি হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে আজ হইতে প্রায় ৪০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী জীব-নিবাসের উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু জীবের আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল, তাহাই এখন আলোচ্য।

এ সম্বন্ধে দুই দিক্ দিয়া দুই প্রকার চিন্তা-প্রণালী প্রসারিত হইয়াছে। চিন্তার একটী প্রণালী এই যে, জড় পরমাণু এবং জড় শক্তি ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। এই সমগ্র জগতের যাহা কিছু, এই জড় পরমাণু এবং জড় শক্তির মধ্যে অবস্থিত ছিল। এক একটী পরমাণু শক্তির আধার, সুতরাং সতত চঞ্চল এবং প্রতিনিয়ত গতিশীল। তাহাদের মধ্যে কোনটী কোনটীকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং কোনটী কোনটী হইতে তফাতে যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহাদের গতিবিধি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে, এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় প্রকাণ্ড বিশ্ব গঠিত হইয়া পড়িয়াছে। জীবেরও এই ভাবেই সৃষ্টি। একটী protoplasmic cell সকল জীবের আদি পুরুষ। কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অণুসকল পরস্পর পরস্পরের সংসর্গে ও সংঘর্ষে আসিয়া হঠাৎ একদিন পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে এরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়া পড়িল যে, একটী প্রাথমিক জীবকোষে পরিণত হইয়া পড়িল। সেই অবধি এই পৃথিবী জীবের আবাস-ভূমি হইল। প্রাথমিক জীবকোষই পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম আদি জীব। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জীবই, এই প্রাথমিক জীবকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মানুষের উৎপত্তির আসল কারণ কি, কি ভাবে মানুষ উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে এই মতানুসারে যে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। মানুষের উৎপত্তির জন্য যে বিবর্ত্তনের প্রয়োজন একটী primordial germ cellএ তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কিন্তু জড়পরমাণু হইতে জীবের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইতে পারে তাহা অনেকের বুদ্ধির অগম্য; সুতরাং আর এক চিন্তা-প্রণালী অনুসারে জীবের উৎপত্তির কারণ স্বতন্ত্র। জীব জীব হইতেই জন্মিতে পারে, জীব ব্যতীত জীবের উৎপত্তির পরিচয় অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, যতই নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে, ততই যেন মনে হইতেছে, জড়ত্ব জীবত্বে পরিণত হইতে পারে না। এখন জীবত্বের উৎপত্তির কারণ, বিজ্ঞানের অনধিগম্য বিষয়ে পরিণত হইতেছে, সুতরাং এখন ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। জড় পরমাণু জীবের শরীরের উপাদান হইতে পারে; শরীর গঠন আরম্ভ হইবার পর, গঠন প্রক্রিয়া চলিতে চলিতে, শরীর যখন জীবনের উপযোগী আধাররূপে পরিণত হয়, তখনই শরীরে জীবনের আবির্ভাব হয়।

এখন প্রধান জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব মূলে একই জাতীয় কি বহু জাতীয়? ঈশ্বর কি প্রথমে একই জাতীয় জীবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অথবা পূর্ব্বে কি বিবর্ত্তন-প্রক্রিয়ার সূত্রে একই প্রকার জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল? না, বহু প্রকার জীব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল? জড়বাদ অনুসারে জড় পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিন্যাসে স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবের উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে; সজীবতা-বাদ অনুসারেও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবোপাদান হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতীয় জীবের উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে; অথবা একই প্রকার জীবোপাদান হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জীবের উৎপত্তিও অনুমান করা যাইতে পারে। যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জীব ভিন্ন ভিন্ন কালে, বা একই সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা স্থান-বিশেষে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে মানুষ যে একেবারে স্বতন্ত্র জীব একথা বলিতে পারা সহজ হইয়া পড়ে। আমরা দেখি, বংশ-বিশেষে, বিশেষ বিশেষ প্রকার জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এখন এইরূপ হয় বলিয়াই, যখন বংশগঠন সম্পূর্ণ হয় নাই, বা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, তখনও যে তাহাই হইত, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

জড় পদার্থসকলের কতকগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং কতকগুলি অনুমানগ্রাহ্য। কিন্তু অনুমানগ্রাহ্য জড় পদার্থের বিষয়, এখন ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; কারণ সেগুলির অস্তিত্ব আমরা কেবল অনুমানই করি, এখনও পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হয় নাই। আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য জড়পদার্থগুলি যে আছে, তাহা আমরা কি ভাবে জানিতে পারি? সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির সাহায্যে আমাদের জ্ঞান-গোচরীভূত হয়। যদি আমাদের জ্ঞান-গোচরীভূত না হইত, আমরা তাহাদিগকে জানিতে পারিতাম না। আমাদের জ্ঞানের ভূমি অতিক্রম করিলে, আমাদের পক্ষে তাহাদের থাকা না থাকা সমান হয়। কিন্তু তাহারা কি? আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কি? তাহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় মাত্র আর কিছুই নহে। তাহারা যে স্বতন্ত্র কিছু বা স্বতন্ত্র প্রকার কিছু, ইহা আমাদের কল্পনা। জড় বস্তুসকল—যাহা আমরা দেখি বা যাহা অনুভব করি—তাহারা যে, আমরা

যাহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র এবং আমাদের বাহিরের বস্তু, তাহা কোন দার্শনিকই প্রমাণ করিতে পারেন না। অথচ আমরা যাহা দেখি বা অনুভব করি, তাহা যে একেবারে কিছুই নয়, তাহাও তো বলা যায় না। আমাদের ইচ্ছা হউক বা না হউক, আমাদের ভাল লাগুক বা না লাগুক তাহা আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হইয়া থাকে। ইহা একেবারে কিছু না হইয়াই বা কেমন করিয়া যায়? সেই কারণে অনেক পণ্ডিতের অনুমান, ইহা এমন কোন অনির্ব্বচনীয় এবং অচিন্তনীয় এক শক্তি, যাহা আমাদিগকে অনুভব করিতে, দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে বাধ্য করে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জড়বাদ কোথায় ভাসিয়া যায়। আজকাল জড়বাদীও একপ্রকার শক্তিবাদী হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু জড়বাদী জড়ভাবের এমন বশবর্ত্তী যে, তিনি তাঁহার শক্তিকেও জড়ভাবাপন্ন না করিয়া বুঝিতে পারেন না। তিনি বলেন জড়শক্তিই বিশ্বের মূলাধার। কিন্তু আজকাল ক্রমশঃ সবই উল্টিয়া পাল্টিয়া যাইতেছে; শক্তির রাজ্যে জড়ত্বের অধিকার আর থাকিতেছে না। এখন সময় এমনই আসিয়া পড়িয়াছে যে, আর আমরা শক্তিকে আত্মশক্তি ব্যতীত অপর কিছুই বুঝিতে পারি না। বিশুদ্ধ জড়বাদ শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হয়। জড়বাদ বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায় এই যে, যাহা দেখা যাইতেছে এবং অনুভব করা যাইতেছে বা অনুমান করা যাইতেছে, তাহা আছে; কিন্তু যে দেখিতেছে, অনুভব করিতেছে বা অনুমান করিতেছে সে নাই। জড়বাদীর মতে জ্ঞান পদার্থও জড়োপাদান-সম্ভূত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, জড়োপাদানের অতিরিক্ত জ্ঞান বলিয়া কিছুই থাকে না, অর্থাৎ জ্ঞানের পারমার্থিক অস্তিত্ব অসিদ্ধ হয়; সুতরাং জড়বাদীর জ্ঞানের কিছুমাত্র মূল্য থাকে না। কাজেই এই মূল্যহীন জ্ঞানে জড়বাদীর যে সিদ্ধান্ত তাহারও মূল্য থাকে না। অতএব বলিতে হয় যে, জড়বাদ শূন্যবাদে পর্য্যবসিত হয়। শূন্যবাদের তাৎপর্য্য এই যে, কিছুই নাই। যদি কিছুই না থাকে তাহা হইলে জড়বাদীর জড়তত্ত্বও থাকে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে জড়াত্মবাদের সমন্বয়বাদের সমুচিত খণ্ডন করিবার স্থানও নাই, প্রয়োজনও নাই। জড়াত্মবাদের সমন্বয়বাদের সহিত বিসংবাদ না করিয়া আপাততঃ জড়পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়াই ভাল।

জীবতত্ত্বের (Biology)র একটী সিদ্ধান্ত এই যে কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সংযোগ-বিয়োগের ক্রিয়া হইতে অবস্থা বিশেষে একটী জীবকোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবকোষই প্রাথমিক জীব। আমরা যাহাকে প্রাণশক্তি বা vital force বলি তাহা একটী complex mechanism of force ছাড়া আর কিছুই নহে। এই প্রাণশক্তি বা vital forceএর উন্নতির কোন ক্রমে ইহার কিয়দংশ মনে পরিণত হয়, এবং মনের ক্রম বিকাশের কোন ক্রমে মনের কিয়দংশ soul বা জীবাত্মায় পরিণত হয়। জীবন আর কিছুই নয়—একটী complex mechanism of force. অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীবে শুধু ইহাই থাকে—মন বা আত্মার সহিত সে স্তরের জীবের কোন সম্বন্ধ নাই। জীবন যেমন একটী mechanism, ইহার যেমন গঠন হয়, তেমনই ইহা ভঙ্গপ্রবণও বটে। উচ্চতর জীবেরা ক্রমোন্নতির ফলে, প্রাণ এবং মন উভয়েরই অধিকারী হয়, কেবল একমাত্র মানুষ ক্রমোন্নতির ফলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া আত্মবান্ হইয়াছে।

(২)

মানবের ক্রমবিকাশ

মানবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ব্যাপারের অনুশীলনে Churchward, Guiffrida Ruggeri প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বেশ একটু অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। আফ্রিকা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সম্প্রতি যে সমস্ত আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে এসিয়া যে মানবজাতির আদিম নিবাস ছিল অথবা এসিয়া হইতেই মানবজাতি প্রথমে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তৎপক্ষে বিশেষ সন্দেহ আনিয়া দিয়াছে। ইয়ুরোপের পশ্চিমাঞ্চলে অথবা সম্ভবতঃ Great Britainএই যে মানব সত্ত্বার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাইবে Reid Moir প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রমাণ সহকারে তাহাই প্রচার করিতেছেন। আফ্রিকায় মানব যতদিন বাস করিতেছে

বলিয়া পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলেন, এখন দেখা যাইতেছে তাহারও বহুপূর্ব্ব হইতে আফ্রিকায় মানব-নিবাস। Nebraskaয় Harold J. Cook জীবাশ্মীভূত যে দন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন, Henry Fairfield Osburn তাহা সুপ্রাচীন যুগের বলিয়া স্বীকার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে একটী নূতন মানব-জাতির (Humanoid Species) অস্তিত্ব সূচিত করিয়া দিতেছে। Agateএর নিকট Cookএর আবিষ্কৃত Molar দন্ত নিম্নতর (অর্থাৎ পরবর্ত্তী) Pliocene স্তরের বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকান বানর (monkey) অথবা এসিয়া বা ইয়ুরোপের বানরের (ape) সহিত ইহার আদৌ সম্বন্ধ নাই। ইহা মানবোপম কোন জীবের। Prof. Osburn ইহার নাম দিয়াছেন,—"Hesperopithecus haroldcookii।" এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব আদর্শটী (type) Hesperopithecus বা Higher Primatesএর প্রকারভেদ বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা Chimpanzee, Pithecanthropus ও মানবের সহিত সম্পর্কিত। এই জীবাশ্মের গভীরভাবে অনুশীলন করিয়া সম্প্রতি সিদ্ধান্ত এইরূপ হইয়াছে যে, মানব, Pithecanthropus, Hesperopithecus এবং Anthropoid একটী Superfamily শ্রেণী গঠন করে। Cercopithecoidea অর্থাৎ এসিয়া বা ইউরোপের বানরের (Old world ape) সহিত তুলনা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ এই শ্রেণীর নাম দিয়াছেন Hominoidea।

আফ্রিকা মহাদেশে ১৯২১ সালে একটী করোটীর (Skull) আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা মানবের একটী নূতন প্রকারভেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। এই নূতন আদর্শ রোডেসীয় মানব বা Homo Rhodensiensis। Neanderthal মানবের করোটীর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু La Chapelle অপেক্ষা ইহা অধিকতর মানবীয় ধরণের। এই করোটীটি পরীক্ষা করিয়া একটী সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। বোঝা গিয়াছে যে, এই করোটী যে জীবের তাহার বৃহৎ মানবীয় মস্তিষ্ক (brain case) এবং মুখ খুব বড় মনুষ্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট মর্কট জাতীয় (Simian)। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। এই করোটী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় মানব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অন্য জাতীয় মানব দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছিল। আর অধিক কিছু বোঝা যায় না। তবে এই আবিষ্কারে মানবের উৎপত্তি সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

তৃষ্ণা

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(১)

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শীলভদ্র যেদিন নব-যৌবনে সংসারের সমস্ত মায়া পরিহার করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের কাতর ক্রন্দনে বধির হইয়া, বন্ধু-বান্ধবের সোহাগ-ভালবাসা উপেক্ষার চোখে চাহিয়া এক বালারুণ-কিরণ-বিহসিত বাসন্তী প্রভাতের কুসুমোজ্জ্বল রমণীয়তায় পাটলীপুত্র নগরের বহিঃসীমা অতিক্রম করিয়া হিমগিরির নিবিড় কন্দরের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, তখন মায়া-মোহ-বিজড়িত পাটলীপুত্রবাসী এই নবীন সন্ন্যাসীর জন্য অন্তরে দুঃখ প্রকাশ করিলেও, বাহিরে তাহার প্রব্রজ্যার সফলতা কামনা করিয়া ভগবান্ বোধিসত্বের নিকটে ব্যাকুল প্রার্থনায় তাহাদের মনোভাব নিবেদন করিয়াছিল। সেই দিন তরুণ সন্ন্যাসীর চোখে বিশ্ব-সংসার কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু

সেই তামসী যবনিকা ভেদ করিয়া, জড় জগতের কঠোর স্থূলত্ব অপসারিত করিয়া পরিব্রাজকের মনে তাহার বাল্য সখা তৃষ্ণার করুণ কাতর চোখ দু'টি নিশীথের অবগুণ্ঠন-মোচনকারী উষার আলোকছটার মত ফুটিয়া উঠিতেছিল। পথ চলিতে চলিতে শীলভদ্রের মনে হইতেছিল,—তৃষ্ণা যে তাহারই দিকে পথ চাহিয়া আছে। যখন সে শুনিবে, শীলভদ্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্বের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তখন কি দুঃখ হইবে তাহার মনে, কত ব্যাকুল হইবে তাহার প্রাণ! নিঃশঙ্কচিত্ত পথিকের মাথায় হঠাৎ শারদাকাশ বিদীর্ণ করিয়া বজ্র নিপতিত হইলে তাহার যেমন অবস্থা হয়, তৃষ্ণার অবস্থাও যে তাহাই হইবে! কেমন করিয়া সহ্য করিবে সে এ কঠোর বিরহ!

যখনই কোন গ্রামের মধ্য দিয়া শীলভদ্র যাইতেছিল, অমনি গ্রামবাসীরা এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল; যেন ভগবান্ বোধিসত্ত্ব নব কলেবর ধারণ করিয়া পুনরায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। —আর সকলে নবীন সন্ন্যাসীকে তাহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছিল। যে গৃহে শীলভদ্র ভিক্ষা গ্রহণ করিত, সে গৃহের রমণীকুল তাহাকে প্রব্রজ্যা পরিত্যাগ করিয়া সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য কতই কাতর অনুরোধ করিত! অনেকে তাহাকে তাহাদের গৃহে থাকিবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করিত! আর সেই রমণীকুলের কাতর ক্রন্দনে শীলভদ্রের মনে তৃষ্ণার কথা জাগিয়া উঠিত—তাহার রূপ, তাহার যৌবন, তাহার ভালবাসা! সে ত ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উপভোগ করিতে পারিত—কিন্তু কি আছে তাহাতে? এই রূপ শুষ্ক ফুলের মত ঝরিয়া পড়িবে অনাদরে, অবহেলায়; যৌবন শুষ্ক হ্রদের বারিরাশির মত কোথায় নিমেষে অন্তর্হিত হইবে; কি মূল্য আছে ভালবাসার? যাহার অর্থ আছে, সম্পদ্ আছে, রূপ আছে, যৌবন আছে, প্রভুত্ব আছে, তাহাকেই সকলে ভালবাসে; কিন্তু ঐ পথিপার্শ্বে নিপতিত গলিত কুষ্ঠ রোগী—কে উহাকে ভালবাসে?—তবে কি হইবে এ নশ্বর ক্ষণস্থায়ী মৃগতৃষ্ণিকায়?—না—কিছুতেই না—ফিরিবে না শীলভদ্র সংসারে, মায়া-মোহের কঠোর নিগড়ে।

দূরে চক্রবালে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তিমিরবিধ্বংসী পূর্ব্বাকাশের লোহিতচক্র, কিরণজালে ধরণীর পাণ্ডুরমুখে হাস্যরেখা ফুটাইয়া। শীলভদ্র ভাবিতেছিল—ঐ ত ভগবান্ বোধিসত্ত্বের আহ্বান সূর্য্যের লোহিতরাগে তাহাকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিতেছে, ঐ ত শ্যামল বৃক্ষশীর্ষের উপরিভাগে কি অপরূপ স্বর্ণ মুকুট শোভা পাইতেছে; শ্যামল দূর্ব্বাদলে শিশির-বিন্দু ভগবান্ বোধিসত্ত্বের পূজার ডালি সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিছে সে শুভ মুহূর্ত্তের, কখন কোন লগ্নে এ ব্যর্থ দুর্ব্বল জীবনের উপর দিয়া সফলতার ঢেউ বহিয়া যাইবে, বোধিসত্ত্বের চরণতলে আত্ম নিবেদন করিয়া ধন্য হইবে।

ক্রমশঃ লোকালয় পরিহার করিয়া শীলভদ্র গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছিল; সম্মুখে নীল হিমাদ্রি তুষার মুকুট পরিধান করিয়া এক বিরাট্ সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির মত প্রতীয়মান হইতেছিল। ঘন সন্নিবদ্ধ দীর্ঘ শাল তরুর শ্রেণী নৈশচন্দ্রালোকে আরব্য রজনীর প্রেতমূর্ত্তির মত আতঙ্ক বিস্তার করিতেছিল, আর শীলভদ্র দেখিতেছিল যেন ঐ ভৈরব মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রসাদ লাভের জন্য যুগাযুগান্তর ধরিয়া গভীর ধ্যানে একাগ্র চিত্তে সাধনায় অভিনিবিষ্ট! ক্রমে ক্রমে শীলভদ্র ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া তিব্বতে উপনীত হইল এবং হেমাম্ভোজপ্রসবিনী মানস সরসীর তীরে সিদ্ধ মহাপুরুষ রাধাগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনায় ব্রতী হইয়া গেল।

উঃ সে কি কঠোর সাধনা! দুরন্ত শীতে মানস সরোবরের জল তুষার স্তূপে পরিণত হইয়াছে; তরুলতা পর্য্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন; যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর এক বিরাট্ শুভ্র তুষার ক্ষেত্র!—তাহাতে মানব নাই, পশু নাই, বৃক্ষ-লতা নাই, শুধু—তুষার মরু! আর তাহার মধ্যে একা সঙ্গীহীন শীলভদ্র ভগবান্ বোধিসত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন! সূর্য্যাস্তের পর হইতে তুষাররাশির মধ্যে সমগ্র দেহ প্রোথিত হইয়া যাইত; আর পরদিন সূর্য্যোদয়ে তুষাররাশি বিগলিত হইয়া মাঝে মাঝে শীলভদ্রের নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির নিশ্চল দেহ আকাশনীলিমার নিম্নে চোখে পড়িত; আবার অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গে তুষারে আবৃত

হইত! গ্রীষ্মের প্রখর তাপে উত্তপ্ত পর্ব্বতবক্ষ মানব-পশুপাখী পরিহার করিয়া ছায়াশীতল বৃক্ষমূলে নির্ঝরিণীতীরে বিশ্রাম করিত; কিন্তু শীলভদ্র সমভাবে ধ্যাননিরত! বর্ষার বারিধারা সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া, পর্ব্বতবক্ষ ধৌত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণদেহ পুষ্ট করিতে করিতে সুদূর বঙ্গের দিকে প্রধাবিত হইত; কিন্তু শীলভদ্র তেমনি একাগ্র ধ্যানের বলে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া কঠোর সংযমের মূর্ত্তিমান্ অবতাররূপে স্থানীয় সাধুসন্ন্যাসীর নিকট পরিচিত হইয়া উঠিতেছিল।

ধ্যানের প্রথম স্তরে শীলভদ্র দেখিল—তাহার বিবেক জাগিয়া উঠিয়াছে; যে বিবেকের তাড়নায় সংসারের নশ্বরত্ব অবলোকন করিয়া সে বৈরাগ্যের সহচররূপে মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া এই কঠোর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছে, এ সে বিবেক নহে;—এ বিবেক যেন স্বতন্ত্র বস্তু—বীক্ষণকারী আলোকের তীব্র ছটা যেমন অতি ক্ষুদ্র বস্তুটিকেও সুপরিস্ফুট করিয়া তোলে, তেমনি এ বিবেক অলৌকিকভাবে এ জড়জগতের এক নিত্যানিত্যের জ্ঞান প্রদান করিতেছে;—ধ্যানের আলোকে শীলভদ্র দেখিল বিশ্বসংসার অনিত্য; চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহতারা নীল আকাশে উঠিতেছে; আবার ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে; বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল এবং ফল হইতে পুনরায় বীজ উৎপন্ন হইতেছে; এইরূপে একটি অনন্ত পরিবর্ত্তনের চক্র অবিরাম ঘুরিতেছে। যাহা আজ সত্যরূপে প্রতিভাত, কাল, নিয়তিচক্রের অবিরাম ঘূর্ণনের বলে তাহা মিথ্যারূপে পরিণত; যে বস্তু এই মুহূর্ত্তে নিত্যের বেশ ধারণ করিয়া মনকে মুগ্ধ করিতেছে, পর মুহূর্ত্তে তাহা অনিত্যের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে! সুতরাং এ পরিবর্ত্তনশীল জগৎ সত্য নহে; কাজেই নিত্যও নহে; তবে কি নিত্য? এই পরিবর্ত্তনের অন্তরালে, এই অনিত্য যবনিকার অভ্যন্তরে এমন কিছু আছে, যাহা নিত্য, যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা সত্য, স্থির। কি সে?—নির্ব্বাণ!

ধ্যানের অমিত প্রভায় একদিন শীলভদ্রের চোখে ফুটিয়া উঠিল—দূর দিগন্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিতেছে এক উন্মাদিনী নারী, খল্ খল্ হাস্যে দশ দিশি মুখরিত করিয়া, ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে গ্রহ-নক্ষত্র কাঁপাইয়া, নীলসিন্ধুর অসীম জলরাশি মথিত করিয়া, তরু-লতা বন-বনানী ওলট্ পালট্ করিয়া শীর্ণ বাহুলতা বাড়াইয়া তাহারই দিকে! সে মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল শীলভদ্র—এ যে তাহারই পরলোকগতা জননী! আহা! কত দিন সে তাহার মাকে দেখে নাই!—নারী ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল শীলভদ্রের সম্মুখে—চক্ষু দিয়া অগ্নিকণা নির্গত হইতেছে; নিশ্বাসে প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে; "আয় বাছা" বলিয়া সে মূর্ত্তি শীলভদ্রকে জড়াইয়া ধরিতে অগ্রসর হইল। অমনি পলকে শীলভদ্রের বিদ্রোহী অন্তর কম্পিত করিয়া বিবেকের তীব্র তিরস্কার-বাণী জাগিয়া উঠিল—কহিল—"কে এ নারী?"

শীলভদ্র উত্তর করিল—"আমার মা!"

বিবেক কহিল—"কি সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে?"

শীলভদ্র বলিল—"এঁর গর্ভে আমার জন্ম হয়েছে।"

বিবেক—"তার পর"

শীলভদ্র বলিল—"এঁর স্তন্য পান করে আমার দেহ বর্দ্ধিত হয়েছে।"

বিবেক—"তোমার জন্মের পূর্ব্বে এঁর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ ছিল কি?"

শীলভদ্র—"না,"

বিবেক—"এখন ইঁহার দেহান্তে তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে কি?"

শীলভদ্র—"না।"

বিবেক—"সুতরাং যে সম্বন্ধ দেহের নাশের সঙ্গে লীন হয়ে যায় এবং দেহের উদ্ভবের পূর্ব্বেও বর্ত্তমান থাকে না, সে সম্বন্ধ ত নিত্য নয়; সে সম্বন্ধের মায়ায় মুগ্ধ হওয়া মূঢ়ের কার্য্য; চেয়ে দেখ, ঐ নারীমূর্ত্তি অবিদ্যা; তোমার অভীষ্ট পথের অন্তরায়।" এইবার শীলভদ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই মাতৃস্বরূপিনী নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিতেই তাহা যেন কোন সীমাহীন মহাশূন্যে লীন হইয়া গেল। শীলভদ্র পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইল।

আর একদিন বাসন্তী সন্ধ্যার লোহিতাভা পশ্চিমাকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুদূর কুঞ্জ কাননের পুষ্পগন্ধ বহন

করিয়া অলস মন্থর বায়ু ছুটিয়া চলিয়াছিল কোন দূর দিগন্তের বিরহী হৃদয়ে শান্তি-ধারা ঢালিয়া দিতে। মাঝে মাঝে কোকিলের পঞ্চম তান শ্যামল ধরণীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হৃদয়ে কি যেন একটা হারাণ কাহিনীর সন্ধানে ব্যর্থ প্রয়াসের দুঃখ জাগাইয়া তুলিতেছিল। এমন সময় শীলভদ্রের ধ্যান-স্তিমিত নেত্রপথে প্রকটিত হইল—নবযৌবনপুষ্টদেহা পীনোন্নতবক্ষা কুসুম-বাসপরিহিতা তন্বী শ্যামা শিখরিত-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী তৃষ্ণা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহার সম্মুখে অনন্ত রূপসম্ভার লইয়া, মহা সমুদ্রের অসীম নীল জলরাশির উপর নিপতিত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ধারার মত, উষার উদয়াচলে সূর্য্য-বিম্বের প্রথম প্রকাশের গরিমার মত, দেবাসুর-দ্বন্দ্ব-সমুদ্ভূত বিশ্বজন-মন-মুগ্ধকারী ভগবানের মোহিনী মূর্ত্তির মত! সে মূর্ত্তি কাতর দৃষ্টিতে অপলকে শীলভদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, যেন নীরব ভাষায় গভীর দুঃখ নিবেদন করিয়া বলিতেছে—"ওগো এস এ ভাঙ্গা বুকে; তোমারি আশায় কাটিয়া গেল এ ব্যর্থ যৌবন, এ ব্যর্থ জীবন, এ অসীম রূপোচ্ছ্বাস! এস একবার তাকে সফল করে যাও।"

শীলভদ্রের ধ্যানপথে আবার সমস্ত বাল্য স্মৃতি বর্ষার জলধারা সিঞ্চনে সুপ্ত বীজের মত অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। বিগলিত হইতে চাহিল তাহার মন ঐ রমণীর ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির দিকে; অমনি বিবেক গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কে ঐ নারী?"

শীলভদ্র—"আমার বাল্য সখা।"

বিবেক—"কেন ইহার দিকে তোমার মন আকৃষ্ট?"

শীলভদ্র—"ইহার কাতরতা নিরীক্ষণ করিয়া।"

বিবেক—"মিথ্যা কথা, তুমি ইহার রূপে মুগ্ধ হয়েছ।"

শীলভদ্র—"যদি তাই হয়, তবেই বা দোষ কি?"

বিবেক—"বল কি! দোষ নেই? তুমি যে বল্‌ছ নারীর রূপে মুগ্ধ হয়েছ, সত্যই কি ঐ নারীর রূপ আছে?"

শীলভদ্র—"আছে বৈকি? নইলে দেখ্‌ছি কি করে?"

বিবেক—"যা দেখ্‌ছ তা সত্য নয়, ভ্রান্তি; যেমন মরুভূমির অনন্ত ধূসরতার মাঝখানে মরীচিকা সরোবর সৃষ্টি করে, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত পথিক তাকে সত্য মনে করে' পশ্চাৎ-ধাবিত হয়ে অনর্থক কষ্ট পায়, এ নারীর রূপও তাই; এ সত্য নয়; সত্যরূপে প্রতিভাত মিথ্যা,—আরও দেখ যা সত্য, তা চিরদিন সত্য; সকলের নিকট সত্য; কিন্তু যার চক্ষু নেই, তার কাছে, এ নারীর রূপ কিছুই নয়; তারপর যে নারী তোমার চোখে সৌন্দর্য্য-প্রভা বিস্তার করে তোমার মনকে মুগ্ধ করচে, সে নারী হয়ত অন্যের চোখে কুৎসিতা-রূপে প্রতিভাত; তবেই দেখ—এ সৌন্দর্য্য, অনিত্য, ভ্রান্তি; জগতের শব্দ-স্পর্শরূপ-রস-গন্ধের সঙ্গে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান উৎপন্ন; এই জ্ঞানই সুখ-দুঃখের মূলীভূত; জন্ম-জন্মান্তরগত সংস্কার-পরিপূর্ণ মন এই বাহ্য জগতের উপাদানসমূহে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই ভ্রান্তি উৎপাদন করে। আরও দেখ এই সৌন্দর্য্য নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী; দুরন্ত ব্যাধি এইরূপ যদি হরণ করে, তখন ঐ নারীর প্রতি তোমার ঐরূপ অনুরাগ থাকা সম্ভব হবে না; কিম্বা যদি নারী কালবশে মরণকে আলিঙ্গন করে, তখন ঐ নির্জ্জীব দেহে তোমার ভালবাসা আকৃষ্ট হবে না—এ নিশ্চয়। কিম্বা যদি এর চেয়েও কোন সুন্দরী তোমার নিকট তার নব যৌবনের উপহার নিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখনও এর প্রতি তোমার অনুরাগ থাক্‌বে বলে বোধ হয় না; সুতরাং যা বৈশাখী আকাশের মত চঞ্চল, পরিবর্ত্তন-শীল, তা কখনো সত্য হ'তে পারে না। তা মিথ্যা, ভ্রান্তি, অবিদ্যা! দূর কর এ মোহ; এ তোমার অভীষ্ট পথের অন্তরায়।"

বিবেকের তীব্র কশাঘাতে নির্ম্মলীকৃত চিত্তে যখন ঐ নারীমূর্ত্তির দিকে শীলভদ্র তাকাইল, অমনি সে মূর্ত্তি অরুণোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত দূর দিগন্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। শীলভদ্র পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইল। . . . .

পরদিন প্রভাতে শীলভদ্রের গুরুদেব রাধাগুপ্ত আসিয়া শীলভদ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বৎস তুমি দুটি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সফল হোক তোমার কঠোর সাধনা, ভগবান্ বোধিসত্ত্ব তোমাকে কৃপা করুন।" নিবৃত্ত হইল না ধ্যানপথে শীলভদ্র; আরও, আরও অগ্রসর হইয়া চলিল। ক্রমে ধ্যানের দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হইয়া শীলভদ্র দেখিল বিশ্বময় 'একোতিভাব,'—বিশ্বময়

অনন্ত সত্ত্বার প্রবাহ-লীলা অবিরাম চলিতেছে—কোন অনাদিকালে এ লীলার আরম্ভ হইয়াছিল, কে বলিবে? মহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষে যেমন অন্তহীন উর্ম্মিমালা একবার উঠিতেছে, একবার বিলীন হইয়া যাইতেছে, তেমনি এই সংসার-বক্ষে অনন্ত আত্মা জন্ম ও মৃত্যুচক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে; জড় ও চৈতন্যের সংযোগ-ফলে এ অপরূপ লীলা দিন-রাত্রির বিশ্বরঙ্গভূমে অপরূপ তালে অপরূপ ভঙ্গীতে নৃত্যের মত বহিয়া যাইতেছে; একই আত্মা বহু জন্মের ভিতর দিয়া, বহু জড়বস্তু-সংযোগের মধ্য দিয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছে। বহু জন্ম যেন একই সূত্রে গ্রথিত কুসুম-পুঞ্জের মত একই আত্মার লীলারূপে শীলভদ্রের মানস নেত্রপটে প্রতিবিম্বিত হইল। দেখিল শীলভদ্র প্রজ্ঞানেত্রে ধ্যানের লোকবিমোহন আলোকছটায় কর্ম্মফলই এই জন্মান্তরের হেতু; কর্ম্মফলে যে সত্ত্বা আজ মনুষ্য-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভোগসুখে গর্ব্বিতচিত্তে ধরাধামে বিচরণ করিতেছে, পরজন্মে হয়তঃ সে সত্ত্বাই তির্য্যক যোনিতে প্রবিষ্ট হইতেছে,—কর্ম্মফলের পরিণতি রূপে একই সত্ত্বা বিভিন্ন যোনিতে বিভিন্ন জন্মে পরিভ্রমণ করিতেছে।

আবার ধ্যানের প্রবাহ প্রবাহিত হইল; এইবার ধ্যানে শীলভদ্র দেখিল আত্মা জন্মমৃত্যুর অতীত; আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। বিশ্বময় এক মহা চৈতন্যের বিরাট্ সত্ত্বা জড়চেতনরূপে অভিব্যক্ত; আত্মার সুখ নাই, দুঃখ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই—সমস্ত দ্বন্দ্বনির্ম্মুক্ত আত্মা অক্রিয়, অস্পন্দ, উপেক্ষক, আসক্তিরহিত; বাসনার মায়াজালে যে মুহূর্ত্তে বিজড়িত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা দুঃখসুখের অধীন হইয়া জড়-চেতনরূপে বিশ্বরঙ্গভূমে অভিনেতার আকারে উপনীত হয়। এই স্তরে শীলভদ্র দেখিল—জড়ের পৃথক সত্ত্বা নাই, বিরাট্ চৈতন্যের সত্ত্বাই জড়ে ক্রীয়াশীল; সুতরাং শীলভদ্রের মন জড়ে উপেক্ষা করিতে শিখিল।

ধ্যানের চতুর্থ স্তরে শীলভদ্র দেখিল, যে মুহূর্ত্তে বিরাট্ সত্ত্বার খণ্ডরূপ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভ্রান্তিবশে আমিত্বের আরোপ করিতে লাগিল, তখনই তাহার সুখ-দুঃখের, জন্মমৃত্যুর ক্রিয়া আরম্ভ হইল; যে বিশাল বারিধিবক্ষ শান্ত নির্ম্মল অবস্থায় নৈশচন্দ্রালোকে সুপ্ত ছিল, তাহাই অহঙ্কারের বাতাসে উদ্বেলিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ভৈরবমূর্ত্তি বিস্তার করিতে লাগিল। শীলভদ্র দেখিল এই অহঙ্কার জ্ঞান তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাণ! আর অমনি দশদিক্ আলোকিত করিয়া শুভ্র তুষার মরু কুসুমমালায় আকীর্ণ করিয়া শীলভদ্রের সম্মুখে দাঁড়াইল—এক ত্রিলোক-বিমোহন পুরুষ, হস্তে ফুলধনু, পৃষ্ঠে ফুলতূণ; সর্ব্বাঙ্গ ফুল-ভূষণে ভূষিত—আর তাহার সঙ্গে পঞ্চ ষোড়শী ভুবনভুলানো রূপ লইয়া শীলভদ্রের দিকে একাগ্রমনে তাকাইয়া রহিয়াছে! বিস্মিত শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমরা? কি চাও?"

পুরুষ উত্তর করিল—"আমি মার, এই পাঁচজন আমার সহচরী—সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, যশঃ, গৌরব, বিলাস; নির্ব্বাণের পন্থা পরিহার করে তুমি আমার ভজনা কর; এই পঞ্চ সুন্দরী তোমারই পরিচারিকারূপে অবস্থান করবে।"

শীলভদ্র উত্তর করিল—"মার, আমার ভজনা করবার অধিকার কি? কে আমি? আমি বলে যে কিছু নেই—চেয়ে দেখ মার এই দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এই বিশাল তুষার ক্ষেত্র, এই বিপুলা ধরিত্রী, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র-শোভিত নৈশাকাশ, অনন্ত নীলাম্বুধি,—সবই যে বোধি-সত্ত্বের বিকাশ—সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট বর্ত্তমান এক বিরাট্ মহা-চৈতন্য!—কে কার ভজনা করে? এস মার, তুমি ত মার নও—তুমি যে মাররূপে বোধিসত্ত্ব।"

এই কথা শুনিয়া মার খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটু পরে বলিল—"দেখ সন্ন্যাসি, আজ আমি তোমার নিকট, তোমার সাধনার নিকট পরাজয় স্বীকার করে নত-মস্তকে প্রস্থান করছি, কিন্তু জেনো সাধক একদিন আমারই প্রভাব তোমার সাধনাকে অতিক্রম করবে, একদিন আমারই সহচরীর জন্য লালায়িত হবে তোমার মন; একদিন আমার চরণতলে আত্ম সমর্পণ করে ধন্য হতে চাইবে তুমি। চেয়ে দেখ দূরে ঐ দিক্ চক্রবালে—"

শীলভদ্র একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিল ক্ষীণ ছায়ার আকারে শীর্ণা তৃষ্ণা ব্যাকুল আগ্রহে তাহারই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! "রক্ষা কর, রক্ষা কর, ভগবান্ বোধিসত্ত্ব" বলিয়া চীৎকার করিয়া শীলভদ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

(২)

সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কাল-চক্রের ক্রম পরিবর্ত্তনের ফলে ধরণীর কত রূপান্তর সংসাধিত হইয়াছে—যেখানে একদিন মহানগরী শোভা পাইত, সহস্র সহস্র নরনারী কলকোলাহলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিত, আজ সেখানে নিবিড় অরণ্যানী লক্ষ লক্ষ শাখা-পল্লব-বাহু মেলিয়া বিরাট্ দৈত্যের মত দণ্ডায়মান—একটি আলোকরেখাও হয়ত সহজে প্রবেশ-পথ অন্বেষণ করিয়া পায় না! লোকলোচনের অন্তরালে মহাসিন্ধুর অতল-তলে বিন্দু বিন্দু করিয়া যে ক্ষুদ্র বালুকাকণা পুঞ্জীভূত হইতেছিল, আজ হয়তঃ তাহাই দ্বীপের আকারে বিশাল বসুন্ধরার বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে! আবার হয়তঃ কত বিস্তৃত জনপদ ভূকম্পনে অসীম সিন্ধুর কুক্ষিগত হইয়া কালের ধ্বংসলীলার সাক্ষ্যদান করিতেছে!

এই দ্বাদশ বৎসরের কাল-চক্র শীলভদ্রের উপরও একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; আজ শীলভদ্রের নবযৌবনের নবীন সৌন্দর্য্য পরিম্লান; যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া লোক দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া মনে করিত, আজ আর তাহাকে দেখিলে সে ভাব জাগে না; আজ মনে উদিত হয় একটা ভয়মিশ্রিত ভক্তির ভাব। দীর্ঘ তপস্তায় শীলভদ্রের প্রকৃতি অনেকটা রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; কোমলতা যেন ধনীর দ্বারদেশস্থিত দ্বারবানের কঠোর গর্জ্জনে দরিদ্র ভিক্ষুকের মত দূরে পলায়ন করিয়াছে, তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা অগ্নিময়ী জ্যোতিঃ খেলা করিয়া বেড়ায়। রাধা-গুপ্তের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বর্ত্তমানে সকলেই শীলভদ্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও ভগবান্ বোধিসত্ত্বের কৃপাপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। সকলেই তাহাকে সম্মান ও মর্য্যাদা দানে সচেষ্ট; অনেকে বলিয়া থাকে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতি এক ভগবান্ বোধিসত্ত্ব ভিন্ন অন্য কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, শীলভদ্র তাহার জন্য ব্যাকুল নহে, নিন্দা-প্রশংসার পরপারে, সুখদুঃখের অন্তরালে, বিশ্বপ্রকৃতির বিরামহীন পরিবর্ত্তন-যবনিকার অভ্যন্তরে সে সন্ধান পাইয়াছে নিত্য সত্যের, যাহার প্রসাদে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই জাগতিক জড়চৈতন্যের সম্মিলিত রূপ অনিত্যের আকারে, পরিত্যাজ্য অসত্যের রূপে তাহার ধ্যান-স্তিমিত মানস-নেত্র-সমক্ষে। তবে আজ এক নূতন মহাসমস্যা উপনীত হইয়াছে তাহার নিকট, দেখা দিয়াছে এক চির-শ্যামল বনানীর সুপ্ত অঙ্কে ঝঞ্ঝার বিপুল আন্দোলন! শীল-ভদ্রের মনোরাজ্যে এক বাসনা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে—নির্ব্বাণের অপরিসীম আনন্দ, অপ্রমেয় সুখ, অমিত তৃপ্তি আজ শীলভদ্রের অন্তর ছাপাইয়া ভাদ্রের ভরানদীর মত ছুটিয়াছে; যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিধারা শুষ্ক হৃদয়-মরু সরস করিয়া, ইন্দ্রিয়ের আবিলতা পঙ্কিলতা দূরীভূত করিয়া নির্ঝরিণীর উদ্দাম স্রোতের মত চিরপ্রবহমানা; যে অমৃতের অনুপমেয় আস্বাদ তাহার জীবনে এক নব সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে; আজ শীলভদ্রের মনে হইয়াছে, সে আনন্দ, সে শান্তি, সে অমৃতের আস্বাদ ভগবান্ বোধিসত্ত্বের মত এই দুঃখ-দৈন্য-দুর্দ্দশা-ক্লিষ্ট জাগতিক নরনারীকে প্রদান করিয়া তাহাদের নীরস জীবনকে সরস করিয়া তুলিতে হইবে। যে বাধাবন্ধহীন ধর্ম্মবন্যা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ বিপ্লাবিত করিয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া-ছিল, শীলভদ্র সেই ধারারই পরিপুষ্টি সাধন করিবে—জগতের বক্ষে একটা অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রোথিত করিবে। এইরূপেই নির্ম্মলহৃদয় অহঙ্কারের আবাসভূমিরূপে পরিণত হয়; এইরূপেই আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহিনীমূর্ত্তি পরোপকারের বেশে মুগ্ধ মানুষের মনোরাজ্যে সিংহাসন পাতিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে; এইরূপেই ভগবান্ বোধিসত্ত্বের কৃপালোক-সমুজ্জ্বল শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হৃদয়কুঞ্জ মারের পূতি-গন্ধময় অন্ধকারাচ্ছন্ন লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়!

কে বলিবে কেন এমন নয়? কিম্বা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই বিশ্ববিধাতা তাঁহার লীলা-চাতুরী প্রকটিত করেন, হয়ত এই পতনেরও একটা সার্থকতা বিশ্বনিয়মের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য দরকার। কঠোর নিয়তির হাত এড়াইয়া যাওয়া ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যাতীত। যে বিশাল অন্ধ শক্তি অগণিত সৌর মণ্ডলের গতি নির্ণয় করে, অথচ জগৎবক্ষে একটি ক্ষুদ্র পরমাণুরও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়, বোধ হয় সে অন্ধ শক্তি মানবের পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের

মধ্য দিয়া বিশ্বের রচনা-কৌশল অভিব্যক্ত করে; মানুষের দুঃখদৈন্য-ক্লেশও জাগতিক নিয়মে প্রয়োজনীয়।

প্রথমেই শীলভদ্রের মনে হইল তৃষ্ণার কথা—কোথায় সে; আছে কিনা। ধ্যানালোকে সাধক দেখিল তৃষ্ণার গত দ্বাদশ বর্ষের জীবন—উঃ সে কি ঘৃণিত, কি কলঙ্ক-কালিকাময়! যে তৃষ্ণা পবিত্র অনাঘ্রাত দেব-মস্তকার্পিত কুসুমের মত কলুষ-কালিমাপরিশূন্য ছিল, আজ তাহার জীবনে কি ঘোর পরিবর্ত্তন! যে দেববালার স্বর্গীয় সুষমা শীলভদ্রের অন্তরকে অলোকানন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিত, আজ কোন নিয়তির কঠোর অভিশাপে তাহা মরুর বুকে বৃষ্টি বিন্দুর মত কোথায় অন্তর্হিত! ধ্যানের দীপ্তপ্রভায় ফুটিয়া উঠিল শীলভদ্রের সম্মুখে পাটলিপুত্রের এক প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা; চতুর্দ্দিকে নন্দনকানন তুল্য উপবন; সুগন্ধী জলের ফোয়ারা অবিরাম জল উদ্গীরণ করিতেছে; মূল্যবান্ চিত্রপট কক্ষস্থ প্রাচীরে লম্বমান; পালঙ্কে অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় তৃষ্ণা;—স্বপনকুহেলিকার মত মদিরার জড়িতভাব নয়নে-বদনে প্রতিভাত! দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল;—দেখিল শীলভদ্র—আলোকমালা-সমুজ্জ্বল কুসুম-দাম-সজ্জিত রঙ্গমঞ্চ—শত শত দর্শক ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায় যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, দর্শন করিয়া নয়নমন সার্থক করিবে; যবনিকা সরিয়া গেল; বিস্ময়-বিকশিত নয়নে লালসা-স্পন্দিত বক্ষে দর্শক দেখিতেছে পূজারিণী বেশে নর্ত্তকী তৃষ্ণা—উছলিয়া পড়িতেছে রূপরাশি! আর শীলভদ্র দেখিতে পারিল না; রুদ্ধ করিল ধ্যাননেত্র—অন্তর্হিত হইল পলকে দৃশ্যাবলী।

নবীন চিন্তা-স্রোত শীলভদ্রের হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। কি উপায়ে তৃষ্ণাকে এই ঘৃণিত জীবন হইতে টানিয়া আনিয়া অমৃতের কূপে নিমজ্জিত করা যায়। কেমন করিয়া তাহাকে ভগবান্ বোধিসত্ত্বের কৃপালোকের অমিত আভায় বিমণ্ডিত করা চলে, কি উপায়ে তাহাকে পূর্ব্বের মত নিষ্পাপ পবিত্র করিয়া তোলা সম্ভবপর হয়। মনে হইল শীলভদ্রের, অগ্নি ভিন্ন যেমন কেহই অঙ্গারের মালিন্য দূর করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি এই বোধিসত্ত্বের চরিত্র-কথা ভিন্ন তৃষ্ণার উদ্ধারের অন্য উপায় নাই!—কিন্তু কে তাহার কর্ণকুহরে এ মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করিবে? কে তাহাকে বলিয়া দিবে নশ্বর তোমার রূপ-যৌবন! যে মধুপকুল আনন্দে আজ তোমার চতুর্দ্দিকে প্রশংসা-গুঞ্জন-ধ্বনি করিতেছে, জরার প্রবল আক্রমণে যখন তুমি রূপহীনা হইবে, তখন কেহই তোমার দিকে ফিরিয়াও তাকাইবে না! তোমার ঐ নবনীত-কোমল দেহ, যাকে আজ বিলাস-প্রসাধনে সুসজ্জিত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করিতেছ, তাহাই একদিন শ্মশানের ধূলিমুষ্টির মধ্যে উপেক্ষিত অবস্থায় শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইবে!—কে তাহাকে এই সমস্ত বুঝাইয়া দিবে?—ভাবিতে ভাবিতে শীলভদ্রের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল—তাই ত, কেন সে নিজে তৃষ্ণাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসে না? সে ত নিজে বেশ ভাল করিয়া তৃষ্ণাকে তাহার জীবনের পরিণাম আলোক-চিত্রের ছবির মত সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতে পারিবে—এক দিকে তৃষ্ণার বিলাস-লালসা পরিপূরিত ঘৃণ্য নারকীয় জীবন; অপর দিকে তাহার নিজের জীবন—ত্যাগ ও সংযমে সমুজ্জ্বল, আনন্দে লোভনীয়, শান্তির অমিয়ধারায় চিরশ্যামল, চিরস্নিগ্ধ! কিন্তু আবার মনে হইল—এই ধ্যান-জগৎ ছাড়িয়া, ভগবান্ বোধিসত্ত্বের লীলামাধুরীর উপভোগ পরিহার করিয়া সে কি যাইবে সেই সাংসারিক কলহ-কোলাহলের মাঝখানে? সুর মন্দাকিনীর নির্ম্মল জল প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া সে কি যাইবে সে পঙ্কিল পল্বলে? আবার ভাবিল—দোষ কি? সে ত নিজের জন্য, নিজের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে যাইতেছে না, যাইতেছে—এক মহদুদ্দেশ্যে—এক পতিতা নারীর উদ্ধারের জন্য—তৃষ্ণার মুক্তি বিধানের কামনায়। ভগবান্ বোধিসত্ত্বও ত সাধনার অবসানে সংসারে ফিরিয়া গিয়া জীবের মুক্তির উপায় জন সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। এইবার শীলভদ্রের চিন্তাস্রোত আরও একটু বেগে প্রবাহিত হইল। যে সঙ্কল্প-বিকল্পের মাঝখানে পড়িয়া তাহার মন হাবুডুবু খাইতেছিল, তাহা ক্রমশঃ তৃষ্ণার দিকে ঢলিয়া পড়িতে চাহিল। এইবার শীলভদ্রের মনে হইল—তৃষ্ণা যে তাহার বাল্যসখী। দুইজনে

এক সঙ্গে ধূলিখেলা খেলিয়াছে, একসঙ্গে স্নানাহার করিয়াছে, একসঙ্গে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে।—সে তৃষ্ণা ঐ পূতি-পল্বলে পড়িয়া পচিবে, আর শীলভদ্র নিজে একাকী স্বার্থপরের মত অপার ভূমানন্দ উপভোগ করিবে?—না—তাহা হইবে না। শীলভদ্র নিজেই গিয়া তৃষ্ণাকে তাহার এই ঘৃণিত পঙ্কিল জীবন হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিবে এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত নারীবিহারে তাহাকে সাধনায় নিযুক্ত করিবে—সে কি সুখ,—কি আনন্দ!

সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। যে সমস্যার সমাধানে মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার তাহা সিদ্ধ করিয়া শীলভদ্র একটু স্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু জানিতে পারে নাই, বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে তাহার ললাট-লিপিতে আজই শান্তির শেষ দিন! আর এ জীবনে অনাবিল শান্তিভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না—এক মর্ম্মন্তুদ যাতনার তীব্র তাড়নায় তাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ছুটাছুটি করিতে হইবে—কিন্তু শান্তি অদৃষ্টে জুটিবে না!

শীলভদ্র দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে তাহার সাধনক্ষেত্র ছাড়িয়া পাটলীপুত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এক এক বার এই পবিত্র দেবভূমি ছাড়িয়া যাইতে তাহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে তৃষ্ণার ঘৃণিত জীবনের কথা মনে হইতেই সে তাহার মনকে লৌহবর্ম্মে আবৃত করিতেছিল।

পরদিন প্রভাতের কনকরশ্মি পূর্ব্বাশায় দেখা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে শীলভদ্র তাহার দীর্ঘ প্রবাসক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্রাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃ

আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ

শ্রীসুধাকান্ত দে এম্ এ, বি এল্

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ বলিতেছেন; "সভ্যতার দুই ধারা—আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক। ইয়োরোপ জড়ের উপাসনা করিয়া থাকে, উপকরণের উপর উপকরণ সাজাইয়া আর্থিক সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধিতে স্বাধিকার-প্রমত্ত হইয়া বসিয়া আছে। ওটা ভোগের পথ। কিন্তু ভারতবর্ষের ও পথ নয়। ভারতবর্ষের পথ ত্যাগের পথ। আর্থিক দৈন্য তার অন্তরের জ্যোতিকে কোনকালে ম্লান করিতে পারে নাই। কারণ ভারতবর্ষ আত্মিক ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইলে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে।"

ইয়োরোপ নাকি ঘোর বস্তুতান্ত্রিক দেশ, আর আমরা আধ্যাত্মিক জাতি। ইহার অর্থ এ নয় যে, আমাদের মধ্যে বস্তুতান্ত্রিক লোকের অভাব আছে অথবা ইয়োরোপে আধ্যাত্মিক লোক একজনও মিলিবে না। কিন্তু সমগ্র দেশ ধরিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, দুই দেশের গতি একদিকে নয়। পূরব শান্ত, উদার, উদাস, গম্ভীর ও মহান্, আপনাতে আপনি স্তব্ধ হইয়া, ধ্যান-নিরত হইয়া বসিয়া আছে, আর পশ্চিম প্রাণের আবেগে সদা চঞ্চল, ছুটিতে চাহিতেছে, সব কিছু জয় করিতে চাহিতেছে, ঐশ্বর্য্যকে, বিত্তকে, ধনকে কাম্য মনে করিয়া রাতদিন তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে।

যাঁরা এই প্রকার ভাবের ভাবুক, তাঁরা পশ্চিমকে অনেক সময় গালাগালি দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা বলেন, ইয়োরোপীয় সভ্যতার মৃত্যু-বীজ উহার অন্তরে উপ্ত হইয়া আছে। উহা ফাঁপা। একদিন সমগ্র ইমারতখানা ধ্বসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে। সুতরাং পূরবকে সময় থাকিতে সাবধান হইতে হইবে। পশ্চিমকে নকল করিতে যাওয়া ধ্রুব মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণের সামিল। অতএব সর্ব্ব প্রকারে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা পূরবের সাধনার অঙ্গ বটে।

কিন্তু ইয়োরোপের মোহিনী শক্তি কম নহে। আজ

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইয়োরোপের মানুষ প্রকৃতির উপর, জলস্থলের উপর প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেছে, অমিত তেজে বিচরণ করিতেছে। বস্তুতঃ ইয়োরোপীয়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আর সীমা নাই। ইয়োরোপীয় মানব নিজেকে ভগবানের প্রেরিত দূত বা শ্রেষ্ঠতম জীব বলিয়া মনে করে। ইয়োরোপ ব্যতীত গোটা জগৎ আজ ইয়োরোপের নিকট পরাজিত অথবা প্রসাদভোজী হইয়া রহিয়াছে।

এরূপ অবস্থায় দেশে দেশে ইয়োরোপকে, ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে নকল করিবার বাসনা ব্যক্তির বা রাষ্ট্রের মনে জাগিয়া উঠিবে, এতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সভ্যতার ধারা দুই হোক্ বা বহু হোক্, যে সভ্যতার দ্বারা জীবনের পথে জয়লাভ সম্ভব হয়, তার প্রতি মানুষের মনে টান থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্ত আমাদের দেশের ভাবুক, চিন্তাশীল ও লোক-বিখ্যাত মনীষিগণ আধ্যাত্মিক ভারতের যত শান্তচ্ছবিই আঁকুন, বা প্রাচীন মহিমার মত গুণকীর্ত্তন করুন, ভারতের সভ্যতার ধারা সে পথে কিছুতেই ফিরিতে চাহিতেছে না। সমগ্র জগতে ইয়োরোপের পথ ধরিয়া চলিবার জন্ত একটা আকুল কার্য্যের অথবা কার্য্যের জন্ত আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। জাপান জগদ্বরেণ্য হইয়াছে, ইয়োরোপকে দূরে রাখিয়া নহে, ইয়োরোপীয় বনিয়া গিয়া। ইতালি পূরব-ঘেঁষা ছিল, মুসোলিনি খাঁটি পশ্চিমা করিবার জন্ত প্রাণপণ করিতেছেন। তাই ইয়োরোপীয় সমাজে ইতালির গৌরব বাড়িয়াছে। মুসলমান তুরস্ক, সেদিন পর্য্যন্ত যে ঘোরতর রাজতন্ত্রবাদী ছিল, কলমের এক খোঁচায় তার মুসলমানত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে। ইরোরোপীয় হইতে হইবে। সেজন্ত প্রথমে বিদায় হইল মোল্লারা! গির্জা ও রাষ্ট্র পৃথক হইয়া গেল। রাতারাতি দেশবাসীদের পোষাক বদ্‌লিয়া গেল, ফেজ্ নয় টুপি পরিতে হইবে। নারীর মুখের অবগুণ্ঠন বোর্‌খা দূর হইল। এইরূপে নবীন তুরস্ক সকল প্রকারে, তার হাবে ভাবে কার্য্যে বাক্যে চিন্তায় ইয়োরোপীয় বনিবার জন্ত বিপুল সাধনা করিতেছে। আফগানিস্থান, পারশ্ত, চীন যে দিকে তাকাই সকল দিকে দেখি এই ইয়োরোপীয় বনিবার জন্ত তুমুল আন্দোলন। সেই জন্ত বলিতে ইচ্ছা করে "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে, হরে মুরারে।" ভারতবর্ষ কি একা এই স্রোতের মুখে দাঁড়াইয়া স্থির থাকিতে পারিবে? না ভাসিয়া যাইবে?

দেশহিতৈষী, বিজ্ঞ, বহু অভিজ্ঞতা-লব্ধ-জীবন কেহ কেহ পরিষ্কার বলিতেছেন, "এই স্রোতে গা ভাসাইয়া দাও। সভ্যতার পূরবী ধারা একপ্রকার, আর পশ্চিমা ধারা অন্ত প্রকার, এমন নহে। একই ধারা বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন রূপে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু উন্নতির পথ পূরব ও পশ্চিমের এক। পশ্চিম আজ যে মন্ত্রবলে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছে, সেই মন্ত্র আয়ত্ত করিতে হইবে। ইয়োরোপ যে পথে অগ্রসর হইয়াছে, আমাদেরও সে পথে অগ্রসর হইতে হইবে। হইবে নয়, হইতেছি। যারা একথা অস্বীকার করে, তারা ইচ্ছা করিয়া সত্যকে অস্বীকার করিতে চায়। তারা মনে মনে জানে, এমন কি প্রার্থনা করে ঐ দিকে চলিব।"

আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া সভ্যতার কোন স্তরভেদ নাই। আমাদের সভ্যতার ভিতর বস্তুর জন্ত মায়া জড়ের উপাসনা কোন্‌খানে কম দেখিলে? উপকরণ আমাকে পাইয়া বসিলে, আমার উপর প্রভুত্ব করিলে অবশ্ত আত্মার গ্লানি হয়। কিন্তু নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার জন্ত উপকরণকে যথাযোগ্য-রূপে আয়ত্ত করায় কোন দোষ আছে কি? মানব যখন অন্ত বহু মানবের সুখ ও মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া সেজন্ত বস্ত্র, ঐশ্বর্য্য, বিত্তের চিন্তায় দিনরাত কাটায়, সেজন্ত নব নব উপায় উদ্ভাবন করে, তখন অনাধ্যাত্মিকতা বা বস্তুতান্ত্রিকতা কোন্‌খানে প্রকাশ পায়? অল্পে পরিতুষ্ট থাকা, শাকভাতে খুসী মনে উচ্চ চিন্তায় জীবন যাপন করা অবশ্তই প্রশংসনীয়। কিন্তু রিক্ততার একটা সীমা আছে। দারিদ্র্য যে শুধু ব্যক্তির নয়, জাতিরও গুণরাশিনাশী, একটা গোটা সভ্যতাকে দিন দিন নিস্তেজ করিয়া ধ্বংস করিতে পারে একথা কেহ অস্বীকার করিবে কি? সেই দিকে চোখ না ফিরাইয়া শুধু আত্মিক উৎকর্ষের জন্ত যোগসাধনায় নিযুক্ত থাকিলে জাতির কোন কল্যাণ হয় না। ইহাকে আধ্যাত্মিকতা বলিলে হয়ত আত্মার অপমান করা হয়।

ভারতবর্ষ এই দুই প্রকার বিভিন্ন মতের ভিতর দোল খাইয়া দ্বিধায় পড়িয়া গেছে। বাস্তবিক পথ দুইটা না একটা? যদি দুইটা হয়, তবে ভারতকে কোন্ পথে প্রয়াণ করিতে হইবে? গত দশ বছরের ভিতর আমাদের রাজনৈতিক গগনে ভারতবর্ষ ঘড়ীর পেণ্ডুলামের মত একবার এদিকে অন্যবার ওদিকে দোল খাইয়াছে। কোন্ পথ তার পথ?

কিন্তু পথের কথা বিচার করিবার সময় আছে কি? হয়ত আমরা শান্ত সমাহিতভাবে গরুর গাড়ীর মত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকিতাম, তারপর কোনদিন ষ্টিম এঞ্জিনের উদ্ভব দৈবগতিকে হইলে হয়ত ভারতীয় সভ্যতা বলিয়া এক নূতন বিজিগীষু জিনিষকে পৃথিবীর দরবারে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিতাম। কেহ বলিতে পারে না। যদি ভারতবর্ষ ষ্টিম এঞ্জিন প্রথম তৈরি করিত—একটা কল্পনা মাত্র। ভারতে ঐ জিনিষ আবিষ্কার হয় নাই, সকলে জানে। কিন্তু যদি হইত, তবে তার কি ফলাফল হইত তার একটা ইতিহাস লেখা চলে। এই ইতিহাস নিতান্ত নিরর্থক নয়। যদি দ্বারা এইরূপ বহু ইতিহাস রচনা করিতে করিতেই একদিন ইয়োরোপ প্রকৃতির রহস্য-দ্বারের চাবি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। সেই সন্ধানের ফলে প্রকৃতি আজ ইয়োরোপকে চামর ঢুলাইতেছে।

বলিতেছিলাম, ইয়োরোপের মোহিনী বাঁশীর রব শুনিবার পর আমাদের আর গালে হাত দিয়া ভাবিবার চিন্তিবার অবসর ছিল কি? পশ্চিম একেবারে আমাদের দরজার গোড়ায় আসিয়া হানা দিয়াছিল। আমাদের সাধ্য হয় নাই তাকে ঠেকাইয়া রাখিবার। সে তার কামান, বন্দুক, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রীতিনীতি একসঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিল। আর ইয়োরোপ হইতে আনীত প্রত্যেকটা জিনিষ আমাদের মধ্যে বিপ্লব বাঁধাইয়া তুলিল।

কার্থেজের হ্যানিবলের কথা মনে পড়ে। রোমের বিরুদ্ধে হ্যানিবলের অভিযান একটা সমগ্র দেশের সঙ্গে একটা ব্যক্তি-প্রতিভার সংঘর্ষ। হ্যানিবলের অতুলনীয় চরিত্র। সেই চরিত্রের জন্য হ্যানিবল রোম পর্য্যন্ত আসিয়া আবার ইতালি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর নখও কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই চরিত্রের জন্য তাঁর বিচিত্র বাহিনী, বিদেশী সৈন্যেরা পর্য্যন্ত একদিনের তরেও বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই। হ্যানিবল যখন আল্পস্ ডিঙ্গাইয়া দ্রুতবেগে রোমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন রোমান্ সৈন্যেরা তাঁর সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য রোমান্ বীরদের উদ্ভাবনী শক্তি ও শিক্ষা-তৎপরতা! যে হ্যানিবল মায়া-যুদ্ধের রাজা, শতবার রোমান্‌দের চোখে ধুলি দিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া যুদ্ধ চালাইয়াছেন, রোমন্‌রা সেই বিদ্যা তাঁর নিকট হইতে এমন ভাবে শিখিয়া লইল যে, তাঁকে হার স্বীকার করিতে হইল। হ্যানিবল যখন ক্যানিতে তখন রোমান্‌রা ২৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কেমন করিয়া হ্যাড্রুবলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাঁর ছিন্নমস্তক হ্যানিবলকে উপহার দিল, সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। এক পক্ষ কালের মধ্যে রোমক সৈন্য ২৫০ মাইল গিয়াছে ও চলিয়া আসিয়াছে, হ্যানিবল বুঝিতেও পারেন নাই যে, তাঁর সম্মুখে সজ্জিত সৈন্য এতখানি কমিয়া গিয়াছে! এইরূপে রোমকেরা প্রতিপদে অত্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও গ্রহণ-ক্ষমতা দেখাইয়াছে। তাই যে হ্যানিবল রোমকে চুরমার করিয়া দিতে পারিতেন, তাঁকে মানে মানে আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইতে হইল। শুধু তাই নয়, অল্প সংখ্যক মাত্র সৈন্য লইয়া যুবক সিপিও যেমন করিয়া আফ্রিকায় উত্তীর্ণ হইলেন ও হ্যানিবলকে পরাজিত করিলেন তাহাও রোমক সৈন্যের শিক্ষা-তৎপরতার পরিচয় দেয়।

ইয়োরোপ যখন একেবারে সঙ্গীন হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল, ক্লাইভ পলাসীর আমগাছতলায় কামান দাগিল, তখন আমাদের অবস্থাটা কি? তখন আমাদের অবস্থাটা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে বর্ণিত সুন্দরীর মত। আমরা গোরা দেখিবামাত্র নাক-কাণ বুজিয়া কলসী ফেলিয়া দে দৌড়। হয়ত তারপরও লেপের ভিতর গিয়া কাঁপি-তেছি। রোমকদের মত গ্রহণ-নৈপুণ্য ও শিক্ষাতৎপরতা যদি আমাদের থাকিত, ক্লাইভের বিদ্যা শিখিয়া যদি তদ্দ্বারা ক্লাইভকে উত্তর দিতে পারিতাম, তবে তার ফলাফলটা কিরূপ হইত, মনশ্চক্ষে তা আন্দাজ করা যায়।

আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা মনে করিয়া আপ্‌শোষ

করিতেছি, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। রাজনৈতিক পরাধীনতার নিগড় সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নিগড় নহে। আর জীবন শুধু মাত্র রাজনীতি নহে। জীবনকে আমরা সকল দিকে দীন ও খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমরা আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব করি বটে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে ইয়োরোপের বল-পরীক্ষা চলিতেছিল সেই মুহূর্ত্তে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ এক কাণাকড়িও ছিল কি না জানি না। যদি থাকিত, এবং ইয়োরোপ আসিয়া ভাঙ্গিয়া দিত, তবে খেদ করিয়া এই কথা বলা চলিত যে, "আহা! এমন জিনিষটার পরিণতি দেখার সুযোগ ঘটিল না। সব মাটি হইয়া গেল।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক উল্টা। তখন আমাদের জাতীয় জীবনের যে দিকে চাহি দেখি যেন লেখা রহিয়াছে, "প্রস্তুত নহি।" হায়, প্রস্তুত নহি! সংসারে সব কিছুর ক্ষমা থাকিতে পারে, কিন্তু কি ব্যক্তি, কি জাতি, কোন কালে অপ্রস্তুতকে ক্ষমা করিবার কেহ নাই। সময় ক্ষমা করে না। যদি বল, লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়, আমি না হয় মানিয়া লইব। কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃতির বিধান ত বদ্লাইবে না।

পূরবী ও পশ্চিমা সভ্যতার ধারার বিভিন্নতা স্বীকারে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। সভ্যতা যদি দুই প্রকারের হয়, তাতে এমন কি আসে যায়? পৃথিবীতে দুই বা দুইয়ের অধিক পরিণতি বরং মানবের সাধনার বৈচিত্র্য ও শক্তিমত্তার লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করি।

কিন্তু দুই প্রকার সভ্যতার দাবী-প্রার্থীদের মনে যে মনোভাবসমূহ উৎপাদিত হয় তার ফলাফল প্রশংসনীয় নহে। ধরার শ্রেষ্ঠ জীব ইয়োরোপীয় পৃথিবীর সমস্ত লোককে ঘৃণার চোখে দেখে ও মনে করে যে, আর সবাই তার গোলামী করিয়া চরিতার্থ হইবার জন্য জন্মিয়াছে। আমেরিকার নিগ্রো সমস্যা বা ইয়োরামেরিকার পীতাতঙ্কের কথা এখানে না হয় না তুলিলাম। ইহা ছাড়া চারি মহাদেশে ইয়োরোপীয়ের অহংকার ও গর্ব্বদৃপ্ততার উদাহরণ ভূরি ভূরি মিলিবে।

পশ্চিমার এই অত্যন্ত অহঙ্কার আমাদের শুধু চোখে লাগে, এমন নয়; মর্ম্মে গিয়া ঠেকে। সেইজন্য এই অহঙ্কারটাকে আমরা ধৈর্য্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিতে পারি না, প্রতিশোধের জন্য লালায়িত হইয়া উঠি। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে মানব সভ্যতা আজ অবধি যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, তাতে কোন জাতির ইতিহাস হইতে এমন উদাহরণ মিলে না যেখানে ক্ষমতা ও জয়লাভের ফলে মত্ততা আসে নাই। "যেদিন হেলায় সিংহল করিল বিজয়"—গাহিতে গাহিতে আমাদের বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে। অথচ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের আব্‌হাওয়ায় প্রতিপালিত শান্তিপ্রিয় জাতি!

অন্য দিকে, পূরবী—বিশেষতঃ পরাজিত পূরবী ও আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সমুৎসুক পূরবী—আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রচারে কম মুখর নহে। আমরা প্রাচীন জাতি, আমাদের মাটিতে সভ্যতার প্রথম সূর্য্যালোক দেখা গিয়াছিল অথবা সেইকালে আমাদের মাটিতে যেরূপ উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল অন্যত্র কোথাও সেইরূপ দেখা যায় নাই, ইত্যাকার বুলির সহিত আমাদের সর্ব্বদা পরিচয় ঘটে। কারণ এগুলি আমাদের প্রিয় ও মিষ্ট বুলি বটে।

পশ্চিম বলিতেছে, "দেখ দেখ, আমরা কি করিতেছি।" পূরব বলিতেছে, "দেখ দেখ, আমরা কি করিয়াছিলাম।"

এই দুই প্রকার মনোভাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ দুয়ের ভিতর কোন প্রকার বিরোধ নাই। পশ্চিম যদি আপনার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়া থামিয়া যায়, আর পূরবও যদি আপনার শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তবে বিরোধের অবকাশ থাকে না। কিন্তু ঐখানে কেহ থামে না, হয়ত থামিতে পারে না। "আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বড়, অতএব আমি প্রভুত্ব করিবার জন্য জন্মিয়াছি", "আমি চিরন্তন, শাশ্বত সম্পদের অধিকারী, অতএব আমার গরিমা সকলকে মানিতে হইবে", এই দুই মনের সংঘর্ষের ফলে জন্মলাভ করে অন্যের সভ্যতাকে তুচ্ছ করিবার বা তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা।

বস্তুতঃ পূরব বা পশ্চিম শুধু আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার

করিতে চায় যে "ওটা কিছু নয়। ওটা নেহাৎ ছোট লোক।" পূরব পশ্চিমকে গালি দিয়া বলে "ওরে রে বস্তু-তান্ত্রিক, ওরে রে জড়বাদী।" পশ্চিম এই গালিতে হাসে ও প্রত্যুত্তরে গালি দিয়া বলে, "ওরে রে বেকুব, ওরে রে মায়াবাদী......"

কিন্তু পশ্চিম না কি আজ জীবন-যুদ্ধে জয়ী, তাই আমাদের গালি পশ্চিমকে যত না লাগিতেছে, পশ্চিমের গালিটা তার বহুগুণ জোরে আসিয়া পূরবকে আঘাত করিতেছে, মর্ম্ম কাটিয়া বসিয়া যাইতেছে।

দেবতা যদি বর দিতে আসিয়া বলেন, "ওগো পূরব, রাতারাতি তোমায় পশ্চিম বানাইয়া দিতেছি, আর পশ্চিমকে পূরব। কেমন খুসী হইবে ত?" বলা বাহুল্য যে পূরব তৎক্ষণাৎ সানন্দ মনে সায় দিবে। অর্থাৎ শুধু পশ্চিমের সমকক্ষ হইয়া সুখ নাই, পশ্চিম যদি হীন হইয়া পড়ে তবে তাহা অতিশয় আহ্লাদের কারণ হইবে। পশ্চিমের অত্যাচার বা নিপীড়ন পূরবের এই মনোভাবের জন্য কতকটা পরিমাণে দায়ী হইতে পারে, সম্পূর্ণ নয়। ব্যক্তির মত জাতির মনেও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ধর্ম্মের অন্তর্গত। সেই প্রভুত্ব যে পথে ভালভাবে অর্জন করা চলে, সেই পথে চলাই পরমার্থ।

সুতরাং সভ্যতার বিশিষ্ট রূপের প্রতি যে মায়া, তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য যে অশেষ বিধ চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞা তাহা আন্তরিক নহে। জীবনে সফলতা কে না চায়? জাতির জীবন অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান থাকুক্ না। বর্ত্তমান কালে জগতের মধ্যখানে কোন্ জাতি আত্ম-প্রতিষ্ঠার দ্বারা যশোভাগী হইতে না চায়? সভ্য-পদ-আরূঢ় জাতি মাত্রেই চায়।

পূরব চিরকালের জন্য হেয় হইয়া থাকিবে, জগৎ-সভার ছোট একটা কোণে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এই প্রকার ব্যবস্থা পশ্চিমের যত মনঃপূত হোক্, পূরবের ভাল না লাগার কথা। ঐ ভাল না লাগার মধ্যেই তার উন্নতির বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

অতএব কথাটাকে যেদিক্ হইতেই বিচার করিয়া দেখি না কেন দেখা যাইবে যে, আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সময়ে বস্তুতান্ত্রিক বা ইয়োরোপীয় বনিয়া না গিয়া গত্যন্তর নাই। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, জীবন যুদ্ধে জয়ী হইবার সকল প্রকার অস্ত্র তাকে আয়ত্ত করিতেই হইবে। তারপর ইয়োরোপীয় বাহ্যিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, এক কথায়, সভ্যতার অন্যান্য কতখানি লইবে বা লইবে না তাহা লইয়াও আন্দোলন-আলোচনার যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে।

সাদা কথাটা এই যে, পূরবীর মরমী, কবি, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক বা দেশপ্রেমিকের নিকট যতই মর্ম্মন্তুদ হোক্ না কেন, আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে, ভারতকে ইয়োরোপ করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই আমরা ইয়োরোপের উপর টেক্কা দিতে পারিব।

কিন্তু এই কথাটার ভিতর একটা গভীর বেদনার—কেহ কেহ বলিবেন লজ্জার,—কথা রহিয়াছে। এই বিশাল ভারতবর্ষ, যেখানে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের অন্ত নাই, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, প্রান্তর, গুহা, গহ্বর শোভিত ভারতবর্ষ, ইহার কি একটা স্বতন্ত্র সত্বা নাই? জগতের ভাণ্ডারে পরিষ্কার, স্পষ্ট, নূতন কিছু কি দান করিবার নাই? যে ব্যক্তি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, ইহার প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক জনপদ ও বিচিত্র নরনারীর অসংখ্য সমাজ হৃদয়ের মধ্যে গাঁথিয়া লইয়াছে, সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে ভারতবর্ষকে জগতের গড্ডালিকার মধ্যে মিশাইয়া দেওয়ার অব্যক্ত বেদনা। এ শুধু শ্রেষ্ঠতার অভিমানের কথা নয়। স্বদেশের প্রতি ভালবাসাতে এই বেদনার জন্মস্থান।

ভারতবর্ষকে যদি কলকারখানা দ্বারা ছাইয়া ফেলি, যদি এখানে অবিলম্বে যন্ত্ররাজের জয়ধ্বনি ঘোষিত হয় ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ অনুচরে, এঞ্জিনিয়ার, বিপুল ব্যবসায়ী, রাসায়নিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদিতে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ও দেশের সমৃদ্ধি ও সুখ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তবে কি আমরা "হর্ষধ্বনি গগনে জাগাইব" না? নিশ্চয় জাগাইব।

ইয়োরোপকে আমদানী করার অর্থ ইয়োরোপীয় সমস্যার আমদানী করা। একথায় কেহ কেহ চম্‌কাইয়া উঠিলেও ইয়োরোপীয় সমস্যায় বিব্রত হইবার কোন কারণ নাই।

কারণ, আমাদের মস্তিষ্কের এখনও সেইরূপ নিশ্চল অবস্থা আসে নাই যে, নব নব সমস্যার সমাধানে আমরা আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছু লাভ করিব। ইয়োরোপকে সজ্ঞানে আমদানী করিতে হইবে, অর্থাৎ ইহার জন্য যথেষ্ট দাম দিতে প্রস্তুত থাকিব।

কিন্তু হায়! আমার ভারতবর্ষীয় আত্মা! শান্তির জন্য চির-পিপাসিত মন কোথায় যেন পীড়া বোধ করিতে থাকে। নদীর দুই ধারে ঝাউবন বাতাসে দুলিতেছে, দুই পারের গ্রামবাসীরা দুনিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে সরল (মধুর কি ?) জীবন যাপন করিতেছে। কিংবা দূরে নীল পাহাড়, নীচে খোলা মাঠ বা বন, রাখাল গরু চরাইতেছে, এখানে সেখানে খড়ের ঘর দেখা যাইতেছে। কিংবা—আর কিংবায় কাজ নাই, এরূপ বহু সহস্র সত্যকার সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করা যাইতে পারে। ইহারি মধ্যে কলকারখানা স্থাপিত হইল, ফ্যাক্টরি তার ধূঁয়া উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল, ধনী তার লাভের হিসাব করিতে থাকিল, আর হাজার হাজার নরনারীর গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় হইল। দেখিতে দেখিতে শহর গড়িয়া উঠিল। আমরা কোন্‌টা চাই ? নিরাবিল শান্তি ও মহান্ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া এই ভারতবর্ষের তীরে ইয়োরোপকে রোপণ করা সম্ভব নয় কি ? যেই মুহূর্ত্তে আকাশে যান উড়াইব, সাগরে সাগরে ভীমকায় তরী লইয়া পাড়ি দিতে থাকিব, অথবা যুদ্ধ করিব, অস্ত্র, বাদ্য ও যন্ত্রের ঝঞ্ঝনায় সমগ্র দেশ মুখরিত করিয়া তুলিব, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গ্রামের, জনপদের, পর্ব্বতের, নদীর, গুহার, লোকের মুখের লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য বুঝিবার মত আত্মা আমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবে কি ? না, আমাদেরও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইবে, "The world is too much with us. We lay waste our power, getting and spending ?" কে জানে ?

আছে এক ধ্যান লোক, এক তাপস লোক, যে লোকের সন্ধান পাইয়া ভারতের মনস্বিগণ ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সেই তাপসলোককে রক্ষা করিতে হইবে, সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধকে সর্ব্বপ্রকারে জীবিত রাখিতে হইবে, নহিলে ভারতের সুকুমার কলা, শিল্প, সাহিত্য, সমস্তই শুকাইয়া ঝরিয়া যাইবে। সেজন্য চাই সূক্ষ্মবোধ, অতীন্দ্রিয়-পরায়ণতা, হয়ত ভাব-বিলাসিতা। তাহা হারাইয়া ইয়োরোপকে শুধু আনিতে পারিলে (সত্য সত্য ইয়োরোপকে আনিতে পারিব কি না তাই বা কে জানে ?) আমরা লাভবান্ অথবা বেশী লাভবান্ হইব কি ? অথবা এই দুয়ের সামঞ্জস্যে এক অপূর্ব্ব বিধান গড়িয়া তুলিবার মত ভারতীয় প্রতিভা দেখা দিবে কি ? কে বলিতে পারে ?

আমাদের আর্থিক অবস্থা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, বি এ

স্মরণাতীত কালের বিবরণ পাঠে জানা যায় দেশের অর্থসূত্র বণিক্‌গণের করতলগত ছিল। বণিক্‌গণ বাণিজ্য-প্রভাবে দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেন এবং তাহার দ্বারা সাধারণের হিতকল্পে প্রভূত সৎকর্ম্ম সাধন করিতেন। সেই জন্যই দেখা যায় সুবর্ণবণিক্ দাতাগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত বহুবিধ সদনুষ্ঠান এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের মহানুভবতার নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান আছে ; এই কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও সুবর্ণবণিক্‌গণের সহায়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদেরই জাতীয় লক্ষ্মীনারায়ণ ধর—যিনি তৎকালে "নকুধর" বলিয়া খ্যাত ছিলেন—লর্ড ক্লাইভকে অর্থসাহায্য না করিলে নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান সম্ভবপর হইত না। ইংরাজ বণিক্‌গণ এদেশে

ব্যবসা আরম্ভ করিলে স্ুবর্ণবণিক্গণ তাঁহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিতেন এবং প্রায় সমস্ত সওদাগরী হাউসেই স্বর্ণবণিক্গণ মুৎসুদ্দি হইতেন। একা ৺মতিলাল শীল কলিকাতায় ১২টি ফার্ম্মের মুৎসুদ্দি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও বহুদিন যাবৎ মুৎসুদ্দিগিরি প্রায় স্ুবর্ণবণিক্গণের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাহাও ক্রমশঃ হস্তান্তর হইয়া বর্ত্তমানে মাড়য়ারীগণ তাহার একাধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের যখন যেখানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানেই স্ুবর্ণবণিক্গণের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সপ্তগ্রামের অবনতির সহিত যখন কলিকাতায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়, তখন সুবর্ণবণিক্গণ সদলবলে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে আগমন করেন। সেই কারণেই বোধ হয় কলিকাতায় সুবর্ণবণিক্গণের ভূসম্পত্তি এত অধিক, কারণ তখন এই স্থানটি জলা ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং অনেকেই নিঃস্বত্বে অথবা স্বল্পস্বত্বে বহু স্থান দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

যাহা হউক বাণিজ্য ব্যাপারে অথবা ব্যবসায় বণিক্গণের যে কেন এত অভাবনীয় অবনতি সংঘটিত হইল তাহা ধারণার অতীত। ভাগ্যলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি বশতঃ দেশের নৌগামী বহির্বাণিজ্য বন্ধ হইল, পরে ব্যবসায়ে ও সওদাগরী কার্য্যে মুৎসুদ্দিগিরীও অন্তর্হিত হইল। তাহার পর অনেকেই কেসিয়ারি কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং এখনও কেহ কেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একদিন যে বণিক্ সম্প্রদায় তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রভায় দেশ উদ্ভাসিত করিয়া গৃহে গৃহে কমলার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণ সামান্য মসীজীবী চাকুরীর জন্য লালায়িত। আমাদের সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে ব্যবসা-স্পৃহা একেবারে বিলুপ্ত। যাঁহাদের সুবিধা বা সঙ্গতি আছে, তাঁহারা ব্যবসা-সঞ্জাত ক্লেশ স্বীকারে অনিচ্ছুক। যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদের অধিক সংখ্যক চাকুরীজীবী; অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে জাতির আর্থিক অবস্থা কখনই উন্নত হইতে পারে না। জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন ব্যতীত জাতির ধনভাণ্ডার কখনই পূর্ণ হইতে পারে না।

যেদিন হইতে সুবর্ণবণিক্গণ স্বীয় বর্ণোচিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত সূচিত হইয়াছে। প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় কোনও পরিবার মধ্যে কেহ নিজ অধ্যবসায়-বলে অথবা মেধাশক্তি-প্রভাবে ধনার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন, তাঁহার পুত্রগণ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কোনও রূপে প্রতিষ্ঠিত কারবার চালাইলেন, কিন্তু তন্নিম্নপুরুষ বংশধরগণ ধনিসুলভ চপলতা-প্রযুক্ত শ্রমবিমুখ হইয়া পরহস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিলেন, ফলে তাহা অচিরকাল মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হইল। বঙ্গদেশে সঙ্ঘশক্তির এবং অন্যোন্য বিশ্বাসের অভাবে বড় বড় কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ব্যবসা-বুদ্ধিও এই প্রকার অনাস্থা এবং ঔদাসীন্য বশতঃই প্রণষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যাহাতে বণিক্গণের মধ্যে সেই লুপ্ত ব্যবসা-বুদ্ধি স্ফুরিত হয় সমাজসেবিগণের সেই বিষয়ে দৃষ্টি নিপতিত হওয়া উচিত।

সমাজের মধ্যে যে উচ্চশিক্ষার আবশ্যকতা নাই আমি তাহা বলি না; যাহাদের প্রখর ধীশক্তি, সমুচিত সঙ্গতি ও শিক্ষা বিষয়ে একাগ্রতা আছে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে উচ্চশিক্ষার সাফল্যে যত্নবান হইবে ইহা অবধারিত; কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটে উচ্চশিক্ষা কোনও সমাধান করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। দেশে উচ্চশিক্ষিত যুবকের অভাব নাই, কিন্তু প্রায় সকলেরই লক্ষ্য চাকুরী; এই সহজসাধ্য বৃত্তি লাভের জন্য সকলেই লালায়িত; ফলে বেকার-সমস্যা বর্ত্তমান জীবন-সমস্যাকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে জীবনোপায়ের নূতন ধারা বা পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে না পারিলে বাঙ্গালী জাতির গত্যন্তর নাই।

বঙ্গে সুবর্ণবণিক্গণ অন্যতম ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন। দেশের এই দুর্ব্বিপাকে এখন আমাদিগকে আমাদের কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লইতে হইবে। দেশের দৈন্য অপনোদনের জন্য আমাদিগকে পুনরায় কৃষি-বাণিজ্যের

উৎকর্ষসাধনে ব্রতী হইতে হইবে। এখনও আমাদের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ী আছেন, আবশ্যক বোধে তাঁহাদের পরামর্শ ও সহায়তা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমে ছোট ছোট ব্যবসা প্রবর্ত্তন করিয়া সততা ও অধ্যবসায় বলে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। কৃষিকার্য্য এখন কেবল কৃষকের হাতে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের জন্য বণিক্ সম্প্রদায় দায়ী, এখন পুনরায় লুপ্তবাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশে বৈশ্যশক্তির বিকাশ করিতে হইবে। জাতিসুলভ কর্ম্মমহিমায় দেশবাসীর চিত্ত জয় করিতে হইবে, নতুবা সংস্কার চালিত বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ কখনই আমাদিগের বৈশ্যত্বের দাবী স্বীকার করিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য।

আমাদের সম্প্রদায়ের বালক ও যুবকগণের মধ্যে যেমন একদিকে ব্যবসা-স্পৃহা উদ্দীপিত করিতে হইবে, তদ্রূপ অন্য দিকে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য জাতীয় জনসাধারণের বিশেষতঃ অবস্থাপন্ন স্বজাতিবর্গের অবহিত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের জাতির মধ্যে এই সহানুভূতিসূচক প্রবৃত্তি একেবারেই নাই। আমাদের জাতীয় ডাক্তার, উকিল, এটর্ণী, ইঞ্জিনিয়ার, প্লাম্বার বা অপর বিশিষ্ট ব্যবসায়িগণ আমাদের জাতির নিকট সমুচিত সাহায্য পাওয়া দূরের কথা, অনেক স্থলে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপেক্ষিত। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, অবস্থা বিশেষে এই প্রকার পক্ষপাতিত্ব অপরিহার্য্য, কিন্তু সামর্থ্য-পক্ষে যদ্যপি ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে হৃদয় ব্যথিত হয়। এখন যতদিন আমাদের প্রাণে এই ভাবের অভ্যুদয় না হইবে ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতিকল্পে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

স্বর্গীয় সুদামচন্দ্র শীল

শ্রীননীগোপাল দে

স্বর্গীয় ডাক্তার সুদামচন্দ্র শীল ১২৭৮ সালের ১৬ই ভাদ্র কলিকাতার অন্তর্গত শুরতী বাগান নামক স্থানে প্রসিদ্ধ শীল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক সত্যনিষ্ঠ অমায়িক প্রকৃতি ৺রামচাঁদ শীল মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পিতার সমস্ত সৎগুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি প্রথমে এল্‌বার্ট স্কুলে বিদ্যারম্ভ করেন এবং ১৮৯০ সালে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া মেট্রোপলিট্যান কলেজে তদানিন্তন ফাষ্ট আর্টস্ অধ্যয়ন করেন। এই সময় তাঁহার পিতা পরলোক গমন করায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ডাক্তার কানাই লাল শীল মহাশয়ের যত্নে তিনি ১৮৯২ সালে ফাষ্ট আর্টস্ পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। সেখানে তিনি ১৮৯৩ সালে প্রথম বৎসর পাঠ করিয়া মেডিকেল কলেজ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৯৭ সালে তিনি মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডাক্তার হইয়া তিনি দুই মাস কর্পোরেশনের হেল্‌থ ইন্সপেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন; তৎপরে তিনি রয়েল মেডিকেল হল নামক ডিস্‌পেন্সরি খুলিয়া নিজে সাধারণের চিকিৎসা করিতে থাকেন। তাঁহার হৃদয় দয়ার আধার ছিল। পরের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত ও পরোপকারার্থ তিনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। তিনি যখন নূতন ডাক্তারি করেন গরীবদের নিকট হইতে ফি লইয়া উক্ত টাকায় তাহাদের পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আমাদের সমাজে যাঁহার সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল বা অন্য যাঁহার সহিত বন্ধুত্ব ছিল, মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনেকের

নিকট হইতে কখন ফি লইতেন না। তিনি বহু আত্মীয়ের প্রতিপালক ও গরীবের মা-বাপ ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহাস্য বদন, সুমিষ্ট বচন, সদালাপ প্রত্যেক রোগী কিম্বা ভোগী যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারই হৃদয় আনন্দ-রসে পরিপ্লুত করিয়াছিল। পরিবারবর্গের সুখ বিধান ও আনন্দ বর্দ্ধন করা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

যদিও তিনি অপুত্রক ছিলেন তথাপি তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে নিজের পুত্রাপেক্ষাও সকল বিষয়ে অধিক যত্ন করিতেন এবং তাহাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করাই তাঁহার একমাত্র জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; বহু সমিতি ও খেলাধূলায় তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। কেহ তাঁহার সাহায্য চাহিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তিনি যথাযথ মানীর মান রক্ষা করিতেন এবং সেইজন্য অতুলনীয় ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন।

তিনি ১৯১৫ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে ৮নং ওয়ার্ডের কমিশনার হইয়া উক্ত পদ অতি মর্য্যাদার সহিত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মিউনিসিপাল গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। যখন গভর্ণমেণ্ট কলুটোলা ষ্ট্রীটে ট্রপিক্যাল ল্যাবরেটরীর সম্মুখে জনবহুল স্থানে লেপার এসাইলাম্ স্থাপন জন্য উদ্যোগ করিয়াছিল, তখন তাঁহার চেষ্টায় সাধারণের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় উক্ত স্থান মনোনীত হয় নাই। স্ফূর্ত্তি বাগান অন্তর্গত জ্যাকারীয়া ষ্ট্রীটে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার জন্য কিছু জমি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট হইতে তিনি খরিদ করিয়া দেন; পরে উক্ত মন্দির গত হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামায় ভগ্ন হওয়ায় তাঁহারই প্রযত্নে সংস্কার ও পুনঃ স্থাপনা হয়।

গত ১৪ বৎসর যাবৎ মিউনিসিপালিটির কাজ তিনি অতি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত করিতেন ও নিজের ডাক্তারি কাজ সত্ত্বেও অতিশয় গুরু পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না, বোধ হয় তজ্জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় ও অকাল মৃত্যু উপস্থিত হয়। গত ২রা ভাদ্র ১৩৩৫ সাল শনিবারে রাত্রি ১২টা ১০ মিনিট সময়ে ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তাঁহার আত্মীয়, পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে কাঁদাইয়া সাধোনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।

পঞ্চপুষ্প

যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট

আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট কুলিজের কার্য্যকাল অবসান হওয়ায় নূতন নির্ব্বাচনে মিষ্টার হুভার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি আইওয়ার একজন গ্রাম্য কর্ম্মকারের পুত্র। ষ্ট্যালফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়মে ১০ লক্ষ বিপন্নকে দৈনিক আহার যোগাইয়া ছিলেন।

স্বাস্থ্য

খাদ্যাভাব পরিপূরণ

পৃথিবীর লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থানে পাহাড়-পর্ব্বত ছিল, যে সমস্ত স্থান মানুষের কোনই কাজে আসিত না, তথায় ক্রমশঃ লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে; এমন কি স্থানাভাববশতঃ কোনও কোনও স্থলে কৃষি-ভূমিকেও আবাস ভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং হইতেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস লক্ষ্য

করিয়া সাধারণ লোকের একটা ভয় হইয়াছে। পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গলে ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ হইল, চাষের ভূমিও সহরে পরিণত হইল, এখন লোকে কি খাইয়া বাঁচিবে! চাষের ভূমিতে বাসের ভূমি হইলে ফসল আসিবে কোথা হইতে এবং লোকজনই বা কি ভাবে প্রাণ ধারণ করিবে! ভবিষ্যৎ বংশধরগণের যে আরও ভীষণ দুরবস্থা হইবে।

আমেরিকার ডাঃ বার্ণার্ড নামক জনৈক রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ এই সমস্যার এক সমাধান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নবাবিষ্কার দ্বারা ভীত লোকজনকে আশ্বস্ত করিতেছেন যে, ভবিষ্যতে খাদ্যের কোন অভাব হইবে না। রুটি, ডাল, ভাত, মাংস প্রভৃতির অভাব হইতে পারে কিন্তু তাহাতে লোকের মৃত্যুর কোনও কারণ নাই। এই খাদ্যের স্থলে নূতন খাদ্য প্রয়োগ করা যাইবে। খাদ্য জগতে আমূল পরিবর্ত্তনের দ্বারা লোকের খাদ্যাভাব আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। তিনি বলেন, সূর্য্যালোক, বায়ু এবং সমুদ্র-জল খাদ্যের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ। সূর্য্যের আলোক হইতে প্রাতঃকালের আহার পাওয়া যাইবে। বেলা নয়টার আহার বায়ু হইতে সংগৃহীত হইবে। আর মধ্যাহ্নের আহার সমুদ্র-জল হইতে পাওয়া সম্ভব। আটলান্টিক মহাসাগরের পাঁচ শত মিটার জলের নিম্ন হইতে এক লিটার পরিমাণ জল লইয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে পাঁচ হাজার সেল্ আছে। এই পাঁচ হাজার সেল্‌কে পঁচিশ লক্ষে পরিণত করা যায়। মৎস্য প্রভৃতি সামুদ্রিক জীব এইগুলি খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। মানুষ এই সমস্ত সেল্ অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে। তাহাতে বর্ত্তমান খাদ্যের কাজ চলিবে। তাঁহার মতে শীঘ্রই পৃথিবীর এমন দিন আসিবে, যখন মানুষ মাংস-রুটির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইবে এবং উক্ত সেল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করিবে।

ক্ষুদ্র ঘড়ীর আবিষ্কার

ইনজারসল নামক এক সাহেব দুই পাউণ্ড মাত্র সম্বল করিয়া নিউইয়র্ক গমন করেন। তথায় পৌছিয়া যে বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তথায় একটি বৃহৎ ঘড়ী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তখনই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, যতক্ষণ ঘরে বসিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ এই ঘড়ী সময় বলিয়া দিতে পারে কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলে ইহার দ্বারা আর কোনও উপকার হয় না। যদি আরও ছোট করিয়া তৈয়ার করা যায়, তাহা হইলে হয়ত সেইগুলি সঙ্গে করিয়া বাহিরে যাইয়াও সময় জানিতে পারা যাইবে। অনতিবিলম্বে তিনি ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া গেলেন। বহু চেষ্টার পর অবশেষে তিনি এই ছোট ঘড়ী (ওয়াচ্) নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথমে পকেট ঘড়ি বা ওয়াচ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই সুপ্রসিদ্ধ ঘড়ী নির্ম্মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। সঞ্জীবনী

বাঙ্গালী মুসলমান মহিলার বিলাত যাত্রা

কুমারী ফজিলাখাতুন নেছা নামিকা এক মুসলমান মহিলা এম্ এ পরীক্ষায় পাশ হইয়া বিলাত যাইতেছেন। ইনিই প্রথম বিলাত যাত্রী বাঙ্গালী মুসলমান মহিলা।

জনমত

৯ পুরুষের ঠাকুর দাদা

চীনদেশে ওয়াসিং ঝেচুয়াং নামক নগরের নিকটে কাইসিং নামক গ্রামে লীচিয়াং নামক এক বৃদ্ধ বাস করে তাহার বয়স ২৫০ বৎসর। ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত মাঞ্চুবংশের বিভিন্ন রাজার অধীনে সে সৈনিকের কাজ করিয়াছে। এত বয়স হইয়াছে তথাপি এখন সে ৪০ মাইল করিয়া হাঁটিতে পারে, যুবকের মত আহার করে। সে ১৪ বার বিবাহ করিয়াছে, বৃদ্ধের বংশ এগার পুরুষ পর্য্যন্ত নামিয়াছে; বংশধরগণের সংখ্যা ২৮০। তাহার বর্ত্তমান পত্নীর বয়স ২৫ বৎসর। বাংলারবাণী

সুড়ঙ্গ-পথে রেল

ফ্রান্সের দক্ষিণে পিরিনিজ পর্ব্বত ভেদ করিয়া একটা রেলের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা দক্ষিণ ফ্রান্স উত্তর স্পেনের সহিত রেল লাইন দ্বারা সংযুক্ত হইল। ফরাসী দেশের রাষ্ট্রপতি ও স্পেনের রাজা মিলিত হইয়া রেল লাইন খুলিয়াছেন।

সোম ও মঙ্গল

স্যার অলিভার লজ্ লণ্ডনের মার্লি কলেজে চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, চন্দ্র এক সময়ে পৃথিবীর অংশ ছিল। সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্যুত পৃথিবী যখন শূন্যমার্গে থাকিয়া ঘূর্ণীত হইতেছিল, তখন কতিপয় জ্বলন্ত ধাতব পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্র-উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে। কাহারও মতে প্রশান্ত মহাসাগর অথবা হিমালয় পর্ব্বতের অংশ বিশেষই চন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে একটা পরস্পর আকর্ষণ আছে। পৃথিবীর আকর্ষণ বলবান্। তাহাতে চন্দ্র ক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। দশ লক্ষ বৎসর পরে চন্দ্র আসিয়া পৃথিবীর গায়ে ধাক্কা দিবে।

তাঁহার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বাণী—এক হাজার বৎসরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহ এবং তাহার উপগ্রহের মধ্যে এক সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। পৃথিবীর লোক তাহা দেখিতে পাইবে। এই সংঘর্ষে মঙ্গলের অধিবাসীর বিপদের সম্ভাবনা।

নূতন ফটোগ্রাফ

স্বাভাবিক বর্ণে ফটোগ্রাফ তুলিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণ ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরাতেই স্বাভাবিক বর্ণের ছবি তোলা যায়। এই ফটো তুলিতে এক সঙ্গে তিনটা নিগেটিভ ব্যবহার করিতে হয়। আলোকের তীব্রতার উপর প্রত্যেকটি বিভিন্ন নিগেটিভ কার্য্য করে। উহা হইতে কাগজে ফটো তুলিতে হরিদ্রা, লাল ও নীল রঙ্গের পাতলা কাগজ ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি কাগজ লাগাইলে স্বাভাবিক রঙ্গে ফটো দেখা যায়। এইরূপে তোলা ছবি দেখিয়া মনে হয় যেন কোনও শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এই ছবি নানাবর্ণে আঁকিয়াছেন। বস্ত্র, ফল প্রভৃতি নানা বর্ণের দ্রব্য তুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্বাভাবিক বর্ণের উৎকৃষ্ট ছবি হইয়াছে।

কৃত্রিম মাথার খুলি

কানাডার অন্তর্গত টোরেণ্টো সহরের এক ব্যক্তি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইবার সময় বিদ্যুতের তারের সহিত তাহার মাথা স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা দিয়া বিদ্যুৎ পরিচালিত হয় ও সেই ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়া পড়ে। হাসপাতালে তাহার মাথার খুলি পচিতে আরম্ভ করে, এগার মাস পরে অস্ত্র-চিকিৎসক আর উপায় নাই দেখিয়া তাহার মাথার খুলির দশ ইঞ্চি লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া স্থান কাটিয়া ফেলিয়া দিতে বাধ্য হন। তৎপরে তাহার জঙ্ঘা হইতে চামড়া কাটিয়া মাথায় লাগাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে তাহার মস্তিষ্ক আচ্ছাদিত হয় বটে কিন্তু তাহার নীচে অস্থি ছিল না। অনেক যত্নের সহিত তাহার মাথার এক ছাচ লওয়া হয় ও রবার, গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের প্রস্তুত 'বেকালাইট' নামক এক পদার্থের দ্বারা এক কৃত্রিম খুলি তাহার মাথার মাপে তৈয়ারী করিয়া, তাহার মাথায় বসাইয়া দেওয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার আর কোনও অসুবিধা নাই। সঞ্জীবনী

কৃত্রিম মাংস

জাপানে ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটির ভাইকাউণ্ট আর্কিবা ডই নামক এক গ্র্যাজুয়েট কৃত্রিম উপায়ে মাংস তৈয়ার করিতে শিখিয়াছেন। তিনি দশ বৎসর যাবৎ ইহার গবেষণা করিতেছিলেন। তবে তাহার পূর্ব্বেও ঐরূপ এক প্রক্রিয়া জার্ম্মাণিতে এবং আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিয়টো সহরের নিকটে উজি নামক স্থানে যথেষ্ট চা জন্মে। তথায় তিনি এই মাংস উৎপাদন করিবার চেষ্টায় আছেন। এই মাংস স্বাদে প্রায় আসল মাংসের ন্যায়।

মরুভূমিতে কৃষিকার্য্য

আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছে। ফরাসী-গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি তুনিসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশই পরীক্ষা করা হইতেছে। মরুভূমি হইতে তিনটি পৃথক পৃথক খাল কাটিয়া ভূমধ্যসাগরের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ এটলাস পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত

একটি নদীর জল বাঁধিয়া তাহা সাহারার দিকে যাহাতে গমন করে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যদি এই প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হয় এবং সাহারা কর্ষণোপযোগী হয় তাহা হইলে তথায় ভারতীয় শস্যাদি, ফল, চা, তুলা, আঁখ ইত্যাদির কৃষি করা হইবে। দেখা যাউক এই চেষ্টা কতটুকু ফলবতী হয়।

ভূগর্ভে প্রোথিত পল্লীগ্রাম

আটলান্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত অর্কনে দ্বীপপুঞ্জের সাকাইল বের নিকট অতি প্রাচীন কালের একটি গ্রাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ভীষণ ঝড়ের পর প্রথমে গ্রামের সামান্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তখন কৌতূহল বশতঃ খনন করিতে করিতে এই গ্রামের খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ছয়টি বাড়ী দেখা যায়। মেঝের বাঁধা এক স্ত্রীলোকের কঙ্কালও পাওয়া গিয়াছে। কঙ্কালের পাশে রান্না করিবার আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। রাস্তা-ঘাটের চিহ্ন সমস্ত বিদ্যমান! এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গর্ডন বলেন পশ্চিম ইয়োরোপে এইরূপ অভিনব আবিষ্কার আর দেখা যায় নাই।

বৃহৎ জাহাজ

বেলফাষ্টে একখানি জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। এই জাহাজখানি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সুন্দর জাহাজ হইবে। এই জাহাজখানিতে ষাট হাজার টন মাল ধরিবে। নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইতে তিন বৎসর লাগিবে এবং ইহাতে নয় কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

নূতন মনুষ্য জাতি

মস্কতের সুলতানের অর্থসচিব মিঃ বারট্রাম থমাস আরব দেশে ভ্রমণোপলক্ষে দুইটি লুপ্ত মুসলিম জাতির সন্ধান পাইয়াছেন। ইহারা চারিটি ভাষায় কথা বলিতে পারে। তাহাদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য। স্ত্রীলোকগণ মাথার মধ্য দিয়া আধ ইঞ্চি পরিমাণ চুল লম্বালম্বি ভাবে কামাইয়া ফেলে, পুরুষেরা গোঁফ রাখে না অথচ এক গোছা দাঁড়ি রাখিয়া দেয়। উত্তপ্ত লৌহ শলাকা জিহ্বায় লাগাইয়া দোষী-নির্দ্দোষ নির্ণীত হয়। যাহারা দোষী তাহাদের জিহ্বা পুড়িয়া যায়। সঞ্জীবনী

পৃথিবীর সর্ব্বত্র নারী-আন্দোলন

জার্ম্মাণী—সম্প্রতি তথাকার ব্যবস্থাপক সভার (রিস্ট্যাগ) যে নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে ৩১ জন জর্ম্মণ নারী সভ্য হইয়াছে।

ইংলণ্ড—হাউস অফ লর্ডসে নারীর ভোটের অধিকার আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উহার পক্ষে ১১৯ জন এবং বিপক্ষে ৩৫ জন ভোট দিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে লেডী হিথ্ সর্ব্বপ্রথমে আসিয়াছেন। লেডী বেলী ইংলণ্ড হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এরোপ্লেনে গিয়াছেন।

ভারত—সিংহলে নারীগণ মিলিয়া ভোট পাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক সমিতি গঠন করিয়াছেন। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই নারীরা ভোটের অধিকার পাইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ—এদামে মিন নামক ব্রহ্মদেশীয় নারী রেঙ্গুনের হাইকোর্টে সহকারী রেজিষ্ট্রাররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কার্য্যে নারীকে এই প্রথম নিযুক্ত করা হইল।

আয়র্লণ্ড—উত্তর আয়র্লণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, আগামী হেমন্ত কালে পার্ল্যামেন্টের অধিবেশনে নর ও নারীর সমান অধিকারের আইন গঠনের জন্য উপস্থিত করা হইবে।

জাপান—সম্প্রতি যে নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে নারী বক্তার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে আবেদন আসিয়াছে। নারীর ভোটাধিকার-সঙ্ঘের কুমারী কানেকো ১৮ দিনে ৩৯ বার বক্তৃতা করিয়াছেন, অন্যান্য নারী ৩০ হইতে ৬০ বার বক্তৃতা করিয়াছেন এবং নানা স্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ভীষণ তুষার-ঝটিকায় অশ্ব পৃষ্ঠে গমন করিতে হইয়াছে।

পোর্টো রিকো—যদিও এই দেশ আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অধীন, তথাপি এই দেশের নারীর ভোট দিবার

ক্ষমতা নাই। এই স্থানের নারী-ভোটাধিকার-সমিতির প্রতিনিধি ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের সমক্ষে যাইয়া নারীর ভোট পাইবার জন্য আইন প্রবর্ত্তনের দাবী করিয়াছেন।

সঞ্জীবনী

ভারতের ডাকঘর

১৯২৬-২৭ সাল

কর্ম্মচারীর	সংখ্যা	১০৯,৭২৫ জন
ডাকঘরের	"	২০,৭৬৭টা
প্রেরিত জিনিষের	"	১২৯৩৫ লক্ষ
তন্মধ্যে রেজিষ্টারী করা	"	৫১০ লক্ষ
ষ্ট্যাম্প বিক্রয়	"	৬ কোটি টাকা
মনি অর্ডার	"	৮,৯৭০ লক্ষ টাকা
টেলিগ্রাফ "	"	৩৭০ লক্ষ টাকা
ভি পি	"	২,৭৩০ লক্ষ টাকা
ইনসিওর করা চিঠি		১৬,৩২০ লক্ষ টাকা
বিদেশাগত দ্রব্য		৮০ লক্ষ টাকা
পেন্সন ব্যয়		১৫৮০ লক্ষ টাকা
কুইনাইন বিক্রয়		১৩,৪৯৫ পাউণ্ড
সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক হিসাবের সংখ্যা		২,৫১৮,১৪২টা
" "	জমা টাকা	২২৫০ লক্ষ টাকা
ডাকঘরের জীবন বীমার সংখ্যা		৫৩৫৪৮টা
" "	টাকা	১০১০ লক্ষ টাকা

ডেড্‌লেটার অফিসে চিঠি জমা হয় ১০,১৪১০,৪৭টা তাহার শতকরা ৪২ খানা গন্তব্যস্থানে পাঠান হইয়াছে; অবশিষ্ট প্রেরকের কাছে ফেরত গিয়াছে।

ডেড্‌লেটার অফিসে চেক, মুদ্রা প্রভৃতি জমা ৮॥০ লক্ষ টাকা। ইহার অধিকাংশ গন্তব্য স্থানে বা প্রেরকের কাছে পাঠান হইয়াছে।

ডাক লুট		১৮ বার
তাহাতে ডাক বহনকারী আহত		৬ স্থানে
ঐ ঐ	নিহত	২ "
ডাকলুটে ক্ষতি		১২,৪৭৮ টাকা
ব্যাঘ্রের মুখে রাণার		২ জন

সঞ্জীবনী

প্রাণীর পরমায়ু

মানবেতর প্রাণীদিগের ভিতরে প্রাণীভেদে পরমায়ুর ভেদ নানাপ্রকার দেখা যায়। খরগোস গড়ে ১০ বৎসর এবং গৃহপালিত বিড়াল ১৪ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কোন কোন বিড়াল ২৩ বৎসর বাঁচিয়াছে এইরূপও দেখা গিয়াছে। ঘোড়া, গাধা এবং জেব্রার আয়ু সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৩০ বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়। শূকর ২০ বৎসর এবং গৃহপালিত জন্তু ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। সিংহ, ব্যাঘ্র এবং ভল্লুকের আয়ু গড়ে ৩০ পর্য্যন্ত পৌঁছে বলা যায়। রাজহাঁস ৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল বাঁচে। ঈগল ও সোয়ান পাখী ১০০ বৎসরের অধিক কাল বাঁচে। তোতা পাখী সাধারণতঃ ৮০ বৎসরের অধিক বাঁচে, এরূপ দেখা যায়। কচ্ছপ ২০০ বৎসরেরও অধিক কাল বাঁচিয়াছে এরূপ জানা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী প্রাণী তিমি। তিমি নিহত না হইলে সাধারণতঃ ৬০০ বৎসরের অধিককাল বাঁচে।

শিক্ষাসমাচার

একপক্ষ বিমান-যান

জার্ম্মাণী গত যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও উদ্যম অজেয়। জার্ম্মাণীর ব্যারণ ফ্রেডারিক ভন কেয়েনিক ওয়ার্টহিসেন সম্প্রতি একপক্ষবিশিষ্ট এরোপ্লেনে চড়িয়া জার্ম্মাণী ছাড়িয়া রুশিয়ার মস্কোতে একটি দন্ত মার্জ্জনার ব্রুস ও একটি তোয়ালে লইয়া বাহির হন। বিনা আয়াসে মস্কো পৌঁছিয়া তাহার ইচ্ছা হইল যে, আর কতদূর ঐ এরোপ্লেনে যাইতে পারেন তাহা দেখেন। এবং ক্রমে কাস্পিয়ান হ্রদের বাখু সহরে উপস্থিত হন, ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে করাচী আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। তাহার ক্ষুদ্র এরোপ্লেন ২০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট এবং তাহার মূল্য ৫৬০০৲ টাকা। তিনি ১৪ ঘণ্টা উড়িয়া ১২০০ মাইল আসিয়াছেন! তিনি বিনা কষ্টে ও যানের যন্ত্রাদির অবিকল অবস্থা লইয়া ভারতে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার এঞ্জিনে মাত্র দুইটি সিলিণ্ডার আছে। উহা দুই ঘণ্টার মধ্যে খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া

পুনরায় যথাস্থানে বসান যায়। এরোপ্লেনখানি ক্ষুদ্র হইলেও উহা ২০ হাজার ফুট উচ্চে উঠিতে পারে, ঘণ্টায় ৭৫ মাইল উড়িতে পারে। ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় ২॥০ গ্যালন পেট্রল খরচ হয়। তিনি কলিকাতাতেও আসিবেন। ক্ষুদ্র এরোপ্লেনের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর। সঞ্জীবনী

আমরা কোথায় ?

ভারতবর্ষে ২৩৯০ নগর আছে, কিন্তু গ্রাম ৭০০,০০০ সাত লক্ষ। বঙ্গদেশে নগর ১৩০টি, গ্রাম ৮৫,০০০ পঁচাশি হাজার। ভারতীয় পল্লীসমূহে কিঞ্চিদধিক ২৮ কোটি লোকের বাস। পল্লীই সত্যিকার দেশ।

বাংলার জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত ৩৬; এতন্মধ্যে মাত্র ১২ লক্ষ ১৮ হাজার লোকের ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে; মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৮ ভাগের এক ভাগ লোক ভোট দিতে পারে।

বাংলার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর গড়ে প্রত্যেক ইয়োরোপীয় ছাত্রের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন ১০৩।০ (এক শত তিন টাকা চারি আনা) এবং প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষার জন্য ২॥৶০ (দু' টাকা এগার আনা)!! রাজকরের বেশীর ভাগ দিতেছে বাঙ্গালী; কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা হইতেছে কাহাদের ?

জার্ম্মাণী ও ডেনমার্কে এক ব্যক্তিও নিরক্ষর নহে; এই দুই দেশে প্রতি ১০০ জন অধিবাসীর মধ্যে ১০০ জনই শিক্ষিত। ভারতবর্ষে শতকরা ৫·২ জন পুরুষ ও ১·৫ জন নারী লিখনপঠনক্ষম।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে ·০৪ পাউণ্ড চা, ·০৬ গ্যালন মদ্য ও ১৭·৬ গ্রেণ অহিফেন সেবন করিয়াছে।

প্রত্যেক	ব্যক্তির	গড় পরমায়ু	
ইংলণ্ডে	৫১	বৎসর	৫ মাস
আমেরিকায়	৫৫	,,	,,
নিউজিল্যাণ্ডে	৬০	,,	,,
ফ্রান্সে	৪৮	,,	,,
জার্ম্মাণীতে	৪৭	বৎসর	৪ মাস
ইটালীতে	,,	,,	—
জাপানে	৪৪	,,	৩ মাস
ভারতে	২৩	,,	৭ মাস

ভারতে একদিন অকাল মৃত্যু ছিল না।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য প্রতি একর জমীর পিছনে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করেন মাত্র ৩ পয়সা, অথচ এদেশের শতকরা ৭০ জন অধিবাসী কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অন্যপক্ষে আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের শতকরা মাত্র ৩০ জনের পেষা কৃষিকার্য্য; কিন্তু ঐ দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতি একর জমির পিছনে ৬ আনা অর্থাৎ ভারতের কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য যাহা ব্যয়িত হয়, তাহার ৮ গুণ অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন। জাপান ভারতের অপেক্ষা অনেক ছোট দেশ; কিন্তু জাপান গভর্ণমেণ্টও জাপানের কৃষি-কার্য্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা সমস্ত ভারতে গত বৎসর কৃষি কার্য্যের জন্য যাহা খরচ করা হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশী।

নীহার

বোম্বাই প্রদেশে শিল্পোন্নতি

মাটির বাসন

কাথিয়াওয়াড়ের থান রোডে গোরাব দালাল টাইল ওয়ার্কস নামক কারখানা খুলিয়া এসিড দ্বারা আক্রান্ত হয় না এরূপ মাটির আধার তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতেছে এবং বোম্বাইতে দোকান খুলিয়া গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় চীনা মাটির আধারাদি প্রস্তুত করিতেছে। ইহার বিক্রয় এত অধিক হইয়াছে যে, সত্বাধিকারী ঐ প্রকার বিক্রয়ের জন্য জিনিষ করিতে যাইয়া উহার আরও উন্নতি করিবার সময় পান না! বিক্রয়াধিক্যের জন্য আরও অধিক যন্ত্র ক্রয় করিয়া অধিকতর দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে। এই কার-খানায় মাটির আধার, ফায়ার ব্রিক, রাণীগঞ্জ টালি প্রভৃতি প্রচুর তৈয়ারী হয়।

তেলেগাঁওর পয়সা ফাণ্ড গ্লাস ফ্যাক্টরি চীনা মাটির বিভাগ খুলিয়াছে এবং এসিড দ্বারা অনাক্রান্ত মাটির আধার, খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে।

কাচের কারখানা

মহাযুদ্ধের সময়ে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বোম্বাইতেও কয়েকটা কাচের কারখানা খোলা হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধান্তে যখন সস্তায় বিদেশী দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল, তখন প্রতিযোগিতায় আঁটিতে না পারিয়া তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখনও তিনটা কাচের কারখানা আছে।

ওয়গালে ওয়াদি গ্লাস ওয়ার্কস বোম্বাই প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ল্যাম্পের চিমনী প্রভৃতি ব্যতীত, ফুলদানী বোতল, বাতাস প্রবেশ না করে এরূপ আধার, ইলেকট্রিক বাতির শেড প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। ওগলে নামক তথাকার একজন এজেন্ট শিল্প-বিভাগের বৃত্তি লইয়া ইয়োরোপে এই শিল্পে শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কারখানার অনেক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং পুনরায় নিজ ব্যয়ে ইয়োরোপ গমন করেন ও প্রত্যাগমন করিয়া আধুনিক হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত করা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুতে মনোযোগ দিয়াছেন। ইহার এক এনামেলের বিভাগ খোলা হইয়াছে তথায় এনামেলের সাইন বোর্ড তৈয়ারি হইতেছে। যে জিনিষ তৈয়ারি হইতেছে তাহা অতি সুন্দর হওয়ায় পূর্ত্ত বিভাগের গোচরে আনা হইয়াছে।

পয়সা ফণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস তাহাদের কর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়া চিনা মাটির কারখানা খুলিয়াছে। সাধারণ চিমনী প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছে কিন্তু এ জিনিষের অতি বেশী প্রতিযোগিতা আছে। বিদেশী কাচের দ্রব্য প্রতি ডজন ১৷৷০ দরে বোম্বাইতে বিক্রয় হয় এবং এই দরে এ দেশে ঐরূপ চিমনী তৈয়ারী করা অসম্ভব। এই কারখানায় কাচ গলান ও ফুকা কাচ প্রস্তুত করা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্থান হইতে ভারতের সর্ব্বত্র কাচ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম ও একক অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য কাচের কারখানার উপকারার্থে শিক্ষিত লোককে কাচ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া তৈয়ারী করিয়াছে।

নাশন্যাল গ্লাস ওয়ার্কস মাজাগাঁও বোম্বাই সহরে ল্যাম্পের চিমনী, আধার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে এবং বৃহৎ সহরের নিকটে অবস্থিত বলিয়া যান-বাহনাদিতে ব্যয় না করিয়া সহজে প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিতেছে।

প্রভাকর ল্যান্টার্ণ ফ্যাক্টরি, করাদওগালে গ্লাস ওয়ার্কসের লণ্ঠন কারখানা বিচক্ষণতার সহিত নির্ম্মিত, সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ ও কার্য্যকরী এবং অতি আধুনিক পরিশ্রম-লাঘবকারী যন্ত্র দ্বারা চালিত। আমেরিকার প্রস্তুত হারিকেন লণ্ঠন এদেশে যাহা প্রচুর বিক্রয় হইতেছে, তাহা প্রস্তুত করিবার উপযোগী যন্ত্র বসান হইয়াছে। এই কারখানায় যে লণ্ঠন প্রস্তুত হয় তাহা অতি উচ্চ শ্রেণীর এবং মূল্য ও উপাদানে আমদানী করা দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। সমস্তটা পিতলের তৈয়ারী লণ্ঠন বাজারে বিক্রয় হইতেছে এবং ঐ আকৃতির সস্তা টিনের লণ্ঠন তৈয়ারী সম্বন্ধে পরীক্ষা হইতেছে।

সকল সহর ও গ্রামে এই প্রকার লণ্ঠনের বিক্রয় অধিক। যাহাতে দূরে পাঠাইলে এই লণ্ঠন না ভাঙ্গে তজ্জন্য করগেট করা পিচবোর্ডের বাক্স উভয়ই প্রস্তুত হইবে। ওয়াগালের ভ্রাতাগণ ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী ও আমেরিকায় এই শিল্পে অভিজ্ঞ হইয়াছেন।

সঞ্জীবনী

কুটির-শিল্প

কেহ কেহ মনে করেন যে, আমাদের লুপ্তপ্রায় কুটির-শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলেই আমাদের সকল অভাব মিটিবে। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে কলকারখানা স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই ও আমাদের দেশে তাহা ভাল চলিবে না, কারণ আমাদের জাতিগত স্বভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত কলকারখানা কখনো মিশ খাইবে না। এতকাল যে তাঁতী, কর্ম্মকার আমাদের সকল অভাব মোচন করিয়াছে আজও তাহারা তাহা করিতে পারে যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তাহাদের উপরে পড়ে, যদি আমরা বিদেশের সস্তার চটকদার জিনিষের মোহে না ভুলি ও ভবিষ্যতের আশায় আপাততঃ

কিছুদিন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া দেশী তাঁতী ও কর্ম্মকারের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহার করি। তাহা হইলে, আমাদের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে ও বিদেশের উপরে কোন কারণে আমাদের নির্ভর করিতে হইবে না। কথাটি কতক পরিমাণে সত্য হইলেও এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক বাধা আছে। প্রথমতঃ কল-কারখানা একেবারে লোপ করিতে কেহ কখনো পারিবে না। পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে প্রতিদিন নূতন আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে অনেক কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে অনেক সহজে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইতেছে। এই সকল সুবিধা মানুষ কোন দিন ছাড়িতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে অবস্থায় আমাদের দেশের কুটির-শিল্পগুলি রহিয়াছে তাহাতে যে তাহারা এখনো বাঁচিয়া আছে তাহাই আশ্চর্য্যজনক। আজিকার দিনে কোন সভ্য জাতির সকল অভাব তাহা হইতে মিটিতে পারে না। আমাদের দেশের শিল্পী অশিক্ষিত, অসহায়, পুর্ব্বপুরুষানুক্রমে ঋণগ্রস্ত। তাহার পর বহুকালের অভ্যস্ত আচার ও প্রথা ত্যাগ করিয়া সে নূতন শিক্ষা লইতে ও নূতন পথে চলিতে অনিচ্ছুক। অপর দিকে বিদেশ হইতে প্রতিদিন সস্তায় সুদৃশ্য জিনিষ আসিয়া আমাদের দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিদেশী বণিকের একতা, অর্থ, শিক্ষা, শক্তি, চেষ্টা এ সকলই আছে। তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প কি করিয়া বাঁচিবে ও কেমন করিয়া কুটিরশিল্পের উদ্ধার হইবে?

এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে, কুটিরশিল্পের আর বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ও আজিকার কলকারখানার যুগে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই! আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বড় মূলধন লইয়া বড় বড় কলকারখানা যত শীঘ্র স্থাপিত হয় ও তাহাদের প্রণালীতে আমাদের দেশেও শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হয় ততই ভাল। কিন্তু বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করার যে বিষময় ফল ফলিয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্য জগতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই শঙ্কিত হইয়াছেন। কলকারখানায় দরিদ্র শ্রমিক নিষ্পেষিত হইতেছে ও সেই কারণেই ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। রাস্কিন, টলষ্টয় প্রমুখ দ্রষ্টারা আজীবন এই কলকারখানার সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী ইহারই বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন ও কবি রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, কল-কারখানার সভ্যতা নকল করিয়া আমাদের পরিত্রাণ লাভের কোন আশা নাই, উপরন্তু পাশ্চাত্য দেশের দোষগুলি টানিয়া আনিয়া আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার ভয় আছে।

কুটিরশিল্প ও কলকারখানা উভয়েরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে প্রণালীতে উহারা এতকাল পরিচালিত হইয়াছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এত অত্যাচার ও এতকাল ধরিয়া এত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে আজও কুটিরশিল্প বাঁচিয়া আছে তাহা হইতেই মনে হয় যে, ইহার মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে যাহার জন্য ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। বৎসরে প্রায় ছ'মাস আমাদের দেশের চাষীর হস্তে যথেষ্ট অবসর থাকে, আমাদের গৃহস্থের ঘরেও এমন অনেক লোক আছে যাহাদের হাতে এমন বিশেষ কিছু কাজ নাই। সেই অবসর সময় বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া যদি কোন শিল্প-কার্য্যে ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কতখানি শক্তি অপব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং তাহার সহিত কতখানি অভাব মোচন হয়, ভাবিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কলকারখানার বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে কাজ করিতে আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত নহি। অনেকের, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ঘর ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইয়া কাজ করা সুবিধাজনক নহে। ঘরে বসিয়া অবসর সময়ে কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন অনেকে করিতে পারে। এসব নানাদিক্ দিয়া ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহাতে দেশের ও তাহাদের উভয়েরই মঙ্গল। কুটিরশিল্পকে বাঁচাইবার আর একটি বড় কারণ আছে, পুরুষানুক্রমে শিল্পী যে নিপুণতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা নষ্ট হইতে দেওয়া বিধেয় নহে, কল-কারখানায় সুকুমার শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। অপর পক্ষে

কলকারখানারও প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র কুটির-শিল্পের দ্বারা আজিকার দিনে সকল অভাব মিটিতে পারে না, দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শুধু কুটিরশিল্পের দ্বারা তাহা হইবে না, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে আমরা কুটিরশিল্প ও কলকারখানা উভয়কেই সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে পারি।

কুটিরশিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিবার একমাত্র উপায় সমবায়, নতুবা প্রতিযোগিতায় আর ইহা দাঁড়াইতে পারিবে না। কুটিরশিল্পের মধ্যে প্রধান শিল্প হইতেছে বয়ন-শিল্প। তাঁতির মূলধন নাই, অধিকন্তু সে ঋণজালজড়িত, তাহাকে সকল কারণেই মহাজনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়, ফলে মহাজনই লাভ খায়, শিল্পীর কেবলমাত্র পরিশ্রম সার হয়। সমবায় প্রণালীতে জোট বাঁধিয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁতী উন্নততর যন্ত্রপাতি, সুবিধাদরে সুতা, অল্প সুদে টাকা ধার এ সকলই পাইতে পারে, এবং তৈয়ারী বস্ত্রের কাট্‌তির ব্যবস্থা করিতে পারে। বাঙ্গালাদেশে এইরূপ অনেকগুলি শিল্পসমিতি স্থাপিত হইয়াছে; যে ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষাসমাচার

মিল বনাম চরকা

মিলের কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে কল-কারখানার ব্যাপারে আমাদের পরাধীনতার কথা। কল-কব্জা তৈরীর উল্লেখযোগ্য কারখানা ভারতবর্ষে একটিই আছে, টাটার লৌহ-ইস্পাতের কারখানা। সেটিও কোন রকমে জীবিত আছে মাত্র। ভারতবর্ষে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে যতগুলি কল-কারখানার দরকার তাহার উপাদান যোগাইবার সাধ্য টাটার কারখানার নাই। ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে প্রতি বৎসর কত টাকার মেশিনারী আসে তাহার হিসাব দেখিলে আমরা আমাদের শক্তি সম্বন্ধে কতক ধারণা করিতে পারিব।

মেশিনারীর আমদানী

(কাপড়ের কল)

	১৯২২	১৯২৩
সুতোকাটার যন্ত্র—	৬৪,২৩১,৩৮১৲	৫২,২০১,৭৩৮৲
বয়নযন্ত্র—	১৭,৮৪৫,৮৪২৲	১২,৬৬৩,৪৫০৲
রংকরার যন্ত্র—	১,৭০৫,৪৫৫৲	৭৪৬,০০০৲
ছাপের যন্ত্র—	২৫,০২০৲	৭,৮৩৩৲
অন্যান্য রকমের যন্ত্র—	৫,৩৩১,৯২৯৲	৪,৬৮৪,৫৭৮৲
মোট	৮৯,১৩৯,৬২৭৲	৭০,৩০৩,৫৯৯৲

সুতরাং মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে স্বাধীনতা দেওয়া ত দূরে থাকুক, এই সব মেশিনারীর জন্য একটা বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। তারপর আমাদের কলকব্জার আড়ৎদার বিশেষভাবে ইংরেজ। যদি উভয় দেশের মিলের সহিত সত্যকার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তবে ইংরেজদের কারখানার উপর কল-কব্জার জন্য নির্ভর করা আমাদের চলিবে না। অতএব, মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমরা যে কিছু করিতে পারিব তাহা মনে হয় না।

এতদ্ভিন্ন এক একটি মিল প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যে অর্থের প্রয়োজন, তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার। কয়েকটা কাপড়ের কলের মূলধনের পরিমাণ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মিলের নাম	মূলধনের পরিমাণ
সেনট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং	৯,৬৮৭,৫০০৲
কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ	৮,০০০,০০০৲

মিলের নাম	মূলধনের পরিমাণ
ই, ডি, সেম্মুন ইউনাইটেড মিলস্ লিঃ	১০০,০০০,০০০৲
নিউ ভিক্টোরিয়া মিলস্ কোং লিঃ	৫০,০০০,০০০৲
ডানবার মিলস্ কোং	৫,০০০,০০০৲
সাউথ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল্স্	৩,০০০,০০০৲
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্	১,৮০০,০০০৲

আবার একটি মিল বসাইলেও চলিবে না। ভারতবর্ষে যতগুলি মিল আছে মিলের দ্বারা দেশের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে হইলে আরও এতগুলি মিল প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। সুতরাং এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা গরীব ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব।

এ সকল ছাড়াও মিল প্রতিষ্ঠার অন্যান্য প্রতিবন্ধক নিতান্ত কম নয়। আবার, যখন মিলের ব্যাপার লইয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ মুখোমুখি হইয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াইবে, তখন ইরেজ কখনই উদারতার মুখোস পরিয়া বসিয়া থাকিবে না। কারণ, যে সামান্য প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তাহাতেই ভারতবর্ষের কার্পাস শিল্প Excise duty, Supertax প্রভৃতি নানা ট্যাক্সের ভারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। মিলের দ্বারা বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই ভার ভারতবর্ষকে দিনের পর দিন বহন করিতে হইবে তাহাও ভুলিলে চলিবে না।

হিন্দুরঞ্জিকা

চীনা মাটির শিল্প

স্বর্ণ-প্রসূ ভারতভূমি যে এখনও হতশ্রী হয় নাই তাহা গত ৫ই অক্টোবরের বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অব কমার্স সভায় মিঃ এস, এস, দেব দেখাইয়া দিয়াছেন। এদেশ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহার প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান আছে। ভারতের ভাণ্ডারে এখনও যাহা আছে অন্য দেশে তাহা আছে কিনা সন্দেহ। অন্য খনিজ পদার্থের কথা দূরে থাকুক, একমাত্র মৃৎ পাত্রের ব্যবসা দ্বারা ভারত তাহার অর্থ সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ভারতের কুম্ভকারগণ এখনও যে প্রকার সুন্দর সুন্দর মাটির জিনিষ তৈয়ার করে, তাহাতে তাহাদের দিন অনায়াসে কাটিয়া যাইতে পারে। যদি তাহারা আরও উন্নত প্রণালীতে, কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহা করিতে পারিত তাহা হইলে ভারতের দুর্দ্দিনের কোন লক্ষণই থাকিত না। এখন অনেক সময় তাহার কোনও কোনও জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানি হয়। এক চীনা মাটির পুতুল আমদানি দ্বারা ভারতের কত অর্থ বিদেশে যাইতেছে। যদি শিক্ষিত যুবকগণ মান-অভিমান ত্যাগ করিয়া এদিকে মনোযোগী হইত তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার আমদানী বন্ধ হইয়া যাইত। দেশের কোটি কোটি টাকা দেশে থাকিয়া যাইত; তদুপরি দেশীয় জিনিষ বিদেশে প্রেরণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারিত। শিক্ষার অভাবে বর্ত্তমান কুম্ভকারগণ উন্নততর প্রণালীতে দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে পারিতেছে না।

সঞ্জীবনী

কয়লার ব্যবসায়

কয়লা ভারতবর্ষের এক প্রধান সম্পদ্। বাংলা দেশেই কয়লার খনি বেশী। অথচ বাঙ্গালী খনিওয়ালাগণ নির্ধন হইতেছে আর ইংরাজ ও কচ্ছ দেশীয় খনিওয়ালাগণ ধনী হইতেছে। ইহার কারণ কি? মিঃ ডব্লিউ, সি ব্যানার্জ্জী একজন প্রসিদ্ধ কয়লার ব্যবসায়ী। গত বুধবার কয়লা ব্যবসায়ীদের সভায় তিনি বলিয়াছেন যত কয়লার প্রয়োজন তাহার অপেক্ষা অধিক কয়লা উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং কয়লার দাম কমিয়া যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, কত কয়লা খনি হইতে বাহির করা উচিত, তৎসম্বন্ধে একটা নিয়ম করা কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট যেমন কয়লা ক্রয় সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন খনিকদের কয়লা বিক্রয় সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে কয়লার মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহাতে খনির মালিকদের উপকার হইবে কিন্তু যে অগণ্য লোক কয়লা ব্যবহার করে তাহাদের ক্ষতি হইবে। বড় বড় সহরে নিতান্ত গরীবেরাও রন্ধনের জন্য কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে। কয়লার মূল্য বৃদ্ধি হইলে তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক খনির কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। **বাঙ্গালীরাই ঐ সকল** অধিকাংশ খনির মালিক ছিলেন। **যদি বাঙ্গালীদের একটা** ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায় তবে তাহা **পরম দুঃখের** কারণ হইবে। কেবল দুঃখের কারণ নয় **বিদেশ** হইতেও কয়লার প্রচুর আমদানী আরম্ভ হইবে। যে ধন বাঙ্গালীর গৃহে যাইত তাহা বিদেশে যাইবে। ইহাতে জাতির দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইবে।

ইংরাজেরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া খনির কার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট খনির মালিক হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর খনির বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতেছে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর খনিরই অনিষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালী ও কচ্ছিরাই দ্বিতীয় শ্রেণীর খনির মালিক। কচ্ছিদের লোকসান হয় না, লোকসান বাঙ্গালীদের হইতেছে। ইহার কারণ এই, বাঙ্গালী মালিকেরা কর্ত্তা আর, কচ্ছি মালিকেরা কর্ত্তা ও চাকর। বাঙ্গালীরা অফিসে বসিয়া হুকুম করেন। কচ্ছিরা **একদিকে হুকুম করে, অন্যদিকে কুলিদেরসহিত মিলিত হইয়া মাথায় কয়লার** বোঝা বহন করে। **সুতরাং কচ্ছিরা** এক টাকায় যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে বাঙ্গালীদের সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দুই টাকার কম খরচ হয় না। সুতরাং কচ্ছিরা বাঙ্গালীদের খনি ক্রয় করিতেছে। বাঙ্গালীরা খনি বিক্রয় করিয়া বাটি প্রত্যাগমন করিতেছে।

বাঙ্গালা দেশের খনি-সম্পদ বাঙ্গালীদের হস্তে যদি রাখিতে হয়, তবে হয় বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া ইংরেজদের ন্যায় ব্যবসা চালাইতে হইবে, না হয় কচ্ছিদের ন্যায় কুলির মত খাটিতে হইবে। কর্ত্তা হইয়া থাকিলে বাংলার সম্পদ্ অপর প্রদেশের লোকের হস্তগত হইবে।

বাঙ্গালী কর্ত্তা হইয়াছিলেন, তাই পাটের ব্যবসায়, কাঠের ব্যবসায় ও কাপড়ের ব্যবসায় মাড়োয়াড়ী ও ভাটীয়াদের হস্তগত হইয়াছে। বাঙ্গালী গন্ধ-বণিকেরা এক সময়ে বিদেশ হইতে মসলা আমদানি করিতেন, তাহাতেই গন্ধ-বণিক্ জাতি ধনী হইয়াছিল। এখন গন্ধবণিকেরা দোকানের কর্ত্তা হইয়াছেন। ভাটীয়ারা বিদেশ হইতে মসল্লা আমদানি করিতেছে ও দুর্ম্মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া কলিকাতার বাড়ীওয়ালা হইতেছে। সব ব্যবসায়ে একই কথা। জমিদার বাবু হইয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, তিনি মহাজনের নিকটে ঋণী। আর তাঁহার দশ টাকার গোমস্তার ঘর ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইতেছে।

কয়লার খনির মালিকগণ যদি ধনী হইতে চান তবে খনিতে যাইয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করুন। সঞ্জীবনী

বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা

কলেজ	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
আর্ট কলেজ	২৪,১২৩	২০,৫১০	৩,১৩২
ল কলেজ	৩৬৩৪	২০৭৬	৫২৬
মেডিকেল কলেজ	১৬৮২	১৪৮৬	১৪০
ইঞ্জিনিয়ারিং „	৩২১	২৬৮	২৯
টিচিং কলেজ	১৪০	৮৫	২৪
কমার্স কলেজ	৬২৪	৫৯৩	৩০
পশু চিকিৎসা „	১৩২	৭৩	৪৫
মোট	৩০,৬৫৬	২৬০৯১	৩৯২৬
বালকদের স্কুল			
হাইস্কুল	১০০,১০১	৮৩,৭৯৬	১৪,৬০৪
মিড্ল্ „	৮৫,৮১৯	৬৮,১৯৫	২৪,৬৭৩
প্রাইমারী „	১,৪৭৮,০৪৮	৭২৪,৪২০	৭২৯,৯২২
বালিকাদের স্কুল			
হাইস্কুল	১৪১৯	৭১০	১৩
মিড্ল্ „	২২২৩	৭৪৮	৩৫
প্রাইমারী „	৩১৭,৪৪৪	১২,৯৬৫	.১৭৮,০৪৫
মোট	৩২১,০৮৬	১৪,৪২৩	১৭,৮০৩

	হিন্দু		মুসলমান		
কলেজে	৮৫.২	শতকরা	১২.৪	শতকরা	
স্কুল	৫৪.৮	„	৪৭.০	„	
হাই স্কুল	৮৩.৭	„	১৪.৫	„	বালক
মিডল „	৮০.৪	„	১৭.৩	„	
নিম্ন „	৪৯	„	৪৯.২	„	
হাই স্কুল	৫০.২	„	১	„	বালিকা
মিডিল „	৪৬.৫	„	১.৬	„	
নিম্ন „	৪০.০	„	৫৬	„	

বঙ্গদেশে মূক-বধির বিদ্যালয়

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে মূক ও বধির বিদ্যালয় আছে। তাহার কোন্ স্থানে কত জন ছাত্র তাহার সংখ্যা দেওয়া হইল।

স্থান	শিক্ষালাভ করিতেছে এরূপ ছাত্র সংখ্যা	বঙ্গদেশে মূক ও বধিরের সংখ্যা
কলিকাতা	১০৬	×
ঢাকা	২০	২৪৭৪
বরিশাল	১৩	১৫৯৯
ফরিদপুর	৮	১৯২৫
ময়মনসিংহ	১৪	৯৯৭
চট্টগ্রাম	১১	১১৭৭
সমগ্র বঙ্গদেশে	×	৩২০০০০

পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বঙ্গে একটাও মূক ও বধির বিদ্যালয় নাই। এই অভাব কেবল স্থানীয় লোকের উদ্যোগহীনতা, পরহিত ও করুণার অভাবের জন্য হইয়াছে।

সঞ্জীবনী

লণ্ডনে আহারের স্থান

লণ্ডনবাসীর আহারের সময়

লণ্ডনে আসিলে অসংখ্য হোটেল, ক্লাব, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি চোখে পড়িবে। আহারের বিষয়ে আমাদের সহিত ইংরেজদের একটা বড় রকম পার্থক্য রহিয়াছে। আমরা ব্যবসায়ী হই বা আফিস্ কাছারি করি, সকলে বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া সারিয়া কর্ম্মস্থানাভিমুখে রওনা হই। ইংরেজরা তাহা করে না। তাহাদের আহারের স্থান প্রধানতঃ বাহিরে। বস্তুতঃ অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত লণ্ডন সহর ঘুরিয়া বেড়াইলে মনে হইবে যেন সমস্ত কর্ম্মস্থলগুলি শূন্য ও নীরব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ সময় কোথাও কোন প্রকার কাজকর্ম্ম হয় না, সকলে খাইতে যায়। আর হোটেলগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের দেশে শুধু আহার যোগাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ হোটেল ইত্যাদির প্রচলন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আহারের সময়টা লণ্ডনবাসী কোন কাজ করে না। এ বিষয়ে তাহার এক বিশেষত্ব আছে। সে এই সময়টা পুরাপুরি আপনার স্বাধীনতা ভোগ করিয়া লইতে চায়। অনেক টাকার মালের অর্ডারের জন্য লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও কোন ব্যবসায়ী এই সময়টা তাহার দোকান ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া নষ্ট করিতে চায় না। এই সময়ে যে কেহ লণ্ডনবাসীর সহিত সাক্ষাৎ বা কাজ কারবার করিতে চায়, তাহাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। কারণ, এই সময়ে লণ্ডনবাসী তাহার মধ্যাহ্ণ ভোজন সমাপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে। সুতরাং এই সময়েই হাজার হাজার হোটেল, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিবার সুযোগ পায়।

হোটেলে হোটেলে সমাজ-তত্ত্বের অনুসন্ধান

খাইবার এই সময়টা সকল লোক এক প্রকারে কাটায় না। লোকের স্বভাবের উপর নির্ভর করে সে কিরূপভাবে সময় কাটাইবে। কেহ গল্প করিতে করিতে খাইতে ভালবাসে। কেহ বা ধীরে ধীরে মনোযোগের সহিত ভাল করিয়া চিবাইয়া খায়। অন্য কেহ কেহ তাড়াতাড়ি আহার সমাধা করিয়া অবশিষ্ট সময়টা নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে কাটায়। রুচি, বয়স, সামর্থ্য ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকারে তাহাদের মাধ্যাহ্ণিক আহার সমাধা করিয়া থাকে। তথাপি এক এক প্রকার ছাঁচের লোকের অভাব-অভিযোগ মিটাইবার জন্য এক এক প্রকার আহারের স্থান গড়িয়া উঠে। এই স্থানগুলি ঘুরিয়া বেড়াইলে সমাজ-

তাত্ত্বিক বহু প্রকার তথ্য ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সম্ভব হইবে।

লণ্ডনের আহার-স্থানগুলির এক প্রকার শ্রেণীভেদ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোক যেখানে যায় তাহাদের রুচি ইত্যাদি অনুসারেই আহার-স্থানে সমস্ত বন্দোবস্ত হয়। আমরাও সেই ক্রম অনুসারে নানাপ্রকার আহারাস্থ-নের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি।

টি-শপে কাহারা খাইতে আসে

ইংরেজীতে যাহাকে বলে "রাস্তার লোক" তাহারা বড় বড় হোটেল ইত্যাদিতে পয়সা খরচ করিয়া খাইতে পারে না। তাহাদের খাদ্য যোগাইবার ভার লইয়াছে লায়নস্, ইরেটেড্ ব্রেড্ কোম্পানী, এ বি সি ইত্যাদি। প্রতিদিন ঠিক ১টার সময়, কয়েক লক্ষ কেরাণী ও টাইপিষ্ট তাহাদের স্ব স্ব আফিস্ হইতে বাহির হইয়া এই সব স্থানে খাইতে যায়। ইহাদের টাকার জোর বেশী নাই, সুতরাং খাদ্য সম্বন্ধে বিলাসিতা করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অল্প খরচে পেট পুরিয়া যাহারা খাইতে চায়, তাহারা এই সব স্থানে যায়। তাহা ছাড়া অনেকের পক্ষে সম্ভব হইলেও হয়ত খাদ্যে ব্যয়-সঙ্কোচের কারণ থাকিতে পারে। যেমন, কোন যুবক হয়ত টাকা জমাইয়া মোটর সাইকেল কিনিতে চায়, বা কোন যুবতী হয়ত একটা সুন্দর পোষাক তৈরি করিতে চায়—ইহারা সব লায়নস্ অথবা এ বি সি'র শরণাপন্ন হয়। কোন ভাবী ব্যবসাপতি হয়ত খাইতে খাইতে শর্টহ্যাণ্ড শিখিতেছে, কোন বুড়া ভদ্রলোক হয়ত হোটেলের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে নাম ধরিয়া ডাকে, কোন ছেলে ছোক্‌রার দল হয়ত হল্লা ও আমোদ করিতে করিতে খায়—এইরূপ নানা আকারের ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদাই দেখা হইবে। পূর্ব্বোক্ত টি-শপ বা চা-ঘর শ্রেণীর আহার-স্থানে আজকাল বহু উপার্জ্জনক্ষম নারীকেও দেখা যাইবে। কেহ হয়ত সরকারী চাকুরী করিতেছে, কেহ দোকানে বসিয়া মোজা, ছাতা বা জুতা বিক্রী করে, কেহ টাইপিষ্ট, কেহ কোন ব্যবসায়-পতির সেক্রেটারি ও তাঁহার ব্যবসার সকল অলিগলির খবর রাখে—এইরূপ নানা ধরণের স্ত্রীলোক আহার-স্থানে আসিয়া আহার করে। ইহারা উপার্জ্জন করিতেছে এবং কে কত-দূর পর্য্যন্ত খরচ করিতে পারিবে তাহা নিজেদের জানা আছে। ইহারা দল ভালবাসে, প্রায় দলবদ্ধ হইয়া খাইতে আসে।

ডাইনিং রুম

এই প্রকার আহার স্থানের এক ধাপ নীচে অবস্থিত হইতেছে লথার্ট স্কুলের খাদ্য-ঘর বা অমুকের ডাইনিং রুম। যাহারা কায়িক পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিয়া খায়, তাহারা এখানে আসে। ডকের শ্রমিক, ট্যাক্সি-চালক, দ্বাররক্ষক, শিল্পী ইত্যাদি এখানে ৩ পেন্স ব্যয় করিয়া খাইতে বসে। এস্থানে গৃহের আসবাব সামান্য। খুব সাদাসিধে অথচ পুষ্টিকর খাদ্য যোগানো এই হোটেল-কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে।

চপ্ হাউস

টি-শপ বা চা-ঘর আহার-স্থানের ঠিক উপরে রহিয়াছে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের এক পারে চপ্-হাউস নামক আহার-স্থান। চপ্ হাউসে অর্কেষ্ট্রা নাই, কার্পেট নাই। ওক কাঠের তৈরী কঠিন চেয়ার, ধুলামাখা মেজে, কিন্তু সাদাসিধে অথচ ভাল খাদ্য ও বিয়ার মদ্য ইহার সম্বল। চেশায়ার চীজস্থ 'পিমৃস', 'বার্চস্' ও 'য়ি ওল্ড কক' ট্যাভার্ণ ভবনত্রয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সব স্থানে সাধারণতঃ তিন ধরণের লোক আসে—(১) গম্ভীর, রক্ষণশীল একদল নাগরিক, ইহারা রাজনীতি ও খাদ্য এই দুই দিকেই কোন প্রকার গোলমাল ইত্যাদি সহ্য করিতে পারে না, (২) বিভিন্ন জিলা হইতে আগত ভ্রমণকারীর দল, ইহাদের ধারণা যে অদ্ভুত কিছু দেখিতে আসিতেছে, (৩) বেশ পুরু একদল আমেরিকান্, ইঁহারা ডাক্তার জনসন বা অন্য কাহারও স্মৃতি-তর্পণের উদ্দেশ্যে আসে। বাস্তবিক এই চপ্ হাউসগুলি এক রকম আমে-রিকান্‌রাই জীবিত রাখিয়াছে। লণ্ডনবাসীর প্রাচীন কিছুর উপর শ্রদ্ধা তেমন প্রগাঢ় নহে। কিন্তু নিউইয়র্ক, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া যেখানেই যাও সর্ব্বত্র চপ্ হাউসের অসীম সুখ্যাতি; আর ভ্রমণকারী আমেরিকান্‌রা দলে দলে আসিয়া এই সব আহার-স্থান পূর্ণ করিয়া বসে।

বিখ্যাত হোটেলসমূহ

স্কট, প্রিন্স, ক্রাইটিরিয়ন, মনিকো এই আহার-স্থানগুলি সবিশেষে বিখ্যাত। যেখানে ইংরেজী ভাষা কথিত হয় সেখানেই এগুলির খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই সব স্থানে খাইতে গিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, এমন লোক খুব কম আছে। সিম্পসনের আহার-স্থানে যাহা কিছু স্বাস্থ্যকর, সুন্দর, পরিষ্কার সবই পাওয়া যাইবে। আর ইহার আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া আগাগোড়া খাস বৃটিশ। জাতির মধ্যমণিরূপে যাহারা পরিচিত, সৎ ও কার্য্যক্ষম বিষয়ী লোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় খেলোয়াড় বা কুস্তিগীর, জমিদার-পুত্র ইত্যাদিরা এখানে খায়। সকলে গোমাংস এবং এল মদ্যের ভক্ত, কিন্তু বাচালতা অথবা সঙ্গীতাদিতে বিশেষ বিরক্ত।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেল

ধনবত্তা, আকার ইত্যাদির দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের অন্য পারে কার্লটন, রিট্‌জ ও স্যাভয় হোটেলকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বলিতে হইবে। ইহারা পূর্ব্বোল্লিখিত আহার-স্থানসমূহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সব স্থানে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহারা আসে তাহারা দেশের বিভিন্ন বিভাগের নেতা বা বিখ্যাত ব্যক্তি অথবা তাহাদের সঙ্গী সাথী বা নকলকারিগণ। রাজনীতি-ধুরন্ধর ও ধনকুবের ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক আমেরিকান্, রঙ্গমঞ্চের নামজাদা নট-নটীগণ, পূর্ব্বদেশীয় রাজা-রাজড়া প্রভৃতি—এক কথায় যাহারা জীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহারা সকলেই এই সব স্থানে খাইতে আসে। ইহাদের মধ্যেও আবার এক একটা এক এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ গন্তব্য স্থান হইয়া দাঁড়ায়। যেমন পল্লীগ্রাম হইতে আগত ভদ্রলোকেরা বার্কলি পছন্দ করেন, ক্লেরিজের রেস্তোরাঁ রাজতন্ত্রবাদীদের আড্ডা, ইত্যাদি। কার্লটন, রিট্‌জ বা স্যাভয় হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধ্য। শুধু টাকা থাকিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপর প্রভুত্ব খাটাইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা চাই। কারণ এই সব স্থানের পরিচারকেরা আভিজাত্যপ্রিয়। এই আহার-স্থানগুলিকে শুধু বিলাসীদের আড্ডা বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। রাষ্ট্রঘটিত অনেক জটিল সমস্যা এবং বাণিজ্য-সম্পর্কিত অনেক লেনদেনের কথা এইরূপ স্থানে মীমাংসিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে অবশ্য এত বড় বড় স্থানে গিয়া আহার করে না। তাহাদের নিকট রোমানোর হোটেল প্রিয়।

লণ্ডনে আহার-স্থানের বৈচিত্র্য

এই গেল মোটামুটি আহার-স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু সকলের রুচি সমান নহে। বিশেষ বিশেষ রুচি-বিশিষ্ট লোকের জন্যও লণ্ডনে ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা নিরামিষভোজী তাঁহারা লণ্ডনে আসিয়া বিপদে পড়িবেন না, কারণ এখানে নিরামিষাশীদের অনেক হোটেল আছে। যাহারা শুধু মাছ খাইতে ভালবাসে তাহাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। যাহারা চপষ্টিক ব্যবহার করিতে চায়, তাহারাও তাহাদের মনোমত আড্ডা পাইবে। এক কথায় লণ্ডনের আহার-স্থানগুলি বৈচিত্র্যময়ী লণ্ডন মহানগরীর এক একটি জীবন্ত চিত্র বিশেষ।

মোসাফের্
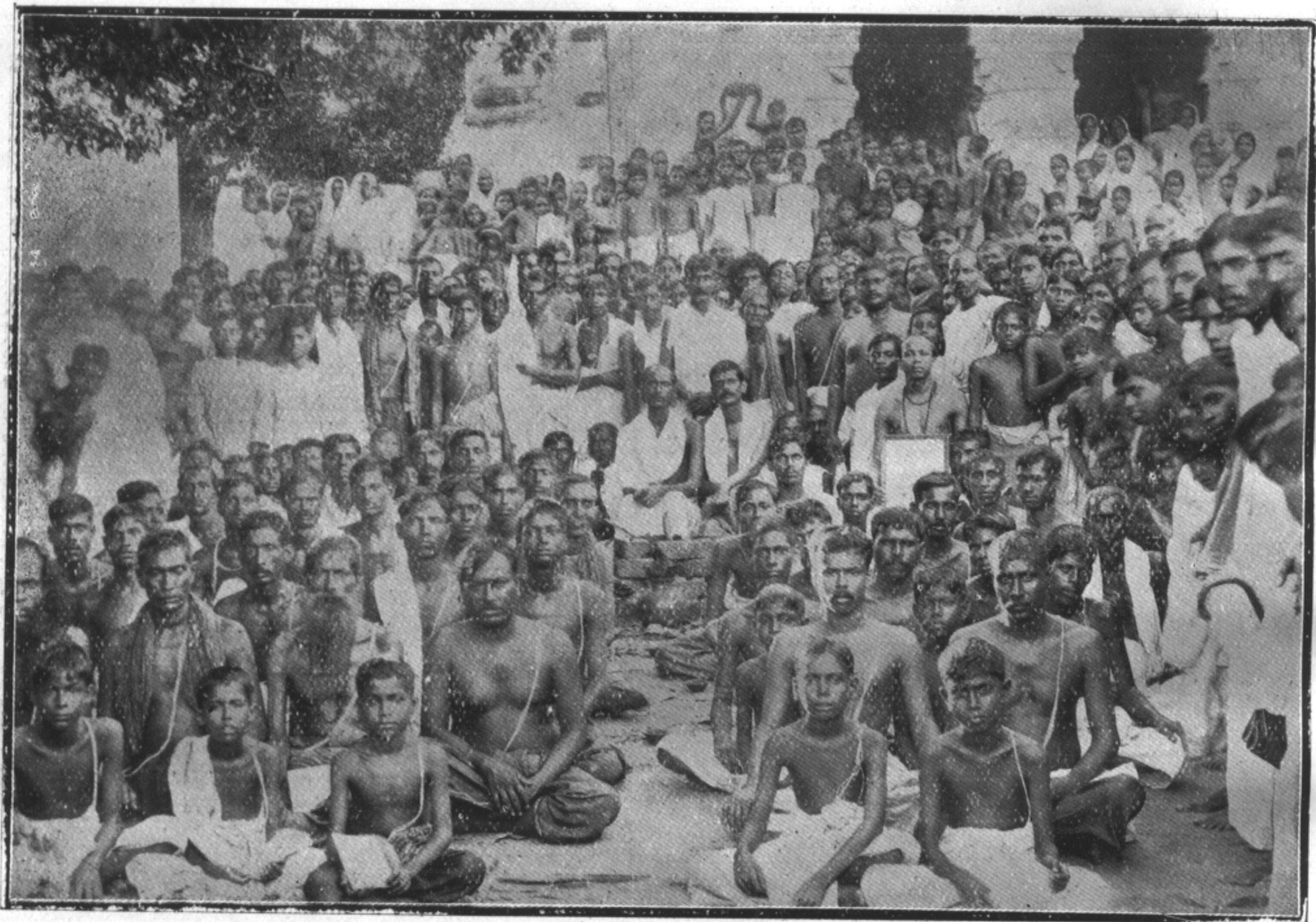
বিষ্ণুপুরে প্রথম বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞ

জাতীয় সংবাদ

ইণ্টারমিডিয়েট এটর্ণি পরীক্ষা

বর্ত্তমান ১৯২৮ সালের এটর্ণিসিপ মধ্য পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের শেষ কৃতিত্ব কামনা করি।

১। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক ২। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ দে।

পদব্রজে কলিকাতা হইতে শ্যামনগর

গত ৺কালী পুজার দিবস প্রত্যুষে ৪ ঘটিকার সময় "মিলন-মন্দির" সম্প্রদায়ের স্বজাতীয় সভ্যগণ প্রায় ৫০ বৎসর বয়স্ক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র মল্লিক, শ্রীমান্ সত্যচরণ মল্লিক ও উক্ত সম্প্রদায়ের সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক ষষ্ঠ বার্ষিকী ভ্রমণ উপলক্ষে তদীয় বাসস্থান কলিকাতা, ৪০ নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটের নিকটস্থ জোড়াসাঁকো কালীতলা হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর বারাকপুর ট্রাঙ্করোড ও কাঁচড়াপারা রোডের মধ্য দিয়া বনহুগলী, কামারহাটী, খড়দহ, বারাকপুর, নববাবগঞ্জ, প্রভৃতি স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক বেলা ৯টা ৫ মিনিটে শ্যামনগর ষ্টেশনে উপনীত হন। প্রায় দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের ৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। রবিবার ঐ পথে ঘন ঘন মোটর গাড়ী যাতায়াতের জন্য গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। স্বর্গীয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মূলাজোড় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অভ্যাগতবর্গকে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর সম্বর্দ্ধনা করিয়া ধন্যার্হ হইয়াছেন।

সুবর্ণবণিক হিতৈষী-সঙ্ঘ

(১)

বিগত ২১শে আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় ভবনে, স্বজাতি হিতৈষী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের উদ্যোগে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনার্থ একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বজাতি-বৎসল শ্রীযুক্ত নারায়ণ কৃষ্ণ সেন, আই এস ও মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় (১) গুরু এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের ও শিক্ষার উন্নতি (২) স্বজাতিগণের বিবাহে পণপ্রথা বর্জ্জন (৩) সন্তানদিগকে সুশিক্ষা প্রদান ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত সময়ে বৃষ্টিপাত জন্য সভার কার্য্য অধিকক্ষণ না হইলেও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় বিবাহে পণপ্রথায় দেশের যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিশেষরূপ বিবৃত করিয়া পুনশ্চ আর একটি বিরাট্ সভার আয়োজনের জন্য প্রস্তাব করেন। স্বজাতি-মুখোজ্জলকারী কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর ও অন্যান্য মহোদয়গণ এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই আর একটি বিরাট্ সভার আয়োজনের ব্যবস্থা হইতেছে।

(২)

সুবর্ণবণিক্ জাতীয় সমাজের উন্নতি সাধন

এই মহার্ঘ্যের দিনে সংসারের ব্যয় বহন করা সকল গৃহস্থের পক্ষে যে অতিশয় কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ; তাহার উপর পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার এবং কন্যার বিবাহ দিবার কিরূপ অর্থাভাব ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। যাহাতে এই সমস্ত কষ্ট নিবারণ করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিবার জন্য আমরা একটি সুবর্ণবণিক্ হিতৈষী সঙ্ঘ, গঠন করিতে ইচ্ছা-করি কারণ, যদ্যপি গৃহস্থ ও গরীব সুবর্ণবণিক্ সকলে

একত্রিত হইয়া একমত হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই জাতীয় উন্নতি এবং আমাদিগের কষ্ট নিবারণ অতি অল্পদিনের মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিব, তাহার সহজ উপায়ের জন্ত একখানি পুস্তক ৻৫ এক পয়সা মূল্য ধার্য্য করিয়া বাহির করা হইয়াছে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিম্ন ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া কিম্বা ৻৫ পয়সা জমা দিয়া একবার পড়িয়া দেখা বিশেষ আবশ্যক এবং প্রত্যেক সুবর্ণবণিক্ মহোদয়ের উক্ত সঙ্ঘে যোগদান করা উচিত। শ্রীযুক্ত নারায়ণ কৃষ্ণ সেন আই এস ও মহাশয়কে ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে এই সঙ্ঘের অধ্যক্ষ করিবার মত প্রকাশ করা হইয়াছে। আপনার সুবর্ণবণিক্ হিতৈষী সঙ্ঘে যোগদান করিবার মতামত জানিতে পারিলে অতিশয় আনন্দিত হইব। এই পত্রের নিম্নার্দ্ধে আপনার মতামত জানাইয়া এবং সহি করিয়া বাধিত করিবেন ইতি—

সুবর্ণবণিক্ হিতৈষী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বিবরণী

১। জাতীয় ব্রাহ্মণগণের দারিদ্র্য মোচন করিয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদিগের শিক্ষা বিস্তার

২। বিবাহে পণ-প্রথা বর্জ্জন

৩। পুত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান

সুবর্ণবণিক্ হিতৈষী সঙ্ঘ ৩১৯ নং অপার চিৎপুর রোড, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

* * * * * * * *

আপনাদের সুবর্ণবণিক হিতৈষী-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আমার মতামত জানাইয়া নিম্নে স্বাক্ষর করিয়া দিলাম।

মন্তব্য :—

শ্রী...

সাং...

তাং · ১৩৩৫ সাল।

(৩)

সুবর্ণবণিক্ স্বজাতিমণ্ডলীর প্রতি নিবেদন

সুবর্ণবণিক্‌গণ, উপবীত ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন-লিখিত কার্য্যগুলি সম্বন্ধে, বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক কি না?

১। জাতীয় গুরু এবং পুরোহিতগণের দারিদ্র্য ত্যাগ করাইয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করা এবং শিক্ষার বিশেষরূপ বিস্তার করা, কারণ, গুরু এবং পুরোহিতগণ শিক্ষিত না হইলে আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের কার্য্য যাহা কিছু হইবে তাহা সমস্ত পণ্ড হইতে থাকিবে। অতএব সাংসারিক লোকের ধর্ম্মই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে গুরু এবং পুরোহিত মহোদয়গণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক কি না? ইহা ধার্ম্মিক লোক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

২। বিবাহে পণ-প্রথা বর্জ্জন করা। এই বিবাহে পণ প্রথায় সমাজের কোন বিষয়ে লভ্য নাই ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু ইহার কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসারের সুখ-স্বচ্ছন্দতা এবং পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার পক্ষে যে কতদূর ক্ষতি হইতেছে তাহা মধ্যবিত্ত ও গরীব লোক মাত্রই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছেন অতএব এই পণ-প্রথা সমাজ হইতে অগ্রে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করা আবশ্যক কি না?

৩। পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করা। পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা না করিলে কিরূপে জাতীয় উন্নতি হইবে? আজ সুবর্ণবণিক্ জাতি শিক্ষায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা নিম্নে পতিত হইয়া রহিয়াছে, যদ্যপি জাতীয় গৌরব দেখাইতে হয় তাহা হইলে অগ্রে সমাজের পুত্রদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করা উচিত কি না?

সুবর্ণবণিক্ সম্মেলন

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সভার
উদ্যোগে অনুষ্ঠান

বিগত ১৪ই আশ্বিন রবিবার অপরাহ্নে রামকৃষ্ণপুর ৭৫নং রাজবল্লভ সাহার লেনস্থ স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হরিচরণ বড়াল মহাশয়ের ভবনে, সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী ন্যায়রত্ন, পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্য-

নারায়ণ চৌধুরী (শ্রীরামপুর), শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী (যশোহর) প্রমুখ ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং কলিকাতা, চেতলা, চুঁচুড়া, হাওড়া, ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি নানা কেন্দ্রের বহু গণ্যমান্য সুবর্ণবণিক্ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, কলিকাতা মহামান্য হাইকোর্টের এডভোকেট দেশমাতৃকার অন্যতম সুসন্তান শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বহুক্ষণ ব্যাপী জাতীয় উন্নতি বিষয়ক আলোচনার পরে পাইন মহাশয় কোন অপরিহার্য্য কারণে রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক ভারতবাণীভূষণ মহাশয়ের উপর সভার কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন।

ভারতবাণীভূষণ মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি, মণিমোহন মল্লিক, জগদীশ সেন দেবভূতি, প্রতুলচন্দ্র বড়াল, উপেন্দ্র দত্ত দেবভূতি, সতীশচন্দ্র আঢ্য দেবভূতি, শ্যামলাল শীল দেবভূতি, দুনিয়াচাঁদ বড়াল দেবভূতি, শরৎচন্দ্র আঢ্য প্রভৃতি সুবর্ণবণিক্‌গণ, বৈশ্যাচার পালনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। যত সত্বর সম্ভব, হাওড়া জেলার মধ্যে একটি বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হউক।

২। যতশীঘ্র সম্ভব কলিকাতা মহানগরীতে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠানকরতঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সমস্ত সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যোচিত উপনয়ন ও সংস্কার গ্রহণ করিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হউক।

৩। সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়কে বৃথা শূদ্র প্রতিপন্ন করিবার মানসে কয়েকজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত একখানি অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপত্র বাহির করিয়াছেন ; কাহার অনুরোধে, কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ এবং কোন শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা এই অযৌক্তিক ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাহার তথ্য অনুসন্ধান করা হউক।

গৃহস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক অভ্যাগত-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করণানন্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

সুবর্ণবণিক্ সভা

পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের বক্তৃতা

২৬নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ "নিমাই নিবাস" ভবনে চুঁচুড়া ও ও কলিকাতাস্থ সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রাচ্য প্রতীচ্য সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বলেন—যে সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাস-অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা—সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৈশ্য বর্ণান্তর্গত নহে বলিয়া স্বীয় অজ্ঞতা বশতঃ শূদ্র বলিয়া সাধারণে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন—তাহার প্রতিকারকল্পে যাবতীয় পুরাণ ও ইতিহাস হইতে সমস্ত জাতিতত্ত্বের আদি ইতিবৃত্ত (origin) সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সুবর্ণবণিক্ সমাজের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যে জাতির সামাজিক আচার-বিচার, রীতিনীতি, ব্যবহার-পদ্ধতি এত সুন্দর শুচিতাসম্পন্ন, শাস্ত্রসঙ্গত তাহারা কখনই শূদ্র হইতে পারে না। এই সমস্ত জাতির সভাসমিতিতে যোগদান ও শুভাগমন প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও গোস্বামী প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য ; বিশেষতঃ গোস্বামী প্রভুদের প্রধান শিষ্য সম্প্রদায় কখনই সমাজে নিম্নশ্রেণীস্থ হইতে পারে না। ধর্ম্মকর্ম্মে উন্নত হইবার জন্য প্রত্যেক সুবর্ণবণিকের বৈশ্যাচার গ্রহণ করা নিশ্চয়ই উচিত। তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন। জাতীয় জীবনের পুনরভ্যুত্থানে তাঁহাদের এ শুভ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্। জাতিভেদ জ্ঞান, দলাদলি, মনান্তর—এ হতভাগ্য দেশে চিরদিন আছে—থাকিবে। আজ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘ যাহা সুবর্ণবণিক্‌যাজী ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৃথা শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে কেন যে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। শূদ্রের যাজকতা করা কি তাঁদের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয়? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘের বাধা দেবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? এই সম্প্রদায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বণিক্ শব্দ হইতে

সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এ জাতি বৈশ্য বর্ণান্তর্গত ; সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। বর্তমানে এ সম্প্রদায় সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রে, সদনুষ্ঠানে, দানে, ধর্ম্মে, দেব-দ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তিতে সমাজে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের পুরোহিতবর্গের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ—তাঁহারা যেন ইহাতে বাধা না দিয়া, সাহায্য ও উৎসাহ দান করেন। তাঁহারা যদি বাস্তবিক শূদ্র হন তবে আমরা তাঁহাদের গৃহে আহারাদি করিব কেন ? আর বৈশ্য বলিয়া যে একটা বর্ণ ছিল সে বর্ণ কি লুপ্ত হইয়া গেল ? মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন সমস্ত সমাজে পতিত জাতিকে উচ্চস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

বিষ্ণুপুরে সুবর্ণবণিক্ সম্মিলন

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর কেন্দ্রসমিতির উদ্যোগে বিগত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই কার্ত্তিক বিষ্ণুপুরে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের তিনটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী ব্যতিরেকে উক্ত অধিবেশন ত্রয়ের ন্যায় জনসমাগম ইতিপূর্ব্বে সুবর্ণবণিক্গণের কোন সভায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অধিকন্তু এই সভার বিশেষত্ব—ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রমুখ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনীষিগণও আমন্ত্রিত হইয়া সানন্দচিত্তে ইহার সফলতার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রথম অধিবেশন

১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে শীতলামাতার বিস্তৃত নাটমঞ্চে বাঁকুড়া নিবাসী স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনীর ১ম অধিবেশন হয়।

সভারম্ভে বর্দ্ধমানের রাজ উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় বিষ্ণুপুরবাসী স্বজাতিগণের পক্ষ হইতে কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের সুযোগ্য সম্পাদক বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর একনিষ্ঠ সেবক বৈশ্য-উপনয়ন-যজ্ঞের অন্যতম প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি মহোদয়কে একখানি অভিনন্দন প্রদান করেন।

অনন্তর গোকুল বাবু বিষ্ণুপুরবাসী ভ্রাতৃগণকে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় এম্ এল্ সি মহোদয়, উপস্থিত পূজনীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং অন্যান্য সুবর্ণবণিক্ বক্তাগণ নিম্নোক্ত চারিটি বিষয় সভায় বিশদভাবে আলোচনা করেন। ১ম—বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন। ২য়—বিবাহে পণ-প্রথা বর্জ্জন। ৩য়—স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আবশ্যকানুরূপ শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা। ৪র্থ—বৈশ্যাচার গ্রহণ।

দ্বিতীয় দিবসের সভা

১৪ই কার্ত্তিক বুধবার সন্ধ্যায় মাধবগঞ্জের মদনগোপালের নয়নমনমুগ্ধকর গগনস্পর্শী মন্দিরের বিরাট্ প্রাঙ্গণে বিষ্ণুপুর নিবাসী কৃষ্ণগঞ্জের শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিষ্ণুপুরবাসী সুবর্ণবণিক্গণের উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। বিষ্ণুপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ও রাজদেওয়ান শ্রীযুক্ত সুজয়দাস, চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, নৃসিংহপদ দত্ত প্রমুখ মনীষিগণ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অনুমতিক্রমে পর দিবস উপনয়ন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে স্থিরীকৃত হয়।

বৈশ্যোপনয়ন-যজ্ঞানুষ্ঠান

১৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার মদনগোপালের বিরাট্ প্রাঙ্গণস্থিত বকুলকুঞ্জের সুশীতল ছায়ায় উপনয়ন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। বিষ্ণুপুরের প্রায় সমগ্র সুবর্ণবণিক্যাজী ব্রাহ্মণ, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের অনুমতিক্রমে যথারীতি শাস্ত্রানুযায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক, কৃষ্ণগঞ্জের অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু পাল, বর্দ্ধমানের রাজউকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল প্রমুখ ৮৫জন গণ্যমান্য সুবর্ণবণিক্ বৈশ্যোচিত উপনয়ন-সংস্কারে ভূষিত হইয়া বিরাট্ হরিনাম সংকীর্ত্তনের মিছিল সহযোগে নগর পরিভ্রমণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ (চুঁচুড়া) এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বিষ্ণুপুর) যথাক্রমে তন্ত্রধারক এবং আচার্য্য পদে ব্রতী ছিলেন।
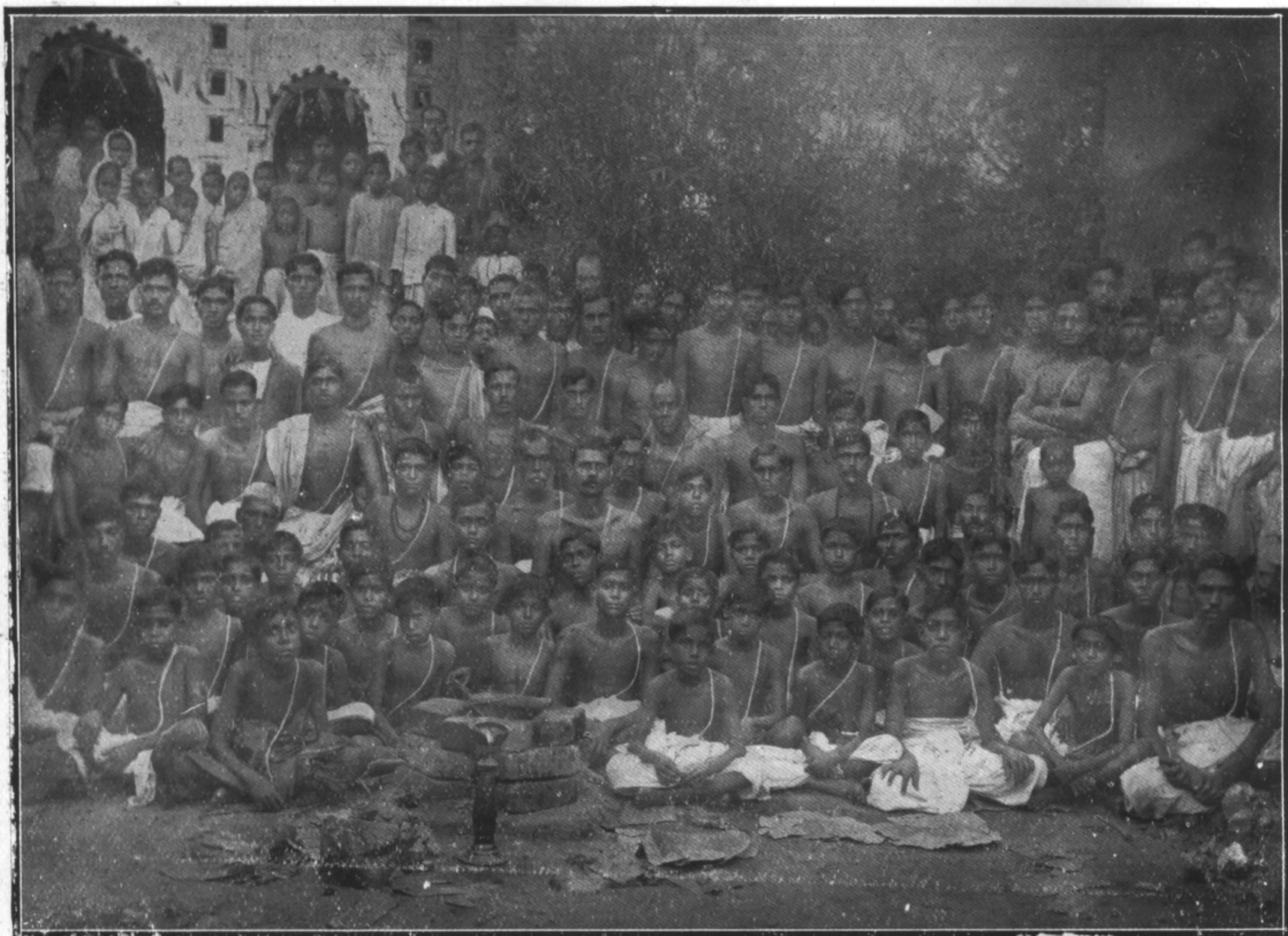
বিষ্ণুপুরে দ্বিতীয় বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞ

বলা বাহুল্য বিষ্ণুপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সুবর্ণবণিক্-গৌরব শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীল মহাশয় এই জাতীয় অভ্যুত্থানের সহায়তাকল্পে তিন দিবসই সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করিয়া সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। রবি ও সোমবার ২৫শে ও ২৬শেকার্ত্তিক, মেদিনীপুরে কেন্দ্র-সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মেদিনীপুরে সুবর্ণবণিক্ সম্মিলন

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক সম্মিলনীর কেন্দ্র-সমিতির উদ্যোগে গত ১১ই নবেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় মেদিনীপুর বড়বাজার নিবাসী সম্মিলনীর একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের ভবনে ;—১। সম্মিলনীর ত্রয়োদশ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের প্রচার কল্পে এবং ২। সম্মিলনীর আগামী চতুর্দ্দশ অধিবেশনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলিকাতা, চুঁচুড়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান, গড়বেতা, তমলুক ও মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা কেন্দ্রের বহু সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্ এবং তাঁহাদের পূজনীয় পুরোহিতমণ্ডলীর সমন্বয়ে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনীর গত মেদিনীপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মেদিনীপুর সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সভাপতিত্ব গ্রহণ করতঃ সভার কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া সকলের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য, গঙ্গানারায়ণ পাল, যতীন্দ্রনাথ আঢ্য, অনিলরতন দত্ত, সত্যরঞ্জন দত্ত প্রমুখ সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর উৎসাহশীল কর্ম্মিবৃন্দের সম্মতিক্রমে, তমলুক নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দে মহাশয় সম্মিলনীর আগামী চতুর্দ্দশ অধিবেশন তমলুক মহকুমায় আহ্বান করিলে সভায় বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, বিগত ত্রয়োদশ অধিবেশনেই বসন্ত বাবু সম্মিলনীর পরবর্ত্তী অধিবেশন তমলুকে আহ্বান করিয়া কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন বলিয়া সভায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

পরিশেষে কেন্দ্র সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম্ এ, বি এল্ (এড্ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট) মহাশয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর এবং আগামী ৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার যশোহর বগ্‌চর নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র মহাশয় তদীয় ভবনে সপুত্রক স্বীয় কেন্দ্রের সুবর্ণবণিক্ ভ্রাতৃগণের সহিত বৈশ্যোচিত উপনয়ন-সংস্কারে ভূষিত হইবেন বলিয়া সমাগত স্বজাতিবৃন্দকে উক্ত যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞ

বিষ্ণুপুর

চুঁচুড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক, অত্রস্থ কংগ্রেস মনোনীত মিউনিসিপাল কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেবভূতি এম্ এ, বি এল্, নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়, গত শুক্রবার ৭ই অগ্রহায়ণ, বিষ্ণুপুরের সুবর্ণবণিক্ সাধারণ কর্তৃক আহূত হইয়া সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনের (জঙ্গীপুর) সভাপতি, কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি এবং শ্রীযুক্ত নৃসিংহপদ দত্ত দেবভূতি বি এল্, পূর্ণচন্দ্র আঢ্য দেবভূতি বি এল্, শ্যামলাল শীল দেবভূতি প্রমুখ কেন্দ্র-সমিতির অক্লান্ত কর্ম্মিবৃন্দ সমভিব্যাহারে, বিষ্ণুপুরের বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করণার্থ তথায় শুভাগমন করিয়াছিলেন।

৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার সন্ধ্যায় লালজীউর কৃষ্ণগঞ্জের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এই স্থানের অন্যতম দলপতি (মুখ্য) শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ দে মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নানা জাতীয় উন্নতি বিষয়ক আলোচনার পর বর্দ্ধমানের রাজ-উকীল সোনামুখী নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল দেবভূতি মহাশয় প্রচার করেন, কলিকাতা নিবাসী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে আগামী কল্য বিষ্ণুপুরে বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞের দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হউক। সভাস্থ সকলেই সানন্দচিত্তে সুরেন্দ্র বাবুর

উক্তির সমর্থন করেন। সভায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহু পূজনীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী সানন্দে যোগদান করিয়া, সুবর্ণবণিক্‌গণের এই বিংশ শতাব্দীর জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায়, আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরদিন রবিবার ৯ই অগ্রহায়ণ, বিপুল আয়োজনে বিষ্ণুপুরে সুবর্ণবণিক্ সাধারণের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণগঞ্জের মদনমোহনের পাটেতে যথাকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয়। কলিকাতা এবং মফস্বলের বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও বহু পূজনীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা করেন। ৮৭ জন গণ্যমান্য সুবর্ণবণিক্ যথাবিধি শাস্ত্রসঙ্গত হোম-যাগ সহকারে বৈশ্যোচিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন।

চুচুড়ায় সপ্তম অনুষ্ঠান

পরিবারস্বামী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল দেবভূতি কনকাঙ্কুর, সিদ্ধান্তরত্ন, সিদ্ধান্তবাচস্পতি মহোদয়ের উদ্যোগে বিগত রবিবার ৯ই অগ্রহায়ণ "শীলগলিস্থ" শীল মহাশয়দিগের বিস্তৃত ঠাকুর দালানে, চুঁচুড়ায় বৈশ্য-উপনয়ন যজ্ঞের সপ্তম অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। চুঁচুড়া নিবাসী বহু পূজনীয় পুরোহিত এবং গণ্যমান্য সুবর্ণবণিক্‌গণ অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যজ্ঞে উক্ত শীলবংশীয় প্রায় সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠগণ বৈশ্যোচিত যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীল, হরিশ্চন্দ্র শীল, পান্নালাল শীল প্রভৃতি ২১ জন বয়োবৃদ্ধ সুবর্ণবণিকের সমবেতভাবে আহুতি প্রদান কালে যজ্ঞাগার এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।

চট্টগ্রাম, চুঁচুড়া, চেতলা কলিকাতা, গড়বেতা (মেদিনীপুর), পালং (ফরিদপুর), বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে উপর্য্যুপরি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, সারা বাঙ্গালার সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দে, রামসাগরের শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দে, সোনামুখীর শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর দে,যশোহরের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, খাগড়ার শ্রীযুক্ত গুরুদাস আঢ্য, দুবরাজপুরের (বীরভূম) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত, জিয়াগঞ্জের (মুর্শিদাবাদ) শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস প্রমুখ স্বজাতিবৎসল মহোদয়গণ, অচিরে স্ব স্ব স্থানে বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

শ্রীপাট খড়দহে বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞ

বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীপাট খড়দহে বাঙ্গালার সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে বৈশ্যাচার প্রবর্ত্তনের প্রাণস্বরূপ, স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "দ্বারকাশ্রম" ঠাকুর বাটিতে শ্রীশ্রীমৎ নিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর শুভ গোষ্ঠবিহার উপলক্ষে কলিকাতা এবং চুঁচুড়া নিবাসী কয়েকজন স্বজাতি আহূত হইয়াছিলেন। সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্যাচার গ্রহণ বিষয়ক আলোচনার ফলে, সমাগত স্বজাতিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন, এই শুভলগ্নে অদ্যই ঠাকুরবাটিতে একটি যজ্ঞানুষ্ঠান করা হউক। ফলে তৎক্ষণাৎ বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর কেন্দ্র সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেবভূতি এম্ এ, বি এল্, 'বৈশ্য-শক্তির' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুনিয়াচাঁদ বড়াল দেবভূতি ও শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত দেবভূতি বি এ, বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য দেবভূতি বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল দেবভূতি প্রমুখ উৎসাহশীল কর্ম্মিবৃন্দ তখনই একটি যজ্ঞের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন।

পরে যথাকালে পূতসলিলা জাহ্নবীতট-সংলগ্ন জগন্মাতা শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে, বাংলার বৈশ্য সুবর্ণবণিক্‌গণের উপনয়ন-যজ্ঞের আচার্য্যপ্রধান পূজনীয় শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর এবং অন্যান্য সজ্জনমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। শাস্ত্রানুমোদিত হোম-যাগ সহকারে কলিকাতা শ্রীগোপাল মল্লিক লেন নিবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দে প্রমুখ কয়েকজন সুবর্ণবণিক্ এই যজ্ঞে বৈশ্যোচিত উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করেন। ৺রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপাট খড়দহে সমাগত বহু যাত্রী যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞান্তে বড়াল মহাশয় আহূত এবং অনাহূত অভ্যাগতমণ্ডলীকে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাতার প্রসাদ বিতরণে

ও পূজনীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে দক্ষিণা প্রদানে পরিতুষ্ট করেন। গোকুলবাবুর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচাঁদ বড়াল দেবভূতি বি এ, তদীয় স্বভাবসুলভ বিনয়-নম্র ব্যবহারে সমাগত জনমণ্ডলীর তুষ্টি বিধানকল্পে যত্ন লইয়াছিলেন।

শ্রীপাট খড়দহে বহু অর্থব্যয়ে উক্ত দেবালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট অতিথিশালা, সাধারণ পাঠাগার, সাধারণ চিকিৎসালয় প্রভৃতি কতকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য তত্রস্থ অনেকেই বড়াল মহাশয়কে যথোচিত শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেন; বড়াল মহাশয়ও খড়দহবাসীর এই মহানুভবতার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে কখনও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর কেন্দ্র-সমিতি

আগামী বড়দিনের অবকাশে মেদিনীপুর জিলার তমলুক মহকুমায়, নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সাম্মলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনের ১—দিনস্থির, ২—সম্মিলনীর সভাপতি মনোনয়ন, ৩—আলোচ্য বিষয়ের খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য, বিগত রবিবার ২রা ডিসেম্বর অপরাহ্লে, কলিকাতা বৈশ্য উপনয়ন-যজ্ঞের উদ্বোধন ক্ষেত্রে (৮ নং হিদারাম বন্দ্যোঃ লেন) তমলুক সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সহযোগে কেন্দ্র-সমিতির একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা এবং মফস্বলের বিশিষ্ট বহু সুবর্ণবণিক্ সদস্য এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল দেবভূতি মহাশয়ের প্রস্তাবে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা মহোদয়ের সুযোগ্য পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভায় স্থিরীকৃত হয়:—আগামী ৯ই এবং ১০ই পৌষ (ইং ২৪শে এবং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২৮ খৃঃ) তারিখে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। চুঁচুড়ার জমিদার চুঁচুড়া সুবর্ণবণিক্ সমিতির সুযোগ্য সভাপতি, স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল দেবভূতি মহাশয় আগামী সম্মিলনীর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। আলোচ্য বিষয়ের খসড়া, ত্রয়োদশ অধিবেশনের বিষয়গুলি প্রায় সমস্তই বাহাল রাখা হইয়াছে। পরিশেষে স্বর্গীয় রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহোদয়ের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

অতঃপর তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দে মহাশয় অভ্যাগতমণ্ডলীকে সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন; অধিকন্তু তিনি বলেন,—অন্যান্য স্বজাতিবৃন্দ যাঁহারা এই সম্মিলনীতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, অনুগ্রহপূর্ব্বক যেন তাঁহারা আগামী ২রা পৌষ তারিখের মধ্যে তাঁহাদিগের নামের তালিকা, তমলুক অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে, মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল দেবভূতি,
সম্পাদক, কেন্দ্র সমিতি
নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর কেন্দ্র-সমিতি

(১)

আগামী বড়দিনের অবকাশে উক্ত সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশন, মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত "তমলুক" মহকুমায় হইবে। বি, এন, আর লাইনে পাঁশকুড়া ষ্টেশনে (হাওড়া হইতে মাত্র ৪৪ মাইল) হইতে মোটর বাস যোগে তমলুক যাওয়াই সুবিধাজনক। বাঙ্গালার বিভিন্ন কেন্দ্রস্থ স্বজাতি-হিতৈষী সুবর্ণবণিক্ ভ্রাতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়া সম্মিলনীর কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া, আমাদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের সহায়তা করিলে বাধিত হইব। আপনাদিগের কেন্দ্র হইতে যাঁহারা এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা তাঁহাদিগের ঠিকানা সহ নাম, তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

(২)

কেন্দ্র-সমিতির অধিবেশন

নিম্নোক্ত বিষয় কয়টি আলোচনা করিবার জন্য আগামী

রবিবার ২রা ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় ৮নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেনস্থ সমাজমন্দিরে কেন্দ্র-সমিতির একটি অধিবেশন হইবে। কেন্দ্র-সমিতির সভ্য মাত্রেরই উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

১। সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনের দিন স্থির করা। ২। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন। ৩। উক্ত অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের খসড়া প্রস্তুত করণ।

(৩)

বিগত ১৪ই কার্ত্তিক তারিখে কেন্দ্র-সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত, বিষ্ণুপুর সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীতে প্রেরিত, পণ্ডিত প্রবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রেরিত পত্র :—

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের সম্পাদক মহোদয়

শ্রীযুক্ত জগন্নাথ সেন (সম্পাদক, কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সভা) মহাশয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ এই জন্য এই সভায় যোগদান করিতে না পারায় দুঃখিত হইলাম। সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্যাচার গ্রহণ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। এই বিষয়ে অনেক সভায় আমি আমার অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। সুবর্ণবণিক্ সমাজ কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হউন ইহাই আমার একান্ত বাসনা। অপিচ কেহ কেহ বলেন যে, কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মালা-তিলক ধারণ করিলে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের প্রয়োজন নাই; আমার মতে ইহা সমীচীন নহে। যজ্ঞোপবীত আর্য্যদ্বিজ-গণের একমাত্র প্রধানতম চিহ্ন; মালাতিলক বৈষ্ণব সাধারণের চিহ্নমাত্র। যাঁহারা বৈশ্যত্বের দাবী করেন, কেবল মালাতিলক ধারণ সে দাবী সম্বন্ধে কখনই প্রচুর নহে, তাঁহাদিগকে দ্বিজত্বের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত অবশ্যই ধারণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ গোস্বামীগণ যেমন মালাতিলক ধারণ করেন, তেমনই যজ্ঞোপবীতও ধারণ করেন; বৈশ্য বৈষ্ণব-গণের পক্ষে তদ্রূপ আচরণই যুক্তিযুক্ত। স্বাঃ শ্রীরসিক মোহন দেবশর্ম্মা (বিদ্যাভূষণ)।

বিগত ১১ই ও ১২ই নভেম্বর তারিখের কেন্দ্র-সমিতির, মেদিনীপুর অধিবেশনের নিমন্ত্রণপত্রে আমি প্রচার করিয়াছিলাম আগামী ৬ই অগ্রহায়ণ যশোহর বগচর নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র মহাশয়ের ভবনে, যশোহর নিবাসী সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্য-উপনয়ন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে।

গত ১৫।১১।২৮ তারিখে মৎসমীপে প্রেরিত চন্দ্র মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, তাঁহাদিগের জাতাশৌচ হওয়ার কারণে বাধ্য হইয়া উক্ত অনুষ্ঠানের তারিখ আগামী ২৯শে অগ্রহায়ণ শনিবার স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল
সম্পাদক, কেন্দ্র-সমিতি
৯৫নং বেচুচ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর কেন্দ্র-সমিতি

৯৫নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

মহাশয় আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর বাং ৯ই ও ১০ই পৌষ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক সহরে চুঁচুড়া নিবাসী স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে "নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী"র চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইবে। আশা করি আপনার কেন্দ্রস্থ স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ সহ আপনি উক্ত সভায় যোগদানপূর্ব্বক সভার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিবেন; আপনার কেন্দ্রের যে সকল স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ঠিকানা সহ নাম আগামী ৫ই পৌষের পূর্ব্বে উক্ত সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক স্বজাতিপ্রাণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে মহাশয়কে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি— ভবদীয় বশম্বদ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল
কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের ঠিকানা—
পোঃ আঃ তমলুক, জিলা মেদিনীপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

মহাশয়,

১৯২৯ সালের কেন্দ্র-সমিতিতে আপনাদের সমিতি

কেন্দ্র-সমিতির নিয়মানুযায়ী......জন সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন। আপনাদের সমিতির প্রতিনিধিস্বরূপ উক্ত সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের ঠিকানা সহ নাম আগামী ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

ভবদীয় বশম্বদ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল
কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক।

গত ২রা ডিসেম্বর তারিখের কেন্দ্র-সমিতি ও তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির একত্র অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী

বিগত ২রা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ-মন্দিরে কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কেন্দ্র-সমিতির ও তমলুকের অভ্যর্থনা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম প্রস্তাব :—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক সহরে আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে "নিখিল বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী"র চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব :—উক্ত চতুর্দ্দশ অধিবেশনের সভাপতি চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় মনোনীত হইলেন।

তৃতীয় প্রস্তাব :—আগামী সম্মিলনীর আলোচ্য বিষয়-নির্দ্ধারক সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত হইবে :—

১। সুবর্ণবণিক্ জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য এই সম্মিলনী এই নিয়ম করিতেছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে অন্য প্রথা বর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান প্রথা—যথা, আশীর্ব্বাদ, গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস ও ফুলশয্যা উভয় পক্ষ পালন করিবেন এবং ব্যবহারিক আদান-প্রদানের বাহুল্য ও অতিরিক্ত ব্যয় বর্জ্জনার্থ নিম্নলিখিত এই নিয়ম সম্মিলনী প্রচলন করিতেছেন—বিবাহকালে ধান, দূর্ব্বা ও যৎকিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিয়া আশীর্ব্বাদ করা হউক এবং গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস ও ফুলশয্যা উপলক্ষে প্রয়োজনীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য, যৎসামান্য দধি, মৎস্য, আশীর্ব্বাদী নৎ ও বরকন্যার ব্যবহারের জন্য যে সকল কাপড়, গহনা ও তৈজসাদি তাহাদিগকে একেবারে দেওয়া হইবে, তাহা ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য পাঠান বন্ধ করা হউক।

২। বিবাহে কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় কন্যাকে যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করা হউক। বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে ফুরাণ চুক্তির দ্বারা নগদ টাকা, অলঙ্কার বা অন্য কোন দ্রব্য বরপক্ষের গ্রহণ করা অতিশয় গর্হিত, নিন্দনীয় ও সমাজের অনিষ্টকর। সেইজন্য এই সম্মিলনী সকলকে চুক্তি-মূলক বিবাহে বরপক্ষের সহিত যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছেন।

এই সম্মিলনী আরও বলিতেছেন যে, বিবাহে শোভা-যাত্রা বন্ধ করা হউক এবং ইহার ব্যতিক্রম হইলে কেহ বরপক্ষে যোগদান করিবেন না।

বিবাহের বয়স সাধারণতঃ ন্যূনকল্পে বরের পক্ষে ২১ বৎসর এবং কন্যার পক্ষে ১২ বৎসর করা হউক।

৩। (ক) জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনার্থ বালক ও বালিকাগণের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, শিল্প, নীতি, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা এবং যুবকগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও কৃষি, শিল্প, বয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা বিস্তার করা হউক। সুদূর মফস্বলসমাজে বালকবালিকাগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার কল্পে কলিকাতা এবং অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু সমাজের বিশেষ সহানুভূতি ও চেষ্টা আবশ্যক।

(খ) সুবর্ণবণিক্‌গণের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্ব-বিধ শিক্ষা এবং ধর্ম্মকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

(গ) দরিদ্র শিক্ষার্থিগণকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক।

৪। কেন্দ্র-সমিতি ও কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের পরিচালনাধীনে যৌথ সুবর্ণবণিক্ ভাণ্ডার স্থাপন ও তৎ-

(ক) স্বজাতীয় দরিদ্র বিধবাগণের ভরণপোষণ ও দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্য দান।

(খ) নিঃস্বহায় দরিদ্র ছাত্রগণের (স্বজাতীয় এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত) সৎশিক্ষার ব্যবস্থা করণ।

(গ) বৈশ্যজাতির প্রধান কর্ম্ম গোরক্ষা কল্পে ব্যবস্থা করণ।

৫। স্বজাতীয় ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত অসমর্থ ছাত্রগণের জন্য কলিকাতায় যে সুবর্ণবণিক্ ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে তাহার পরিচালনা ও স্থায়িত্ব বিধান কল্পে এই সম্মিলনী সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

৬। এই সম্মিলনী পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতেছেন—

(ক) বৈষয়িক কলহ যথাসম্ভব আপোষে বা উপযুক্ত সালিশ দ্বারা মিটাইয়া লওয়া হউক এবং যদি কোন স্থানে কোনও কারণে সামাজিক অপ্রীতি জন্মে ও স্থানীয় লোকের দ্বারা নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে তাহার মীমাংসার ভার কেন্দ্র-সমিতির উপর অর্পণ করা হউক।

(খ) সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচার কল্পে ও জাতীয় ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে হরিসভা স্থাপন ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হউক।

(গ) সুবর্ণবণিক্-কুলোজ্জ্বলকারী শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট সপ্তগ্রামকে জাতীয়-তীর্থ-স্বরূপ গ্রহণ করা হউক এবং দত্তঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে গ্রামে গ্রামে মহোৎসবের আয়োজন করা হউক।

(ঘ) এই আত্মবিস্মৃত সুবর্ণবণিক্ জাতির মধ্যে স্বজাতিপ্রীতির উন্মেষ করিবার জন্য, জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলন একান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়ায় এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে, আমাদিগের পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণ ও বর্ত্তমান স্বজাতি—সাহিত্য, শিল্প, মনোবিজ্ঞান, ব্যবসায় বাণিজ্য, দান, শিক্ষাবিস্তার, দেবালয় স্থাপন প্রভৃতি যে কোন জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কেন্দ্র-সমিতি কর্ত্তৃক তাহার ইতিহাস সংগ্রহ ও পুস্তকাকারে প্রচার করা হউক।

৭। সুবর্ণবণিক্গণ বৈশ্যবর্ণোচিত উপনয়নাদি দশবিধ [illegible] বৈশ্যবর্ণোচিত [illegible] রক্ষা করুন।

৮। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সাধারণ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সদস্য হইবার জন্য প্রত্যেক যোগ্য সুবর্ণবণিকের চেষ্টা করা উচিত এবং প্রত্যেক সুবর্ণবণিকের সে কার্য্যে সহায়তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৯। কেন্দ্র-সমিতির নিয়মাবলীর আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও সংশোধন।

তমলুক যাইবার পথ

বি এন্ রেল লাইনে পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নেমে মোটর বাস যোগে তমলুক যাওয়াই সুবিধাজনক।

পাঁশকুড়া যাইবার ট্রেনের সময় :—

হাওড়া হইতে	খড়গপুর হইতে
সকাল—৭ ঘটিকা	প্রাতে—৫।৪৪ মিনিট
৭।৪৯ মিনিট	৬।১৩ "
১১।২৪ "	১০।১ "
১২।২৪ "	বৈকালে—৩।৫৪ মিনিট
বৈকাল—৫।৪৩ "	৪।২ মিনিট

হাওড়া হইতে পাঁশকুড়ার ভাড়া :—

প্রথম শ্রেণী রিটার্ণ—৮।/০ মধ্যম শ্রেণী রিটার্ণ—১৸১৫

দ্বিতীয় " " —৪৶০ তৃতীয় শ্রেণী (single)—৸৴১০

বৈশ্যশক্তি

নূতন মাসিক পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩৩৫ সাল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দত্ত, বি এ, এবং শ্রীযুক্ত দুনিয়াচাঁদ বড়াল। আনন্দের কথা যে, আমাদের জাতীয় দুইজন কর্ম্মী যুবকের চেষ্টায়, আর একখানি মাসিক পত্রিকার অভ্যুদয় হইল। আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে একাধিক পত্রিকা আবশ্যক তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। ইহা সুখের বিষয় যে, পত্রিকাখানির "বৈশ্য-শক্তি" নামকরণ হইলেও সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের উন্নতিবিষয়ক আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইহা শারদীয়া সংখ্যার উপযোগী একখানি দশভুজা দুর্গার ত্রিবর্ণ চিত্রে শোভিত, কয়েকটি প্রবন্ধে ও কবিতায় সুখপাঠ্য। এই মাসিক পত্রিকার আবির্ভাবে আমাদের আশা হয় যে,

অতঃপর জাতির মধ্যে ক্রমশঃ সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার উদ্ভব হইবে। আমরা এই নূতন পত্রিকাখানিকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

শ্রীপাট সপ্তগ্রামের মহোৎসব

যথাবিহিত প্রণাম, বন্দনা ও নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয়

নিবেদন :—

মহাত্মন্!

আগামী ২৪শে পৌষ ইং ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপার্ষদ দ্বাপরের পঞ্চম গোপাল সুবর্ণবণিক্-কুলোজ্জ্বলকারী শ্রীশ্রীমৎ-উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীপাট সপ্তগ্রামে নিম্নলিখিতমত মহামহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে উক্ত মহাপুরুষের স্মৃতির সম্মানার্থ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ভক্তবৃন্দের শুভাগমন একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি—

কার্য্যসূচী

২৩শে পৌষ ইং ৭ই জানুয়ারী সোমবার—সন্ধ্যাকালে অধিবাস।

২৪শে ইং ৮ই মঙ্গলবার—তিথি আরাধনাকল্পে প্রাতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ; মধ্যাহ্নে বিশ্বপাবন শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক স্মৃতিসূচক কীর্ত্তন, পরে শ্রীগোস্বামী, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবা।

দিবস চতুষ্টয় সংকীর্ত্তন ও ভোগরাগ। (২৫শে হইতে ২৮শে)

২৯শে পৌষ ইং ১৩ই জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন ও ধূলট; মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ। বেলা ১টার সময় শ্রীমৎউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমিতির ও বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ স্বজাতিসম্মিলনী সভার ঊনবিংশ সাম্বাৎসরিক অধিবেশন, পরে শ্রীগোস্বামী, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি ও অভ্যাগত সেবা হইয়া উৎসব সমাপন।

সপ্তগ্রাম, মগরা পোঃ
রেল ষ্টেশন—ত্রিশবিঘা
ই, আই, আর।
৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সাল

বিনীত নিবেদক—
শ্রীহৃষীকেশ লাহা—সভাপতি
শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক,
ও কার্য্যনির্ব্বাহক
সমিতির সদস্যগণ।

ট্রেনের সময়—কলিকাতার সময়

হাওড়া হইতে প্রাতে—৬।১৪, ৯টা, ১০।৯, ১।৩০, ২।৫৪, ৫।৩০, ৬।১৪, ৮।৩৬ ও ১০।৩০

ত্রিশবিঘা হইতে—৪।২০, ৭।৫০, ৮।২৩, ৯।৪৬, ১২।৪৬, ৩।৫৩, ৭।৪৬ ও ৮।৫০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যাত্রীদিগের প্রত্যাগমনের সুবিধার জন্য ২৪শে ও ২৮শে পৌষ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ত্রিশবিঘা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

শোক সংবাদ

কবিবর রসময় লাহা

আমরা আন্তরিক শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, কবিবর রসময় লাহা গত ২০ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। রসময়বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; বিশেষতঃ তিনি তাঁহার সরস ব্যঙ্গ কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; বঙ্গভাষায় তাঁহার ন্যায় হাস্যরসাত্মক কবি বর্ত্তমান সময়ে কেহ ছিলেন না। রসময় বাবুর কাব্য-গুলি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন। আমাদের জাতির মধ্যে কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল যেরূপ খণ্ড কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, রসময় বাবুও তদ্রূপ রসাত্মক কবিতায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি তাঁহার কয়েকটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার রসভাণ্ডার শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাই সম্প্রতি তাঁহার কবি-প্রতিভার উপযোগী কোনও পুস্তক আমরা দেখিতে পাই নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল, অবশেষে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণকে কাঁদাইয়া মহাপথের যাত্রী হইলেন। রসময় রসময়ের লোকান্তরে আমাদের জাতির যে ক্ষতি সাধিত হইল তাহা অপূরণীয়, অপিচ বঙ্গভাষা জননী একটি অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলেন।

আমরা মৃত মহাত্মার শোকতপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ

বিজয়া-সম্মিলন

গত ২রা অগ্রহায়ণ রবিবার কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ

রায় মহাশয়ের বেলুড় গঙ্গাতীরস্থ "শান্তি কানন" নামক উদ্যানে সমাজের বার্ষিক বিজয়া-সম্মিলন মহা সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। সমাজের সভ্যগণ ও আমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গে প্রায় দুইশত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। সকলের মনোরঞ্জনের জন্য সঙ্গীত, কমিক ও ম্যাজিকের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সমাজের প্রাচীন সদস্য ও অন্যতম সহকারী সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত কানাই লাল দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। সমাজের অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয় সভার উদ্বোধনকালে প্রকাশ করেন যে, দেশের অন্যতম নেতা পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে সমগ্র দেশে শোকের স্রোত প্রবাহিত, এবং সেই দিবসেই বহুস্থলে শোকসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুবর্ণবণিক্ সমাজ বহু পূর্ব্বেই বিজয়া-সম্মিলনীর বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন সুতরাং সেই শোক-সাগরে আনন্দানুষ্ঠান বন্ধ করা অসম্ভব; এতদবস্থায় তিনি প্রস্তাব করেন যে, লালাজীর প্রতি সম্মানার্থ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে সকলেই তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশ্যে ভক্তি-অঞ্জলি প্রদান করেন।

সমাজের সভাপতি মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা বাহাদুরও শারীরিক অসুস্থতা বশত অনুপস্থিতির কারণ বিজ্ঞাপিত করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন এবং তাহাতে লালাজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সমবেত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন করেন।

তদনন্তর সঙ্গীতাদি আরম্ভ হয়। শ্রীমান্ পঙ্কজকুমার মল্লিক ও শ্রীমান্ গোবিন্দদাস মল্লিকের সঙ্গীত ও বাদ্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রফেসার হেমচন্দ্র দত্ত ব্যঙ্গ অভিনয়ে সকলকে প্রীতিদান করেন। পরিশেষে বৈদ্যুতিক আলোকমালাসুশোভিত বিস্তৃত ময়দানে বিখ্যাত যাদুকর প্রফেসার মুখার্জ্জি তাঁহার সুনিপুণ হস্ত-কৌশল ও যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। আমোদপ্রমোদ অবসানে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন সভাপতি শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস, উদ্যানস্বামী কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, স্বজাতীয় গায়ক-বাদক ও রঙ্গ অভিনেতা প্রফেসার দত্ত এবং যাদুকর প্রফেসার মুখার্জ্জিকে সমাজের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নিজব্যয়ে উপাদেয় ভূরি জলযোগের আয়োজন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সুবর্ণবণিক্ ছাত্রাবাস

কলিকাতা

দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণ

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে কলিকাতায় ২১নং কালিদাস সিংহের গলিতে সুবর্ণবণিক্ ও তাঁহাদের পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রগণের জন্য একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই ছাত্রাবাসে ১১টি সুবর্ণবণিক্ ছাত্র ও তিনটি তাঁহাদের পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র অবস্থান করিতেছেন। এই ছাত্রাবাস গৃহে ১৪টি ছাত্র থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে। ছাত্রাবাসটি কলিকাতা ইউনিভারসিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত (affiliated) হইয়াছে। যে ছাত্রগণ এই ছাত্রাবাসে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মফস্বলের ছাত্র। তাঁহাদের নামের তালিকা, বাসস্থানের পরিচয় এবং তাঁহারা কোন্ কলেজে, কোন্ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছেন তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বগচর নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র মহাশয়ের ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ চন্দ্র বি এ এই ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent)।

এখানে ছাত্রগণ বিনা ভাড়ায় থাকিতে পান এবং পাচক ব্রাহ্মণ ও চাকরেরা মাহিনা বাবদ তাঁহাদের কিছু দিতে হয় না। তাঁহাদের চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানেরও বন্দোবস্ত আছে।

ছাত্রাবাস হইতে আলোচ্য বর্ষে শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ ধর বি এস্ সি ও শ্রীমান্ রামমোহন পাল আই এস্ সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

উপস্থিত বাড়ীভাড়া প্রভৃতিতে ছাত্রাবাসের গড়পড়তা

মাসিক প্রায় ১৫০৲ টাকা ব্যয় হয়। গড়পড়্তা মাসিক আয় (এককালীন প্রাপ্ত ১৪০।৶১০ বাদে) প্রায় ১৪০৲ টাকা। এখনও প্রতি মাসে ১১৲ টাকা অকুলান রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এককালীন দান হিসাবে সর্ব্বসমেত ১৪০।৶১০ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। সাহায্যদাতৃগণের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। এই ১৪০।৶১০ টাকার মধ্যে কলিকাতা হইতে ১৫-৲ টাকা, মফস্বল হইতে ৫৲ টাকা ও গত সম্মিলনী হইতে ১২০।৶১০ সংগৃহীত হইয়াছে।

মাসিক সাহায্য হিসাবে দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৮ মে পর্য্যন্ত ১৬৮১৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে ১৭৭৬৲ এবং মফস্বল হইতে ১০৫৲ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় ৫৪ জন সাহায্যদাতার মধ্যে ৪৮ জন এবং মফস্বলে ১২ জন সাহায্যদাতার মধ্যে ৩ জন নিয়মিতভাবে তাঁহাদের প্রতিশ্রুত সাহায্যের টাকা প্রদান করিতেছেন। ৺দীননাথ দত্ত ও ৺সাক্ষীগোপাল বড়াল মহাশয়ের মৃত্যুতে মাসিক সাহায্য ৮৲ টাকা কমিয়া গিয়াছে। সাক্ষীবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণপ্রকাশ বড়াল মহাশয় মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের অকাল মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

বহু চেষ্টায় ও আপনাদের অনুকম্পায় ছাত্রাবাসটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং গত এক বৎসরকাল ইহা পরিচালিত হইতেছে। আপনাদের সকলের সমান অনুগ্রহ দৃষ্টি ইহার উপর না পড়িলে ইহার উন্নতি হইবে না। জাতীয় সম্মিলনের এই শুভক্ষণে আমি ছাত্রাবাসের পক্ষ হইতে আপনাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, আমার এ প্রার্থনা আপনাদের কাছে 'অরণ্যে রোদনবৎ' হইবে না।

নিবেদক
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।

২য়-বর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব—

২য় বর্ষের আয়

এককালীন সাহায্য	—১৪০।৶১০
মাসিক	—১৬৮১৲
	১৮২১।৶১০
প্রথম বর্ষের উদ্বৃত্ত	—৪৯৩।৫
	২৩১৪৸৶১৫
২য় বর্ষের ব্যয়	—১৮০৫।৶৫
উদ্বৃত্ত	—৫০৯॥১০

ছাত্রদিগের গচ্ছিত টাকার হিসাব

জমা	— ১৯৬৲
খরচ (ফেরত দেওয়া)	৫০৲
হাতে মজুত	১৪৬৲

দ্বিতীয় বর্ষের শেষে হাতে মজুত

ছাত্রাবাস হিসাবে	— ৫০৯॥১০
ছাত্রদিগের গচ্ছিত হিসাবে	১৪৬৲
	৬৫৫॥১০

এককালীন দান

১ম বর্ষে ৩১ মে ১৯২৭ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত	—	৭৪১৲
২য় বর্ষে প্রাপ্ত		
গত কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী-ক্ষেত্রে প্রাপ্ত		১২০।৶১০
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র (যশোহর)		৫৲
(৩য় দফা)		
ডাঃ „ রামলাল সেন	কলিকাতা	৫৲
„ বলাইচাঁদ দত্ত	ঐ	৫৲
„ যুগলচরণ রায়	ঐ	২৲
„ রঘুনাথ শীল	ঐ	২৲
(২য় দফা)		
„ চন্দ্রমাধব দে	ঐ	১৲
		৮৮১।৶১০

ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি

১। শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ
৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন এম্ বি ৪। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ
৫। শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দত্ত

কর্ম্মাধ্যক্ষ

সভাপতি—কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্; পি এইচ ডি

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দত্ত বি এ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযুক্ত বিজয়গোবিন্দ চন্দ্র বি এ

হিসাব-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র দত্ত

বর্ত্তমান তৃতীয় বর্ষে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রাবাসে আছে তাহাদের পরিচয়

	নাম	গ্রাম	জিলা	কলেজ	শ্রেণী
১।	শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার ধর	বরুথান	চট্টগ্রাম	ইউনিভার্সিটি	Third Year Law
২।	„ কৃষ্ণমোহন ধর	সুয়াবিল	„	বিদ্যাসাগর	Fourth Year B. A.
৩।	„ রমেশচন্দ্র মিশ্র	অসিকাটি	ত্রিপুরা	বিদ্যাসাগর	Second Year I.A.
৪।	„ ভবানীচরণ সেন	কীর্ণাহার	বীরভূম	বিদ্যাসাগর	Fourth Year B.A.
৫।	„ রাসমোহন পাল	তিতারকাঁদি	ত্রিপুরা	ঐ	Third Year B.A.
৬।	„ বিনয়ভূষণ দে	চিংড়া	যশোহর	মেডিকেল স্কুল	Third Year
৭।	„ উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	বাউরখুমা	নোয়াখালী	কারমাইকেল মেডিকেল ক:	Second Year
৮।	„ কুঞ্জমোহন চক্রবর্ত্তী	বিজয়পুর	নোয়াখালী	বিদ্যাসাগর	Fourth Year B.A.
৯।	„ ধীরেন্দ্রলাল চন্দ্র	দৌলৎপুর	নোয়াখালী	স্কটিশচার্চ	Fourth Year B.A.
১০।	„ সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল	জঙ্গিপুর	মুর্শিদাবাদ	সিটি	Second Year I.A.
১১।	„ গৌরীদাস মল্লিক	হুগলী	হুগলী	প্রেসিডেন্সি	Sixth Year M. Sc.
১২।	„ বলাইচাঁদ দে	চুঁচুড়া	হুগলী	ইউনিভার্সিটি	Sixth Year M. A.
১৩।	„ পুলিনবিহারী পাল	জয়নগর	২৪ পরগণা	রিপণ	First Year Law.
১৪।	„ নীরদরঞ্জন সেন	টেপাখোলা	ফরিদপুর	বঙ্গবাসী	First Year I. Sc.

কবিবর ৺রসময় লাহা

কবিবর রসময় লাহা

জন্ম—রবিবার ৭ই আষাঢ় ১২৭৬ সাল

মৃত্যু—বৃহস্পতিবার ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সাল

বিগত ২০ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫৷৷০টার সময় রসময় বাবু ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পিতা ৺সীতানাথ লাহার চীনাবাজার সোয়ালো লেনে কাঁচের ব্যবসা ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর রসময় বাবু বিশেষ দক্ষতার সহিত ঐ কারবার চালাইয়াছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহার বঙ্গ সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল বিশেষতঃ হাস্যোদ্দীপক পদ্য রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার সরল কবিতাগুলি সাধারণে বিশেষতঃ সাহিত্যিক রথিবৃন্দের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, পরলোকগত কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, ডি, এল, রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার, বঙ্কিম ও ললিতচন্দ্র মিত্র, নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকগণ তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। "পূর্ণিমা মিলন" প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনের তিনি অন্যতম নেতা। স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুণে ও শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মান ও সমাদর করিতেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং রসময় বাবুও প্রায়ই তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। প্রথিতযশা সুকবি ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচনা নৈপুন্য দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, হাস্যরস কবিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত হইবেন—ব্রাহ্মণবাক্য সফল হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থবলী সুরসিক ও গুণগ্রাহী পাঠকবর্গের অবিদিত নহে তন্মধ্যে তাঁহার শেষ জীবনের লিখিত "ঋতুলীলা" ও "মণিমুক্তা" টেক্‌স্‌টবুক কমিটি কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার "ছাইভস্ম" পড়িয়া পরলোকগত স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় নিজ মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন—"কবির ছাইভস্ম অন্যের মণিমুক্তা অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্।" তাঁহার "আরাম" ও "আমোদ" পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই এমন পাঠক বিরল। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার বাল্যে রচিত "পুষ্পাঞ্জলী" পড়িয়া তাঁহার কৃতিত্বের নমুনা পাওয়া যায়। তিনি চিরবন্ধু শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত একযোগে "মধুর মিলন" গীতি কাব্য প্রণয়ণ করেন। শেষ গ্রন্থ "পরিহাস" তিনি তাঁহার অনুজ-প্রতিম মনোমোহন গাঙ্গুলীর (যিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে বিশেষ দক্ষতার সহিত কতিপয় উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন) নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বেই মনোমোহন বাবু ইহলীলা সংবরণ করেন—তাই কবি শোকে ও দুঃখে পুস্তকের উৎসর্গ পত্রের পূর্ব্বে 'পরিতাপ' বলিয়া এক মুখবন্ধ সংযোজন করিয়া দেন। আজ 'কবির জীবন-নাটকের যবনিকা পতনে দেশের ও দশের পরিতাপ উপস্থিত! তিনি বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ কুলোদ্ভব ও কলিকাতাবাসী ছিলেন। সাংসারিক জীবনে আজন্ম পরম শান্তিতে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহা, এম্ এ মহাশয় আদর্শ অনুজ। মধ্য জীবনে কবির প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে শোক কয়েক বৎসরে প্রশমিত হইতে না হইতে তাঁহার তৃতীয় পুত্রও (যাহার উপর ভার দিয়া তিনি বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন) অকালে (মোটর চাপা পড়িয়া) কালগ্রাসে পতিত হয়—তদবধি রসময়বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে। উপস্থিত তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম পুত্রদ্বয় তাহাদের খুল্লতাত গিরিশবাবুর সহিত একযোগে ৺সীতানাথ লাহা এণ্ড কোং নামক কারবার বেশ দক্ষতার সহিত চালাইতেছে। কবির বিধবা স্ত্রী নারী-মণ্ডলীর আদর্শ; তাঁহারই ত্যাগ ও ভালবাসার গুণে সংসার মধুময়—হায় নিদারুণ বিধিলিপি বশে তাঁহাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল! কিন্তু হিন্দু বিধবার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি সংসার পূর্ব্ববৎ মধুময় ও শান্তিময় করিয়া রাখুন—করুণাময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আমাদের ইহাই কাতর প্রার্থনা।

শ্রীমণিমোহন মল্লিক

প্রেরিত পত্র*

(১)

"বৈশ্যোপনয়ন"

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল মহাশয়ের কোন মতটি প্রকৃত?

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত "সুবর্ণবণিক সমাচার" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত আশ্বিন মাসের "সমাচারে" চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল মহাশয় লিখিত "বৈশ্যোপনয়ন" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। বিস্মিত হইবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ—প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শীল মহাশয়ের আসল কথাটা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না;—শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি সুবর্ণবণিকগণের উপনয়ন-সংস্কারের পক্ষপাতী নহেন। এমন কি তিনি ব্রাহ্মণগণকেও উপবীত ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু এটুকু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে "বর্ণ বৈষম্য বা জাতিগত পার্থক্যের বিলোপ সাধন করিয়া "হিন্দু জাতিকে তিনি যতই "সাম্যমার্গের দিকে অগ্রসর হইতে" সদুপদেশ দান করুন, উহা কোনকালে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। মোট কথা—তিনি "বৈশ্যোপনয়ন" প্রবন্ধে উপনয়ন-সংস্কারের বিরোধী বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কারণ বড় বেশীদিনের কথা নয়—শীল মহাশয়কে আর এক মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম এই চুঁচুড়া সহরেই ১৩৩১ সালের পৌষ মাসে বার্ষিক সম্মিলনীর দশম অধিবেশনে "নিবেদন" কবিতার রচয়িতারূপে। যেদিন তিনি সেই বিরাট্ সভায় বলিয়াছিলেন—

"বৈশ্য মোরা, ইতিহাসে পেয়েছি প্রমাণ
কিন্তু বল ভ্রাতৃগণ! জীবনে কখন
বৈশ্যের আচার মোরা করি কি পালন?
* * * * * *
অর্দ্ধশত বর্ষ ধরি' ব্রাহ্মণমণ্ডলী
আমাদের বৈশ্য বলি করেছে গ্রহণ,
কিন্তু যবে বৈশ্যাচার পালনের তরে
তাঁহাদের মত মোরা করিব গ্রহণ
অমনি সন্দিগ্ধ চিত্তে অমূলক ভয়ে
তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইবে তখন।
* * * * * *
* * * * *হোম, যাগ, যজ্ঞ,
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-জপ, বেদ-নির্দ্ধারিত
ইহা বৈশ্য-কুলধর্ম্ম। হে মোর স্বজাতি,
এ আচার, এই ধর্ম্ম তোমাদের মধ্যে
পালে কয়জন, বড় ইচ্ছা হয় মোর
করিতে শ্রবণ।"

স্বজাতীয় ভদ্রমহোদয়গণ বিচার করিয়া দেখিবেন—"নিবেদন"এর কবি ও "বৈশ্যোপনয়ন" প্রবন্ধের লেখকের মধ্যে কতখানি পার্থক্য বর্ত্তমান। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—শীল মহাশয়ের কোন মতটি প্রকৃত? ব্রাহ্মণগণ "অর্দ্ধশত বর্ষ ধরি" আমাদিগকে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও, আমরা যখন অগ্রসর, তাঁহারা তখন "অমূলক ভয়ে" পশ্চাৎপদ—এ কথা তিনি চারি বৎসর পূর্ব্বে ভাল করিয়াই জানিতেন, তবে এখন আবার নূতন করিয়া বিস্মিত হইতেছেন কেন? উপনয়ন-সংস্কারের অভাবে সুবর্ণবণিকগণ যখন গায়ত্রী-জপের অধিকারী ছিলেন না, তখন তিনি দুঃখে, ক্ষোভে, মনোকষ্টে আত্মহারা হইয়াছিলেন—অথচ ভগবৎপ্রসাদে সে অধিকার যখন আমাদের করতলগত, তখন তিনি ত্রিভুবন অন্ধকার দেখেন কেন, চন্দ্রালোক দেখিয়া প্রেতের ভয় হয় কেন? বৈশ্যোচিত গায়ত্রী-জপে অকস্মাৎ এই অরুচি আসিল কেন? চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বজাতিগণকে যে ভাষায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আজ সেই ভাষাতেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—

* মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নহেন।

হে মোর স্বজাতি!
এ আচার, এই ধর্ম্ম পালনে বিরত
কেন তুমি আজ—বড় ইচ্ছা হয় মোর
করিতে শ্রবণ।

শীল মহাশয়ের এই অভূতপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের কারণ কি? চারি বৎসর পূর্ব্বে সহস্রাধিক স্বজাতির সম্মুখে তিনি স্বয়ং যে সংস্কারের জন্ত এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ তাহাকে "জাতিগত ও বর্ণগত কুসংস্কার" বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা, একটু হাস্যোদ্দীপক নহে কি?

শীল মহাশয় আর এক স্থানে একটা অমূলক কথার উত্থাপন করিয়া স্বজাতিগণকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"রঘুনন্দন সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; গৌতম ঋষি প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। গৌতমের মতে বৈশ্যের ১২ দিনে অশৌচান্ত হইবে; রঘুনন্দনের মতে বৈশ্যের ১৫ দিনে অশৌচান্ত হইবে। রঘুনন্দনকে মানিব কেন? বহু পুরাতন ঋষি—গৌতম, মনু, পরাশর মানিব না কেন?"

মনু ও পরাশরের দোহাই দিলেন কেন? পঞ্চদশ দিবসে বৈশ্যের অশৌচান্ত হইবে, তাঁহারাই এই প্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন।—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন, দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন, শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥
(মনুসংহিতা—৫ম অধ্যায় ৮৩ শ্লোক)

ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ॥
(পরাশর—২ অধ্যায়, ২)

সুতরাং পঞ্চদশাহে অশৌচান্ত করিয়া সুবর্ণবণিক্‌গণ মনু, পরাশর প্রভৃতির ব্যবস্থানুসারেই কার্য্য করিতেছেন। অতএব এই সকল ঋষির নামের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া শীল মহাশয় স্বজাতির প্রতি যে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সকলে নিজ নিজ স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী—কিন্তু এই প্রকার অসত্যের অবতারণা করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা সঙ্গত নহে।

সর্ব্বশেষে শীল মহাশয় যে নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত সমাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। শীল মহাশয়ের জানা উচিত ছিল—রঘুনন্দন বা অন্য কেহ ভট্টপল্লী বা নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। যে কোন পণ্ডিত তদনুসারে ব্যবস্থা দিবার সমান অধিকারী। সুবর্ণবণিক্‌গণ কেন ভট্টপল্লী প্রভৃতির আশ্রয় না লইয়াও ধর্ম্ম-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—এ কথার সদুত্তর শীল মহাশয় স্বয়ং কেন প্রদান করেন নাই—ইহাই আশ্চর্য্য। ইতি চৌমাথা ষ্ট্রীট, চুঁচুড়া। ১৪ই কার্ত্তিক।

বশম্বদ,
বলাইচাঁদ আঢ্য
চুঁচুড়া সুবর্ণবণিক্ সমিতির কার্য্যকরী
সদস্য এবং বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর
কেন্দ্র-সমিতির সদস্য।

---

(২)

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ ১৪শ সম্মিলনীর
অভ্যর্থনা সমিতি
তমলুক ৫।১২।২৮

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

বড়ই দুঃখের বিষয় উপনয়ন গ্রহণ এবং সভাপতি মনোনয়ন সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকায় আজ প্রায় দুই মাস যাবৎ আলোচনা হইতেছে। তাহার ফলে আমাদের বাং ১৬।৩৫ তারিখের পত্র এবং তাহার উত্তর না পাইয়া পুনরায় বাং ২৪।৬।৩৫ তারিখে প্রত্যাহার পত্র প্রেরিত হয় এবং তাহা মীমাংসা করিবার জন্ম গত ১১।১১।২৮ তারিখে মেদিনীপুরে কেন্দ্র-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে কেন্দ্র-সমিতির যে সমস্ত সভ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, অভ্যর্থনা-সমিতির মনোনীত ব্যক্তিই আগামী সম্মিলনীর সভাপতি হইবেন এবং উপনয়ন গ্রহনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা বাধ্যতামূলক নহে। যিনি স্বেচ্ছায় উপবীত গ্রহণ করিতে চাহিবেন তিনি তাঁহার

বাটীতে তাহা গ্রহণ করিবেন, সভাস্থলে কোনও গোলযোগ হইবে না। এখন সভাপতি মনোনয়ন সম্বন্ধে আপনারা যেরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছেন তাহাতে শেষোক্ত কারণ লইয়া যে সভাস্থলে গোলযোগ ও মনোমালিন্য হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের কিন্তু এ সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত। যে সময়ে মেদিনীপুরে কেন্দ্র-সমিতির অধিবেশন হয় সেই সময়ে সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় আমরা তিন জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যথা কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এবং শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন মহাশয়গণের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাতে আপনারা শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরে এই স্থির হইল যে, কার্ত্তিকবাবু যদি সভাপতি হইতে অনিচ্ছুক হয়েন তৎপরে জীতেনবাবু এবং জীতেনবাবু অনিচ্ছুক হইলে বরদাবাবু সভাপতি হইবেন। আপনার ২৭।১১।২৮ তারিখের পত্রে লিখা ছিল যে "কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক মহাশয়কে যদি সভাপতি করা আপনাদের বাসনা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার মত গ্রহণ করে রাখা আবশ্যক"। ইহার উত্তরে ২৮।১১।২৮ তারিখে "কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সভাপতি পদ গ্রহণ করিতে সুম্মত আছেন এবং এখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকেই মনোনীত করা হইয়াছে" এই মর্ম্মে আপনাকে একখানি পত্র দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে দেখা যায় যে, কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পরিবর্ত্তে আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় কেন্দ্র-সমিতি হইতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ফলতঃ এইরূপভাবে কথার ও প্রতিশ্রুতির সামঞ্জস্য না থাকায় ভাবী বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কায় অভ্যর্থনা-সমিতি আগামী সম্মিলনীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্র সমাচারে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি ৫।১২।২৮

শ্রীবিহারীলাল দে
বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

(৩)

মহাশয়,

কলিকাতায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর ত্রয়োদশ অধিবেশনের পর হইতেই আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, কেন্দ্রসমিতির কয়েকজন সদস্য এবং সম্পাদক মহাশয় সম্মিলনীতে গৃহীত অপরাপর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় নির্দ্ধারণে তাদৃশ উদ্যোগী না হইয়া কেবল উপবীত-সংস্কারেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। উপনয়ন সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত মত যাহাই হউক না কেন, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, স্বজাতির মধ্যে যিনি বা যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের আপত্তির কোন কারণই নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু মেদিনীপুর জেলার ও তদন্তর্গত মহকুমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত যে, আমাদের স্বজাতির মধ্যে উহা অসাময়িক হইবে। সেইজন্য আমরা বিগত ৪ঠা আশ্বিন তারিখের পত্রে কেন্দ্র-সমিতিকে আমাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও আমরা অনুরোধ করি যে, স্থানীয় জনসাধারণের সন্তুষ্টির জন্য মান্যগণ্য দানশীল বংশ-পরিচয়ে খ্যাত এবং বিভিন্ন সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত কোনও স্বজাতিকে সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ করা হউক। এই দুই বিষয়েই আমরা কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদকের মনোযোগ আকর্ষণ করি। উক্ত পত্রের উত্তর না পাওয়ায় পুনরায় ১৮ আশ্বিন তারিখে সম্পাদকের নিকট তাগিদ পাঠাই, তাহাতেও কোন উত্তর না পাওয়ায় পুনরায় ২৪ আশ্বিন তারিখে আর একখানি পত্র রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাই এবং বিহিত কারণ পূর্ব্বক সম্মিলনীর আহ্বান প্রত্যাহার করি। এই দুইখানি পত্রই অগ্রহায়ণ মাসের "সমাচারে" ছাপান হইয়াছে।

তৎপরে গত ১১।১১।২৮ তারিখে কেন্দ্র-সমিতির চেষ্টায় মেদিনীপুর সহরে একটি সভা হয়। তাহাতে উপনয়ন সম্বন্ধে আমাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির নির্দ্দেশে সম্মিলনীর মূল সভায় ঐ সম্বন্ধে প্রস্তাব

উপস্থাপিত হইতে পারে কিন্তু সম্মিলনীর পর কোনও যজ্ঞাদি তমলুকে অনুষ্ঠিত হইবে না। উক্ত সভায় সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নামগুলি প্রস্তাবিত হয় (১) কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, (২) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, (৩) শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন এবং (৪) কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মল্লিক। কার্ত্তিক বাবুর নির্ব্বাচনে সকলে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ও তাঁহার ১৩।১১।২৮, ২২।১১।২৮, ২৬।১১।২৮ ও ২৭।১১।২৮ তারিখের পত্রে,"কাহাকে সভাপতি মনোনয়ন করা আপনাদের ইচ্ছা", "আপনাদের মনোমত সম্পাদক নির্ব্বাচনে সহায়তা করিবেন" "কার্ত্তিক মল্লিক মহাশয়কে যদি সভাপতি করা আপনাদের বাসনা হয় তবে পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া রাখা আবশ্যক" ইত্যাদি বাক্যে আমাদিগকে আশ্বস্ত করেন। তদনুযায়ী আমরা সরল বিশ্বাসে কলিকাতা যাইয়া কার্ত্তিক বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য সম্মত করিয়া আসিয়াছিলাম। আমাদের স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য এবং স্বজাতিগণ তথা ব্রাহ্মণাদি অপর জাতীয় সহানুভূতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই নির্ব্বাচনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ২।১২।২৮ তারিখে কলিকাতায় যে কেন্দ্র-সমিতি ও অভ্যর্থনা-সমিতির যৌথ অধিবেশন হয় তাহাতে আমরা যথারীতি কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিকের নাম প্রস্তাব করি। কিন্তু চুঁচুড়ার জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করেন। এই নূতন নামের প্রস্তাবে আমরা মত প্রকাশ করি যে, আমরা অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত চিঠি ও আশ্বাস বাণীর বশবর্ত্তী হইয়া স্থির করিয়া আসিয়াছি যে, কার্ত্তিক বাবু সভাপতি হইবেন এবং কার্ত্তিক বাবুও সম্মতি দিয়াছেন সুতরাং আমাদের মনোনীত ব্যক্তিকেই সভাপতি করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আমাদের এই প্রস্তাব কলিকাতা নিবাসী কয়েকজনের দ্বারা সমর্থিত হইলেও হুগলী ও চুঁচুড়া নিবাসী সভ্যগণ গ্রহণ করেন নাই। পরিশেষে বিষয়টী ভোটে দিবার কথা হইলে আমরা বলি যে, আমাদের অপরিচিত ভদ্রলোককে যখন সভাপতি-পদে বরণ করিবার প্রয়াসী হইতেছেন তখন এই প্রস্তাব স্থগিত রাখিয়া এক সপ্তাহের নোটিশ দিয়া তমলুকে একটী বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হউক এবং তথায় ভোটের দ্বারা যিনি নির্ব্বাচিত হইবেন তিনিই সভাপতি হইবেন, আমাদের এ প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্য করা হয়। তখন নিরুপায় হইয়া আমরা সভার কার্য্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করি ও কোনও ভোট দিই নাই এবং অধিকাংশ মতে রমেশ বাবু সভাপতি সাব্যস্ত হয়েন।

তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ কেন্দ্র-সমিতির এই প্রকার অভাবনীয় আচরণে আপনাদিগকে বিশেষভাবে প্রতারিত ও অপমানিত মনে করিয়াছেন। সভাপতি নির্ব্বাচন অভ্যর্থনা-সমিতির অধিকার; কেন্দ্র-সমিতি নিয়মানুযায়ী তাঁহাদের সহযোগে কার্য্য করিবেন। কিন্তু কলিকাতায় তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য বশতঃ যে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন বিশেষতঃ নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নামটী পর্য্যন্তও পূর্ব্বাহ্ণে অভ্যর্থনা-সমিতিকে জানাইবেন না ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার্য্য। মেদিনীপুরের কেন্দ্র-সমিতিতে ও তৎপরে পত্রদ্বারা কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক আমাদিগকে পরামর্শ না দিলে আমরা কার্ত্তিক বাবুর সম্মতি প্রার্থনা করিতাম না; এবং সর্ব্বাগ্রে কার্ত্তিক বাবু এবং তিনি সম্মত না হইলে, পর পর অপর ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করা হইবে মেদিনীপুরে এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সেদিনকার কেন্দ্র-সমিতির সভ্যগণ আপনাদের জিদ বজায় রাখিবার জন্য আমাদের সমস্ত মিনতি ও যুক্তি পদদলিত করিয়াছেন।

এতদবস্থায় কার্য্য ও প্রতিশ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষিত না হওয়ায় ও ভাবী বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কায় আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে সম্মিলনী আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম ইত্যাদি মর্ম্মে ৪।১২।২৯ তাং প্রত্যাহার পত্র পাঠাইয়া দিই। উহার উত্তরে ৭।১২।২৮ তারিখে কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, সভাপতি-মনোনয়ন সম্বন্ধে পূর্ব্বে চিঠির দ্বারা যে সমুদয় কথা

লিখিয়াছেন, তাহা তিনি ভদ্রতার খাতিরে লিখিয়াছিলেন মাত্র, কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই।

যাহা হউক এই সভাপতি-মনোনয়ন সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটায় উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য তমলুকে কেন্দ্র-সমিতি ও অভ্যর্থনা-সমিতির পুনর্ব্বার যৌথ অধিবেশন বাঞ্ছনীয় বলিয়া কেন্দ্র-সমিতির প্রবর্ত্তিত ১৭শ নিয়মানুসারে ৩ জন সভ্যের সাক্ষরিত অনুরোধ পত্র গত ১৩।১২।২৮ তারিখে সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই বিষয় মীমাংসিত হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর সম্মিলনী হওয়া অসম্ভব বিধায় উক্ত তারিখে সম্মিলনী হইবে না। সম্মিলনীর দিন পরিবর্ত্তিত হইলে যথা সময়ে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইবে ইতি। ১৫।১২।২৮।

বশম্বদ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে
তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৩৮ সাল | ৩য় সংখ্যা

সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

দারিদ্র্যের কারণ কর্ম্মাভাব

ধন-দৌলতের ভাগ-বাটোয়ারার বৈষম্য ও অবিচার থাকার দরুণ অন্যান্য দেশের মতন ভারতেও দারিদ্র্য উৎপন্ন হইতে পারে সত্য। কিন্তু ধনোৎপাদনের জন্য যথেষ্ট কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবই ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের জন্য বেশী দায়ী। এই কর্ম্মাভাব বা বেকার সমস্যাকে সার্ব্বজনীন বলা চলে, কারণ দেশের সকল শ্রেণীর লোকই ইহা দ্বারা আক্রান্ত। ভারতের দেশব্যাপী কর্ম্মাভাব ইয়োরামেরিকার উন্নত দেশগুলির মত কোন এক শ্রেণীর নরনারী কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর উৎপীড়নের ফল নয়। অন্ততঃ পক্ষে এই "নব্য" শ্রেণী-নির্য্যাতনের মাত্রা ভারতে ঐ সকল দেশের মতন এখনও কঠোররূপে দেখা দেয় নাই।

ভারতীয় দারিদ্র্য দেশব্যাপী বেকারের নামান্তর মাত্র। এই বিরাট্ কর্ম্মাভাব নিবারণের উপায় কি, অর্থাৎ কি উপায়ে অসংখ্য চাকুরী, অর্থাগমের নূতন নূতন ব্যবসা সৃষ্টি করা যাইতে পারে ইহাই বর্ত্তমান দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের প্রধান প্রশ্ন। কর্ম্মাভাব নিবারণ করা আর বহুবিধ কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া দেওয়াই হইতেছে বর্ত্তমানে ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের ও অর্থরাষ্ট্রিকদের আসল সমস্যা।

দারিদ্র্যের দাওয়াই শিল্প-নিষ্ঠা

ভাবের আর বাক্যের দিক্ দিয়া সমস্যাটার চিকিৎসা করা খুবই সহজ। পাঁতিগুলা বা ব্যবস্থা-পত্রের জন্য বেশী গলদ্-ঘর্ম্ম হইতে হইবে না। কেননা লোকের আর্থিক প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধারায় বৃদ্ধি কর, চারিদিক্ দিয়া ধনোৎপাদন হউক, তাহা হইলেই লক্ষ লক্ষ নরনারী কারখানায় কার-খানায় মজুরি পাইতে পারিবে, আর হাজার হাজার

এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, বীমা-দালাল, আফিস-কেরাণী আরও কত লোক কাজ খুঁজিয়া পাইবে। রকমারি ধন-স্রষ্টার নানা দল দেশে দেখা দিবে। আর নানা নামের ধন-সৃষ্টির কর্ম্ম-কেন্দ্রে দেশ ছাইয়া যাইবে। এই আবহাওয়ায় ফ্যাক্টরী, ওয়ার্কশপ, শিল্প-কারখানাগুলি তাহাদের নিজের নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া বা গভর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকের চাপে পড়িয়া উপযুক্ত কারিগর, পরিচালক ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার নিমিত্ত "ভোকেশানাল" ইস্কুল, গবেষণাগার, শিল্প-বিদ্যালয় ইত্যাদি ধনোৎপানের বিদ্যাপীঠসমূহ খুলিতে বাধ্য হইবে।

ফলতঃ কৃষির উপর আর লক্ষ লক্ষ নরনারার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করিবে না। জন সংখ্যার কতকটা অংশ মাত্র ইহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষিও উন্নত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে কুটির-শিল্প ও গৃহশিল্পে "সেকেলে" আবহাওয়ার ঠাঁইয়ে এক নব পর্য্যায় আরম্ভ হইবে। বৃহদাকার শিল্প-কারখানার সাঙ্গোপাঙ্গরূপে কুটির-শিল্প ও হস্ত-শিল্পগুলা নবীন জীবন চালাইতে সুরু করিবে। সোজা কথায় দেশটাকে শিল্প-কারখানা দ্বারা ছাইয়া ফেলা দরকার। কারখানা-নিষ্ঠা বা শিল্প-নিষ্ঠাই বর্ত্তমান দারিদ্র্যের আসল দাওয়াই। সমাজে কারখানা-প্রাধান্য সুরু হইলে গ্রামগুলি মুন্সিপাল বা নগর-কেন্দ্ররূপে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। সহর ও পল্লীর চেহারা বদলাইয়া যাইবে। নরনারীর স্বাস্থ্য, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, গণতান্ত্রিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক আত্মচৈতন্য আর আর্থিক শক্তিযোগ ইত্যাদি সদ্গুণ মাত্র দশ বিশ জনের ভিতর নয় পরন্তু হাজার হাজার লোকের জীবনে স্থায়ী ঘর করিয়া বসিবে। দুনিয়ার লোক বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া বলিবে, "ভারতবর্ষও একটা দেশ বটে।"

সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থাপত্র

শিল্প-নিষ্ঠার খুব গুণকীর্ত্তন করা গেল। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, ইহাতেও কিন্তু বিপদ্ আছে, আশঙ্কা আছে, পতন আছে। তবে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার আর্থিক ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে এমন কোন যুগ, অবস্থা বা স্তর দেখা যায় নাই যাহা পুরাপুরি দুঃখহীন বা দুর্নীতি-মুক্ত। আগামী ভবিষ্যৎ বা পরবর্ত্তী অবস্থায় কি অভূত-পূর্ব্ব বিপদ্ আছে এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান ও অতীতের দুঃখ, কষ্ট ও দুর্নীতিকে হজম করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা বা বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্নীতি ইত্যাদির স্তুতিবাদ করা আবার বুদ্ধিমান বা সাবধানী লোকের কাজ হইবে না। সতর্কতা-সাবধানতার একটা সীমা আছে। আগামী কল্যকার দুর্যোগের বা বিপদের কথা মাথায় রাখিয়াই আমাদিগকে বর্ত্তমানের কাজে হাত দিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমানের উপযোগী কর্ম্মপন্থা ও প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা অন্যায়। কারখানা-প্রাধান্যের আমলে কিছু কিছু দুর্য্যোগ জুটিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও তাহার সাহায্যে আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়িবে এইরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হইলেই অসাধ্য সাধনের মামলায় পড়িতে হইবে না। মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতের আপদ্-বিপদের সম্বন্ধে যে সকল উদ্ধার-যন্ত্র প্রথম হইতেই কায়েম করা আবশ্যক, তাহার সব কিছুই সযত্নে ভারতেও আমাদেরকে কায়েম করিতে হইবে। কারখানার পরিচালনায় আর মালোৎপাদনের কলকব্জায় দৈব-দুঃখ-নিবারণ করিবার নানা কর্ম্ম-কৌশল ও আইন-কানুন ইতিমধ্যেই কারখানা-বহুল দেশে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া মাথা খাটাইলে আরও অনেক দুঃখ-নিবারক কর্ম্মকৌশল আবিষ্কার করা সম্ভব। সেই সবই শক্ত মুঠার ভিতর রাখিয়া রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ওস্তাদগণের পক্ষে সাহসের সহিত "সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের" ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতটি তাহার পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে। সেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও এই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের ভিতর অনেক জুটিবে। শত শত বৎসর বা হাজার হাজার বৎসর পরে মানব-সমাজে কত কি অসুখ-অশান্তি-দুর্য্যোগ বিপত্তি ঘটিতে পারে তাহার চিন্তায় অস্থির হওয়া আহাম্মুক মাত্র। সেই সব দূর ভবিষ্যতের দুঃখদৈব নিবারণ করিবার জন্য কর্ম্ম-কৌশলের ব্যবস্থা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব-

পরও নয় আর মানব-জাতির নিকট এইরূপ অসাধ্য সাধন আশা করাও উচিত নয়। সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের সুযোগ-দুর্য্যোগ সম্বন্ধে সজাগ থাকা আর তাহার জন্ত যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করাই মানুষের মগজের নিকট আশা করা যায়।

চাই পুঁজি

দেশের আর্থিক জীবনে এই বিপুল পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে চাই পুঁজি বা মূলধন। কোটী কোটী টাকার পুঁজি খাটান চাই। অর্থাগমের নয়া নয়া পথ, নয়া নয়া পেশা সৃষ্টি করিবার কাজে আজ ভারত-সন্তানের প্রভূত পুঁজির দরকার। যে সকল লোক বিবেচনা করেন যে মেহনত বা মজুরের শ্রমশক্তিই ধনোৎপাদনের একমাত্র বা প্রধানতম কারণ, তাঁহারা ভারতের অবস্থা দেখিলেই নিজদর্শনের ভুল, অসম্পূর্ণতা বা একদেশদর্শিতা বুঝিতে পারিবেন। কেননা এদেশে শ্রমশক্তির অভাব নাই। অভাব আছে শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতাওয়ালা পুঁজি-শক্তির। ঘটনাক্রমে এই পুঁজি আজ কেবলমাত্র জগতের শিল্পী-ব্যবসায়ী জাতি-গুলির একচেটিয়া সম্পত্তি বিশেষ।

ভারতের দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের সম্মুখে আজ এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে পাইতেছি। দুনিয়ার বড় বড় ব্যাঙ্কারদের দুয়ারে গিয়া আজ তাঁহাদিগকে "ধরণা" দিয়া পড়িতে হইবে। ভারতের মাটিতে, খনিতে, বনে, দরিয়ায় টাকা ঢালিবার জন্ত বিদেশীদিগকে আজ আহ্বান করা আবশ্যক। বিদেশীদিগকে ডাকিয়া বলা দরকার "স্বর্ণভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। তোমরা এখানে আসিয়া টাকার গাছ রোপন কর। ঘাটে মাঠে পল্লীবাটে—সহরে নগরে টাকা ছিটাও। তোমরা ত মোটা হাতে লাভবান হইতে পারিবেই। আমরাও খাইয়া বাঁচিব আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হওয়ার কলকব্জাও পাকড়াও করিতে শিখিব।"

শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কায় বিগত শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী এমন কি জাপান, ইতালি ও রুশিয়ার আর্থিক জীবনে এক বিপুল পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। এই দেশগুলির চেহারা বেমালুম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এইদেশগুলির পুঁজিপাট্টা, কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও কর্ম্মক্ষমতা দশ বিশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যে কারণেই হউক, এই যুগে ভারত কিন্তু স্বাধীনভাবে তাহার আর্থিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইতে সমর্থ হয় নাই। আজকাল ভারতের এখানে ওখানে শিল্প-নিষ্ঠার, কারখানা-নিষ্ঠার যে সকল নতুন ইমারত গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহার বোধ হয় শতকরা ৭৫ ভাগ বিদেশী সোজা কথায় বিলাতী পুঁজির দৌলতে সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের জঙ্গলে প্রবেশ করিব না।

বিদেশীদের টাকা ভারতে না খাটিলে, আর দেশী লোকের মতিগতি, কর্ম্মপ্রবণতা আজ যেমন দেখিতেছি সেইরূপই বরাবর ধরিয়া লইলে, দেশের আর্থিক জীবন আজ আরও দরিদ্র থাকিত। শিক্ষা-দীক্ষায়, টেকনিক্যাল কাজ-কর্ম্মে দেশের লোক বর্ত্তমানের চেয়ে অনেকটা কম দক্ষতা লাভ করিত। খোলাখুলি স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজির দৌলতেই ভারতের আর্থিক ও আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য আমাদের নিকট ততটা গভীর ব্যাপক ও বিশাল দেখিতেছি না। বুঝিতে হইবে যে, বিদেশীদের পুঁজি ভারত-সন্তানের পক্ষে কোন মতেই নিখুঁত নিরেট অভিশাপ মাত্র নয়, ইহাকে আগাগোড়া অস্পৃশ্য মনে করিলে অবিচার করা হইবে।

শিল্প-নিষ্ঠাই ভারতের এই দুর্দ্দিনে তাহার রক্ষা-কবচের কাজ করিবে। আর ভারতকে শিল্প-নিষ্ঠার আখড়ায় পরিণত করিতে হইলে বিদেশী পুঁজির সহায়তা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদেশী মূলধন আমাদের কাছে ভগবানের আশিস্ বিশেষ। এই আশিস্ একদম অমিশ্র নয়। ইহার সঙ্গে কিছু শাপ জড়ান আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি হইতেছে রাষ্ট্রনৈতিক। আজ চীন, তুর্কি, পোলাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, এমন কি জার্ম্মাণী, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি দেশের লোক এই শাপ মিশ্রিত বরের সমস্তা ভোগ করিতেছে। বিদেশী পুঁজির কু-গুলা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে শুধরাইবার চেষ্টাও করিতেছে। কিন্তু বিদেশী পুঁজির আশ্রয় লইলে পরাধীন ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক তরফ হইতে নূতন

করিয়া বেশী কিছু হারাইতে হইবে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বরঞ্চ তাহার আর্থিক লাভ কিছু গোটা রকমেরই হইবে।

কিন্তু নিছক আর্থিক তরফ হইতে বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে বিদেশী পুঁজির জন্ম অন্যান্য দেশের মতন ভারতকেও খুব বেশী চড়া দাম দিতে হইয়াছে আর ভবিষ্যতেও হইবে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে আমরা অনেক কিছুই এইজন্য বিদেশীর হাতে দামস্বরূপ তুলিয়া দিয়াছি। আরও বিদেশী পুঁজি ভারত-ভূমিতে আমদানী করিতে হইলে আমাদিগকে আরও অনেক দিন ধরিয়া বিদেশকে যথোচিত দাম দিবার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদ্ ইহা দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে অনেকটা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। বিদেশীদের দ্বারা লাগান কোটি কোটি টাকা মূলধনের লাভের বখরা তাহাদের পকেটেই যাইবে। ইহা স্বাভাবিক। অধিকন্তু এই সকল টাকা দ্বারা যে সকল শিল্প ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহাদেরও পরিচালকগণ স্বভাবতই বিদেশীরা হইবেন।

এই সব কথা নৈরাশ্যজনক সন্দেহ নাই। তবুও ভারত বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে কতকটা অল্পবিস্তর সুবিধা-জনক বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারে। "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" এই প্রবাদ বাক্য মনে রাখিয়া আমাদিগকে কাজে নামিতে হইবে। কেবল মাত্র ইংরেজ বা মার্কিণ নয় পরন্তু জার্ম্মাণ এবং ফরাসী, জাপানী সকলকেই এই ভারতবর্ষের সম্পদ্-বৃদ্ধির কাজে মোতায়েন রাখা যাইতে পারে।

বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের দাবী

প্রথমেই বুঝিয়া রাখা উচিত যে, বিদেশী পুঁজিওয়ালারা তাহাদের টাকার একটা সিকিউরিটি বা জামিন চাহিবে। অন্যান্য দেশে ইহা একটা বিষম সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ততদিন,—স্বরাজ স্বাধীনতার আন্দোলন সত্ত্বেও,—আন্তর্জ্জাতিক বাজারে আইন ও শৃঙ্খলার দেশ বলিয়া তাহার টাকা মাঠে মারা যাইবে না এরূপ আশ্বাস বিদেশীদের আছে। বল্কান ও মধ্য ইয়োরোপের মত এখানকার অবস্থা অস্থির বা জটিল নয়। নির্ভাবনায় টাকা খাটাইবার উপযুক্ত স্থান আমাদের এই "সোণার ভারত", এই কথাটা ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণ দুনিয়ার বাজারে বাজারে প্রচার করিতে থাকুন। তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে।

ইহাও বুঝিয়া রাখা উচিত যে, বিদেশী পুঁজিওয়ালারা একটা নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ ও মুনাফা দাবী করিবেই। তাহার নীচে তাহারা নামিবে না। সেই সর্ব্ব নিম্ন দাবী কতটা হওয়া উচিত? জবাব অতি সোজা। সাধারণ লাভ-লোকসান দুনিয়ার সকল কারবারে যেমন, এইক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হওয়া উচিত। অতি-কিছু জামিনের ব্যবস্থা করিবার দরকার নাই। বিপদ্-আপদের কথা খতিয়ান করিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হইয়া থাকে বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে সেইরূপ চুক্তি চালানোই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সময় নিছক আর্থিক বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু বিচার করিবার দরকার নাই। বিদেশীরা অনুন্নত বা 'কচি' দেশগুলায় টাকা ঢালিবার সময় তাহাদের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক বা "নিম" রাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা দাবী করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু ভারত-সন্তানের পক্ষে স্পষ্ট করিয়া দুনিয়ার লোককে জানাইয়া দেওয়া চাই যে, আইন-কানুন বিষয়ক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনরূপ সুবিধা বাহির হইতে আগত পুঁজির প্রতিনিধিগণ এদেশে ভোগ করিতে পারিবেন না। শিল্প-ব্যবসার কর্ম্মক্ষেত্রে কোন প্রকার কৌলিন্য রাখা হইবে না। আসল কথা এরূপ বিশেষ সুবিধা কোনো বিদেশী বামুন-দেরকে বা ব্যবসাদারকে দিতে হইলে তাহা ব্রিটিশ ভারতের লোকজনের পক্ষে ঘোর অপমানসূচক বিবেচিত হওয়াই উচিত। ভারত-সরকারের আন্তর্জ্জাতিক ইজ্জতই এই বিদেশী পুঁজির জামিন রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। এক পক্ষে ভারতীয় পুঁজিওয়ালা ও অন্য পক্ষে বিদেশী পুঁজিওয়ালা এই দুই দলের মধ্যে চুক্তি করা হইবে। ঐ চুক্তির জন্য ব্যক্তিগত

সরকার বা বিদেশী সরকার কেহই এই সকল ব্যবসা-বিষয়ক চুক্তির ভিতরে ব্যবসায়ী হিসাবে নাক গুঁজিতে পারিবেন না। অবশ্য দেশের ভিতরকার সকল প্রকার রেজিষ্টীকৃত চুক্তি আইনসম্মত কিনা তাহা দেখিবার অধিকার ভারত-সরকারেরও থাকিবে। ভারতের এবং ভারত-সন্তানের আর্থিক উন্নতির অন্তরায়মূলক কোন প্রচেষ্টা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত নয় বলাই বাহুল্য।

ভারতীয় স্বার্থ কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে

বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইবার সময় ভারত-সন্তানের পক্ষে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত করা উচিত :—

(১) প্রত্যেক প্রচেষ্টা ভারতীয় চৌহদ্দির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এদেশের রুপৈয়ায় ইহার মূলধনের হিসাব-কিতাব থাকিবে। আর প্রত্যেক প্রচেষ্টাতেই ভারত-সন্তানের কতক পরিমাণ টাকা পুঁজি হিসাবে খাটিবে।

(২) পরিচালকবর্গের মধ্যে ভারতবাসীর স্থান থাকিবে।

(৩) সর্ব্বোচ্চ বিভাগগুলিতে এবং টেকনিক্যাল পরামর্শ-বিভাগেও ভারতবাসীকে বাহাল করিতে হইবে।

(৪) ভারতীয় কর্ম্মদক্ষগণকে উচ্চতম পদে বাহাল করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারিবে না। আর একমাত্র জন্মের দরুণ ভারতীয়গণ বিদেশীদের চেয়ে কম সরেস বা কার্য্যক্ষম এরূপ অস্বাভাবিক ধারণা কোম্পানীর আবহাওয়ায় পুষ্ট হইতে পারিবে না।

(৫) উচ্চাঙ্গের কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিবার জন্য ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৬) দেশের ভিতরই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়বিধ শ্রমজীবিগণের শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার আয়োজন থাকিবে।

(৭) শ্রমজীবিগণের সহিত মজুরি ও অন্যান্য বিষয়ে সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সদ্ব্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।)

(৮) বিজ্ঞাপনাদি প্রচার কার্য্যের জন্য ভারত-সন্তান পরিচালিত দেশী ও বিদেশী সংবাদ-পত্রের সাহায্য লইতে হইবে।

এই সকল ভারতীয় দাবীর কোন্ কোন্‌টি এখনই বিদেশী পুঁজিওয়ালারা স্বীকার করিয়া কাজে নামিতে প্রস্তুত তাহা বলা কঠিন। এই সব হইতেছে বাজারে দর কষাকষির মামলা। তবে ভারতের স্বার্থ এখানে জবর। যেন তেন প্রকারেণ বিদেশী পুঁজির সাহায্যে ভারতকে আগাগোড়া শিল্প-কারখানায় ছাইয়া ফেলিতে হইবে। দেশের স্বার্থ এই ক্ষেত্রে এত বেশী যে, বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা চালাইবার সময় দুই এক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর ভুলচুক্ করিয়া বসিলেও অত্যধিক ক্ষতি হইবে না। আজ ১৯২৯ সনে দুনিয়ার অবস্থা ঢের ঢের বদলিয়া গিয়াছে।

১৮৭৫ সনের এদিক্ ওদিকে দুনিয়ার পুঁজিপতিদের ধরণ-ধারণ যেরূপ ছিল আজ সেরূপ নয়। তাহারা অনেকটা দুরস্ত হইয়া আসিয়াছে। সকল দিকে নজর ফেলিয়া তাহারা সুবিবেচকের মতন কার্য্য করিতেছে। ভারতবর্ষ একবার শিল্প-নিষ্ঠায় মাতোয়ারা হইয়া উঠিলে আর সঙ্গে সঙ্গে কারখানাবহুল, শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান পল্লী-নগরে দেশ ভরিয়া উঠিলে, জগতে একটা প্রবল শক্তির অভ্যুদয় হইবে। আর সেই শক্তির জোর থাকিবে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নর-নারীর মুঠায়। এই শক্তি-কেন্দ্রের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করা কোন লোকের পক্ষে মঙ্গলের কাজ বিবেচিত হইবে না।

স্বদেশী পুঁজিপতি ও জনসাধারণ

স্যর বিট্‌ঠ্‌ল দাস ঠাকুর্সে বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। ভারতের এই "বাঘা" ব্যবসায়ী মহাশয় বলিতেন—"দেশের স্থায়ী উন্নতির দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের ক্রমিক উন্নতির ফলে ভারতীয় শিল্প-দক্ষেরা নিজ মুরদে ভূগর্ভ হইতে তেল বা সোনা উত্তোলন করিতে সমর্থ না হয়, আর কারখানার লাভ, মুনাফা নিজে ভোগ করিতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত পেট্রোলিয়ম মাটীর নিচেই ভাসিয়া চলুক, আর

পৃথিবীর জঠরে সোণা তাহার নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করুক। বিদেশী পুঁজি আর বিদেশী শিল্প-দক্ষের সাহায্যে দেশকে শিল্পনিষ্ঠ করিয়া লইবার জন্য যে দাম দেওয়া হইতেছে বা হইয়াছে তাহাতে আমাদের উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী।"

এই মতের মধ্যে পুরা মাত্রায় স্বাদেশিকতার ঝাঁজ আছে। কাজেই ইহা সম্মানযোগ্য বটে। তাহা ছাড়া যিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে চরমপন্থী বলিয়া কোন দিনই তাঁহার অখ্যাতি ছিল না। তবুও আজ যুবক ভারতের নরম, গরম, চরম সকল স্বদেশ-সেবকের পক্ষেই এই "খাটি স্বদেশী"মতটা পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। দেশের "খাঁটি" স্থায়ী "ভবিষ্যৎ" আর "বেশী" স্বার্থ কি কি আর কোন্ কোন্ কর্ম্ম-কৌশলে এই সব পুষ্ট হইতে পারে তাহা পাকা রাষ্ট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের কায়দায় খতিয়ান করিয়া দেখা আবশ্যক। ভাবপন্থী আদর্শ-বাদীরাও চোখের ঠুলি ফেলিয়া দিয়া দেশ ও দুনিয়ার আর্থিক গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করুন।

দেশের মাটীতে কবে কোন শুভ ভবিষ্যতে স্বদেশী ধনকুবেরগণ গজাইয়া উঠিবেন, কবে তাঁহারা তাঁহাদের সঞ্চিত পুঁজির দ্বারা দেশের নানা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুলিতে অগ্রসর হইবেন, আর কবে তাঁহারা তাঁহাদের "কারখানার লাভ-মুনাফা নিজে ভোগ করিতে" থাকিবেন, সেই অনির্দ্দিষ্ট সুদিনের জন্য ভারতের নরনারীগণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেওয়া উচিত কিনা সন্দেহ। ভারত-সন্তান অতদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে সমর্থ কিনা তাহাও বিবেচ্য। আসল কথা ভারতীয় পুঁজি-পতি মহাশয়রা নিজ নিজ মুনাফার সুযোগ চুঁড়িবার মতলবে দেশের লোককে বলিতেছেন:—"সবুর কর আমরা আরও বড়লোক হইয়া লই তারপর তোমাদের দিন ত পরিয়া আছেই"। এই ধরণের পরামর্শ খাঁটি যুক্তির নিক্তিতে সমালোচনা করিতে বসিলে "কেঁচো খুড়িতে গিয়া সাপ আবিষ্কার করা হইবে মাত্র"। এই বিষয় লইয়া ঘোর বাদ-বিতণ্ডা হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। ব্যক্তিগত মত বাহাল রাখিবার জন্য অনেকেই যুঝিবেন। নিজ পরি-বারের, নিজ ব্যবসার, নিজ জাত-ভায়ার লাভ-লোকসান আর "আর্থিক স্বার্থই" এই সকল তকড়ারের প্রধান কথা দেখিতে পাইব। এই সকল ব্যক্তিগত সুখ-খেয়াল, স্বার্থ প্রবৃত্তির ভিতরে আসল স্বদেশহিত বা দেশোন্নতির স্পৃহা হয়ত একরত্তিও নাই।

বিদেশী পুঁজির সাময়িক শিষ্য স্বদেশী পুঁজি

ভারতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির ব্যবস্থায় দেশবাসীর নিকট এই যে আর্থিক মোসাবিদা পেশ করিতেছি তাহাতে বিদেশী পুঁজির মাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করিলাম। বর্ত্তমানে আরও কিছুকাল ধরিয়া ইহাকে ভগবানের দান স্বরূপই বিবেচনা করিতেছি। তবে একথাও বলিয়া রাখি যে, এই বিদেশী পুঁজি একটা উপলক্ষ মাত্র। আসল কথা, এই বিদেশী পুজির সঙ্গে সঙ্গে অথবা পশ্চাতে পশ্চাতে দেশী লোকের পুঁজি চলিতে, দৌড়াইতে, উড়িতে শিখিবে। আরও কিছুকাল ধরিয়া ভারতীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজির নিকট নিম্নপদস্থ সহযোগী শিষ্য বা শিক্ষানবীশ রূপে কর্ম্ম-প্রণালী শিক্ষা করিবে। বিদেশী পুঁজিতে পরিচালিত কারবারগুলা এখনো কিছুকাল ধরিয়া ভারতীয় ধনী-মহাজনদের পক্ষে ব্যবসায় সাহসের ও কর্ম্মদক্ষতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ থাকিতে বাধ্য। বিদেশী পুঁজির পরিমাণ, বিদেশী কারবারের সংখ্যা যত বেশী বাড়িবে ততই আমাদের লোকেরা নতুন নতুন দিকে টাকা খাটাইতে শিখিবে।

যাহা হউক নিছক স্বাদেশিক গর্ব্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিদেশী পুঁজির সাগরেতি করা সুখময় গৌরবময় কিছুই নয়। কিন্তু দেশের সম্মুখে আজ দুইটি পথ দেখিতে পাইতেছি। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের দারুণ দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুরবস্থা। তাহার কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। অন্যদিকে বিদেশী পুঁজির নেতৃত্বে ও অভি-ভাবকতায় দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি। ইহাতে দেশের সুখ-স্বচ্ছন্দতা যে বাড়িবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্বদেশ-সেবকগণ স্থির করুন তাঁহারা কোন্ পথ বাছিয়া লইবেন। সত্যিকার স্বদেশ-সেবকগণ শেষোক্ত প্রস্তাবেই রাজি হইবেন, যদিও সাময়িক ভাবে ইহা জাতীয়তার দিক্ দিয়া অপমানজনক। কিন্তু "পেটে

ক্ষিদে মুখে "লাজ" রাখিয়া লাভ কি? কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সজ্ঞানে কারবার চলিতে থাকুক। এক যুগের পরীক্ষার ফলে জাতির গোটা ভবিষ্যৎ বেচা হইয়া যাইবে না। কোন জাতির জীবন দশ বিশ বা পঞ্চাশ বৎসরের কর্ম্ম-প্রণালীর উপর নির্ভর করে না। যথাসময়ে পরিবর্ত্তিত অবস্থা অনুসারে আবার নয়া ব্যবস্থা করা চলিবে। সম্প্রতি সাময়িক ভাবে বিদেশী পুঁজির সদ্ব্যবহার ভারতীয় স্বদেশ-নিষ্ঠার অন্যতম প্রধান খুঁটা হওয়া উচিত।

আট জাতের জন্য আট ব্যবস্থা

ভারতের দৈন্য যদি প্রকৃতরূপে দূর করিতে হয় তাহা হইলে বিদেশী পুঁজিই সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া একটা প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। একথা শুনিলে মনে হইবে যেন যুবক ভারতের নিকট নিতান্ত নৈরাশ্য ও দুঃখের বাণী প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য যে ব্যবস্থা পত্র তৈয়ারি করিতেছি, উহা প্রকৃতপক্ষে নৈরাশ্য-মূলক নয়। আত্মশক্তির সাহায্যেই, বিদেশী পুঁজি ও মগজের তোয়াক্কা না রাখিয়াও, ভারত-সন্তানের পক্ষে আজ অনেক কিছু সাধন করা সম্ভব।

আসল কথা এই যে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন আপন গণ্ডীর ভিতর সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। একটা মস্ত বড় স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। একটা হুজুগ বা উন্মাদনা আসুক তাহাতে দেশের অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হইয়া উঠিবে, তখন নিজের নিজের অবস্থার উন্নতি করিয়া লইলেই চলিবে, এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকা কোনো কাণ্ড-জ্ঞানশীল লোকের দস্তুর নয়। নিজ নিজ আর্থিক উন্নতি নিজ নিজ স্বাধীন খেয়াল ও প্রয়াসের উপর নির্ভর করে। ইহাই দুনিয়ার নিয়ম। সম্পদ্-বৃদ্ধির ছোট খাট অনেক উপায় আমাদের মুঠার মধ্যে এখনই রহিয়াছে। বর্ত্তমান মোসাবিদার সব কয়টা দফাই পুরাপুরি নতুন বা একদম অজানা নয়। অনেক-গুলি নানা জায়গায় পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। এখনকার কর্ত্তব্য জেলায় জেলায় সেই সকল সুপরিচিত কর্ম্ম-কৌশলই ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে অনুসরণ করা।

দারিদ্র্যের এমন কোন দাওয়াই নাই যাহা সকল শ্রেণীর মানুষই সমানভাবে সেবন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারিবে। দারিদ্র্য-ব্যাধির চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র ব্যাধি অনুসারে নির্দিষ্ট ও বিভিন্ন হওয়া আবশ্যক। ইহা লম্বা চওড়া না হইয়া খাটো হইলেই ভাল হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দারিদ্র্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের বস্তু। এই রকমারি দারিদ্র্যের জন্য চাই রকমারি ব্যবস্থা। দারি-দ্র্যের আকার-প্রকার মাফিক বিভিন্ন দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রী নিজ নিজ ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে। আর তাহার সমবেত ফলেই সমগ্র দেশের ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইবে। শ্রেণীগত আর ব্যক্তিগত কর্ম্ম-কৌশলের ফর্দ্দ দিতে না পারিলে দারিদ্র্য-চিকিৎসকগণের প্রচারিত ব্যবস্থাপত্র কোন কাজে আসিবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি যে পরিমাণে এই জাতীয় ধন-সম্পদ্ বাড়াইতে সহায়তা করিবে, সে সেই পরিমাণে এই ধন-দৌলতের ভাগ পাইতে অধিকারী। ধন-সম্পদের বাটোয়ারার হিস্যা লইয়া যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইতে পারে তাহা সম্প্রতি আলোচনা করিব না।

নিম্নলিখিত খসড়াতে আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে কতকগুলা কর্ম্ম-কৌশল নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কোনো জাত, শ্রেণী ও পেষাকে লক্ষ্য করিয়া এই মোসাবিদা প্রস্তুত করা হয় নাই। পেশার পর পেশা, শ্রেণীর পর শ্রেণী, জাতের পর জাত দেশের ভিতরকার সকল প্রকার নরনারীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমেই ধরিয়া লইতেছি যে, এক একটি পেশার জাতের বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত মানুষের পক্ষে আর্থিক সমস্যা অনেকটা একই প্রকারের বা প্রায় কাছাকাছি। অতএব মীমাংসা বা ব্যবস্থাপত্রও অনেকটা একরূপ হইবারই কথা। আবার এই একই পেশার ভিতর-কার যে সব নরনারীর আয় প্রায় সমান সমান আত্মরক্ষার জন্য আর আত্মপ্রসারের জন্য তাদেরকে একই প্রণালীতে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। ব্যক্তিগত সম্পদ্-বৃদ্ধি শ্রেণীগত আর্থিক উন্নতি বা জাতীয় ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্বকথা শেষ পর্য্যন্ত নিম্নরূপ। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পেশা জাত

বা শ্রেণী যাহাই হউক, বর্ত্তমান আয়ের চেয়ে বেশী আয় করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার কত টাকা বেশী হইলে যে আয় বাস্তবিক পক্ষে বেশী হইল তাহা একটু সমঝিয়া দেখা দরকার। বেশী আয়ের ধারণাটা একমাত্র টাকার গুণতিতে সম্ভবে না। কারণ যে ২০০০৲ টাকা বেতন পায় তার পক্ষে ১০০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়ত বড় বেশী কিছু নয়। কিন্তু যে ২৫৲ টাকা বেতন পায় তার ১৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি একটা বিশেষ কাণ্ড সন্দেহ নাই। আয়ের পরিমাণ-বৃদ্ধি স্বভাবতঃ আস্তে আস্তে চলিবে। লম্বা-চৌড়া মুখরোচক ফর্দ্দ দিয়া আয়-বৃদ্ধির বহর দেখিতে গেলে খসড়াটা কেবলমাত্র কাগজের লেখা খসড়াই রহিয়া যাইবে। তাহাতে কাজ হাসিল হইবে না।

ভারতীয় নরনারীকে মোটামুটি আটটি পেশায়, জাতে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের হিসাব মাফিক চাঁচা-ছোলা শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, বা পেশা-ভেদ অনুষ্ঠিত করা হইল না। বলাই বাহুল্য, জাতের কুঠরিগুলা একদম পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক দলের মধ্যে আর এক দলের লোক আসিয়া পড়িতে বাধ্য। খাঁটি ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত ভাগাভাগি করা বড়ই শক্ত। কিন্তু তথাপি ভারতের সমগ্র জনবলকে মোটের উপর (১) কিষাণ (২) কারিগর (৩) দোকানদার ও বেপারী (৪) মজুর (৫) জমিদার (৬) আমদানি-রপ্তানি-কারক (৭) টাকাকড়ির মালিক এবং (৮) মস্তিষ্কজীবী এই আট শ্রেণীতে ভাগকরা যাইতে পারে। পর পর এই আট জাতের জন্য আট প্রকার ব্যবস্থাপত্র তৈয়ারি করা যাইতেছে।

১। কিষাণ শ্রেণী

ভারতের কৃষিক্ষেত্রে লোকের ভীড় খুব বেশী। এখান হইতে লোক সরান দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রত্যেক চাষীর জমির পরিমাণ গড় পড়তা ৫।৬ বিঘার বেশী নয়। এই পরিমান জমির উৎপন্ন ফসল, একটি পাঁচ ব্যক্তি-বিশিষ্ট পরিবারের অতি সাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। অপর দিকে প্রায় প্রত্যেক চাষীই বৎসরের অনেক ঘণ্টা অলসভাবে কাটাইতে বাধ্য

(১) অপেক্ষাকৃত বড় জমি—আয়-বৃদ্ধির কথা ভাবিতে হইলে কিষাণের পক্ষে আপাততঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অথবা যন্ত্রপাতির ব্যবহারের চেয়ে জমিজমার পরিমাণ-বৃদ্ধি করিবারই দরকার বেশী। এটা ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, চাষী মাত্রেরই দখলী স্বত্ব আছে। আর এই স্বত্বের উপর হাত দিতে কোন লোক অধিকারী নয়। চাষী প্রতি জমি-জমার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য আসল দরকার সরকারী সাহায্য। জার্ম্মাণ, ডেনিশ, ইংরেজী কায়দায় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা না হইলে ছোট ছোট চাষারা যথোচিত পরিমাণে সুবিস্তৃত আবাদী জমির মালিক হইতে পারিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—পল্লীসংস্কার বা পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন কাহাকে বলে?

চাষী প্রতি যেই জমি-জমার আয়তন বৃদ্ধি করা হইবে অমনই কৃষিক্ষেত্রে লোকের ভিড় কমিয়া যাইবে। অনেক চাষী চাষ ছাড়িতে বাধ্য হইবে। যাহারা চাষে থাকিবে তাহারা অলসভাবে বসিয়া থাকিবার সুযোগ কম পাইবে। ভুমিছাড়া চাষীদিগকে কলকারখানার মজুররূপে অথবা অন্যান্য কাজের জন্য পাওয়া যাইবে।

"পল্লী"কে তখনই কেবল "পুনর্গঠিত" বলা যাইতে পারে যখন এই বর্ত্তমান ধরণের পাড়াগাঁ এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে কিংবা যখন মানুষ সব পাড়াগাঁ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। তথাকথিত পল্লীগুলির পল্লী-লীলা সংবরণই পল্লী-সংগঠনের গোড়ার কথা। ইহা এক হেয়ালি বিশেষ কিন্তু সমাজ-শাস্ত্রের এ একটা অসম্ভব অথচ সত্য কথা। নূতন নূতন আর্থিক আয়োজন, নূতন নূতন কর্ম্ম-সৃষ্টি ও তার সঙ্গে নূতন নূতন আইনের ব্যবস্থা ঘটিবামাত্রই একেলে পল্লীগুলা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন আপনা আপনিই পল্লী-জীবনে পুনর্গঠন সাধিত হইতে থাকিবে।

পল্লী-সংস্কারের কাজে বিশেষ কোন রাষ্ট্র-নীতি, পরোপ-কার-নিষ্ঠা বা স্বদেশ-প্রেম এমন কিছুই নিহিত নাই। ইয়োরামেরিকায় ১৭৭৫ কিম্বা ১৮৩০ হইতে ১৮৭৫ সন পর্য্যন্ত ধাপের পর ধাপে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ভারতকেও সেইরূপ ধাপের পর ধাপে ঠেলিয়া

তোল। তাহা হইলে পাড়াগাঁগুলা সহজেই নূতন নূতন সামাজিক সুবিধা ও ধনোৎপাদনের উপায়গুলি আত্মস্থ করিতে সমর্থ হইবে।

পল্লী সংস্কারের সমগ্র কার্য্য-পরম্পরা অর্থনীতি-সম্পর্কিত শক্তি-বিজ্ঞানের সহিত সুজড়িত। ধনোৎপাদন আর ধন-বিতরণের কর্ম্ম-কৌশলগুলা রূপান্তরিত হইতে থাকুক। তাহা হইলে জনগণের আবাসক্ষেত্র, পল্লী, নগর ইত্যাদি সবই রূপান্তর লইতে বাধ্য। পল্লী-সংস্কারের জন্য চাই আর্থিক সংস্কার, অর্থনৈতিক রূপান্তর, নতুন নতুন কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের ব্যবস্থা।

এতদিন ধরিয়া দেশহিতৈষীর দল জোরের সহিত বলিতেছেন "সহর থেকে পাড়াগাঁয়ে ফিরে যাও।" আমার বিবেচনায় এই মতের ভিতর যে রাস্তা দেখান হইতেছে, সেটা সু-রাস্তা নয়। অন্ততঃ পক্ষে এক পুরুষ ধরিয়া আমাদের জপ-মন্ত্র হওয়া উচিত ঠিক উল্টা। "পাড়াগাঁ ত্যাগ করিয়া" আসিলেই পাড়াগাঁর উন্নতি সাধিত হইবে। এই ধরণের পল্লীনীতি জারি করা আমার দেশোন্নতি-শাস্ত্রের গোড়ার কথা। ভারতে কিষান-সংখ্যা এত বেশী হইয়া গিয়াছে যে, কিষাণ-সমাজের লোকবল কমিলে লাভ ছাড়া লোকসান নাই। অন্য কোন নূতন পেষায় কিষাণদের অনেক ব্যক্তিকে ভর্ত্তি করিতে পারিলেই এদের সংখ্যা কমান যাইতে পারে। ইহাদের দল কমিলেই ইহাদের কর্ম্মাভাব, ইহাদের আলস্য আর ইহাদের বেকার অবস্থা কমিবে।

(২) কিষাণের জন্য চাই নূতন নূতন কাজ।—অপর-দিকে কৃষিকাজ হইতে ছাড়াইয়া আনিলে কৃষকদের কতক-গুলিকে পাড়াগাঁয়ে কারিগরদিগের "কুটীর-শিল্পে" লাগান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ছোট, বড়, মাঝারি নূতন নূতন শিল্পেও অনেককে মোতায়েন করা যাইতে পারে। এটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কৃষিকাজে ইস্তফা দিলেই কৃষকের দল কারিগর হইবার জন্য যে সমস্ত হস্তশিল্প অবলম্বন করিতে পারে, সেই সমস্ত শিল্প-কাজের ভিতর চরকা ও খদ্দরের স্থান আছে। তাহা ছাড়া এখনই চাষীরা অবসর সময়ে, চরখা-খদ্দরে লাগিলে লাভবান হইতে পারে। কিন্তু এই সব হস্ত-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এমন ভাবে এই সবের পরিবর্ত্তন দরকার যাহাতে শিল্পজাত জিনিষ অল্প সময়ে বেশী প্রস্তুত হইতে পারে, আর আধুনিক কালের উপযোগী হয়। তাহা ছাড়া অধিক অর্থ উপার্জ্জিত হওয়া চাই।

(৩) সমবায়-সমিতি।—(ক) চাষের বীজ ও যন্ত্রাদির ক্রয় আর ফসলাদি বিক্রয়, জলসেচন ইত্যাদির জন্য কৃষক-দিগের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতায় সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে প্রায় একমাত্র উপায়।

(খ) এই সমস্ত সমিতিকে কালে সমবায়-ঋণ-দান-সমিতিতে (চাষী-ব্যাঙ্কে) পরিণত করা যাইতে পারে। ("চাষী-ব্যাঙ্ক" আর "কৃষি-ব্যাঙ্ক" দুই স্বতন্ত্র ধরণের প্রতিষ্ঠান। এই কথা পরে খুলিয়া বলা হইতেছে।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—সমিতি সংস্থাপন মানুষের পক্ষে খাঁটি স্বাধীন খেয়াল-খুসীর ব্যাপার। কিন্তু ইহার জন্য যথেষ্ট প্রচার-কার্য্য আবশ্যক। এই প্রচার-কার্য্য প্রকৃত পক্ষে চালাইতে পারে কাহারা? প্রথমতঃ কৃষি-স্কুল ও কৃষি-কলেজের শিক্ষা প্রাপ্ত কৃষি-বিশেষজ্ঞগণ, আর দ্বিতীয়তঃ ধন-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ গ্র্যাজুয়েট ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ।

প্রত্যেক জেলার জন্য প্রায় দশজন এইরূপ প্রচারক চাই। এইরূপ প্রচার কাজের জন্য মাসে ১,০০০ এক হাজার টাকা করিয়া লাগিতে পারে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইতেছে। স্বদেশসেবকদের দ্বারা এই কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিরও এই জন্য সাহায্য করা দরকার। কৃষি-সমবায়-সমিতি ভারতের নতুন প্রতিষ্ঠান নয়। জিনিষটিকে একটু বিস্তৃত ও গভীরভাবে চালানো দরকার। আজকাল একমাত্র গভর্ণমেণ্টই কৃষি-সমবায়ের মা-বাপ ও হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। স্বদেশসেবকগণ সমবায়-আন্দোলনে বিশেষ কিছু হাত দেখাইতে পারেন নাই। এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

সমবায়-ঋণদান-সমিতি যে কিষাণগণকে খুব বেশী রকম সাহায্য করিতে পারিবে তা নয়। কোনো দেশেই ইহা

সম্ভবপর হয় নাই। ধনীদের প্রতিষ্ঠিত "কৃষি-ব্যাঙ্ক" এই গুলির পৃষ্ঠ-পোষকতা করিবে। তাহাতে ধনীদের অবশ্য লাভের একটা পথ দেখা যায়। অধিকন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও কৃষিকার্য্যের জন্য, বিশেষ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাঙ্ক মারফত সমবায়-সমিতি-গুলিকে অর্থ সাহায্য করিবে আর কৃষকগণ সমিতির নিকট হইতে দরকার মত অর্থ গ্রহণ করিবে। এই বিষয়ে ফ্রান্সের "ব্যাঁক্ দ্য ফ্রাঁস" নামক কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের কার্য্য-প্রণালী ভারতে আলোচিত ও অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

(৪) বিক্রয়-সমিতি।—ফসল বিক্রয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথাপি এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ভাবেও আলোচনা করা দরকার। ভারতের কাঁচামাল এখন যে ভাবে বিক্রী হইতেছে তাহাতে কৃষকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। তাহারা ক্রেতাদের হাতে এক প্রকার খেলার সামগ্রী মাত্র রূপে জীবন ধারণ করিতেছে! এই দুরবস্থা শুধরানো বিশেষ জরুরি।

মাল উৎপাদনকারীরা সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে ক্রেতাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ক্রেতারা আপন ইচ্ছামত বাজার দর ঠিক্ করিয়া দিতেছে। চাষীরা নিজ হাতের তৈয়ারি ফসল সম্বন্ধে খরচ মাফিক দর ঠিক করিতে অসমর্থ। বিশেষতঃ যে সকল মাল সমুদ্র-পারে চালান হইয়া যায় তাহার ক্রেতারা বিপুল মহাজন। তাহাদের ট্যাঁকে টাকার জোর এত বেশী যে, চাষীদের সঙ্গে ব্যবহারে তাহারা একপ্রকার বাদশা বিশেষ। এই সকল ক্রোরপতি বেপারীদের টিট্ করিবার একমাত্র উপায় চাষী-সঙ্ঘ। মার্কিণ চাষীদের "কম্বাইন" "পুল" ইত্যাদি সঙ্ঘ-প্রণালী ভারতে আলোচিত হওয়া দরকার। ক্রমশঃ এই সব সঙ্ঘ কায়েম করাও আবশ্যক হইবে।

২। কারিগর-শ্রেণী

যত রকম হস্ত-শিল্প বা কুটির-শিল্প আছে, সমস্তই কারিগর-শ্রেণীর এলাকার অন্তর্গত। সেই জন্য সংখ্যা হিসাবে কিষাণকুলের নীচেই কারিগর-শ্রেণীর স্থান। কারিগর-শ্রেণীর মধ্যে ছুতোর, সাঁকরা ও সকল প্রকার ধাতুদ্রব্য প্রস্তুত কারক, কুমার, তাঁতী, চামার ইত্যাদি সকল প্রকার কারিগর-শিল্পীকেই ধরিতেছি।

এক একটী শিল্প এখন যে অবস্থায় আছে ঠিক তার পরের ধাপে সেই সেই শিল্পকে ঠেলিয়া তুলিতে পারিলেই এই কারিগর-শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে। গোড়া হইতেই ইহা যন্ত্রপাতির বা কল-কব্জার কাণ্ড। সুতরাং যে ব্যক্তি কেবলমাত্র "স্বদেশ-ভক্ত" বা সাধারণ হিসাবে ধন-বিজ্ঞান পণ্ডিত তার পক্ষে কারিগরদের উন্নতি সমস্যাটা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। কারিগর-পেশার উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ প্রধানতঃ যন্ত্রবিৎ এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিকের দল। কারিগরগণের অক্ষর পরিচয় আছে কিনা এই যন্ত্রপাতির কারবারে তাহাতে বড় একটা আসে যায় না।

(১) উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি।—বর্ত্তমান অবস্থায় কারিগরদিগের পক্ষে সবচেয়ে বেশী আবশ্যক নূতন নূতন যন্ত্রপাতির সহিত পরিচয়। আর চাই উন্নত প্রণালীতে মাল তৈয়ারি করিবার উপায় উদ্ভাবন।

(২) কারিগর শিক্ষালয়।—জেলায় জেলায় সুবিধামত কেন্দ্রীয় স্থানে কতকগুলি শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সেই সমস্ত শিক্ষালয়ে ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার মত ও স্থানীয় লোকজনকে দেখাইবার মত নানা প্রকার যন্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির যোগান থাকা চাই। তাহা হইলে "কুটীর-শিল্পে" এই নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহজসাধ্য হইবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি এক হিসাবে শিল্প-মিউজিয়ামের অর্থাৎ সংগ্রহালয়ের মত কাজ করিবে। অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্পকর্ম্মে-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও চলিতে পারিবে। এই শিক্ষালয়ে আংশিক ও পূর্ণভাবে শিক্ষিত, এই দুই শ্রেণীর শিক্ষারই ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) হস্ত-শিল্পের বা কুটির-শিল্পের ব্যাঙ্ক।—কারিগরগণ যখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা একটা নতুন কায়দা বা কর্ম্ম-কৌশল শিখিয়াছে, তখন তাহারা প্রয়োজন মত যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা চাহিবে। হস্ত-শিল্পের এই সংশোধিত বা পুনর্গঠিত অবস্থা কায়েম করিবার জন্য অর্থ সাহায্য দরকার। নতুন নতুন কর্ম্ম-কৌশল বলিলেই

বুঝিতে হইবে, নতুন নতুন টাকার চাহিদা। এই অর্থ সাহায্যের জন্য প্রত্যেক উপযুক্ত কেন্দ্র-স্থলে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক স্থাপনের আবশ্যক। এই ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের জন্য টাকা ঢালিবেন কাহারা? বলা বাহুল্য তাঁহারা অল্প-বিস্তর কালতো টাকার অর্থাৎ পুঁজির মালিক। জমিদারদিগকেও এই পুঁজিপতিদের মধ্যে ধরা হইতেছে। এই কারিগরি ব্যাঙ্কগুলি ১০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ধারের জন্য বন্ধক থাকিবে কারিগরদিগের ক্রীত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার। এরূপ সর্ত্তও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, যন্ত্রপাতি সমস্তই ব্যাঙ্কের মারফতে ক্রয় করিতে হইবে।

৩। দোকানদার ও বেপারী

বেপারীরা আর ছোট খাট দোকানদারগণ কারিগর-শ্রেণীর মতই আমাদের দেশের জন সংখ্যার এক মস্ত-বড় অংশ।

(১) দোকানদারদের জন্য বিদ্যালয়।—কারিগরদিগের মতই আমাদের দেশের দোকানদার আর বেপারীদেরও অনেকে নিরক্ষর। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও নিরক্ষরতা আর্থিক উন্নতির পথে বিষম বাধা বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

দোকানদার ও বেপারীদের পক্ষে সব চেয়ে বেশী দরকারী মালপত্রের বাজার ও দর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা। নিজ নিজ ব্যবসায় এলাকা যে কতদুর বিস্তৃত এ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞানের সীমা যেমন বাড়িয়া যাইতে থাকিবে, তেমনি তাহাদের ধন অর্জ্জনের সুযোগ আর ক্ষমতাও বাড়িতে থাকিবে।

দোকানদারি বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি গ্রামকে লইয়া এক একটি এলাকা কায়েম করা দরকার হইবে। প্রত্যেক জেলার বড় বড় মহকুমার মধ্যে এইরূপ এক একটী বেপারী-বিদ্যালয় বা দোকানদারী-বিদ্যালয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

(২) দোকানদারদের ব্যাঙ্ক।—নতুন কোন-কিছুর মতলব করিলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য ডাক পড়ে টাকার পুঁজির বা মুলধনের। দোকানদারদের এই অভাব বা দাহিদা পূরণ করিবার জন্যও পুঁজির দরকার। এই পুঁজি যোগাইবে কাহারা? এই অভাব পূরণের জন্যই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক। টাকা ঋণের জন্য বন্ধক থাকিবে-মালপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি। কারিগর-শ্রেণীর আয়-বৃদ্ধি সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হইয়াছে বেপারী ও দোকানদার শ্রেণীর আয়-বৃদ্ধি সম্পর্কেও সেই সকল কথাই খাটিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—কুটিরশিল্প ও দোকানদারি শিক্ষালয়। (কারিগর-বেপারি-বিদ্যালয়)।

(১) অক্ষর পরিচয়ের অভাবই এই সকল শ্রেণীর পক্ষে বর্ত্তমানে এক বড় অসুবিধা। কিন্তু এই দুরবস্থা সত্ত্বেও যতদুর সম্ভব উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক ও সার্ব্বজনীন না হওয়া পর্য্যন্ত জনগণের আর্থিক উন্নতি অসম্ভব বা অসাধ্যসাধন, এইরূপ চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

বস্তুতঃ কারিগরের হস্ত-কৌশল আর দোকানদারের ব্যবসা-বুদ্ধি অক্ষর পরিচয়ের ধার বড় একটা ধারেনা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের পক্ষে নিরক্ষরতার চেয়ে দারিদ্র্য বেশী বিপজ্জনক ও অনিষ্টকারক। নিরক্ষর থাকা ভাল কি নির্ধন থাকা ভাল, এই প্রশ্নের জবাবে বলিব যে, নিরক্ষর থাকা অপেক্ষাকৃত ভাল। এই নীতিকে একটা প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

(২) কারিগরদিগের শিক্ষালয় আর দোকানদারদের শিক্ষালয় একই প্রতিষ্ঠানের ভিতর চলিতে পারে। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জার্ম্মানির "ফাখ্‌শুলে" কিংবা ফ্রান্সের "একল প্রাতিক্ দ্য কম্যার্স এ দ্যাঁদুস্ত্রী" ইত্যাদি বিদ্যালয় যে প্রণালীতে পরিচালিত হয় সেই প্রণালীতে চালানো উচিত।

(ক) প্রত্যেক ইস্কুলে বাধ্যতামূলক হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার—(১) চিত্রাঙ্কন ও নক্সা করা (২) যন্ত্রপাতির ব্যবহার (৩) কাঁচা মাল ও অন্যান্য জিনিষপত্রের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, (৪) রাসায়নিক প্রক্রিয়া, (৫) বাজার বিদ্যা ও টাকাকড়ির কথা। কি কি বিশেষ ব্যবসা ও শিল্প শিখিবার ব্যবস্থা

থাকিবে তাহা স্থান বুঝিয়া নির্ব্বাচিত করিতে হইবে। সাধারণ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার বিষয়গুলিও বাদ দেওয়া উচিত নয়।

(খ) সম্পূর্ণ পাঠ তিন বৎসরে সমাপ্ত করা যাইতে পারে। যে সকল শিক্ষার্থী ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে অথবা ঐ দরের বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে তাহাদের জন্যই ইস্কুল খোলা হইবে। কিন্তু আধাআধি বা অন্য প্রকার আংশিক পাঠের ব্যবস্থা অথবা কোন বিশেষ দু একটা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা উচিত। বলা বাহুল্য যাহারা এইরূপ আংশিক পাঠের জন্য আসিবে তাহাদেরকে বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন পূর্ণভাবে মানিয়াই চলিতে হইবে।

(গ) সম্পূর্ণ পাঠ সমাপনকারী ছাত্রগণ পরবর্ত্তী ধাপে উচ্চাঙ্গের টেক্‌নিক্যাল বা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। যদি এইরূপ উচ্চতর শিক্ষালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ তাহাদের না থাকে, তাহা হইলে তাহারা নতুন নতুন শিল্পে, ব্যাঙ্কে ও অন্যান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে।

(ঘ) অন্ততঃ পক্ষে মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার একজন, রাসায়নিক একজন ও একজন ধনবিজ্ঞানবিৎ প্রত্যেক ইস্কুলের শিক্ষকবর্গের মধ্যে বাহাল থাকা আবশ্যক।

(ঙ) এইরূপ একটি কারিগর-বেপারী-বিদ্যালয় চালাইতে প্রায় বার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা লাগিতে পারে। আর এইরূপ স্কুলে প্রায় ২৫০ জন ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রথমেই প্রতি জেলায় এইরূপ ৪টি করিয়া বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা দরকার।

(চ) শিক্ষালয়গুলি জনসাধারণ কর্ত্তৃকই স্থাপিত হওয়া উচিত। বৎসরখানেক বা দু'এক বৎসর পরে পৌনঃপুনিক খরচপত্র নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক সাহায্যের জন্য মিউনিসিপালিটি বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়-গৃহাদির সংস্কার, নতুন নতুন যন্ত্রাদি দ্বারা কারখানাগুলি অধিক কাজের উপযোগী করা, আর সংগ্রহালয় লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট যথাসময়ে সাময়িক ও এককালীন অর্থ সাহায্যের দরখাস্ত করা অন্যায় হইবে না।

৪। মজুর-শ্রেণী

মজুর বলিলে কেবলমাত্র ভারতীয় বা বিদেশীগণের কল কারখানায় যে সমস্ত পুরুষ-নারী গতর খাটায় তাদেরকে বুঝায় না। কয়লার খনি বা অন্যান্য খনিতে, রেলপথে, ডকে, নদী-সমুদ্রের জলযানে, চা ও কাফির বাগানে যে সমস্ত লোক মোতায়েন আছে তাহারাও এই মজুর-শ্রেণীর অন্তর্গত।

ইয়োরামেরিকার তুলনায় ভারতে মজুরের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু জীবন-যাত্রার সমস্যাগুলি সর্ব্বত্র যেমন এখানেও তেমনি।

(১) ধর্ম্মঘটের অধিকার।—মজুর-শ্রেণীর নিম্নলিখিত দুইটি বিষয়ে অধিকার থাকিলে তাহারা নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, প্রথমতঃ তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, পুঁজিপতি, নিয়োক্তা বা মালিক-শ্রেণীর সহিত সর্ত্তাদি স্থির করিবার অধিকারী হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি তাহাদের সকল রকম দরকারী বিষয়ে তাহারা যথাসময়ে ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার পায়।

(২) মজুরদের দাবী।—মজুরগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে যাহা পাইবার অধিকারী সেগুলি প্রধানতঃ নিম্নরূপ :—(১) ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব-দুর্ব্বিপাক ইত্যাদির বিরুদ্ধে বীমা, (২) উন্নত ধরণের স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও কারখানার কর্ম্মস্থান, (৩) ম্যানেজার ও অন্যান্য উপরওয়ালাদের নিকট সুব্যবহার, (৪) জিনিষপত্রের দাম যেমন যেমন বাড়িতে কমিতে থাকিবে সেইরূপ মজুরির হার পরিবর্ত্তিত হইবার ব্যবস্থা, (৫) কারবারের লভ্যাংশের হিস্যা পাওয়া, (৬) কারবারের পরিচালনায় কিছু কিছু হাত থাকা, (৭) সাধারণ ও টেকনিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দিনে আট ঘণ্টা খাটিবার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই কাজে বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৩) সমিতি।—এই সমস্ত দাবী-দাওয়া যাহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থাপিত, স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইতে পারে সেইজন্য মজুর নরনারীকে শক্তিশালী ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। এই সমস্ত ইউনিয়ন বা সমিতি কেবলমাত্র

যে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বুঝাপড়া বা দর কষাকষির ও নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিবার সূতিকাগাররূপেই বিবেচিত হইবে তাহা নহে। সামাজিক লেন-দেন আর শিক্ষাদীক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল রূপেও এগুলি ব্যবহৃত হইতে পারিবে। মজুর-সঙ্ঘ ভারতে দেখা দিয়াছে। এইগুলি যাহাতে সর্ব্বত্র বাড়িয়া উঠে আর যথোচিতরূপে কর্ম্মদক্ষ হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা স্বদেশ-সেবকদের কর্ত্তব্য।

(৪) কো-অপারেটিভ ষ্টোরস্। মজুর নরনারীগণ যদি সমবায়-ভিত্তির উপর দোকান বা ষ্টোর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিবে। অপেক্ষাকৃত সস্তায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ফিকির এই সকল সমবায়-দোকানে ঢুঁড়িয়া পাওয়া যাইবে। ভারতে এই ধরণের সমবায় আজও বিশেষ পুষ্ট হয় নাই। এই দিকে আমাদের নজর ফেলা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—আধুনিক শিল্প-কারখানার আবহাওয়ায় নানা প্রকার নূতন ঢঙের সামাজিক দুর্গতি সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। তাহা অস্বীকার করিবার দরকার নাই। তাহা সত্ত্বেও নবীন কারখানার আওতায় কর্ম্মীদের অনেক সদ্‌গুণ বিকশিত হইয়া থাকে। আধুনিক কারখানার কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকার দরুণ শিল্প-বুদ্ধি, সাধারণ সংস্কৃতি, ব্যক্তিনিষ্ঠা, সমাজ-বোধ, সঙ্ঘপ্রীতি এবং জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি নানাদিকেই কর্ম্মীদের জীবন নানা প্রকারে বিকাশলাভ করিতে থাকে।

ভারতবর্ষের পক্ষে কারখানার শ্রমিক-সম্প্রদায় এক মস্ত-বড় আধ্যাত্মিক বস্তু। যতই তারা সংখ্যায় বাড়িতে থাকিবে ততই তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইবে, এবং যতই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকিবে ততই ভারতবর্ষ বিশ্ব-জগতের কার্য্যক্ষেত্রে আপন স্বরূপ প্রকাশ করিবার পথে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবে। লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণীর আর তথাকথিত "ভদ্রলোকদের" ভিতর যাঁহারা ভারতের এই নতুন শ্রেণীর নরনারীর সুখ-সুবিধা ও কর্ম্মদক্ষতা বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত রূপে গণ্য হইবেন।

৫। জমিদার-শ্রেণী

আমাদের দেশে জমিদার-শ্রেণী বলিলে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পত্তিওয়ালা হইতে নানা স্তরের বড় বড় জমিদার পর্য্যন্ত নানা ধাপের লোক বুঝিতে হইবে। দুচার জন ছোটখাট রাজা-মহারাজাও চরম কোঠায় অবস্থিত। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের ভাষায় এই সব লোক ঠিক এক শ্রেণীর লোক নয়।

(ক) জমিদারী পেশার সর্ব্বনিম্ন স্তরের লোকজনকে আর্থিক হিসাবে প্রায়ই কৃষক, কারিগর, খুচরা দোকানদার বা ফড়ে মহাজনদের সমশ্রেণীর জীব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে এই সকল শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নস্তরের তথাকথিত জমিদারদের আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধেও সেই সব কথাই খাটিবে।

(খ) অপেক্ষাকৃত ধনী, মাঝারি ও বড় দরের জমিদার আর রাজা-মহারাজাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনা করা দরকার। ধরিয়া লইতেছি যে, দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা আরও কিছুকাল যথা পূর্ব্বং তথাপরংই থাকিবে। এই অবস্থায় জমিদারদের পক্ষে নিজ নিজ জমিদারীতেই নতুন উপায়ে নতুন অর্থাগমের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজে এইরূপে নয়া নয়া ধনদৌলত সৃষ্টি হইতে পারিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের নিজ নিজ আয়বৃদ্ধিও ঘটিবে।

আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে জমিদারদের সর্ব্বপ্রধান বর্ত্তমান সমস্যা সামাজিক ও নৈতিক। বড় বড় পয়সাওয়ালা জমিদারদের সংখ্যা বেশী নয়। তথাপি প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ কয়েকটা পরিবার বাপ-দাদাদের পয়সার জোরে "কুঁড়ের বাদশা"রূপে আলস্যময় জীবন ধারণ করিতেছে। তাঁহাদের সঙ্গে নানাপ্রকার লেনদেনের দরুণ উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারী চাকর্যে, কেরাণী, স্কুল মাষ্টার এবং চাষী-মজুর সম্প্রদায়ও অনেক পরিমাণে নৈতিক অধোগতি লাভ করিতেছে। সমাজের আর্থিক উন্নতি এই আলস্যের আবহাওয়ায় বেশ বাধা পাইয়া থাকে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমিদারেরা নিজ নিজ জমিদারির দেখা-শুনা নিজেই করিয়া থাকেন। সুতরাং এই

হিসাবে তাঁহারা সমাজের সেবক সন্দেহ নাই। জমিদারী মাত্রকেই কুঁড়েমির কেল্লারূপে নিন্দা করা চলিবে না। "কেজো" কর্ম্মতৎপর জমিদার দুচার জন আছেন ধরিয়া লইলাম। প্রকৃতপক্ষে যদি এইরূপই হয় তথাপি এই সকল "কেজো" জমিদারদের আত্মীয়-স্বজন ও বংশধরেরা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্কর্ম্মা। জমিদারদের সন্তানগণকে নানাপ্রকার অর্থকরী কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা স্বদেশসেবকদের একটা বড় ধান্ধা হওয়া উচিত। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সকল লোককে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে মোতায়েন রাখিবার দিকে বিশেষ নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

জমিদারী-প্রথার আইন-কানুন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্ত্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়। রাইয়তে জমিদারে সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত। জমিদার মাত্রকে চরিত্রহীন, অকর্ম্মণ্য বা কর্ত্তব্য-বিমুখ বিবেচনা করা বর্ত্তমান লেখকের দস্তুর নয়। জমিদারদের অর্থে ভারতের নানাপ্রদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে দেশোন্নতি-বিধায়ক বহুসংখ্যক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান জন্ম এবং বিকাশ লাভ করিয়াছে। জমিদারদের স্বদেশ-সেবা আমাদের "স্বদেশী আন্দোলনের" সকল স্তরেই একটা বিপুল শক্তি ছিল। বহুসংখ্যক স্বদেশ-সেবক জমিদারদের অন্নেই পুষ্ট হইয়াছেন। আর জমিদারদের সাহায্যেই, সেকালের মতন একালেও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি নানা কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে।

এই সকল প্রশ্ন সম্প্রতি তোলা হইতেছে না। বলিতেছি মাত্র এই যে, দেশকে পুনর্গঠিত করিবার কাজে,—দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য, অন্যান্য শ্রেণীর মতন জমিদার-শ্রেণীরও ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি আবশ্যক। তাহারই জন্য চাই জমিদার-সমাজে পারিবারিক সংস্কার। ধনশালী সম্পত্তিওয়ালাদের পুত্রগণ ও আত্মীয়স্বজনের পক্ষে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করা উচিত নয়। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে এবং ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বসবাসের ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ কিছুকালের জন্য উত্তরাধিকার নির্ণয় ও সম্পত্তি-বিভাগ সম্বন্ধে যে আইন-কানুন আছে তাহাই মানিয়া লওয়া হইতেছে। সম্পত্তি-বিষয়ক আইন-কানুন সংস্কারের কথা সম্প্রতি তুলিতেছি না। বলা বাহুল্য পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার হইতে, কোন সন্তান বা আত্মীয়কে বঞ্চিত হইতে হইবে না। কিন্তু ভূস্বামী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়াও ভদ্র কর্ম্ম-নিষ্ঠ জীবন-যাপন করিতে পারে তাহার জন্য আন্দোলন রুজু হওয়া আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম-কৌশল ঢুঁড়িয়া বাহির করাও চাই। অর্থাৎ দেশের ভিতরকার অন্যান্য শ্রেণীর সকল নরনারীর মতনই পয়সাওয়ালা জমিদারদের ছেলেদিগকেও অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যান্য লোকের মতন জমিদারদের সন্তান সন্ততি "মানুষ" হইতে শিখুক। কয়েকটা কর্ম্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত করিয়া দেখিতেছি :—

(১) কৃষিক্ষেত্রের কাজ।—জমি লইয়া চাষবাস করা ভূস্বামীদিগের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ব্যবসা। যে কোনো লোকই একশত বিঘা জমি বা ততোধিক পরিমাণ জমি লইয়া কৃষি-মজুরদের দ্বারা কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। এজন্য চাই প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া নিয়মিতভাবে আবাদে গিয়া ম্যানেজারের মত দেখাশুনা করা। কৃষিকার্য্যকে লাভজনক করিয়া তোলাই হইবে তাঁহার প্রধান ধান্ধা। পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক পুঁজি লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব সন্দেহ নাই।

(২) আধুনিক শিল্পকর্ম্ম।—"সেকেলে" কারিগরগণের দ্বারা চালিত হস্ত-শিল্প বা কুটির-শিল্প ছাড়া অনেক নয়া নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা দেশোন্নতির জন্য দরকার। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় "ছোট ছোট" কল-কারখানা চালানো ছাড়া ভারত-সন্তানের পক্ষে বেশী কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। বড় বড় কারখানার দিকে ধাওয়া করা বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য। "ক্ষুদ্র কল-কারখানার" ব্যবস্থা ভারতবাসীর পক্ষে একটি নৈতিক বা আধ্যাত্মিক হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। এই ক্ষুদ্রত্বের ভিতর গুড় মাখানো নাই। ইহার ভিতর আমাদের পুঁজির অভাব ছাড়া আর কোনো মাহাত্ম্য দেখিতে পাই না।

মেহাৎ দায়ে পড়িয়াই ভারতবাসীকে আরও কিছুকাল এই "ক্ষুদ্র কারখানার" ব্যবস্থায় মস্‌গুল থাকিতে হইবে। ভারতের তথাকথিত "দার্শনিকগণ" এই ছোট ছোট কারখানাকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বিশেষত্ব হিসাবে প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রচারের পশ্চাতে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই।

(৩) বহির্ব্বাণিজ্য।—আর এক প্রকার কাজ হইতেছে আমদানি ও রপ্তানি। রাজধানীতে বা জেলা ও মহকুমার সদরে এই কাজ চালাইতে পারা যায়।

(৪) বীমা।—একটি বড় লাভের পথ বীমা-ব্যবসা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবাসী এখনও সেদিকে যথোচিতরূপে মনোনিবেশ করে নাই। তবে ইতিমধ্যেই ভারত-সন্তানের ইজ্জৎ বীমা-ব্যবসায়ে বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। জমিদারের পুত্রগণ ইনসিওর্যান্স অফিস নিজেরাই চালাইতে পারেন। ঐ সমস্ত অফিসের এজেন্ট হইলেও তাঁহারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইবেন।

(৫) ব্যাঙ্ক।—জমিদারের আত্মীয়-স্বজন নানা শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। তাহার সাহায্যে (১) সমবায়-ঋণদান-সমিতি (চাষী-ব্যাঙ্ক), (২) হস্ত ও কুটির-শিল্প এবং (৩) খুচরা ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক পরিমাণে লাভবান হইতে পারে। আরও দু এক প্রকার ব্যাঙ্ক জমিদারের অর্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইগুলি (১) বৈদেশিক বাণিজ্য (২) "আধুনিক" শিল্প এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ে অর্থ সাহায্য করিতে পারে। এই পাঁচ প্রকার ব্যাঙ্ক জমিদারের পক্ষে আয়-বৃদ্ধির সদুপায়। এদিকে নজর ফেলা আবশ্যক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ভূস্বামী-সম্প্রদায় পুঁজিবিহীন নয়। তাদের আজ দরকার "খাটিয়া খাওয়ার" প্রবৃত্তি, আর অন্যান্য লোকজনের মতনই মানুষের মতন মেহনৎ করা। এই সকল গুণ তাঁহাদের জীবনে দেখা দিলেই চাষ-আবাদের কাজে কর্ম্ম কর্ত্তা, ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালক আর আমদানি-রপ্তানি অফিসের এবং শিল্প-কারখানার নানা প্রকার ম্যানেজার হইবার দায়িত্ব লওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে।

৬। আমদানি-রপ্তানিকারক

বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয় ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার একটি মস্ত-বড় উপায়। অল্পদিন হইল এই দিকে ভারতের বুদ্ধিমান্ ও সাহসী লোকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। বহির্ব্বাণিজ্যে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির জন্য কয়েকটা নূতন কাজ করা আবশ্যক।

(১) বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্ক।—বিদেশের সঙ্গে মাল লেনা-দেনা চালাইতে হইলে বিশেষ জরুরি হয় ভারতীয় বন্দরে আর বিদেশী বন্দরে "ব্যাঙ্ক পরিচয়" (ব্যাঙ্ক সার্টিফিকেট)। দেশে আর বিদেশে এইরূপ ব্যাঙ্ক-পরিচয় বা ব্যাঙ্কের সুবিধা না থাকায় অনেক ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি কোম্পানী কাজ-কর্ম্ম চালাইতে কষ্ট পায়। ভারতবাসীর তাঁবে বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রভূত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সাগর-পারের ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ভারতবাসীর ট্যাকে মোটা মোটা লাভের টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। আমদানি-রপ্তানি কাণ্ডে টাকা ঢালিবার জন্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক কায়েম হওয়া আবশ্যক।

(২) বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক বীমা।—আমদানি-রপ্তানি কারবারের পক্ষে ব্যাঙ্কের মত বিদেশে মাল চালান দেওয়ার জন্য ইন্‌সিওরেন্স করাও সমান দরকারী। যদি ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স অফিস থাকিত তাহা হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য-বিষয়ক লাভের অনেক অংশ ভারতীয় বণিকদিগেরই থাকিয়া যাইত।

(৩) বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহালয়।—বিভিন্ন দেশের শিল্প-কারখানা, জাহাজ-কোম্পানী, বিনিময় ও বাজার ইত্যাদি বিষয়ক প্রকৃত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় আমদানি-রপ্তানিকারকগণের জানা থাকে না। সেই জন্য তাদের সময়ে সময়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেকেরই আর্থিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল নয় যে, তাঁহারা স্বাধীন ভাবে নিজ খরচায় খবর জানিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারেন। কাজেই "অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা" এই সূত্রের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এই রকম কাজ-কর্ম্ম যে সমস্ত

অফিসে চলে সে সমস্তকে একসঙ্গে মিলিত হইয়া "বৈদেশিক বাণিজ্য-সঙ্ঘ" স্থাপন করিতে হইবে। এই সঙ্ঘ আপন আপন মেম্বর ও মক্কেলদের ভিতর "বাণিজ্য-সংবাদ-দপ্তর" রূপে কাজ করিবে।

(৪) বিদেশী ভাষা ও বাণিজ্য-ভূগোল।—এই বহির্বাণিজ্য-সঙ্ঘ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুলে পরিণত হইতে পারে অথবা সেইরূপ স্কুল চালাইতে পারে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত :—বিদেশী ভাষা (ফরাসী জার্ম্মাণ, জাপানী ইত্যাদি), দেশ বিদেশের শিল্পকারখানা বিষয়ক ভৌগলিক বৃত্তান্ত, আমদানী-রপ্তানীর কায়দা ইত্যাদি।

৫। বিদেশে ভারতীয় এজেন্ট।—ভারতবর্ষের সওদাগরেরা যে সকল দেশের সহিত ব্যবসা করে, সেই সমস্ত দেশে যদি আপন আপন প্রতিনিধি রাখা যায় তাহা হইলে মাল ক্রেতা ও মাল বিক্রেতা এই দুই হিসাবেই আমাদের পক্ষে অনেক টাকা বাঁচানো সম্ভব। ব্যয়-সংক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লাভও জুটিতে পারিবে। স্বদেশে বাণিজ্য-সংবাদ-ভবনের মত বিদেশেও "বাণিজ্য-প্রতিনিধি" বা এজেন্ট স্থাপন করা দরকার। এই জন্যও আবার দরকার একাধিক আমদানী-রপ্তানী কোম্পানীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। বিদেশে ভারতীয় সওদাগরদের ছোট খাটো এজেন্সি রাখিবার খরচ বার্ষিক ১০,০০০ টাকা পড়িবে। যদি নিপুণভাবে চালাইতে পারা যায়, তাহা হইলে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এইরূপ প্রতিনিধি-ভবন বা এজেন্সি নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

৭। পুঁজিশীল সম্প্রদায়

টাকা-পয়সার মালিক-শ্রেণী বলিলে বিশেষ কোন দাগ দেওয়া মার্কা-মারা শ্রেণীকে বুঝায় না। সঞ্চিত টাকা-কড়ি যার আছে সেই ধনিক, ধনী বা পুঁজিশীল। "কর্জ্জদাতা", "মহাজন" "বাণিয়া" জমিদার, মস্তিষ্কজীবি ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই পুঁজিশীল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। খাঁটী চাষী দিগকেবাদ দিয়া পয়সাওয়ালা বড় বড় জমিদারের আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, পুঁজিশীল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেও সেই সব কথাই প্রযোজ্য। ব্যক্তি-গত আয়-বৃদ্ধি আর দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির জন্য সেই সকল "হদিশ" কার্য্যে পরিণত করা পুঁজিশীল শ্রেণীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। দফা কয়েকটা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

(১) নয়া নয়া কারখানা-শিল্প।—বর্ত্তমান আলোচনায় শিল্পসমূহকে ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ—হস্তশিল্প বা কুটীর-শিল্প। শিল্পীরা স্বাধীন কারিগর। ২৫,৫০ বা ৫০০ টাকা হইতে ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূলধন তাহাদের তাঁবে আছে এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ—আধুনিক শিল্প। (ক) ছোট ছোট কারখানা-শিল্প। ক্ষুদ্র কারবার, মূলধন ২৫,০০০, টাকা হইতে ১০০,০০০ টাকার বেশী নয়। ইংরেজি পরিভাষিকের "স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি"কে এই গোত্রের অন্তর্গত করা গেল।

(খ) মাঝারি রকমের কারখানা-শিল্প।—মূলধন ৫,০০,০০০ হইতে ২৫,০০,০০০ টাকা।

(গ) বড় বড় শিল্প।—মূলধন ২৫,০০,০০০ টাকার উপর ("লার্জ্জ" "বিগ" বা "বৃহৎ" কারবার)।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিল্প সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় পুঁজিপতির বিশেষ মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। কয়েক ক্ষেত্র বাদে এই সমস্ত শিল্প-কার্য্যে টাকা ঢালিবার মত অবস্থা তাঁহাদের এখনও আসে নাই। ভারতবর্ষের অর্থ-সামর্থ্য হিসাবে বর্ত্তমানে "মাঝারি" রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাহাও যে সংখ্যায় খুব বেশী হইবে ভরসা কম। এই খসড়ায় এই কথাটাই জোর দিয়া বলা হইতেছে যে, আধুনিক ধরণের ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতাই ভারতবর্ষীয় ধনীদের আছে প্রচুর। যতদূর সম্ভব এই সকল শিল্প পুঁজিপতির নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে গড়িয়া উঠা দরকার। ২৫০০০ হাজার টাকার মূলধনে চালিত শিল্পকাণ্ডে সাধারণতঃ দুই তিনজনের বেশী অংশীদার থাকা উচিত নয়। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই অংশীদারগণকে কারখানার ম্যানেজার, বিশেষজ্ঞ, হিসাব নবিশ বা অন্য কোনরূপে সর্ব্বদা মোতায়েন থাকা উচিত।

কুটির-শিল্প বনাম কারখানা-শিল্প

বিষয়টা গুরুতর বলিয়া কিছু খোলসা করিয়া বলিতেছি। হস্ত-শিল্পগুলি কারিগরদিগের হাতেই চলিতে থাকিবে। এইরূপ ধরিয়া লইতেছি। তবে পুঁজিশীল শ্রেণী পূর্ব্বলিখিত উপায়ে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সকল কুটির-শিল্পের সাহায্য করিতে পারে। নবীন কারখানা-শিল্পের যুগেও,—ছোট বড় মাঝারি কারবারের আওতায়ও,—"সেকেলে" কুটির-শিল্প নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। শিল্প-প্রধান যন্ত্র-নিষ্ঠ ইয়োরামেরিকার উন্নততম দেশে এবং জাপানে কুটিরশিল্পের রেওয়াজ একদম বন্ধ হইয়া যায় নাই। ভারতেও যন্ত্রপাতির আমলে কুটির-শিল্প বড় শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কুটিরশিল্প পুঁজিশীলদের সাহায্যে আধুনিক যন্ত্র, রসায়ন, কলকব্জা ইত্যাদির কিছু কিছু আত্মসাৎ করিয়া নবজীবন লাভ করিবার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে। যন্ত্রপাতি আর পুঁজি হইতেছে "সেকেলে" কুটির-শিল্পের পক্ষে বর্ত্তমানে আসল দাওয়াই।

যাহাহউক হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি-কিছু বক্তৃতা করিতে যাওয়া চলিবে না। যাঁহারা ইহার চেয়ে বড় কিছু করিতে অসমর্থ তাঁহাদের জন্য এই পাঁতি। ইহার ভিতর ভারতাত্মার বিশেষত্ব কিছু নাই। আসল কথা আজও আমরা ভারতে লম্বা লম্বা বজেটওয়ালা লম্বা লম্বা ফর্দ্দ যুক্ত কারবার চালাইতে অসমর্থ। আমাদের আসল অভাব কাঁচা, নগদ, "তরল" টাকার। তাহার উপর আবার, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্য, কর্ম্ম-দক্ষতা ইত্যাদির অভাবও আছে। বর্ত্তমান মোসাবিদায় সম্পদ্-বৃদ্ধির যে সকল হদিশ প্রচার করা হইতেছে তাহার ভিতর কুটির-শিল্প লইয়া মাতামাতি করিবার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। নতুন নতুন কারবার, আধুনিক কায়দার কারখানা, ফ্যাক্টরি, "একেলে" শিল্প ইত্যাদির দিকেই পুঁজিশীলদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা প্রধান মতলব। এই সকল শিল্পকে "হাঁক ডাক" হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার ভিতর তৃতীয় শ্রেণীটি অর্থাৎ "বৃহৎ কারবার" ভারতীয় পুঁজিওয়ালাদের পক্ষে এখনো অনেক দিন পর্য্যন্ত মোটের উপর "আশমানের চাঁদ" বিশেষ। দু' এক ক্ষেত্রে হয়ত বা প্রত্যেক প্রদেশে দু' একটা "বড় কারখানা" ভারতীয় তাঁবে আর ভারতীয় পুঁজিতে চলিতে পারে। কিন্তু মোটের উপর ভারতীয় ধাতে আজকাল লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা "ক্ষুদ্র কারবার"ই বেশী বরদাস্ত হইবে। তবে ২৫ লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা "মাঝারি কারবার"ও কতকগুলা ভারতীয় টাকার জোরে চলিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্পদ্-বৃদ্ধির যে কর্ম্ম-কৌশল জারি করা হইতেছে তাহাতে লাখ টাকা পুঁজিওয়ালা আধুনিক শিল্প-কারখানাকেই "ক্ষুদ্র কারবার" বলা হইতেছে। এই ধরণের "ক্ষুদ্র কারবার" ভারত-সন্তান কর্ত্তৃক যেখানে সেখানে এখনই গণ্ডা গণ্ডা বা ডজন ডজন পরিচালিত হইতে পারে। প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষুদ্র কারবারগুলা চালাইবার চেষ্টা করা উচিত। প্রয়োজন হইলে দু'একজন "পার্টনারের" সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

"জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী" "লিমিটেড কোম্পানী" যৌথ কারবার ইত্যাদির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হইতেছে না। এই সব দিকেও আমাদের আর্থিক জীবন বাড়িতে থাকিবে। তবে যথাসম্ভব নিজ নিজ তাঁবে ছোট ছোট কারখানা চালাইতে পারিলে সহজে আধুনিক ঢঙের অভিজ্ঞতা আর দায়িত্ব-জ্ঞান জন্মিবে আর ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধি ত হইবেই। যে যে ক্ষেত্রে দু'চার জন "পার্টনারের" সাহায্য লওয়া আবশ্যক সেই সকল ক্ষেত্রে পার্টনারগণ প্রত্যেকেই যাহাতে নিত্যনৈমিত্তিকরূপে কারবারের কাজে বাহাল থাকেন তাহার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক।

ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে বিপুল যৌথ প্রতিষ্ঠান আর "কার্টেল" "ট্রাষ্ট," আজকাল আটপৌরে জিনিষ বটে। কিন্তু "ব্যক্তিগত" কারবার, "পার্টনার শিপের কারবার, অল্প পুঁজিওয়ালা কারবার, ইত্যাদির সংখ্যাও গুণতিতে কম নয়। ২৫,০০০ টাকা হইতে ১,০০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূলধনের আধুনিক শিল্প-কারখানা ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার যুগ আসিয়াছে। এই ধরণের ক্ষুদ্র কারখানার আবহাওয়ায়ই যন্ত্রপাতির "শালসা" আর কল-কব্জার "পাঁচন" ভারতীয়

সমাজের রক্ত সাফ করিয়া দিতে পারিবে। যন্ত্র-নিষ্ঠাও ভারত-সন্তানের একটা স্বভাব-নিষ্ঠ স্বধর্ম্মে পরিণত হইতে থাকিবে।

(২) আমদানী ও রপ্তানী।—টাকা-পয়সাওয়ালা লোকেরা ব্যক্তিগত মালেকানা স্বত্বের ব্যবস্থায়ই বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কোম্পানীও স্থাপিত করিতে পারেন। ১০,০০০ টাকায়, ২৫,০০০ টাকায় এইরূপ কাজ আরম্ভ হইতে পারে। এইদিকে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির জন্য ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। অবশ্য "সীমাবদ্ধ দায়িত্বওয়ালা" (লিমিটেড) যৌথ ব্যবস্থায়ও বহির্ব্বাণিজ্যের কোম্পানী খাড়া করিবার সুযোগও এক্ষণে বিস্তর রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কালে একই প্রকার কারবারে লিপ্ত বিভিন্ন কোম্পানী পরস্পর প্রতিযোগিতা দূর করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে। কিন্তু যতদিন সম্ভব প্রত্যেক কোম্পানীরই স্বাধীনভাবে কাহারও সাহায্য না লইয়া সাফল্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। তবে এখনই কতকগুলি কোম্পানীর পক্ষে "বৈদেশিক বাণিজ্য-সংসদ্"রূপে মিলিত হইয়া বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ-সংগ্রহালয়ের কার্য্য করিতে লাগিয়া যাওয়া উচিত।

(৩) ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি।—দুই প্রকারের বীমা সমিতির কথা বলা হইয়াছে :—(১) সাধারণ জীবন ও অন্যান্য প্রকারের বীমা-সমিতি, এবং (২) সাগর-পারের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বীমা-সমিতি।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরামেরিকান্ বীমা কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষের নর-নারীর নিকট অনেক টাকা লাভ করিতেছে। ভারতের ধনী সম্প্রদায় যদি এই ব্যবসার রহস্যগুলি সমঝিতে পারে তবে এই লাভের টাকার অনেক অংশ তাহার হাতে আসিতে পারে। বিগত দশ পনর বৎসরের ভিতর "স্বদেশী আন্দোলনের" ধাক্কায় এই দিকে ভারতবাসীর নজর কিছু কিছু গিয়াছে। আমরা অনেক কৃতকার্য্যও হইয়াছি। আরও দরকার।

(৪) ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সমিতি।—পূর্ব্বে জমিদার শ্রেণীর জন্য পাঁচ প্রকার ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করা (২) কুটির-শিল্পের সহায়তার জন্য ব্যাঙ্ক (৩) দোকানদার শ্রেণীর জন্য ব্যাঙ্ক (৪) আধুনিক কারখানা-শিল্পের জন্য ব্যাঙ্ক (৫) বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য ব্যাঙ্ক। টাকাওয়ালা লোকদের পক্ষেও এই তালিকাই কার্য্যকরী হইবে। এই সমস্ত ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমবায়-ঋণদান-সমিতি এক বিশেষ গোত্রের প্রতিষ্ঠান। কারণ, কৃষকগণের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার উপরে এই সকল নির্ভর করে। অর্থাৎ কৃষকগণের টাকায় এগুলি চালিত হয় আবার কৃষকেরাই এসকলের নিকট ধার লয়। পুঁজিওয়ালা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ এক্ষেত্রে একই লোক। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ দরিদ্র। মালিকানা স্বত্বে অথবা কোম্পানীবদ্ধ ভাবে কৃষকগণের জন্য চাষী-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া পুঁজিশীল লোকেরা এই সমস্ত ঋণদান-সমিতিগুলিতে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। এই কথা জমিদার-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ও বিবৃত হইয়াছে।

অন্য চারি প্রকারের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাই বিশেষ রূপে ধনী সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এক পুরুষ সময়ের মধ্যেই "ভারতীয় মূলধন" এক মস্ত "শক্তি"তে পরিণত হইয়া যাইবে। হস্তশিল্প বা দোকান-দারগণের জন্য ব্যাঙ্ক প্রথমে ৫০,০০০, টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জেলার সদরে ও মহকুমায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান অনেকগুলা কায়েম করা সম্ভব।

আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজি দরকার বেশী। ৫,০০,০০০ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন না হইলে এই সকল কারবারে হাত দেওয়া কঠিন। একটা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতেছি। ইহার "আদায়ী" পুঁজি মাত্র ৭৫,০০০, এই ব্যাঙ্কের পক্ষে কারখানা-শিল্প বা বড় রকমের বহির্ব্বাণিজ্যে লেন-দেন চালানো সহজ নয়। কিন্তু প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে এইরূপ ব্যাঙ্ক গণ্ডায় গণ্ডায় থাকা দরকার আর সম্ভবও বটে।

এই বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্কসকল প্রত্যেকটি অপরটি

পৃথক। প্রথম প্রথম সকল ব্যাঙ্কেরই কেবলমাত্র এক-প্রকার ব্যবসা লইয়া নাড়া চাড়া করা উচিত। এক সঙ্গে বিভিন্ন কারবারে হাত দেওয়া সাধারণত নিরাপদ্‌ নয়।

লোন-আফিসগুলার "জাত"

আমাদের দেশে আজকাল একপ্রকার ব্যাঙ্ক জোরের সহিত চলিতেছে। তাহার নাম "লোন-আফিস"। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। কিন্তু স্বদেশীর যুগে এই গুলার সংখ্যা বাড়িতে থাকে। পরে লড়াইয়ের (১৯১৪-১৮) পরবর্ত্তী কালে বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর "লোন-আফিস" বা ঐ জাতীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান ভারতে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে নামজাদা হইয়া উঠিয়াছে।

সম্পদ্‌বৃদ্ধির হদিশ দিতে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইতেছে তাহার ভিতর লোন-আফিসগুলার ঠাঁই কোথায়? একমাত্র চাষীদের পুঁজিতে প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র চাষীদের তাঁবে পরিচালিত, একমাত্র চাষীদের চাষ-আবাদের কাজে কর্জ্জ দিতে বাধ্য,—যে সকল প্রতিষ্ঠান তাহারই নাম "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমিতি" বা সমবায়-ঋণদান-সমিতি। বলা বাহুল্য লোন-আফিসগুলা এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক নয়। তবে এই সকল চাষী-ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবার দিকে লোন-আফিসের পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব এবং উচিত। সেই কথাই জমিদার আর পুঁজিশীল শ্রেণীদের ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল স্বরূপ প্রচার করা হইতেছে।

অপরাপর যে চার শ্রেণীর ব্যাঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে তাহার ভিতর শেষ দুই শ্রেণী অর্থাৎ কারখানা-শিল্প ও বহির্ব্বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান রূপে কার্য্যকরা লোন-আফিসগুলা আজ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে কিনা সন্দেহ। অনেকের পক্ষেই হয়ত এখনো সম্ভবপর নয়। বাকী রহিল কারিগর-ব্যাঙ্ক আর বেপারী-ব্যাঙ্ক। এই দুই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-রূপে কার্য্যকরা লোন-আফিসগুলার পক্ষে খুবই সম্ভব। এইদিকে নজর রাখিয়া লোন-আফিসগুলার পক্ষে নতুন গড়ন গ্রহণ করা চলিতে পারে। কিন্তু এই দুই দিকেও হয়ত আজকালকার লোন-আফিসগুলা বেশী নজর দেয় না।

কারখানা-শিল্প আর বহির্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাঙ্ক যে শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কারিগর আর বেপারী বিষয়ক ব্যাঙ্কও জাতি হিসাবে সেই শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান। তবে কারখানা-শিল্পে আর বহির্ব্বাণিজ্যে ঝুঁকি বেশী। ইহার জন্য পুঁজি চাই অনেক ত বটেই, তাহা ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, রসায়ন, দেশ-বিদেশের কারখানা, টাকার বাজার, সামুদ্রিক যান-বাহন, বীমা ও ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ চলনসই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কিন্তু আসল ব্যাঙ্কের কারবার বলিলে এই চার শ্রেণীর, বা (ছোট ধাপটা ধরিলে) মাত্র দুই শ্রেণীর;—ব্যাঙ্করূপে কাজ করা বুঝিতে হইবে। এই মাপ-কাঠিতে অনেক ক্ষেত্রেই লোন-আফিস-গুলাকে ব্যাঙ্ক বলা উচিত কিনা সন্দেহ। তবে লোন-আফিসসমূহ কোন্‌ জাতীয় ব্যাঙ্ক?

জমি-জমা বন্ধক রাখিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান জমিওয়ালা-দেরকে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান ব্যবসা। ঘর-বাড়ী বন্ধক লওয়াও বোধ হয় খুব প্রচলিত। তাহা ছাড়া সোনা-রূপার মালপত্র, অলঙ্কারাদিও বন্ধক লওয়াও হয়। কাজেই এই সকল প্রতিষ্ঠানকে "গোত্র" হিসাবে "বন্ধকি-ব্যাঙ্ক,"—এবং কারবারের পরিমাণ হিসাবে "জমি-বন্ধক-ব্যাঙ্ক"রূপে বিবৃত করা চলে। এই ধরণের ব্যাঙ্ক চালাইয়া ভারত-সন্তান টাকা-কড়ির লেন-দেনে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছে। দেশের আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে সমাজের নানা শ্রেণীর উপকারও সাধিত হইয়াছে মন্দ নয়। ভবিষ্যতেও এই ধরণের বন্ধকি-ব্যাঙ্কের দরকার থাকিবে।

কিন্তু দেশোন্নতির জন্য যে সকল আর্থিক হদিশ প্রচার করা বর্ত্তমান খসড়ার মতলব তাহার ভিতর প্রধান কথা হইতেছে সম্প্রতি ছোট দরের শিল্প-ব্যাঙ্ক আর ছোট দরের বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক কায়েম করা। "কারিগর," কুটির-শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদির জন্য চাই এক প্রকার প্রতিষ্ঠান। আর মফস্বলের মাল সদরে, কলিকাতার মাল মফস্বলে, এক জেলার মাল অন্য জেলায় চালান করার কাজে এবং স্থানীয়

বেপারী, আড়তদার, দোকানদার ইত্যাদি ব্যবসায়ীর নিত্যনৈমেত্তিক হাটবাজারের কাজে চাই বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক। এই দুই দিকে হাত পাকাইতে সুরু করিলে আমাদের পুঁজিশীল লোকেরা ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির দিকে উন্নত হইতে পারিবেন।

(৫) সুদখোরদের বিরুদ্ধে আইন।—টাকা কর্জ্জ দেওয়া সম্বন্ধে অন্যায় আচরণ ও অত্যন্ত উচ্চহারে সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই সমস্ত উপায় যাহাতে দূরীভূত হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্টের আইন পাশ করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এইদিকে সরকারী নজরও আছে।

৮। মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণী

মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর মানুষ কোন প্রকার জীব? ইহাদিগকে কোন বিশেষ সামাজিক বা আর্থিক গোত্রের লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আমাদের ভারতীয় পারিভাষিকে "ভদ্রলোক" শ্রেণীর লোক যাহারা একমাত্র তাহারাই মস্তিষ্কজীবী নয়। আবার ইয়োরামেরিকার "মধ্যবিত্ত" শ্রেণীর লোক বলিলে যাহা বুঝায় একমাত্র তাহাদিগকেই মস্তিষ্কজীবী বলা চলিবে না। একমাত্র জন্মের জোরে অথবা একমাত্র আর্থিক আয়ের জোরে মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত নয়। জন্ম যে ঘরেই হউক, আর আয় যাহাই হউক না কেন, স্কুল-টোল-মক্তবের পাঠ-নির্দ্দিষ্ট-কতকটা-দূর অগ্রসর হইলেই নরনারীকে মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর লোক বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভারতের এইরূপ মানুষের সর্ব্বনিম্ন আয় মাসিক ৫৲ টাকা বা ২০৲ টাকা মাত্র। আবার ভারতেই ইয়োরামেরিকার মাপে অনেক নামজাদা ডাক্তার বা আইনজীবী লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক এই মস্তিষ্কজীবীদের জন্য বক্তিগত আয়-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল বিবৃত করা যাইতেছে।

১। নূতন নূতন পেশা।—এখন আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা, দেশের মধ্যে নতুন নতুন কর্ম্মের-সংস্থান আর নতুন নতুন পেশার উদ্ভাবন করা। মস্তিষ্কজীবি-শ্রেণীর

এই নয়া নয়া কর্ম্ম-প্রণালী আরব্ধ করিতে হইলে চাই "তরল" পুঁজি, মূলধনের স্রোত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কিষাণ বা কারখানার মজুরের অর্থাৎ নিরক্ষর লোকজনের স্বার্থও যাহা, "লিখিয়ে-পড়িয়ে" মগজওয়ালা মস্তিষ্কজীবী ভারত-সন্তানের স্বার্থও তাহাই। এইখানে অবশ্য জানিয়া রাখা উচিত যে "নিরক্ষর" চাষী-কারিগরদের মগজ, মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ইত্যাদি চীজ্ নাই এরূপ বলা চলিবে না। মস্তিষ্কজীবী লোক দুনিয়ার সকল নরনারীই। তবে ইস্কুল পার হওয়া লোক-জনকে পারিভাষিক হিসাবে মস্তিষ্কজীবী ধরিয়া লইতেছি মাত্র। লোকজনের শ্রেণী-বিভাগ করা সহজ নয়।

কৃষি-কার্য্যে অত্যন্ত লোকের ভিড়। চাষীদের জন্য নতুন নতুন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তোলা দরকার। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ধনি-সম্প্রদায় যদি নানা প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করিতে না পারে, ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়, ইনসিওরেন্স কোম্পানী না চালায় বা বৈদেশিক বাণিজ্য-কোম্পানিগুলি আপুন্ তাঁবে আনিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে লিখিয়ে-পড়িয়ে বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে কেরাণী, ম্যানেজার বা কলকারখানার বিশেষজ্ঞরূপে কর্ম্ম পাওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহা বুঝিতে কোনো বেগ পাইতে হয় না। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে পুঁজির সংস্থান অত্যন্ত অল্প। আর যা কিছু স্বদেশী পুঁজি একত্র হওয়া সম্ভব তাহার সাহায্যে বড় জোর ছোটখাট রকমের শিল্প-বাণিজ্য চলিতে পারে। সুতরাং ভারতের ধনদৌলত বৃদ্ধি করিবার জন্য এখনও কিছুকাল ধরিয়া বিদেশী পুঁজি আমদানি করা যে অত্যন্ত আবশ্যক তাহা কি মজুর, কি চাষী, কি কেরাণী, কি এঞ্জিনিয়ার, কি রাসায়নিক সকলেই একপ্রকার প্রথম স্বীকার্য্য রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য। নতুন নতুন কর্ম্ম সৃষ্টি করা একমাত্র মাথার জোরে অথবা একমাত্র হাতের জোরে সম্ভব নয়। মেহনৎ ও মগজকে চালাইবার জন্য চাই কেবল পুঁজি।

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যথা:—

চাকুরিই আর অন্যান্য চাকুরিই হউক) যাহারা নিযুক্ত আছে (বুদ্ধিজীবি ও শারীরিক পরিশ্রমকারিগণ ও শিক্ষকগণ) জিনিষ পত্রের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতন বা মজুরিও বাড়া উচিত।

(২) ভারত-সন্তানের পক্ষে (ক) দেশ শাসনের জন্য বড় বড় চাকুরীতে ও (খ) কল-কারখানার বড় বড় চাকুরিতে নকৃরি গ্রহণ করাটা যাহাতে সহজ হইয়া আসে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কাজটা অবশ্য সোজা নয়।

চাকুরিতে বিশেষতঃ বড় বড় চাকুরিতে যত বেশী ভারত-সন্তান ঢুকিতে পারে ততই ভাল। স্বদেশ-সেবকগণ এই দিকে আন্দোলন চালাইতেছেন। এই আন্দোলন কোনমতেই থামা উচিত নয়। গবর্ণমেন্টের বড় বড় সমস্ত চাকুরি ভারতবাসীর তাঁবে আসিলে কেবলমাত্র যে স্বরাজের পথ আবিষ্কার হইয়া আসিবে তাহা নহে, দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধিও ঘটিতে পারিবে।

(৩) সমবায় দোকানদারি, সমবেত গৃহ নির্ম্মাণ-সমিতি।—কল-কারখানার মজুরদের জন্য সমবায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত দ্রব্য-ভাণ্ডার স্থাপন যেমন যুক্তিযুক্ত, মস্তিষ্ক-জীবী মানুষের পক্ষেও এই সকল কায়েম করা তেমনি যুক্তিযুক্ত। বাসগৃহের সংস্থানের জন্যও সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া দেখা যাইতে পারে। এইরূপে সস্তার জীবন-যাপন-প্রণালী আরব্ধ হইলে সঞ্চয়ের পথও খোলসা হইয়া আসিবে।

(৪) হস্তশিল্প ও ব্যবসা শিক্ষার বিদ্যালয়।—মস্তিষ্কজীবী সম্প্রদায়ের ছোকরাদের পক্ষে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর হস্তশিল্প ও ব্যবসা-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। এইরূপ বিদ্যালয়ের কথা কারিগর ও দোকানদার-গণের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে। সকলেরই যে ইউনিভার্সিটির জন্য তৈয়ারী হওয়া উচিত তাহা নয়। এইরূপ শিল্প-বাণিজ্য-বিদ্যালয় হইতে পাশ করা ছাত্রগণকে নূতন নূতন শিল্প-কারখানা, ব্যাঙ্ক ও আমদানি-রপ্তানি কোম্পানিগুলি কাজে লাগাইতে পারিবে।

(৫) আর্থিক উন্নতি সাধনের ধুরন্ধরগণ।—যন্ত্রপাতির ওস্তাদরূপে আর নানাবিধ দায়িত্ব মাথার উপর লইয়া দেশের আর্থিক উন্নতি বিধান করিতে পারে এইরূপ উচ্চ অঙ্গের মস্তিষ্কজীবীর সংখ্যা ভারতবর্ষে আজকাল বড় বেশী নয়। কিন্তু এইরূপই একদল লোক, যাদেরকে কতকটা "আর্থিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ" (ইকনমিক্ জেনার‍্যাল ষ্টাফ্) বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক জেলায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এইরূপ ধুরন্ধরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ভারতবর্ষে বিশেষ কোন সুযোগ নাই। "আর্থিক উন্নতির সেনাপতি-সঙ্ঘ" গড়িয়া তুলিতে হইলে, ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আগামী দশ বৎসরের জন্য কর্ম্ম-তালিকা প্রচার করিতেছি। প্রত্যেক জেলাকে প্রতি বৎসর দশটি করিয়া অর্থাৎ মোটের উপর ১০০ জন ধুরন্ধরের বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে ও কাজকর্ম্মে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আবশ্যক।—

(১) চাষ-আবাদ ও কৃষিকার্য্যের রসায়ন।

(২) যন্ত্র সম্বন্ধীয়, বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয়, রসায়ন সম্বন্ধীয় ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এঞ্জিনিয়ারিং ও পূর্ত্তবিদ্যা।

(৩) ব্যাঙ্কিং, বীমা, যানবাহন, বিনিময়, বহির্ব্বাণিজ্য, ইত্যাদি বিষয়ক ধনবিজ্ঞান।

যাঁহারা এম্ এস সি, এম্ বি, বি ই, বি এল, বি টি বা এম্ এ পাশ করিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই এইরূপ বৃত্তি লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবেন। তাঁহাদের বয়স ২৫ হইতে ২৮ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। তাঁহারা তিন, চার বৎসর ধরিয়া বিদেশের নানা শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। বিভিন্ন লাইনের নামজাদা লোক-জনের সঙ্গে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো তাঁহাদের প্রধান কাজ থাকিবে। বিদেশী ডিগ্রী লাভের জন্যই যে লেখাপড়া করিতে হইবে সেরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা থাকিবে না।

এই সমস্ত শিক্ষার্থী, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্য-ভবন, স্বাস্থ্য, পরীক্ষা-লয়, হাঁসপাতাল, শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণাগার, কারখানা, রেল-জাহাজ, আবাদ এবং কৃষি শিল্পবাণিজ্য-কলেজ ইত্যাদি প্রতি-

ষ্ঠানের আবহাওয়ায় নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরগণের "অতিথি" অথবা সহযোগী হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা যে সকল গবেষণা বা অনুসন্ধান চালাইবেন তাহার ফলাফল তাঁহারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। কখনো কখনো ভারতবর্ষের পত্রিকা গুলিতেও এই সব প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণাভবনে অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয় বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত বক্তৃতা দেন তাহাতে যোগদান করা, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী ইস্কুল-কলেজের ছোকরাদের মতন পাঠে লাগিয়া যাওয়াও এই সমস্ত প্রবাসী বিদ্যার্থিগণের অন্যতম ধান্ধা থাকিবে।

গড়পড়তা খরচ।—প্রত্যেকের জন্য সমগ্র পাঠ-কালের নিমিত্ত ১০,০০০ টাকা লাগিবার সম্ভাবনা।

আর্থিক উন্নতির রাষ্ট্রনীতি

আর্থিক জীবনের চারিটা বড় বড় কর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর খুব বেশী। ভারতীয় বেকার-সমস্যার আলোচনায় আর দেশের ভিতর নয়া নয়া কর্ম্মের সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য এই চারিটা কর্ম্মক্ষেত্রের বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এইগুলি নিম্নরূপ :—(১) শুল্কনীতি, (২) মুদ্রার ব্যবস্থা, (৩) রেলওয়ে, (৪) জাহাজ। ভারতের জন্য সকল প্রকার আর্থিক উন্নতির খসড়ায় এইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চয়ই করা উচিত।

কিন্তু এই চার দফায় বর্ত্তমানে দেশের ভিতর "শ্রেণী" হিসাবে "নানা মুনির নানা মত।" অধিকন্তু এই গুলার সব কয়টাই বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেন্টের নিজ ঘরোয়া স্বার্থের একতিয়ার ভোগ করে।

ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্য-নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত আর্থিক কর্ম্ম-প্রণালীর সঙ্গে এই সব সুজড়িত। একে দেশীয় নরনারীর ভিতর "শ্রেণী-বিবাদ", তাহার উপর বিদেশী সাম্রাজ্যের সরকারী অর্থনীতি। কাজেই সমস্যা জটিল। দেশের শাসন-কর্ম্মে স্বদেশী নরনারীর একতিয়ার যতদিন পর্য্যন্ত না বেশ কিছু বাড়িয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল দিকে প্রকৃত পক্ষে বেশী কিছু হাসিল করা সম্ভবপর নয়। কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি সমঝিয়া রাখা উচিত। এই বিষয়ে চিন্তার গোঁজামিল রাখা আহাম্মুকি মাত্র। যাহা হউক এই সকল দিকে সর্ব্বদাই আন্দোলন চালাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। যখন যেমন তখন তেমনি, এক আধ ইঞ্চি করিয়া অথবা মাইলের পর মাইল ধরিয়া—এই সমস্ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র দেশবাসীর দখলে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ হাসিল করিতে হইলে প্রথমেই চাই স্বরাজ। দ্বিতীয়তঃ চাই গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি দরদশীল-স্বরাজ। কেননা মামুলি স্বরাজ, স্বাধীনতা, বা প্রজাতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণ-শাসনেও দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, নিরুপায়, সুযোগ-বিহীন নরনারীর দল থাকিবেই। সেই সকল লোকের আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির সহায়ক আইন-কানুন আর সমাজ-ব্যবস্থাও রাষ্ট্রিক স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গেই সমানভাবে জরুরি।

কিন্তু দার্শনিক হিসাবে ষোলকলায় পরিপূর্ণ, অথবা তত্ত্বহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এমন কোনো কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণের অভিপ্রায়ে, এই খসড়া প্রচার করা হইল না। এই জন্য অর্থনীতির "সরকারী" "সাম্রাজ্যিক" ধরণের আইনকানুন বিষয়ক মতামত সম্প্রতি ধামা চাপা দিয়া রাখা গেল। যুবক-ভারতের জন্য সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্ম-কৌশল সম্বন্ধে কেবল মাত্র সেই সমস্ত দফার আলোচনা করিলাম যে সব দফায়,—গভর্ণমেন্টের সাহায্য না লইয়াও অথবা শাসন-যন্ত্রকে নিজ তাঁবে বড় বেশী না আনিয়াও,—দেশের লোকেরা স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত আয়-বৃদ্ধির আর শেষ পর্য্যন্ত দেশগত বা জাতিগত সম্পদ্-বৃদ্ধির কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারে।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী

১০ই পৌষ মেদিনীপুর, পাহাড়ীপুর টাউন-স্কুল-গৃহে সম্মিলনীর নির্দ্দিষ্ট স্থান পুষ্পপত্র-পতাকা দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল এবং অধিবেশনের নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্ব হইতে বহু সুবর্ণবণিক্ সভাস্থলে সমাগত হইয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল বহু গণ্যমান্য সুবর্ণবণিক্ সহ সভায় সমাগত হন। এই সময় নিম্নলিখিত মুদ্রিত পত্রিকাসমূহ সভায় বিতরণ করা হয়—

মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনে আপত্তি

বহু সম্মানাস্পদ স্বজাতিবৎসল সুবর্ণবণিক্ মহোদয়গণ

সমীপেষু

মহাশয়

গত ২০।১২।২৮ তারিখে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট স্বজাতীয় মহোদয়গণের এক আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। জাতীয় উন্নতিকল্পে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সম্মিলনীর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত এবং বর্ত্তমান সম্মিলনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর তমলুক মহকুমায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনে সকলকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু মতদ্বৈধ বশতঃ তমলুকে উক্ত সময়ের মধ্যে অধিবেশন সম্ভবপর হইবে না। তজ্জন্য গত ১৯।১২।২৮ তারিখের রাত্রে মেদিনীপুরবাসী স্বজাতীয়গণের এক সাধারণ সভায় উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন উক্ত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর মেদিনীপুরে আহ্বান করা হইয়াছে তাহাতে কয়েকজন ব্যক্তি উক্ত কার্য্য নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর নিয়মাবলীর তৃতীয় ধারা অনুসারে কেন্দ্র-সমিতি বিশেষ কারণ বশতঃ সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় ও স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং কেন্দ্র-সমিতির নিয়মাবলীর ১৭ ধারা অনুসারে কোন আকস্মিক কারণ বশতঃ ৭ দিনের নোটিশেও কেন্দ্র-সমিতির অধিবেশন আহূত হইবার বিধান আছে কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীর ১৮ ধারা অনুসারে সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশন ভিন্ন উক্ত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন, সংশোধন বা সংযোজন হইতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কেন্দ্র-সমিতির নিয়মাবলীর ১৭।১৮ ধারার বিধান অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপে ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর সম্মিলনীর অধিবেশনের স্থান পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি কেন্দ্র-সমিতির সভ্যগণের স্বেচ্ছানুসারে বা ভোটের আধিক্যে উক্ত ১৭।১৮ ধারার বিধান অমান্য করা হয় তাহা হইলে নিয়মাবলী রচনায় প্রয়োজন কি? তাহা হইলে সমগ্র সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের অবমাননা করা হয় না কি? স্বেচ্ছাক্রমে নিয়মাবলীর উলঙ্ঘন করিলে কোনও সম্মিলনীর স্থায়িত্ব সম্ভবপর হয় না। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহা কেবল স্বেচ্ছাচারিতা এবং ভাবী বিরোধের সূচনামাত্র, সুদূর পল্লীতে এখনও সকলে জানেন তমলুকেই সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। কিন্তু মেদিনীপুরে অধিবেশনের স্থান পরিবর্ত্তন হওয়ায় এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের জানিবার সুযোগ হইবে না এবং অনেকেই উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, মেদিনীপুর সহরে রাঢ়ী শ্রেণীর অধিকাংশ এবং আরও কতক সুবর্ণবণিক্গণ উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশনে যোগদান করিবেন না। আমাদের সানুনয় নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্গণের প্রবর্ত্তিত ও অনুমোদিত নিয়মাবলী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর

তারিখে মেদিনীপুরে উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশন না করিয়া নিয়মাবলী অনুসারে কেন্দ্র-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়া সম্মিলনীর স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করা হউক। নতুবা মেদিনপুরে বর্ত্তমান সম্মিলনীর অধিবেশন অসম্মিলনীতে পরিণত হইবে এবং তাহার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। নিবেদন ইতি

সহর মেদিনীপুর।

২১।১২।২৮

পুঃ—কেন্দ্র-সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা সি আই ই, বাহাদুর তারযোগে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সম্মিলনীর অধিবেশন মেদিনীপুরে হইতে পারে না কারণ সম্মিলনীর পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে যে স্থান ধার্য্য হইবে সেই স্থানে ইহার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে এবং তিনি মেদিনীপুরে অধিবেশন হওয়া সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	শ্রীবরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্ত	শ্রীঅযোধ্যানাথ দে
শ্রীগঙ্গানারায়ণ পাল	শ্রীপশুপতি দত্ত
শ্রীঅযোধ্যানাথ পাল	শ্রীঅপূর্ণচরণ চাবরী
শ্রীননীগোপাল সেতুয়া	শ্রীঅনিলরতন দত্ত
শ্রীগোপীবল্লভ দে	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীচন্দ্রনাথ পাইন	শ্রীশরৎচন্দ্র পাইন
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেতুয়া	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে পর চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য বি এল্ মহাশয় বন্দে-মাতরম্ ও নিম্নলিখিত প্রথম উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন।

অভ্যর্থনা সঙ্গীত

এই মেদিনীপুর পূত প্রাঙ্গণে,
তোমরা সবাই আসি জনে জনে,
ন বছর আগে, স্নেহ অনুরাগে,
বেঁধেছিলে করি সব ব্যথা দূর।
সে প্রেম আজও জেগে আছে বুকে

সেই ভরসায়, সেবার আশায়,
ডেকেছে সবায় এ মেদিনীপুর।
পুণ্যশ্লোক রাজা রাজেন্দ্র, দাতা মতিশীল, রাজা দেবেন্দ্র
সুখময় রায়, যত মহোদয়, তোমরাই যে গো
তাদের স্বজন,
গৌরী সেনের দানের বারতা, আজও রয়েছে ইতিহাসে গাঁথা
তোমাদের'ই কুলে যত ধনী দাতা,
মানিক লাল আর দুর্গাচরণ।
কবি উমাপতি, শ্রীকর, শরণ,
ধনী বল্লভ, দত্ত উদ্ধারণ।
তাঁদের কুলের সন্তান সবে,
কি দিয়ে করিব সবার সেবা,
হে মোর দেবতা, হে মোর অতিথি,
নিঃস্ব আমরা ক্ষুদ্র যে অতি,
তাই লাজে মরি, জানিনা কি করি,
তোমাদের দেখা পায় গো কেবা।
তবু আবাহন করিগো সবায়,
স্বাগত আজি স্বজাতি-সভায়
ত্রুটি পরমাদ, ভুল, অপরাধ,
ক্ষমা করে কর সব লাজ দূর,
মনে রেখো দীন ছোট ভাই বলি,
এই আমাদের সকাতর বুলি,
দেখিয়া শত্রু মরুক গুমুরি,
দর্প তাদের হউক চুর।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র মহাশয় নিম্নলিখিত প্রার্থনা গীতি গান করেন।

প্রার্থনা

(গান)

তুমি জাগ জাগ্রত ভগবান্,
যুগ যুগ ধরি, জেগেছিলে যেন, অপহরি যত অপমান।
উৎপীড়িতের সকরুণ ডাকে,
জাগ তুমি জানি লোকে বলে থাকে

এস শাশ্বত, শুভ, সনাতন,
মিথ্যা মোহের, ভ্রান্তি বিনাশি, তৃপ্ত করিয়া প্রাণমন,
দাও বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি, জড়দেহে পুনঃ
ফিরে প্রাণ।

জাগ আজ তুমি ভক্ত-আহ্বানে
বৈশ্য জাতির গায়ত্রী-গানে,
সার্থক হোক, মিলন মোদের, কর কৃপাময় কৃপাদান।
আবার ভাসাতে পণ্যের তরী,
পোত্‌দার জাতি পারে যেন হরি,
জানিয়া মনেতে, তুমি কাণ্ডারী, হয়েছি আমরা ধাবমান।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ দে মহাশয় প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্ এই সম্মিলনী কেন্দ্র-সমিতির নিয়ম উলঙ্ঘনপূর্ব্বক আহূত হইয়াছে, সুতরাং উহা আইনসঙ্গত নহে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন এবং ঐ মতের পরিপোষণকল্পে কেন্দ্র-সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা সি আই ই মহোদয়ের টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া এই অধিবেশনের তীব্র প্রতিবাদ করেন; এবং প্রতিবাদের প্রমাণ স্বরূপ বেআইনী সভায় থাকা সুবর্ণবণিকের অকর্ত্তব্য বিবেচনায় শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ দে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দে প্রমুখ অধিকাংশ সুবর্ণবণিক্ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অবশিষ্ট সামান্য সংখ্যক সভ্য লইয়া এই সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হয়, পরে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য একখানি গান গাহিবার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন—

যে দেবতা জলে, স্থলে, আকাশে বিরাজমান, যে দেবতা জ্ঞানময়, মঙ্গলময় ও আনন্দময়, যে দেবতা সর্ব্বশক্তিমান—সেই দেবতার নাম স্মরণ করিয়া সমাগত ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণের চরণে অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আমি প্রণাম জানাইতেছি। তদনন্তর সমবেত স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদর অভিনন্দন ও যথাবিহিত সম্মান প্রদান করিতেছি এবং প্রীতিপূর্ণ নমস্কার করিতেছি।

বঙ্গীয় সুবর্ণ-বণিক্ সম্মিলনীর অদ্য চতুর্দ্দশ অধিবেশন। এই অধিবেশন এই জেলার তমলুক মহকুমায় হইবার জন্য আমাদের তথাকার স্বজাতীয় ভ্রাতাগণ কলিকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সম্মিলনীতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কিন্তু কোন বিশেষ অসুবিধা নিবন্ধন তাঁহারা এই অধিবেশন বর্ত্তমান বড়দিনের অবকাশে সংসাধন করিতে পারিলেন না। গত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাদের সাধারণ সভার সভাপতি মহাশয় আমাদিগের ঐ তারিখের সাধারণ সভায় সুনিশ্চিত ভাবে উহা প্রকাশ করায় আমরা ঐ ভার স্কন্ধে লইয়া ঐ অধিবেশন তমলুকের পরিবর্ত্তে এই মেদিনীপুরে হইবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অধিবেশন বড়দিনের অবকাশে হইতেছে এবং ইহা প্রতি বৎসর এই সময়ে হইবার জন্য কলিকাতাস্থ কেন্দ্র-সমিতিতে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই প্রথা প্রচলিত রাখিবার জন্য আমরা কষ্টে সৃষ্টে এ ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়াছি। উপরোক্ত সাধারণ সভার কার্য্য চলিতে থাকাকালীন আমাদের কোন ভ্রাতা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, তমলুকের পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরে এই অধিবেশন হইলে কেন্দ্র-সমিতির কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা; আমরা এই বলিয়া—এই আপত্তি খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করি যে, তমলুকবাসী সুবর্ণ-বণিক্ এবং মেদিনীপুরবাসী সুবর্ণ-বণিক্ উভয়ে এক "মেদিনী-মাতার" গর্ভজাত সন্তান; সুতরাং সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাটীর কোন সময়ের কোন উৎসব কোন অসুবিধা হেতু বন্ধ হইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইলে সাধারণের অসুবিধা ও লোক-লজ্জা নিবারণ জন্য ঐ উৎসব ঠিক সেই সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবর্ত্তিত করিলে তাহা দূষণীয় নহে বলিয়া আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বোধ হয়। ইহাতে নিয়ম ভঙ্গ হয় না; বরং নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাটীতে হঠাৎ কোন ব্যক্তি কঠিন রোগাক্রান্ত হইবার দিবস কোন কুটুম্ব উপস্থিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইবার উপক্রম সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার বাটিতে স্থান ও আহারের আয়োজন করিয়া দিয়া তাঁহার সেবাও পরিচর্য্যা করিলে তিনি কি সভ্যজনোচিত কোন নিয়ম বা ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন?

আমাদের সম্মিলনী কেবল নিয়ম পালন উদ্দেশ্যে হয় নাই। জাতীয় মঙ্গল সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য। সভা-সমিতি হইতে ইহা যতই আন্দোলিত ও সুচিন্তিত হয় ততই জাতীয় মঙ্গল সাধিত হইতে থাকে। এই প্রকার সভা-সমিতি বন্ধ দেওনের প্রয়াস অতিশয় গর্হিত কার্য্য মনে করি। বিশেষতঃ সঙ্কটকালে নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হয় না। এক্ষণে এই অবান্তর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আমাদের লক্ষ্য বিষয়ে আসা যাউক। অতি স্বল্পকাল মধ্যে এই অধিবেশনের আয়োজন করিতে হইয়াছে সুতরাং ইহাতে ত্রুটী-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতি আমাকে সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পদের আমি অনুপযুক্ত তথাচ সভ্যগণ আমাকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবৎপ্রেমে প্রণোদিত কর্ম্মবীরগণই জগতের যাবতীয় মঙ্গল ও উন্নতির সংসাধক। সুতরাং তাঁহাদের সেবা ও পরিচর্য্যা অবশ্যই পুণ্য কার্য্য। এই প্রাংশুলভ্য ফলে প্রলুব্ধ হইয়া উদ্বাহু বামনের ন্যায় আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

স্বজাতি-প্রেমে প্রণোদিত হইয়া আপনারা কত দূরদেশ হইতে দুরন্ত শীতের প্রকোপ সহ্য করিয়াও এখানে আসিয়াছেন। সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য কি উপায়ে স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিয়া ইহ জগতে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যে বিভূষিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন এবং অন্তে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

এই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য আমাদের বালক-বালিকাগণের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন; জ্ঞানালোক ব্যতীত উন্নতি সাধন অসম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের সমাজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে জ্ঞান কিঞ্চিৎ পক্ক হইয়া আসিলে আমাদের বালক-বালিকাগণ যাহাতে ঈশ্বর বিশ্বাসী হইয়া যৌবনকাল হইতেই ভগবান্‌ই আমাদের প্রভু ও উপাস্য দেবতা এবং আমরা সকলে তাঁহার দাস তাঁহার জগতের হিতের নিমিত্তই নিজে আচরণ করিয়া তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকর ও উদ্দীপক।

দরিদ্রতা মানুষের সকল গুণনাশক। এজন্য আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃবর্গ যোথ কারবারের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া সকলে অবাধে যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ নিতান্ত আবশ্যক। বৈশ্য জাতির বাণিজ্যই জীবিকা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শরীর রক্ষা ব্যতীত কোন সাধনই সিদ্ধ হইতে পারে না, এজন্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এবং পল্লীগ্রামে যাঁহাদের বাস পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।

বঙ্গ দেশবাসীগণের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা ও জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যের বড় অভাব দৃষ্ট হয় না; তবে কি কারণ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে হাহাকার ও কলহ-বিচ্ছেদ অতীব প্রবল। কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব বাঙ্গালীর হৃদয়ে একতা-গুণের বড়ই অভাব। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ইংরাজ, মুসলমান প্রভৃতি জাতীয় ব্যক্তিগণের ন্যায় একতা-গুণ যদি আমরা অর্জ্জন করিতে পারি আমাদের সকল অভাব শীঘ্রই দূরীকৃত হইবে। বাণিজ্য করিবার জন্য মূলধনের অভাব হইবে না। শিল্প-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বড় বড় কারখানার অভাব হইবে না। এই একতা-গুণাবলম্বী ব্যক্তিগণের জগতের সকল সুখ, সকল সম্পদ্, সকল পদ অতি সহজে প্রাপ্তব্য। কোন স্ত্রীলোককে মণি-মাণিক্যে সুশোভিত করিয়া তাহাকে যদি একখণ্ড বসন না দেওয়া হয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সকলের যেরূপ লজ্জা বোধ হয় বাঙ্গালীর বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও একতা-গুণের অভাবে সেইরূপ বাঙ্গালী জগতের চক্ষে অতিশয় ঘৃণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় উন্নতির জন্য একতা নিতান্ত আবশ্যক। এই একতাগুণের আভাস এক্ষণে বাঙ্গালীগণের মধ্যে কিছু কিছু দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কারণ এক্ষণে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতীয় ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টা করিতেছেন। ইহা অবশ্যই শুভলক্ষণ। শরীরের মধ্যে

রূপ বাঙ্গালীগণের এইরূপ মিলনের চেষ্টা নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া। তাহা বলিয়া বাঙ্গালীকে কি জাগ্রত জাতি বলা যাইতে পারে? কখনই না। তাহারা এই মাত্র পাশমোড়া দিতেছেন। এখনও ঘুমন্ত। ভগবানের নিকট প্রার্থনা বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণ শীঘ্র আসুক।

আমাদের সম্মিলনী অশেষ মঙ্গলের আকর। ইহাদ্বারায় আমাদের অশেষ হিতসাধন হইবে। গত ত্রয়োদশ অধিবেশনের পর হইতে কত পর আপন, কতদুর নিকট হইয়াছে। পূর্ব্বে বিভিন্ন শ্রেণীর সুবর্ণবণিকের গৃহে বিবাহ ত দুরের কথা, অন্নগ্রহণ করিলেও জাতি যাইত। এখন কন্যাদান পর্য্যন্ত হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহা অগণ্য সুফল প্রদান করিবে সন্দেহ নাই। এই সম্মিলনীর কল্পনা কলিকাতাবাসীর মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত সেইজন্য তাঁহারা নমস্য ও ধন্যবাদের পাত্র—সমস্ত সম্মিলনীর স্বজাতির নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন সম্মিলনীকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন। মাতা আহ্বান করিলে, সৎপুত্র সব অগ্রাহ্য করিয়া মাতৃ সন্নিধানে আগমন করে, সেই ভাবে আমরা সম্মিলনীর আহ্বানে সকল আপত্তি পদদলিত করিয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত হই। সম্মিলনীর এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য মঙ্গল সাধন—অন্য স্থানে বিধি-ব্যবস্থার আলোচনা বাঞ্ছনীয়—এখানে শুধু একটু হিতসাধনের আলোচনা।

মনের আবেগে আপনাদের নিকট অনেক কথা নিবেদন করিলাম। এই সকল কার্য্যে পরিণত হইলেই বুঝা যাইবে এই সকল আন্দোলন, এই সকল চিন্তাস্রোত প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আপনাদের সমবেত মঙ্গল কামনা আমাদের এই জাতীয় মহাযজ্ঞকে নিশ্চয়ই সত্বর পূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত করিবেই করিবে।

আপনাদের সমক্ষে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি অতি অল্পকালের মধ্যেই আমাদিগকে এই অধিবেশনের আয়োজন করিতে হইয়াছে সুতরাং আপনাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনে আমরা নিতান্ত অক্ষম। এ যাত্রায় আপনাদিগকে বিদুরের বাটিতে আগমন মনে করিতে হইবে। আপনারা পদে পদে আমাদের ত্রুটী, বিস্মৃতি, বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাইবেন। এ সময়ে আপনারা জাতীয় মঙ্গল চিন্তাতেই নিমগ্ন তাহাতেই বিশ্বাস আমাদের ত্রুটী আপনাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিবে না, যদি করে তজ্জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অভিভাষণ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়কে বর্ত্তমান সম্মিলনীর সভাপতির পদে বরণ করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেকে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও তাঁহার গলদেশে মাল্য দান করা হয়।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ বন্দোপাধ্যায় বি এ মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র জ্যোতির্ব্বিনোদ সরস্বতী রচিত নিম্নোদ্ধৃত মাঙ্গলিক আশীর্ব্বচনম্ পাঠ করেন :—

১। অবনিরমরসিন্ধুর্ভানুমানগ্নিরিন্দুঃ
ব্রজযুবতিবিহারী বেণুধারী মুরারিঃ ॥
সকলশুভনিরীশো মঙ্গলেশো গিরীশঃ
সমিতিগতিবিধাতুঃ ক্ষেমমায়ুর্দদাতু ॥

২। যদপিচ সুনবীনা নো সভেয়ং সুদীনা।
নগণিত গুণমানা স্বঃসদস্তুল্যমানা ॥
নহি বয়মপি হীনাঃ প্রাপ্য যাং প্রীতিপীনা।
বিতরতু চ বিপাশাং সা সদা জীবিতাশাং ॥

৩। ভবতি তদপবর্গঃ সাধ্যতে যস্ত্রিবর্গঃ।
ন ভবতি পরমার্থঃ সাধিতো যস্য নার্থঃ ॥
নহি বিলসতি কাম শুদ্ধ ধর্ম্মোঽপি বামঃ।
তদিহ চরতু নিত্যং বৈশ্যশক্তিঃ সুনৃত্যম্ ॥

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নিম্নলিখিত অভিভাষণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে এম্ এ মহাশয় পাঠ করেন—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ,

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য কি বলিয়া, কি ভাষায়,

কোন ভাবে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব ? জাতীয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতরূপে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করিলে, আমি আনন্দিত হইতাম। তবে আপনাদের ন্যায় গুণী, জ্ঞানী, বিদ্বান্‌গণের সহায়তা, সহযোগিতা ও সহানুভূতি দ্বারা আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের সকল ত্রুটী সংশোধিত হইবে,—ইহা বিশ্বাস করি, বলিয়াই সর্ব্বকল্যাণময় শ্রীনারায়ণের নাম গ্রহণপূর্ব্বক এই গুরুকর্ত্তব্য গ্রহণ করিলাম। স্বজাতি-নারায়ণের সেবা করিবার এই অধিকার—এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারি না। আপনারা আমার সহায় হউন !

বর্ত্তমান বৎসরে আমরা আমাদের দুইজন সমাজ নেতাকে হারাইয়াছি। সম্মিলনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সাক্ষীগোপাল বড়াল ও দীননাথ দত্ত মহাশয়দ্বয় পার্থিব সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। এই সম্মিলনের জন্মাবধি তাঁহারা ইহার লালনপালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান, নিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রেম আমাদের আদর্শ হউক ! আজ আমরা তাঁহাদের স্বর্গগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

আজ যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগকে সম্বোধন করিতেছি, সেই মেদিনীপুরের গৌরবময় অতীত ইতিহাস রহিয়াছে—এই জেলার প্রাচীন বন্দর, ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত—রূপনারায়ণের উত্তাল তরঙ্গময় বারিরাশি ইহারই পাদদেশে প্রবাহিত। পণ্যসম্ভারপূর্ণ শতশত বাণিজ্যতরী ইহারই বন্দরে যাতায়াত করিত। মালয়, জাভা, সিংহল প্রভৃতি দ্বীপে বাঙ্গালী বণিক্‌গণ এখান হইতে বাণিজ্যে গমনাগমন করিতেন। ধনপতি সদাগর এখান হইতে সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারই পূজিতা সর্ব্বশক্তিময়ী জননী "বর্গভীমা" আজও এই স্থানে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তন্ত্রে পুরাণে এই প্রদেশ সুপবিত্র তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে চৈনিক পরিব্রাজক, ফা-হিয়ান্ ও হুয়েন সাং এই সহরের গৌরব ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মঠে, মন্দিরে, দেউলে পরিপূর্ণা, কংশাবতীতটশোভিতা এই মেদিনী-ভূমি বৈশ্যগণের পরম তীর্থ—আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের পদরজঃপূত এই দেশকে বারংবার নমস্কার করিতেছি। বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান, বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যের আকর,—বৈশ্যত্বের প্রকটমূর্ত্তি—এই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আবার বাঙ্গালার গৌরবময় দিনকে স্মরণ করিতেছি !

এই পবিত্র ভূমিতে এক বৎসর অন্তে নিখিল বঙ্গের সুবর্ণবণিক্‌গণ সমাজসেবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া আবার সমবেত হইয়াছেন। আমরা চাই—এক বিরাট্ জাতীয় ঐক্য—আমরা চাই এক প্রাণময়ী সঙ্ঘশক্তি ! আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায়, সাধনায়,—ধ্যান ও চিন্তায় এক হইতে। এই উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে স্বজাতি-সম্মিলনের আয়োজন হয়। পরস্পর চিন্তা ও ভাব বিনিময় দ্বারা সমগ্র সুবর্ণবণিক্ সমাজের পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করা হয়। এই গুলিই সম্মিলনের গৃহীত প্রস্তাব। সমাজের সকলকেই এই প্রস্তাব মত কার্য্য করিতেই হইবে—এইরূপ নৈতিক বাধ্যতা আছে। এতদিন সুবর্ণবণিক্ সম্মিলন হইয়া আসিতেছে—অনেক বাহবাস্ফোট, অনেক চুলচেরা যুক্তি, তর্ক, অনেক ওজস্বিনী বক্তৃতা, অনেক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু কার্য্য আশাপ্রদ হয় নাই। কেন হয় নাই ? তাহার কারণ, আমরা ধারণা করিতে পারি নাই—যে সভাস্থলে পরিগৃহীত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের মন এমনি মোহে, অজ্ঞানে ও জড়তায় পূর্ণ যে, নৈতিক বাধ্যতা বলিয়া কোন বস্তু স্বীকার করি নাই—বিবেকের অনুশাসন মানি নাই। কেহ কেহ—অহঙ্কারে ও অজ্ঞানতাবশে সমস্ত বিষয়ে উদাসীন ছিলেন—বা সময় বিশেষে নিজেদের গৃহীত সংকল্প মানেন নাই। আর কেহ কেহ বড়দের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিলেন। তাই পূর্ব্বে পূর্ব্বে সম্মিলনে আশানুরূপ কাজ হয় নাই। বড়দিনের জলসা—বা শুধু তর্কসভায় পরিণত হইয়াছে। এজন্য দোষী সবাই। কিন্তু এরূপ আত্মপ্রতারণা আর চলিবে না। আমাদের মধ্যে এক্ষণে কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে—হে সমাজসেবক সাড়া দাও। আজ সমাজ বিগ্রহ জাগিয়াছেন—কে আছ পূজারি তোমার অর্ঘ্য লইয়া আইস।

বহুদিন ধরিয়া আলোচনা হইয়া আসিতেছে—সুবর্ণ-

বণিক্ আমরা বৈশ্য। শুধু আলোচনা হয় নাই, সুবর্ণবণিক্ জাতির বৈশ্যত্ব সুপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে যথেষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে—বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ "বণিক্" অর্থে "বৈশ্য" ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না। কোন শাস্ত্রে, কোন অভিধানে অন্যরূপ অর্থ নাই—হইতেও পারে না। কিন্তু শুধু আমরা "বৈশ্য" বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। বৈশ্যের আচার অবলম্বন করিতেই হইবে। বৈশ্যত্বের দাবী করিব কিন্তু বৈশ্যাচার অবলম্বন করিতে বলিলেই পশ্চাৎপদ হইব, এরূপ করিলে চলিবে না। সমগ্র বঙ্গের সুবর্ণবণিক্‌গণ কর্ত্তৃক এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করা চাই। "আচার" অর্থে সম্পূর্ণ দশবিধ সংস্কারই বুঝায়। সুবিধাবাদীর ন্যায় যাহার যতটুকু সুবিধা গ্রহণ করা চলিবে না। সমগ্র সুবর্ণবণিক্ সমাজকে যজ্ঞসূত্ররূপ এই যোগ-সূত্রে "সূত্রে মণিগণা ইব" গ্রথিত করিয়া দেওয়া চাই। অন্য সকল দিক্ ছাড়িয়া দিলেও সঙ্ঘশক্তির দিক্ দিয়া উপবীত গ্রহণের সার্থকতা এইখানে। শুধু নিজ সমাজের মধ্যে নয়, সমগ্র ভারতের বৈশ্য সমাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। ন্যায়ের ফাঁকি যাঁহারা খুঁজিতেছেন—অকারণ ভয়ে যাঁহারা ভীত হইতেছেন, তাঁহাদের ভ্রম শীঘ্রই ভাঙ্গিবে, —ভয় শীঘ্রই ঘুচিবে।

বৈশ্যের বৃত্তি—কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি এক্ষণে অপর জাতিতে গ্রহণ করিয়াছে। রাজা বল্লালের আমলে আমরা নিতান্ত নির্য্যাতিত হইয়াছিলাম, সেদিন বাঙ্গালার বড় দুর্দ্দিন। আমরা বৈশ্যোচিত আচার ত্যাগ করিয়া একে একে আমাদের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বৃত্তিও ত্যাগ করিতেছি। "লক্ষ্মীমন্ত" জাতি লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছে। এক্ষণে ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, গোপালন, কুসীদ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া যাহাতে আমাদের লুপ্ত ঐশ্বর্য্য ফিরাইয়া আনিতে পারি, তাহাই করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে—অন্নসংস্থানের উপায় দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। বাঙ্গালার বাহিরের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা আসিয়া আমাদের বৃত্তিগুলি সব হস্তগত করিয়া লইতেছে। ইংরাজ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি লোকেরা বাঙ্গালার ধনসম্পদ্ নিরন্তর লুণ্ঠন করিতেছে, দেখিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত আছি। আলস্য, বিলাসিতা ও মানসিক এক ভীষণ জড়তায় আমরা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছি! "বণিকের" ছেলেকে যখন চাকুরির জন্য লালায়িত হইতে দেখি, তখনই আমার মনে হয়—আমাদের জাতীয় স্বভাবের বিকৃতি ঘটিয়াছে। আত্মশক্তি হারাইয়া গিয়াছে। এই জড়তা, বিলাসিতা ও মোহ ত্যাগ করিয়া আমাদের বিশিষ্ট সংস্কারকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। চাকুরিকে শূদ্রবৃত্তি-জ্ঞানে পরিহার করিতে হইবে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

ব্যবসাবাণিজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে আমাদের প্রধানতঃ চারিটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

১। শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা
২। যৌথকারবার প্রতিষ্ঠা
৩। ধনিগণের অর্থনিয়োগ
৪। ব্যবসা-কেন্দ্র সংস্থাপন

শিল্পবাণিজ্য এক্ষণে শুধু দেশের মধ্যে রুদ্ধ নহে। সমগ্র সভ্যজগতেই ইহার প্রসার ও কার্য্যক্ষেত্র। সুতরাং শিল্পবাণিজ্যও এক্ষণে বিধিবদ্ধ শিক্ষার বিষয়। দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন ও অন্য দেশ হইতে অর্থ আনয়ন করা একটি বিরাট্ শিক্ষা। সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম্ এ, বি এল্, পি এচ ডি, তাঁহার অভিভাষণে এই সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাক্যগুলি সর্ব্বদা প্রণিধানযোগ্য।

শিল্পবাণিজ্যের শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে অনেকগুলি Technical School, School of Accountancy, Commercial School, কৃষিবিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পুস্তক পাঠ ব্যতীত হাতেকলমে শিক্ষা দিবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা সমাজের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যাঁহারা ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত আছেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ছোট বড় ব্যবসায়ী, তাঁহারা যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে স্বজাতীয়

যুবকগণকে ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যবহারিক জ্ঞান দিবার জন্য শিক্ষানবীশ রূপে নিযুক্ত করেন, তবেই অতি সহজে এই বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইয়া যায়। এইরূপে ব্যবহারিক শিক্ষা পাইলে, তাঁহারাও পরবর্ত্তী কালে শিল্পবাণিজ্যের পরিচালক ও মালিক হইয়া জাতীয় ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিবেন। আধুনিক যুগেও গৃহশিল্প ও কুটির-শিল্পের শক্তি বড় সাধারণ নয়। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন এইরূপ শিল্পের সহায়তায় অন্নের সংস্থান করিতেছে। সুতরাং এ বিষয়েও আমাদিগের অবহিত হইতে হইবে।

শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকল্পে যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা চাই। Co-operative Bankএ মূলধন সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে যৌথকারবার প্রতিষ্ঠা করা অতি সহজ। সঙ্ঘ-শক্তি স্ফুরিত হইলে অতি সামান্য মূলধনও বিরাট্ যৌথ-কারবারের ভিত্তি হইতে পারে। প্রত্যেক সুবর্ণবণিক্ যদি অতি সামান্য অর্থ এইরূপ যৌথকারবারে নিয়োগ করেন, তাহা হইলেও অনেক বড় কাজ হইতে পারে। চাই বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা! সম্মিলনীতে এই বিষয়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছিল। ব্যবসা-সংক্রান্ত সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া অতি সামান্য ভাবে কার্য্যারম্ভ হইলেও স্থায়ী হইল না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপিত না হইলে, বণিক্জাতি বলিয়া আমাদের গৌরব করিবার কিছু থাকে না। মাড়োয়ারীদিগের Chamber of Commerce আছে, আর আমাদের এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নাই। লজ্জার কথা!

ধনিগণকেও ব্যবসাক্ষেত্রে নামিতে হইবে। বিলাসের আরাম শয্যায় শুইয়া থাকিলে চলিবে না। কমলার বর-পুত্রগণ যদি নূতন নূতন শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ে তাঁহাদের অর্থ নিয়োগ করেন, তবে যে শুধু তাঁহারাই লাভবান্ হইবেন তাহা নহে, সমস্ত বঙ্গভূমি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠিবে। যাহারা বেকার তাহাদের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। আমাদের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, একালে যাঁহারা ধনী বলিয়া পরিচিত লোকগত মতিলাল শীল, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকগণ আমাদের আদর্শ হউন।

শিক্ষাই জাতীয় উন্নতির মাপকাঠি! যে সমাজ যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। আমাদের সমাজের উন্নতির জন্য আরও শিক্ষাবিস্তার প্রয়োজন। বাঙ্গালার সেন্‌সাস্ রিপোর্টে সুবর্ণবণিক্ সমাজ শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে গৌরব করিবার কিছুই নাই। আমাদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন লিখিতে পড়িতে জানে। আর ৩০ জন একেবারে নিরক্ষর। নিম্ন-প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত, সকল স্তরেই আমাদের সুবর্ণবণিক্ যুবকগণকে অগ্রণী দেখিতে চাই। সংখ্যায় আরও অধিক দেখিতে চাই। ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে আরও মনোযোগী হউন! দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য, চিত্র, সুকুমার শিল্প সকল বিষয়ে আমাদের সমাজে কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি অধিক হওয়া চাই। সাহিত্যে ও শিল্পে সুবর্ণবণিক্ জাতি আবার গৌরবান্বিত হউক! দরিদ্র শিক্ষার্থিগণের জন্য আরও বিস্তৃত ব্যবস্থার প্রয়োজন! ধনীরা এই স্বজাতীয় দরিদ্র ছাত্রগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে মুক্তহস্ত হউন। প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে এককালীন অর্থদান (Endowment) করিয়া বিনা বেতনে দরিদ্র স্বজাতীয় ছাত্রগণের পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হউন। এরূপ দান পূর্ব্বকালে অনেক ছিল, এখন কি আমরা সেই সকল মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইব? স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য সুবর্ণবণিক্‌বহুল প্রত্যেক স্থানেই এক একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। স্ত্রীশিক্ষার সহিত সামাজিক সর্ব্ববিধ সংস্কারের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমাদের বণিকাদিগকে সমস্ত উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিলে আমরাই পরিণামে প্রতারিত হইব। নূতন চিন্তা, নূতন উদ্দীপনা তাহারা যদি না পায়, তবে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু হইয়া থাকিবে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে, বাল্য-বিবাহ-প্রথা রহিত করিতে হইবে। আদর্শ মাতা, আদর্শ গৃহিণী, যাহাতে হয়,

কথকতা পুজাপার্ব্বণ, ব্রতনিয়ম, এই সকলই পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ীভূত ছিল, গৃহস্থালী, রন্ধনাদি, শিশুপালন, এসমস্ত বিষয় বালিকাগণ পুরবৃদ্ধাগণের নিকট শিক্ষা করিত। আমাদের এই সকল বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। নচেৎ ধর্ম্মবর্জ্জিত ইরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের যুবকসম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, আমাদের স্ত্রীসমাজেও তাহাই হইবে।

সামাজিক ঐক্য সংস্থাপনই আমাদের অপর একটি আলোচ্য বিষয়। কয়েক বৎসর আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন সমাজে বৈবাহিক আদান-প্রদান চলিতেছে। বাঁকুড়া সমাজের সহিত চুঁচুড়া সমাজের বিবাহ কার্য্যই গতবৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এইরূপে বিভিন্ন সমাজের সহিত আমাদের যতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, ততই সমগ্র সুবর্ণবণিক্ জাতির পক্ষে কল্যাণকর। বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইবে, রাক্ষসী পণপ্রথার অত্যাচার ততই কমিবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্বজাতীয়গণের সহিত বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। ইহা দ্বারা সামাজিক দৃঢ় একতা সংস্থাপিত হইবে। আচার ব্যবহারের বৈষম্য, করণকারণের বিভিন্নতা,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তি আমাদের এই একতার অন্তরায়, আমাদের লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। এ দূর করিয়া আচার-ব্যবহারের সাম্যসংস্থাপনের সহিত যোগ রাখিয়া সমিতি স্থাপন করিয়া সমাজের সর্ব্ববিধ ঐক্য স্থাপনে সকলেই যত্নবান্ হউন! এইরূপ প্রত্যেক সমিতি, সেই স্থানের সমাজতন্ত্রের নিয়ামক হইলে ও সম্মিলনীর সহিত যোগ রাখিয়া সম্মিলনীরই ঈপ্সিত কার্য্য সাধন করিলে, বিচ্ছিন্ন সুবর্ণবণিক্ ভ্রাতৃগণকে অচিরেই একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে। আমাদের জাতি এ বিষয়ে একটু অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায় আদানপ্রদানের একটি আদর্শ পদ্ধতি অচিরে সঙ্কলিত হইয়া সকল সমাজের মধ্যে প্রচারিত হইবে, এবং সমস্ত বৈবাহিক আদান-প্রদান সেই নিয়মে সম্পাদিত হইয়া বিরাট্ সামাজিক একতা গড়িয়া উঠিবে। বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের আর একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত বিবেচনা করি। যুবকগণ যতদিন উপার্জ্জনক্ষম না হয়, ততদিন যেন পিতামাতা তাহাদের বিবাহ না দেন। কর্ম্মহীন বেকার যুবকগণের বিবাহ দিয়া আমরা যেন বর্ত্তমান বেকারসমস্যা বাড়াইয়া না তুলি! কেবল উপার্জ্জনক্ষম যুবকদিগের বিবাহ দিবার প্রবর্ত্তন করিলে সমাজে পণপ্রথাও কথঞ্চিৎ নিবারিত হইবে। শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম যুবকমাত্রেই এই জঘন্য ব্যাপারকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করিবে।

কি ঘৃণার্হ প্রথা এই পণগ্রহণ! সুবর্ণবণিক্ সমাজে এই প্রথা পূর্ব্বে ছিল না। আমরা যতই দরিদ্র হইতেছি, ধর্ম্মহীন শিক্ষা যতই বাড়িতেছে, আমরা ততই পরধনে লোভ করিতেছি। একদিকে অর্থলোভ অন্যদিকে কুশিক্ষা, এই দুইটিই পণপ্রথার মূলীভূত কারণ। সুতরাং অর্থসমস্যার সমাধান ও সুশিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই ইহা একেবারে দূরীভূত হইবে। সমগ্র দেশের যুবক-শক্তি জাগ্রত হইতেছে, আমাদের জাতিরও ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল যুবকগণ জাগ্রত হউন। জাতির এ কলঙ্ক দূর করিবার শক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে নিহিত আছে। সুশিক্ষিত হইয়া তাঁহারা জাতির আচার পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। তাহা হইলে এ পণপ্রথার বিরুদ্ধে এত আন্দোলন, পুস্তকপ্রণয়ন ও বক্তৃতার আর প্রয়োজন হইবে না।

সামাজিক জীবনের ক্ষয় নিবারণের জন্য আমাদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ, ক্ষুদ্র মনোমালিন্য স্থানীয় সমিতি বা কেন্দ্র-সমিতির সাহায্যে সালিসী দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইব। এইরূপ বিবাদ বা সম্পত্তি বিভাগ ব্যাপার লইয়া আদালতে দৌড়ান কি পরিতাপের বিষয়! ইহাতে অনর্থক অর্থব্যয় করা কি দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক! এইরূপ মামলামোকদ্দমায় কত সমৃদ্ধ সংসার উৎসন্ন গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘরের কথা পরকে জানিতে দেওয়া মতিমানের কার্য্য নয়।

দেশের ও আমাদিগের জাতির এই দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার দিনে, যখনই দেখি যে এখনও আমরা বিলাসিতার মোহপাশ ছিন্ন করিতে পারি নাই, তখনই আমরা যে কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলেও কষ্ট হয়। সম্মিলনীতে কয়েক বৎসর আলোচনার ফলে, বিবাহে বাহ্যাড়ম্বর বর্জ্জন সম্বন্ধে আমরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, সেই প্রতিজ্ঞা অধিকাংশ স্থলেই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কেবল বিবাহকার্য্যে বাহ্যাড়ম্বর বর্জ্জন করিলেই চলিবে না। আমরা বণিক্; সকল বিষয়েই

আমাদিগকে বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে হইবে। বৈদেশিক চাকচিক্যের মোহে আমারা যেন আমাদিগের স্বাদেশিকতা, স্বাজাত্য না হারাই। গৃহশিল্প, বা বড় বড় কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে দেশে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, দেশ-জননীর সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করিতে হইলে, আমাদিগের জীবনযাত্রার সকল ব্যাপারেই স্বদেশজাত পণ্য ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করিতেই হইবে!

আমরা বৈষ্ণব—শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্ম আমাদের জীবনকে অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে। প্রেম-ভক্তিসাধনে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সুবর্ণবণিকের কুলোজ্জ্বল করিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দের এরূপ করুণালাভ কাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে? সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুশীলন,—বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সংরক্ষণ, দেবালয় ও বৈষ্ণবতীর্থসমূহের সংস্কার—আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা করিলে চলিবে না। আমরা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নই—যে বর্ণাশ্রমের অনুশাসন মানিব না। আমরা গৃহী—সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে আমাদের অবস্থিতি—বর্ণাশ্রমের শাস্ত্রবিধি আমাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। একদিকে আমরা বৈষ্ণব—অন্যদিকে আমরা বৈশ্য। এই উভয় দিক্ রক্ষা করিলেই আমাদের অধ্যাত্মজীবনের পরিশুদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইবে। বৈশ্যাচারের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধ ত নাই-ই, বরং বিষ্ণু পুরাণে দেখিতে পাই—বর্ণাশ্রমের নির্দ্দিষ্ট আচার পালনই বিষ্ণু আরাধনার শ্রেষ্ঠ পন্থা। সুতরাং বৈশ্যাচার ও বৈষ্ণব আচার উভয়ই আমাদের কুলধর্ম্ম। ধর্ম্মসাধনে সমগ্র সুবর্ণবণিক্ সমাজ শক্তিমান্ ও পবিত্র হউক! আমাদের ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তাকল্পে সুশিক্ষিত বেদজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম্মবিদ্ পুরোহিতের প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহাদের জীবিকাঅর্জ্জন ও আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের সৌকর্য্যার্থ পুরোহিতদিগের উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। তাঁহাদের উন্নতিতে আমাদের উন্নতি। যজমান ও পুরোহিতের সুখ, স্বার্থ ও উন্নতি—ওতপ্রোত-ভাবে সম্বদ্ধ।

আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে দেশের ও দশের সেবায় প্রত্যেক সুবর্ণবণিক্‌কে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যে সকল স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ দেশের বর্ত্তমান মহান্ প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগ রাখিয়া, মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, প্রাদেশিক বা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে সভ্যরূপে প্রবেশ করিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করিতে প্রয়াসী হইবেন, আমাদের প্রত্যেকেরই তাঁহা-দিগকে সকল প্রকারে সাহায্য করিতে হইবে।

সম্মিলনীর কেন্দ্রসমিতি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। এই কেন্দ্র-সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। সম্মিলনীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, যাহাতে প্রত্যেক সুবর্ণবণিকের কর্ণে সম্মিলনীর বাণী ধ্বনিত হয়, যাহাতে প্রতি সুবর্ণবণিকের হৃদয়ে সঙ্ঘ-শক্তির অনুভূতি আসে,—সেই জন্যই বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া এই কেন্দ্র-সমিতি গঠিত কিন্তু কেন্দ্র-সমিতির কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে সরলভাবে সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কেন্দ্র-সমিতি এ বৎসর যেরূপ সুন্দর-ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে আশা হয়, বঙ্গের প্রত্যেক সমিতি এই কেন্দ্র-সমিতির সহিত যোগ রাখিয়া কার্য্য করিলে কেন্দ্র-সমিতির প্রচারকার্য্য অচিরে সাফল্যমণ্ডিত হইবে ও সম্মিলনীর মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

শেষ কথা। আমাদের দেশ-জননীর সেবা সুবর্ণবণিক্-গণের প্রথম ও প্রধান কার্য্য। দেশের মঙ্গলেই সমাজের মঙ্গল। দেশের মঙ্গলের জন্য যে সকল আন্দোলন চলিতেছে, তাহার সহিত সম্পূর্ণভাবে যোগ না রাখিলে আমরা লোক-সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হইব। চাই, বিরাট্ অক্ষুণ্ণ জাতীয় স্বাধীনতা। বিধি-প্রবর্ত্তিত উপায়ে অর্থাৎ (constitutional means) ইহা অর্জ্জন করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভিন্ন সমাজের মুক্তি নাই। সর্ব্বং আত্মবশং সুখং, সর্ব্বং পরবশং দুঃখং। সুতরাং চাই সেই স্বরাজ্যসিদ্ধির, সেই মুক্তির আস্বাদ যাহাতে আমরা আবার ধন-ধান্য-ঐশ্বর্য্যময়ী বাঙ্গালার শোভাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নামে আমরা যাহাকে অভিহিত করি, সে সকলই একই জীবনবেদের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র মাত্র, সুতরাং আমাদের সকল

সামাজিক আন্দোলন, সমাজের মঙ্গলের জন্য সকল প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবার পথে যে সকল প্রবল বাধাবিঘ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার কারণ আমাদের পরাধীনতা। "রাজনীতি" কথাটি শুনিলেই ভীত হইলে চলিবে না। এতদিন এই অলীক ভয়ে আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের সমাজকেও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিই নাই। এখন হইতে এ ভ্রম আমাদের সংশোধন করিতে হইবে। আহিমাচল-কুমারিকা আজ জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; সুবর্ণবণিক্‌গণ আর মোহঘুমঘোরে আচ্ছন্ন থাকিবেন না!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত!

তৎপরে আলোচ্য বিষয় নির্ব্বাচক কমিটি গঠনের পর প্রথম দিবসের সভা ভঙ্গ হয়। ১১ই পোষ, তারিখে সকালে ৮টায় ও অপরাহ্ণ ২টায় এই দুইবার সভার অভিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবসমূহ :—

১। সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন ৺দীননাথ দত্ত, ৺সাক্ষীগোপাল বড়াল, ৺রসময় লাহা, ৺উমাকান্ত সেন, ৺সুদামচন্দ্র শীল প্রভৃতি সুবর্ণবণিক্‌গণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হউক। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

২। সভাপতি প্রস্তাব করেন, এই সম্মিলনী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উচ্চপদ ও সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন—(১) ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—পোর্টট্রাষ্টের কমিশনার

(২) শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন—হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান

(৩) শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র—ফ্রান্সের খেতাব ও রৌপ্যপদক প্রাপ্তি

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। সুবর্ণবণিক্ জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য এই সম্মিলনী এই নিয়ম করিতেছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে অন্য প্রথা বর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান প্রথা

—যথা, আশীর্ব্বাদ, গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস ও ফুলশয্যা উভয় পক্ষ পালন করিবেন এবং ব্যবহারিক আদান-প্রদানের বাহুল্য ও অতিরিক্ত ব্যয়-বর্জ্জনার্থ নিম্নলিখিত এই নিয়ম সম্মিলনী প্রচলন করিতেছেন—বিবাহকালে ধান, দূর্ব্বা ও যৎকিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিয়া আশীর্ব্বাদ করা হউক এবং গাত্রহরিদ্রা, অধিবাস ও ফুলশয্যা উপলক্ষে প্রয়োজনীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য, যৎসামান্য দধি, মৎস্য, আশীর্ব্বাদী নৎ, বর-কন্যার ব্যবহারের জন্য যে সকল কাপড়, গহনা ও তৈজসাদি তাহাদিগকে একেবারে দেওয়া হইবে, তাহা ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য পাঠান বন্ধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দে—মেদিনীপুর
সমর্থক—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক—কাঁথি
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ পাল—বিষ্ণুপুর
এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। বিবাহে কন্যাপক্ষ স্বেচ্ছায় কন্যাকে যাহা দিবেন তাহাই গ্রহণ করা হউক। বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে ফুরাণ চুক্তির দ্বারা নগদ টাকা, অলঙ্কার বা অন্য কোন দ্রব্য বরপক্ষের গ্রহণ করা অতিশয় গর্হিত, নিন্দনীয় ও সমাজের অনিষ্টকর সেইজন্য এই সম্মিলনী সকলকে চুক্তিমূলক বিবাহে বরপক্ষের সহিত যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছেন।

এই সম্মিলনী আরও বলিতেছেন যে বিবাহে শোভাযাত্রা বন্ধ করা হউক এবং ইহার ব্যতিক্রম হইলে কেহ বরপক্ষে যোগদান করিবেন না।

বিবাহের বয়স সাধারণতঃ ন্যূনকল্পে বরের পক্ষে ২১ বৎসর এবং কন্যার পক্ষে ১২ বৎসর করা হউক। উপার্জ্জন-ক্ষম না হইলে যুবকগণের বিবাহ করা উচিত নয়।

প্রস্তাবক—কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতা
সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দে—মেদিনীপুর
অনুমোদক— „ বৃন্দাবনচন্দ্র দে „
„ „ জগদীশচন্দ্র সেন—কলিকাতা
এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৫। (ক) জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনার্থ বালক ও বালিকাগণের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, শিল্প, নীতি, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য-

বিষয়ক শিক্ষা এবং যুবকগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও কৃষি, শিল্প, বয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষা বিস্তার করা হইক। সুদূর মফস্বলসমাজে বালকবালিকাগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে কলিকাতা এবং অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু সমাজের বিশেষ সহানুভূতি ও চেষ্টা আবশ্যক।

(খ) সুবর্ণবণিক্গণের পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্ববিধ শিক্ষা এবং ধর্ম্মকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।

(গ) দরিদ্র শিক্ষার্থিগণকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে অর্থভাণ্ডার স্থাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত—কলিকাতা
সমর্থক— „ যতীন্দ্রনাথ দাস—মেদিনীপুর
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর সেন—ঢাকা
„ রামকৃষ্ণ দে—গড়বেতা
„ নৃসিংহপদ দত্ত—কলিকাতা
„ পূর্ণচন্দ্র আঢ্য—চুঁচুড়া

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬। ব্যবসার জন্য আগামী বৎসরের মধ্যে দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হউক; কিরূপ ব্যবসায়ে ঐ টাকা নিয়োজিত করা হইবে, তাহা সম্মিলনীর আগামী অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত—মেদিনীপুর
সমর্থক—শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল—কলিকাতা
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র—যশোহর

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭। স্বজাতীয় ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত অসমর্থ ছাত্রগণের জন্য কলিকাতায় যে সুবর্ণবণিক্ ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে তাহার পরিচালনা ও স্থায়িত্ব বিধান কল্পে এই সম্মিলনী সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। কেন্দ্র-সমিতির দুই জন সদস্য উক্ত ছাত্রাবাসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইবেন।

এই প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় উত্থাপন করিবার পর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ সমর্থন করেন ও গৃহীত হয়।

৮। এই সম্মিলনী পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতেছেন—

(ক) বৈষয়িক কলহ যথাসম্ভব আপোষে বা উপযুক্ত সালিশ দ্বারা মিটাইয়া লওয়া হউক এবং যদি কোন স্থানে কোনও কারণে সামাজিক অপ্রীতি জন্মে ও স্থানীয় লোকের দ্বারা নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে তাহার মীমাংসার ভার কেন্দ্র-সমিতির উপর অর্পণ করা হউক।

(খ) সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচার কল্পে ও জাতীয় ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে হরিসভা স্থাপন ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হউক।

(গ) সুবর্ণবণিক্-কুলোজ্জ্বলকারী শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট সপ্তগ্রামকে জাতীয়-তীর্থ-স্বরূপ গ্রহণ করা হউক এবং দত্তঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে গ্রামে গ্রামে মহোৎসবের আয়োজন করা হউক।

(ঘ) এই আত্মবিস্মৃত সুবর্ণবণিক্ জাতির মধ্যে স্বজাতি-প্রীতির উন্মেষ করিবার জন্য, জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলন একান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়ায় এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে, আমাদিগের পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণ ও বর্ত্তমান স্বজাতিবৃন্দ—সাহিত্য, শিল্প, মনোবিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দান, শিক্ষাবিস্তার, দেবালয় স্থাপন প্রভৃতি যে কোন জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কেন্দ্র-সমিতি কর্ত্তৃক তাহার ইতিহাস সংগ্রহ ও পুস্তকাকারে প্রচার করা হউক।

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৯। সুবর্ণবণিক্গণ বৈশ্যবর্ণোচিত কুলসম্মান রক্ষা করুন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য—(চুঁচুড়া)
সমর্থক—শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়—(ঐ)
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত—(ঐ)

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১০। সভাপতি প্রস্তাব করেন যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সাধারণ জনহিতকর অনুষ্ঠানের সদস্য হইবার জন্য প্রত্যেক যোগ্য সুবর্ণবণিকের চেষ্টা করা উচিত এবং প্রত্যেক সুবর্ণবণিকের সে কার্য্যে সহায়তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১১। কেন্দ্র-সমিতির নিয়মাবলী আবশ্যক মত পরি-

বর্ত্তন ও সংশোধন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রস্তাব করেন যে কেন্দ্র-সমিতির ৮নং নিয়ম যে, "মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা মহাশয় কেন্দ্র-সমিতির স্থায়ী সভাপতি থাকিবেন,"—এই নিয়ম তুলিয়া দেওয়া হউক; কারণ কংগ্রেস বা অন্যান্য সভায় যিনি বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি হন, তিনিই পরবর্ত্তী বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি থাকেন, আমাদের এখানেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হউক।

যখন সভাপতি জিজ্ঞাসা করেন যে এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে কি না, তখন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দত্ত বলেন যে, এতদিন ধরিয়া যখন মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা মহোদয় কেন্দ্র-সমিতির স্থায়ী সভাপতি রহিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান সম্মিলনীতে তাঁহাকে সেই পদে না রাখা যুক্তিযুক্ত নহে, দ্বিতীয়তঃ এই সম্মিলনীক্ষেত্রে যখন অনেক স্বজাতি ভ্রাতা মতদ্বৈধ হেতু সভা ত্যাগ করিয়াছেন, তখন এই স্থায়ী সভাপতি পরিবর্ত্তনরূপ কলঙ্ক আপনারা মেদিনীপুরের স্কন্ধে অর্পণ করিবেন না। যদি একান্তই পরিবর্ত্তন করা দরকার হয়, তবে অন্য স্থানে অন্য সম্মিলনীর অধিবেশনে করিবেন—ইহাই মেদিনীপুর বাসীর পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন। তৃতীয়তঃ, রাজা বাহাদুর যখন এই সম্মিলনীর অধিবেশনে আপত্তি করিয়াছেন, তখন যদি তাঁহাকে সভাপতির পদে না রাখা হয়, তবে সাধারণ লোকেও বলিবে যে, ইহা বিদ্বেষবশতঃই করা হইয়াছে, সুতরাং সমবেত স্বজাতিনারায়ণগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, এই নিয়ম যেমন আছে, তেমনই থাকুক।

সুতরাং প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল পুনরায় কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

১২। এই সম্মিলনী স্বজাতি মাত্রকেই স্বদেশজাত বস্ত্র ও শিল্প দ্রব্যাদির ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস
সমর্থক— „ সুরেন্দ্রনাথ আঢ্য
অনুমোদক—„ বলাইচাঁদ দত্ত
„ „ গিরিশচন্দ্র দে—বাঁকুড়া

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৩। কেন্দ্র-সমিতির উদ্যোগে বিধবা ও দুঃস্থ পরিবার-বর্গের সাহায্য-কল্পে কুটির-শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ লাহা—চেতলা
সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র দত্ত—খুলনা
„ „ কৃষ্ণকিশোর সেন—ঢাকা

১৪। কেন্দ্র-সমিতির পরিচালনাধীনে প্রতি সুবর্ণবণিক্ বহুল স্থানে সুবর্ণবণিক্ যুবক-সঙ্ঘ স্থাপিত হউক এবং প্রতি-বৎসর সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সহিত বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ যুবক সম্মিলনীর অধিবেশন হউক। এই অধিবেশনের ব্যবস্থা কেন্দ্র-সমিতি করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচাঁদ বড়াল
সমর্থক— „ যতীন্দ্রনাথ আঢ্য—মেদিনীপুর
অনুমোদক—„ হরিমোহন পাল—(চুঁচুড়া)
„ রাসবিহারী দে—বিষ্ণুপুর
„ বলাইচাঁদ দত্ত

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে সমাগত সুবর্ণবণিক্গণকে ও মেদিনীপুরবাসীকে ধন্যবাদ প্রদানের পর বিদায় সঙ্গীত গীত হইয়া সভার অধিবেশন শেষ হয়।

প্রেরিত পত্র*

(১)

মাননীয় সুবর্ণবণিক্ সমাচার সম্পাদক
সমীপেষু

মহাশয়,

আমি বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর আরম্ভ হইতেই প্রায় সমস্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া আসিতেছিলাম এবং ইহার ক্রমিক উন্নতি অবলোকন করিয়া স্বজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে বড়ই আশান্বিত হইয়াছিলাম। সম্মিলনীর গত ত্রয়োদশ অধিবেশনে কলিকাতার সভায় যেরূপ উৎসাহ দেখিয়াছিলাম তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতির মধ্যে আরও উন্নতিমূলক অনুষ্ঠানের সূচনা হইবে। কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে কুক্ষণে উপবীত আন্দোলন আরব্ধ হইয়া ছিল এবং তাহার বিষময় ফলে জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। এবারকার সম্মিলনীতে যে গোলযোগ হইবে তাহার আভাষ পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন্দ্র-সমিতির কয়েকজন সদস্য নিজেদের জেদ বজায় রাখিবার জন্য যে সমস্ত অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে এবং সম্মিলনী সভার প্রারম্ভে অযোধ্যাবাবুর বক্তৃতায় সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে। এই হেয় ব্যাপারের প্রতিবাদ স্বরূপ কলিকাতা এবং মফস্বলবাসী অনেকে সভা ত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন এই ব্যাপারের কথঞ্চিৎ আভাষ গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের "দৈনিক বসুমতী" পত্রে প্রকাশ করেন এবং তাহার উত্তরে যশোহরের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে ও কলিকাতার কেহ কেহ প্রতিবাদ করেন এবং তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, প্রতিবাদকারিগণের সংখ্যা ৪০।৫০ জনের উর্দ্ধ হইবে না এবং সভার অধিকাংশ লোক প্রতিবাদের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। উপেন্দ্রবাবুকে এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে, দৈনিক সংবাদ পত্রাদিতে এ সমস্ত আলোচনা প্রকাশ করিয়া জাতির কলঙ্কের মাত্রা তিনি বাড়াইতে চান না। কিন্তু আমি কর্ত্তব্যবোধে উহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি আমার পত্রখানি অবিকল মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন।

১। অশ্বিনীবাবু, নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এবারকার সম্মিলনীর মত সাফল্য কোনও অধিবেশনে দেখা যায় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি সাফল্য কোন্ দিকে, উন্নতির দিকে না অবনতির দিকে? তাঁহারা কি অবগত আছেন যে, এবার কলিকাতা হইতে আগত সদস্যগণকে কিরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখা হইয়াছিল? তাঁহারা কলিকাতা সমাজের সভ্য কিনা, এবং কোন তরফের লোক, ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। অশ্বিনীবাবু কি বলিতে পারেন যে কোন সম্মিলনীতে তিনি রাত্রে অন্নাহারের ব্যবস্থা দেখিয়াছেন এবং পূর্ব্বরাত্রে একাদশী জানিয়াও উপবাসী ব্যক্তিগণের জন্য বিহিত ব্যবস্থা করা হয় নাই?

২। তাঁহারা কি অবগত আছেন যে, তমলুক হইতে যে ৫০।৬০ জন সদস্য আসিয়াছিলেন তাঁহারা সদস্যনিবাসে ছিলেন না জানিয়াও তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই?

৩। কলিকাতা হইতে আগত শান্তি ক্লাবের সভ্যগণ সকলেই এবং আরও অনেকে মেদিনীপুরে উপস্থিতির রাত্রে সদস্যনিবাসে বন্দোবস্তের অভাবে অন্যত্র আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

৪। মেদিনীপুর টাউন স্কুলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঐ রাত্রে অভুক্ত ছিলেন অথবা বাজার হইতে খাদ্যাদি আনাইয়া আহার করিয়াছিলেন। একথা উপেন্দ্র-

* মতামতের জন্য সম্পাদক, মুদ্রাকর বা প্রকাশক দায়ী নহেন।

বাবু রাত্রি প্রায় ১১টার সময় অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র পাল মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, লোকের সংখ্যা আশাতীত হওয়ায় ঐরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অধিবেশনের প্রথম দিবস প্রাতে প্রায় দশটার সময় কলিকাতা সমাজের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সভ্য শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক সমাগত সমস্ত সদস্যগণের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য লইয়া গণনা করিয়া জানান যে সদস্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন শত মাত্র। এই সংখ্যাকে কি আশাতীত বলিয়া ধরিতে হইবে? আমার ধারণা মণিমোহন বাবুর নিকট সেই তালিকা এখনও আছে।

৫। মণিবাবু সম্মিলনীর একজন অকপট শুভানুধ্যায়ী, সুতরাং তিনি যে সম্মিলনীকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন তাহাতে সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি সত্যের অপলাপ করিবেন ইহা তাঁহার নিকট হইতে আমরা আশা করি না। কাহার বা কাহাদিগের অবিবেচনার ফলে যে কতকগুলি লোককে বাধ্য হইয়া সভা ত্যাগ করিতে হইল তাহার কারণানুসন্ধান বা প্রতীকার চেষ্টা না করিয়াই তিনি (অশ্বিনীবাবু) ঐ বিষয়টী ধামা চাপা দিয়া লোকের নিকট জাহির করিলেন মাত্র কয়েকজন যাঁহাদের সংখ্যা ৫০ জনের ঊর্দ্ধ হইবে না সভা ত্যাগ করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি ইহাই কি আমাদের সম্মিলনীর উদ্দেশ্য? অবশ্য তিনি বলিতে পারেন যে, তাঁহারা কয়েকজন সভার পর আসিয়া পুনরায় সকলকে ফিরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমার সম্মুখে উপেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে তাঁহার ব্যক্তিগত কোন অনুযোগের কারণ নাই, তমলুকবাসিগণের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি সভা ত্যাগ করিয়াছেন এবং তমলুকের সদস্যগণকে সভায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে বলেন। অবশ্য মেদিনীপুর সহরবাসী সভ্যগণের পক্ষ হইতে মিটমাটের পক্ষে কয়েকটী সর্ত্ত দেওয়া হয় কিন্তু যে বাড়ীতে তমলুকের সদস্যগণ ছিলেন সেখানে উপেন্দ্রবাবুর পরামর্শ সত্ত্বেও কেন একবার যাওয়া হয় নাই তাহা কি অশ্বিনীবাবু আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন?

৬। এবারকার সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যজনক ব্যাপার, "গৌরী সেনে"র টাকায় ব্যয়-নির্ব্বাহ। "রসদ" কলিকাতা হইতে আসিয়াছে"—একথা কেন্দ্রসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয়ের লিখিত পত্র পাঠ করিয়া প্রকাশ্য সভায় অযোধ্যাবাবু দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে মেদিনীপুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের মানমর্য্যাদা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সকলেই বুঝিবেন এবং ইহার জন্য কলিকাতার কোনও স্বজাতি-ধুরন্ধর ভিক্ষাপাত্র হস্তে বড়-লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এত চেষ্টা সত্ত্বেও সদস্যগণের ভাগ্যে রাত্রে অন্নাহার তাহাও উদর পূরিয়া জুটে নাই। অন্যদিকে সভাত্যাগকারী প্রায় তিনশত সদস্যকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ চাপড়ি উপাদেয় ভুরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

৭। পরিশেষে সভাত্যাগকারী সদস্যগণের সংখ্যা সম্বন্ধে দু একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সভাত্যাগের অব্যবহিত পরেই সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন কিন্তু অযোধ্যাবাবু, অপর্ণাবাবু, অনিল রতনবাবু, লক্ষ্মীনারায়ণবাবু প্রভৃতির বিশেষ আগ্রহে তাঁহাদের আতিথ্য স্বীকারে অধিকাংশ রাজী হয়েন এবং অবশিষ্ট সেই সঙ্গেই ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হন। অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি যখন অপরাহ্ণে চাপড়ি মহাশয়ের গৃহে মিটমাট করিতে আসিয়াছিলেন তখন সে বাড়ীতে কেবল কলিকাতার সদস্যগণ ছিলেন, তমলুক ও মেদিনীপুর জেলার সদস্যগণ অপর স্থানে ছিলেন তাহা তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়। এখন তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য তিনি কি বলিবেন যে সেই বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন কেবল তাঁহাদের সংখ্যা ৪০।৫০ জনের ঊর্দ্ধ হইবে না? সভা ত্যাগের পরে বাহিরে একটি সভা করিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু উপেনবাবুর নিষেধে তাহা হয় নাই, পরন্তু সভ্যগণের একটী তালিকা সংগ্রহ ও স্বাক্ষরের ব্যবস্থা হয় এবং তাহার ফলে যতগুলি নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে তাহার তালিকা দিলাম। আশা করি ইহা হইতে প্রকৃত ব্যাপার সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীবসন্তকুমার দে, অধরচন্দ্র দাস, হরিচরণ দে, সতীশ

চন্দ্র দাস, নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, কালীচরণ দত্ত, গোপালচন্দ্র দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ, সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, মাণিকচন্দ্র দাস, অঘোরচন্দ্র দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিনয়ভূষণ দাস, অমরনাথ সিংহ, বিপিনবিহারী দাস, বিপিনবিহারী দে, বামাচরণ দে—তমলুক।

ঈশানচন্দ্র পাণ্ডা (সুবর্ণবণিক্ পুরোহিত), রাজকুমার সিংহ, সুকুমার সিংহ, আশুতোষ দে, প্রবোধচন্দ্র সেতুয়া, বাবুলাল সিংহ, ব্রজেন্দ্রলাল সিংহ, শ্রীপতিচরণ সেতুয়া, কালীপদ সিংহ—প্রতাপপুর।

বলাইচাঁদ সিংহ, তুলসীচরণ সিংহ, শ্যামপদদাস, মিহিরলাল দাস, সতীশচন্দ্র দে, পঞ্চানন দে, যতীন্দ্রনাথ দে, বিষ্ণুপদ দে—ভোড়দহ।

পুলিনবিহারী দে—বাদলা, ঈশানচন্দ্র ধর—কালনা, মধুসূদন দত্ত—কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বর নাথ—কুলিনগ্রাম, ভবানীপ্রসাদ দত্ত—কুন্তি, চিন্তামণি ধর—কালনা।

অভয়চরণ দত্ত—কাশীগড়ি।

যুগলচরণ পাইণ, আনন্দলাল বড়াল, জগবন্ধু সেন, ননীলাল সেন, পুর্ণচন্দ্র পাইন, কেশবলাল সেন, পাঁচুগোপাল সেন, ব্রহ্মমোহন ধর, কার্ত্তিকচন্দ্র সেন, গোপেশ্বর পাল, হারাধন দাস, ভোলানাথ সেন, গোপীবল্লভ চন্দ্র, মন্মথনাথ চন্দ্র—কলিকাতা। ভোলানাথ দে—সাতগাছিয়া, শম্ভুনাথ দত্ত—কুন্তি, বিভূতিভূষণ দে—বর্দ্ধমান টাউন, পাঁচুগোপাল দে, বলাইচাঁদ পাল, ভবানীচরণ শীল—সাতগেছিয়া, ধরণীধর নন্দী, রাসবিহারী দত্ত—কুন্তি, মোহনলাল ধর—বলগনা, নিমাইচরণ মদনমোহন পাইন, কালাচাঁদ দত্ত, মদনমোহন দত্ত—কলিকাতা।

গোপালচন্দ্র সিংহ, বঙ্কিমবিহারী দাস, জগৎপতি দাস, প্রবোধচন্দ্র দে, সীতানাথ দে, হরিচরণ দাস, ধরণীধর সিংহ, রাখালচন্দ্র দে, (বড়) জীবনচন্দ্র দে, ভুবনচন্দ্র দে, বিহারী লাল দাস, হরিচরণ দে, কুমেদাচরণ দাস, গোষ্ঠবিহারী দাস, শীতলচরণ দাস, নগেন্দ্রনাথ সিংহ, কেশবচন্দ্র দে, ভীমচরণ সেন, চিন্তামণি সিংহ, রাজেন্দ্রনাথ সিংহ, হেমচন্দ্র দাস, বিহারীলাল দে—তমলুক।

জন্মেজয় দত্ত সেতুয়া, রজনীকান্ত সেন, সতীশচন্দ্র সেন—

পশুপতি দত্ত, পূর্ণচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শুকদেব দত্ত, পঞ্চুরাম আঢ্য, শরৎচন্দ্র চাপড়ি, উমেশচন্দ্র ধর, মাণিকচন্দ্র দে, সন্তোষচরণ পাইন, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, গোপীবল্লভ দে—মেদিনীপুর।

শ্রীপতিচরণ দাস, শ্রীধরচন্দ্র দাস—প্রয়াগ, পোঃ পুলসিটা বিমলপ্রসাদ সেন, রাজেন্দ্রনাথ সেন, উমেশচন্দ্র সেন, রামচন্দ্র শীল, কানাইলাল শীল, বলাইচাঁদ শীল, হীরালাল শীল, শ্যামাচরণ শীল, হরিচরণ দত্ত, কালিচরণ দত্ত, মাণিকলাল শীল, অনন্তলাল চন্দ্র, প্রফুল্লকুমার শীল, গোরাচাঁদ শীল, মহাদেব চন্দ্র শীল, কমলকৃষ্ণ ধর, আশুতোষ ধর, প্রমোদকুমার ধর—কলিকাতা।

রামপদ সেন, রেণুপদ দত্ত, ললিতমোহন চন্দ্র—চন্দননগর।

উপেন্দ্রনাথ সেন, ভোলানাথ দত্ত, কুলচন্দ্র দত্ত, গৌরমোহন আঢ্য, গোপালচন্দ্র আঢ্য, তারকনাথ সেন, তারকনাথ প্রসাদ ধর, হৃষীকেশ ধর—কলিকাতা।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত—কুমারখালী।

কালীচরণ দে, গদাধর সিংহ, কানাইলাল দত্ত, পার্ব্বতীপুর; যোগেন্দ্রনাথ দে, রজনীকান্ত দত্ত, রাখালচন্দ্র দে (ছোট), জহরলাল দাস, কালীচরণ দে, কানাইলাল দে—তমলুক।

হৃষীকেশ চন্দ্র, নৃসিংহকুমার ধর, দুলালচন্দ্র চন্দ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র সেন, গোপালচন্দ্র সেন, মাণিকলাল সেন, ডাঃ গোপীনাথ চন্দ্র এম্ বি—কলিকাতা।

চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, অযোধ্যানাথ দে, অনিলরতন দত্ত, নরেন্দ্রনাথ দে, রাধানাথ আঢ্য, অপর্ণাচরণ চাপড়ি,—মেদিনীপুর।

যুগলকিশোর শীল, গৌরচন্দ্র চন্দ্র, রাধারমণ চন্দ্র, খগেন্দ্রনাথ সেন, সিদ্ধেশ্বর-চন্দ্র, অঘোরচন্দ্র সেন, রাধাগোবিন্দ দাস, কানাইলাল আঢ্য—চন্দননগর।

নিকুঞ্জবিহারী শীল—চুঁচুড়া।

নবগোপাল সিংহ—কলিকাতা।

প্রফুল্লকুমার দাস—কুমারখালী।

সুবলচন্দ্র দে, গোষ্ঠবিহারী চন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ দে, পূর্ণচন্দ্র দত্ত,

চরণ দে, আশুতোষ পাইন, শম্ভুনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ পাল, অদ্বৈতচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেতুয়া, ফকিরচন্দ্র দত্ত, বিষ্ণুপদ আঢ্য, জ্যোতিন্দ্রনাথ আঢ্য, রাধাকান্ত দত্ত—মেদিনীপুর।

সতীশচন্দ্র দে—বাদলা, নিকুঞ্জবিহারী শীল, রবীন্দ্রনাথ নাগ, বলাইচাঁদ দত্ত—চুঁচুড়া, গোপেশ্বরপ্রসাদ দাস, জীবনকৃষ্ণ দে, কার্ত্তিকচন্দ্র দে, লক্ষ্মীনারায়ণ ধর—কলিকাতা, ধনঞ্জয় দত্ত—ওসমান পুর, বর্দ্ধমান; বিজলীকুমার শীল—বাদলা, ফণিভূষণ আঢ্য কলিকাতা, কেদারনাথ দে, সিদ্ধেশ্বর শীল—সাতগাছিয়া, প্রতাপচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রনাথ দে, প্রমথনাথ দে, যতীন্দ্রনাথ দে, কালীপদ সিংহ, সুরেন্দ্রনাথ দে, ভীমচরণ সেতুয়া, প্রবাসচন্দ্র সেন—রাণীহাটি।

আশুতোষ মল্লিক—কলিকাতা, নগেন্দ্রনাথ আঢ্য—কুটি নগেন্দ্রনাথ দে, ধরণীধর দে—সাতগাছিয়া, প্রসন্নকুমার পাল—কালনা।

দুর্লভচন্দ্র দত্ত, অযোধ্যাপ্রসাদ আঢ্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, অনাথনাথ দাস, শান্তিরঞ্জন দাস, সুধীররঞ্জন দাস, নকুলেশ্বর দাস—কলিকাতা।

তিনকড়ি শীল, শিবচন্দ্র শীল, যশোদানন্দন ধর, হরগোপাল মল্লিক, সূর্য্যকান্ত লাহা, অমরনাথ সেন, মনীন্দ্রনাথ চন্দ্র, মুটবিহারী চন্দ্র, গোবর্দ্ধন চন্দ্র, হৃষীকেশ শীল, হরেকৃষ্ণ শীল, গোপেন্দ্রকুমার চন্দ্র, পাঁচুগোপাল চন্দ্র, রসিকলাল শীল, তিনকড়ি আঢ্য—চন্দননগর।

রাসবিহারী দে, যতীন্দ্রনাথ পাল, পঞ্চানন পাল, গোবিন্দচন্দ্র সেন, গগনচাঁদ দত্ত, হরিদাস আঢ্য, গোপালচন্দ্র পাল, বাদলচাঁদ দত্ত, বৈদ্যনাথ আঢ্য, চারুচন্দ্র নন্দী, ত্রৈলোক্যনাথ আঢ্য, কলিকাতা।

বলাইচাঁদ নন্দী, আশুতোষ দে, সতীশচন্দ্র দে—সাতগাছিয়া, সখারাম সেন—বালী দাওয়ানগঞ্জ, সাগরলাল দত্ত—বাদলা, সন্তোষকুমার দে, বামাপদ দে, লক্ষ্মীনারায়ণ দে—সাতগাছিয়া, অতুলকৃষ্ণ নাথ—কুলিনগ্রাম, সুধীরকুমার পাল, সন্তোষকুমার পাল—চুঁচুড়া, বিধুভূষণ পাল—কালনা, রবীন্দ্র নাথ পাইন—কলিকাতা, রবীন্দ্রনাথ নন্দী—সাতগাছিয়া, তুলসীদাস ধর, বলাইচাঁদ ধর, দেবনারায়ণ ধর—কালনা, বলাইচাঁদ পাল—গোবিন্দপুর। ইতি—

বশম্বদ
শ্রীগৌরমোহন আঢ্য

১৫ মদন দত্ত লেন

(২)

মান্যবর শ্রীযুক্ত সুবর্ণবণিক্ সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

মেদিনীপুর সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর গত অধিবেশনের সভাক্ষেত্রে পুলিশের আবির্ভাব দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনী যে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিলাম। সম্মিলনীর প্রথম দিন সকালে প্রায় ৯টার সময় শুনিলাম যে কলিকাতা, বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বড়াল (ইনি আবার কংগ্রেসের সভ্য এবং খদ্দর ও গান্ধি কেপ পরিধারী) গাড়ী করিয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে যাইতেছেন। তাহার পরেই সম্মিলনীক্ষেত্রে প্রায় ১॥টা ২ টার সময় রেগুলেশান লাঠি হস্তে পুলিশের আবির্ভাব। সভাক্ষেত্রে পুলিশের আবির্ভাবের পর চুঁচুড়া ও বাঁকুড়া নিবাসী দুই চারিজন সভ্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ দে যখন কেন্দ্র সমিতির অবৈধতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেছিলেন তখন তাঁহার প্রতি "বেরিয়ে যাও" প্রভৃতি অসম্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহার প্রতিবাদস্বরূপ মেদিনীপুর, তমলুক, বর্দ্ধমান, খুলনা, যশোহর, কুমারখালি প্রভৃতি জেলার ও কলিকাতার প্রায় চারিশত সভ্য সভা ত্যাগ করেন। সভায় প্রথম দিবসের অধিবেশনের পর, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দে, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে, শ্রীযুক্ত কালঞ্জর মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন সভাত্যাগকারী সভ্যগণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের আবাসে আসিয়া পুনরায় সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন; তাহাতে অযোধ্যাবাবু বলেন যে, মেদিনীপুরবাসী তাঁহার পক্ষীয় ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি রাত্রে জবাব দিবেন। তদনুযায়ী রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় রজনীবাবু, কালঞ্জরবাবু, প্রতাপনারায়ণ বাবু, ত্রৈলোক্যবাবু, শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক প্রভৃতি পুনরায় আগমন করেন। মেদিনীপুরবাসীর তরফ হইতে তাঁহাদিগকে মিটাইবার পক্ষে কয়েকটি সর্ত্ত দেওয়া হয় এবং

সকলের পক্ষ হইতে পুলিশ আনয়নের জন্য দায়ী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বড়ালকে সভা হইতে বাহির করিয়া দিবার প্রস্তাব করা হয়। বলা বাহুল্য মণিমোহন বাবু যিনি সভার তরফ হইতে মিটাইতে আসিয়াছিলেন তিনিও এই গর্হিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং শম্ভুবাবুর অপরাধ অমার্জ্জনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত, সর্ত্তটি গৃহীত না হওয়ায় সভাত্যাগকারী সদস্যগণ সভায় ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই। এই পুলিশ আনা ব্যাপারে মনে হয় যে একা শম্ভুবাবু দায়ী নহেন। কেহ কি অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিবেন ?

১৭ই পৌষ ১৩৩৫ সাল
১৩।১এ, মদন দত্ত লেন

বশম্বদ
শ্রীকুলচন্দ্র দত্ত

---

(৩)

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুবর্ণবণিক্ সমাচার সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

সুবর্ণবণিক্‌গণ বহুদিন যাবৎ আপনাদিগের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছেন এবং সম্প্রতি কলিকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী এক দল উৎসাহী সুবর্ণবণিক্ দ্বিজত্বসূচক উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণে অগ্রণী হইয়াছেন। অপরদিকে এখনও সমাজের অনেক ধীরবুদ্ধি প্রবীণ ব্যক্তি উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। ফলে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বজাতি-বিরোধের সূচনা হইয়াছে।

আমার বিশ্বাস—প্রত্যেক সুবর্ণবণিক্ই হিন্দু সমাজে যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সমুৎসুক ; এবং এ উদ্দেশ্যে যে আন্দোলনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মতভেদের ফলে বিভিন্ন মুখে পরিচালিত না হইয়া অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইলে সে-প্রতিষ্ঠা লাভ সুদূরপরাহত নহে। সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায় নানাবিধ সমাজ-হিতকর অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়েরই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিদ্যানুশীলন করিয়া বিদ্বৎসমাজে সবিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন—এইরূপে সুবর্ণবণিক্‌গণ কার্য্য দ্বারাও সমাজে তাঁহাদের প্রাপ্য স্থান আদায় করিয়া লইতেছেন। কিন্তু সত্বর সিদ্ধি লাভের আশায় তরুণ-প্রধান উপবীতপক্ষীয়গণ যে উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সফল হইবে কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

যদি উপবীতকামীগণ সামাজিক প্রতিষ্ঠায় উদাসীন হইয়া কেবল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রদ্ধাবশতঃ ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় স্বজাতি-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা হিন্দু সমাজভুক্ত বর্ণান্তরের অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াও বৈশ্যোচিত উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন—কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মলিপ্সা পূর্ণ করিতে হইলে সমষ্টিগতভাবে "উপনয়ন-যজ্ঞে" কার্য্য সিদ্ধ হইবে না—শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ে যথাযথ প্রায়শ্চিত্তাদির পর দশবিধসংস্কারের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া বিবাহ-সংস্কারের পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক—যথাযথভাবে উপনয়ন গ্রহণ করিলেও বর্ণান্তরের অনুমোদন না থাকিলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা হইবে না বরং উপবীতধারী সুবর্ণবণিক্‌গণ অন্যান্য জাতির সমধিক বিদ্বেষভাজন হইবেন। অবশ্য শাস্ত্রানুগামী ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ ধর্ম্মরক্ষার জন্য ঐরূপ বিদ্বেষভাজন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন, কিন্তু তাহাতে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ হইবে না।

বর্ত্তমান যুগে উপবীতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। যে সময়ে চারিদিকে উপবীতের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে, সে সময়ে উপবীতের দ্বারা মর্য্যাদা বাড়াইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সুবর্ণবণিক্‌গণ যজ্ঞসূত্র ধারণের জন্য বল ও কালক্ষয় না করিলে একটা জাতিগত পণ্ডশ্রমের অপরাধ হইতে রক্ষা পাইবেন। হয়ত কেহ কেহ মাসান্ত অশৌচের ক্লেশ পরিহার উদ্দেশ্যে উপবীত গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা ত সূত্র ধারণ না করিয়াও তাহার অনুকল্প অনুষ্ঠান দ্বারা বৈশ্যোচিত পঞ্চদশাহ অশৌচ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি সুবর্ণবণিক্‌গণের উপবীত গ্রহণ দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। কতিপয় ব্যক্তি যে

ভাবে এই আন্দোলন চালাইতেছেন তাহাতে ধর্ম্মোন্নতির বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা নাই—এবং স্বজাতি-বিরোধ, অন্যান্য জাতির উপহাস লাভ, অর্থব্যয় এবং বৃথা শ্রমই ইহার প্রত্যক্ষ ফল। ইতি বশম্বদ

শ্রীপরমেশকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

---

(৪)

মাননীয় "সুবর্ণবণিক্-সমাচারের" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,

মহাশয়,

বিগত পৌষ সংখ্যার "সমাচারে" অত্রস্থ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য মহাশয় আমার "বৈশ্যোপনয়ন" নামক প্রবন্ধকে আক্রমণ করিয়া যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করি। বলাই বাবু লিখিয়াছেন "'নিবেদনের' কবি এবং 'বৈশ্যোপনয়ন' প্রবন্ধের লেখকের মধ্যে কতখানি পার্থক্য বর্ত্তমান," এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "শীল মহাশয়ের এই অভূতপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?" পরিবর্ত্তন কিছুই নাই ; বৈশ্যাচার বা বৈশ্য-বৃত্তি প্রচলনের আমি খুব পক্ষপাতী। পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, এখনো তাহাই আছি ; তবে যে এই সকল উপনয়ন-কার্য্যে যোগদান করি না তাহার কারণ নিম্নে লিখিলাম।

(১) কলিকাতা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নগরী এই উপনয়ন-যজ্ঞের পীঠস্থান। পীঠস্থানের পাণ্ডারা অনেকেই চাকুরী-জীবী। উপবীতী ভদ্রসন্তানগণও প্রায় সকলেই চাকুরী করিয়া থাকেন। চাকুরী যে বৈশ্যবৃত্তি নহে ইহা বোধ করি কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। চাকুরী করিব, অথচ উপনয়ন ধারণ করিব, ইহা কিরূপ বৈশ্যাচার পালন বলাই বাবু বুঝাইয়া দিবেন কি ? ইহার ব্যবস্থা কোন্ সংহিতায় আছে ? যদি দেখিতাম, পাণ্ডাগণ চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য-গোপালন-কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ঐ পথে যাইবার জন্য সকলকে ডাকিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে প্রকৃত বৈশ্য বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। চাকুরীর নাম দাসত্ব ; দাস শূদ্রকে কহিয়া থাকে। অন্তরে শূদ্রত্ব ও বাহিরে বৈশ্যত্ব দেখিয়া আমি বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি। অনেক পাণ্ডাকে বলিতে শুনিয়াছি "আজি কালিকার দিনে চাকুরী না করিলে পেট চলে না।" ইহা যদি সত্য হয়, তবে আজি কালিকার দিনে পৈতা না লইলে চলিবে না কেন ? পৈতা লইলে বৈশ্যবৃত্তি পালন করিতে বাধ্য। হিন্দুর জীবন পদে পদে ধর্ম্মের সহিত জড়িত। "কুলাচার" অর্থে "পৈতা ধারণান্তর দাসত্ব করা" ইহা আমি বুঝি না। যে ব্রাহ্মণ উপবীত লইয়া দাসত্বের জন্য লালায়িত, আচার পালন করে না, আমি তাহাকে অনাচারী বলিব। তদ্রূপ যে বৈশ্য উপবীত ধারণ করিয়া দাসত্বের জন্য লালায়িত, বৃত্তিপালন করে না, আমি তাহাকে অনাচারী বলিব। অনাচারীর দলবৃদ্ধি করা উপনয়ন-প্রথার উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্যই লিখিয়াছিলাম। এরূপ ব্রাহ্মণ-সন্তানের আজকাল পৈতা ত্যাগ করাই উচিত। জীবন-ভরণ দাসত্বের দ্বারা করিব, অথচ পৈতা-ধারণ কুলগর্ব্বের জন্য করিব, এরূপ প্রথার আমি অনুমোদন করি না।

(২) আমরা জানি, দ্বিজাতির জীবন তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, তৎপর গার্হস্থ্য, তৎপরে বাণপ্রস্থ। বৈশ্য সন্তানের উপনয়নের বয়স ১২ হইতে ২৪ বৎসর। পুরাকালে উপনয়নের পর সন্তানকে শাস্ত্রশিক্ষার জন্য পিতা গুরুর হস্তে সমর্পণ করিতেন। শিক্ষার পর যুবক বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিত। পঞ্চাশ গত হইলে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিত। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা বোধ করি বলাইবাবু জানেন। কবে বিবাহিত যুবকের এবং বানপ্রস্থা-বলম্বনোপযুক্ত বৃদ্ধের উপনয়ন-ব্যবস্থা কোন্ সংহিতায় আছে, বলাইবাবু আমাকে দেখাইয়া দিবেন কি ? যদি বলেন "আজি কালিকার দিনে ঐরূপ জীবনযাপন সম্ভবপর নহে," তাহার উত্তরে আমি বলি, তবে পূর্ব্বেকার পৈতাটার প্রয়োজন কি ?

(৩) যজ্ঞসূত্রধারী ব্যক্তি যজ্ঞ-কার্য্যের অধিকারী হয়। যজ্ঞ করিতে হইলে বেদ পাঠ ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন। বৈশ্যসন্তান কেহ পূর্ব্বেকার মত "পরিষদে" গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করে না। ইংরাজী শিক্ষা না করিলে, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে না পারিলে, আজকাল পেট চলা দায়। দেশের অবস্থা যখন এই, তখন "যজ্ঞসূত্র" ধারণের প্রয়োজনীয়তা কি ?

ঐ প্রবন্ধের একস্থানে আমার ভুল দেখাইয়া দিয়া বলাইবাবু ভালই করিয়াছেন। মানুষমাত্রেরই ভুল হইয়া থাকে, তবে শ্লেষ বচনটী ব্যবহার না করিলেই ভাল হইত। আমি মিথ্যা যুক্তির দ্বারা মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে প্রাচীন স্মৃতিকার, পরবর্ত্তী স্মৃতিকার, এবং রঘুনন্দের মতে অনেক স্থানে পার্থক্য আছে। তবে কাহাকে মানিব? প্রাচীনকে না নবীনকে? আর সংহিতাকারগণের নামোল্লেখে ভুল হইয়াছিল বটে। প্রাচীন সংহিতাকারগণ,—গোতম, বশিষ্ঠ, বৌধায়ণ এবং আপস্তম্ব। তৎপশ্চাৎ, মনু, তৎপশ্চাৎ —অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ ও শাতাতপ। যে সময় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের সভায় সংস্কৃত সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল, ঐ সময় হইতে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ পঞ্চম হইতে একাদশের মধ্যে স্মৃতিশাস্ত্রগুলিকে নূতন ছাঁচে ঢালা হইল এবং সময়োপযোগী করিয়া নূতন স্মৃতি রচিত হইল। প্রাচীনের গন্ধে অনেক পঙ্ক ঢুকিল। প্রাচীন সংহিতাকারগণের মধ্যে বশিষ্ঠ একজন, তিনি বলিলেন বৈশ্যের ২০ দিনে অশৌচান্ত হইবে। প্রাচীন গৌতমে না কি ১২ দিনের বিধান আছে, কিন্তু সেখানি পাওয়া যায় না। যেখানি আছে তাহাতে ১৫ দিন আছে। পরবর্ত্তী সকলেই বলিয়াছে ১৫ দিন। প্রাচীন মনুও নাই, কাজেই কি ছিল জানি না; তবে যেখানি আছে, তাহা মনুর ছায়ামাত্র; তাহাতেও ১৫ দিন আছে। পরাশরকে আমি পূর্ব্বে প্রাচীন বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" ইতি বাক্য হইতে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সর্ব্বকনিষ্ঠ সংহিতাকার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ সকল কথায় পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দুজাতি চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে সংখ্যায় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, মুসলমান সাত শত বৎসরের মধ্যে প্রায় সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও সাত শত বৎসর পরে আমাদের দশা কি হইবে, বলাইবাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই অন্ন-সমস্যার দিনে পণপ্রথা তুলিবার জন্য একটি বিশেষরূপ চেষ্টা (organized effort) হইল না, পাঁচ দিকে হস্তক্ষেপ করিতেছি। তাহার উপর জীবন-মরণ সমস্যা আসিয়াছে। হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে সমাজবন্ধন কোন্ স্থানে শিথিল করিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। বাল্য-বিবাহ, অবরোধ-প্রথা, জাতিভেদের উচ্ছেদ; শুদ্ধি ও বিধবাবিবাহের বহুল প্রচলন; স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার;—এই সকল গুরুতর বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া, পৈতা লইয়া দলাদলি পাকাইতে কিম্বা পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ ১৫ দিনে করিব কি ৩০ দিনে করিব ইহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিতে আমি নারাজ। সমাজ এইরূপ ভাবে চলিলে কিছুকাল পরে হিন্দুর শ্রাদ্ধ করিবার লোক থাকিবে না!

কেবলমাত্র উপনয়ন ধারণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলেই কি বৈশ্য হওয়া যায়? গায়ত্রীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির সমান অধিকার। তবে উপবীতী হইয়া গায়ত্রী জপ করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না কেন?" চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"—ইহা গীতার উক্তি; সমগ্র স্মৃতি শাস্ত্রেরও তাহাই। বৈশ্যের গুণ বা তপস্যা,—যজন, দান, ও অধ্যয়ন; বৈশ্যের কর্ম্ম,—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুসীদ। এই গুণ ও কর্ম্মের সমন্বয়ের নাম "বৈশ্যাচার"।

আধুনিক ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহাতে কোন দ্বিজাতির যথাশাস্ত্র আচার পালন সম্ভবপর নহে। এই কারণেই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান পালন ক্রমে সংক্ষেপ ও উপেক্ষিত হইয়াছে। যে অনার্য্য জাতি আর্য্যের ধর্ম্মকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, যাহারা অনেক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া থাকে, যাহাদিগের কন্যাগণকে বৈদিকযুগের আর্য্যঋষিরাও পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন, যবনবিদ্ধস্ত ভারতের তদানিন্তন স্বার্থপর সংহিতাকারগণ তাহাদিগের প্রতি যে অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, উহা সংশোধন করিয়া লইবার সময় এখনও আসে নাই কি?

সমস্ত হিন্দুজাতিকে সাম্যমার্গের দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাওয়া এক্ষণে সম্ভবপর না হইলেও, বারবার চেষ্টার ও শিক্ষার ফলে যে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বুদ্ধ, চৈতন্য, কেশব সেন কি আবার আসিতে

পারে না? সমগ্র হিন্দুজাতির না হউক, সমগ্র বণিক্‌জাতির একীভূত হওয়া সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। একতায় শক্তিবৃদ্ধি, ভেদে শক্তির হ্রাস,—ইহা সকলেই জানেন। আমি যাহা বলিয়াছি, কাল দেখিলাম Youth Congressএ সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ও বলিলেন,—"We have to live in the present, and adapt ourselves to modern conditions. * * * We must resist the cry of 'Back to the Vedas' on the one side, and on the other, the meaningless craze for fashion and change of modern Europe." আমি যাহা বলিয়াছি, কাল দেখিলাম Social Conferenceএ জয়াকর মহাশয় বলিলেন,—"Caste-system is a relic of the past, and is now a great handicap on national efforts towards freedom." জাতিগত পার্থক্য এবং বংশগত প্রভেদই যে ভারতকে পরাধীনতা ও অধঃপতনের পথে প্রেরণ করিয়াছে, ইহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন। বলাইবাবু যদি আমার এই মতের সমর্থন না করেন, তবে দুঃখের বিষয় হইলেও, উপায় নাই। আমি আমার স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। ইতি

শীলবাটী, চুঁচুড়া
১২ই পৌষ, ১৩৩৫ সন।

বিনীত
শ্রীনিতাইচাঁদ শীল

তমলুকে প্রস্তাবিত সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী ও কেন্দ্র-সমিতি

নিখিল বঙ্গ সুবর্ণবণিক্‌গণের চতুর্দ্দশ সম্মেলন লইয়া আমাদের স্বল্প-জন-সংখ্যা-সমন্বিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য এবং বৃথা গৃহ-বিচ্ছেদের যে সূত্রপাত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের আত্মকর্ত্তব্য স্থিরীকরণের জন্য বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'এক কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

সুবর্ণবণিক্-সম্প্রদায় ও উপবীতগ্রহণ

উপবীতগ্রহণ ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত সে সম্বন্ধে কোন কথা এখন বলিতে চাই না। তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, আমাদের জাতির বর্ত্তমান অবস্থা, ইহার গন্তব্য স্থান এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার উপায় কি—ইহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। অতীতের পাতিত্য-সম্বলিত ঐতিহাসিক গবেষণায় বৃথা কালাতিপাত বর্ত্তমান সময়ে গন্তব্য পথের সহায়ক বলিয়া অনুমিত হয় না। উপবীত গ্রহণ যদি সামাজিক পাতিত্যের উদ্ধার-তরণী হইত, তাহা হইলে আমাদের পূজনীয় পুরোহিতমণ্ডলীকে সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে পৃথকভাবে থাকিতে হইত না। হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যান্য জাতির মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ত্বের অথবা বৈশ্যত্বের চিহ্নস্বরূপ উপবীতগ্রহণ-আন্দোলনের পরিণাম পরিদর্শন করিয়া আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

সুবর্ণবণিক্-সম্প্রদায় ও মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা

আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রথিতনামা মহাত্মগণ যাহাতে লাঞ্ছিত সুবর্ণবণিক্ জাতি ধীরে ধীরে অতি সাবধানে হিন্দুর মহাজাতি-গণ্ডে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতঃ জাতীয় জীবনের উদ্বোধন সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সুদূর মফস্বলবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। এই শুভক্ষণে সাময়িক উত্তেজনার বশে আত্মহারা হইয়া মরীচিকার অনুসরণ পূর্ব্বক জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে বিঘ্ন আনয়ন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিশেষতঃ ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবনের গতির মাত্রা বিভিন্ন। সেইহেতু, সাময়িক উত্তেজনার

বিষময় ফল হইতে সমাজকে দূরে রাখিবার জন্য আমাদের জাতির কর্ণধারস্বরূপ একনিষ্ঠ সেবক মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয় পরিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সমাজ যাহাতে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়,—তাহারই পক্ষপাতী। প্রত্যেক লোককে তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। কাহাকেও কোন বিষয়ে জোর করিয়া কোন কার্য্য করান, জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। সেই জন্য রাজা বাহাদুর উপনয়ন যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক কর্ত্তৃক আহ্বান-পত্রে স্বাক্ষর করিবার অনুরোধ—"the association of your name will give a very great impetus to the movement and will eventually wipe out the little discord that is now witnessed in our own ranks. * * * * * I shall be highly grateful if you be pleased enough to permit me to issue the invitations as above suggested." পালন করিতে রাজী হন নাই। কারণ তিনি উপবীতী এবং অনুপবীতী সমস্ত সুবর্ণবণিক্‌গণের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। তিনি কলিকাতা সমাজের উপনয়ন-কমিটির মতামত বাহির হইবার পূর্ব্বেই কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে উপনয়ন-আন্দোলন পরিচালনা করিতে নারাজ। আমাদের সভাপতি মহাশয়ের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া মনে হয়, তিনি চান সমস্ত বা অধিকাংশ সুবর্ণবণিক্ জাতির অভিমত অনুযায়ী চলিতে, তাহা পদদলিত করিতে নহে।

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন, কেন্দ্র-সমিতি ও তমলুক-অভ্যর্থনা-সমিতি

সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনীর বিগত ত্রয়োদশ অধিবেশনে স্থির হয় যে, তমলুকে সম্মিলনীর চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইবে। কিন্তু কেন যে তাহা না হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের ঠিক পাঁচ দিন পূর্ব্বে তমলুকে কলেরার অজুহাতে মেদিনীপুর সহরে সম্মিলনীর বৈঠক স্থানান্তরিত করা হইল, তাহা অদ্যাপি প্রহেলিকাপূর্ণ রহিয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে তমলুক মহকুমার সরকারী Death Register দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, ১৭।১২।২৮ তারিখে তমলুক সহরের পার্ব্বতীপুরে মাত্র একজন লোক বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ সহরে যেখানে অত লোকের বাস, সেখানে একটি লোকের মৃত্যুতে যে একেবারে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, তাহা সামান্য মস্তিষ্কের ধারণাতীত; কারণ সহর-বাজারে খোঁজ করিলে দেখা যায় যে, ঐ প্রকার দু'একটা কলেরা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কলিকাতার মতন সহরেও প্রতি মাসে ৫০।৬০টা হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত লোক কলেরায় মারা যায়। যদি ২।১ জন লোকের কলেরায় মৃত্যুকে মহামারী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই অজুহাতে কলিকাতায় কোন সময়েই কোন অনুষ্ঠান হইতে পারিত না। তাহার পর খবর লইয়া জানিলাম যে, তমলুকের স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ সভাপতি-নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের জনমত কেন্দ্র-সমিতি কর্ত্তৃক পদদলিত হওয়ায় এবং তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও যখন তমলুকে কেন্দ্র-সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন করাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া চতুর্দ্দশ অধিবেশনের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন। অবশ্য এই সমস্ত ব্যাপার ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখের মধ্যে হইয়াছিল এবং কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়, যিনি শ্রীযুক্ত গোকুল চাঁদ বড়াল মহাশয় প্রভৃতির সহিত তমলুক অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ১৮ই ডিসেম্বর এক ইস্তাহার জারি করেন, তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন যে, তমলুক-অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাদের ইস্তাহারের বহু পূর্ব্বে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে কেন্দ্র-সমিতির অধিবেশন, অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন ও মেদিনীপুরে সম্মিলনীর স্থান পরিবর্ত্তন

এখন জিজ্ঞাস্য যে, অনুপবীতী যে সমস্ত ভদ্রমহোদয় এই ইস্তাহার স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কি বলা হইয়াছিল যে, স্থানীয় লোকের মতের বিরুদ্ধে এই অধিবেশন

হইতেছে ? ভিতরে ভিতরে এতবড় একটা কাণ্ড হইতে লাগিল, আর সম্পাদক মহাশয় ঘুণাক্ষরে তাহা সাধারণকে জানাইলেন না—অথচ জোর করিয়া তমলুকে সম্মিলনীর অধিবেশনের আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু তমলুকে যে কোন কারণেই হউক, কেন্দ্র-সমিতির চেষ্টা সফল হয় নাই। তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির লিখিত ২।১২।২৮ তারিখের বিনীত নিবেদন সত্ত্বেও, যে কেন্দ্র সমিতির অধিবেশন তমলুকে সময়াভাবে হইয়া উঠে নাই, সেই কেন্দ্র-সমিতির অধিবেশন ১৯।১২।২৮ তারিখে মেদিনীপুরে এক রাত্রে ৬০।৭০ খানা Telegramএর দ্বারা হইয়া গেল। বিসূচিকার প্রকোপ এমন বাড়িয়া গেল যে, এক রাত্রে মেদিনীপুরে নূতন অভ্যর্থনা-সমিতিও গঠিত হইল। যদি Telegramএ কেন্দ্র-সমিতির বৈঠক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা হইয়াছিল ? মফস্বলের সভ্যদের কাছে কতক্ষণে তার পৌঁছায়, এবং কতক্ষণে তাহার উত্তর আসা সম্ভব এসমুদয় একবার যুক্তিপথে আসিয়াছিল কি ? কতজন কেন্দ্র-সমিতির সভ্যের মতে স্থান পরিবর্ত্তন হইল ? এই মত পাইবার পরে না পূর্ব্বে মেদিনীপুরবাসী স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিতে বলা হইয়াছিল ? শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয়ের কলিকাতা হইতে ২০।১২।২৮ তারিখের ইস্তাহারে জানা যায়, তাহার পূর্ব্ব দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মেদিনীপুরে এক সভায় সম্মিলনীর অধিবেশন তমলুকে না হইয়া মেদিনীপুরে হইবে—ইহা স্থির হয়। অবশ্য ইহার আপত্তিও হইয়াছিল ; যাহা হউক মেদিনীপুর সহরনিবাসী স্বজাতীয় কতকগুলি ভ্রাতৃবৃন্দকে স্থান-পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা কে দিয়াছিল ? আমি জানি কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের তার কলিকাতাতে ১৯।১২।২৮ তারিখে বিকাল বেলায় পৌঁছায়। মফস্বলের সভ্যদের কাছে কখন পৌঁছিয়াছিল, তাহা তাঁহারাই জানেন। অবশ্য রাত্রি ৮টার মধ্যে সমস্ত জায়গায় খবর পাওয়া অসম্ভব, কাজে কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, অধিবেশনের স্থান-পরিবর্ত্তন করা কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অনেকটা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী হইয়াছিল।

কেন্দ্র-সমিতির-বিশেষ অধিবেশনের জন্য তমলুক-বাসীর প্রার্থনা ও কেন্দ্রসমিতির সম্পাদক মহাশয়ের উপেক্ষা

তমলুকের ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অনুসন্ধানে জানা যায়, তাঁহারা কেন্দ্র-সমিতির ২।১২।২৮ তারিখের কলিকাতা বৈঠকে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ স্থানসমূহের উপবীতী সভ্যগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া সম্পাদক মহাশয়কে মিটমাট করিয়া যাহাতে সুশৃঙ্খলায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য তমলুকে কেন্দ্র-সমিতির একটি অধিবেশনের জন্য অনুরোধ করেন ; "* * * পরিশেষে আমাদের সমস্ত স্বজাতিবৃন্দের পক্ষ হইতে আবার অনুরোধ করিতেছি, আপনারা পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া তমলুকে কেন্দ্র-সমিতির একটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করুন, সমস্ত মনোমালিন্য ঘুচিয়া যাইবে। এখানকার প্রতিনিধিগণকে বুঝাইয়া যাহাকেই সভাপতি করুন, আমাদের কোন আপত্তি থাকিবে না। সমগ্র তমলুকবাসী আপনাদের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ রহিয়াছে। আশা করি, আমাদিগকে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বজন-সেবার অবসর দান করিয়া চিরকৃতার্থ করিবেন * * *।" তাঁহাদের এ সাগ্রহ প্রার্থনাকে কেন অগ্রাহ্য করা হইল ? যখন তমলুক অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে, "যাহাকেই সভাপতি করুন আমাদের কোন আপত্তি থাকিবে না"—এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা হইয়াছে, তখন কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতি পদের কোন আশঙ্কা ছিল না। তবে কেন তিনি একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিলেন না ?

তমলুক-অধিবেশনের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণে কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদকের কার্য্য

এই বিষয়ে কেন্দ্র-সমিতির স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ও, যাহাতে তমলুকবাসীদিগের সহিত মতান্তর হইয়া বাৎসরিক অধিবেশনে মনোমালিন্য না হয়, সেই মর্ম্মে সম্পাদক মহাশয়কে বারংবার

তমলুকের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দে মহাশয় কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে ৫।১২।২৮ তারিখে অধিবেশনের আহ্বান প্রত্যাহার করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবু সভাপতি মহাশয়কে তাহা না জানাইয়া ৬।১২।২৮ তারিখে অপরাহ্ণে তাঁহাকে একখানি পত্র পাঠান। তাহার মর্ম্ম এই যে, রাজা বাহাদুর সম্পাদককে ভার দিন যে, তিনি সভাপতি মহাশয়ের নামে সারা বাঙ্গালা দেশের সুবর্ণবণিক্-ভ্রাতৃবৃন্দকে তমলুকে যাইবার অনুরোধ করিবেন। এই অনুরোধ পত্রের খসড়াও ঐ পত্রের সহিত ছিল। এবং ইহার শেষে লেখা ছিল—"I should very much like to print the notice in the course of the day so that I can despatch them by post to the various places this evening." এইখানে বলা আবশ্যক যে, কেন্দ্র সমিতির ২।১২।২৮ তারিখের বৈঠকে চতুর্দ্দশ অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহ বিবেচিত হয় এবং তৎপর দিবসই তাহার ছাপান রিপোর্ট বিলি করা হয়। মাঝে তিন দিন চলিয়া গেল; ৪র্থ দিন বৈকালে হঠাৎ সভাপতি মহাশয়ের নামে নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করিবার প্রয়োজন হইল কেন? অথচ ১৬।১২।২৮ তারিখে সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং এক ইস্তাহারে সকলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তমলুকে অধিবেশন হইবে! বোধ হয় বিহারী বাবুর প্রত্যাহার পত্রের পর সভাপতির নামে নিমন্ত্রণ পাঠান আবশ্যক বোধ হইয়াছিল; তাই সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন, "Needless for me to say that the attendance at the conference will be a record one if the intimation be issued under your signature and its success will be a unique one."

তমলুকবাসীর আহ্বান প্রত্যাহার ও কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদকের কার্য্য

যেখানে স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে যাইতে বলা হইতেছে সেইখানকার লোকেরা লিখিল, "এইরূপভাবে কথার ও

আশঙ্কায় অভ্যর্থনা-সমিতি আগামী সম্মিলনীর আহ্বান প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন।" অর্থাৎ যাহাদের বাড়ী যাওয়া হইবে তাহারা বলিল, "আপনারা আসিবেন না।" আমরা কিন্তু কোন কথা শুনিব না—তমলুকবাসীর ইচ্ছা না থাকিলেও জোর করিয়া তথায় সম্মিলনী করিব, কাহার সাধ্য তাহাতে বাধা দেয়—এইরূপভাব চলিতে লাগিল।

উক্ত প্রত্যাহার পত্রের একখণ্ড নকল সভাপতি মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বে আসিয়া পড়ায় তিনি ৭।১২।২৮ তারিখে সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলেন যে, "* * * in consideration of the views expressed in the letter of Babu Behari Lal Dey, Chairman, Reception Committee, Tamluk, a copy of which reached me yesterday, I would think it desirable not to proceed in the matter in the way suggested by you as they have declined to hold the conference owing to reasons mentioned therein."

ইহার উত্তরে সম্পাদক মহাশয় এক পত্র লিখিলেন, তাহার একাংশ এই—"... ... ...Will it be for the good of the conference and our community to bow down to the whims of a few members of the Tamluk Reception Committee? * * * The conference has got to be held and held at Tamluk as settled by the last Conference and the Kendra Samity. If necessary a new Reception Committee will have to be formed............Why should we refrain from proceeding with the Conference simply on account of the whim of the Chairman, Reception Committee............"

সভাপতি মহাশয় সম্পাদকের এইরূপ অভাবনীয় জিদ্ দেখিয়া একখানি পত্রে লিখিলেন যে—

"When the letter has been signed by the

should be presumed that he has communicated the voice of the majority and not the views of a whimsical minority.

I was given to understand by the representatives of the Tamluk Reception Committee in the morning of 3-12-28 that the Kendra Samity which met at Midnapur on 11-11-28 decided to elect one of the four gentlemen named in the meeting as Chairman for the Tamaluk Conference but they were greatly disappointed to see that a gentleman whose name was not mentioned in connection with Presidentship at Midnapur meeting elected Chairman. It is for these reasons that the representatives of the Tamluk Reception Committee as they told me remained neutral and did not take part in the proceedings. So the resolutions passed after the declaration of their neutrality may not be taken as binding on them, specially when they declared that an emergent meeting of the Kendra Samity should be called at Tamluk to decide the issue, as the Kendra Samity was thrusting on them a President whom they were not authorised to accept. When the Tamluk representatives left Calcutta under protest, you instead of hastily issuing notices should have waited for further news from them. Behari Babu did not make an unusual delay, as a copy of his letter reached me on the 6th instant.

It would be rather inadvisable to forcibly hold the conference at Tamluk against the wishes of the local people. We should therefore wait for further developments. It would not be harmful if the conference be postponed pending an amicable and satisfactory settlement."

কেন্দ্র-সমিতির সভাপতির প্রতি সম্পাদকের আচরণ

ইহার উত্তরে সম্পাদক মহাশয় ১১।১২।২৮ তারিখে কতকগুলি লোকের উপর দোষারোপ করিয়া এবং কেন্দ্র-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিয়া এক পত্র লিখেন। তাহার অংশবিশেষ এই—

"I am sorry to find that the Tamluk representatives misinformed you as to what took place at Midnapur on 11. 11. 28.

At the importunate request of Sj Upendra Nath Sen they did not vote during the election of the President.

The whole thing has been misrepresented to you from top to bottom and it is regrettable that you should advise us to adopt a particular line of action without learning the true state of things.

On the pretext of making some purchase in the bazar, they (Tamluk representatives) left Gocool Babu's house in the morning promising that they would go to Chinsurah either in the forenoon or in the afternoon. But instead of doing so, it was found that they closeted for the next two days with Sj Upendra Nath Sen and Sj Kartic Charan Mullick. The conduct of these gentlemen from Tamluk was not at all commendable............

Everything seems to ha...

hole and corner fashion and out of some motive."

ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় নিজের গুরুদায়িত্ব অনুযায়ী কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন—

"As regards the Tamluk Conference, I should like to point out that the meetings of the Kendra Samity held on 11-12-28 on a short notice of 4 days was in violation of rule 17 of the Subarnabanik Kendra Samity which clearly states that the Secretary can ordinarily call a meeting on a fortnight's notice and in case of emergency he may call a meeting on a week's notice, but you issued a notice on 7-12-28 calling two meetings of the Kendra Samity one at Khagra on 9-12-28 and another at Calcutta on 11-12-28. This hasty procedure on the part of the Secretary of the Kendra Samity deprived the members of the Mofussil residing at a distance from Calcutta of the privilege of taking part in the deliberations of the Kendra Samity, as many had received notices after the meeting was over. Moreover, this presistent violation of the rule of the Kendra Samity by the Secretary himself may lead others to think that the work of the Samity is being carried on party lines and that the All-Bengal Kendra Samity is being slowly converted into a tame affair of some of the members of Calcutta and its neighbourhood. It is for keeping the Executive of the Kendra Samity immune from such very likely probabilities that I advised you to avoid haste and hurry as rule 3 of the Bangiya Subarnabanik Sammilani states in unambiguous terms that for special reasons, the Kendra Samity has the power to change the time and place of the Annual Conference.

The letters of the President, Reception Committee, Tamluk, dated 5-12-28 and 10-12-28 clearly show that there has been some misunderstanding between the Kendra Samity and the Reception Committee, for which the latter refuses to hold the conference at Tamluk now. It is for these reasons that I communicated to the Secretary of the Kendra Samity in my letter dated 8-12-28 to postpone the conference pending amicable and satisfactory settlement so that there may not be any breach and party faction in a limited minority community like ours specially at a time when all the resources of the community should be consolidated and put together in order to regain our lost position. I think I did not overstep my limit as the permanent President of the Sammilani in communicating to my honourable colleagues and co-workers what I consider proper in the best interest of the community.

As regards the issuing of invitations I should like to draw your attention to rule 5 of the Bangiya Subarnabanik Sammillani which states in unequivocal language that সম্মিলনীর অধিবেশনের সমস্ত ব্যাপারের কার্য্য, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামবাসী সুবর্ণবণিক্‌দিগের নিমন্ত্রণ করিবার ভার ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়ভার উক্ত অভ্যর্থনা-সমিতি বহন করিবে।

This shows that it is not the business of the Secretary of the Kendra Samity to issue invitations for the Annual Conference. So I think I did not go beyond my limit when I declined to violate the rule of the Sammilani. As regards the personal reflections in your letter, the less said the better. You admit in your letter that the Tamluk representatives had to get out of Gokul Babu's house on some pretext. This proves that they were there much against their will. Was it not proper for you to inform me of the anomalous affair without any loss of time, specially after receiving my letter advising you to wait and see. I heard from them and informed you the result of the conversation so that you might not be misled.

In conclusion, I should like to point out to you that I do not like that presistent violation of rules should give others opportunity to say that the work of the Kendra Samity of which you are the Secretary seems to have been done 'in a hole and corner fashion and out of some motive'. I would once again request you and the members of the Kendra Samity to come to a satisfactory settlement with our brethern of Tamluk, and if necessary postpone the conference for the present."

বলা বাহুল্য, ইহার উত্তরে সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে যে পত্র দেন, তাহা নিতান্ত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। সেই পত্রের (১৪।১২।২৮) মধ্য হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।...........Probably you did not comprehend the meaning of the word 'persistent' when you used it............

As regards the propriety or otherwise of the said remarks of yours quoted, I already gave you my mind in my letter to you dated 11th instant.......So long as my action is approved by the Kendra Samity, it is perfectly immaterial to me whatever any individual member, nay even its President, thinks of my action..........

I do not think, I need say or write anything further on your letter under reply. If you kindly peruse it carefully with your letter to me dated the 14th instant, I have absolutely no doubt in my mind that the hollowness of your conclusion cannot but be apparent to you."

কেন্দ্র-সমিতির কোন উপবীতী ভদ্রলোক এই পত্র পড়িয়া বলিয়াছেন যে, সম্পাদক মহাশয় যে এরূপভাবে সভাপতি মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন না। তাই সম্পাদকের কার্য্য অনুমোদনের পক্ষে তিনি হাত তুলিয়াছিলেন, নতুবা তিনি উহার বিপরীত করিতেন।

সভাপতি মহাশয় সহি করিলেন না দেখিয়া বোধ হয় কলিকাতার অন্য গণ্যমান্য কয়েকজন ভদ্রলোকের স্বাক্ষর করাইয়া ইস্তাহার জারি অর্থাৎ স্থানীয় লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার বাড়ী যাইবার ব্যবস্থা এবং তাহার পর হালে পানি না পাইয়া তমলুকে মাত্র একটি লোকের মৃত্যুতে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়া, তৎক্ষণাৎ পট-পরিবর্ত্তন এবং মেদিনীপুরে সম্মিলনীর আয়োজন। এ বিষয়ে আরও অনেক রহস্য আছে, ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, কেন্দ্র-সমিতির সভাপতি মহাশয় "hasty procedure" কথাটি একখানি পত্রে লেখায়, তাঁহার উপর সম্পাদক মহাশয় নিজ পৃষ্ঠপোষকবর্গের সহায়তায় একটি কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য পাশ

করান। এইখানেই পরিসমাপ্তি নহে, ইহার পর সম্পাদক মহাশয় মেদিনীপুর সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনীর বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে সভাপতি সম্বন্ধে নিয়মপরিবর্ত্তনরূপ একটি নিরীহআকারযুক্ত প্রস্তাবের সাহায্যে তাঁহাকে স্থায়ী সভাপতির পদ হইতে সরাইবার চেষ্টা করেন এবং সেখানে তাহা গৃহীত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সম্মিলনীর সাধারণ অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয়ের এই উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহার প্রকৃত মনোভাব অবগত হইয়া মেদিনীপুর-বাসীর পক্ষ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ হয়। এখন আমার জিজ্ঞাস্য যে, সভাপতি মহাশয়ের উপরি-লিখিত কথা দুইটি ব্যবহারের জন্য যাঁহারা বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পাদক মহাশয়ের নিয়ম-ব্যতিক্রমাদি কার্য্যাবলী আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিবেন কি? তাঁহার পত্রে সভাপতি মহাশয়ের উপর যে সমস্ত অশিষ্ট কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কি প্রতীকার করিতেছেন?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

(৩)

লণ্ডনের পার্ল্যামেণ্ট ভবন ও কাউণ্টি কাউন্সিল

পার্ল্যামেণ্ট ভবন

পার্ল্যামেণ্ট বলিতে হাউস্ অব্ কমনস্ ও হাউস্ অব্ লর্ডস্‌কে বুঝিতে হইবে। পার্ল্যামেণ্ট ভবন অর্থাৎ যেখানে পার্ল্যামেণ্ট বসে তাহা টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত—একদিকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি নামক গির্জ্জা ও অন্যদিকে নদী, ইহারই মাঝখানে পার্ল্যামেণ্ট ভবন অবস্থিত। ইংরেজের রাজনৈতিক ইতিহাস রাজায় প্রজায় বিরোধের ইতিহাস। প্রজারা ক্রমাগত আপনাদের অধিকার দাবী করিতে করিতে ও কাড়িয়া লইতে লইতে আজ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। কিন্তু একটা মজার কথা এই যে, চরম গণতান্ত্রিক ইংরেজের পার্ল্যামেণ্ট (যাহা নাকি দেশ-বিদেশে মাদার অব্ পার্ল্যামেণ্টস্ বা পার্ল্যামেণ্টের জননী বলিয়া কথিত হয়) ওয়েষ্টমিনিষ্টারের রাজপ্রাসাদে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাতে ইংরেজ ছাড়া আর সকলে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু ইংরেজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, বিবর্ত্তনটা কিরূপ ধাপে ধাপে হইয়াছে, কিরূপ পর পর ইংলণ্ডেশ্বরের বাসস্থান হইতে ইহা অবশেষে জনসাধারণের মন্ত্রণাগারে পরিণত হইয়াছে।

ইংরেজের নিকট পার্ল্যামেণ্টের ইজ্জৎ

পার্ল্যামেণ্ট ইংরেজের অত্যন্ত আদরের ও গৌরবের বস্তু। ইংলণ্ডে এক্ষণে "ম্যানহুড্ সাফ্রেজ" প্রচলিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ইংরেজ নর-নারীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে।

সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিচালনায় সম্রাট্ ও পার্ল্যামেণ্টের স্থান সকলের উপরে। জনসাধারণ তথা পার্ল্যামেণ্ট এতদূর ক্ষমতা একদিনে লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বহু বিরোধ ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া, এমন কি রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়া, ইহাকে জন-মত জয়যুক্ত করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে।

ট্যাসিটাসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, প্রাচীন টিউটনিক জাতিদের মধ্যে সভার প্রচলন ছিল। ইংরেজদের উইটেনাগেমট বা বিজ্ঞ লোকদের সমিতিও ঐ ধরণের সভা। ইহা রাজাকে পরামর্শ দিত এবং তাঁহাকে নির্ব্বাচন করার ও অত্যাচারী হইলে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও ইহার ছিল। নর্ম্মাণ রাজাদের সময় হইতে ইহা কতকটা তাঁহাদের অধীন জমিদার-শ্রেণীর লোকের সভাতে পরিণত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাচন-প্রণালী অবলম্বন

করা হয় ও অবশেষে ইহা বর্ত্তমান পার্ল্যামেণ্টের রূপ পাইয়াছে।

পার্ল্যামেণ্ট ভবনের অতীত কথা

প্রথমতঃ হাউস্ অব্ লর্ড্স্ ও হাউস্ অব্ কমনস্ একটিমাত্র সভারূপে একত্র মিলিত হইত। প্রথম এড্ওয়ার্ডের সময় হইতে দুয়ের স্থান পৃথক্ হইয়া গেল ও কমনস্ অ্যাবির চাপ্টার হাউসে বসিতে লাগিল। কিন্তু ৭ম হেনরীর মৃত্যুর পর কমন্স সভা আবার রাজপ্রাসাদে আহূত হয়। এইরূপ ব্যবস্থা ১৮৩৪ সন পর্য্যন্ত চলে। ১৮৩৪ সনে লণ্ডনে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। তাহাতে অনেক ঘর-বাড়ী পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। রাজপ্রাসাদও ভস্মীভূত হয়। শুধু ওয়েষ্টমিনিষ্টারের প্রকাণ্ড হল ও পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীসমূহ রক্ষা পায়। এগুলি এক্ষণে কমন্সদের পোষাক-ঘর রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমান পার্ল্যামেণ্ট ভবন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করা আরম্ভ হয়। ইহা শেষ হইতে বহু বর্ষ লাগিয়াছিল। লর্ডেরা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের চেম্বার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কমন্সদের চেম্বার ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। বর্ত্তমান পার্ল্যামেণ্ট ভবন আট একর স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে ও ইহাতে ১,১০০টি কুঠরী আছে, সিঁড়ির সংখ্যা ১০০টি আর পথের পরিমাণ ২ মাইল। এই বর্ণনা হইতে পার্ল্যামেণ্টের বিপুলতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। কিন্তু এই পার্ল্যামেণ্ট ভবন সম্প্রতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

ভবনের ভিতরে

লর্ডদের চেম্বারে সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলার। ইনি পশম নির্ম্মিত গদীর উপর বসেন। এই প্রথাটী অনেক কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আগেকার কালে পশম ইংলণ্ডের মস্ত বড় ব্যবসার জিনিষ ছিল। কোন আইনের খসড়ায় যখন শেষকালে রাজার সম্মতি মিলে তখন তাহা প্রাচীন নর্ম্মাণ ফ্রেঞ্চে লর্ডদের মধ্যে ঘোষিত হয়।

কমন্স সভার দ্বার-রক্ষকের হাতে এক সরকারী নস্যের ডিবা থাকে। তাহা হইতে সভ্যেরা যাতায়াতের সময় নস্য লইয়া থাকে। লাইব্রেরীতে এখনও লিখিবার জন্য পালকের কলম দেওয়া হয়। সেসানের (বৈঠকের) শেষে একজনের পর একজন পুলিশ দুয়ার-গোড়া ও কুঠরীগুলি হইতে চীৎকার করিতে থাকে, "কে বাড়ী যায়?"

প্রধান মন্ত্রীর বাসস্থান

ডাউনিং ষ্ট্রীটের নাম শুনে নাই এমন লোক বিরল; ইহা সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক লেন-দেনের কেন্দ্র। ডাউনিং ষ্ট্রীট নাম শুনিলে মনে হয় যে, এই রাস্তার বাড়ীঘরগুলি পার্ল্যামেণ্ট ভবনের মত সুন্দর ও বৃহৎ, তাহা নহে। ইহার উপর অবস্থিত বাড়ী-ঘরগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছাঁচে নির্ম্মিত। এখানে প্রধান মন্ত্রী ও চ্যান্সেলার অব্ এক্সচেকারের বাসস্থান।

পার্ল্যামেণ্টের প্রসার

"পার্ল্যামেণ্টারি লণ্ডন" বলিতে পার্ল্যামেণ্ট ভবন ও ডাউনিং ষ্ট্রীটের সরকারী বাড়ীগুলি ত বুঝিতে হইবেই, তাহা ছাড়া ইহা ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রাসাদের পরও টেমস্ নদীর পাড় দিয়া বিস্তৃত হইয়া পার্ল্যামেণ্ট ষ্ট্রীট ও হোয়াইট্ হল পার হইয়া জেম্স পার্ক ও ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। শুধু তাই নয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রও এই স্থানে অবস্থিত। এই পরিসরের ভিতরে যে সকল রাজনৈতিক দলের ক্লাব রহিয়াছে এই প্রসঙ্গে সেগুলির কথা ভুলিলে চলিবে না। টোরি, লিবারেল ও লেবার—প্রত্যেক দলের ক্লাবকে পার্ল্যামেণ্টের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কারণ অনেক সময় ঐ সকল স্থানেই দলের নীতি নির্দ্দিষ্ট ও মীমাংসিত হয়।

লণ্ডন কাউন্টি

কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত আমরা সকলে পরিচিত আছি। লণ্ডন সহরের মিউনিসিপ্যালিটি শাসন ব্যবস্থা লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত। লণ্ডন কাউন্টি বলিতে আজ যে আয়তনকে বুঝায়, পূর্ব্বে তাহা

বুঝাইত না। সাউথওয়ার্ক, ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রভৃতি জনপদসমূহ পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইত, লণ্ডনের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। ইহারা ক্রমে ক্রমে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের অন্তর্গত হইতে আরম্ভ করে। এক্ষণে লণ্ডন কাউন্টি বলিতে ৬১টি এইরূপ বিভাগকে বুঝিতে হইবে।

বর্ত্তমান লণ্ডন কাউন্টি ১৮৮৮ সনের আইন দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার আয়তন ১১৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। ৬১টি নির্ব্বাচন-জিলার প্রত্যেকটি হইতে দুইজন করিয়া লোক লণ্ডন কাউটি কাউন্সিলের জন্য নির্ব্বাচিত হয়। শুধু "লণ্ডন নগর" ৪ জন লোক পাঠায়।

লণ্ডনের শাসন-ব্যবস্থা

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের উপর লণ্ডনের শাসনভার ন্যস্ত আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ১২৪, সকলেই নির্ব্বাচিত। এই ১২৪ জন ব্যক্তি তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে ২০ জন অল্ডারম্যান নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কাউন্সিলারগণ ৩ বৎসরের জন্য ও অল্ডারম্যানগণ ৬ বৎসরের জন্য মনোনীত হন। ১৯১৮ সনের "ফ্র্যাঞ্চাইজ অ্যাক্ট" (Franchise Act) অনুসারে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ (২১ বৎসরের উপর) ও পূর্ণবয়স্কা নারী (৩০ বৎসরের উপর) ভোট দিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। কাউন্সিল প্রতি বৎসর ২ কোটি পাউণ্ডের উপর বা প্রায় ৩০ কোটি টাকার কাছাকাছি খরচ করিয়া থাকে।

কাউন্সিলের ক্ষমতা

সমগ্র লণ্ডন নগরীর উপর কাউন্সিলের ক্ষমতা প্রভূত। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় ইহার শাসনের বহির্ভূত। মেট্রোপলিটান পুলিশ সরাসরি হোম অফিস কর্ত্তৃক পরিচালিত। কিন্তু সিটি অব্ লণ্ডন জিলাটি নিজে নিজের পুলিশের ব্যবস্থা করিয়া থাকে; পুওর ল বা গরীবদের সাহায্যদান বিষয়ক আইন এখনও বোর্ডস অব্ গার্জিয়ান্‌স নামক প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুশাসিত হয়; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের আইনের বলে মেট্রোপলিটান বরো কাউন্সিলস্ প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি ইহারাই দেখাশোনা ও পরিচালনা করে; সহরের জল সরবরাহের ভার মেট্রোপলিটান ওয়াটার বোর্ডের হাতে অর্পিত রহিয়াছে, ইহা ১৯০২ সনের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহাতে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ১৪ জন সভ্য মনোনীত করিয়া পাঠায়; সিটি অব্ লণ্ডন নামক জিলাটি ইহার নিজের ও পার্শ্ববর্ত্তী ৭ মাইলের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত বাজারের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে।

কাউন্সিল শিক্ষাদান ব্যাপারে আপন আয়তনের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহা সমস্ত বাড়ী-ঘরের তত্ত্বাবধান করে, ট্রামওয়ে চালায়, কাউন্টির রাস্তা ও সেতুর মালিক, ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক, বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে শাসনকর্ত্তা। গ্যাস ও গ্যাস মিটার পরীক্ষা করা, ১৮৯৪ সনের "ডিজিজেস্ অব অ্যানিম্যালস্" বা জানোয়ারের পীড়া আইন খাটানো, পাগলা-গারদ, পার্ক ও বাগিচা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা, স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করা, থিয়েটার ও নাচঘরকে লাইসেন্স দেওয়া ইত্যাদিও ইহার কাজ। এক কথায় উপরি উক্ত কার্য্যাবলী ও লণ্ডন বরো কাউন্সিলগুলির কাজ ছাড়া অন্য সমস্ত কাজ ইহাকে করিতে হয়।

শিক্ষার ব্যবস্থা

১৯০৩ সনের আইনের প্রচলনের পর হইতে সমগ্র লণ্ডনের শিক্ষা-ব্যবস্থা কাউন্টি কাউন্সিল গ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম হইতেই যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে এই ভার ন্যস্ত হইয়াছে। এডুকেশন কমিটির অধীনে ১০০০ সরকারী স্কুল, ৭০টা সেকেণ্ডারী স্কুল ও ২৬০টা টেক্‌নিকাল ও নৈশ স্কুল পরিচালিত হইতেছে। কিংসওয়েতে অবস্থিত সেন্ট্রাল স্কুল অব টেক্‌নিক্যাল অ্যাণ্ড আর্ট এডুকেশন সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক বছরে লণ্ডনে শিক্ষাদানের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বা মোটামুটি ১৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

ট্রাম, ড্রেণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা

কাউন্সিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ট্রামওয়েতে

খাটাইয়াছে। ট্রামের লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ১৬৪ মাইল। বছরে ৭০ কোটির উপর লোক ট্রামে চড়ে। ১৯২৬ সনে ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর ঋণশোধ করা হইয়াছে।

ড্রেণেজ বা পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্তের জন্য ১ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হইয়াছিল। পয়ঃপ্রণালীর মোট দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল এবং কাউন্সিলের শাসনাধীন আয়তনের বাহিরেও বিস্তৃত।

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহ নির্ম্মাণেরও তদ্বির করিয়া থাকে। ১৯২৫ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত গৃহ নির্ম্মাণ স্কিমে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর খাটান হইয়াছে। দরিদ্রদের অপরিষ্কার বস্তি সাফ করিতে ও নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে এই টাকা লাগিয়াছে। বাড়ীভাড়া ইত্যাদি হইতে অবশ্য কিছু টাকা উঠিয়া আসিবে। প্রায় ৪০ একর স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে ও আরও ৪০ একর পরিষ্কৃত হইবে। ১৬,০০০ বাড়ী তৈরী করা হইয়াছে ও আরও ২,০০০ তৈরী হইবে।

পার্ক, বাগান ও রাস্তাঘাট

পার্ক ও খোলা জায়গাগুলি কাউন্টি কাউন্সিল বিশেষ যত্নের সহিত তত্ত্বাবধান করে। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের অধীনে ১০০টা এইরূপ পার্ক ও খোলা জায়গা আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিখ্যাত। যেমন,

হাইনাণ্ট ফরেষ্ট, ৮০৫ একর
হ্যাকনি মার্স, ৩৩৯ একর
হাম্পষ্টেড হিল, ৩২০ একর
পার্ল্যামেণ্ট হিল, ২৬৭ একর
ব্ল্যাক হিল, ২৬৭ একর
ভিক্টোরিয়া পার্ক, পূর্ব্ব লণ্ডন, ২১৭ একর
ক্ল্যাপহাম কমন, ২০৫ একর
ব্যাটারসী পার্ক, ১৯৯ একর
ওয়ার্স উড্ স্কোরস, ১৯৩ একর

লণ্ডন শহরের এপিং ফরেষ্টের আয়তন ৫,৫৫৯ একর।

লণ্ডন, সাউথওয়ার্ক, ব্ল্যাকফ্রায়ার ও টাওয়ার সেতু সিটি অব্ লণ্ডন কর্ত্তৃক পরিচালিত। এগুলি ছাড়া টেম্‌স নদীর অন্য সব সেতু লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের অধীনে পরিচালিত হয়। রথারহাইথ, ব্ল্যাকওয়াল, গ্রীণউইচ্ ও উল্‌উইচ্ সুড়ঙ্গ এবং উলউইচের ফেরীর কর্ত্তাও লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল। ভিক্টোরিয়া, আলবার্ট, চেলসি, গ্রস্‌ভেনর তীরস্থ রাস্তাগুলিও কাউন্সিল পরিচালনা করিতেছে।

অগ্নি-নির্ব্বাণের ব্যবস্থা

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল এক ফায়ার ব্রিগেড রাখিয়াছে। স্থলে ৬৪ ও জলে ৩ অগ্নি ষ্টেশন আছে। পার্ল্যামেণ্ট হইতে ১০,০০০ পাউণ্ড ও অগ্নি-বীমা কোম্পানী-গুলি হইতে বীমার মূল্যের প্রতি দশ লক্ষ পাউণ্ডে ৩৫ পাউণ্ড সাহায্য পাওয়া যায়। বীমা হইতে বৎসরে ৭০ হাজার পাউণ্ডের উপর উঠে।

কাউন্টি কাউন্সিলের বিশালতা

কাউন্টি কাউন্সিলের আয়-ব্যয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহার বিশালতা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। কর বসাইয়া বছরে ১ কোটি পাউণ্ডের উপর আদায় হয়। ট্রেজারি হইতে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আসে। কাউন্সিলের ঋণের পরিমাণ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা ৬০ বছরে শোধ করিয়া দিবার কথা।

মোগাফের্

পঞ্চপুষ্প

বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রেটবৃটেন

এ যাবৎ গ্রেটবৃটেনের মহাজনেরা বিদেশী বণিক্‌দিগকে ধারে মাল বেচিয়া অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইত; মহাজন মাল চালান দিয়া বিল অব এক্সচেঞ্জ বেঙ্কের মারফৎ খরিদদারের নিকট পাঠাইত; খরিদ্দার নির্দ্দিষ্ট দিনে বেঙ্কের মারফৎ টাকা দিবার অঙ্গীকারে ঐ বিল গ্রহণ করিত; খরিদ্দার টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে, মহাজন ঐ বিল বাট্টা দিয়া বেঙ্কের মারফৎ ভাঙ্গাইতে পারিত; কিন্তু যদি পরে কোন কারণে খরিদ্দার ঐ টাকা না দিত, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ঐ প্রাপ্য টাকা মহাজনের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইত। সেই জন্য গ্রেটবৃটেনের বৈদেশিক রপ্তানী কমিয়া আসিতেছিল। উহাতে বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় বর্ত্তমানে নূতন নিয়ম জারির ব্যবস্থা হইতেছে যে, খরিদ্দার টাকা না দিলেও গবর্ণমেণ্ট নিজে তাহার প্রতিকার কল্পে শতকরা ৭৫ টাকা মহাজনের বা ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

সবাক্ চলচ্চিত্র

মিঃ ফ্রেডারিক লনস্‌ডেলের অভিমত

সবাক্ চলচ্চিত্রের আবিষ্কারে ইংলণ্ডের গ্রন্থকারের ও অভিনেত্রীর সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমানে নীরব চলচ্চিত্র জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু সবাক্ চলচ্চিত্রের সঙ্গে তুলনায় উহা মৃতের মত জীবন হীন ও নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী আজ নীরব চলচ্চিত্রে মাত্র চেহারার গৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কালে তাহারা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইবে এবং তাহার স্থানে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইথেল বেরিমুর আমেরিকার একজন নামজাদা অভিনেত্রী; কিন্তু তিনি নীরব চলচ্চিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী; সবাক্ চলচ্চিত্রে তিনি শীঘ্রই শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবেন।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের পক্ষে সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত। কারণ ইংলণ্ডের লোকের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও কথাবার্ত্তা আমেরিকাবাসীরাও পছন্দ করে; দ্বিতীয়তঃ নয়নমনোমুগ্ধকর দৃশ্য বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক যুগের অট্টালিকাসমূহ আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান। এই সমস্ত সুযোগে শীঘ্রই ইংলণ্ডবাসী এই নব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীময় প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডবাসীর প্রধান বাধা—মূলধন। ইংলণ্ডের ধনবান্‌গণ এই শিল্পের উন্নতির জন্য মূলধন প্রদানে স্বীকৃত নহে, পরন্তু আমেরিকার ধনিগণ লক্ষ লক্ষ টাকা অবিচারে ঢালিতেছে। যেখানে ইংলণ্ডের ধনী ৫০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতে ইতস্ততঃ করে, সেখানে আমেরিকার পুঁজিপতি ৫০,০০০ পাউণ্ড অকুণ্ঠিত চিত্তে খরচ করিতেছে। যে অভিনেতাকে ইংলণ্ডীয় ধনী ১০০০ পাউণ্ড বেতন দিতে স্বীকৃত নহে, আমেরিকাবাসী লক্ষ পাউণ্ড দিয়া তাহাকে আপন দলে টানিয়া নিতেছে।

দ্রুতগামী মটরবোট

মেজর সিগ্রেভ মটরবোট প্রতিযোগিতায় ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছেন। তাঁহার বোটের এঞ্জিন ৫০০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট। তিনি শীঘ্রই ঘণ্টায় ১০০ মাইলগামী একখানা মটরবোট প্রস্তুত করিবেন।

চলচ্চিত্রে বালকের উপার্জ্জন

হার্টফোর্ড সায়ারের নব প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রে অভিনেতা হিসাবে বোরহাম উড নামক গ্রামের একটি বালক দৈনিক ৪ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতেছে, বালকটি পূর্ব্বে সামান্য বেতনে একটি দোকানদারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল।

বাধ্যতামূলক এ-বি-সি শিক্ষা

তুরস্কের নূতন রাজধানী আঙ্গোরার সমস্ত অধিবাসীকে শিক্ষিত করিবার জন্ম বিপুল আয়োজন চলিতেছে। পুরুষ নারী, বালক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকেই নব প্রবর্ত্তিত লাটিন অক্ষর শিখিবার জন্ম বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে হইবে। কামালপাশা নিজে এই সমস্ত স্কুলের তত্ত্বাবধান করিবেন।

শ্রীরাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, সুলতানপুর (বীরভূম)

এই বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযোগী যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা ছাড়া কাঠের কাজ, লৌহের কাজ, বস্ত্র বয়ন, সাবান প্রস্তুত করা, কৃষি প্রভৃতি বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে বালকগণ শিক্ষালাভের সঙ্গে শীতাতপসহিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান্, কর্ম্মক্ষম ও সবল মনের অধিকারী হয়, এই বিদ্যালয় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। রায় বাহাদুর এ সি ব্যানার্জ্জির বিশেষ চেষ্টা ও উৎসাহে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে বোর্ডিংএর খরচ মাসিক মাত্র ৬ টাকা, তাহার উপর শিল্প-বিভাগে কাজ করিয়া ছাত্রেরা নিজে উপার্জ্জনও করিতে পারে। এখনই কোন ছাত্র শিল্প-কাজের দ্বারা মাসিক ১০।১২ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। সুতরাং তাহাদিগকে আর অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না।

নিম্নলিখিত শিল্প-কার্য্যগুলি এই বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া যায়:—

(১) চরকায় সূতা কাটা, (২) কাপড়, গামছা, তোয়ালে, নানাপ্রকার ছিট, সতরঞ্চ, আসন প্রভৃতি বয়ন (৩) সূতা এবং কাপড়ে রং করা, (৪) কাপড়ে ছাপ দেওয়া, (৫) কাঠের কাজ, (৬) লৌহের কাজ, (৭) চাষ (সবজী বাগানে এবং মাঠে), (৮) সাবান প্রস্তুত করা। এই সমস্ত শিল্পকার্য্য অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা দেওয়া হয়।

লণ্ডন হইতে ছয় দিনে ভারতবর্ষে আগমন

আগামী এপ্রিল মাস হইতে ৫০০০ মাইল দূরবর্ত্তী লণ্ডন ও করাচির মধ্যে ডাক ও যাত্রী লইয়া আকাশযান-সমূহ রীতিমত গমনাগমনের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এই আকাশ-পথের দ্বারা লণ্ডন হইতে ছয়দিনে ভারতবর্ষে আগমন করা সম্ভবপর। লণ্ডন হইতে দিবসে আকাশযানে বাসল্ ও তথা হইতে রাত্রে রেলপথে জেনোয়ায়, জেনোয়া হইতে আকাশ-পথে দুই দিনে কাইরো, কাইরো হইতে একদিনে বসোরা এবং পরে অবশিষ্ট দুই দিনে পারস্যোপসাগর অতিক্রম করিয়া করাচি পৌছান যাইবে। আকাশযানসমূহ সপ্তাহে একবার মাত্র যাতায়াত করিবে এবং কম পক্ষে একটন ডাকের জিনিষ বহন করা হইবে।

যাত্রীবাহী সুবৃহৎ আকাশযান চালনার জন্য সুদক্ষ চালক নিযুক্ত করা হইবে। এই সমস্ত চালক ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে গমানাগমন করিয়া আকাশযান চালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে। শীঘ্রই বৃটিশসাম্রাজ্যের যে কোন অংশ হইতে ১৫দিনের মধ্যে লণ্ডনে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইবে।

লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নিম্নলিখিত সময়ে যাতায়াত করা যাইবে:—ভারতবর্ষ—৬দিন, কেপটাউন—৭দিন, অষ্ট্রেলিয়া—১২দিন, নিউজিল্যাণ্ড—১৪দিন।

ইংলিশম্যান

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারে স্থায়ী শিল্প-প্রদর্শনী

বর্ত্তমান কলিকাতা কংগ্রেস প্রদর্শনী বিশেষ কৃত-কার্য্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। প্রদর্শনীর ফল যাহাতে স্থায়ী হয়, তজ্জন্য শিল্পী ও দ্রব্য নির্ম্মাতাদের সাহায্যে একটা স্থায়ী সো-রুম বা ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ২০ নং ষ্ট্যাণ্ড রোডস্থ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারে একটি স্থায়ী শিল্প-প্রদর্শনী শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। এই মিউজিয়ামে Exhibitorগণ তাঁহাদের দ্রব্যাদি সাজাইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইবেন। চেম্বার এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। আমরা মিউজিয়ামের সাফল্য কামনা করি।

জার্ম্মাণির ঘরবাড়ী

বর্ত্তমানে জার্ম্মণিতে ৩,০০,০০০০ লোকের বসবাসের জন্য কমসে কম ৬০০,০০০ ব্যক্তিগত বাড়ীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে। গত সন ৫০,০০০ অধিবাসি-যুক্ত সহরগুলিতে ১০৫,৫৪০টি বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। ১৯২৬ সনে ৭৫,৩৮৫ খানা বাড়ী করা হয়।

আর্থিক উন্নতি

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর আপত্তি

বৃটিশ পীস্‌গুড্‌সের মাড়োয়াড়ী বেপারীগণ এখানকার প্রধান আমদানীকারক। বাঙ্গালী দোকানদারেরা তাদের নিকট কিনিয়া বেচে। কিন্তু এই কিনার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দামটা চুকাইয়া দিতে হয় না। কিছু দিন সময় সর্ব্বদা হাতে থাকে। এই সময় দেওয়ার সম্বন্ধে সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। "টাইম্ অব্ গ্রেস্" বা সময় দানটা বহুদিন অবধি ২০ হইতে ২৫ দিন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে আর দৃষ্টিমাত্রে যে বিল শোধ করিবার কথা তদ্দরুণ ৬০ দিন পাওয়া গিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে মাড়োয়ারী চেম্বার অব্ কমার্শ প্রথমটি কমাইয়া ১০ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয়টি ৫০ হইতে ৫৩ দিন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া ধার্য্য করে ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করে।

গত ৭ই জানুয়ারী বেঙ্গল পীস্‌গুড্‌স্ মারচেন্টস্ এসোসিয়েসনের এক সভায় বাঙ্গালী ব্যবসায়িরা এই বিষয়ে আপত্তি জানাইয়া বলে যে, গ্রেসের জন্য ২০ হইতে ২৫দিন পর্য্যন্ত এবং দৃষ্টিমাত্র শোধ বিলের জন্য ৬০ হইতে ৬৫ দিন পর্য্যন্ত সময় চাই। মাড়োয়ারী চেম্বার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় বেঙ্গল পীস্‌গুড্‌স্ এসোসিয়েশন স্থির করিয়াছে যে, মাড়োয়ারীদের নিকট হইতে বৃটিশ পীস্‌গুড্‌স্ কিনা বন্ধ রাখিবে। ষ্টক রাখিবার জন্য একটা কেন্দ্রীয় ষ্টোর ও একটা বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে যাহাতে মাড়োয়ারী-দের সাহায্য না লইয়াও ব্যবসা চালাইতে পারে।

প্রায় ২০০ প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিল।

জাতীয় সংবাদ

সুবর্ণবণিক্ মহিলার দান

হুগলী ঘুটিয়াবাজার নিবাসী ৺ ডাঃ প্রসাদদাস মল্লিকের বিধবা পত্নী শ্রীমতী বিনোদিনী মল্লিক নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠান-সমূহে মোট ৩২,৯৫০৲টাকা দান করিয়াছেন :

(ক) হুগলী ইমামবাড়া হাসপাতালে প্রসাদদাস ওয়ার্ড নির্ম্মাণের জন্য ও দুইটি রোগী (১) একটি সুবর্ণবণিক্ ও (২) অপরটি হিন্দু ছাত্র—থাকিবার ব্যবস্থাকল্পে ৫১০০৲টাকা দান করিয়াছেন।

(খ) হুগলী কলেজে ব্যবহারিক রসায়নের পুস্তকাধার নির্ম্মাণ ও পুস্তক ক্রয়ের জন্য ১০০০৲টাকা দান করিয়াছেন। এই পুস্তকসমূহ কলেজের অধ্যাপকগণ নির্ব্বাচন করিবেন ও ছাত্র এবং জনসাধারণ পাঠ করিতে পারিবে।

(গ) হুগলী কলেজে আই এস্ সির প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ২জন ছাত্রকে ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপ দেওয়ার জন্য ও বি এস্ সি পরীক্ষার্থী একটি দরিদ্র ছাত্রের পরীক্ষার ফি প্রদানের নিমিত্ত ৬০০০৲টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। ঐ ছাত্রগণের মধ্যে সুবর্ণবণিক্ ছাত্রের দাবী অগ্রগণ্য।

(ঘ) ডাঃ প্রসাদদাস মল্লিকের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ১০,০০০৲টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের জন্য জমি ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণকল্পে ১০,০০০৲টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

(ঙ) ঘুটিয়াবাজার আর্য্য লাইব্রেরীতে ৫০০৲টাকা দিয়াছেন।

(চ) মল্লিকবাটী উচ্চ প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ে ১৫০৲টাকা দেওয়া হইয়াছে।

(ছ) দুর্ভিক্ষ প্রশমন ফণ্ডে ২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট এই দানশীলা পুণ্যবতী মহিলার দীর্ঘজীবন কামনা করি যেন তিনি এই প্রকার পুণ্য-কার্য্যে আমাদের স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

ঘুটিয়াবাজার, হুগলী শ্রীপ্রসাদদাস মল্লিক বি এল্

৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দান

শ্রীরামপুরের সুবর্ণবণিক্ সমাজের ৺মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি নিম্নলিখিত সৎকার্য্যে দানের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন :—

কলিকাতা, হুগলী এবং চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবণিক্ পরিবারসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পত্নী প্রেমবতী দাসীর নামে এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড করিবার জন্য ১,১০,০০০৲ টাকা। কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে বিশ্বেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড নামে শিশুদের বিনা পয়সায় শুশ্রূষার নিমিত্ত একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৫,০০০৲। শ্রীরামপুর হাসপাতালে একটি দাতব্য চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার জন্য ৫০,০০০৲। এই বিভাগটি দাতার নামে হইবে। কারমাইকেল কলেজে শিক্ষা-লাভের নিমিত্ত সুবর্ণবণিক্ সমাজের ছাত্রদের ফ্রীশিপের জন্য ২০,০০০৲। এই বিভাগটি দাতার মাতার নামে হইবে। সুবর্ণবণিক্ ছাত্রদের ফ্রী ষ্টুডেন্ট-শিপের জন্য আশুতোষ দে স্মৃতি ফণ্ড নামে একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০,০০০৲। হুগলী জেলায় নলকূপ খননের জন্য ১০,০০০৲। কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কয়েকটী রোগীর বিনা পয়সায় শুশ্রূষার 'বেড' করিবার জন্য ১০,০০০৲। ২৪ পরগণার অন্তর্গত যাদবপুরে চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়াল স্যানাটোরিয়ামে যক্ষ্মারোগীর শুশ্রূষার জন্য ১০,০০০৲। শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ২,০০০৲। ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়ের জন্য ২,২০,০০০ টাকা।

এবং শ্রীরামপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৫,০০০ টাকা। বাঙ্গালা সরকারের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেলকে এই সব এণ্ডাউমেণ্টের ট্রাষ্টি বা অছি করা হইয়াছে। হুগলী জেলায় এত বড় দান আর হয় নাই। আর্থিক উন্নতি

শোক-সংবাদ

এই বৎসর সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বৎসর বলিতে হইবে। আমাদের জাতির মধ্যে যে সমস্ত মনিষিগণ নিজ গুণবত্তায় ও কর্ম্মমহিমায় জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন আমরা একে একে তাঁহাদিগকে হারাইতেছি। সমাজের অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী স্বজাতিবৎসল সাক্ষীগোপাল বড়াল, দীননাথ দত্ত প্রমুখ কর্ম্মিবৃন্দের মৃত্যুজনিত শোক ভুলিতে না ভুলিতে হুগলীর অন্যতম কর্ম্মবীর রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুরের মৃত্যু-সংবাদ আমাদিগকে পাঠকগণের গোচরীভূত করিতে হইল। তিনি গত ১৭ই পৌষ মঙ্গলবার অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু জাতির উন্নতিকল্পে সদা অবহিত ছিলেন। সন ১৩২৩ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠার পরে তিনি যশোহরের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন; তদুপলক্ষে তাহার অভিভাষণে কত পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শ্রীপাট সপ্তগ্রামের প্রতি নগেন্দ্রবাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যবিধ অসুবিধা তাচ্ছিল্য করিয়া তিনি প্রতি বৎসর শ্রীপাটের বার্ষিক অধিবেশনে গমন করিয়া উহার উন্নতিমূলক আলোচনায় যোগদান করিতেন। কলিকাতায় সাক্ষীগোপাল বড়াল মহাশয়ের উদ্দেশ্যে অধিবিষ্ট শোক-সভায় তিনি হুগলী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আজ সমগ্র বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সমাজ একটী অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইল। আমরা নগেন্দ্রবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক সভা

বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি হুগলী নিবাসী রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুরের পরলোক গমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যশোহর-বগচরের স্বজাতি বৃন্দ, স্বর্গীয় রায় কালিপ্রসাদের ভবনে, ২৪শে পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে সমবেত হইয়া একটি শোক সভার অধিবেশন করেন। রায় শ্রীযুক্ত নিধুবনচন্দ্র দে সভাপতির আসন গ্রহণ কয়েন। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র স্বর্গীয় ধর মহাশয়ের জীবনীর বিস্তৃত আলোচনা, ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র নিম্নলিখিত "শ্রদ্ধাঞ্জলি" কবিতা পাঠ করেন।

হে নগেন্দ্র! উদার, মহান্‌, সত্বপ্রিয়া
মর্ত্ত্যলীলা করিলে প্রয়াণ, সাধনোচিৎ
দিব্য ধামে। ললিত মধুর তব প্রকৃতি
উদার, চিত্র-পট সম, মম চিত্ত-পটে,
গুণমুগ্ধ, অঙ্কিত রহিবে চিরকাল।
প্রাড্‌বিবাকের কার্য্য, গুরু দায়িত্যের,
সুসম্পন্ন-করি, লভেছিলে অবসর
সরকারী কার্য্য হ'তে। কিন্তু জীবনের
মহাব্রত, সমাজের হিত কার্য্য হ'তে
পার নাই লভিতে বিশ্রাম। তাই কাণ্ডারী
হইয়া চালিত করিয়াছিলে, স্বজাতীয়
সম্মিলনী, দ্বিতীয় বরষে, এই যশোর
নগরে। তোমার অনন্ত গুণ চরিত্র
মধুর, বঙ্গের স্বজাতি, ভুলিবেন না কভু।
দূরবীণের শিল্প-শালা করিয়া স্থাপনা
রেখেছ অতুল কীর্ত্তি বাঙ্গালীর নাম।
শিল্পি-শ্রেষ্ট, বণিক্-প্রধান! তব তরে
কাঁদে আজি আমাদের প্রাণ। মহান্‌,
জগদীশ্বর দিব্যালোকে তব আত্মার
করুণ কল্যাণ! তোমার বিরহ-শোক
সহ্য করিবারে, শক্তি দি'ন্‌ তব পরিজনে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ধর মহাশয়ের ঔর্দ্ধদৈহিক শান্তি কামনায় প্রার্থনা করেন। এই সময়ে সভাপতি মহাশয় ও সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সভান্তে শ্রীশ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীমৎ দত্ত উদ্ধারণ

ঠাকুরের তিরোভাব তিথি পূজার প্রসাদ বিতরণ দ্বারা, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চন্দ্র, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেন।

সুলক্ষণা স্মৃতি পুরস্কার

(কেবলমাত্র মহিলাদিগের জন্য)

"হিন্দু সংসারে বধূর স্থান ও শ্বাশুড়ীর কর্ত্তব্য" বিষয়ে মহিলাগণের লিখিত রচনার মধ্যে যাঁহার রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোনীত হইবে তাঁহাকে রায় সাহেব কেদারনাথ দত্ত উকিল মহাশয় প্রদত্ত ৪০৲ টাকা মূল্যের পারিতোষিক দেওয়া হইবে। বঙ্গের তিনজন খ্যাতনাম্নী বিদুষী মহিলা কর্ত্তৃক রচনাগুলি পরীক্ষিত হইবে। পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটিতে লেখিকার কোন স্বত্ব থাকিতে পারিবে না, আমাদের নিজ খরচে মুদিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধকে তাহা প্রকাশিত হইবে।

১৯২৯ সালের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় রচনা পাঠাইতে হইবে। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ধর, বি, এল, সেক্রেটারি, আর্য্য লাইব্রেরী, হুগলী

বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ

গত ৮ই অগ্রহায়ণ বিক্রমপুরের কাদিশাল গ্রাম নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রমোহন সেনের সহিত ঢাকা চৌধুরীবাজার নিবাসী উত্তর রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসীর শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ হইতে পণ গ্রহণ করেন নাই বরঞ্চ কন্যা-পক্ষ গরীব বিধায় তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। শোভাযাত্রা প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বর ও ব্যয় বাহুল্য সর্ব্বথা বর্জ্জন করিয়া সমিতির ব্যয়সংক্ষেপ তালিকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম যথাসাধ্য পালন করা হইয়াছে। কাদিশাল গ্রাম নিবাসী বহুগণ্যমান্য লোক কন্যাভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইয়াছেন। অধুনা বিক্রমপুরবাসী প্রায়ই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এবং বিদেশে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতেছেন।

পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা

এবার নিম্নলিখিত ছাত্র বিক্রমপুরের কাদিশাল গ্রাম হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

১। শ্রীপুলিনবিহারী পাল (Honours)

২। শ্রীবেণীমাধব দাস (Pass)

শ্রীপাট সপ্তগ্রামের মহোৎসব

বিগত ২৪শে পৌষ হইতে ২৯শে পৌষ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপার্ষদ দ্বাপরের পঞ্চম গোপাল সুবর্ণবণিক্-কুলোজ্জ্বলকারী শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীপাট সপ্তগ্রামে নিম্নলিখিত রূপ মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২৩শে পৌষ সোমবার সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তনাদি সহযোগে অধিবাস হইয়া পরদিন ২৪শে পৌষ মঙ্গলবার তিথি আরাধনা কল্পে প্রাতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ হইয়াছিল, মধ্যাহ্নে বিশ্বপাবন শ্রীল রামদাস বাবাজি মহাশয় কর্ত্তৃক স্মৃতিমূলক কীর্ত্তন জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করিয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীগোস্বামী, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল, এই দিন প্রায় ১৫০০ লোক শ্রীপাটে সমবেত হইয়াছিল। এইরূপ জন-সমাগম পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

২৪শে হইতে ২৮শে পৌষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথারীতি ভোগ-রাগ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। ২৯শে পৌষ রবিবার প্রাতঃকাল হইতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়, এবং বেলা ১১টার সময় কীর্ত্তনের দল নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়। বেলা ১০টার পর হইতে দলে দলে লোক সমবেত হইতে আরম্ভ করে। কবিবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যা-বিনোদ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় বহুসম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়ও শ্রীপাটে আগমন করিয়াছিলেন। স্বজাতিগণের মধ্যে হুগলীর শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য বি এ,

কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত, শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত সুবর্ণবণিক্ উপস্থিত ছিলেন। বেলা এক ঘটিকার সময় শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমিতির ও বৈশ্য সুবর্ণবণিক্ স্বজাতি সম্মিলনী সভার উনবিংশ সাম্বাৎসরিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। উন্মুক্ত আকাশ তলে ঘনছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষমূলে অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কীর্ত্তনের আনন্দধ্বনিতে, সমবেত জনমণ্ডলীর প্রীতিভক্তিতে সমগ্র পীঠস্থান যেন এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সভার প্রথমে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চরণ মল্লিক প্রস্তাব করেন—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অদ্যকার অধিবেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করুন। সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী বলেন "আপনাদের এই সম্মান আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম, বিশেষতঃ আজ আপনারা এই বনে—যেখানে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকশিত, শান্তিধারা ক্ষরিত, যেই বন ৬০হাজার ঋষি খুঁজিয়াছিলেন,—আপনারা সেই বনে সভার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাজেই আপনারা বন পাইয়া আনন্দের অধিকারী, কিন্তু আমি বন পাই নাই; এখনও সহরে থাকি; সুতরাং আপনাদের উপর সভাপতিত্ব করিতে কেমন কেমন মনে হইতেছে, তবে আমি সহরে বনের কাজ কতকটা করি; সেই জন্যে আপনাদের এ সম্মান সাদরে গ্রহণ করিলাম।"

সভাপতির আসন গ্রহণের পর শ্রীপাটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমিতির অষ্টাবিংশ সাম্বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানে স্থায়ী সেবা-ভাণ্ডারে ১৪৭০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ সংগৃহীত হইয়াছে, তৎপর বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাবও পঠিত হয় এবং উহা সভায় গৃহীত হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন প্রস্তাব করেন যে শ্রীপাটের তিনজন কর্ম্মী ৺সাক্ষীগোপাল বড়াল, ৺দীননাথ দত্ত ও ৺নগেন্দ্রনাথ ধর মহাশয়গণের মৃত্যুতে এই সভা শোক-প্রকাশ করিতেছেন; আর এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করা হউক।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক বলেন—শ্রীপাঠের উন্নতির জন্য, দেবসেবা, অতিথিসেবা, ও দেবায়তন রক্ষণের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন; সুতরাং সকলের সমবেতভাবে যাহাতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতিতে শ্রীপাটের জন্য বৃত্তি আদায় হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত।

এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক পুনরায় প্রস্তাব করেন যে, শ্রীপাটের নামানুসারে রেল ষ্টেশনের নাম সপ্তগ্রাম করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে ও তজ্জন্য বর্ত্তমান সভায়ও সেই প্রস্তাব গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয় উহা সমর্থন করিলে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

● অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয় এবং স্বর্গগত সভ্যগণের স্থানে নূতন সভ্য গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষায় সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন—গতবারের দত্তঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাটে আমার অগ্রজকল্প সুহৃৎ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়া যে জনসমাগম দেখিয়াছিলাম, এবার তাহা না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। বৎসরে মাত্র একটি দিন, স্বজাতির পুণ্যপীঠে, শত শত ভক্তের পদরজপূত পুণ্যস্থানে আসিয়া যিনি অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ না করিবেন, যিনি এই উন্মাদনাময়ী রসধারা পানে বঞ্চিত, বড় দুর্ভাগ্য তাঁর! এই শ্রীপাটকে জাগাইয়া রাখিতে হইলে এখানে মাত্র একদিন আসিলে চলিবে না; প্রত্যেক স্বজাতিকে অবসরে অনবসরে এখানে আসিতে হইবে, তবেই কীর্ত্তনানন্দে এই পুণ্যপীঠের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিবে, প্রেমের বন্যা তরতর বেগে প্রবাহিত হইবে। এবারে জন-সমাগম এত কম হইবার কারণ কি জানিনা; যাঁহারা অক্লান্ত কর্ম্মী তাঁহাদের কোন ত্রুটী নাই; তবে লোকের উৎসাহ পূর্ব্বের মত পরিলক্ষিত হইতেছে না। আশার কথা গত মঙ্গলবারে ১৫০০শত লোকের সমাগম হইয়াছিল—যাহা এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। মনে পড়ে, সেবারে ৺প্রাতঃস্মরণীয়

মল্লিক প্রভৃতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি পদে বরণ করিয়াছিলেন ; সেই সভায় বিশ্বকবি বলিয়াছিলেন—"এই সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী ; ব্যবসার কেন্দ্র ছিল ; নানা দেশের বড় বড় বাণিজ্যতরণী ইহারই বন্দরে সমবেত হইত ; আজ তাহার কি শোচনীয় পরিণাম ! এই স্থানকে জাগাইয়া তুলিতে হইলে আবার ইহাকে ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে। নব নব অট্টালিকা গড়িয়া তুলিতে হইবে।" রাজার অন্যায় জেদের বসে এই সম্ভ্রান্ত বর্দ্ধিষ্ণু সমাজ নিগৃহীত হইয়া বাঙ্গালার এককোণে পড়িয়াছিল। ১৪শত শকের মধ্যভাগে শ্রীশ্রীমৎ নিত্যানন্দ এই সপ্তগ্রামে আসিয়া কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব রোলে উদ্ধারণ দত্তঠাকুরকে কৃপা করিলেন ; সে দিন এই সমাজের মুক্তিপথ অর্গলমুক্ত হইয়া গেল—তার সাক্ষী ঐ ৪৫০ বৎসরের মাধবীলতা—যা ডালের কাটি হইতে উদ্ভূত ; তার সাক্ষী ঐ নুপুর কুণ্ড ; সেই দিন হইতে এই সুবর্ণবণিক্ জাতি ভক্তপ্রাণ জাতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিল। আপনারা সেই ভক্তপ্রাণ জাতি নামের সার্থকতা সম্পাদনকরুন, এই পুণ্য তীর্থকে জাগাইয়া তুলুন ; তবেই আপনারা জগতে স্মরেণ্য ও বরেণ্য হইবেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—হিন্দু সমাজের মধ্যে ধনী ও গণ্যমান্য অনেক লোক আছে ; কিন্তু এই সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার পালন সমধিক পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক্ মহিলাগণ ধর্ম্ম ও নীতি বলিয়া আচার পালনে বিশেষ যত্নবতী। অবশ্য আচার পালন করিয়া উঠিতেছেন কি নীচে নামিতেছেন, তাহা জানি না ; এবং অনেকে আচার পালনকে বর্ব্বরের কার্য্য বলিয়া মনে করেন ; পিতৃ-পিতামহের আচরিত পথে গমন করিলে যদি বর্ব্বর হইতে হয়, তবে সে বর্ব্বর আখ্যা গালি নহে—উহা প্রশংসার বাণী। অনেক পূর্ব্বে আমি একবার এই স্থানে আসিয়াছিলাম, তখন ঐ মাধবীলতা ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না ; তখন এ স্থানে শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলাম, এখন তাহা যেন একটু খর্ব্ব হইয়াছে—এখন যেন একটু জমিদারীর ভাব আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার দৃষ্টি কটু, আমি নির্জ্জনতাই ভাল দেখি। দর্শন উপনিষৎ পড়িয়া, নাস্তিক প্রায় হইয়া যখন আমি গুরুর নিকট প্রাচীন ন্যায় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করি, তখন তিনি আমাকে ভাগবত পড়িতে আদেশ করেন, কারণ ভাগবতই বেদান্তের ভাষ্য, ভাগবতেই ভক্তি নিহিত—সে ভাগবত প্রাসাদের নয়—সে বনের জিনিষ। আর আমাদিগকেও একদিন এই বনের শরণাপন্ন হইতে হইবে—যেদিন স্ত্রীপুত্র-পরিজন সকলে বলিবে—তুমি নিজের পথ দেখ, সেদিন অহঙ্কার আর আমাকে পার করিতে সমর্থ হইবে না—সেদিন যে পারে নিয়ে যাবে—সে এই বন, সে এই ভাগবত, সে এই হরিনাম। বিভিন্নদিক্‌গামী ফলপ্রসবোন্মুখ বৃক্ষশাখা যেমন একত্র মিলিত হতে সমর্থ হয় না ; কিন্তু গোড়ায় মিলিত থাকে, তেমনি আপনারাও পরস্পর বিভিন্ন হয়েও এই একস্থানে একত্র মিলিত হইয়াছেন,—মানব-মিলনের মহাক্ষেত্র ধর্ম্মই আজ আমাদিগকে এক করিয়াছে ! আজ একদিন এই মিলন হইলে চলিবে না ; এখানে আপনাদিগকে আসিতে হইবে, হরি নামই সার করিতে হইবে। সময় থাকিতে ভব-ব্যাধির চিকিৎসা করা দরকার—সঙ্গে কেহই যাইবে না—অর্থ অনর্থরূপে প্রতিভাত হইবে। তাই বলি, সময় থাকিতে নিজের পথ দেখুন, বাড়ী প্রস্তুতের সঙ্গে ঠাকুর ঘরও প্রস্তুত করিবেন। আর একাগ্রভাবে কাতর প্রাণে তাঁকে ডাকুন—তিনি কাঙ্গালের ঠাকুর। কাতরপ্রাণে ডাকিলে তাঁহাকে আসিতেই হইবে। পিতা যেমন পুত্রকে হাত ধরিয়া গৃহে লইয়া যায়, তিনিও তেমনি আমাদিগকে বিপদে অভয় দিয়া হাত ধরিয়া পারে লইয়া যাইবেন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর বেলা ৩ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে গোস্বামী, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবও দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়া উৎসব সমাপ্ত হয়।

এই বৎসর শ্রীপাটে লোক সমাগম পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম হইয়াছিল ; ইহার কারণ বোধ হয় ঐ দিন হুগলী-চুঁচুড়াতে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন থাকায় অনেক লোক উৎসবে যোগদান করিতে পারে নাই।

মঙ্গলবার ও রবিবার রেলওয়ে কোম্পানী বেলা ৫টার সময় ত্রিশবিঘা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে

শ্রীশ্রী৺উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব

বিগত ২৪শে পৌষ মঙ্গলবার কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে ময়মনসিংহ সুবর্ণবণিক্ যুবক সঙ্ঘের নিম্নলিখিত সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বজাতীয় মহোদয়গণের (তন্মধ্যে হুগলী নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ শীল ময়মনসিংহের সব্-জজ মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য) সাহায্যে ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পারিষদ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নর্ম্মসখা, দ্বাদশ গোপালের একতম রত্ন বণিক্কুলপাবন শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব স্থানীয় বড়বাজারস্থ ভক্তপ্রবীণ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের শুসঙ্গ বাই লেনস্থ একটী মনোরম ও সুসজ্জিত দ্বিতলগৃহে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রথমতঃ ময়মনসিংহের স্বনামধন্য সুগায়ক শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রমোহন সেন তাহার সুললিত কণ্ঠে একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিয়া আগত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে ভক্তিরস সঞ্চারিত করিয়া দেয়। পরে স্থানীয় বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের মাননীয় সভাপতি, আনন্দমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রফেসর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মহাশয় ভক্তবীর উদ্ধারণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও পূজা সমাপনান্তে অতি সুমধুর, মর্ম্মস্পর্শী, নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রেমরসে আপ্লুত করেন। পরে স্বজাতীয় ধর্ম্মপ্রাণ কয়েকজন তাঁহাদের সুশ্রাব্য ও প্রাণ-মাতোয়ারা সংকীর্ত্তনে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপর সমাগত ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ ও জলযোগ দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তির সংখ্যা অন্যূন ৫০।৬০ জন হইবে। ভিন্নজাতীয় কয়েকজন মহোদয় ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী পূর্ণ চৈতন্য ও হিন্দুমিশনের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ব্রহ্মচারী হরিবিনোদ এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদের আনন্দ সংবর্দ্ধন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বজাতীয় ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই যোগদান করেন নাই। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূর করিতে না পারাই ইহার মুখ্য কারণ, যদিও স্বজাতীয় মহাসমিতি পুনঃ পুনঃ অধিবেশনে তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের এই করুণ বিলাপধ্বনি আমাদের নিকট সুদূর অরণ্যে রোদনবৎ বোধ হইতেছে। হায়! ইহাই যে আমাদিগকে ক্রমে ধ্বংশের পথে ধাবিত করিতেছে, আমরা কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের জাতীয় উন্নতির রশ্মি আমাদের হৃদয়াকাশের নিভৃত কন্দরকে কি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবে না? আর কতদিন আমরা এ জাতীয় জাগরণের দিনে এ ভাবে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব।

আশা করি, ময়মনসিংহের যুবক-সঙ্ঘ এতাদৃশ ভক্তিপ্রবণ ও অনুরাগপূর্ণ উৎসবটী প্রতি বৎসরেই প্রাণপণে অনুষ্ঠান করিবেন ও যাহাতে স্বজাতীয় মহোদয়গণের প্রত্যেকে উহাতে যোগদান করিয়া উহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন ও প্রাণঢালা সহানুভূতি প্রদান করেন তৎপ্রতি এ সঙ্ঘের প্রত্যেক যুবকই সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এরূপ করিলে ক্রমে সাম্য না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।

উৎসাহী সভ্যবৃন্দের নাম—

১। শ্রীযুক্ত লোকনাথ সেন
২। " খগেন্দ্রকুমার মুন্সী (সম্পাদক)
৩। " যতীন্দ্রনারায়ণ মুন্সী
৪। " যোগেশচন্দ্র দত্ত
৫। " ব্রজেন্দ্রমোহন দাশ (সভাপতি)

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩৮ সাল | ৪র্থ সংখ্যা

সুইডেনের শিল্প-বাণিজ্য

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্ এ, বি এল্

বর্ত্তমান সময়ে সুইডেন শিল্প-বাণিজ্যের দিক্ হইতে ইয়োরোপের অগ্রসরতম দেশসমূহের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশের নীচে ইহার স্থান। তথাপি ক্ষুদ্র সুইডেন যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অতিশয় পারদর্শিতা দেখাইয়াছে, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সুইডেনের দিয়াশালাইর ব্যবসা একটা বিপুল কীর্ত্তি। এই দিয়াশালাই ভারতের বাজার অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর বহু দেশে সুইডিশ দিয়াশালাই অন্যান্য দেশে প্রস্তুত দিয়াশালাইর সহিত প্রতিযোগিতায় আপনার স্থান অবিকৃত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা যে প্রাইমাস্ ষ্টোভ ব্যবহার করিয়া থাকি এবং যাহা নাকি পৃথিবীর বহু দেশে প্রচলিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহার উৎপত্তিস্থল সুইডেন। সুইডেন হইতে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরি হইয়া এদেশে আসে ও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুইডেন হইতে শিল্পজাত দ্রব্য কোন্ দেশে কি পরিমাণ মূল্যের রপ্তানি হয় তাহা ১৯২৪ সনের নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যাইবে।

দেশের নাম		কোটি ক্রোনার
নরওয়ে	...	৫.১
ডেন্মার্ক	...	৭.১
ফিন্ল্যাণ্ড	...	২.৪
ইস্থোনিয়া	...	.৩
লেট্ল্যাণ্ড	...	.৫
লিথুনিয়া	...	.২
রুশিয়া	...	৪.৪
ডান্‌ৎসিগ্	...	.১
পোল্যাণ্ড	...	.৭

দেশের নাম		কোটি ক্রোনার
জার্ম্মাণি	...	৯·৬
অষ্ট্রীয়া	...	·২
চেকোশ্লোভাকিয়া	...	·৩
সুইট্জারল্যাণ্ড	...	·৪
বেলজিয়াম	...	·৪
ফ্রান্স	...	৯·১
গ্রেট বৃটেন	...	৩২·২
আয়ার্ল্যাণ্ড	...	·৬
স্পেন	...	৩·৪
পর্ত্তুগাল	...	·২
ইতালি	...	১·২
গ্রীস	...	.৫
তুরস্ক	...	·৩
ঈজিপ্ট	...	·৫
আলজিরিয়া	...	·২
কানাডা	...	·৪
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	...	১৪·৮
মেক্সিকো	...	·২
কিউবা	...	·৩
ব্রাজিল	...	·৬
আর্জিন্টিনা	...	১·৭
চিলি	...	·২
পেরু	...	·১
ক্যানারী দ্বীপ	...	·২
বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা	...	১·৬
বৃটিশ ভারত	...	·৯
ডাচ্ ঈষ্ট ঈন্দীজ্	...	·৩
জাপান	...	২·১
চীন	...	·৮
অষ্ট্রেলিয়া	...	২·১
নিউ জীল্যাণ্ড	...	·২

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে সুইডেন পৃথিবীর কত স্থানের কতপ্রকার অভাব-অভিযোগ মিটাইতে সমর্থ হইতেছে। সুতরাং সুইডেনের শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু খোঁজ লওয়া বাঙ্গালী পাঠকের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

বৃত্তি অনুসারে লোক-বিভাগ

আমাদের মত সুইডেনেও প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর লোক-গণনার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। যাহারা খাটিয়া খায় বা উপার্জ্জন করে তাহাদিগকে বৃত্তি অনুসারে নিম্নলিখিত চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে—

(ক) চাষবাস, মৎস্য-শিকার ও বন-পালন
(খ) ম্যানুফ্যাকচারিং বা শিল্প-ব্যবসা, খনি-খনন
(গ) বাণিজ্য, যান-বাহন
(ঘ) সরকারী চাকুরে ও অন্যান্য চাকুরে

১৯২০ সনের লোক গণনায় দেখা গিয়াছিল যে এই চারি বিভাগের লোক শতকরা এইরূপ ছিল: (ক) ৪৪%, (খ) ৩৫%, (গ) ১৫·২% ও (ঘ) ৫·৮%। বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বৃত্তিতে লোক সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কথা নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝা যাইবে।

সন	(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	মোট
	লাখ	লাখ	লাখ	লাখ	লাখ
১৮৭০	৩০	৬	২	৪	৪২
১৮৮০	৩১	৭	৩	৪	৪৫
১৮৯০	২৯	১১	৫	৪	৪৯
১৯০০	২৭	১৫	৭	৪	৫৩
১৯১০	২৬	১৭	৯	৪	৫৬
১৯২০	২৫	২০	৯·৫	৪	৫৯·৫

দেখা যাইতেছে যে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চাষবাসে লিপ্ত নরনারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদিতে, (খ) ও (গ), অনবরত বাড়িতেছে। ইহার অর্থ এই যে সুইডেন অধিকতর পরিমাণে ইন্ডাষ্ট্রীয়েলাইজ্ড হইতেছে বা কলকারখানা ইত্যাদির স্থাপনা দ্বারা কাঁচা মাল হইতে দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। সুইডেন এই সব দ্রব্য নিজ দেশে কাটাইবার জন্যই শুধু করিতেছে, তাহা নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে

আপনার তৈরি মাল পাঠাইয়া লাভবান্ হইবার জন্য সুইডেন এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং ইহার রপ্তানি বাণিজ্য যে দূর দূরান্তর দেশের সহিত পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। এ-সম্পর্কে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, সুইডেনের শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যান-বাহন-শিল্পেরও (গ) উন্নতি ঘটিয়াছে। কাঁচা মাল হইতে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে পাঠাইতে হইলে সর্ব্বপ্রকারে মাল চলাচলের পথের সুগমতা বৃদ্ধি পাওয়া চাই। রাস্তা ঘাট, নদী, নালা, খাল, রেল, জাহাজ, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রসার ঘটিতে থাকে এবং এই সকল কর্ম্মের জন্য দেশের মধ্যে অনেক লোকের আবশ্যক হয়।

কোন্ ব্যবসায়ে কত লোক খাটে

সুইডেনের প্রধান প্রধান ব্যবসার প্রত্যেকটার সংখ্যা কত এবং প্রত্যেকটায় কতজন করিয়া দিনমজুর খাটিতেছে তাহার হিসাব (১৯২৪ সন) নিম্নরূপ—

শিল্প-ব্যবসার নাম	শিল্প ভবনের সংখ্যা	নিযুক্ত লোকের সংখ্যা	মোট লোকের শতকরা
খনিতে	১১৩	৮,৮০০	২·৩%
লোহা ও ধাতুর কারখানা এবং লৌহজ ও ধাতব শিল্প	৭৫৮	৪৩,০০০	১১·৩%
কল, জাহাজ নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা	১,০০৩	৫৪,১০০	১৪·৩%
খনিজ দ্রব্য ও প্রস্তর-দ্রব্যের ব্যবসা	৯৭৬	৩৮,৩০০	১০·১%
কাঠের ব্যবসা	২,০১৩	৫৭,১০০	১৫·০%
কাগজ ও ছাপাখানা	৮৮০	৪৮,০০০	১২·৭%
খাদ্যদ্রব্য	৩,৩৬১	৪১,৬০০	১১·০%
বয়ন ও দরজীর কাজ	৬৩২	৫০,৬০০	১৩·৩%
চামড়া, জন্তুর লোম ও রবারের দ্রব্য	৩৯৮	১৭,৯০০	৪·৭%
রাসায়নিক দ্রব্য	৩৫৪	১৪,০০০	৩·৭%
শক্তি উৎপাদক, বাতি ও জল ব্যবস্থা	৭০৫	৬,২০০	১·৬%
মোট	১১,১৯৩	৩৭৯,৬০০	১০০·০%

সুইডেনের কাঠের ব্যবসা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করিয়া থাকে। সুইডেনের বনানী দিয়াশালাই, কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার খুব উপযোগী, জাহাজের জন্যও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং কাঠের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার জড়াইয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ১৫% এর বেশী লোক কাঠের দৌলতে অন্ন-সংস্থান করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু উপরের তালিকা হইতে শুধুমাত্র শিল্প-ভবনের সংখ্যা দ্বারা ব্যবসার প্রসার বিচার করা যেরূপ অন্যায় হইবে, একমাত্র নিযুক্ত লোকের সংখ্যা দ্বারা ব্যবসার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে ধারণা করাও তদ্রূপ অন্যায় হইবে। কারণ একটু বিবেচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে বেশী কারখানা থাকিলেই বেশী লোক কাজ পায় না একথা যেমন সত্য, অল্প লোকের দ্বারাও বেশী ফল উৎপাদন করা যায় একথাও তেমনি সত্য। ইয়োরোপের অগ্রসরতম দেশসমূহে র‍্যাশানালিজেশন, সঙ্ঘবদ্ধতা ইত্যাদি দেখা দিয়াছে। সুইডেনও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। সেইজন্য যেখানে কম লোক নিয়োজিত হইতেছে সেখানেও সাবধানতার সহিত দেখিতে হইবে ব্যবসাটা বাস্তবিক কত বড়।

সুইডেনের ব্যবসাসমূহের মূল্য

১৯১৩ সনে সুইডেনের পূর্ব্বোক্ত ব্যবসাগুলির "ওয়ার্কিং আপ্ ভ্যালু" বা মোট মূল্য কষিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবসাগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

ব্যবসা	মিলিয়ন ক্রোনার	দামের শতকরা
খনি	৫৯·২	৬·৮%
লোহা ও ধাতুর কারখানা ইত্যাদি	৯৮·৮	১১·৩%
কল, জাহাজ নির্ম্মাণ, ইত্যাদি	১৪৯·৬	১৭·১%
খনিজ ও প্রস্তর দ্রব্য	৬৪·২	৭·৪%
কাঠ	১০৭·৭	১২·৩%
কাগজ ও ছাপা	১০৫·১	১২·০%
খাদ্যদ্রব্য	১৩৮·৮	১৫·৯%
বয়ন ইত্যাদি	৮২·৪	৯·৫%
চামড়া ইত্যাদি	২৬·৪	৩·০%
রাসায়নিক্ ইত্যাদি	৪১·০	৪·৭%
মোট—	৮৭৩·২	১০০·০%

জীবতত্ত্বের অ-আ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

(৬)

মনোরাজ্যের কথা ছেড়ে দিই, বাস্তব জগতে এমন দুটো মানুষ দেখা যায় না—যারা চেহারায় হুবহু এক রকমের। অথচ এই বিপুলা চ পৃথ্বির মধ্যে একশ' সত্তর কোটি এমন জীব বাস কচ্ছে—যারা দেহে ও ব্যবহারে এমন একটি সাধারণ সৌসাদৃশ্য প্রকাশ কচ্ছে, যাতে ক'রে আমরা তাদের মানুষ বলে' চিন্‌তে পারি; তারা সবাই বৃহত্তর মানব জাতির মণ্ডলের মধ্যে বাস করে।

কটা চুল, মোহন বাঁশীর মতো নাক, গৌরবর্ণ চেহারা-ওয়ালা একজন ইংরাজ দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি—ইনি ইয়োরোপের কোনো দেশের অধিবাসী; আবার অতি ঘন-কোঁকড়া-ক্ষুদ্র চুল, থ্যাবড়া নাক, আব্‌লুশ কাঠের মতো চেহারাবিশিষ্ট একজন কাফ্রিকে দেখলেই বুঝতে পারি—এটি আফ্রিকা মহাদেশের কোনো স্থানের অধিবাসী। এই দুই দেশবাসীর চেহারার মধ্যে এমন কয়টা পরিস্ফুট অসৌসাদৃশ্য আছে যে, একজনকে দেখে আর একজন বলে' ভুল কর্‌বার যো নেই। এদের দুজনকে কি এক জাতির অন্তর্গত বলে' স্থির করব?

বহুদিন পূর্বে জাতিতত্ত্ববিৎ ব্লুমেনব্যাক্ সাহেব পাঁচটি মহাদেশে অবস্থিত পাঁচটি মোটামুটি জাতি বিভক্ত করে' গিয়েছেন। পরবর্তী জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা তাঁর ঐ মূল সূত্র থেকে তন্তু বার করে' করে' পৃথিবীর মধ্যে অনেকগুলি শাখা-জাতি বা উপজাতি তৈরী করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক-একটা জাতির ভেদ-রেখা কোথায় আরম্ভ হয়েছে আর কোথায় শেষ হয়েছে, তা নিশ্চয় করে' বলা যায় না; কোন্ জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে ককেসিয়ান্ রক্তধারা এবং তাদের কোন্ প্রতিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলিয়ান্ রক্তধারা প্রবাহিত এবং এদের কারো মধ্যে দুই রকমের রক্তধারা প্রবাহিত আছে কিনা কোনো জৈবতাত্ত্বিক যন্ত্র-সাহায্যেই নির্ণয় করে' বলা কঠিন। এই সকল জাতির একটির সহিত আর একটি বা ততোধিকের অল্প-বিস্তর রক্তের সংমিশ্রণে যে পৃথিবীর দৃশ্যমান্ সকল সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি তৈয়ারী হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। মহাভারতের সময়েই আপনারা দেখ্‌তে পেয়েছেন—"সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণশঙ্করঃ।" অর্থাৎ অনেক দিন ধরেই পৃথিবীতে নৈকষ্য কুলীন জাত একেবারে নাস্তি!

ভাষা-ভেদের মধ্য দিয়ে জাতিত্বের সীমান্ত নির্ধারণ কর্‌তে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। আমেরিকায় লাখ্ লাখ্ নিগ্রো আছে; তারা ইংরাজীতে কথা কয়, ইংরাজী পোষাক পরে, সকলেই-প্রায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং সভ্য। কয়েক পুরুষের মধ্যে তাদের চেহারারও একটু হের্‌ফের হয়েছে, অনেকে নিকষ কালো থেকে দুর্বাদল-শ্যামে এসে দাঁড়িয়েছে। যাহোক্, ইংরাজী ভাষা বা পোবাক-আশাক্ দিয়ে শুধু এদের বিচার কর্‌লে এরা ত আমেরিকান্‌দের মৌলিক জাতির মধ্যেই পড়ে। আসল কথা হচ্ছে এই—"জাতি" শব্দটা মৌলিক রক্তসম্বন্ধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমষ্টিগত দৈহিক প্রকৃতির একত্ব অর্থেই প্রযোজ্য।

ভিন্ন আব্‌হাওয়া ও আবেষ্টনীর মধ্যে পড়্‌লে একটা তথাকথিত জাতির বা সেই জাতির কোন কোন মানুষের শারীরিক বিশেষত্বসূচক লক্ষণাবলীর ঠিক্ কতটা পরিবর্তন হ'তে পারে—তা এখনো নির্ণীত হয়নি। তবে কয়েক পুরুষের মধ্যে যে কতকটা পরিবর্তন হয় এবং আন্তর্জাতিক্ বিবাহে এক পুরুষ পরেই যে স্পষ্ট হের্‌-ফের লক্ষিত হয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জান্‌তে পেরেছি। "আর্য্য" বা "সেমিটিক্" বলে কোনো স্থূল "জাতি" নেই; পূর্বে যারা এই ভাষায় কথা বল্‌ত—তাদেরকেই তত্তৎ নামে বিশেষিত করা হ'ত। পূর্বে যারা ঐ আর্য্য ভাষা

ও আর্য্যসভ্যতা গ্রহণ করেছে, তাদেরকেই আর্য্যনামে অভিহিত করা হয়েছে। মোট কথা হচ্ছে এই যে, জাতি বল্‌ব সেই নগ্ন শরীরটাকে—যা নিয়ে আমরা জন্মাই; তাকে ভাষা আর কৃষ্টির পোষাক্ পরিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়, সেটা আর যাই হোক্—জাতি নয়। নানা গণ, শ্রেণী বা গোষ্ঠির লোক এই পৃথিবীতে আছে; এদের প্রত্যেকের অপর গুলির সঙ্গে হয়ত অল্প-বিস্তর শারীরিক সৌসাদৃশ্য আছে অথবা নেই, ভাষাগত বা সংস্কৃতি-গত (cultural) একত্ব আছে অথবা নেই। জন-সমষ্টিকে ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও কৃষ্টি দ্বারা বিভাগ করা এক জিনিস, আকারগত বিশেষত্ব দ্বারা বিভাগ করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস্।

জাতিতত্ত্ববিদরা ছোট-বড় জাতি-উপজাতি বিভাগ করে' তার কোন্‌টি প্রথমে, কোন্‌টি পরে, কোন্‌টি আদি, কোন্‌টি অকৃত্রিম, কোন্‌টি উচ্চ—কোন্‌টি নীচ—তা স্থির কর্‌তে গণ্ডদেশে হস্তার্পণ করে' গভীর গবেষণা কর্‌ছেন। আপনারা বোধহয় কলিকাতা-সহরের রাস্তা চল্‌তে প্রায়ই দেখেছেন অনেক দোকানের সাইন্-বোর্ডে "আদি ও অকৃত্রিম" কথাটি লেখা আছে। যেহেতু ওটা শিরিষ চক্রবর্ত্তীর আদি ও অকৃত্রিম মাংসের দোকান, সেহেতু ওটা যে সব দোকানের চেয়ে বড় ও ভালো, অতএব ওই দোকানেই যে সবান্ধবে প্রবেশ কর্‌তে হবে—এই সহজ সিদ্ধান্তটাই আমাদের মনে জাগে। ওই দোকানে যে কথনো চপ্-কাটলেটের মধ্যে কুকুরের মাংস পুরে দিতে পারে—এ কল্পনাও আমাদের মস্তিষ্কে কথনো উদয় হয় না, কারণ শিরিষ চক্রবর্ত্তী যে কলিকাতার আদি ও অকৃত্রিম হোটেলওয়ালা! তথাকথিত জাতিরও তেমনি যেটি আদি ও অকৃত্রিম অর্থাৎ কিনা—অমিশ্রিত, সেইটিই সব চেয়ে বড় ও ভালো হ'বে কি? আচ্ছা, জাতির মধ্যেও কি উঁচু ও নীচ পর্য্যায় আছে? সাধারণ বুদ্ধিতে বলে—হ্যাঁ আছে। সাধারণ বুদ্ধি আরো বলে—ভূতে রাত দুপুরে ভাজা মাছ চায়, ডাইনীতে নজর দিয়ে সাদা দুধকে লাল করে' দেয়, পৃথিবীটা সমতল-ক্ষেত্র! তাই কি বিশ্বাস কর্‌তে হবে?

মানুষ আদিতে অকৃত্রিম ন্যাজহীন বানর ছিল, তাই বলে' কি বানর জাতটাকে মানুষ জাতের চেয়ে উঁচু আসন দেব? শুক্লপক্ষ 'ককেসিয়ান্' জাত বড় কি কৃষ্ণপক্ষ 'ইথিওপিয়ান্' জাত বড়—কোন্‌টি মানবিক্ ক্রমবিকাশের আদি এবং কোন্‌টি অন্ত—তা' নিয়ে জাতিতত্ত্ববিশারদরা অনেক মাথা ঘামাচ্ছেন এবং ঘামাবেনও। ধলায় যখন পৃথিবীর জাতিগুলোর উচ্চনীচত্ব নির্ণয় করতে বসে, তখন সে ধলাকে উচ্চ ও কালাকে নিম্ন আসন দেবেই। আত্ম-প্রীতি বা স্বজাতি-গৌরব জীবনের একটা মৌলিক নীতি বটে! এটা চমৎকার মনস্তত্ত্ব হ'তে পারে, কিন্তু নির্বিকার জীবতত্ত্ব নয়!!

জাতিতত্ত্বের রাজ্যে চর্ম্মের বর্ণ-ভেদের কোনো কদর নেই। মানুষের চামড়ার রং কালো বা ফর্সা হয় কেন—তা আপনাদের আগেই বলেছি। কারণটা আবার গুছিয়ে নূতন করে' বল্‌তে গেলে এই বল্‌তে হয় যে, প্রধানতঃ সূর্য্যের উত্তাপ-প্রাখর্য্য থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে দেশের অধিবাসীর যতটা প্রয়োজন, ততটা গাঢ় বর্ণ-সুষমা সেই দেশের অধিবাসীর চামড়ার মধ্যে সেই দেহ-প্রকৃতি জন্মিয়ে দেন্। এই চামড়ার বর্ণ-সুষমার অনেকটা মূলধন বাপ-মা থেকে নেমে আসে বটে; তা' ছাড়া পূর্ব্বপুরুষদের রক্তের সংস্কারও তার উপর একটু প্রভাব বিস্তার করতে ছাড়ে না। বাঙালীর মধ্যে বর্ণের তারতম্য যতটা দেখা যায়, ততটা আর পৃথিবীর কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় না। এর কারণ হচ্ছে যে, পৃথিবীর আদি জাতির সব শাখাগুলিরই রক্ত এদের ভিতর অল্প-বিস্তর মিশে রয়েছে। আমাদের বাঙালীর মত বর্ণ-সঙ্কর জাত আর ভু-ভারতে দুটি নেই।

এখন জীবতত্ত্ব লিখবার ভার যদি আমরা নিই, তাহ'লে বোধ হয় পৃথিবীর যে-জাতিটার সর্ব্ব প্রকারের বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাদেরকেই সব চেয়ে উঁচু জাতি বলে' ফতোয়া দেব। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট কথিকা মনে পড়ে' গেল। একবার পশ্চিমাঞ্চলের কোনো নবাবকে এক বিলাতী সাহেব ঠাট্টা করে' বলেছিলেন—"তোমাদের ভারতবর্ষে যত রকম রঙের লোক আছে—এমনটি আর কোথাও নেই; দেখ তো ইয়োরোপীয়দের সব এক রকমের রঙ—সাদা! প্রত্যুৎপন্নমতি নবাব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ঘোড়া"

বহুৎ রংকা হোতা হায়, লেকিন্ গাধা বিল্‌কুল এক রংকা হোতা !”...

জাতির উচ্চ-নীচত্ব নির্ণয় ব্যাপারে এরূপ এন্টি‌নি-ফিরিঙ্গী-সুলভ নজীরের মূল্য মোটেই নেই। জাতি-সুলভ রঙের-যে স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ আছে, তা আমরা ইঙ্গ-ভারতীয়দের দেখ্‌লেই বুঝতে পারি। ভূতপূর্ব স্কুল-ইন্সপেক্টর ষ্টার্ক সাহেবকে বোধহয় অনেকে দেখেছেন্; হ্যাট্-প্যান্ট্ খুলে নিয়ে তাঁকে ধুতি-চাদর পরিয়ে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে কুলীন বামুনদের সঙ্গে এক সারিতে বসিয়ে দিলে, কেউ তাঁকে ইয়োরোপীয় জনক-জননী-জাত বলে' বুঝতেই পারবে না।

তার উপর ব্যায়রামে শরীরের রংকে খুব সহজে পরিবর্তন করে' দিতে পারে। শ্বেতি রোগ মিশ্ কালো রংকে হুবহু বদ্‌লে দিতে পারে। 'ইয়োলো ফিভার্' কিংবা কাম্‌লা রোগ যখন হয়, তখন সাদা চাম্‌ড়ার আগা-গোড়াই “গায়ে-হলুদ” হয়ে যায়। 'য়্যাডিসন্স ডিজিজ' হ'লে নিছক্ শ্বেত চর্মকে ঘোর কপিশ বর্ণে রূপান্তরিত করে' দেয়। গৌরাঙ্গের সারা গায়ে কালো তিল, কালো জড়ুল, কালো ছুলি বা 'মেলানোসিস্' রোগ (যাতে রক্ত স্রোতের মধ্যে কৃষ্ণ-বর্ণ-সুষমা তৈরী হয়ে চাম্‌ড়ার 'পরে তা' সঞ্চিত হয়ে যায়) হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

আদি মানব জাতির রং বোধহয় খুব সম্ভবতঃ কালো ছিল। নেগ্রয়েড্ জাতির মধ্যে বর্ণ-সুষমার গাঢ়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, মঙ্গোলয়েড্ জাতির মধ্যে তা অত্যন্ত কমে গেছে; ককেসিয়ান্‌দের মধ্যে এটা মাঝামাঝি পরিমাণে দাঁড়িয়ে গেছে। মোদ্দা কথা, রঙের মালিন্য বা উজ্জ্বলতা নিয়ে জাতির উপজাতির ছোট-বড়ত্বের পরিমাপ করা চল্‌বে না; তা হ'লে আমাদের দেখাদেখি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকরাও বায়না ধরে' বস্‌বেন—যেহেতু শুক্রগ্রহ সব চেয়ে সাদা, সেহেতু ওটা সকলের উপরে !

আফ্রিকার অধিবাসীদের চোয়াল্ বেশ ভারী ও শক্ত; এই চোয়ালের মাঝখানে তারা চমৎকার দু'পাটি মুক্তাপাঁতির মতো দাঁত ধারণ করে' রেখেছে। এই দাঁতগুলির গুণ এই যে, টুথ-ব্রাস দিয়ে কখনো এদেরকে মাজ্‌তে হয় না, এরা মুঠো মুঠো শুক্‌নো ছোলাকে চিবিয়ে ছাতু করে' দিতে পারে, বড় বড় আকের চোক্‌লা এরা আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছাড়িয়ে ফেলে। আর ইয়োরোপীয়ান্‌দের দাঁতগুলো মাসে একবার করে' দন্ত-চিকিৎসককে গিয়ে দেখাতে হয়, ত্রিশ বৎসরে দুই পাটীই বাঁধিয়ে নিতে হয় এবং দুটুকুরো সিদ্ধ মাংস চিবোলে পরদিন দাঁতের মাড়ী ফুলে উঠে। কোন্ দাঁতগুলোকে আদি ও অকৃত্রিম বল্‌ব—বলুন। আবার নেগ্রোদের যেমন বাইরের দিকে উল্টানো পুরু-পুরু এক জোড়া ঠোঁট্ আছে, ও রকম আর পৃথিবীর কোনো জাতির দেখা যায় না। পাতলা ঠোঁট্ কিন্তু আদিমতার চিহ্ন, বানরদের খুব পাতলা ঠোঁট; কাজেই নীচত্বব্যঞ্জক। তারপর, ভ্রুর নিকটে ললাটের অস্থি-ফলকটি গরিলাদের যেমন উঁচু থাকে, নিগ্রোদেরও কতকটা তেমনি থাকে। সারা গাত্রে লোমের প্রাচুর্য্য নিগ্রোদের মোটে নেই বল্লেই হয়, বরং ধলারা এ বিষয়ে বিশেষ ভাগ্যবান্; কাজেই এটাও একটা আদিমতার চিহ্ন।

মাথা বড় বা মস্তিষ্কের ওজন বেশী হলেই সে জাতি বা মানুষ বেশী বুদ্ধিমান্ হবে না—একথা আপনাদেরকে আগেই শুনিয়ে দিয়েছি। আফ্রিকান্‌দের মস্তিষ্কের চেয়ে ইয়োরোপীয়ান্‌দের মস্তিষ্কের ওজন অকিঞ্চিৎকরভাবে বেশী। পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার 'নীয়াণ্ডার্থ্যাল্' মানুষের যে মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তা আজকালকার ছোট একটা মাথার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ আকারের। নিগ্রোদের নাক, কোমরের শিরদাঁড়া (কটি কশেরুকা) প্রভৃতিতে তারা পূর্বপুরুষদের কতকটা কাছ ঘেঁষে রয়েছে। ইহুদিদের নাক খুব লম্বা; অথচ তাদের জাতকে কেউ বড় বলে' আমল দেয় না। তারা জগতের ক্ষয়িষ্ণু জাতির অন্যতম।

অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, কতকগুলি দৈহিক বিষয়ে ধলা জাতিরা তাদের পূর্বপুরুষ জানোয়ারদের নিকটতম, আবার কতকগুলি বিষয়ে দূরতম। এতেও প্রমাণ হচ্ছে যে, ধলারা কালাদের চেয়ে জাতি হিসাবে উঁচু নয়। কোনো প্রত্যক্ষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর সব সভ্য জাতির কতকগুলি লোককে তাদের জাতীয় বিশেষত্ব থেকে দূরাগত দেখা যায়। তাদের ছেলেপুলেরা আবার হয়ত

আরও অনেকখানি জাতীয় বিশেষত্ব বর্জিত হয়ে জন্মায়। এস্কিমো জাতদের মধ্যে কাউকে কিন্তু জাতীয় বাহ্যিক বিশেষত্ব থেকে বড় একটা চ্যুত হ'তে দেখা যায় না। তারা পরস্পর দেখতে এমন এক রকমের যে, অল্প পরিচিত লোকের রামকে দেখে শ্যাম বলে' ভ্রম হবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাদের মাথার খুলিগুলো হুবহু এক রকমের। হাজার জাতের মাথার খুলির ভিতর একটা এস্কিমোর মাথার খুলি থাকলে, ওস্তাদ তা' তৎক্ষণাৎ বেছে নিতে পারেন। এদের রক্ত তাহ'লে খুব পবিত্র বল্‌তে হবে। প্রকৃতপক্ষে এস্কিমোরা বহুলাংশে অমিশ্রিত জাতি!

যাহোক্, প্রকৃতি মানুষ সৃষ্টি করবার সময় তাদের ভিতর ভেদ-রেখার সৃষ্টি করে' দেন্ নি, এটা নিশ্চিত। তিনি তৈরী করে দিয়েছেন এক অখণ্ড মানুষ জাতি। ধরে নেওয়া যাক্—তিনি আপনার একটা গোপন উদ্দেশ্যমূলক খেয়ালের বশে কাউকে কালো, কাউকে সাদা, কাউকে তামাটে, কাউকে হলদে রঙের পোঁচ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন; যেমন বড় লোকেরা আপনাদের মর্জ্জি মাফিক্ বৈঠকখানা ঘরটা নীল রঙে, লাল রঙে, সাদা রঙে বা বাদামী রঙে পেন্ট করিয়ে নেন্।

যাদের কায নেই, তারা খই ভাজার মতো এই মানুষ জাতির রং বাছাই করতে সুরু করে' দিয়েছে এবং কোন্ রঙ পাকা তাই নিয়ে মারামারি লাগিয়েছে। প্রকৃতির এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের খেয়াল্ আমরা মানবেতর জীব-জন্তুর মধ্যেও দেখতে পাই। কালো বেরালের সাদা ছানা হ'তে অনেক সময় দেখা যায়; সাদা গরুর কালো বাছুরও জন্মায়। সভ্যতার অভিমান ও ভব্যতার ভণ্ডামী-পরিশূন্য জীবের অন্তঃপ্রকৃতিও কালো সাদার বিচার করে না। কালো কুকুরী সাদা কুকুরের সঙ্গে সম্মিলিত হ'তে কোন কালেই আপত্তি করে না। "গোরচনা গোরী নবীন নাগরী" রাধা ও ডেস্‌ডেমোনা কালো রূপ-দীঘির জলেই ডুব দিয়েছিলেন।

কালো রঙই যে আদিম রং—তা আগেই বলেছি, এবং কেন—তাও বলছি। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, তার রং তত সাদা ও চক্‌চকে হ'তে চাচ্ছে। অর্থাৎ সভ্যতার রং এখন সাদা বলে' ধরে নেওয়া হয়েছে। গায়ের রং যাঁর নিকষ কালো, তিনি সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের রং সাদা করবার জন্যে দু'বেলা ভগবানকে ডাকেন; ভগবান ডাক্ না শুন্‌লে দু'বেলা গায়ে সাবান্ ঘষেন, স্নো ও পাউডার মাখেন; সাদা ময়দা, সাদা চাল, সাদা চিনি খান্। শোক জিনিসটা একটা অসভ্যতা বলে' বোধ হয় সাদা জাতিরা কালো পোষাকে শোক-চিহ্ন ধারণ করেন; তাই কালোর দুঃখে সাদার এত শোক!

এই কালোর উৎপত্তি আগে, না সাদার উৎপত্তি আগে, কে কা'র জ্যেষ্ঠ—তার একটা সহজ মীমাংসা হয়ে যায়, যদি দু' পাঁচ হাজার বছর আগের মানব জাতির ইতিহাসের পাতা উল্টানো যায়! ভারতবর্ষে যখন সভ্যতার আলো ধরে' আর্য্যরা প্রবেশ কর্‌লেন, তখন কালো রূপেই ভারত আলো দেখেছিলেন। এই আদিম অধিবাসীদের স্মৃতিচিহ্ন এখনো কোল, ভীল, সাঁওতাল, কুকি, নাগা, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির মধ্যে জেগে রয়েছে। আফ্রিকায় আবহমানকাল আব্‌লুশ কাঠ ও আবলুশ রঙের মানুষ দেখ্‌তে পাই। পশ্চিম প্রশান্ত সাগরের মেলানেসিয়ান্ জাতিরাও আফ্রিকার অধিবাসীদের মতো বর্ণাকৃতিসম্পন্ন। এই দু'জাতির মধ্যে কেবল একটা বিরাট বৈষম্য আছে। এক জায়গায় চ্যাপ্টা নাক আর এক জায়গায় বোঁচা নাকের বাহার! মেলানেসিয়ার নিকটবর্ত্তী ফিজি দ্বীপের অধিবাসীরা ঘোর মসী বর্ণ; আবার তার অনতিদূরেই ইণ্ডো-চায়না ও আনামের অধিবাসীরা হরিদ্রাভ। ভারতে দেখুন—মাদ্রাজের দ্রাবিড় উপজাতি তামাম্ কালিন্দীর রূপ দেহে ধরে' রেখেছেন, আর তার পাশেই ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসীরা সবাই কেমন ফর্সা। অথচ এই দুই জায়গার জলহাওয়ার তারতম্য বিশেষ কিছুই নেই। অষ্ট্রেলিয়ান্‌রা বিস্ময়কর জাত। এদের নাক খুব চ্যাপ্টাও নয়, খুব উঁচুও নয়, রং কালো বটে—একেবারে মিশ্‌ কালো নয়, উচ্চতায় মাঝামাঝি রকমের, রোগাটে, চুল কোঁকড়া, মাথা লম্বাটে ধরণের, চোয়াল খুব স্পষ্ট ও প্রশস্ত নয়। এরা ককেসিয়ান ও নেগ্রোয়েড্ শ্রেণীর মাঝামাঝি একটা জাতি বলে' মনে হয়।

নেগ্রিটো বলে' আর এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতি আছে; এদের আকৃতি আরো আশ্চর্য্য রকমের ক্ষুদ্র। পৃথিবীর মানুষের গড়্‌পড়্‌তা দৈর্ঘ্য বা খাড়াই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। কসাক্‌রা পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম জাতি, গড়ে পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি হয়। নেগ্রিটোরা কখনো পাঁচ ফুটের বেশী লম্বা হয় না; অনেক বয়স্ক নেগ্রিটো চার ফুট বেড়েই চাঁদের পানে হাত বাড়িয়ে থাকেন। এই নেগ্রিটোদের বিষুবরেখা সন্নিহিত আফ্রিকার ভূভাগে, মলয় উপদ্বীপ্, ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ গিনিতে দেখা যায়। এরা প্রকৃত বামনের জাত।

কোনো নিষ্ঠাবান্ হিন্দু জাতিতাত্ত্বিক যদি এই বামন জাতির জন্ম-গঙ্গোত্রির সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করে বসেন যে, ভগবান্ যখন বামন অবতারে বলিরাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি যাচিঞা করেছিলেন, তখন এক পাদ ভূমির জন্ম তাঁর অনূঢ়া কন্যার মস্তক নির্দেশ করে দিয়েছিলেন; এবং তার ফলে যে সন্তান জন্মান তিনিই বর্তমান নেগ্রিটোদের আদি পুরুষ......ইত্যাদি, তা হলে' মোটে আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই, যেহেতু গোঁড়া খৃষ্টান্ পণ্ডিতরা তাঁদের জীবতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলের মধ্যে এই রকম কিছু কিছু পরীক্ষিৎ রাজের পোকা ঢোকাতে চেষ্টা করেছেন।

যাহোক্, এই বামন জাতির রং কালোর কালো তস্য কালো বটে, কিন্তু তাদের মুখাবয়ব, নাসিকা-চোয়াল-ঠোঁট-চোখের গড়ন অনেকটা নর্ডিক শাখার (উত্তর ইউরোপীয় জাতির আদি উৎস) মতো। শরীরের পরিমাপে তাদের হাত দুটো বেশী লম্বা—সকলেরই পুরাণ বর্ণিত বীরোচিত আজানুলম্বিত বাহু, যেমন সিম্পাঞ্জী জাতীয় বানরের থাকে। এরা দুই পাশে হাত ঝুলিয়ে ও দুলিয়ে যখন ঘাড় হেলিয়ে পা দুটি থপ্ থপ্ করে' ফেলতে ফেলতে যায়, তখন বৈষ্ণব কবিরা বলতে পারেন—"আহা যেন হেলে দুলে নেচে চলে গোষ্ঠবিহারী", কিন্তু বেরসিক জীবতাত্ত্বিকরা বলেন, "বাঃ, এযে ডাহা বানরদের চল্‌বার ভঙ্গী।"

কেউ কেউ অনুমান কচ্ছেন যে, আমাদের আদি পুরুষরা যখন বানরত্ব হ'তে মানবত্বে ডিঙ্গিয়ে আসেন, তখন মৈনাক্ পর্বতের মতো এই বামন রূপটাকে একটা মধ্যবর্তী বিশ্রামের স্থল করে' নিয়েছিলেন; অথবা এই রূপ নিয়ে মানুষ নাম সার্থক করা যায় কি না—পরীক্ষা করে' দেখছিলেন। এ রূপ তাঁদের পছন্দ হয়নি বটে, তবে তার স্মৃতিকে চিরোজ্জ্বল রাখবার জন্যে এই নেগ্রিটোদের বংশধরকে প্রবহমান করে' দিয়ে গেছেন।

জীবতাত্ত্বিকরা পরমপ্রাণীদের (Primates) ছয়টি কুলীন গোষ্ঠিতে বিভক্ত করেছেন:—(১) লেমারাইডি, (২) হ্যাপাসাইডি, (৩) সেবিডি, (বানর) (৪) সার্কোপিথেসাইডি, (৫) সিমিয়াইডি (ল্যাজহীন মানবানুগ বানর) ও (৬) হোমিনাইডি (মানব)।

ছয়ের নম্বরটি ছাড়া আর পাঁচটি গোষ্ঠিই বানর জাতির বিভিন্ন শ্রেণী, কেহ উত্তর রাঢ়ী, কেহ বঙ্গজ, কেহ বারেন্দ্র, কেহ মুখ্য, কেহ ভঙ্গ.........ইত্যাদি।

জীবতাত্ত্বিকরা সিমিয়াইডি বা বন মানুষ শ্রেণীর মধ্যে চারি গোত্রের বানর পেয়েছেন:—গরিলা, শিম্পাঞ্জী, আরাং-উটান ও গিব্বন (উল্লুক); এবং যথাক্রমে এদেরকে মানুষের পিছনে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যে, আমরা তাদের তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ অবিরত যেন পিঠের উপর পাচ্ছি। তারাও মানবসুলভ রোগসমূহে অতি শীঘ্র আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই চারি জাতি বানরেরই গায়ের রং অল্প-বিস্তর কালো।

গরিলাই হচ্ছে মানব জন্মে ডিঙ্গিয়ে পড়বার শেষ অব্যাহত ধাপ। অবশ্য এর মাঝে আরো নানা রকমের কায়া বদল করে ঈশ্বরের ক্রম-বিকাশ-নীতি সার্থক করবার চেষ্টা হয়েছে। গরিলার পর ও মানুষের আগে এক রকমের আধা-মানুষ আধা-বানর গোছের জীবের শাখা উৎপন্ন হয়েছিল, সে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। এদের নাম "পিথেক্যানথ্রোপাস্ ইরেক্টাস্", এরা পৃথিবী থেকে বহুদিন পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; ভগবান মেধাহীন ছাত্রের মতো বিশ্ব-শ্লেটের উপর অনেক ভুল অঙ্ক কষে' সেগুলো এমনি করে' মুছে ফেলে দিয়েছেন!

তারপর এলো "পিল্ট্‌ডাউন ম্যান"; মানুষ হ'লেও বনমানুষত্বের ছাপ তখনো তার গা থেকে একেবারে মুছে যায় নি। তারপর প্রায় চল্লিশ লক্ষ বৎসর আগে ক্রম-বিকাশের

পথে পথে একটু এগিয়ে এসে দেখা দিল—"হিডেল্‌বার্গ ম্যান্।" চোয়াল্, মাথার খুলি ও মস্তিষ্কের গড়ন প্রায় এদের গরিলার মত; তবে বানর জাতি-সুলভ দাঁতের বদলে এদের মানুষের মতো পাঁচ-মিশালী মাফিক্‌সই দাঁত ছিল। এই স্তরে গায়ের লোম অনেক কমে গেছে, বাহুদ্বয় শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দৈর্ঘ্যে কতকটা ছোট হয়ে এসেছে, দু দশটা কথা বলে' ভাব-বিনিময়ের চেষ্টাও চল্‌ছে। তারপর ৫২ হাজার বছর পূর্ব্বে হাজীর হলেন্ 'নিয়্যান্‌ডার্থাল্' মানুষ; মস্ত বড় মাথা, কিন্তু দেখ্‌লে মানুষ বলে' চেনা যায়। পার্বত্য গুহার মধ্যে বা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে দিব্যি লতা-পাতার আস্তরণ দিয়ে সাজিয়ে বাস করে। বড় পাথর ছুড়ে মারামারি কর্‌তে পারে, পূর্বের চেয়ে একটু ভালো করে' কথা কইতে পারে, চক্‌মকি ঠুকে আগুন ধরাতে পারে; (কিন্তু রাঁধ্‌তে পারে না) এবং মৃতদেহ প্রোথিত করে। তারপর এলেন্ 'গ্রিম্যাল্ডি' 'ক্রো-ম্যাগ্‌নান্' প্রভৃতি অসংখ্য ছাঁচের মানুষ।

সেই অতি পুরাযুগের কোন্ ছাঁচের কোন্ মানুষ থেকে এক-একটা রক্তধারা গড়িয়ে এসে, বর্ণ ও অবয়বের বিশেষত্ব দিয়ে নর্ডিক্, য়্যালপাইন্ মেডিট্যারেনিয়ান্, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান বা হিন্দু জাতিদেরকে গড়ে' তুলেছে, তা' পারম্পর্য্য রক্ষা করে' তদন্ত করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। যাহোক্, পূর্বগামী পশুদের আকৃতির ছাপ তুল্‌তে মানুষকে লক্ষ লক্ষ বৎসর অপেক্ষা ও তপস্যা কর্‌তে হয়েছে; কিন্তু পশু-প্রকৃতিটা সম্পূর্ণ ভুল্‌তে এখনো তাদের কত লক্ষ বৎসর কেটে যাবে—তা' কে জানে!

যাক্, বনমানুষরা যেমন মানুষকে নকল কর্‌তে পারে, সে রকমটি আর কোনো জানোয়ারই পারে না—এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। গরিলা, সিম্পাঞ্জী প্রভৃতিরা পোষ মেনে ও উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে জামা-জুতা-টুপী পরে' ছুরী-কাঁটা ধরে' টেবিলে খানা খেতে পারে; আবার কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়্‌তেও পারে। অনেক বনমানুষদের কেন—রূপী বানরদের হারমনিয়াম্ ও পিয়ানো বাজিয়ে সুরালাপ কর্‌তে দেখা গেছে; কেউ গৃহস্থ বাড়ীতে থেকে পান-দোক্তা বা সিগারেট্ খেতে শিখেছে; কেউ বা দু'চাকার সাইকেল চালিয়ে সার্কাসে দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

মেয়ে-গরিলাদের দূর থেকে দেখ্‌লে অনেকটা অসভ্য মানুষ বলে' ভ্রম হয়; মানুষের নিকটতম সাদৃশ্য এরাই বহন করে। পুরুষগুলোর চেহারা মেয়েদের চেয়ে আর একটু লম্বা ও জংলী ধরণের হয়। সাধারণতঃ এদের উচ্চতা পাঁচ ফুট এবং ওজনে হয় প্রায় পাঁচ মণ। ঘাড়, বুক ও প্রলম্বিত সবল বাহুদ্বয়েরই ওজন হবে প্রায় মণ তিনেক্। হাতের তুলনায় এদের পা দুটো অপেক্ষাকৃত ছোট ও হাল্কা। কিন্তু হাত-পায়ের গঠন ও বিভিন্ন পেশী-সংস্থান প্রায় মানুষেরই মতো। এরা যেমন অমিত বলশালী, সাহসে তেমনি দুর্জয়। এদের গায়ের রং কালো; গায়ের লোমাবলী ঘোর কটা রঙের। বার্ধক্যের সূত্রপাতে লোমগুলি সাদা হ'তে থাকে, দু'একটি দাঁতও পড়ে যায়। গরিলা ও শিম্পাঞ্জী দুই পায়ে স্বভাবতঃ ভর দিয়ে, দেহ-কাণ্ডটিকে প্রত্যেক পা-ফেলার সঙ্গে একবার এ-পাশে আর একবার ও-পাশে হেলিয়ে যায়।

শিম্পাঞ্জীরা গাছে বাসা বাঁধে। এখনো অনেক অসভ্য দেশের অধিবাসীরা গাছের উপর কুটির তৈরী করে' বাস করে। এক গাছ থেকে হাত দিয়ে ঝুলে আর গাছে লাফিয়ে গিয়ে ঝুল্‌তে শিম্পাঞ্জীরা খুব ওস্তাদ। এদের চেয়ে আরো ওস্তাদ ওরাংওটাংরা। এরাও গাছে বাসা বাঁধে এবং ডুমুর ও জাম খেতে বড় ভালবাসে। এদের দেহ-যষ্টি মাত্র ৪ ফুট লম্বা, কিন্তু হাত দুটি দৈর্ঘে প্রায় সাড়ে সাত ফুট। এরা মাটিতে চল্‌তে তেমন পোক্ত নয়; তার উপর চল্‌তে গেলে ফ্যাসন-দোরস্ত যুবকের চাদরের মতো দিগ্‌গজ হাত দুটো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তারপর উল্লুকদের দেহ-কাণ্ডটি মাত্র ৩ ফুট লম্বা, কিন্তু হাত প্রায় ওরাংওটাংদের মতোই। এদের সুর-জ্ঞান মন্দ নেই; তবে এফ্‌-সার্প্‌-এর নীচে সে সুরের পর্দাকে বড়-একটা নাম্‌তে দেখা যায় না। এরা পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের শব্দ ও ভঙ্গী দ্বারা ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করে। জন্তুর মধ্যে কথা কইবার চেষ্টা এই উল্লুকদের মধ্যে প্রথম দেখা যায়। এরাও বেশ সোজা হয়ে' হাঁটতে পারে;

তবে ঐ বেমানান হাতের জন্যে কিছু বাধা পায়। এরাও হাত দিয়ে গাছের এক ডাল ধরে' দুলে পনেরো ফুট দূরের আর এক ডালে লাফিয়ে গিয়ে ঝুল্‌তে পারে। 'কনিক্ সেক্সন' ও 'ট্রাইগোনোমেট্রি'র অস্ফুট জ্ঞানের আলোক-রশ্মি সর্বপ্রথম এদের মস্তিষ্কেই জ্বলে উঠেছে বলে' মনে হয়। বৃক্ষের উচ্চতা ও জমির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ সম্বন্ধে বিচার-শক্তি-সুক্ষ্মভাবেই এদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়।

তারপর ৩নং ও ৪নং শ্রেণীর মধ্যে রূপী বানর, শুক্ল বানর, মুখপোড়া বানর, ইত্যাদি হরেক রকমের কপি আছে। এরা অবশ্য চার পা দিয়েই চলে এবং প্রত্যেকেই পঞ্চম পদের মতো একটি কার্য্যকরী কঠিন লম্বা ল্যাজ্ লাভ করেছে। তবে মানুষের আকৃতি ও অভ্যাসের সঙ্গে এদের যে কিছু কিছু খাপ্ পায়, তা সকলেই জানেন। মানুষের মধ্যে যত রকম সংক্রামক রোগ আছে, মানবাকৃগ বানররা তার অর্দ্ধেক রকমের রোগ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হ'তে পারে। ৩নং ও ৪নং শ্রেণীর কপিরা এই রোগ-সমষ্টির চার আনা ভাগ রোগ গ্রহণ কর্‌তে পারে। তবে রোগ-প্রতিরোধ করার শক্তি এদের মানুষের চেয়ে বেশী। উল্লুকদের সিফিলিস্ রোগ দ্বারা অতি সহজেই সংক্রামিত কর্‌তে পারা যায়।

২নং শ্রেণীর মধ্যে যে সব বানর দেখা যায়, তারা সবাই আমেরিকার অধিবাসী। 'লেমার' এক প্রকার ছোট্ট (এক ফুটের বেশী বড় নয়) বানর, গাছের কোটরে থাকে, রাত্রে জাগে, দিনে ঘুমোয়, মুখটি ছুঁচালো। যারা থিয়েটার করেন বা দেখেন, তাঁরা আমাদের এই দূরতম জাতি লেমারদের নিকট থেকে রাত্রি জাগার অভ্যাসটুকু অনেকটা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছেন—বল্‌তে হবে। এই যে এক নং থেকে চার নং পর্য্যন্ত কপি শ্রেণী, এরা বনমানুষের মতো দাঁড়াতে না পারলেও, মানুষের মতো দুই পা গুটিয়ে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বেশ বস্‌তে পারে। অন্য জন্তু বসে বটে, তবে চার পায়ে ভর দিয়ে। দুটি হাত বল্‌তে যা কিছু, তার চিহ্ন আমরা এই লেমারদের মধ্য থেকেই প্রথম দেখ্‌তে পাচ্ছি; এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের মতো থাবা ও বক্র ছুঁচালো নখ লুপ্ত হয়ে গিয়ে, এদের ভিতরই ধীরে ধীরে হাতের পায়ের চেটো (করতল ও পদতল) এবং মানুষের মতো চ্যাপ্টা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার নখ বিকশিত হয়ে উঠ্‌তে দেখি। বানর জাত যত দিন গাছে ছিল, ততদিন তার পা ছিল হাতের চেয়ে একটু দুর্বল ও সমগ্র শরীরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট; তারপর যখন মাটিতে নামতে শিখল, তখন পদদ্বয় আস্তে আস্তে পুষ্ট ও দীর্ঘ হ'তে আরম্ভ কর্‌ল। মানুষ-জন্মে এসে পায়ের বাহার ও ব্যবহার দুইই বেশ ভাল রকম খুলেছে, কিন্তু পায়ের আঙ্গুলের মর্য্যাদা অনেকটা খর্ব হয়ে গিয়েছে।

ওস্‌বর্ণ বল্‌ছেন, এশিয়াই বন-মানুষ থেকে মানুষ পর্য্যন্ত ক্রম-বিকাশের কেন্দ্রভূমি; আদিম মানুষ এখান থেকে গিয়েই আফ্রিকা, ইয়োরোপ, আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমি বলি, এশিয়া শুধু বানর থেকে মানুষ গড়ে নি, মানুষ থেকে অতি-মানুষ গড়েছে; আবার মানুষকে দেবত্বের রাস্তা বাৎলিয়ে দেবে একদিন এই এশিয়াই।

কবি অক্ষয়কুমারের কাব্য

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী

কাব্য বলিতে গেলে মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য দুই বুঝায়। তবে মহাকাব্যের সঙ্গে খণ্ডকাব্যের কিছু পার্থক্য আছে। মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, কবি হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহার কাব্য ও কবি নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র কাব্য ও রৈবতক এবং রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়ড ইত্যাদিকে কাব্য বলা যায়; যে কাব্যের মধ্যে সার্ব্বজনীনতা ও বিশাল কল্পনাশক্তি, ভাবপ্রবণতা ও বহু আড়ম্বরপূর্ণ নানা ঘটনা-বৈচিত্রের কাহিনী দেখা যায়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। কিন্তু খণ্ড কাব্য সামান্ত স্বল্পপরিসর হইলেও তাহার মধ্যে রসমাধুর্য্য ও ভাবপ্রবণতা থাকা চাই। কেন না রসই কাব্যের প্রাণ। রসই কাব্যের পুষ্টি করে। তা হাস্যরস বা বীররস বা করুণ রস যে কোন একটী রসকে অবলম্বন না করিলে কাব্য লেখা চলে না। আবার কাব্যের মধ্যে রসোচ্ছ্বাস না থাকিলে আনন্দ দিতে পারে না। যাঁহার রচনার মধ্য দিয়া একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে ও আপনার অভিজ্ঞতাকে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করিয়া মানবের চিরন্তনী বস্তু করিয়া তোলে তাহার নাম কাব্য। রামায়ণ, মহাভারত বা ইলিয়ড মহাকাব্য। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য এই শ্রেণীর মহাকাব্য বলিয়াই খ্যাত। বড়াল কবির তিন খানি পুস্তকের মধ্যে এষা একখানি খণ্ডকাব্য। অপর দুইখানি গীতি কবিতা। এষা কাব্যখানি লিখিয়া তিনি এ মর জগতে যে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হইয়াছেন তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার কাব্যের প্রধান গুণ তিনি যখন যে রসের অবতারণা করিয়াছেন সেইটিই অতি উজ্জ্বলরূপে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোমুখী-নিসৃত পবিত্র জাহ্নবীধারার ন্যায় তাঁহার কবিতাগুলি যেন অশ্রান্ত কলতানে ছুটিয়াছে, কোন স্থানে তাহার গতি বাধা-প্রাপ্ত হয় নাই। কবির এই কাব্যখানির মধ্যে সর্ব্বত্রই জীবন্তভাবের চিত্র দেখা যায়। তাঁহার প্রত্যেক ছন্দে, প্রত্যেক বর্ণে যেন সজীবতা বিদ্যমান। বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক সুকবি আছেন এবং নারীগণের মধ্যে সুকবি লেখিকা আছেন। অক্ষয়কুমারের কবিতার মধ্যে যে ভাবপ্রবণতা ও সজীবতা আছে আধুনিক কবির মধ্যে এ ভাবটী বিরল। ভাবের উচ্ছ্বাস না থাকিলে কাব্য প্রাণহীন হয়। স্বভাব কবির এষা কাব্যের সর্ব্বত্রই ভাবের অভিব্যক্তি সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। কবি সহজ ভাষায় সরলভাবে বিনা আয়াসেই এষার নারী চিত্রের মহিমময়ী ছবি আঁকিয়াছেন। এষার নারী ভোগ-ঐশ্বর্য্যলালিতা কামনাময়ী নারী নহে; এষার নারী সরলা কোমলা মুগ্ধা পতিপ্রাণা হিন্দু গৃহের নিখুঁত ছবি। এষার সরলা সুকুমারী প্রেমমুগ্ধা কোমলহৃদয়া। প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা ও মাতৃবাৎসল্যে সে হৃদয়খানি ভরা। এষা কাব্যের মধ্যে তাই নারীচিত্রের বৈশিষ্ট্যই অধিক। মাতৃত্বের মধ্য দিয়াই নারী-জীবনের যে পূর্ণ বিকাশ, সেই মাতৃত্বের মধুর মূর্ত্তিটী অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির প্রথম উচ্ছ্বাস হইতে শেষ উচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত সবগুলিই শোকোচ্ছ্বাস পূর্ণ। মৃত্যুশয্যাশায়িতা মুমূর্ষু জননী প্রবাসী পুত্রের সংবাদ আসিয়াছে শুনিয়া অশ্রুভরা নয়ন দুটী মেলিলেন। পুত্র ভাল আছে; লেখাপড়া করিতেছে; এই দুটী কথাতেই জননীর বক্ষোভার নামিয়া গেল। নিমেষের জন্য সেই মৃত্যু-বিবর্ণ মুখে হাসির রেখা ফুটিল, গভীর বাৎসল্যে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সন্তানবৎসলা জননীর প্রাণটি সন্তানের মঙ্গল সংবাদে পরিতৃপ্ত হইল। তাঁহার ভাবুকতা কাব্যের মধ্যে যথেষ্টই দেখা যায়। তাঁহার পত্নীর মৃত্যুশোকোচ্ছ্বাস-গুলিও অতি গভীর। কবি সেই বিষাদগীতি গাইয়াছেন—

চিরতরে ছাড়াছাড়ি দেহপ্রাণে কাড়াকাড়ি
নাহি তায় কোন আয়োজন।
বলিবে না কোন কথা জানাবে না কোন ব্যথা
ফিরাবে না ব্যারেক নয়ন।

দেখিতে দেখিতে মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসটি বাতাসে মিলাইয়া গেল। জননী স্নেহের এই করুণ চিত্রটি কবি কি সুন্দরভাবেই আঁকিয়াছেন। নারী যে সন্তানবতী হইলেই মাতৃত্বের মহিমায় ও পত্নীত্বের ঐশ্বর্য্যে বিভূষিতা হয়েন তাহার ছবি এই কাব্যে সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। বড়াল কবির এই কাব্যখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শোক বিজড়িত, তাঁহার কাব্যে একাধারে মাতৃত্ব ও পত্নীত্ব দুইভাবই সুপরিস্ফুট। তাহার পরেই হিন্দু গৃহের গৃহলক্ষ্মীর চিত্রটী কি অপূর্ব্বভাবের তুলিকায় তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা একটু দেখাইতেছি। এষার নারীচিত্রটি স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার ন্যায় পূণ্যপূত মহিমময় ছবি। এ নারীচিত্রে নারী-প্রকৃতিগত চঞ্চলতা ও বাসনা কামনা আবিলতা নাই। এষার নারী প্রাতে উঠিয়া স্নানান্তে ক্ষৌমবাসখানি গলায় দিয়া তুলসীমূলে জল ঢালিতেছেন; সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া ভক্তি-অবনত হৃদয়ে তুলসীমূলে প্রণাম করিতেছেন; নীরব সাধিকার ন্যায় জীবনের সুখ দুঃখ ভগবানের চরণে উৎসর্গী-কৃত করিয়া হাসিমুখে সংসারের সকল দুঃখই বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং পতিপ্রেমে আত্মহারা হইয়া পতিচরণে নিজের অস্তিত্বটুকু বিলয় করিয়া দিয়াছেন। কবির নিপুণ তুলিকায় কাব্যের নারী চিত্রটী অতি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যকারের এই কাব্যখানি উজ্জ্বলতায় মধুরতায় সরসতায় অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ভাগীরথীর কলতানের ন্যায় গীতি কবিতাগুলি আপন মনে আপন সুরেই বিভোর হইয়া চলিয়াছে। এষার নারী-চিত্রে নারী হৃদয়ের স্নেহ-মমতা যেন শতধারায় উথলিয়া পড়িতেছে। কবি কোন স্বপ্ন রাজ্যে বসিয়া তাঁহার নিপুণ তুলিকায় এই নারী চিত্রটি আঁকিয়াছেন। তাই এষার কবি উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে গাহিয়াছেন—

মরণে কি মরে প্রেম অনলে কি পুড়ে প্রাণ।
বাতাসে কি মিশে যায় সে নীরব আত্মদান।

কবি হৃদয়ের এই গভীর খেদোক্তি সকলেরি হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত দেয়। সকলেরি মর্ম্মে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে। পত্নী-বিরহ-বিধুর কবি পতিপ্রাণা পত্নীর মরণেও পূজার নির্ম্মাল্যের ন্যায় তাঁহার স্মৃতিটুকু লইয়া আমরণ এই শোক-উচ্ছ্বাস ভরা গীতি কবিতাগুলি গাইয়া প্রাণের সান্ত্বনা দিয়াছেন। সামান্য দুইটি সহজ কথার মধ্য দিয়া কবির হৃদয়ভাব কেমন সুপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্য-কার বিনা আয়াসে বিনা যত্নেই এই কাব্যখানি লিখিয়াছেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বের বলেই তিনি এ মালা গাঁথিয়া-ছেন। তাহার এ মন্দার-মালার সৌরভে সাহিত্য-জগৎ ভরা। কাব্যকার হৃদয়ের করুণ ঝঙ্কারে তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিতে করিতে আমরা আত্মহারা হইয়া পড়ি। তাঁহার এ ফুলটী যেন নীরবে ফুটিয়া জীবনের সমগ্র সৌরভ-সম্ভার ঢালিয়া কোন অনুদ্দিষ্টের সন্ধানে চলিয়াছে। স্বভাবকবি অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা কাব্যখানি অতি উচ্চ অঙ্গের। ইহা ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সরসতা-মধুরতায় অতি সুন্দর, হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। ভাবুক কবি ভাবরাজ্যে বসিয়া তাঁহার কল্পনার তুলিকায় যে চিত্রটী আঁকিয়াছেন তাহা কাব্য জগতে অতুলনীয় উপমাবিহীন, বলাই বাহুল্য। এষার নারীর দেব-সৌন্দর্য্যভরা হৃদয়ের চিত্রটি সকলের হৃদয়ই মুগ্ধ করে। কবি শোক-বিহ্বল প্রাণে কাব্য কুসুমোদ্যানে বসিয়া যে সুরভিপুষ্পগুলি চয়ন করিয়াছেন, তাহার অপূর্ব্ব সৌরভে সাহিত্য-উদ্যান সুরভিত। তাঁহার কাব্যের নারী-চিত্র পতি-প্রাণতার পূর্ণ ছবি! নারী হৃদয়ের প্রেমভক্তি ভালবাসা বাৎসল্য স্নেহ মমতাগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া কাব্য খানি অতি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। এষার নারীতে এক বিন্দু স্বতন্ত্রতা নাই। সে নারীত্বের স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে পতি-প্রেমে আত্মহারা হইয়া নীরব সাধিকার মত পতি-চরণে আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছে। এষার নারীতে আমিত্ব নাই। ভোগ লালসা নাই—এ প্রেম শুদ্ধ সত্ত্ব নির্ম্মল পবিত্রতাময়। অক্ষয় কুমারের কাব্যে নারীর নীরব আত্মদানের ছবিটিতে-বিশ্ব সংসার বিমুগ্ধ। এ নারী চিত্র অতি মহিমময়। ভাবুক কবি ভাবের তুলিকায় যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেন এ সংসারের নয়। তাঁহার কাব্যের নারী চিত্রের সৌন্দর্য্য অসীম। এষার নারী হিন্দু গৃহের দেবী মূর্ত্তিতে বুকভরা প্রেম ভালবাসার ও স্নেহভরা হাত দুটীর পতি-সেবায় সার্থকতা দেখাইয়াছে। তাই পত্নী-প্রেম-বিহ্বল কবি সেই স্মৃতির

রেখাটি সযত্নে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া আমরণ এই শোক-উচ্ছ্বাস-পূর্ণ কবিতাগুলি লিখিয়া জগতে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। তাহার নারীচিত্রে গৃহিণীত্ব সখিত্ব শিষ্যত্ব দাসীত্ব একাধারে সকলগুলিই ফুটিয়া নারীত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ সৃষ্টি করিয়াছে। কবির কাব্যখানি রূপ-রস-গন্ধে ভরা তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন।

তাঁহার কনকাঞ্জলী গীতি কাব্য খানি পত্নীহারা হৃদয়ের প্রেম-উচ্ছ্বাস। সত্যই এই মধুর প্রেমের উচ্ছ্বাসভরা কবিতাগুলি অতি সরল মধুর প্রাণস্পর্শী হইয়া তাহার কনকাঞ্জলী নামের সার্থকতা করিয়াছে। কবির এই শোক উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা দু একটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ধর সখি কনক অঞ্জলী।
এত নহে ফুলমালা আসি নাই দিতে জ্বালা
এসেছি বিদায় নিতে কেঁদে যাব চলি।
ধর ধর হৃদয় অঞ্জলী।
কি দিয়ে শোধিবে দীন তোমার অসীম ঋণ—
তবু দিব যাহা আছে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি।

পত্নী-বিরহ-বিধুর কবির এই বিষাদ গীতি বড় করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার স্মৃতির রেখা শীর্ষক কবিতাটি অতীত শোকোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতেছে—

কত কাল পরে আজ কত দিন পরে
কি স্মৃতি-কুহকে চিত চমকে আবার।
কল্পনার ফল্গুনদী লহরে লহরে
ছুটিছে কল্লোলি যেন প্লাবি দুই ধার।

কবি এই স্মৃতির রেখাটি মরমের স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। পূজার নির্ম্মাল্যের মত চির দিন সযত্নে সেই স্মৃতির পূজা লইয়াই জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহার এই শোক-উচ্ছ্বাসময়ী কবিতাগুলি মরমের প্রতি পরতে পরতে যেন গুমুরিয়া গুমুরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যের এই নারী চিত্রটি প্রেমের অপার্থিব জলন্ত ছবি। সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও স্মৃতির জ্বালা যায় না। সেই গভীর ব্যথার মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কার আমাদেরও হৃদয়ে আঘাত দেয়। কবি শোকাবেগভরা হৃদয়ের গোপন ব্যথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। লহ উপহার কবিতাটি তিনি আবেগ ভরা কণ্ঠে গাহিয়াছেন—এ গানের মধ্যে শুধুই তাঁহার মরমের উচ্ছ্বাস—

লহ উপহার
ধর ধর হৃদি-পুষ্প লহ উপহার।
আজি এ মধুর প্রাতে
মধুর প্রভাত বাতে
কি শুভ সংবাদ আসে প্রেম-দেবতার।
গোপনে আপনে নারি আর না রাখিতে পারি
ছুটে কি আকুল শ্বাস সুখ-মলয়ার।
বুঝি দলে দলে ফুটে পূর্ণতায় পড়ে লুটে
ছুটে পড়ে চারিধারে সর্ব্বস্ব আমার।

পত্নীহারা প্রেম-বিহ্বল কবির হৃদয় পুটপাকের ন্যায় পত্নী-বিরহ-ব্যথায় দগ্ধীভূত হইয়া এই আবেগময়ী গীতি কবিতার উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। তাই কবি অনন্ত জীবন সেইজন্য স্মৃতির পূজা লইয়াই কাটাইয়াছেন। তাঁহার কনকাঞ্জলীর কবিতাই প্রেমের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া কবির মরমের ব্যথা যেন সকাতরে নিবেদন করিতেছে। তাঁহার মিলনে এখনও রজনী আছে। 'ও আঁখি' ও 'আসি তবে' ইত্যাদি কবিতায় হৃদয়ের গভীর বেদনা সুস্পষ্টভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি দুই চরণের মধ্যেই হৃদয়ের অন্তস্তলের সেই ভাব সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়াছেন। 'যাও তবে' কবিতাটির ভাব লিখিবার লোভ সম্বরন করিতে পারিলাম না। কবি অক্ষয় বড়ালের কনকাঞ্জলী ও প্রদীপ দুইখানি পুস্তকই হৃদয়গ্রাহী; প্রত্যেক কবিতার মধ্যে কবিহৃদয়ের গভীরতা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার এই করুণ গীতি কবিতা প্রেমের উচ্ছ্বাসেই ভরা। তাঁহার প্রদীপ চিরদিনই সমুজ্জ্বলভাবে সাহিত্য-জগৎ দীপ্তিমান করিয়া থাকিবে। কবির স্বভাব সরল কবিতাগুলি যেন লহরে লহরে ছুটিয়াছে। প্রদীপের প্রথম উচ্ছ্বাসেই কবি গাইয়াছেন—

গীতি অবশেষে নিশ্বসিল কবি
বল কি গাইব আর।
মরমের গান ফুটিল না ভাবে
বাজিল না হৃদি তার।

চিত্ত অবশেষে সজল নয়ন
চিত্রকর শূন্যে চায়।
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে
জীবন বৃথায় যায়।
প্রিয়ার সন্ধানে প্রেমিক বিহ্বল
একি অদৃষ্টের ছলা।
কত ভেবেছিল কত বুঝেছিল
কিছুই হলনা বলা।

চিত্রকর এই চিত্রগুলি আঁকিয়া যে সাহিত্য-জগতে চির অমরতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকাটি রং-বর্ণে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন সেই মতই ফুটাইয়াছে। কবির ইহাই কৃতিত্ব। প্রেমিক কবির পত্নীহারা প্রাণের দীর্ঘনিশ্বাস যেন প্রতি তরু মর্ম্মরে, প্রতি কুসুমের সুবাসে, প্রতি বাতাসের হিল্লোলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মরণে তাঁহার প্রেম অমরতার সাক্ষ্য দিতেছে। কবি আজীবন এই প্রেমের সাধনায় আত্মহারা হইয়া হৃদয়ের এই গভীর প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। এবং দরদী কবি প্রেমের তপস্যার ধ্যানে মগ্ন; প্রিয়ার ধ্যানের মধ্যে মানবজীবনের ভাব-বিচিত্রতার কাহিনী অস্ফুট মধুর গুঞ্জনে গাহিয়াছেন। তাঁহার রচনার গুণে তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্রই ভাবের উচ্ছ্বাস-গুলি সুপরিস্ফুট হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। প্রদীপের কবি উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে গাহিয়াছেন—

রমণীরে সৌন্দর্য্যে তোমার।
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা
যেন বিধাতার সৃষ্টি জড়িত প্রকৃতি সনে
দেহ-প্রাণ বেদ-গানে গাঁথা।

কবি অন্যস্থলে লিখিয়াছেন—

প্রাণান্তে এ জীবন সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য জয় পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখসাধ।

কবি জীবন-সঙ্গিনীকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভাবিয়াই হৃদয়ে বরণ করিয়াছিলেন কিন্তু জীবন-সঙ্গিনীর অকাল মৃত্যুতে তাহার গভীর প্রাণের বেদনাগুলি যেন আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার জন্য কবিকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় নাই। পত্নীহারা কবির হৃদয় শশ্মানের মত শূন্য হইয়া গিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন—

হৃদয় ভিতরে শ্মশান হইয়া গেছে।
বুঝি নাই শুধু দিশা ছলে।
একটী দৃষ্টিতে তার উষার আভাষ ওই
এখনি মিশিব প্রেতদলে।
জলন্ত আঁখিতে তব আছে কি কলঙ্ক রেখা
দেখিতে না চাও।
রুদ্ধ কণ্ঠে গাহে যেন মৃত্যুর কঠোরাদেশ
দেব কর্ণে শুনিতে না পাও।

কবির এ গভীর প্রেম হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী। এ প্রেমের গভীরতার ইয়ত্বা নাই। কবি সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—

পারি না বহিতে আর দুঃখের পসরা
সুপ্রসন্ন হও।
জীবনে আশ্বাস দিয়ে মরণে বিশ্বাস দিয়ে
যেমন গড়িয়া ছিলে পুনঃ গড়ে লও।

বড়াল কবির প্রদীপ কাব্য দীপালোকে হৃদয়কে উজ্জ্বল করে। তাঁহার কাব্যে তাঁহার এই প্রেমের অসীমতা-গভীরতা দুই বর্ত্তমান। আমরা চিরদিনই কবির এই মরমের গীতি কবিতা সাদরে বরণ করিয়া সাহিত্য-উদ্যানে সুশোভিত রাখিব।

পাঠক-পাঠিকদের এই খেদোক্তি দেখাইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাই তুলিয়া দিলাম—

যাও তবে কি বলিব কভু কোন দিন।
শুন যদি অভাগার হয়েছে মরণ।
একদিন ধরাতলে একবিন্দু অশ্রুজলে
তৃষাহত প্রণয়ের করিও তর্পণ।

তাঁহার এই সকরুণ বেদনা-ব্যথিত হিয়ার খেদোক্তি চিরদিনই জগতের বুকে জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকিবে। কবির সকরুণ ভাব ও ভাষাগুলি যেন সজীবভাবেই ফুটিয়াছে। কনকাঞ্জলীর শেষাংশে বৃন্দাবন গাথা কবিতা-গুলি অতি সুমধুর, হৃদয়কে স্পর্শ করে। শ্রীরাধার

প্রেমাহ্লাদ-ভরা গীতি কবিতাগুলি প্রভাতী বিহগের কলকূজনের ন্যায় ঝঙ্কৃত হইয়া সরসতায় বিমুগ্ধ করিয়াছে। বৃন্দাবন গাথার প্রথম কবিতাটির একটু নমুনা দিলাম—

বাঁধিয়া ছিলাম মন আপন ঘরে।
কেন গৃহ ছাড়িলাম বাঁশরী স্বরে।
সম্মুখে প্রমোদ বন ফুলফোটে অগণন
ওড়ে অলি নাচে শিখী হরিণী চরে।
সমীর সরভি ভরে ফুলে ফুলে ঢলে পড়ে
মৃদু কাঁপে তরুলতা পিক কুহরে।
যে যে ছিনু ভাল ছিনু আপন ঘরে।

সাধিকা গোপীকার এ ভাবামোদের চিত্রটি বিরহের করুণ সুরে গাঁথা। ভক্তিমতী গোপী কৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা—সারা বিশ্বময়ই শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছেন, লতায় পাতায়, আকাশে বাতাসে, দ্যুলোকে ভূলোকে সেইরূপই দর্শন করিতেছেন, তাঁহার বাঁশীর গানে, যমুনার কলতানে, সমীরের হিল্লোলে, বিহগের কুজনে যেন কর্ণের পথে সুধা ঢালিয়া দিতেছে। তাই সাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময় হইয়া দিবানিশি সেই ভাবেই বিভোর হইয়া আছেন। তাঁহার লালসা, কিশোরী অভিসারিকা, উদ্বেগ ও বিপ্রলব্ধা ইত্যাদি কবিতাগুলি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহ গাথা গানগুলি, মধুর হইতেও মধুরতর। কবির গীতি কবিতার ঝঙ্কার সাহিত্য-জগতে চির আদৃতই থাকিবে। স্বভাব কবির এই গীতি কবিতাগুলি বীণাতন্ত্রীর ঝঙ্কারের মত, সুদূর বনাগত বাঁশরীর স্বরসুধার মত, শারদ জ্যোৎস্নাস্নাত ফুলদলের মত, প্রেমের মদিরাময় আবেশের মত হৃদয়ের পরতে পরতে অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়া অমরতা আনে। কবি এই কাব্যগুলি লিখিয়া সাহিত্য জগতে চিরকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার কবিতা এই নশ্বর জগতে চির অমরতাই লাভ করুক।

নিয়তির দূত

শ্রীসত্যনারায়ণ পাল

(১)

অসময়ে এক ঝাঁকা বেগুণ মাথায় করিয়া পরাণকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া স্ত্রী বিন্দুবাসিনী শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাগা এরই মধ্যে চলে এলে? বেগুণ কি বিক্রী হ'ল না?"

দুপুর রৌদ্রে অত বড় বোঝা মাথায় করিয়া, ক্রোশ-খানেক রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়া পরাণ একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; স্ত্রীর কথায় কোন জবাব দিতে পারিল না। বোঝাটিকে মাথা হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলায় ভর্ত্তি, রোদের ঝাঁঝে চোখমুখ লাল সিঁদুরের মত হইয়া উঠিয়াছে, পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে ও ক্ষুধায় জঠরাগ্নি জ্বলিতেছে। একটু সুস্থ হইয়া ধীরে ধীরে জবাব দিল—"জমীদারের অত্যাচারে বোধ হয় সকলকে শুকিয়ে মরতে হবে বিন্দি! বরাবর চার পয়সা করে দান দিয়ে এসেছি, আজ গিয়ে শুনি দু'আনা ক'রে দান না দিলে কাউকে হাটে বস্‌তে দেবে না, সেরে ত সিকি পয়সা লাভ, খদ্দের কিনবে কানা পোকা বাদ দিয়ে, কোথা থেকে দি, তাই বেগুণ ফিরিয়ে নিয়ে এলুম"।

জলের ঘটীটি সামনে এগিয়ে দিয়ে বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল —"হাটে তা হ'লে কারও বিক্রী হয় নি বল?"

"যারা দু আনা করে দান দিলে তাদেরই বিক্রী হল। সেরে তিনপো বেগুণ দিয়ে দু আনা কেন চার আনা দাম দেওয়া যায়; চাষারা ত ঘর থেকে দেবে, না ওজনে কম দিয়ে বিক্রী কর্ব্বে সেত আমি পার্ব্বনা, গলায় ছুরি দিলেও ঠকাব না, তাতে না খেয়ে মরি সেও ভাল।"

"আসছে হাট পর্য্যন্ত বেগুণ রেখে দিলে থাকবে কি?

অর্দ্ধেকের উপর নষ্ট হয়ে যাবে, রহিমকেই কেন না দিয়ে এলে? যা হয়, সব তো আর লোকসান হবে না?"

ঘটীর জলে মুখ হাত ধুইয়া পরাণ শুষ্কমুখে বলিল— "তাই কর্ত্তে হবে এ ছাড়া ত আর কোন উপায় নাই" বাঁশের উপর গামছা ঝুলিতেছিল টানিয়া লইয়া মুখ হাত মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—

"টেঁপী কোথায় গেল, তাকেও অনেকক্ষণ দেখিনি।"

টেঁপী পরাণের একমাত্র মেয়ে বয়স সাত বৎসর। বিন্দু একটু কড়া স্বরে বলিল—"রাগ ক'রে শুয়ে রয়েছে, সকাল থেকে কিছুই খায় নি, এমন মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি, যা দেখবে তাই ওর চাই না পেলেই রাগ আর কান্না।"

পরাণ কোন উত্তর দিল না। ঘরের ভিতর যাইয়া দেখে টেঁপী মেজের উপর শুইয়া কাঁদিতেছে। বাপের গলার আওয়াজ শুনিয়া মেয়ের কান্নার মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। সস্নেহে মেয়েকে কোলে লইয়া, চুমু খাইয়া, 'কি হয়েছে' জিজ্ঞাসা করিতেই মেয়ে কেঁদে খুন। কোঁচার খুঁটে মুখ মুছাইয়া দিয়া পরাণ বলিল—"কান্না কেন মা, কি হয়েছে বল ত?"

বাপের কোলে উঠিয়া টেঁপী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "শৈলীর বাপ শৈলীকে কেমন কুকুর এনে দিয়েছে, মাথা টিপলেই কেমন ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে ডাকে, দেখ বাবা এইটুকু তার লেজ, ছোট্ট খাট্ট পা, শৈলী কেমন তাকে টিপ পরিয়ে দিয়েছে তুমি ওই রকম কুকুর এনে দেবে কিনা বল?"

"দেবো গো দেবো, ঠিক ঐ রকমই এনে দেবো, তার জন্যে না খাওয়া না দাওয়া, মেজেয় শুয়ে শুয়ে কান্না হচ্ছে; পিত্তি প'ড়ে জ্বরে পর'বে যে মা, যাও খেয়ে নাও তোমায় ওই রকম কুকুরই এনে দেবো।"

"এ গাঁয়ে বুঝি ঐ রকম কুকুর পাওয়া যায়? শৈলীর বাপ যে কল্‌কাতা থেকে এনে দিয়েছে তুমি কি করে এনে দেবে?"

বিন্দু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, রাগে ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"পোড়ার মুখি কুকুর পুসবে, আব্দার দেখলে হাড় জ্বলে যায়, দূর হ।"

আর যায় কোথা, টেঁপী ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। টেঁপীকে কোলে লইয়া পরাণ দাওয়া হইতে নামিয়া পড়িল; সস্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া পরাণ বলিল,— "শৈলীর বাপ শৈলীকে খেলনার কুকুর এনে দিয়েছে তোমায় কেমন সত্যিকারের কুকুর দিচ্ছি চল"।

মেয়েকে লইয়া পরাণ চলিয়া গেল।

রাগে গন্‌গনে হইয়া বিন্দু বলিল, "অমন মেয়ের মুখটা পুড়িয়ে দিলে তবে রাগ যায়, মিন্সেরও আক্কেল দেখলে একবার, বেলা গেল, চান নাই, খাওয়া নাই, কখন থেকে রেঁধে বসে রইছি, মেয়েকে নিয়ে চোল্লো কুকুর আনতে! মেয়ে স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দেবে।"

(২)

রহিম সেখের ধাড়ী কুকুরটির পাঁচটি বাচ্চা হইয়াছে। তার মধ্যে ছোটটিই বেশ ভাল দেখিতে; দিব্বি গোলগাল চেহারা, এক গা পশম, সবে এই চোখ ফুটিয়াছে। পরাণ রহিমের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া রহিম বলিয়া ডাকিতেই রহিম তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল "পরাণ খুড়ো যে গো, এই যে টেঁপীও এসেছে দাও ত খুড়ো একবার টেঁপীকে টিপে ওর পেটটা গেলে দি।"

"টেঁপীর কথা আর বোলো না বাবা, সকাল থেকে রাগ করে রয়েছে কিছুই খায় নি শৈলীর কুকুর দেখে বায়না ধরেছে ঐ রকম কুকুর চাই থামাতে পারি নি, কোলে ক'রে তাই তোমার বাড়ীতে এলুম বাবা।"

রহিম হাসিতে হাসিতে বলিল "টেঁপীদির তাহলে একটি কুকুর চাই না কি?"

বাপের কাঁধে মুখ রেখে টেঁপী জবাব দিল "হুঁ"।

"কোনটা নিবি? ছোটটাই নে ওইটেই সব চেয়ে ভাল হয়েছে"। বাপের কোল থেকে নামিয়া টেঁপী সকলের ছোট ভাল কুকুরটীকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইল। একবার কোলে করে, একবার কাঁধে নেয়, একবার বগলে করে, মুখে মুখ দিয়ে কখন বুকে তুলিয়া আদর করিয়া চুমু খাইয়া বলে—"ওরে আমার সোনারে—কি খাবি, মুড়ি খাবি? দেখ বাবা কেমন চাইচে দেখ?"

টেঁপীর আনন্দ দেখিয়া পরাণের চক্ষু জলে ভরিয়া

আসিল। কল্কেটী পরাণের হাতে দিয়া রহিম বলিল—"তুমি ত চলে এলে খুড়ো আমরা সকলে নায়েবের কাছে গিয়ে দানের ব্যবস্থা করে এলুম।"

"কি রকম শুনি ?"

"চার পয়সার ওপোরে উঠ্‌তে হবে—তবে ছ আনার বদলে, ছ' পয়সায় নাম্‌তে পারে, নায়েব ত ভরসা দিলেন, দেখি কি হয় ?"

কল্‌কেতে আর একটি টান মারিয়া রহিমের হাতে ফিরাইয়া দিয়া পরাণ কাসিতে কাসিতে বলিল—"বেগুণ গুলো তোমাকেই দিয়ে যাব রহিম, অনর্থক ঘরে প'ড়ে নষ্ট হবে কেন, আর, আসছে হাটে কি রকম দান দিতে হবে তুমি সন্ধান নিয়ে রেখ—এখন উঠি" বলিয়া কুকুরছানাটী লইয়া টে'পীর হাত ধরিয়া পরাণ চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আসিয়া উঠানে কুকুরছানাটিকে ছাড়িয়া দিতেই কুঁই কুঁই শব্দে ক্ষুদ্র লেজটি নাড়িয়া ছানাটি উঠানময় বেড়াইতে লাগিল। একবার গুড় গুড় করিয়া টে'পীর দিকে ছুটিয়া যায়, টে'পী পাশ কাটিয়া উঠানের অপর পাশে গেলেই কুকুরটিও সেই দিকে ছুটে। টে'পীর হাসি কি।

সমস্ত দিন টে'পী সোনাকে লইয়া বাড়ীর ভিতর খেলা করে। রাত্রিতে বিছানার পাশে একটি ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া দেয় পায়ের ভিতর মুখ রাখিয়া সোনা কুণ্ডলী হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

সে দিন মঙ্গলবার। খুব ভোরে উঠিয়া পরাণ বেগুণ লইয়া হাটে চলিয়া গিয়াছে। বিন্দুবাসিনী এঁটো বাসন লইয়া তখন পুকুরঘাটে, বাড়ীতে আর কেউ নাই। টে'পী একা সোনাকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে খেলা করিতেছে, কখন যে জমীদার রতন রায়ের ছেলে নীলু বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে টে'পী টেরও পায় নাই। ধবধবে নাদুশনুদুশ কুকুরছানাটি দেখিয়া নীলুর ভারী লোভ হইল। একেবারে বাড়ীর ভিতর আসিয়া টে'পীকে বলিল—"টে'পী কার কুকুর রে ?"

বাড়ীর মধ্যে নীলুকে দেখিয়া টে'পীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। কেন না নীলুর অসাধ্য কিছুই নাই ; দশ বৎসর বয়স হইলে কি হয় অনেক যুবকও তাহাকে ভয় করিয়া চলে। যে দিন চাকরের সঙ্গে হাটে যায় চাষীরা যা যা ভাল জিনিস লইয়া আসে সব লুকাইয়া রাখে। নীলুর নজরে পড়িলে—আর রক্ষা নাই জোর করিয়া ছিনাইয়া লইবে, বাধা দিলেই সর্ব্বনাশ। সে দিন হাটে এক ডিমওয়ালার ঝুড়ি হইতে বড় বড় সাতটী ডিম তুলিয়া লইয়াছিল ; ডিমওয়ালার অপরাধ, সে নাকি কেবল মাত্র বলিয়াছিল "বাবু অত ডিম নেবেন না মহাজনের জিনিস, দুটী নিন। ডিমওয়ালার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল এক লাথিতে ঝুড়ি উল্‌টাইয়া দিয়া নীলু সমস্ত ডিমগুলিকে পদদলিত করিয়া চলিয়া গেল। জমীদারের ছেলে সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিতেও পারে না। জমীদারের নিকট নালিশ করিতে গিয়া ডিমওয়ালা ধমক খাইয়া চলিয়া আসিল। টে'পী পরাণের মুখে নীলুর অত্যাচারের কথা সব শুনিয়াছিল, তাই ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল "ও আমার কুকুর।"

"তুই মেয়ে ছেলে কুকুর নিয়ে কি কর্ব্বি আমাকে দিয়ে দে।"

"আমার কুকুর তোমায় কেন দেবো।"

"দিবি নি ত ?

"ছানাটিকে বুকে করিয়া টে'পী কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল, "না।"

বাঘের মত লাফ মারিয়া নীলু টে'পীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। টে'পীও কুকুর দিবে না নীলুও ছাড়িবে না। সবলে টে'পীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া নীলু কুকুর ছানা লইয়া চলিয়া গেল।

"ওরে আমার কুকুর নিয়ে গেল রে, ওরে আমার সোনাকে নিয়ে গেল রে" বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া টে'পী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর নীলু সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

মেয়ের কান্না শুনিয়া বিন্দু ছুটিয়া আসিয়া দেখে টে'পীর গোড়ালী দিয়া রক্ত পড়িতেছে সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া গিয়াছে। মেয়ের মুখে সমস্ত শুনিয়া বিন্দু নীলুর উদ্দেশে অনেক গালি বর্ষণ করিয়া পরে আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিয়া টে'পীকে কোলে করিয়া বলিল—"তুই কাঁদিস নি টে'পি ; তোর কুকুর কেউ রাখতে পার্ব্বে না, যে জোর করে রাখবে. ঐ

কুকুর বই তার ঘরে আর কিছুই থাকবে না। তুই দেখে নিস্ মা, তোর মা যা বল্‌ছে সব ঠিক, সব সত্যি।"

ভিজে নেকড়া দিয়া বিন্দু টেঁপীর গোড়ালী বাঁধিয়া দিল, গায়ের যে সব জায়গা ছড়িয়া গিয়াছিল, বিন্দু তেল গরম করিয়া সেই সব ক্ষতে দিল।

টেঁপী আর কাঁদিল না সত্য, কিন্তু কুকুরের শোকে সমস্ত দিন কিছুই খাইল না—মন-মরা হইয়া সমস্ত দিন দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়া উদাস চক্ষে দরজার দিকে তাকাইয়া রহিল।

(৩)

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই টেঁপীর একটু গা গরম হইল। যত রাত্রি হয় জরও তত বাড়ে; ক্রমে গায়ে আর হাত দেওয়া যায় না। বিন্দু রান্নাপাট বন্ধ করিয়া টেঁপীকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। জ্বরের ধমকে টেঁপী চোখ চাহিতে পারিল না, মাঝে মাঝে 'সোনা সোনা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। বিন্দু প্রদীপের আলোতে দেখিল টেঁপীর চোখদুটি জবাফুলের মত লাল হইয়াছে, গা ভয়ানক গরম আর সেই রকম কাঁপুনি। সবলে চাপিয়াও বিন্দু কাঁপুনি কমাইতে পারিল না। মেয়ের অবস্থা দেখিয়া মায়ের মন হু হু করিয়া উঠিল। এমন কেউ নেই যে তাকে ডাকে; রোগা মেয়েকে ফেলিয়া রাখিয়া কাহারও কাছে যাইতেও পারে না; স্বামীও বাড়ীতে নাই, মনের দুঃখে বিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। সস্নেহে মেয়েকে বুকে লইয়া বিন্দু বলিল "টেঁপি ও টেঁপি বড় কষ্ট হচ্ছে মা? কিছু খাবি? একটু গরম দুধ, সমস্ত দিন যে কিছুই খাস নি মা। টেঁপি দেখ, একবার চেয়ে দেখ।"

টেঁপীর উত্তর নাই, জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "নীলু দে ভাই আমার সোনাকে, আমার সোনাকে নিয়ে যাস নি, নিয়ে যাস্ নি।"

কি করিবে, কার কাছে যাইবে টেঁপি যে খালি ভুল বকিতেছে, কি হইবে! বিন্দু স্থির থাকিতে পারিল না, সজল চক্ষে বলিল—"হে দুর্ব্বলের বল অনাথের আশ্রয় দীননাথ, টেঁপীকে ভাল করে দাও, টেঁপীকে বাঁচাও।"

বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখে পরাণ আসিয়াছে। বিন্দু চীৎকার করিয়া বলিল "ওগো শীঘ্র এসো টেঁপীর ভয়ানক জ্বর, ভুল ব'ক্‌ছে।"

"সেকি?"

উন্মাদের মত পরাণ ঘরে আসিয়া দেখে মেয়ে জ্বরের ধমকে ছটফট করিতেছে; গা এত গরম যে হাত দেওয়া যায় না; হাত মুঠো করিয়া রহিয়াছে, ঘন ঘন গরম নিঃশ্বাস পড়িতেছে, চোখ জবাফুলের মত লাল—পরাণের মাথা ঘুরিয়া গেল; বিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কখন জ্বর হ'ল, সকালে ত বেশ ছিল।"

"হতভাগা জমীদারের ছেলে টেঁপীর কুকুর নিয়ে গেছে। সমস্ত দিন মনমরা হয়ে ছিল, সন্ধ্যা থেকে একটু একটু করে গা গরম হয়ে এখন এত বেড়ে উঠেছে; তুমি একবার কাউকে ডাক না? না হয় বদ্দিপাড়ার উমেশ কবরেজকে একবার নিয়ে এস; মেয়ে যে ভয়ানক ছটফট করছে।"

বিন্দু আর বলিতে পারিল না, চোখের জলে মুখ বুক ভাসিয়া গেল।

পরাণ উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে বদ্দিপাড়ার দিকে ছুটিল এবং অবিলম্বে কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিল। কবিরাজ মহাশয় ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রোগীর মাথায় শীতল জলের পটী ও পাখার বাতাস করিতে আজ্ঞা দিয়া ভিজিট লইয়া গেলেন, আরও বলিয়া গেলেন যে করিয়া হউক কুকুর ছানটিকে আনিতেই হইবে, না আনিলে রোগীর জীবন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে।

কবিরাজ-প্রদত্ত ঔষধটি মাড়িয়া টেঁপীর মুখে দিতেই টেঁপী থুথু করিয়া ফেলিয়া দিল। বিকারের ঘোরে মুখ বিকৃত করিয়া ঝাঁকি মারিয়া উঠিল। পরাণ অনেক কষ্টে মেয়েকে চাপিয়া রাখিয়া মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটী দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। যত রাত্রি হয় বিকারও তত বাড়িয়া উঠে। কখনো দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া রক্ত চক্ষে উঠিয়া বসিতেছে, কখনো হাত পা ছুড়িয়া বালিস বিছানা ছড়াইয়া ফেলিতেছে, আবার কখনও বা নিজের মাথার চুল ছিঁড়িয়া নিজের হাত কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিয়া ফেলিতেছে।

বিন্দু অস্থির হইয়া বলিল "একবার দেখ না গো, মেয়ে যে কি রকম ক'রে উঠছে।"

"আমি কি দেখছি না রে সব দেখছি, কি কর্ব্ব বল্ ভগবানকে ডাক্, ভগবান্ ভিন্ন কেউ টেঁপীকে রক্ষা কর্ত্তে পারবে না।"

পরাণের দুটি নয়নপ্রান্ত বাহিয়া হু হু করিয়া জল গড়াইয়া আসিল।

কিন্তু মায়ের মন ত বুঝে না, সে যে এক এক বিন্দু রক্ত দিয়া টেঁপীকে এতটুকু থেকে অত বড় করিয়া মানুষ করিয়াছে; টেঁপী যে তার কত আদরের, কত সাধনার জিনিস, টেঁপী যে তার প্রাণেরও অধিক,—সে যে মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়া টেঁপীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

বিন্দু আর ভাবিতে পারিল না। আবেগে মেয়েকে বুকে তুলিয়া লইল কিন্তু একি গা ত আর সে রকম গরম নাই, গা যেন ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে, মেয়ের মুখে যেন কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে। বিন্দু চীৎকার করিয়া বলিল—"ওগো একবার দেখ না গো।"

পরাণ প্রদীপ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখে, মেয়ের সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভর্ত্তি, গাও বেশ শীতল, পায়ে হাত দিয়ে দেখে বরফের মত ঠাণ্ডা, বুকে হাত দিয়া দেখে অতি ধীরে ধীরে স্পন্দন ক্রিয়া হইতেছে, শুনিতে পাইল তখনও টেঁপী অস্পষ্ট স্বরে বলিতেছে "সোনা রে আয় আয়।"

বিন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"একবার চেষ্টা ক'রে দেখ যদি ছানাটিকে পাও টেঁপীর অন্তিম আশা অপূর্ণ রেখো না।"

পরাণ মাতালের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। টেঁপীকে শেষ দেখা দেখিয়া পরাণ উল্কাবেগে জমীদারের বাটির দিকে ছুটিয়া গেল। তখন প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব ছিল না ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলিলেও চলে।

(৪)

জমীদার রতন রায় কাছারী গৃহের সম্মুখে প্রাঙ্গণে প্রভাতীবায়ু সেবনের জন্য পায়চারী করিতেছেন। ইহা তাঁহার নিত্য অভ্যাস। অত ভোরে পরাণকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া জমীদার থমকিয়া দাঁড়াইলেন ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পরাণ এত ভোরে কি মনেক'রে?

পরাণ হাতজোড় করিয়া বলিল—"বাবু, ছোটবাবু টেঁপীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার কুকুরছানাটিকে ছিনিয়ে এনেছেন, প'ড়ে গিয়ে গোড়ালির অনেকটা মাংস কেটে গেছে কুকুরের শোকে সমস্তদিন কিছুই খায় নাই, সন্ধ্যার পর থেকে খুব জ্বর হয়েছে, এখন সম্পূর্ণ বিকার। সমস্ত রাত মেয়ের কাছে ব'সে রাত কাটিয়েছি, বিকারের ঘোরে খালি কুকুর কুকুর বলে চেঁচিয়ে উঠছে; কবিরাজ বলে গেলেন—'কুকুর না পেলে রোগীর জীবনের আশা খুব কম', কুকুরটীকে ফিরিয়ে দিন হুজুর?"

—"ছোটবাবু তা হলে জোর করে কুকুর ছানা এনেছে?

—"জোর ত করেছেনই; এ জোর নিরীহ চাষীদের ওপর ছোটবাবু খুবই দেখাচ্ছেন।"

রতন রায় গুম হইয়া রহিলেন। একটা নিরক্ষর চাষা জমীদারের সামনে জোর গলায় ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিয়াছে এটা যে তাঁর নিজের পর্য্যন্ত কতখানি মাথা নিচু করিয়া দিতেছে জমীদার মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধে রক্তচক্ষে উত্তর দিলেন—"কী ছোটবাবু চোর? তোর কুকুরছানা চুরি করে এনেছে, নয়? বেটা চাষা, বলে কি? হারামি, পাজি কাঁহাকা, চাবকে লাল ক'রে দেব জানিস?"

জমীদারের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া পরাণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"আমায় মেরে ফেলুন, জাহান্নামে পাঠিয়ে দিন কোন দুঃখ নেই, কিন্তু হুজুর কুকুরটীকে দয়া করে ফিরিয়ে দিন আমি আপনার কাছে মেয়ের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি—মেয়েকে বাঁচান।"

মেঘের মত গর্জ্জন করিয়া জমীদার বলিলেন—"এত বড় বদমাইশ মেয়ে তোর, নীলুর জামাখানিকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে দিয়েছে, আবার বলা হচ্ছে নীলু ওর মেয়েকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে! বেশ করেছে, খুব করেছে, যা তুই নালিশ করগে যা, নালিশ না কর্লে পাবি না।"

পরাণ আবার জমীদারের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল; চোখের জলে জমীদারের পা ভিজিয়া গেল, তবু জমীদারের

মন ভিজিল না ; গলায় কাপড় দিয়া পরাণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হুজুর আমি কাঙ্গালেরও অধম, কাঙ্গালের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন।"

পরাণ আর বলিতে পারিল না অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

—"কাঙ্গালের ত কুকুর পোষবার সখ খুব ; ওসব নেকামি তোর রেখে দে, অমন কান্না ঢের দেখেছি। খোকার জামার দাম দিয়ে কুকুর নিয়ে যা, না দিতে পারিস কুকুরও পাবি না।" বলিয়া জমীদার হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিকট চীৎকার করিয়া পরাণ কাঁদিয়া বলিল—"টেঁপীরে মা আমার, তোকে বাঁচাতে পাল্লুম না, তোর সোনাকে তোর হাতে ফিরিয়ে দিতে পাল্লুম না কি কর্ব্ব, কি কর্ব্ব"—বলিতে বলিতে সশব্দে পরাণ মাটীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

সহসা এক করুণ আর্ত্তনাদ বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিল। পরাণ স্থির হইয়া শুনিল কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। কেও ? ওকি বিন্দু ! মুখ ফিরাইয়া দেখে, এ্যাঁ তাই ত, এযে বিন্দু পাগলিনীর মত উদ্‌ভ্রান্ত বেশে এই দিকেই আসিতেছে। পরাণের বুকের ভিতর যেন এক অসহ্য যন্ত্রণা টন টন করিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিল, অতিকষ্টে বুক চাপিয়া ধরিয়া পরাণ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল —"কুকুর পেলুম না বিন্দি ?"

বিন্দু ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আর কুকুরের দরকার নেই গো, আর কুকুরের দরকার নেই, সে চলে গেছে !"

"টেঁপী নেই টেঁপী নেই !" পরাণ বক্ষে করাঘাত করিয়া গগনভেদী স্বরে বলিয়া উঠিল "টেঁপী নেই, টেঁপী নেই উঃ !" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পরাণ মাটীর উপর পড়িয়া গেল।

(৫)

"বাবা আপনার ঘরে কুকুরটি এসেছে কি ?"

নীলুর প্রশ্নে জমীদার মুখ তুলিয়া জবাব দিলেন—"আমার ঘরে কেন আসবে, তুই কি কুকুর বাঁধিস নি ?"

"বাঁধাই ত ছিল, বেড়িয়ে এসে দেখি, দড়িটা পড়ে রয়েছে, কুকুর নেই।"

"দেখ্ দেখ্ ভাল করে খুঁজে দেখ্ ?"

নীলু চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবা বাড়ীতে ত কুকুর নেই কে নিয়ে গেল ?"

"কে আবার নিয়ে যাবে ? ভাল ক'রে খুজেছিঁস্ ?"

মেজের দিকে তাকাইয়া নীলু উত্তর দিল—"সব জায়গা খুঁজেছি কোথাও দেখতে পাই নি, তা হলে কোথায় গেল !"

নীলুর চক্ষু অশ্রু ভরাক্রান্ত হইল।

জমীদার নীলুর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া ধীরভাবে বলিলেন—"যেখানেই থাকুক এখুনই সন্ধান নিয়ে বার কর্ব্ব ; তুমি কাপড় ছেড়ে জল খাওগে যাও, কুকুরের জন্য ভাবনা কি বাবা ?"

নীলু চলিয়া গেল।

জমীদার তৎক্ষণাৎ স্থানীয় দারোগাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া দিলেন—ছোটবাবুর কুকুর ছানাটিকে সকাল থেকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বামাল শুদ্ধ চোরকে ধরিতে পারিলে জমীদার প্রচুর পুরস্কার দিবেন।

চিঠি পাইবামাত্র দারোগা সাহেব চৌকীদারদিগকে কুকুরটির সন্ধান লইতে আজ্ঞা দিলেন এবং ধরিতে পারিলে যে প্রচুর পুরস্কার পাওয়া যাইবে একথা বলিতেও ভুলিলেন না। সমস্ত গ্রামের অলি, গলি, পুকুর ধার, ডোবা, মাঠে, জঙ্গল-ঝোপে খোঁজ খোঁজ রব পড়িয়া গেল।

* * * * *

এদিকে বস্ত্রাবৃত টেঁপীর মৃতদেহ দাওয়ার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। উন্মাদিনী বিন্দু শবের মুখের কাপড় সরাইয়া দিয়া বলিতেছে "টেঁপী টেঁপী কত ঘুমুচ্ছিস মা, ওঠ একটু দুধ খা অনেকক্ষণ খাস্‌নি যে মা।"

পরাণ বিন্দুর হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর কি তোর টেঁপী আছে, কাকে ডাকছিস্ ওকি তোর মেয়ে ? শত্রু—শত্রু ! আর জন্মে ওর কাছে কত ঋণ করেছিলি এ জন্মে পেটে এসে শোধ নিয়ে গেলো, কাঁদিসনি, কেঁদে কি ফেরাতে পার্ব্বি ?

"ওগো তুমি আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার

টেঁপীকে অমন বলে গাল দিও না। আমার যে কত কষ্টের টেঁপী, কত ঠাকুরের দোর-ধরা টেঁপী, তুমি কি জানবে? আমি যে বুকের রক্ত খাইয়ে ওকে মানুষ করেছি। আমায় তুমি ধোরো না—ছেড়ে দাও। মেয়ে অনেকক্ষণ পড়ে রয়েছে, অনেকক্ষণ মা বলে ডাকে নি।"

—"আর কি তোর টেঁপী আছে, আমাদের ছেড়ে অনেকক্ষণ চলে গেছে।"

স্ত্রীপুরুষে বাড়ীর উঠানে বসিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ওকি? ও আবার কি? টেঁপীর সেই কুকুর ছানা নয়? লাফিয়ে দাওয়ার উপর উঠিয়া টেঁপীর বিছানার চারদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে না? তাইত? টেঁপীর মুখের কাপড়খানা সরাইয়া দিয়া কুঁই কুঁই করিয়া ডাকিতেছে না?

পরাণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"এতক্ষণে এসেছিস্? আর কি তোর টেঁপী আছে, তোর আদর কর্ব্বার লোক চলে গেছে, আর এখানে কেন এসেছিস্ সোনা, যা চলে যা।"

বিন্দু আগুন হইয়া বলিল—"দূর করে দাও, ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দাও—তুমি ওকে কাঁদুনি শোনাচ্ছ অলক্ষণে কুকুরের গায়ে গোবর জল গুলে গাঁ ছাড়া করে দাও।"

পরাণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল—"ওর দোষ কি বিন্দি, সব আমাদের পোড়া অদৃষ্টের দোষ, আমাদের কপাল পুড়েছে, ওকে মেরে তাড়িয়ে দিলে কি তোর টেঁপী ফিরে আসবে?"

—"কি কুক্ষণে কুকুর এনেছিলে তুমি? আমার সোণার সংসার ছারখার করে দিলে; রাক্ষসী আসতে না আসতে আমার সোণার প্রতিমা টেঁপীকে খেয়ে ফেল্লে কিন্তু ওকেও আমি জ্যান্ত যেতে দিচ্ছিনে টেঁপীর সঙ্গে ওকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে বিন্দু এক লম্ফে দাওয়ার উপর উঠিয়া বজ্র মুষ্টিতে শাবকটির গলা টিপিয়া ধরিল। শাবকটি বিকৃত স্বরে ডাকিয়া উঠিতেই কোথা হইতে দারোগা সাহেব চারজন পুলিশ সঙ্গে করিয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখেন জমীদারের কথিত হৃত কুকুর-শাবকটির অবয়বের সঙ্গে এই কুকুরটির সমস্ত মিলিয়া যাইতেছে। ইহাই যে সেই কুকুর সে বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

বাড়ীর মধ্যে পুলিশ দেখিয়া পরাণ ও বিন্দু উভয়েই চমকাইয়া উঠিল। কাহারও মুখে কথা সরিল না, ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া এক দৃষ্টিতে পুলিশের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিন্দুর হাত হইতে কুকুরটিকে লইয়া দারোগা সাহেব বলিলেন "পরাণ কুকুর চুরির অপরাধে তোমায় বন্দী কর্লে'ম।"

একজন কনেষ্টেবল তৎক্ষণাৎ পরাণের দুই হাতে লৌহ বলয় পরাইয়া দিল। পরাণ কোন বাধা দিল না শান্ত সমুদ্রের মত ধীর ভাবে বলিল—"দারোগা সাহেব—আমার বলবার কিছুই নেই; তবে এইটুকু অনুরোধ আমায় দু ঘণ্টার মত মুক্তি দিন—মেয়ের গতি করে আপনার হাতে আত্মসমর্পণ কর্ব্ব।"

সম্মুখে টেঁপীর মৃতদেহ পড়িয়াছিল দেখিয়া দারোগা সাহেব পরাণের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। একজন পুলিশকে পরাণের উপর দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দিয়া তিনি কুকুর লইয়া চলিয়া গেলেন।

টেঁপীর শবদেহ বুকে তুলিয়া লইয়া পরাণ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"ভেবেছিলুম টেঁপীকে পুড়িয়ে এসে শূন্য ঘরে কি কর্ব্বে আসবো কিন্তু ভগবান তাই স্বকর্ণে শুনলেন। তাই পুলিশের হাতে দিয়ে সেই শূন্যভাব মুছে দিলেন—বিন্দি—তবে চোল্লুম আর বোধ হয় তোর সঙ্গে দেখা হবে না।"

টপ্ টপ্ করিয়া চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। বিন্দু সজল চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কিছু উপায় করে যাও, টেঁপী বুকে ছুরি মেরে চলে গেল, তুমিও চল্লে, ওগো আমার কি হবে বলে দাও।"

ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলী তুলিয়া পরাণ ব্যাকুল ভাবে উত্তর দিল—"ঐ ওকে জিজ্ঞাসা কর্ বিন্দি ওই, তোর উপায় বলে দেবে"; পরে পুলিশের দিকে চাহিয়া বলিল—"চল হে আর দেরী কর্ব্বার দরকার নেই ... ..."

বিন্দু দেখিল টেঁপীকে লইয়া পরাণ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল যতদূর দেখা গেল এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল যখন

আর দেখা গেল না তখন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"ভগবান্‌ আমার উপায় কি হবে বলে দাও।"

(৬)

বিচারে পরাণের ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু অতদিন পরাণকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, দারুণ মনোবেদনায় পনর দিন যাইতে না যাইতেই সেও টেঁপীর অনুসরণ করিল। এদিকে দারোগা সাহেব জমীদারকে কুকুরছানাটী ফিরাইয়া দিয়া প্রচুর পুরস্কার পাইলেন।

হতভাগিনী বিন্দুবাসিনী স্বামী ও কন্যার শোকে উন্মাদিনী হইয়া কোথায় যে চলিয়া গেল আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেবার জমীদার রতন রায়ের বাটীতে দুর্গোৎসব। একমাস পূর্ব্ব হইতে পূজার যাবতীয় সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন, দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিরই নিমন্ত্রণ, এ ছাড়া দেশবিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিয়াছেন; আত্মীয়-কুটুম্ববর্গে জমীদারের বৃহৎ অট্টালিকাটী পরিপূর্ণ; বাড়ীতে নহবত বসিয়াছে, চতুর্দ্দিকে যেন এক আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পরেই মায়ের সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। পূজা প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য, নানাবিধ বাদ্য বাজিতেছে, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর ও ঢাকের শব্দে পূজা প্রাঙ্গণ গমগম করিতেছে। বিবিধ আতস বাজী পোড়ান হইতেছে; সকলেই অবাক্‌ হইয়া একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকাইয়া হাউইয়ের অগ্নিময় পুষ্প বরিষণ দেখিতেছে।

পূজান্তে মায়ের আরতি আরম্ভ হইল। জমীদার রতন রায় জোড়হস্তে দেবীর প্রতিমার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন হঠাৎ একটী হাউই উপর দিকে না উঠিয়া ছাড়িবার দোষে পূজা-মন্দিরের কার্ণিশের পাশ দিয়া গোশালার চালে গিয়া পড়িল। কাহারও সেদিকে দৃষ্টি নাই—কেহ আরতি দেখিতেছে কেহ বা বাজী পোড়ান দেখিতেছে।

চালার আগুণ ধোঁয়াইয়া ধোয়াইয়া হঠাৎ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অনুকূল পবনের সাহায্যে অগ্নিদেব গো-শালার চালা হইতে জমীদার রতন রায়ের উচ্চ প্রাসাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত তেতালার ঘরের উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং ক্রমশঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত সিঁড়ি, বারান্দা প্রভৃতির মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। সেই আলোকে আকাশের অনেক খানি স্থান রক্তিম আভায় আলোকিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত জনসমূহ কেহই বুঝিতে পারে নাই যে আগুন লাগিয়াছে, মনে করিল বাজীর আলোতে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে।

তারপর বিশ্ববিধ্বংসী লোলরসনা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মণ্য-দেব যখন কক্ষের পর কক্ষে, অলিন্দের পর অলিন্দে রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল, তখন বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া দর্শকবৃন্দ প্রাণভয়ে ইতঃস্তত পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পালাইবার ত রাস্তা নাই চারিদিক হইতে আগুণ চাপিয়া আসিয়াছে, যেই দিকে ছুটে অনলের লেলিহান শিখা বাধা দেয়, অজস্র পুঞ্জীভূতে ধূমে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত, পরিত্রাহি শব্দে গগন মণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল।

রতন রায় ক্ষিপ্তের ন্যায় নীলুকে খুঁজিতেছেন। হায়রে কোথায় তখন নীলু! কাষ্ঠ নির্ম্মিত জলন্ত বারান্দার উপরে 'বাবা গো বাবা গো' বলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। জমীদার বক্ষে করাঘাত করিয়া 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। নীলুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া জমীদার বালকের ন্যায় আছাড় খাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"কে আছ নীলুকে বাঁচাও, নীলুকে রক্ষা কর, নীলুর প্রাণ যায়!"

কে কার কথা শুনে। অগ্নিচক্র ভেদ করিয়া কার সাধ্য নিলুর কাছে যায়। জমীদার দেখিলেন অর্দ্ধদগ্ধ নীলু কুকুর-টীকে বুকে লইয়া তখনও ক্ষীণ স্বরে "বাবা গো গেলুম, পুড়ে মলুম" বলিয়া চেঁচাইতেছে। ক্রমে ধূমে ও অগ্নি শিখায় বারাণ্ডা মিশিয়া গেল, আর কিছুই দেখা গেল না, আর নীলুর আর্ত্তনাদ শোনা গেল না, কেবল প্রলয়ের ভীম গর্জ্জনের সঙ্গে কুকুর শাবকটীর অস্পষ্ট শব্দ ভাসিয়া আসিল—কুঁই কুঁই কুঁই।

জমীদার হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন।

কালরাত্রি প্রভাত হইল; তখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। রতনরায়ের অত বড় অট্টালিকা খালি রাশি রাশি ইষ্টক-স্তূপে পর্য্যবসিত। কাল যিনি রাজ-

চক্রবর্ত্তী ছিলেন নিয়তির কঠোর দণ্ডে আজ তিনি ভিখারী !

রতনরায় উন্মাদের মত ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, সহসা সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া দেখেন ভস্মস্তূপের উপর টেঁপীর কুকুর ছানাটী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রতন রায়ের বুকের ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। ওই কুকুরের জন্য তিনি কি না করিয়াছেন, ওই কুকুরের জন্যই ত টেঁপীকে মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিয়াছেন, নিরীহ পরাণকে পুলিশে ধরাইয়া দিয়া অকালে তার প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন, ওই কুকুরের জন্যই ত বিন্দু উন্মাদিনীর মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! আর ওই কুকুর তাঁর সোণার সংসার পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে ; পিণ্ডস্থল একমাত্র পুত্র নীলু ওই কুকুরের জন্য আগুনে পুড়িয়া মরিল। জমীদার আর চিন্তা করিতে পারিলেন না, মনে ধিক্কার আসিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কি অলক্ষণে কুকুরকে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছিলেম !"

হঠাৎ পশ্চাতে খল খল বিকট অট্টহাস্য শুনিয়া জমিদার মুখ ফিরাইয়া দেখেন এক রুক্ষকেশা ছিন্নবেশা উন্মাদিনী রমণী ; একমুষ্টি ভস্ম লইয়া কুকুর শাবকটীর গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার বিকট হাস্যে বলিয়া উঠিল—"তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্ ও একটা কুকুর ছানা ? তা নয়—নিয়তির দূত ! টেঁপীকে ধ্বংস কর্ল্লে, টেঁপীর বাপকে ধ্বংস কর্ল্ল, আমাকে ধ্বংস কর্ল্লে, তোর ছেলেকে ধ্বংস কর্ল্লে, তোর যা কিছু সব ধ্বংস করে গুড়্ গুড়্ করে কেমন ল্যাজ নেড়ে যাচ্চে দেখ্। ওই মাঠে গিয়ে পড়্ল আবার কাকে ধ্বংস কর্ত্তে চলেছে। দেখলি ত তুই বল্ছিলি কুকুর, হাঃ হাঃ হাঃ তা নয়, নিয়তির দূত !"

এই বলিয়া পাগলিনী মাঠের রাস্তা ধরিয়া কুকুরের পশ্চাতে পশ্চাতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল। জমীদারের চোখে যেন ধাঁ ধাঁ লাগিয়া গেল। একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিলেন পাগলিনী তখনও কুকুরটির পশ্চাতে ছুটিতেছে ; তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও জমীদার বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন পাগলিনী তখন ও বলিতেছে "কেথায় যাবে তা না দেখে ছাড়চি না। ধ্বংসের সূচনা দেখিয়েছে, এর যবনিকা না দেখে ফিরছি না।"

জমীদার গালে হাত দিয়া ভস্মস্তূপের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "পাগলী যা বলে গেল সব সত্যি, প্রকৃতই এ কুকুর বেশী নিয়তির দূত !"

* * * * *

আজো মাঝে মাঝে অজ্ঞাত পথিকের কর্ণে নৈশান্ধকারের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সেই উন্মাদিনী নারীর বিকট চীৎকার প্রবিষ্ট হয়—"নিয়তির দূত—নিয়তির দূত !"

তৃষ্ণা

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

চলিয়াছে শীল ভদ্র একাগ্রচিত্তে ; যেমন করিয়া একদিন দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্র ছাড়িয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবে আজ চলিয়াছে তৃষ্ণার মুক্তি কামনায় সেই পরিত্যক্ত পাটলীপুত্রে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে, অপরিসীম হর্ষে, বিশ্ববিকশিত জ্যোৎস্নার মত অবাধ প্রফুল্লতায়। পড়িয়া রহিল দূরে তাহার সাধন ক্ষেত্র সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের স্মৃতি বুকে লইয়া। এক এক বার সেই দ্বাদশবর্ষের সাধনার ক্রম-বিকাশের ঘটনাবলী মানসরঙ্গভূমির উপর নিক্ষিপ্ত যবনিকা ঠেলিয়া উঁকি মারিতেছিল ; এক এক বার ফিরিয়া সাধন ক্ষেত্রে যাইয়া ধ্যানের অমিত প্রভায় ভগবান্ বোধিসত্ত্বের অপরূপ লীলা-মাধুরী নিরীক্ষণ করিবার লোভ মনের কোণে জাগিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু আবার তৃষ্ণার উদ্ধারের চিন্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহাকে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত করিতেছিল।

এইরূপ মানসিক ভাব লইয়া শীলভদ্র তাকলাকোট ও লিপুলেখের তুষার মরু অতিক্রম করিয়া গারবণ্ডের অধিত্যকায় তাহার গুরুভাই অবলোকিতেশ্বরের সাধন-মঠে উপনীত হইল।

শীলভদ্রকে দেখিয়া অবলোকিতেশ্বর যেন একটু ক্ষুণ্ণভাব ধারণ করিল, যেন তাহার মানস-পথে একটা ক্ষীণ সন্দেহের রেখা অজ্ঞাতসারে অঙ্কিত হইয়া গেল ; তাহার মনে হইল, এ ত সেই শীলভদ্র নয়, যে একদিন ভগবান্ বোধিসত্ত্বের জন্য জীবনপণে সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিল ; যার সাধনার প্রভাব একদিন রাধাগুপ্তের শিষ্যমণ্ডলীর আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল, যাহার তুষার-প্রোথিত মূর্ত্তি আজও স্বপ্নের দৃশ্যের মত মানস-নয়নে প্রতিভাত হয়,—একি সেই শীলভদ্র ?—না—এত সে নয়! এযে এক কামনার প্রতিমূর্ত্তি!—শীলভদ্রের কঙ্কাল—প্রেতমূর্ত্তি!

যাহা হউক, বাহিরে অন্তরের ভাব প্রকাশ না করিয়া অবলোকিতেশ্বর শীলভদ্রকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিল, বহু সম্মানদানে তুষ্ট করিল, পথশ্রম অপনোদনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিল।

সূর্য্যদেব দূর তুষার ক্ষেত্রের উপর শেষ কিরণ-ছটা বিকীর্ণ করিয়া চলিয়া পড়িতেছেন দূরে দিগন্তরালে। ছাগলের পাল লইয়া ব্যবসায়ী চলিয়াছে ধীর মন্থর গতিতে বাটির উদ্দেশে। উন্নত দেবদারু পাইন ফার প্রভৃতি বৃক্ষের শ্যাম পত্রাবলী যেন কোন যাদুকরের মোহিনী মায়ার কুহক-দণ্ড-স্পর্শে উত্তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ ধারণ করিয়া মুগ্ধ জীবনের অসারত্বের মহিমা প্রচার করিতেছে—এ জগৎ অনিত্য, অস্থির, চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল ; আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকিবে না, এই মুহূর্ত্তে যে যে আকারে ধরণীর বুকে বিরাজমান, পর মুহূর্ত্তে তাহা ভিন্নরূপে পর্য্যবসিত ; যে কালীনদী আজ ভীম গর্জ্জনে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া সুদূর অনন্তের উদ্দেশে লক্ষ্যহারা কেন্দ্রভ্রষ্ট ধূমকেতুর মত স্বপ্নায়মান জগতে ছুটিয়া চলিয়াছে, কে বলিতে পারে মুহূর্ত্ত পরে তাহার অস্তিত্ব ধরার বিশাল বক্ষ হইতে চিরতরে মুছিয়া যাইবে না, অনন্ত নীরবতার কোলে বিলীন হইয়া যাইবে না তাহার মুগ্ধ হৃদয়ের গভীর গর্জ্জন, অশ্রান্ত কল তান, মর্ম্মস্পর্শী হাহাকার।

কালীনদীর তীরে পাষাণখণ্ডের উপর শীলভদ্র ও আলোকিতেশ্বর বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত, অবলোকিতেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল—"পাঠলীপুত্র যাওয়া হচ্ছে কেন ?"

শীলভদ্র উত্তর করিল—প্রথমতঃ জন্মভূমি দর্শন।"

বিস্মিত হইয়া অবলোকিতেশ্বর প্রশ্ন করিল—"সেকি? তোমার আবার জন্মভূমি কি? তুমি সাধনবলে পূর্ব্ব জ্ঞানীদের বংশে নব জন্ম পরিগ্রহ করেছ—তোমার ত জন্মভূমি বলে' কিছু নেই!"

শীলভদ্র বলিল—"দেখ, সে অন্তর্দৃষ্টিতে নেই বটে; কিন্তু বাহ্যতঃ স্থূল দৃষ্টিতে যতদিন এ পাঞ্চভৌতিক দেহ আছে, যতদিন এ জড়-চৈতন্যের বাহ্য সংযোগ বর্ত্তমান, ততদিন জন্মভূমি নেই বল্‌লে কি চলে? বল দেখি ভাই, একদিনও কি মনের কোণে, সাধনার শ্রমাবসানে দূর বাল্যকালের স্মৃতি, কৈশোরের সুখস্বপ্ন, যৌবনের লীলা-বিলাস মুহূর্ত্তের জন্যও কি উদিত হয় না? ফুটে উঠে না কি সে ছবি, সে ভালবাসার চিত্র, সে মধুর লোভনীয় কমনীয় শান্ত মূর্ত্তি, পূর্ব্বাশায় উষার রক্তিমছটাকে লাঞ্ছিত করিয়া, তুষার মরুর অমলধবল শোভা নির্জ্জিত করিয়া, বনানীর সুপ্তঅঙ্কে জ্যোৎস্নার কোমল প্রভা পরাজিত করিয়া ধ্যানগঠিতা বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব মহিমার মত বিশ্বের কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে, ভরিয়া দিয়া সমস্ত মনপ্রাণ এক অপূর্ব্ব পুলকে? জাগিয়া উঠে না কি বন্ধু মোহবন্ধনের মধ্যে কোমল বাহু-লতিকার সুখস্পর্শ? টুটিয়া যায় না কি ক্ষণে ক্ষণে ধ্যানের অপূর্ব্ব একাগ্রতা জননীর স্নেহাহ্বান মনে পড়িয়া, নৈশচন্দ্রালোকে সুপ্তকুঞ্জের নিভৃত নীরবতায় প্রণয়িনীর সপ্রেমভৎসনায়?—তবে বন্ধু এ জড় সম্বন্ধকে উপেক্ষা করবে কি করে?"

শীলভদ্রের এই বাক্যে অবলোকিতেশ্বর যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল! যে শীলভদ্র মারের কঠোর হস্ত এড়াইয়া বোধিসত্ত্বের কৃপাপ্রাপ্ত, একি সেই শীলভদ্র? সেই শীলভদ্রের অন্তর প্রদেশে একি বিসদৃশ অভাবনীয় কাণ্ড,—কামনার একি লীলা-চাঞ্চল্য! অবলোকিতেশ্বর নীরবে দূর কালীনদীর ঘূর্ণাবর্ত্তের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটু পরে বলিল—"দেখ ভাই, তুমি যা বল্‌ছ তা ঠিক; হয়ত সময়ে সময়ে পূর্ব্ব স্মৃতি মনে উদিত হয়ে সাধনার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, কিন্তু তাকে দমন করাই ত সাধকের কর্ত্তব্য; তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যদি চল্‌তে থাক, তবে ঐ যে দূরে কালীনদীর ঘূর্ণাবর্ত্ত দেখ্‌ছ, ঠিক তার মধ্যে ঐ অদূরবর্ত্তী ভাসমান তৃণখণ্ডের মত গিয়ে পড়্‌বে—তখন আবার সেই মোহজালে জড়িয়ে জন্মমৃত্যু-চক্রে ওঠা নামা কর্‌তে হবে, অবশ্য তোমার মত উন্নত মহাপুরুষকে আমার কিছু বলা সাজেনা, তবু গুরুভাই বলে' বল্‌চি, তোমার যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়; তুমি ফিরে যাও সাধন ক্ষেত্রে, পাটলীপুত্রে গেলে যেন মায়ায় জড়িয়ে যাবে, কিম্বা গুরুদেবের কাছে গিয়ে কিছু দিন তাঁর সাহচর্য্য কর।"

শীলভদ্র গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল—"তুমি যা বল্‌চ, তাও ঠিক, কিন্তু দেখ, মোহের ঘূর্ণিপাকেই যে পড়্‌তে হবে, তারই বা কারণ কি? জন্মভূমি দেখ্‌তে গেলেই যে তার মায়ায় আবদ্ধ হতে হবে এমন কি কথা আছে? ভগবান্ বোধিসত্ত্বও ত শেষে সাধনার অবসানে, কপিলাবাস্তুতে গিয়ে পিতামাতা-স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন; তিনি কি মোহে আবদ্ধ হয়েছিলেন? আরও দেখ আমরা যদি সকলেই পর্ব্বত-গহ্বরে নির্জ্জনে বাস কর্‌তে থাকি, তবে যারা সংসারী তাদের কি হবে? কে তাদের কাছে মুক্তির বাণী নিয়ে ভগবান বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব পুণ্য জীবন উপস্থাপিত করবে? কে তাদের মোহঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে তাদের পূতি-পঙ্কিল জীবনে স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করবে? কে তাদের বল্‌বে—'ওরে আয় তোরা, কে আছিস্ নিদ্রিত, কে আছিস্ তন্দ্রাচ্ছন্ন, কে আছিস্ মোহবিজড়িত, আয় আজ তোদের জন্য, তোদের মুক্তির কামনায় নিয়ে এসেছি এ অপূর্ব্ব বাণী—অমৃতময়ী শাশ্বতী গাথা, যা কল্পকল্পান্তর ধরে তোদের প্রাণ-মন শান্তির স্বর্গীয় সুধায় পরিপূর্ণ করে' রাখ্‌বে—আয় কে আছিস্ কাঙ্গাল, কে আছিস্ দীন, কে আছিস্ পতিত—ভগবান বোধিসত্ত্ব তোদেরই জন্য মুক্তিপাত্র হাতে নিয়ে নির্ব্বাণের স্ফটিক তোরণে আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—আয় জীবন ধন্য কর্‌বি আয়।' কে তাদের এমনি করে তাঁর চরণ-তলে টেনে নিয়ে যাবে, কে তাদের কামনা-কলুষ-কালিমার বিষময় ফল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে? কাজেই দেখ, শুধু স্বার্থপরের মত নিজের নির্ব্বাণের পন্থা ধরে চল্‌লে চলবেনা—এস ভাই তুমিও এস আমার সঙ্গে আমরা দু'জনে

মিলে আবার ভগবান বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব ধর্ম্মচক্র পুনঃ প্রবর্ত্তন করি।”

অবলোকিতেশ্বর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, “না ভাই ‘ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন’ কর্ব্বার মত স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। আমি ক্ষুদ্র মানব, আমার নিজের নির্ব্বাণের চেষ্টাই করে উঠ্‌তে পারি না, মন চারদিকে ছুটে বেড়ায়, তার উপর অপরের উদ্ধারের ভার নেওয়া আমার মত দুর্ব্বলের কাজ নয়। অবশ্য তুমি হয়তঃ ভগবান্ বোধিসত্ত্বের উদাহরণ দিয়ে বস্‌বে; কিন্তু আমি বল্‌ছি ভগবানের সঙ্গে মানুষের শক্তির তুলনা হয় না, অগ্নির সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ কখনো বিরাট্ দাবানলের শক্তি নিয়ে বিশ্বজগৎ দগ্ধ কর্‌তে পারে না। এক বিন্দু জল অসীম মহাসমুদ্রের প্রবল উচ্ছ্বাসে—যদি বেলাভূমি বিপ্লাবিত কর্‌তে অগ্রসর হয়, তবে নৈরাশ্যই তার সম্বল হবে—সফলতা জীবন-পথে অগ্রসর হবে কিনা সন্দেহ।”

শীলভদ্র বলিল—“তুমি যা বলছ তা একটা দিক্ মাত্র, অন্যদিকে চেয়ে দেখ এই বিশাল বিশ্বের অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশার দিকে, জন্মজরা-মরণের অনন্ত অক্ষুরন্ত আবর্ত্তনের দিকে, এ দেখে কি করে মানুষ স্থির থাকৃতে পারে? আমার মনে হয়, অবশ্য বিশ্বের কোটি কোটি নর-নারীর দুঃখ-দুর্দ্দশা দুর কর্‌তে না পার্‌তে পারি, কিন্তু যদি এক জনেরও দুর্দ্দশা দূর করতে পারি, এক জনেরও হৃদয়ে ভগবান্ বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব পুণ্য চরিত্রের প্রভাব প্রতিফলিত কর্‌তে পারি, এক জনেরও প্রাণে নির্ব্বাণের স্নিগ্ধ শান্তিধারার প্রথম স্রোত বহাতে পারি, তাই কি কামনীয় নয় বল্‌তে চাও? নিজের জন্য যে জীবন—সে ত হেয়, ঘৃণ্য, শৃগাল কুকুরের মত পাশবিক; কিন্তু পরের জন্য যে জীবন, আত্মদান, যে স্বার্থ-ত্যাগ, তাই ত মহীয়ান্, গরীয়ান্, আলোকোজ্জ্বল, অপূর্ব্ব!”

বাধা দিয়া অবলোকিতেশ্বর বলিল—“কিন্তু জেনো তা কর্‌তে গেলে উচ্চাবস্থা থেকে নাম্‌তে হবে; নির্ব্বাণের অপূর্ব্ব আস্বাদ ভুলে যেতে হবে; পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে গ্রাম-বাসীর উপকার করা চল্‌বেনা—তা কর্‌তে গেলে তোমাকে তাদের সঙ্গে শয়নেস্বপনে, সুখেদুখে, হাসিকান্নায় এক হয়ে যেতে হবে, তোমাকেও তাদের দলে গিয়ে মিশ্‌তে হবে, তাতে পতন হওয়া অসম্ভব নয়।”

“কি বল্‌ব অবলোকিতেশ্বর” বলিয়া শীলভদ্র অব-লোকিতেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

অবলোকিতেশ্বর সেই দৃষ্টির মধ্যে দেখিল একটা বিশ্বব্যাপী স্নিগ্ধ করুণার ছায়া—যে করুণা একদিন ভগবান বোধিসত্ত্বের হৃদয়-মন্দাকিনী হইতে নিসৃত হইয়া জড়জগতের মোহ-কালিমা ধৌত করিয়া অনন্ত নির্ব্বাণের পথে বাঁধনহারা উল্কাপিণ্ডের মত ছুটিয়াছিল;—শীলভদ্র যেন সেই করুণার একবিন্দু লাভ করিয়াছে—আর তাহা তাহার নয়নে বদনে প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, দর্পণে স্বাত্মপ্রতিকৃতির মত, সরসীর স্থির জলে তীরস্থিত দ্রুমদলের ছায়ার মত, গোষ্পদে অনন্ত আকাশের প্রতিবিম্বের মত।

শীলভদ্র বলিল—“যাক্ আমার জন্মজন্মান্তর অনন্ত নরকের গভীর কূপে, জন্মজরা-মরণের আবর্ত্তনরূপ গভীর ঘূর্ণাবর্ত্তে; লীন হয়ে যাক এ দেহ জড়মাংসপিণ্ড কৃমিকীটের উদর-গহ্বরে; চাই না নির্ব্বাণ, চাই না মুক্তি, চাই না শাশ্বত শান্তি,—চাই যদি একজনও ভগবান বোধিসত্ত্বের চরণে আত্মদান করে, তাঁর পবিত্র জীবনের প্রতি অনুরাগী হয়, অন্ততঃ একজনও যেন তাঁহার ধর্ম্মকল্পবৃক্ষের মহীয়সী ছায়াতলে বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া জন্মজরা-মরণের করাল কবল হইতে উদ্ধার লাভ করে; তাতে আমি অনন্তকাল নিরয়গামী হই—ক্ষতি নাই। আরো দেখ, আমি যাদের ভলবাসি, যাদের স্নেহ করি, অন্ততঃ একদিন যাদের আদর করে’ বুকে তুলে নিয়েছি, তারা সংসারের মোহান্ধকারে দুঃখের বিপুল ঝঞ্ঝাবাতে, মুক্তিহীন জন্মজরামরণের কঠোর বন্ধনে বদ্ধ হয়ে থাকৃবে, আর আমি মুক্তির পথে একাকী নীরবে অগ্রসর হ’ব চুপি চুপি কৃপণের ধনভাণ্ডার পরীক্ষার মত;—আমাকে দিয়ে সে স্বার্থপরতাময় কাজ সম্ভব হবে না ভাই। আমি চাই আমার আত্মীয়স্বজন সকলকে, আমার দেশবাসীকে, সমগ্র মানবজাতিকে দেখাতে—নির্ব্বাণে কি অপূর্ব্ব মাধুরী, ত্যাগে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ, কি অপরিসীম আনন্দ! আমি ভাই সেই উদ্দেশ্যে পাটলীপুত্র যাচ্ছি—আমার বাল্যসখী তৃষ্ণাকে সংসারের পঙ্কিল আবর্ত্ত থেকে উদ্ধার করে ব্রহ্মপুত্রের নারী-বিহারে সাধনায় নিযুক্ত করব।”

অবলোকিতেশ্বর চমকিত হইয়া বলিল—“বল কি!

অমন কাজও করো না, ওযে স্ত্রীলোক ! একবার যদি সাক্ষাৎ হয়, সুপ্ত কামনা বর্ষার বারিপাতে বীজের মত অঙ্কুরিত হয়ে ফলফুলপল্লবে পরিমণ্ডিত কর্ব্বে।"

শীলভদ্র উত্তর করিল—"ভয় নেই ভাই, আমি শুধু ভগবান বোধিসত্বের পুণ্য চরিত্রের কথা শুনিয়ে নির্ব্বাণের পথে নিয়ে আসব, না আস্‌তে চায়, আমি আবার ফিরে আসব সাধনক্ষেত্রে।"

অবলোকিতেশ্বর বলিল—"দেখ ভাই, কামিনী আর কাঞ্চন এ দু'টি বড় ভয়ানক জিনিষ—মারের প্রধান অস্ত্র। গুরুদেবের কাছে শুনেছি, তুমি মারের প্রলোভন জয় করেছ, কিন্তু সাবধান, আবার যেন তার কবলে পড়োনা; আমাদের গুরুভাইদের মধ্যে তুমিই উন্নত; তোমার যদি কোন্ রকমে পতন হয় তবে আমরা দাঁড়াবার স্থান পাব না। আরো দেখ, স্ত্রীলোকের শরীর এমন কতকগুলি দ্রব্য-সংযোগে তৈরী যে, তাতে পুরুষ শরীরকে আকর্ষণ করে, তা সে যেই হোক—বালিকাই হোক, যুবতীই হোক, আর বৃদ্ধাই হোক, সুতরাং আমার মতে তোমার এ সঙ্কল্প পরিহার করা উচিত।"

শীলভদ্র তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল কিন্তু জানিত না অবলোকিতেশ্বরের উক্তিই একদিন তাহার জীবনে মহাসত্য-রূপে প্রতিভাত হইবে। আজ শীলভদ্র সফলগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া অবলোকিতেশ্বরের নিস্বার্থ হিতবাক্য উপেক্ষা করিল। যখন নিয়তির প্রবল ধ্বংসলীলা মানবের জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন সে নিঃস্বার্থ উপদেশ অবহেলা করে; সাধকেরও যখন অধঃপতনের সময় আসে তখন তাহার জ্ঞাননেত্র মায়াবরণে রুদ্ধ হইয়া যায়; বুঝিতে পারে না, কি তাহার পক্ষে শুভ, সিদ্ধিপথের অনুকূল। বিশেষতঃ যোগৈশ্বর্য্যে মুগ্ধচিত্ত হয়, ভাবে বিশ্বের সমস্ত তথ্যই করামলকবৎ তাহার নিকট ধরা দিয়াছে, কিন্তু বুঝিতে পারে না ত্রিগুণময়ী মায়া আস্তে আস্তে তাহার জ্ঞানচক্ষু আবরিত করিতেছে—ধীরে ধীরে অহঙ্কারের বিপুল তামসী ছায়া হৃদয়-বৃন্দাবন আচ্ছন্ন করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে।

অদূরে শুক্র তারকার নীলাভ জ্যোতি তুষারমরুর ধবল ক্ষেত্রে, দূর বনরাজির উন্নত শীর্ষে, কালী নদীর কল তরঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। উভয়ে শীলাসন ত্যাগ করিয়া আশ্রমের দিকে চলিল।

(৪)

যতই শীলভদ্র জনবিরল তুঙ্গ পার্ব্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ততই যেন তাহার মানস জগতে ভাব বৈষম্যের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিল। কি যেন একটা অনির্ব্বচনীয় স্পন্দন শীলভদ্রের দেহের প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছিল—যাহার তুলনা নাই, উপমা নাই, জগতে যেন সমজাতীয় কিছু নাই।

এক স্থানে শীলভদ্র দেখিল একটি কিশোরী পুষ্প বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতেছে। কিশোরীর অন্তর জগতে যেন কোন অশরীরী দেবমূর্ত্তি বিরাজমান, আর তাহারই সঙ্গলাভে আত্মহারা কিশোরী বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে—অন্তরের পরম দেবতার পূজার জন্য পুষ্প-চয়ন-রতা;—এই দৃশ্য দেখিয়া শীলভদ্রের মনে জাগিয়া উঠিল তৃষ্ণার কথা—সে দিন কি আনন্দের দিন হইবে, যে দিন তৃষ্ণা তাহার দেহে মনে প্রাণে ভগবান বোধিসত্বের ত্রিলোক-বিজয়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই ধ্যানে জীবজগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিবে এবং মানস দেবতার পূজায় আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হইবে। আবার মনে হইল—যদি তৃষ্ণা পঙ্কিল ভোগলালসায় ডুবিয়া থাকিতে চায়—ঘৃণ্য জড় বস্তুর মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে, যদি উষরভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের মত ভগবান্ বোধিসত্বের পুণ্যচরিত-কথা তাহার হৃদয়ে কোনরূপ ভাব-রেখা অঙ্কিত করিতে অসমর্থ হয়; যদি সে ভাবে মৃত্যুর হাত ত এড়াইবার উপায় নাই, এক দিন ত এ দেহ শ্মশানের চির স্থৈর্য্যময়ী নীরবতায় কাশবন-প্রান্তভাগে স্রোতস্বতীর উপকূলে ধূলিকণায় বিলীন হইয়া যাইবে,—ইন্দ্রিয় আর ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিবে না, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুষমা ক্রীড়াবসানে যাদুকরের কুহকের মত, স্বপ্নের দৃশ্যের সৌন্দর্য্যের মত, পলকে কোন অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে; তবে কেন সময় থাকিতে, যৌবনের সরস-রসধারা প্রাণের পরতে পরতে প্রবহমান থাকিতে থাকিতে, ভোগ বাসনার জ্বলন্ত বহ্নি অন্তর জগতে প্রধূমিত

প্রজ্জ্বলিত থাকিতে থাকিতে, তাহাতে ইন্ধন না যোগাইয়া বৈরাগ্যের শীতল বারিপ্রক্ষেপে নির্ব্বাপিত করিব?—বরং যতদিন দিন আছে, যতদিন অমানিশির ঘনান্ধকার বিশ্ব-চরাচরে মসীমাখা বিরাট্ কাল ছায়া লইয়া আবির্ভূত না হয়, ততদিন মুক্ত আকাশের অবাধ নীরবতার মধ্যে, ধরণীর স্বপ্নহীন সুপ্তির মধ্যে, লোধ্রক্রমের শাশ্বত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে, নির্ঝরিণীর বাধা বন্ধহীন উদ্দাম গতির সাহচর্য্যে এ ভরা যৌবনের নৌকা ভাসাইয়া দি বিলাস-স্রোতে, জ্বালিয়া দি ভোগের ইন্ধন বিশ্ব জুড়িয়া—ভোগ—ভোগ—চলুক এক বিরাট্, বিপুল, অবাধ অগাধ সীমা-পরিসীমাহীন অফুরন্ত ভোগ-প্রবাহ এ যৌবনপুষ্ট দেহ মনের উপর দিয়া, লালসাপুরিত প্রাণের শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া, ধ্বংসোন্মুখ বিশ্ব জগতের অনন্ত অফুরন্ত ঘূর্ণনের উপর দিয়া; ফুটিয়া উঠুক মরনয়নের সম্মুখে কোন পরীরাজ্যের নবীন সুষমা হৃদয়-মন ব্যাকুল করিয়া, ধরণীর বৈষম্য-বিভিন্নতা দূরীভূত করিয়া বট বৃক্ষের নব পল্লবে, সহকারের নব মুকুলে, মাধবীলতার নবোদ্গত কিশলয়ে, নিশীথের চন্দ্র-করোজ্জ্বল নীরবতায়;—আর তারই মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যাউক, জীবনের যাহা কিছু অভাব-অভিযোগ-অপূর্ণতা!

এই যদি তৃষ্ণার মনোভাব হয়, তবে শীলভদ্র কি করিবে? কেমন করিয়া সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবে, কি প্রকারে তৃষ্ণাকে নবীন জীবনের আলোকলোকে উপস্থিত করিবে?

আবার ভাবিল—"কে আমি? আমার কি ক্ষমতা তাহাকে নবীন জীবনে লইয়া যাই? ভগবান্ বোধিসত্ত্বই ত আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন; তাঁহার কার্য্য তিনিই করিতেছেন, আমি কেন বৃথা আমিত্বের আরোপে মানসিক অশান্তি ভোগ করি? এযে তাঁরই কাজ—তাঁরই প্রেরণা—আমি উপলক্ষ্য মাত্র—এ সিদ্ধ হতেই হবে।—কি ক্ষমতা তৃষ্ণার ভগবান্ বোধিসত্ত্বের প্রতিকূলাচরণ করে? নিশ্চয় আসিতে হইবে তাহাকে নির্ব্বাণের দীপ্তালোকে, ত্যাগের মহীয়সী ছায়ায়, গৌরবের স্বর্ণসিংহাসনে।"

চলিতেছে শীলভদ্র; কিন্তু ধীরে ধীরে যেন তাহার মানসজগৎ হইতে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব দূরে চলিয়া যাইতেছেন, আর ফুটিয়া উঠিতেছে তৃষ্ণার রূপমাধুরী-মণ্ডিত ছবি। যতই শীলভদ্র তৃষ্ণার দ্বাদশবর্ষের জীবনের কথা ভাবিতেছে, যতই তাহাঁকে ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই যেন তৃষ্ণা তাহার মানসজগতে ঘৃণা-উপেক্ষার মধ্য দিয়া সুদৃঢ় আসন পাতিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে যেন শীলভদ্রের মন একটু আনন্দের রেশ্ অনুভব করিতেছে—তৃষ্ণার ধ্যান, তৃষ্ণার চিন্তা, তৃষ্ণার কথা যেন আজ ভগবান্ বোধিসত্ত্বের ধ্যানের অপেক্ষা অধিকতর লোভনীয় হইয়া মনোরাজ্যে প্রকটিত হইতেছে।

এক নীরব সন্ধ্যায় শীলভদ্র এক দরিদ্র দম্পতীর কুটিরে রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিল। দরিদ্র দম্পতি এই জ্যোতিঃপুঞ্জ-বিমণ্ডিত সন্ন্যাসীকে তাহাদের যথাসাধ্য আহার্য্য দানে ও সেবাশুশ্রূষায় পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। নিশীথরাত্রে যখন চন্দ্রকিরণ বনান্তের শ্যামশাখা-পল্লবের মধ্য দিয়া নির্ঝরিনীর নির্ম্মল সলিলে, তুষারমৌলি হিমাদ্রির অমলধবল বক্ষে, সুপ্তপল্লীর নীরব কুটির-প্রাঙ্গণে, পুষ্পকুঞ্জের শিশির-সিক্ত কুসুম দলে, শ্রান্ত এলায়িত অলস পথে, তৃণখচিত দিগন্তব্যাপী উদার প্রান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া নিদ্রাহীন মানবের নয়নে স্বপ্নজাল রচনা করিতেছিল, তখন বিনিদ্র শীলভদ্রের শ্রবণ-বিবরে গৃহস্থ দম্পতীর অস্ফুট কল-গুঞ্জন দূরাগত বংশীনিনাদের মত, অজ্ঞাত পথিকের মধুর গীতখণ্ডের মত প্রবেশ করিতেছিল; তাই শুনিতে শুনিতে শীলভদ্রের মনে হইতেছিল—কি সুখী এ গৃহস্থ দম্পতি—কি আনন্দে ইহাদের ক্ষুদ্র গৃহস্থালী পরিপূর্ণ! দিবসের কর্ম্মক্লান্তির অবসানে, নিশীথের সুকোমল ক্রোড়ে প্রণয়ী-প্রণয়িনী ভুজলতিকার অপূর্ব্ব বন্ধনে কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতেছে—স্নেহে আদরে সোহাগে বিগলিত দুটি হৃদয়—একে অন্যের মুখাপেক্ষী, একে অন্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, নির্ভরশীল—কি অপূর্ব্ব, কি সুন্দর, কি রমণীয়! শীলভদ্রেরও ইচ্ছা হইল যদি তাহার জীবন তৃষ্ণার সাহায্যে এরূপ মধুর, এরূপ সুন্দর, এরূপ লোভনীয় রমনীয় হইত—তবে সে কি সুখের হইত। সহসা সে নিস্তব্ধ কক্ষ খিল্‌খিল্ অট্টহাস্যে মুখরিত করিয়া শীলভদ্রের চিন্তামগ্ন মানসজগতে একটা প্রলয়ের বন্যা ডাকিয়া আনিয়া অঙ্গ-

জ্যোতির অমিত ছটায় নৈশাকাশের জ্যোৎস্না-ধারা পরিম্লান করিয়া দাঁড়াইল সম্মুখে ফুলধনু হস্তে—মার! মার বলিল—"শীলভদ্র, আজ তুমি আমার অধিকারে। হৃদয়ে কামনার ছায়া অলক্ষিতে নিপতিত; বলেছিলাম দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে—একদিন আমারই সহচরীর জন্য লালায়িত হবে তোমার মন—আজ তার পূর্ব্ব সূচনা। যেইদিন তুমি সাধন-ক্ষেত্র থেকে বেড়িয়েছ, সেদিন থেকে আমি তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ আমার চেষ্টা আংশিক ফলবতী। বোধিসত্ত্ব দূরে—অনেক দূরে তুষারাচ্ছন্ন সাধনক্ষেত্রে ভূপ্রোথিত—এখন তোমার হৃদয়ের অধীশ্বর—আমি—সহচরী তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে।" এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে মার অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিঃশঙ্কচিত্তে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ ঝোপের অন্তরালে উদ্যতলম্ফ ব্যাঘ্র দর্শনে যেমন পথিক ভীত-চকিত হইয়া পলায়নতৎপর হয়, মারের দর্শনে শীলভদ্রও তেমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল শীলভদ্র—কি এ প্রহেলিকা! তবে কি সত্যসত্যই মার তাহার হৃদয়ে অধিকার বিস্তার করিয়াছে? সত্যই কি সে ভোগ-বাসনার জন্য লালায়িত? একবার মনে হইল যেন মন কতকটা তৃষ্ণার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল—কৈ না? সে ত ভোগ চাহে না—সে চাহে তৃষ্ণার মুক্তি;—যে পঙ্কিল পল্বলে পড়িয়া তৃষ্ণা হাবুডুবু খাইতেছে, সে চাহে তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া বোধিসত্ত্বের চরণতলে উপস্থাপিত করিতে; এর মধ্যে লালসা-কামনার স্থান কোথায়?

এক একবার শীলভদ্রের মনে হইল—ফিরিয়া যাই সাধনক্ষেত্রে—আবার তৃষ্ণা করুণ মূর্ত্তি লইয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—অহঙ্কার নবীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিল।

যখন পাপ ধর্ম্মের ভাণে, অহঙ্কার পরোপকারের বেশে সজ্জিত হইয়া মানবের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিবার জন্য উপস্থিত হয়, তখন বাস্তবিকই মানুষ জিনিষের প্রকৃতরূপ দেখিতে পায় না। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন শ্যামল তরুলতা, নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, ধূসর বালুকাময় মরুভূমি, তুষার রাশির শ্বেতশোভা হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত দেখে, নীল চশমা পরিহিত ব্যক্তি যেমন বিশ্বসংসার নীলরঙের আবরণ মণ্ডিত নয়নগোচর করে, তেমনি অহঙ্কার যাহার হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে, সেও পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায় না, আত্মপ্রতারণা তাহার সাথী হইয়া তাহাকে কলুর বলদের মত অসত্য ও অবিদ্যার চারি পাশে ঘুরাইয়া বেড়ায়।

অহঙ্কারের আবরণে শীলভদ্র দেখিতে পাইল না নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা, দৈন্য; বুঝিতে পারিল না সে সরিয়া আসিয়াছে কোথায়, সাধনার কত পশ্চাতে; দেখিল না বোধিসত্ত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে হৃদয়-রাজ্য হইতে দূরে দূরে—বহু দূরে—কোন অজানা দেশে, আর সেখানে প্রতিষ্ঠিত তৃষ্ণার ভুবনমোহিনী প্রতিচ্ছবি!

যতই শীলভদ্র পাটলীপুত্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই তাহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি সান্ধ্যতারকার মত উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল; ততই শীলভদ্রের অন্তর প্রদেশে একটা অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল—একটা হর্ষ-শোকমিশ্রিত ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল যা বিদেশ প্রত্যাগত প্রবাসী গৃহের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই অনুভব করে, ততই সে ব্যাকুলতা তাহার অন্তর প্রদেশে সঞ্চারিত হয়; শীলভদ্রও যেন ক্রমশঃ সেই ভাবের বশীভূত হইয়া পড়িতেছিল।

* * * *

এক অপরাহ্নে মন্দীভূত ময়ূখমালার সমভিব্যাহারে, মানব-কোলাহলের ক্ষীণায়মান অস্ফুট ধ্বনির সাহচর্য্যে, তাম্রকূট-সেবনরত গ্রামবৃদ্ধের অলস গল্পের মাঝে, গৃহ প্রত্যাগমনকারিণী কলসীকক্ষা কুলকামিনীর সিক্তবস্ত্রপ্রান্ত হইতে জলবিন্দু পতন শব্দের সঙ্গে শীলভদ্র পাটলীপুত্র নগরের বহির্দ্বারে উপনীত হইল। পাটলীপুত্রবাসী এই নবাগত দেবদেহধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ভক্তিভরে চরণে প্রণিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বহুলোক একত্রিত হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সন্ন্যাসীর পরিচয় লাভের জন্য উৎসুক। কিন্তু শীলভদ্র কাহাকেও কোন কথা বলিল না, চিত্রার্পিত পুত্তলিকার মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদ্যানবিহারে গন্ধকাম শ্রেষ্ঠীপুত্র দেবদত্ত এই জনতা দেখিয়া উহার সম্মুখীন হইল এবং শীলভদ্রকে দেখিয়া চিনিতে পারিল—এ সেই তাহার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী শীলভদ্র। সে তৎক্ষণাৎ শীলভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"কিহে এতদিনে বুঝি জন্মভূমির কথা মনে পড়েছে? এস ভাই এস, যে কয়দিন পাটলীপুত্রে থাকবে, আমার গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, আমার উদ্যানগৃহ তোমারই বাসের-জন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকবে" বলিয়া হাত ধরিয়া শীলভদ্রকে টানিয়া লইয়া গেল।

ক্রমশঃ

সুবর্ণবণিকের উপনয়ন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

বহুদিন হইতে সুবর্ণবণিক্-সমাজ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুসমাজে স্থানচ্যুত হইয়া আছেন। এই স্থানচ্যুতির মূলে যে তাঁহাদের উপর অন্যায় ও অবিচার রহিয়াছে, তাহা ইতিহাস পড়িলেই জানা যায়। তা'ছাড়া ইঁহাদের পবিত্র আচার-ব্যবহার, দয়াদাক্ষিণ্য, শুচিতা ও স্বধর্মনিষ্ঠা দেখিয়াও উহা সহজেই অনুমান করা যায়। যাহা হউক, আজ তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্বহৃত বৈশ্যত্বের জন্য হিন্দুসমাজের নিকট যে দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, আশা করি হিন্দুসমাজের সকল সহৃদয় ব্যক্তি উহা নিঃসঙ্কোচে পূর্ণ করিয়া আপনাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিবেন। কয়েক মাস হইতে দেখিতে পাইতেছি শাস্ত্র ও সমাজের সম্মতি পাইয়া সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি আপনাদের বৈশ্যত্ব সপ্রমাণের জন্য উপনয়ন গ্রহণে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। বালবৃদ্ধের বিচার নাই—অনুষ্ঠানের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য নাই—কোন মতে দলে দলে উপনীত হইতে পারিলেই তাঁহারা মহাকৃতকৃতার্থ; যেন এই টিকিটটি কাটা হইলেই এখনি তাঁহারা বাণিজ্যপোতে চড়িয়া বিশ্ববিজয়ে বাহির হইয়া পড়িবেন। এই ভাবটি আমাদের মোটেই ভাল লাগে নাই। সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায় আপনাদের পাতিত্যদোষ হইতে মুক্ত হইয়া বৈশ্যত্ব লাভ করুন—উন্নত হউন—উর্দ্ধে উত্থিত হউন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সম্মতি ও সহানুভূতি আছে; কিন্তু এই যে 'ভাবের ঘরে চুরি'—এই যে উপবীতের সাহায্যে বৈশ্য হওয়া নয়—বৈশ্য সাজা, ইহা তুমি আমি স্বার্থসাধনায় বা বন্ধুতায় মানিয়া লইলেও কালাত্মা ভগবান কখনও মানিবেন না; তিনি সমদৃষ্টি, 'এতেষাং লোকানামসম্ভেদায়' তিনি সেতু তিনি বিধৃতি, এই বিরাট বিশ্বসংসার তিনি ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার কাছে কি ফাঁকী চলে? শাস্ত্রের সহজ ব্যাখ্যা ছাড়িয়া মানব আত্মতৃপ্তির জন্য কূট ব্যাখ্যার অবতারণা করে, আপনাকে প্রতারিত করিয়া মনে করে ভগবদ্-বিধানকে অতিক্রম করিলাম। কিন্তু যাহা হইবার নয় তাহা কখনও হয় না—ভগবদ্-বিধানের ব্যতিক্রম ঘটে না; ফলে দাঁড়ায় এই যে, যিনি চির দক্ষিণ-মুখ, একদিন বাধ্য হইয়া তাঁহারই রুদ্রমুখ দেখিতে হয়। কল্যাণবিধাতা আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যই একদিন 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' হইয়া দেখা দেন—উৎপথপ্রস্থিতকে কঠোর শাসনে সুপথে প্রতিষ্ঠিত করেন—শাস্ত্রের কোন মনগড়া ব্যাখ্যা আমাদের সে দুর্দ্দিনে বিন্দুমাত্রও উপকারে আসে না। এমন দুর্দ্দিন আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক-বারই আসিয়াছে। সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়কেও আজ ধীরে ধীরে সেই পথে অগ্রসর দেখিয়া আমরা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি।

আপনাকে ছোট ভাবা খারাপ। নিজেকে হীন বা পতিত মনে করিতে নাই—'আত্মানং নাবমন্যেত।' কিন্তু

তাই বলিয়া আত্মোন্নতির ক্লেশকর সাধন-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া সহজের উপাসনা করা উচিত নয়। উহা মানুষকে আরও দুর্গতিগ্রস্ত করে। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন ও বৈশ্যাচার-প্রতিপালনই সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায়কে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে বৈশ্যত্বে উন্নীত করিতে পারে—কেবল মাত্র লোক-দেখানো উপনয়ন-অনুষ্ঠানের দ্বারা উহা কদাপি সুসাধ্য নহে। বিশেষতঃ অধুনা বঙ্গীয় সমাজে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই উপনয়ন-গ্রহণ একটি সংক্রামক ব্যাধির মত এমনই ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে, উহাতে আর কোনই গুরুত্ব নাই—উহা এখন শক্তিহীনের গতানুগতিক লঘুতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই মাহেন্দ্র-ক্ষণে সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায় যদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন ও বৈশ্যাচার প্রতিপালনপূর্ব্বক আপনাদের বৈশ্যত্বের নিদর্শনস্বরূপ উপবীত গ্রহণ করেন তবে দেশমধ্যে তাঁহারা সম্মানিত হইবেন কেবল নহে, গতানুগতিকতার এই অন্ধ অনুসরণে উন্মত্ত শক্তিহীন দেশ-বাসীর সম্মুখে শক্তিমানের অবলম্বিত মহান আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া ধন্য হইবেন। বৈশ্যের ধর্ম্ম কি ?

"বৈশ্যস্ত চ প্রবক্ষ্যামি যো ধর্ম্মো বেদসম্মতঃ।
দানমধ্যয়নং শৌচং যজ্ঞশ্চ ধনসঞ্চয়ঃ।
পালয়েচ্চ পশূন্ বৈশ্যঃ পিতৃবদ্ধর্ম্মমর্জ্জয়ন্॥"

ইতি পাদ্মে

দান, বেদাধ্যয়ন শুচিতা, যজ্ঞ, ধনসঞ্চয় ও পশুপালনই বৈশ্যদিগের বেদবিহিত ধর্ম্ম। সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায় বহুল-ভাবে এই বৈশ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালনে উদ্যুক্ত হউন। ইহাতেই তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হইবে।

দ্বিজাতির অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অব্যভিচরিত ধর্ম্ম হইতেছে স্বাধ্যায় পাঠ অর্থাৎ নিত্য বেদাধ্যয়ন। শ্রৌত বিধি হইতেছে 'স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ'। এই বেদাধ্যয়নের জন্যই গুরুগৃহ-গমন ও গুরুগৃহ-বাস; উপনয়ন হইতেছে এই গুরুগৃহবাসের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান। উপনয়ন শব্দের অর্থই 'উপ' সমীপে 'নয়ন' লইয়া যাওয়া অর্থাৎ যে অনুষ্ঠানের দ্বারা বালক বেদাধ্যয়নের জন্য আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হয় উহাই উপনয়ন। 'অধ্যয়নার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নম্'। স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে—"গৃহ্যোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ। বালো বেদায় তদ্‌যোগাৎ তস্যোপনয়নং বিদুঃ।" বালকের পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ যে গৃহ্যোক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা বেদাধ্যয়নের জন্য উহাকে গুরুর সমীপে লইয়া যান 'সমীপে লইয়া যাওয়া' এই অর্থের যোগ হেতু উক্ত অনুষ্ঠানের নাম উপনয়ন। শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়ীত" আচার্য্য অষ্টবর্ষ ব্রাহ্মণ বালককে উপনীত করিয়া বেদাধ্যাপন করাইবেন। মোটের উপর, শ্রুতি স্মৃতি ও সদাচার ধর্ম্মের এই বিবিধ প্রমাণ হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বেদাধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন। অধুনা বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত এই উপনয়ন একান্তই অর্থহীন ও উপহাস্য হইয়া পড়িয়াছে, তা' সে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যনির্ব্বিশেষে ত্রিবর্ণেরই। যাঁহারা পিতৃপিতামহদিগের নিকট হইতে আজন্মপ্রাপ্ত আচারকে বহন করিয়া চলিয়াছেন তবু তাঁহারা কথঞ্চিত সমর্থনীয়, কারণ অভ্যাসের নেশা সব চেয়ে বড় নেশা, ইহারা সেই নেশায় মশগুল হইয়া আছেন, তাই ইহার মন্দ দিকটা, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না; কিন্তু যাঁহারা ইহাকে নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কি উচিত নয় এমন সুন্দর আচারটির অধুনাপ্রচলিত প্রাণহীন রূপের পরিবর্ত্তে ইহার প্রাণবান প্রাচীন রূপটিকে উদ্বুদ্ধ করা ?

তাছাড়া আর একটি কথাও আছে, উপনয়ন হইতেছে একটি সংস্কার কর্ম্ম এবং ইহার মূলতত্ত্ব হইতেছে—"দোষা-পনয়ো গুণাধানো বা"; যে ক্রিয়া সাধারণতঃ কাহারও দোষ দূর করিয়া উহাতে গুণের উৎপাদন করে তাহারই নাম সংস্কার। উপনয়ন দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম অষ্টম সংস্কার ও কৈশোর-সংস্কার; এই কৈশোর-সংস্কারের পরবর্ত্তী সংস্কারটি হইতেছে যৌবন-সংস্কার বা উদ্বাহ-সংস্কার। এই যৌবন সংস্কার যাঁহাদের হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের পুনরায় কৈশোর-সংস্কারের অনুষ্ঠান শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়-বিরুদ্ধ। যাঁহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিল—উদরপূর্ণ তিনি কি আবার নূতন করিয়া সুক্তনি দিয়া আরম্ভ করিবেন? লোকাচারে ইহা এতই বিরুদ্ধ যে বাঙ্গলা ভাষায় "কেঁচেগণ্ডুষ" কথাটি একটি উপহাস-বাক্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রেও

পতিতসাবিত্রীক—ব্রাত্যদিগের প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপনয়নের বিধান থাকিলেও, একবার যাঁহার যৌবন-সংস্কার হইয়া গিয়াছে তিনিও যে ইচ্ছা করিলে পুনরায় উপনীত হইতে পারেন, ইহার অনুকূলে কোনই বিধান পাওয়া যায় না। অধিকন্তু উপনয়ন-সংস্কারের বৈদিক মন্ত্রগুলি পড়িলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কল্যাণলিপ্সু মানবক জ্ঞানলাভের জন্য বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিতেছেন। একটি বৈদিক মন্ত্রে উপনয়নার্থী বালক দ্বারা স্পষ্টই বলান হইয়াছে যে, "ব্রহ্মচর্য্যমা গামুপ মা নয়স্ব" আমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি হে গুরুদেব, আপনি আমাকে উপনীত করুন। এরূপ ক্ষেত্রে যিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন সেই গার্হস্থ্যাশ্রমীর পুনর্ব্বার "আমি ব্রহ্মচারী হইয়াছি" বৈদিক বাক্যে এই মিথ্যা প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে যে প্রত্যুত ধর্ম্মহানিই করিয়া থাকে, ইহার জন্য কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্রের দরকার নাই—সহৃদয় ব্যক্তিরা ইহা স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন।

এইরূপে শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়তঃ স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সুবর্ণবণিক্‌সম্প্রদায়ের অন্ধভাবে এই উপনয়ন-সংস্কারের অনুষ্ঠান একান্তই অসঙ্গত।

পঞ্চপুষ্প

সমুদ্রবক্ষে সংবাদপত্র

বিনা তারের যন্ত্রে যেমন গান শুনা যায়, তেমনি বিনা তারের যন্ত্রে ছবি আঁকাইয়া লওয়া যায়। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যেসকল যাত্রী-জাহাজ যাতায়াত করে সেই জাহাজে দৈনিক সংবাদ যাত্রীগণকে জানাইবার জন্য এক সংবাদ পত্র জাহাজেই ছাপা হয়। পৃথিবীর বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ সকল উহাতে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ সকল বিনাতারের যন্ত্রে জানা যায়। আজ কাল জাহাজে সংবাদ পত্রে সংবাদ ছাপা ব্যতীত ছবি, প্রতিকৃতি প্রভৃতি ও বিনাতারের যন্ত্রে আঁকা হয় বলিয়া তাহাও সংবাদ পত্রে ছাপা হইতেছে।

সঞ্জীবনী

ঐতিহাসিক দ্রব্য আবিষ্কার

নোয়াখালি জিলার ছাগলনাইয়া থানার অধীন সিলুয়া নামক গ্রামে "সিলুয়া দীঘি" নামক একটি পুরাতন দীঘির তীরে তিন খণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। এগুলি একটী মূর্ত্তির ভগ্ন অংশ বিশেষ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ফেনীর মহকুমা-হাকিম মিঃ মুখার্জ্জি প্রস্তরগুলির ফটো তুলিয়াছেন; উহাদের গাত্রে খোদিত লিপি আছে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া উক্ত স্থলে যাইয়া ঐ লিপির পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। তিনি কিয়দংশ পড়িতে পারিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় লিখিত এবং সম্ভবতঃ এই বস্তু অশোকের সময়ের। প্রকাশ, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে উক্ত ফটো পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিক্ষাসমাচার

বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলার দান

পরলোকগত বাবু রাধিকামোহন রায়ের পত্নী শ্রীযুক্তা শৈলসুতা দেবী সারে তিন টাকা সুদের দেড় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা এই মহীয়সী মহিলার দান গ্রহণ করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে কয়েকটি বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে; যাহারা দেশে কোন শ্রমশিল্প বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া তদ্ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভার্থ বিদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইবে তাদৃশ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে এই বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

শিক্ষাসমাচার

অদৃশ্য দর্শন

বিনাতারের যন্ত্রে যেমন বক্তৃতা সঙ্গীত প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত করা যায় এবং যাহাদের উহা শুনিবার যন্ত্র আছে তাহারা সেই সকল শুনিতে পারে, তেমনি ইংলণ্ডের ব্রডকাষ্টিং কোম্পানি নানাপ্রকার চিত্র, দৈনিক ঘটনার ফটোগ্রাফ আদি আগামী ফেব্রুয়ারী মাস হইতে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিবেন। যাহাদের যন্ত্র থাকিবে তাহারা তাহা দেখিতে পাইবে। ইতিমধ্যেই ইয়োরোপের সাতটি স্থান হইতে উক্তরূপ চিত্র চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করা হইতেছে। সম্ভবতঃ এক এক স্থান হইতে চিত্র প্রেরণ ও অপর স্থান হইতে কথা, এই দুই সমন্বয় করিয়া দেওয়াও হইবে।

সঞ্জীবনী

কন্যা-মহাবিদ্যালয়

জলন্ধরের কন্যা-মহাবিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষার এমনই একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হইয়াছে যে, ইহা প্রত্যেক পরিদর্শককেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পাঞ্জাবের একজন ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর বলিয়াছেন, এই বিদ্যালয় উক্ত প্রদেশের এক গৌরব-সামগ্রী, ইহা সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতরে জলন্ধরকে প্রসিদ্ধি-মণ্ডিত করিয়াছে। এখানে কেবল যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্রীরা আসে তাহা নহে, পরন্তু ফিজি, আফ্রিকা, তুর্কিস্থান প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশ হইতে শিক্ষার্থিনীরা উপস্থিত হন। এখানে আর্য্যভাষার সাহায্যে মেয়েদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে অনেক শিক্ষয়িত্রী তৈরী হইয়াছেন, এইভাবে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এতদিন যে একটা অভাব ছিল তাহা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে।

শিক্ষাসমাচার

কো-অপারেটিভ সোসাইটি

গত ১৯২৭ সনে বাংলায় মোট তিন হাজার সংখ্যক নূতন সমবায়-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত মোট সংখ্যা আঠার হাজার। মহাজনদের উচ্চ সুদের তাড়নায় কত পরিবার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা হেতু দেশবাসী একটু নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইবে। উচ্চ সুদের নিষ্পেষণে তাহাদিগকে আর ঘর-বাড়ী বিক্রয় করিতে হইবে না। এই সদনুষ্ঠান হেতু দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে। ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি ও মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। লোকজন সাধারণ বিবাদ বিসম্বাদ আদালতের সাহায্য না লইয়াই সালিসীর সাহায্যে মীমাংসা করিতে শিখিয়াছে। আরও একটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ আছে, তাহা এই যে, জনসাধারণ অনেকে মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতেছে। গ্রামের সমবায়-সমিতির সভ্যগণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অশিক্ষিত লোকজনও বুঝিয়াছে যে লেখাপড়া না জানিলে কোনও প্রকার উন্নতি-সম্ভাবনা কম। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি নিকেতন কর্ত্তৃক পরিচালিত 'গ্রাম্য সংস্কার বিভাগ' গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিতেছেন। ঐ সমস্ত সমিতি গ্রামে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত অর্থ সংযোগ থাকায় সমিতিগুলির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই সুযোগে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও উন্নতিলাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। কৃষকগণ অর্থাভাবে তাহাদের কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিত না। এখন নামমাত্র সুদে সমিতি হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া ইচ্ছানুরূপ কৃষি-বিস্তার করিতে পারিবে। মোটের উপর, এই সমিতির সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইবে দেশের অবস্থা ততই ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতায় ভেজাল খাদ্য

আমরা অনেকবার কলিকাতায় খাদ্যে ভেজাল ও তাহা অস্বাস্থ্যকররূপে ধূলার মধ্যে রাখা সম্বন্ধে লিখিয়াছি। কলিকাতা কর্পোরেশন ইহা দূর করা সম্বন্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। কলিকাতায় খাদ্যের দোকান দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২৬ সালে কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ ৪৭২৯ টি খাদ্য পরীক্ষা করেন তাহার মধ্যে ১২১৫ টা খাদ্যই ভেজাল প্রমাণিত হয়।

অর্থাৎ শতকরা ২৩.৭টি খাদ্য ভেজাল। ১৯২৫ সালে শতকরা ১৯.৭টি খাদ্য ভেজাল পাওয়া গিয়াছিল। ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ের জন্য ১৬৯৮ জন ব্যবসায়ীর ২৩৩২২৷৷• টাকা জরিমানা হয়।

১০০৩ জন দুগ্ধ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ৩৪৯ জনের দুগ্ধে ভেজাল পাওয়া যায় অর্থাৎ শতকরা ২৯.১জনের দুগ্ধে ভেজাল পাওয়া গিয়াছিল। ভেজালের তালিকা এইরূপ ;...

		১৯২৬ সালে	১৯২৫ সালে
ঘি	শতকরা	৮১·১	১৬·৪
মিষ্টান্ন	,,	২৩.৬	২১·৪
সরিষার তৈল	,,	৩৫·৬	৯·৬

দুগ্ধ, ছানা ও দধিতে শতকরা ৩৩এরও অধিক ভেজাল পাওয়া যায়। রোগীর খাদ্য সাগু, বার্লীতেও বহু ভেজাল পাওয়া গিয়াছে।

ইহা হইতেই দেখা যায় যে কলিকাতার ভেজাল খাদ্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কর্পোরেশন এই ভেজালি খাদ্য দূর করিবার জন্য যদি চেষ্টা করেন তবে সহর হইতে সংক্রামক পীড়া ও নানাপ্রকার পেটের পীড়া দূর হইবার উপায় হয়।

গোলআলুর প্রদীপ

বসুবিজ্ঞানমন্দিরে অধ্যাপক মোলিশের বক্তৃতা

ভিয়েনাবাসী অধ্যাপক-মোলিশ জীবদেহ প্রদীপরূপে ব্যবহার করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এ জীবন্ত প্রদীপ অতি মৃদু স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করে। তিনি তাঁহার আবিষ্কারসমূহ প্রদর্শিত করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, শুষ্কপত্র, কাষ্ঠ এবং মৎস্যও অনেক সময় আলো দেয়। তাহাদের শরীর হইতে একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া বন কিম্বা সমুদ্রগর্ভ গোধূলির ম্লান আলোয় বিভূষিত করে। এই আলোকে সহজেই পুস্তকাদি পাঠ করা চলে। যখন এই জীবকোষের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন আলোক সংপৃক্ত খাদ্যের দ্বারা ঐ আলো নিয়মিত করা সম্ভব। অধ্যাপক দেখাইয়াছেন যে, আলু, ভাত ও ডিমের প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অন্ধকারে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিয়া স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল এবং অধ্যাপক মহাশয় ঐ খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। ঐ খাদ্য গলদেশের মধ্য দিয়া যাইবার সময় উহার আলো দেখা যাইতে পারে কিন্তু পাকস্থলীতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অম্ল-নির্গত রসে ঐ আলো নিভিয়া যায়। অধিকন্তু আলো অক্সিজেন বাষ্পের সাহায্য ব্যতীত জ্বলে না। একটি অন্ধকার নলের মধ্যে মর্দ্দিত পত্র দিয়া পূর্ণ করা হইল; কিন্তু যখনই একটা দিয়াশলাই জ্বালিয়া দেওয়া হইল, অমনি নলটি আলোক পূর্ণ হইয়া গেল। পরিশেষে অধ্যাপক বলেন, সমস্ত আলোই সূর্য্যের দান। আলো হইতেই আলোর উৎপত্তি—অন্ধকার হইতে নহে। যখনই শ্যামল তৃণের অন্তরালে জোনাকী পোকা মিট মিট করে, কিম্বা জাহাজের চাকার আঘাতে নৈশান্ধকারে সামুদ্রিক মৎস্য জলভাগ আলোকিত করিয়া ভাসিয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে ঐ আলো সূর্য্যকিরণের রূপান্তর মাত্র। জাবকোষের জীবনী-শক্তি সূর্য্যালোক গ্রহণ করিয়া নিজের দেহের ভাণ্ডারে তাহা সঞ্চিত করিয়াছে এবং সেই আলোকই নৈশান্ধকারে তাহাদিগকে আলো প্রদান করিয়া জীবন ধারণে সহায়তা করে।

ইংলিশম্যান

বৃটিশ ছায়াচিত্র বিক্রয়ের উপায়

পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেনে ছায়াচিত্র আদৌ প্রস্তুত হইত না। সিনেমেটোগ্রাফ ফিল্ম একৃট্ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর এক বৎসরের মধ্যে মাত্র ৩টি ফিল্ম প্রস্তুত হয়। ১৯২৬ সনে ২৬টি ফিল্ম প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু ১৯২৮ সালে ৭৯টি ছায়াচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই ফিল্ম বিক্রয় করা হইবে তাহাই সমস্যার বিষয়। যেহেতু বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্ম বাজারে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানী ভীষণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বৃটিশ ফিল্মের দাম প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। এখন এই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে যদি টিকিয়া থাকিতে হয়, তবে বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী-গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কম সংখ্যায় উৎকৃষ্টতর ছায়াচিত্র

প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে বাজারে ঐ ফিল্মের চাহিদা বাড়ে।

ম্যানচেষ্টারে বস্ত্র-শিল্প-যন্ত্র প্রদর্শনী

ম্যানচেষ্টার বহু কাল হইতে বস্ত্র-শিল্পের প্রধান স্থান। কিছুদিন পূর্ব্বে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রসমূহের এক প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। ঐ প্রদর্শনীতে বস্ত্রশিল্পের কাজে ব্যবহৃত সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাবলী চলন্ত অবস্থায় প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বস্ত্রশিল্পে অভিজ্ঞ বহু দর্শক উপস্থিত হইয়া যন্ত্রাবলী পরীক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি শিল্পের যন্ত্রাবলী প্রদর্শিত হওয়ায় সকলেই যন্ত্রসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে ও কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হীরকখনি

দক্ষিণ আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর মোহনার অদূরবর্ত্তী ভূভাগে বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হীরক-খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার ম্যারেন্‌স্কী নামক একজন ভূতত্ত্ববিদ্ ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে উপনীত হন; এবং বাতাসে বালুকাবরণ উন্মোচিত হওয়ায় অত্যুজ্জ্বল সুবৃহৎ হীরকখণ্ডসমূহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি ঐ আবিষ্কারের বিষয় কেপ টাউনের গভর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিবার পর আকাশ যানে কয়েকজন সৈন্য এবং গভর্ণর ঐস্থানে উপনীত হইয়া অপর্য্যাপ্ত হীরক প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি ঐ হীরকসমূহ নিউইয়র্ক বা লণ্ডনের বাজারে উপস্থাপিত করা হয়, তবে পূর্ব্বের হীরক কাচের মত সস্তা হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে অন্য কাহাকেও ঐস্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। কোন অপরিচিত লোক নিকটে গেলে তাহাকে গুলি করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রতি মাসে এই খনি হইতে ৪০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের হীরক উত্তোলিত হইতেছে। ডাক্তার ম্যারেন্সক ও তাঁহার পুঁজিপতিগণ সামান্য পরিমাণ স্থানের ইজারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

আকাশ পথে ১৪০০০ রমণী

বিগত এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে আকাশ পথে ১৪০০০ রমণী পরিভ্রমণ করিয়াছে কিন্তু পুরুষের সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক কম। লণ্ডন ও প্যারিশের মধ্যে স্থায়ীভাবে আকাশ পথে গমনাগমনের যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে এখনও অনেক রমণী প্রতি সপ্তাহে আকাশপথে লণ্ডন হইতে জিনিষপত্র কিনিবার জন্য প্যারিশে গমন করিয়া থাকে।

চলচ্চিত্রের উদ্যানসহর

হার্টফোর্ডসায়ারের বারহাম উড্ নামক গ্রাম বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানীর কল্যাণে ক্রমশঃ নগরে পরিণত হইতে চলিল। আমেরিকার হলিউড যেমন চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাসস্থান রূপে পৃথিবীময় প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে বারহাম উড্ও বৃটিশ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বাসস্থানে পরিণত হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইবে। এখনই অনেক অভিনেত্রী চিত্রশালার সন্নিকটে সুসজ্জিত গৃহে আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে। যে গ্রাম একদিন শান্তির সুকোমল ক্রোড়ে কোলাহলের বাহিরে সুখে নিদ্রিত ছিল, আজ তাহা ধীরে ধীরে অভিনেতা অভিনেত্রীর কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। হয়তঃ অজ্ঞাত পরিব্রাজকের চোখে এই গ্রাম কাল্পনিক পরীরাজ্যের আভাস প্রদান করিবে।

মৃতের জীবন-দান

সম্প্রতি রুশিয়ার মস্কো সহরে মৃতের জীবন-দানের এক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন রুশীয় ও জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক মিলিয়া এই পরীক্ষা করিয়াছেন, মৃত্যুর ২৯ ঘণ্টা পরে মৃতদেহে ঔষধ প্রবিষ্ট করান হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে শরীর একটু উষ্ণ হইয়া উঠে, গলায় একটু ঘড়্ ঘড়্ শব্দ

শোনা যায় এবং চোখের পাতা একটু নড়িয়া উঠে; তৎপরে পুনরায় সব নিস্তব্ধ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ প্যারিশ সহরে আবার এই পরীক্ষা প্রদর্শনের জন্য আহুত হইয়াছেন। ফর্ওয়ার্ড

বাঙ্গালী যুবকগণের জীবিকা-সংস্থানের পথ

ওভারসিয়ারী শিক্ষা

সাব ওভাসিয়ারীর উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ঢাকাতে আশানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে আর দুই বৎসর ওভারসিয়ারীও পড়িতে পারে। বেতন মাসিক ৫৲ টাকা। কতকগুলি বৃত্তিও দেওয়া হয়। পরীক্ষায় পাশ করিয়া তাহারা ওভারসিয়ার পরীক্ষা বোর্ড হইতে ওভারসিয়ারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। তাহারা জেলাবোর্ডে, মিউনিসিপালিটী, জমিদারী সেরেস্তা এবং অন্যান্য স্থানে ৫০৲ টাকা ও তাহার অধিক বেতনে চাকুরী পাইতে পারে।

মাইনিং শিক্ষা

রাণীগঞ্জ এবং সীতারামপুরে দুইটী মাইনিং স্কুল আছে। শিক্ষাকাল তিন বৎসর। ছাত্রগণকে খনিবিদ্যা, গণিত প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং খনি সম্পর্কীয় মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সার্ভেইং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম নাম রেজেষ্টীর সময় মাইনিং লেকচারারকে ১ম এবং ২য় বৎসরের জন্য ৫৲টাকা ফি দিতে হয়। তৃতীয় বৎসরের ফি ১০৲ টাকা। ধানবাদ মাইনিং স্কুলে ৫০৲ টাকার একটী বৃত্তি আছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ খনিতে মোটা মাহিনার চাকরী পায়।

ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট

বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউটে এককালে ২৪ জন শিক্ষানবীশ লওয়া হয়। এই ২৪ জনের মধ্যে বিহার উড়িষ্যা হইতে ৮ জন এবং বাঙ্গালা হইতে ১৬ জন ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষানবিশীর কাল ২ বৎসর—এক বৎসর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে এবং আর এক বৎসর ডিমনষ্ট্রেশন ট্যানারীতে ব্যয়িত হয়। তাহাদিগকে ট্যানিংয়ের রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্লেষণ এবং চামড়া প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। বঙ্গালায় ১৬ জন শিক্ষানবীশ ছাত্রের মধ্যে ২ জন প্রতি মাসে ৩০৲ টাকা করিয়া এবং ২ জন ২০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পায়। কেমিষ্ট্রী সহ যাহারা বি এস্ সি পাশ করিয়াছে তাহারাই শুধু প্রথমোক্ত বৃত্তি পাইবার অধিকারী। দ্বিতীয় বৃত্তির জন্য আণ্ডার গ্রাজুয়েট, ম্যাট্রিকুলেট এবং ননম্যাট্রিকুলেটদের নিকট হইতে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণ ১৫০৲ টাকা বা তাহার বেশী বেতনে চাকরী পাইতে পারে, অথবা নিজেরাও ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারে।

রেশম শিল্প

বহরমপুরে একটী সিল্ক উইভিং এবং ডাইং ইন্‌ষ্টিটিউট আছে। এই বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়:—(১) উন্নত বিভাগ এবং (২) কারিগরী বিভাগ। প্রথমোক্ত ছাত্রগণের শিক্ষা কাল দুই বৎসর; ১৬ হইতে ২৫ বৎসরের যুবকগণ—যাহারা স্কুল ফাইনেল, ম্যাট্রিকুলেশন কিম্বা সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ভর্ত্তিকালে তাহাদের দাবীই অগ্রগণ্য। ১ম এবং ২য় বাৎসরিক শ্রেণীতে ১০ টাকা মূল্যের ১০ টী বৃত্তি দিবার দিবার ব্যবস্থা আছে। মুসলমানদের জন্য ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টী এবং ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে ৪টী বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদিগকে কোন বেতন দিতে হয়না। কারিগরী বিভাগে বয়স কিম্বা গুণ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। এই বিভাগে অনেকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে ছাত্রদিগকে রেশম বয়ন, রঞ্জন এবং ছাপের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবারও ভালরূপ ব্যবস্থা আছে। যাহারা এপ্রেন্টিস ট্রেণিংয়ের বোর্ড অব কনট্রোলের এডমিশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে শুধু তাহারাই রেলওয়ে ওয়ার্কসপে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষানবীশিতে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই পরীক্ষা বোর্ড অব কন্ট্রোলের অধীনে বৎসরে দুইবার অর্থাৎ জানুয়ারী মাসে এবং জুন মাসে হয়। পরীক্ষার্থীদিগের বয়স ১৯ বৎসরের কম হওয়া চাই এবং তাহাদিগকে পরীক্ষার ফি বাবৎ ১২৲ টাকা দিতে হইবে। এই পরীক্ষার দুইটি বিভাগ আছে—(১) বাধ্যতামূলক বিভাগ—এখানে ইংরাজী, গণিত এবং ফ্রী

হাও ড্রইং পরীক্ষা দিতে হয়। (২) স্বেচ্ছামূলক বিভাগ; এখানে মেকানিক্স, ত্রিকোণমিতি, প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা, প্রাথমিক রসায়ন শাস্ত্র এবং ব্যবহারিক জ্যামিতির চিত্র অঙ্কন এই ৫টি বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে দুইটি গ্রহণ করিতে হয়।

এই সমস্ত ওয়ার্কসপে কাজ শিখিতে ৫ বৎসর সময় লাগে। এই সময় মধ্যে শিক্ষার্থীকে নিজ খরচ বাবৎ কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যে সমস্ত শিক্ষানবীশ সন্তোষজনক কাজ দেখাইতে পারে তাহাদিগকে ২ বৎসরের জন্য ১৫০৲ টাকা বেতনে ইমপ্রুভাররূপে ওয়ার্কসপের কাজেই রাখা হয়। এই কাজ হইতে তাহারা ক্রমে চার্জ্জহ্যাণ্ডস্, এসিষ্ট্যাণ্ট ফোরম্যান এবং ফোরম্যানের পদে উন্নীত হয়।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

ইঞ্জিনীয়ারের ব্যবসার পক্ষে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন সেই সব বিষয়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বেশ শৃঙ্খলামত শিক্ষা দেওয়া হয়। সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রগণকে সাধারণতঃ বি ই উপাধির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়।

নীহার

প্রেরিত পত্র*

(১)

সম্পাদক সুবর্ণবণিক্ সমাচার—

মহাশয়,

উপনয়ন সংস্কার লইয়া সুবর্ণবণিক্ সমাজে আজকাল আন্দোলন চলিতেছে। স্থানে স্থানে সভা হইতেছে ও স্বপক্ষে অনেক বক্তৃতা হইতেছে, শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখান হইতেছে। এই যুক্তিগুলির সারাংশ এই যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সুবর্ণবণিক্ জাতির জন্মগত অধিকার। জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিলে ধর্ম্মহানি হয়, যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলে ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধন হইবে। আচার ভ্রষ্ট হওয়াতেই সুবর্ণবণিক্গণ বৃত্তিভ্রষ্ট হইয়াছেন, বৈশ্যাচার অবলম্বনেই বৈশ্যবৃত্তি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু বর্ত্তমান কালধর্ম্মে আমাদিগকে কোন্‌দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা সম্যক্ বিবেচিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। আমি সেই জন্য ঐসম্বন্ধে দুই একটি কথা আমার স্বজাতি ভ্রাতাদের বিবেচনার্থ এই পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইলাম, আশাকরি আপনি ইহাকে আপনার পত্রিকায় স্থান দান করিবেন।

প্রথমেই দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাব অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির উন্নতিকল্পে প্রাচীন কালে আর্য্য ঋষিরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, এক শ্রেণীর লোকে শাস্ত্রালোচনা যজন-যাজনাদি করিবে, এক শ্রেণীর লোক প্রজারক্ষাদি করিবে, একশ্রেণীর লোক কৃষিবাণিজ্যাদি করিবে ও এক-শ্রেণীর লোক অপর তিন শ্রেণীর সেবা করিবে। সে ব্যবস্থা এখন আর নাই। এখন একটি ছাড়া আর সকল বৃত্তি শ্রেণীগত নহে। দেশে অনেক Bank প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, লোকের পুরাতন মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব এখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অংশভূত স্বতন্ত্র বৈশ্য সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নাই।

দ্বিতীয়তঃ, জন্মগত অধিকার ত্যাগ করিলে ধর্ম্মহানি হয়, এই যুক্তিকে আধুনিক জ্ঞান গুরুত্বহীন করিয়াছে। এখন অন্ধবিশ্বাসের দিন গিয়াছে, লোকে বুঝিয়াছে যে সামাজিক আচার ধর্ম্মের সার নহে ও ইহার একটি পালন না করিলে ধর্ম্মহানি বা পাপ হয় না।

* মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নহেন।

তৃতীয়তঃ, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে ঐহিক শ্রেয়ঃসাধন হইবে এই যুক্তিশাস্ত্রসম্মত হইলেও অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া আজকাল গৃহীত হইবে না।

চতুর্থতঃ, সুবর্ণবণিকেরা প্রণববিহীন গুরুমন্ত্রের উপাসক। তাঁহাদের পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধন ইহাতেই হইতেছে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। এই মন্ত্র ছাড়িয়া উপনয়নান্তর বৈদিক মন্ত্র জপ করিতে অধিকাংশ লোক স্বীকৃত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। সংসারী জীবের উভয়বিধ মন্ত্র জপের অবসরই বা কোথায়? সকলে ইহাও বোঝেন যে পারলৌকিক মঙ্গল প্রধানতঃ ধর্ম্মজীবন ও সৎ-কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, তাহার জন্য উপবীত আবশ্যক করে না, এবং উপবীত ধারণ করিলেই জীব সদ্‌গুণান্বিত হয় না।

পঞ্চমতঃ, শাস্ত্রে আচারের মহিমা যতই কেন কীর্ত্তিত হইয়া থাকুক না, বর্ত্তমান সময়ে লোকে বিনা বিচারে শাস্ত্রবচন শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করিবে না। আচার ভ্রষ্ট হওয়াতেই সুবর্ণবণিক্‌গণ বৃত্তিভ্রষ্ট হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইলে ইতিহাসের সাক্ষ্য অমান্য করিতে হয়। ইহা কিন্তু অসম্ভব। সুবর্ণবণিক্‌গণ উপবীত ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন বহুদিন, কিন্তু তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা সপ্তগ্রামে বৈশ্যোচিত গুণের পরিচয় দিতেছিলেন। বেশী দিনের কথা নয় স্বর্গীয় মতিলাল শীল, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি উপযুক্ত বৈশ্যসন্তানগণ কুলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময়েও অনেকে দিতেছেন। আজ যে আমরা সাধারণতঃ অধঃপতিত হইয়াছি, তাহা কতকটা নিজের দোষে, কতকটা অন্য কারণে, উপবীত নাই বলিয়া নহে।

বৈশ্যাচার অবলম্বনে বৈশ্যবৃত্তি ফিরিয়া আসিবে, এ যুক্তিরও যাথার্থ্য স্বীকার করা যায় না। আচার সামাজিক অনুষ্ঠান, বৃত্তি মানসিক প্রক্রিয়া। স্মৃতিশাস্ত্রে সকল দ্বিজের এক আচার কিন্তু বিভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। সামাজিক ক্রিয়াগুলি যথাযথ করিলেই বৃত্তি সাফল্যমণ্ডিত হয় না, না করিলেও বৃত্তির অনুশীলনে দৈন্য আসে না। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে।

আমি উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে সুবর্ণবণিক্‌গণ ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণতঃ সরল বিশ্বাসী হইলেও শুধু পুরাতন শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের সাহায্যে লুপ্ত আচার পুনরনুষ্ঠানের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মধ্যে বিস্তৃতভাবে জাগাইয়া তুলিবার দিন আর নাই। বহুদিন যাবৎ লুপ্ত আচার পুনরাচরণ করিতে স্বভাবতঃ একটা সঙ্কোচ আসে; অতএব তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অনুযায়ী বিচার করিতে অনেকে চাহিবে। যদি দেখাইতে পারা যাইত যে, উপবীত ধারণ করিলে সুবর্ণবণিক্‌গণের সামাজিক উন্নতি হইবে অর্থাৎ তাহারা আর পতিত থাকিবে না, জলচল হইবে ও উপবীতীদের ন্যায় সম্মান পাইবে, তাহা হইলেও বা হয়ত স্বার্থমোহে অনেকে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত, কিন্তু সেদিকেও অন্তরায় অনেক। আমি যতদূর দেখিতে পাই, সে অন্তরায় গুলি এই :—(১) অপর সমাজের জনসাধারণ, যাহাদের চক্ষে আমরা পতিত, আমাদের উপবীতে অধিকার স্বীকার করে না। তাহারা সুবর্ণবণিক্‌কে নীচ শূদ্র বলিয়াই জানে ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ এই শ্রেণীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।

(২) মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, যাহাকে এযাবৎ নীচু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে তাহাকে উঁচু বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না।

(৩) অপর সমাজের পুরোহিতগণ আমাদের পৌরোহিত্য করিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

(৪) স্বতন্ত্র বৈশ্য-সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা এখন নাই।

(৫) সত্য কথা বলিতে গেলে মাত্র উপবীতের পূর্ব্ব সম্মান ও সমাদর নাই।

(৬) কায়স্থ ও যোগি-সমাজে যাঁহারা উপবীত লইয়াছেন, তাঁহারা তজ্জন্য বিশেষ কোন সমাদর পাইতেছেন, তাহা দেখিতেছি না।

এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, কিন্তু ইহা হইতেই মনে হয় যে উপনয়নের প্রসাদে সামাজিক হিসাবে ঈপ্সিত সুফল লাভের সম্ভাবনা অল্প।

বর্ত্তমান সময়ে যথার্থ সামাজিক উন্নতি শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে না। এখন মাপকাঠি স্বতন্ত্র। ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি আইন-কানুন লোকের পুরাতন মতিগতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। এখন জাতি-বিদ্বেষ কমিয়া যাইতেছে, আদর প্রধানতঃ গুণ, মান ও ধনের, বর্ণের নহে। ইহা সকলেই দেখিতেছেন। সকলে ইহাও বুঝিতেছেন যে এই পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইবে এবং ক্রমে ইহার প্রভাব বাড়িবে। আমি সেইজন্য আমার সুবর্ণবণিক্ ভ্রাতাগণকে বলি ঐহিক শ্রেয়ঃ সাধন করিতে হইলে বর্ত্তমান কাল ধর্ম্মের বশে চলুন, অবস্থা প্রভেদে ব্যবস্থারও প্রভেদ করুন, জীর্ণ দেওয়াল আঁকড়াইয়া থাকিবেন না। বর্ত্তমান সময়োচিত পুত্রকন্যাগণকে শিক্ষা দিন। আধুনিক জীবন-সংগ্রামে যাহাতে তাহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারে তাহা করুন, তাহাদের হৃদয় প্রশস্ত করুন, কৃষিবাণিজ্যাদিতে মনঃসংযোগ করুন, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া অপর সমাজের সহিত সদ্ভাব রাখুন, অবাস্তব ছাড়িয়া বাস্তব ধরুন,—দেখিবেন আপনাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। সুখের বিষয় কালধর্ম্মের প্রভাবে এই অবস্থা ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে, পাতিত্যনাশক বহ্নি ধূমায়মান, আপনারা ইন্ধন দিন। পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধন আপনাদের নিজের হাতেই আছে। ইতি

কলিকাতা
২৭এ শ্রাবণ ১৩৩৫ সাল

ভবদীয়
শ্রীদীননাথ দত্ত*

(২)

মাননীয় শ্রীযুক্ত "সুবর্ণবণিক্ সমাচারের সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমার সেই "বৈশ্যোপনয়ন" নামক প্রবন্ধটা লইয়া বেশ একটু নাড়াচাড়া পড়িয়াছে। ঐ প্রবন্ধে কতকগুলি সত্য কথা, অপ্রিয় হইলেও, বলিতে হইয়াছে। তাহাতে কেহ বলিলেন "বাতুল", কেহ বলিলেন "পণ্ডিতি ফলাইবার আর জায়গা পাও নাই?" আবার কেহবা "তোবা" "তোবা" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন। কেহ বা "নিবেদন" নামক কবিতায় আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম তাহার নজির দেখাইয়া আমাকে অপ্রতিভ করিবার প্রয়াস পাইলেন। আমি "নিবেদনে" বৈশ্যকে বৈশ্যোচিত কার্য্য করিতে বলিয়াছিলাম, গোলামী বৈশ্যত্ব করিতে বলি নাই। ব্যবসা-ব্যাণিজ্য দ্বারা ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। উপনয়নধারী চাকুরীজীবী বৈশ্যের দ্বারা ভারতের কি মঙ্গল সাধিত হইবে? তুমি ব্রাহ্মণই হও আর বৈশ্যই হও, ভারত "যে তিমিরে সেই তিমিরে!" সেইজন্য আমাকে আমার সম্প্রদায়ের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। গণ্ডীর বাহিরে সারা বঙ্গদেশে, তাহার বাহিরে ভারত, তাহার বাহিরে সমগ্র জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছে। বৈদিককাল হইতে জগৎ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভারতের উন্নতি নাই কেন? তাহার কারণ ভারতের হস্তপদ বর্ণ-বৈষম্যরূপ কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ,—পরাধীনতার জগদ্দল পাথর বুকে চাপান আছে। পাথর ঠেলিয়া ফেলিতে হইলে অগ্রে হস্তপদকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইবে। উঠিয়া না দাঁড়াইলে জগতের গতির সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে না। এখন আর ভারত শুধু হিন্দুর জননী নহে; ভারত এখন বহু জাতির জননী। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, পার্শি এবং অনেক "অস্পৃশ্য" জাতিরও জননী,—এই ভারতবর্ষ। সকলের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া, ঐক্য স্থাপন করিয়া লইয়া, ভারতকে এখন অগ্রসর হইতে হইবে। বৈদিক যুগের দিকে, বর্ণ-বৈষম্যের পথে, ফিরিলে চলিবে না। ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে বৈষম্য দূর করিতে হইবে। বৈষম্য দূর করিতে হইলে ভেদনীতিমূলক সংহিতার বিধানগুলির আশ্রয় লইলে চলিবে না। এক প্রবন্ধে দেখিলাম বিপিনবাবু লিখিয়াছেন "গণ্ডী ভাঙ্গিতেই হইবে"। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। আমি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছি। আদিম যুগের বৈদিকধর্ম্ম উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছিল। সংহিতার যুগে উহা সংকীর্ণ

* স্বর্গীয় দীনবাবুর পুত্রগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত—সম্পাদক।

হইয়াছে। সংকীর্ণ ধর্ম্ম লইয়া ভারতে ঐক্য স্থাপনা করা অসম্ভব। সংহিতারও যুগ এখন আর নাই। দেশ ও কালের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংহিতাগুলিকে টানিয়া বাঁকাইয়া এখন সময় উপযোগী করিয়া লইবার চেষ্টা নিষ্ফল। এই যুগে উহা অকর্ম্মণ্য। শ্রীচৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন রায় উহা অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। দুইটা উদাহরণ দিই, অত্রি সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির গুণ কর্ম্ম বর্ণিত আছে। বৈশ্যের গুণ কর্ম্ম,—যজন, দান, অধ্যয়ন, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, ও কুসিদ। ইহার সহিত পরাশর মুনি যোগ করিলেন,—লৌহ ব্যবসা এবং রত্ন ব্যবসা। হারীত মুনি বলিলেন "ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত যে বৈশ্য এতদুক্ত ধর্ম্মাচরণ করিবে, সে অন্তে স্বর্গলাভ করিবে সন্দেহ নাই।" (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১০ শ্লোক)। পরাশর সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে উক্ত হইল "আচার ভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ"। দক্ষ মুনি বলিলেন "যে দ্বিজগণ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য বর্ণের কাজে থাকে, তাহারা পাপভাগী হয়।" (দ্বিতীয় অধ্যায় ৩ শ্লোক)। অত্রিমুনি বলিলেন "যাহারা পূর্ব্বোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, নরপতি তাহাদিগকে শাস্তিদান করিয়া স্বর্গভাগী হন্।" (প্রথম অধ্যায়, ১৮ শ্লোক) ইত্যাদি। আবার বিধান দেখিতে পাই "ব্রাহ্মণ আপদ্‌কালে ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিবে; অথবা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ক্রমে সেই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা আত্মশোধন পূর্ব্বক নিজ ধর্ম্ম পথে বিচরণ করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ৩ অধ্যায় ৩৫ হইতে ৪৪ শ্লোক)। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই আপদ্ কালে অন্য বৃত্তি অবলম্বন অল্পদিনের জন্য মাত্র। বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলে স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিত। আবার বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন কালীন্ অমুক অমুক দ্রব্যের ব্যবসা করিবে না। তালিকা খুব বৃহৎ। এই যে "জাত্যনন্তরা বৃত্তিঃ।" ইহা পূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন পরাধীন ভারতবর্ষে ইহা সমস্ত জাতির মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। এখন নিজবৃত্তি পালনে প্রায় সকলেই অসমর্থ। যাহার যে রূপ অভিরুচি, বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। সংহিতার মর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্মবিধান বজায় রহিল কৈ? আর একটীর কথা বলি। সকল সংহিতায় ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন কাল ৮ হইতে ১৬ বৎসর; ক্ষত্রিয় সন্তানের ১১ হইতে ২২; এবং বৈশ্য সন্তানের ১২ হইতে ২৪ বৎসরের পর সাবিত্রী পতিত হয়, অর্থাৎ উপনয়ন হইবে না। পতিত সাবিত্রীকের বিবাহ হইবে না, কারণ সে ব্রাত্য বলিয়া তখন সমাজে স্থান পাইত না। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"উহাদিগের আর উপনয়ন দিবে না; অধ্যয়ন করাইবে না; যাজন করাইবে না; তাহাদিগের সহিত বিবাহ দিবে না; পতিত সাবিত্রীক ব্যক্তি উদ্দালক ব্রত করিবে।" (একাদশ অধ্যায়)। উদ্দালক ব্রতের বহর দেখুন।—"দুই মাস যাবক পান করিয়া, একমাস মাক্ষিক মধুপান করিয়া, আট দিন ঘৃত পান করিয়া, ছয়দিন অযাচিত আহারে, এবং তিন দিন জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিবে। ইহার নাম উদ্দালক ব্রত। কিম্বা অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃত স্নান করিবে। অথবা ব্রাত্যস্তোম যাগ করিবে।" এই ব্রত বা যাগ সমাপন করিয়া ব্রাত্য দ্বিজ উপনয়ন ধারণ করিলে তবে তাহার বিবাহ হইত। আমাদিগের পৈতার পাণ্ডারা তাহা বুঝিলেন না। তাঁহারা ধর্ম্মহীন, বিবাহিত ও বৃদ্ধের গলায় পৈতা ঝুলাইয়া দিলেন! সংহিতায় দশটি সংস্কার পর পর উক্ত হইয়াছে। প্রথম গর্ভসংস্কার—গর্ভাধান; পুংসবন; সীমান্তোন্নয়ন (২) শৈশব-সংস্কার,—জাতকর্ম্ম; নামকরণ; নিষ্ক্রামন; অন্নপ্রাশন (৩) কৈশোর সংস্কার,—চূড়াকরণ; উপনয়ন। (৪) যৌবন-সংস্কার,—বিবাহ। ইহার পর গার্হস্থ্যাশ্রম। তৎপরে বানপ্রস্থ। বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন। যৌবন-সংস্কার অর্থাৎ বিবাহের পর যদি কৈশোর-সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন সম্ভবপর হয়, তবে হয়ত কোন দিন বৃদ্ধের অন্নপ্রাশনের কথাও শুনিতে হইবে! অথচ দক্ষসংহিতা স্পষ্টই বলিতেছেন "আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান, এবং বেদাধ্যয়নাদি যাহা করিবে, তাহার ফলপ্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম এই তিন আশ্রমের যথাক্রমে কর্ত্তব্যতা আছে; বিপরীত ক্রমে কর্ত্তব্যতা নাই। যে ব্যক্তি বিপরীত

ক্রমে ঐ তিন আশ্রম করে, অর্থাৎ অগ্রে গৃহস্থধর্ম্ম করিয়া পরে ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহা হইতে আর পাপিষ্ঠ নাই।" (প্রথম অধ্যায়, ১১।১২ শ্লোক)। সেই জন্যই বলিতে-ছিলাম, সংহিতার বিধান এ যুগে অকর্ম্মণ্য। যথারীতি পালন করিলেও, পরাধীন ভারত স্বাধীন ও উন্নত হইবে না। সাম্যমার্গ অবলম্বন ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। সাম্যমার্গ অবলম্বন করিতে হইলে ভেদনীতিমূলক সংহিতা ত্যাগ করিবে হইবে। সাম্যবাদী ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে। তবে "গণ্ডী" ভাঙ্গিবে। নতুবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র; আর্য্য অনার্য্য; স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের মধ্যে চিরকালই ভেদ থাকিয়া যাইবে, এই ভারত কখনো স্বাধীন হইবে না। আমার এই বাক্য যদি বাতুলের প্রলাপবাণী হয়, তবে রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত মালব্য, সুভাষ বাবু, শ্রীযুক্ত জে, এম্, সেনগুপ্ত, মিঃ জয়াকর, স্যার তেজনারায়ণ প্রভৃতি সকলকেই পাগল বলিতে হইবে। পূর্ব্বে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলাম, চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা ফলে যদি সেই দৃষ্টি সমগ্র ভারতের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতে দোষ কি? কূপের ভেকের জগতের আলোর প্রতি চাহিতে কিছু মানা আছে কি?

ঐ প্রবন্ধে শ্রীবল্লভানন্দ আঢ্য সম্বন্ধে আমাকে যে দুই একটি অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছিল তজ্জন্য আমি দুঃখিত হইলেও, উপায় নাই। কারণ উহা ঐতিহাসিক সত্য। আমি যে কি ক্ষোভের সহিত "স্বেচ্ছায়" কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলাম, রায় বাহাদুর তাহা বুঝিলেন না। যিনি তখন বাঙ্গালার ধনকুবের ছিলেন, স্বয়ং বল্লালসেন অর্থের জন্য যাহার দ্বারস্থ হইত, তিনি রাজার ভয়ে কিরূপে তাঁহার ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন?

অর্থই শক্তির মূলাধার, এই নীতি যদি মানিতে হয়, তবে তিনি ত কম শক্তিশালী ছিলেন না? নিজ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যদি তিনি প্রাণবিসর্জ্জন দিতেন, তাহা হইলে আজ বাংলার ইতিহাসে সুবর্ণবণিকের নাম সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিত। তাঁহার কৃতকার্য্যের ফলভোগ এখন আমাদিগকে করিতে হইতেছে, এ কথা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না। পূর্ব্ব পুরুষের নিন্দা করিয়াছি বলিয়া যাঁহারা "তোবা" বলিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়াছেন, তাঁহারা না হয় আমার এই পত্র পাঠ করিবেন না। সত্যের খাতিরে আমাকে, অপ্রিয় হইলেও, ঐ প্রসঙ্গ তুলিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব পুরুষের নিন্দা হইবে বলিয়া যদি লেখনী বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মণেয় সেন যে বিনা রণে বাঙ্গালার সিংহসনটাকে বক্তিয়ার খিলিজির হস্তে অর্পণ করিয়া মন্দ কাজ করিয়াছিল, সেটা বলাও নিষিদ্ধ!

দুই একটি ঋষির সম্বন্ধে ভুল লেখা হইলে সমস্ত প্রবন্ধটা অশুদ্ধ হয় না। পাণ্ডিত্যের অভিমান আমি করি না। যেরূপ বুঝিয়াছি, লিখিয়াছি। উহা যদি কোন পণ্ডিত অপাঠ্য বোধ করেন, তবে না হয় তিনি আমার প্রবন্ধগুলা পাঠ করিবেন না।

আর একটি কথা। আঢ্য মহাশয় লিখিয়াছেন যে স্মৃতিশাস্ত্রগুলি কাহারো নিজস্ব সম্পত্তি নহে; তাহার বিধান লইবার জন্য আমরা কেন ভট্টপল্লীর পণ্ডিতদিগের নিকট যাইব? ইহা যে কতদূর হাস্যজনক কথা তাহা আমি দেখাইতেছি। বৈদিক ধর্ম্মের বিধান প্রাচীন স্মৃতি-গুলিতে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু, তাঁহারা ঐ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ করেন না। আমি এই পত্রে দেখাইয়াছি যে বৈশ্যসন্তানের উপনয়ন কাল ১২ হইতে ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে। ঐ ২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেও যদি কেহ বিবাহ করেন, তবে তাহার আর উপনয়ন হয় না। কারণ যৌবন-সংস্কারের পর আর কৈশোর-সংস্কার হয় না। ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাও দেখাইয়াছি। ২৪ বৎসর বয়সের পর বৈশ্য উদ্দালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোমযাগ করিয়া (অশ্বমেধে অবভৃত স্নানের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কারণ অশ্বমেধ এখন আর প্রচলন নাই) উপনয়ন লইয়া তবে গৃহস্থাশ্রম বা বিবাহ করিবার অধিকার পাইত। ইহার প্রমাণ দিয়াছি। যদি কেহ বলেন "আমিও প্রমাণ দিতেছি যে বিবাহের পরে, এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও উপনয়ন হয়," (বোধ করি চতুরাশ্রমের বিঘ্নজনক এমন অদ্ভুত কথা কোন পণ্ডিত বলিবেন না) তবে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য আমরা কাহার নিকট যাইব? ইহার মীমাংসা করিয়া

দিবে কে,—আঢ্য মহাশয় ? না পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ? যথাশাস্ত্র উপনয়ন ধারণ করিবার পন্থা আমাদিগকে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ যে কেন দেখাইয়া দেন নাই, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে দোষ দিয়াছিলাম। রঘুনন্দন একবার ঐ সকল প্রাচীন স্মৃতিগুলিকে নূতন করিয়া লিখিয়াছিলেন। এখন আর নূতন করা চলে না বলিয়া বোধ হয়। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আসলের কিছু থাকে না। স্মৃতিকে ঠেলিয়া রাখিয়া বৈদিক সংস্কার লওয়া চলে না। জোর করিলে নানারূপ গোলযোগ আসিবে। আর জোরই যদি করিব, তবে বাঁধন ছিঁড়িয়া অগ্রসর হইব না কেন ?

এক্ষণে সংক্ষেপে দেখাই ইহার আলোচনায় কি দাঁড়াইল।—(১) বৈদিক ধর্ম্মের বিধান প্রাচীন সংহিতাগুলিতে আছে। উহাকে স্মৃতিশাস্ত্র কহে।

(২) গোঁড়া হিন্দুর পক্ষে সংহিতার বিধানবিগর্হিত কার্য্য অশাস্ত্রীয়।

(৩) কিন্তু, দেশকালপাত্রে এ যুগে সংহিতা অকর্ম্মণ্য।

(৪) কাজেই, সংহিতা কথিত বৈদিক ধর্ম্মও এ যুগে অকর্ম্মণ্য।

পুনশ্চ,—(১) সাম্য বা উদারনীতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি বা স্বাধীনতা আসিবে না।

(২) অতএব সাম্যবাদী কোন ধর্ম্ম এখন অবলম্বনীয়।

(৩) সাম্যবাদী ধর্ম্ম,—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ; বৌদ্ধধর্ম্ম।

(৪) গোঁড়া হিন্দু একেবারে তাহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে না।

কাজেই বৈষ্ণব ধর্ম্মই এখন অবলম্বনীয়।

এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই আমি "বৈশ্যোপনয়নে" লিখিয়াছিলাম, "বৈদিক যুগের দিকে আর ফেরা যায় না", "এখন সাম্যবাদী বৈষ্ণব ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে" "উপনয়ন এখন একটা অর্থশূন্য প্রথায় পরিণত হইয়াছে"—"আচার ভ্রষ্টের তাহা ত্যাগ করাই উচিত" ইত্যাদি। তজ্জন্য আমার উপর অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি কাণ পাতিয়া শুনেন, তবে শুনিতে পাইবেন, কালের ভেরী এখন নূতন সুরে বাজিতেছে,—"উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !" অগ্রসর হইতে হইলে, পশ্চাতের দিকে চাহিলে চলিবে কেন ? ভবিষ্যতের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অতীতের দিকে চাহিলে কি অগ্রসর হওয়া যায় ? হস্তপদ শৃঙ্খলমুক্ত না করিলে কি উঠিতে পারা যায় ? ইতি

শীলগলি চুঁচুড়া
৫ই মাঘ, ১৩২৫ সাল

বিনীত
শ্রীনিতাইচাঁদ শীল

লণ্ডনের পুলিশ ও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

লণ্ডনের পুলিশ

ভদ্রতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিষয়ে লণ্ডনের পুলিশ জগতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দেশ হইতে লোকেরা লণ্ডন-পুলিশের কার্য্যকলাপ দেখিতে আসে। কিন্তু বর্ত্তমান লণ্ডন-পুলিশ আর প্রাচীন লণ্ডন-পুলিশে আকাশ পাতাল তফাৎ। আগে লণ্ডনের পুলিশ এরূপ অকর্ম্মণ্য ছিল যে লোকে সন্ধ্যা বেলায় ডাকাতের ভয়ে বাড়ীর বাহির হইতে চাহিত না। অনেক ক্ষেত্রে চোর বাটপাড়ের সহিত পুলিশ লাভের বখ্‌রা লইত ও তাহাদিগকে ধরাইয়া দিয়া পুরস্কার লাভ করিত। এমন শোনা যায় যে কোন কোন পুলিশ কর্ম্মচারী অল্প বেতন পাইয়াও মৃত্যুকালে অনেক টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

সার রবার্ট পীলের সংস্কার

লণ্ডনের এই দুরবস্থায় সার রবার্ট পীল বিচলিত হন। তিনি হোম্ সেক্রেটারী থাকা কালে ১৮২৯ সনে ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের নিকট উৎসাহ পাইয়া পুলিশের আমূল সংশোধন সাধন করেন। তিনি নব পুলিশ-বাহিনীতে বিশ্বস্ত লোকদিগকে ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করেন ও অভিজ্ঞ লোকদের হাতে তাহাদের চালাইবার ভার দেন।

বলা বাহুল্য, অন্য অনেক নূতন জিনিষের মত সার রবার্টের এই সংস্কার জনসাধারণ প্রথমতঃ ভাল চোখে দেখে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল তাহাদের স্বাধীনতায় হাত দেওয়া হইতেছে, এজন্য অনেকে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে এই নূতন পুলিশের সহিত জনতার বহুবার সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ধীরে ধীরে লোকে নূতন পুলিশদের মর্য্যাদা বুঝিতে আরম্ভ করিল। যখন দেখা গেল যে অপরাধের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে ও মানুষের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ্ হইয়াছে তখন বিরুদ্ধতা থামিয়া গেল।

সার রবার্ট পীল ২জন কমিশনার ও ৩,০০০ কনষ্টেবল্ দিয়া কাজ আরম্ভ করেন। চ্যারিং ক্রস্ হইতে ১২ মাইল ব্যাস অবধি পুলিশের এলাকা ছিল। ৭ বছর পরে এলাকা বাড়িয়া ১৫ মাইল হইয়াছিল। পরে "অশ্ব-পেট্রোল" এবং "টেম্‌স পুলিশে"র সৃষ্টি করা হয়।

বর্ত্তমান কালের পুলিশ-বাহিনী

বর্ত্তমান পুলিশ-বাহিনীর মোট কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২০,৪৩৬। হোম্ সেক্রেটারীর নিকট সাক্ষাৎ ভাবে দায়ী হইতেছেন কমিশনার। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আছে ৪ জন অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ও ৩ জন ডেপুটি অ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার। ইঁহাদের নীচে ৪ জন জিলা চীফ্ কনষ্টেবল্ ও বিভাগগুলির জন্য কয়েকজন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রহিয়াছেন। এই উচ্চ কর্ম্মচারীগণের আফিস্ ও কাজ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে।

"সিটি অব্ লণ্ডন" পুলিশ মাত্র ৬৭৫ একর ব্যাপী আয়তনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ম্যানসন্ হাউসের নিকট ওল্ড্ জিউরিতে ইহাদের হেড্‌কোয়ার্টার ও একজন কমিশনার ও একজন অ্যাসিষ্টান্ট কমিশনারের হাতে সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ৩ জন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, বিভিন্ন পদের ৪৮ জন ইন্‌স্পেক্টার, ২৫ জন সার্জেণ্ট ও ৯৮৪ জন কনষ্টেবল্ কাজ করিতেছে।

রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার যাতায়াত সুনিয়মিত করা পুলিশের একমাত্র কাজ নয়। অপরাধীর সন্ধান ও ছেলে-পিলে হারাইয়া গেলে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করাও তাহাদের কর্ত্তব্য।

পুলিশের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক

লণ্ডন-পুলিশে ঢুকিতে হইলে প্রথমতঃ ভাল স্বভাব-চরিত্র থাকা আবশ্যক। বয়স ৩০ বছরের নীচে হইবে, শরীর খুব সুস্থ হওয়া দরকার, সুগঠিত দেহ থাকা চাই ও

সুশিক্ষার পরিচয় দিতে হয়। নিম্নতম উচ্চতা ৫ফু. ৮ই। আজকাল আরও লম্বা লোক ঢুকিতেছে। পুলিশের কাজে প্রবেশের আগে প্রার্থীকে এক ট্রেনিং স্কুলে থাকিয়া তাহার সব কাজকর্ম্ম শিখিতে হয়। কি করিয়া চোর ধরিতে, সাক্ষ্য দিতে, অনুসন্ধান করিতে ও রিপোর্ট লিখিতে হয়—তাহা শিখান হয়। পুথিগত ও কার্য্যকরী—দুই প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থাই আছে। এই শিক্ষা ৩ মাস ধরিয়া চলে। যাহারা পরীক্ষায় পাশ করে তাহারা শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক "প্রবেশনারি কনষ্টেবল্" হয়। তাহার পর ৬ মাস ধরিয়া তাহাদিগকে কোন বিভাগে রাখিয়া আরও শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহারা ট্রেনিং স্কুলে শেষ পরীক্ষা দিতে আসে। বস্তুতঃ এই এক বৎসরকাল তাহাদের "প্রবেশনার" বলিতে হইবে। শেষ পরীক্ষায় পাশ হইতে পারিলে তাহারা দস্তুর-মত পুলিশ হইতে পারে।

আমাদের দেশের মত লণ্ডনেও সকল প্রকার ভীড়ের আগে আগে অশ্বারোহী পুলিশ দেখা যায়। ইহাদের আলাদা শিক্ষার কোন্ বন্দোবস্ত নাই, পদাতিকদের মধ্য হইতেই কর্ম্মখালি হইলে বাছিয়া লওয়া হয়। যাহারা ভাল ঘোড়ায় চড়িতে জানে তাহারাই নির্ব্বাচিত হয়। সম্প্রতি টেম্স্ ডিটনে এই সব লোকদের জন্ত এক ট্রেনিং স্কুল খোলা হইয়াছে।

পুলিশের শ্রেণীভেদ

সার রবার্ট পীল পুলিশের সংস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু ডিটেক্‌টিভ্ সৃষ্টির চিন্তা তাঁহার মাথায় আসে নাই। ১৫ বছর পরে তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মচারী সার জেমস গ্রাহাম প্রথমতঃ সাদা পোষাকে ১২ জন সার্জেণ্ট তৈরির হুকুম দেন। ক্রমে কয়েকজন কনষ্টেবল দেওয়া হয় ও শেষে এই শাখার কর্ম্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০। জনসাধারণ প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধেও শত্রুতা করিয়াছিল, কিন্তু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স বিলাতী এক মাসিক পত্রে ইহাদের উপযোগিতা বুঝাইয়া কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিবার পর ইহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন থামিয়া যায়।

টেম্‌সের মধ্য দিয়া হাজার হাজার টাকার মাল ইত্যাদি বাহিত হয়। দেড়শ বছর আগে অনেক হাজার টাকার মাল প্রতি মাসে চুরি যাইত। শেষে অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল যে বণিকেরা যুক্তি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া "মেরিন বা জল পুলিশ" খাড়া করিল। ১৪ বছর বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব নাবিকদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া ২০০ জন লোককে লইয়া কনষ্টেবল্ করা হয়। তখন হইতেই জল পুলিশের আরম্ভ। টেম্‌স পুলিশের ভাসমান বোট এক্ষণে ওয়াটারলু ব্রীজের ধারে নোঙর করিয়া রাখা হয়। সাঁতার না জানিলে ও নৌকা-ষ্টিমার প্রভৃতি চালাইবার জ্ঞান না থাকিলে এই কাজে কাহাকেও লওয়া হয় না।

লেখাপড়ার স্থান

পুলিশকে রিপোর্ট লিখিতে হয়। সেইজন্ত তার শুদ্ধ ও ভাল ইংরেজী জানা চাই। বিদেশী ভাষায় দক্ষতা থাকিলে পুলিশের কাজে অতি দ্রুত উন্নতি হয়। পদোন্নতি নির্ব্বাচন দ্বারা হয়। কিন্তু সাধারণ কার্য্যের সময়কেও গণনা করা হয়। সরকারী স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া অনেক লোক পুলিশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে দেখা যায়।

লণ্ডনের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নাম শোনে নাই, এমন লোক অল্প আছে। কিন্তু এই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও ইহার কাজ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা অনেকের নাই। পার্ল্যামেণ্ট ভবনদ্বয় হইতে অল্প একটু দূরে টেম্‌স নদীর ধারে পাথর ও লাল ইটের তৈরি এক অট্টালিকা দেখা যায়। এই অট্টালিকাই লণ্ডনের পুলিশ আফিস্ বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড।

অপরাধ ও প্রতীকার

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কার্য্যপ্রণালী ঠিক "আফিসী" কায়দায় পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহা সুশাসনের একটি যন্ত্রবিশেষ ও ইহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ত ছোট বড় নানাপ্রকার বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছে। ৭০০ বর্গ

মাইল জুড়িয়া ২০,০০০ হাজারের উপর লোক সকলপ্রকার অপরাধ নিবারণের জন্ম অনবরত যুদ্ধ করিতেছে। সাধারণ পুলিশ কর্ম্মচারী যখন অপরাধীর কোন কিনারা করিতে পারে না, তখন "ক্রিমিনাল ইন্‌ভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেণ্টে"র (সংক্ষেপে "সি আই ডি") লোকেরা সাহায্য করিয়া থাকে।

'সি আই ডি'তে ৮৫২ জন লোক রহিয়াছে। প্রত্যেক বছর লণ্ডনে ১৫,০০০ গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়। আর গড়ে প্রত্যেক বছর প্রায় ৫ লাখ পাউণ্ড বা ৭০ লাখ টাকার সম্পত্তি চুরি হয়। প্রত্যেক বছর প্রায় ১০,০০০ বন্দী হয়। কোন কোন বন্দী একের অধিক অপরাধও করিয়া থাকে। উপরি উক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারীদিগকে প্রতিদিন কিরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়।

'সি আই ডি'র প্রত্যেক লোককে কিছুকাল সাধারণ পুলিশের কাজে কাটাইতে হয়। বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণের জন্ম তাহাদিগকে ডিটেক্‌টিভ্ হইবার জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। ইহাদের পোষাক নীল রঙের। সি আই ডি পুলিশের অব্যবহিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী চীফ্ (প্রধান) কনষ্টেবল্। তাহার উপরে ডেপুটি অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার ও অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার রহিয়াছেন। লণ্ডনে ৪ জন অভিজ্ঞ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে সমগ্র সহরটি সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেট্রোপলিটান পুলিশ ২৩ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে একজন করিয়া ডিভিশনাল ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্পেক্টার রাখা হয়। ইহাদের নীচে বিভিন্ন থানায় ১২ হইতে ৩০ জন পর্য্যন্ত কর্ম্মচারী কাজ করিতেছে।

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীরা মোটর কার পায়; ডিভিশনাল ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্পেক্টারদিগকে মোটর বাইসিকেল ইত্যাদি দেওয়া হয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও প্রত্যেক থানার সহিত সরকারী ও বেসরকারী টেলিফোনের সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রতীকারের বিবিধ সরঞ্জাম

'সি আই ডি'র লোকেরা সবজান্তা নয়। তাহাদিগকে নানা উপায়ে অপরাধীর সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া অন্যান্য প্রকার বৈজ্ঞানিক সাহায্যও তাহারা পাইয়া থাকে। এখানে ২।১টির উল্লেখ করা যাইতেছে।

Finger-print Branch বা আঙ্গুলের ছাপ রাখার কার্য্যকারিতার কথা সকলে জ্ঞাত আছেন। এই বিভাগে হাজার হাজার আঙ্গুলের ছাপ রক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন অপরাধী আগে সাজা পাইয়াছে কিনা তাহা এই দপ্তরখানার বহি খুলিয়া ও তাহার আঙ্গুলের ছাপ মিলাইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে "ক্রাইম্ ইন্‌ডেক্স" দোষী ধরিবার এক বড় অস্ত্র। মানুষের অভ্যাস সহজ জিনিষ নয়। যাহার যাহা অভ্যাস সে তাহার হাত সহজে এড়াইতে পারে না। দোষী ও অপরাধীদের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এমন দেখা গিয়াছে যে কোন অপরাধী তাহার অপরাধ করিবার সময় বিশেষ এক রকমে করিয়া থাকে। এই রকমটা লক্ষ্য করিতে হয়। যেমন, কেহ নির্দ্দোষ কোন ছোট ছেলের হাত দিয়া দামী জিনিষ চুরি করে; কেহ বা এক মিথ্যা নামে টেলিফোন করিয়া বা চিঠি লিখিয়া ডাকাতি করে; ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে অপরাধের রকমটা লক্ষ্য করিয়া টুকিয়া রাখা হয়। ইহাকেই ইনডেক্স করা বলে। তারপর যখন কোথাও কোন অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়, তখন সেই অপরাধের রকমটা ইনডেক্স বহি মিলাইয়া বাহির করিবার পর অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। এই উভয় প্রকার প্রণালীতে দোষী ধরার সহিত অপরাধীদের ফটোগ্রাফ ও বিবরণ সংগ্রহ হইয়া থাকে। এইরূপ ফটো ও বিবরণের মোট সংখ্যা এক্ষণে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার। ইহাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে পুলিশের হাতে পড়িয়াছে। কিন্তু অধিকাংশই দাগী অপরাধী নয়।

আঙ্গুলের ছাপ রাখা, ক্রাইম ইন্‌ডেক্স ও অপরাধীদের রেজেষ্টারি এই তিনটি যে আফিসে থাকে তাহাকে ক্রিমিনাল রেকর্ড আফিস্ নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি শুধু যে লণ্ডনের পুলিশেরাই যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারে, তা নয়। সমগ্র গ্রেট বৃটেনের জন্য এগুলি ব্যবহৃত

হয়। তাহা ছাড়া গোটা বছর ধরিয়া লণ্ডন কর্ম্মচারীদিগকে হাজার রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হয় ও নূতন নূতন তথ্য যোগ করিতে হয়।

অপরাধ সম্বন্ধে সাহিত্য ও পত্রিকা

ক্রিমিনাল রেকর্ড আফিস্ হইতে নানাবিধ পুস্তক ইত্যাদি প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পুলিশ সপ্তাহে ৩ বার করিয়া "পুলিশ গেজেট" পায়। ইহাতে যে সব অপরাধ সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহা শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় ও "চাই" অধ্যায়ের নীচে কোন্ কোন্ অপরাধীকে ধরিতে হইবে তাহার তালিকা থাকে। এই গেজেটের ক্রোড়পত্রে খুব বড় ও ভয়ানক অপরাধীরা মুক্তি পাইলে সে খবর বাহির হয়। কোন কোন অপরাধী কচিৎ একই জিলায় থাকে; ইহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়; ইহাদেরও বিস্তৃত বিবরণ ক্রোড়পত্রে দেখা যায়। "ইন্-ফর্মেশনস্" বা "সংবাদ" নামক পত্রিকা দিনে ৪ বার করিয়া থানায় থানায় বিতরিত হয়। এগুলি শুধু মেট্রোপলিটান পুলিশরা পায় ও এগুলিতে লণ্ডনের অপরাধীগণের কথা থাকে। প্রথমতঃ মোটর কারে করিয়া এগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে পাঠান হয়, সেখান হইতে মোটর সাইকেল আরোহীগণ থানায় দিয়া আসে। এই বিভাগ হইতে অন্যান্য ধরণের পুস্তিকা ইত্যাদিও বাহির হয়। যেমন, গয়নার দোকানে বা অন্যান্য স্থানে অপহৃত দ্রব্য বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য সেই সব স্থানে অপহৃত দ্রব্যাদির লিষ্ট ইত্যাদি পাঠান হয়।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নিজের ছাপাখানা আছে, পুস্তকাদি ও হাজার হাজার নোটিশ সেখানে ছাপা হয়। বছরে এজন্য ১০ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ১৩ লাখ টাকা) ব্যয় হয়।

ডিটেক্‌টিভের কার্য্যের সহায়তা

চোর বা অপরাধী ধরা সহজ কথা নয়। ডিটেক্‌টিভের একার শক্তি যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমান কালে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য নানা প্রকার ওস্তাদ সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফটোগ্রাফ তোলা প্রায় সব সময়ই দরকার হয়। সেজন্য ফটোগ্রাফের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রপাতি সর্ব্বদা রাখা হয়। কখনও হয়ত মৃত বা জীবিত লোকের ছবি উঠাইতে হয়, কখনও কোন লেখা বা টাইপকে বহুগুণ বড় করিয়া তুলিতে হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার রহিয়াছে।

ডিটেক্‌টিভ্‌রা এক একটা বিষয় লইয়া গভীর ভাবে চর্চ্চা করে। কেহ পায়ের চিহ্ন ধরিবার প্রণালী, কেহবা মোটরকার টায়ারের চিহ্ন ধরা আয়ত্ত করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক প্রবঞ্চনা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ও অপরাধী, মুদ্রা তৈয়ার ইত্যাদি নানা বিষয়ে নানা জন মাথা ঘামাইতেছে।

অপরাধী ধরা

লণ্ডনে ৫ জন ডিটেক্‌টিভ্ ইনস্পেক্টার রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের বহুকালের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি আছে। কিন্তু এই ৫ জনের একজনকে সর্ব্বদাই ভিন্ন করিয়া রাখা হয়, ইনি হত্যাঘটিত অপরাধ ইত্যাদির তদন্ত করিয়া থাকেন। এই ডিটেক্‌টিভেরা লণ্ডনের জন্যই রহিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানে ইঁহাদের সাহায্য দরকার হইলে ইঁহাদিগকে পাঠান হয়।

চোরকে ভাল রকম জানা ডিটেকটিভের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাতে এই অসুবিধা হয় যে চোরেরা তাহাদের অপকর্ম্মের পর গা ঢাকা দিবার সুযোগ পায়। তখন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে বিশেষ ডিটেক্‌টিভ্ পেট্রোল প্রেরিত হয়। ইহারা চোরদের একেবারে অপরিচিত বলিয়া তদন্ত করার সুবিধা হয়।

ইহা ছাড়া "ফ্লাইয়িং স্কোয়াড্" বা উড়ন্ত দল আছে। ইহাদের সংখ্যা ২০ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত। বাছা বাছা লোক লইয়া এই স্কোয়াড্ গঠিত হয়, ইহারা মুহূর্ত্তের হুকুমে বিমানযানে চড়িয়া লণ্ডনের যে কোন জায়গায় আপনাদের কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। ৪ খানা মোটরও ইহাদের জন্য রাখিতে হয়, প্রত্যেকের সঙ্গে বেতার গ্রহণের ও প্রেরণের ব্যবস্থা আছে—সুতরাং ইহারা সর্ব্বদা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে পারে। ইহাদের কাজ হইতেছে কখনও ডাকাতের পশ্চাদ্ধাবন করা, কখনও

গাঁটকাটা ধরা, ইত্যাদি। স্কোয়াডের লোকেরা মুখোস্ পরে না বটে, কিন্তু নানা রকম সাজপোষাকের এমন অদল-বদল করে যে তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায় না।

ডিটেক্‌টিভ্ তৈরি

ডিটেক্‌টিভ্‌দের একটী স্কুল আছে। এখানে ৮ সপ্তাহের শিক্ষার পর কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু আগে কনষ্টেবল্ না হইলে কেহই ডিটেক্‌টিভের কাজ পায় না। যুবক কনষ্টেবল্‌দের মধ্যে ডিটেক্‌টিভ কাজের বিশেষ গুণাবলী দেখিতে পাইলে শিক্ষার জন্য স্কুলে পাঠান হয়। একজন অভিজ্ঞ ডিটেক্‌টিভ এই স্কুল চালান ও প্রতিদিন তিনি দুই ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দেন।

আইনতঃ প্রমাণ কাকে বলে ও কেমন করিয়া দিতে হয়, অপরাধ সঙ্ঘটনের ঘটনাস্থলের প্ল্যান ও খসড়া কিরূপে করিতে হয়, খুব ফলপ্রদ সাক্ষীর জবানবন্দী কিরূপ ও ঐবিষয়ে তাহার নিজের ক্ষমতা ও অক্ষমতা কি,—ইত্যাদি বিষয় তাহাকে শিখান হয়। কোন লোককে ঠিক যথাযথরূপে বর্ণনা করা সহজসাধ্য নয়। এ বিষয়েও তাহাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানিয়া চলিতে হয়। চোরাই মাল যে স্থানে লুকান আছে তাহা খুঁজিবার বিশেষ নিয়ম তাহার জানা চাই। তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলিতে ও ন্যায্য আচরণ করিতে শিখাইয়া দেওয়া হয়। অধিকন্তু "কৃষ্ণ যাদুঘরে" (Black Museum) লইয়া গিয়া তাহাকে অপরাধীদের সকল রকম অস্ত্রের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে তৈরি হইলে তাহার উপরওয়ালারা তাহাকে কর্ত্তব্য ভাগ করিয়া দিয়া চালনা করিয়া থাকেন।

অপরাধের কিনারা

একজন লোককে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ হইলে অথবা তাহার অপরাধ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলেও কোন ডিটেক্‌টিভ্ তাহাকে ধরিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণিত না হয় যে কোন ব্যক্তি বাস্তবিক কোন অপরাধ করিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে আইনের চোখে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। অনেক ধৈর্য্যের সহিত বহু পরিশ্রমের পর অপরাধীকে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করা সম্ভব হয়। ডিটেক্‌টিভ্‌দিগকে এজন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিতে হয়।

অনেক সময় এইরূপ হয় যে আইনতঃ কোন প্রমাণ না থাকিলেও কোন লোক যে অপরাধী ডিটেক্‌টিভ তাহা ভাল করিয়া জানিতে পারে। তখন তাহাকে যেমন করিয়া হউক সেই লোকটিকে আট্‌কাইয়া রাখিতে হয়। হয়ত অন্য কোন সামান্য অপরাধে তাহার শাস্তি বিধান হয় অর্থাৎ সে চোখের সাম্‌নে থাকিতে বাধ্য হয়। তারপর আসল অপরাধের অনুসন্ধান চলিতে থাকে ও প্রমাণ জুটিতে থাকে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে ডিটেক্‌টিভের দায়িত্ব গুরুতর, কারণ সে একজন লোকের স্বাধীনতা হরণের জন্য অভিযুক্ত হইতে পারে।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অপরাধীকে কষ্ট দিয়া ধরে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। অনেক সময় ইহা অপরাধীকে সুপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করে। এজন্য একটি ফাণ্ডও রহিয়াছে। অপরাধীরাও ডিটেক্‌টিভের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ থাকে না, কারণ সে জানে যে ডিটেক্‌টিভ্ তাহার প্রতি অন্যায় করিবে না।

মোসাফের

জাতীয় সংবাদ

কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট জনহিতকামী শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র পাল বি এল্ মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের ৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজ

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন

বিগত ২৮শে মাঘ, রবিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় ৮নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেনে কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের এক বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত নূতন সভ্যগণকে সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল, এই সভায় তাহার মীমাংসা হইয়া তাঁহাদিগকে সভ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। তৎপরে সমাজের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া এক সব কমিটি গঠিত হয় :—

কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা
„ „ বিষ্ণুপ্রসাদ রায়
„ „ কার্ত্তিকচরণ মল্লিক
„ গোকুলচাঁদ বড়াল
„ রজনীকান্ত দে
„ পূর্ণচন্দ্র সেন
„ অম্বিকাচরণ দে
„ ভোলানাথ দত্ত
„ ননীগোপাল দে
„ নৃসিংহপদ দত্ত

এই সব কমিটি ১লা চৈত্রের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং ১৭ই চৈত্র সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বালুচর (মুর্শিদাবাদ) সুবর্ণবণিক্ সমিতি

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ, বালুচর, বেগমগঞ্জস্থ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দাস মহাশয়ের বাটীতে স্থানীয় সুবর্ণবণিক্ সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু সুবর্ণবণিক্ এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদন ও বৈশ্যাচার গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

দাঁইহাট (বর্দ্ধমান) সুবর্ণবণিক্ সম্মিলন

প্রথম অধিবেশন

সন ১৩৩৫ সাল, ২৫শে অগ্রহায়ণ

স্থান—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বড়ালের পূজার দালান

উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের নাম—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ নাথ, রাধিকাপ্রসাদ নাথ, ললিত-মোহন ধর, শিবপ্রসাদ ধর, তারাপদ বড়াল, ব্যোমকেশ বড়াল, দোলগোবিন্দ ধর, রামরাম চন্দ্র, কালিদাস দত্ত, শিবদাস দত্ত, বামনচন্দ্র দাস, কালিপ্রসাদ পাল, উপেন্দ্রচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, সত্যেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র, নরেন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্র, হরিদাস দত্ত।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ পাল মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইল।

অত্র সভায় শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার নিম্নলিখিত হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও ভ্রাতৃবৃন্দ,

অদ্য আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বজাতীর

উন্নতিকল্পে কিছু বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বাতুলতা মাত্র।

আশা করি সুধীবৃন্দ নিজগুণে আমার দোষ ক্ষমা করিবেন।

আজকাল সকল সমাজেই সভা-সমিতি বৎসর বৎসর করিতেছে। আমাদের সুবর্ণবণিক্ সমিতিও প্রায় ১৪।১৫ বৎসর হইতে হইতেছে। ইহাতে যে ফল হয় না একথা বলিতে পারি না বরং বারংবার করিতে করিতেই ইহার ফল হইবার সম্ভাবনা। আজকাল যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে প্রায় সকল গৃহস্থেরই সংসার যাত্রা অতিকষ্টে নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাহার উপর যদি কাহারও ৪।৫টি কন্যা জন্মে তাহা হইলে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে তাহার পৈত্রিক বাটী পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়াও নিস্তার নাই। এই যে পণপ্রথা আমাদের সমাজের মহা অনিষ্ট করিতেছে ইহা দূর করিবার কি কোন উপায় নাই? পণপ্রথা হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক বরং যতই দিন যাইতেছে ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যদি বাস্তবিক এই পণপ্রথা দূর করা আপনাদের মনে একান্ত বাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিলে ইহা দূর হইবার সম্ভাবনা। এই যে কন্যার পিতাকে উৎপীড়ন করিয়া ২।৪ হাজার টাকা লওয়া হয় তাহাতে পাত্রের পিতা কয়টি টাকা পান বলুন ত? ঐ টাকা পাত্রীর গহনা, বিবাহের খরচ ও বাজনা প্রভৃতিতেই ফুরাইয়া যায়। পুত্রের পিতার হস্তে কিছুই জমে না। যদি বাস্তবিক তাহাই হয় তাহা হইলে এরূপ উৎপীড়ন করিয়া লইয়া লাভ কি? কত কন্যা পিতার পয়সা না থাকায় বিবাহ দিতে না পারায় কেরোসিনে কাপড় ভিজাইয়া ও অন্যান্য নানা প্রকারে নিজ প্রাণ অকাতরে বিসর্জ্জন দিতেছে ইহাতে কি আমাদের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হয় না? আমার যতদূর ধারণা হয় বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মত এরূপ সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক জগতে দুর্লভ। ইউরোপ, আমেরিকা জাপান এমন কি কাবুলে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা কিরূপ ভাবে বিবাহ করে। তাহারা নিজে দেখিয়া শুনিয়া রীতিমত পরীক্ষা করিয়া বিবাহ করে। বাঙ্গালী জাতির স্ত্রীর মত এমন স্বামীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী স্ত্রী আর পৃথিবীতে নাই। মেয়েদের গৃহধর্ম্ম পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি ও সামাজিক মঙ্গলের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই গৃহ-ধর্ম্ম-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলেই নারী জনম সার্থক বোধ করে। এই সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে যে কতটুকু জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, ত্যাগ স্বীকার ও সর্ব্বোপরি পবিত্রতা আবশ্যক ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। আশৈশব পিতামাতার গৃহে লালিত পালিত হইয়া ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া এই যে সকলকে চির পরিচিত করিয়া জানা, গুরুজনকে ভক্তি সহকারে পরিচর্য্যা করা ও সর্ব্বোপরি পতির সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া পরার্থে এই যে নারীর নিজেকে দান করা, ইহা যে বাঙ্গালী নারী জীবনের কত বড় গৌরব, কত বড় শ্লাঘার বস্তু তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দু-নারী-জীবনের মহত্ত্ব গৃহ-ধর্ম্ম পালন করিয়াই নারী সমাজ রক্ষা করে।

"সমাজের গৃহ পল্লী—সহর নহে"। পল্লীর বিরাট জন-সঙ্ঘের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজ গঠন ও সমাজগুলির মীমাংসা করিতে হইবে।

সহরের মধ্যে শতাধিক ধনী পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ধরণ দেখিয়া ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ আদর্শ মনে করিয়াই তাহা সমগ্র জাতিকে গ্রহণ করিতে বলিলে, সমাজের অনিষ্ট বই আর কিছু হইবে না। দরিদ্রের সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নতুবা দরিদ্রের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার থামিবে না ও অচিরে তাহা সমাজকে ডুবাইয়া দিবে। গরীবের দুঃখ নিজে সম্যক বরণ করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই, সর্ব্বত্যাগী মহাত্মা গান্ধীজীর আদেশ সমগ্র ভারত গ্রহণ করিয়াছিল।

স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে কোন সামান্য দোষ পাইলে তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে সকলে বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু পুরুষেরা যে কত অসৎ কার্য্য করিতেছে তাহার সম্বন্ধে সমাজ নিরুত্তর। এ সম্বন্ধে সকলেরই এক নিয়ম হওয়া দরকার। যদি কোন স্ত্রীলোক বয়স-সুলভ দোষে কোন

অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করা অনুচিত বরং যাহাতে সমাজে চলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আর এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য।

১। প্রত্যেকের মধ্যে সহানুভূতির একান্ত দরকার। কেবল মৌখিক সহানুভূতিতে কোন কার্য্য হইবে না, আন্তরিকতা থাকা চাই। সকলের মন হইতে কুলীন, মৌলিক প্রভৃতি ভেদাভেদ দূর করিতে হইবে।

২। বিবাহে কোনরূপ চুক্তিপত্র কিছুই থাকিবে না। কন্যার পিতা স্ব-ইচ্ছায় যাহা দিবেন তাহাই লইতে হইবে। যদি কেহ না মানেন, কোন বিবাহ চুক্তি-মূলক হয় তাহা হইলে তাঁহাকে সমাজ হইতে পদচ্যুত করিতে হইবে। তাহার সহিত খাওয়া দাওয়া, বিবাহে কোনরূপ সাহায্য করা হইবে না। এমন কি সৎকারেও কেহ যাইবে না বা সাহায্য করিবে না। যদ্যপি কন্যারা প্রতিজ্ঞা করে যে পিতামাতাকে এরূপভাবে কষ্ট দিয়া তাহারা কখনও বিবাহ করিবে না, যদ্যপি কেহ স্বেচ্ছায় বিবাহ করে তাহা হইলে হইবে নচেৎ নহে; তাহারা চিরকুমারী থাকিবে।

কন্যার রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া শাস্ত্র সম্মত কিন্তু যদ্যাপি কেহ রজঃস্বলা হয় তাহা হইলেও চুক্তি-মূলক বিবাহ দেওয়া হইবে না এবং সমাজ হইতে তজ্জন্য কন্যার পিতাকে কোনরূপ শাসন করা না হয় বরং এজন্য উৎসাহ দেওয়া দরকার। ইহা দাঁইহাট কাটোয়া স্থিত ৪।৫ খানি গ্রাম লইয়া একটি সমিতির অধীন করা দরকার। যদ্যপি ইহা ফলপ্রসূ হয় তাহা তাহা হইলে ক্রমে জেলা সমিতিতে ও পশ্চাৎ কন্‌ফারেন্সে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবেক। যদি সকলে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্য করেন তাহা হইলে সত্বর ইহার ফললাভ হইবার সম্ভাবনা।

সমবেত সভ্যমণ্ডলীর অধিবেশনে এই স্থির হয় যে, অত্র দাঁইহাট গ্রামে একটি সুবর্ণবণিক্ সমিতি স্থায়ীভাবে হইল। এই সভার অধিবেশন প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে একদিন হইবেক ও তাহাতে জাতীয় বিষয় আলোচিত হইবেক। এই সমিতিতে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর কেন্দ্র সমিতির কার্য্য বিবরণী পঠিত হইয়া স্থির হয় যে, এখান হইতে তমলুক মোকামে তিনজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হউক ও প্রতিনিধি বর্গের যাতায়াতের খরচ সমিতি হইতে প্রদত্ত হউক সে কারণ অত্রস্থ সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায় হইতে চাঁদা সংগৃহীত করা হইবেক, উপস্থিত সভ্যগণ মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চাঁদা দিতে সম্মত হইলেন :—

শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণপ্রসাদ নাথ ১৲, রাধিকাপ্রসাদ নাথ ॥০, চন্দ্রভূষণ নাথ ॥০, ললিতমোহন ধর ।০, শিবপ্রসাদ ধর ।০, তারাপদ বড়াল ।০, কালীপদ ধর ॥০, রামরাম চন্দ্র ।০, বামনদাস দাস ॥০, কালীদাস দত্ত ।০, কালীপ্রসাদ পাল ১৲, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র ২৲, সত্যেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ॥০, নরেন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্র ॥০, হরিদাস দত্ত ॥০, বিরিঞ্চিমোহন দাস ।০।

অত্র সভায় আরও স্থির হয় যে অন্যান্য সুবর্ণবণিক্-গণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইবেক।

উপস্থিত সভ্যগণ সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর পণপ্রথা নিবারণ কল্পে দৃঢ়সংকল্প করিয়া স্থির করিলেন যে, আমরা দাঁইহাট গ্রাম নিবাসী সমবেত স্বজাতিবৃন্দ অদ্য প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম যে আমরা অদ্য হইতে পুত্রের বিবাহে পণগ্রহণ বা পণাপণ সম্বন্ধে কোনও চুক্তির কথা উল্লেখ করিব না; যদি কেহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন তিনি আমাদের সমাজ হইতে তৎমুহূর্ত্ত হইতে পরিত্যক্ত হইবেন, তাঁহার সহিত আহারাদি, বিবাহে কোনরূপ সাহায্যাদি ও অন্যান্য সামাজিক যে কোন কার্য্য সমস্ত বন্ধ করা হইবেক।

এই মন্তব্য সকলে ভালরূপে বুঝিয়া স্বহস্তে স্বাক্ষর করিলেন।

শ্রীরামরাম চন্দ্র, শ্রীকালীপদ ধর

২৭শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীচন্দ্রভূষণ নাথ

২৭শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র, শ্রীহরিদাস দত্ত, শ্রীশিবদাস দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীবামনদাস দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীশিবরাম ধর, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ নাথ, শ্রীঅমরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র,
২৭শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীললিতমোহন ধর, শ্রীব্যোমকেশ বড়াল, শ্রীবিরিঞ্চি-মোহন দাস, ২৭শে অগ্রহায়ণ।

সভাপতি—
শ্রীকালীপ্রসাদ পাল
মোঃ দাঁইহাট
বৰ্দ্ধমান

দাঁইহাট (বৰ্দ্ধমান) সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী

দ্বিতীয় অধিবেশন

স্থান—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বড়াল মহাশয়ের পূজার দালান

১৩৩৫, ২৭শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা, উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের নাম :—

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দাস, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, উপেন্দ্র-নাথ সেন, শিবুদাস দত্ত, বামনদাস দাস, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, কালীপ্রসাদ পাল, নরেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র, শিবুদাস ধর, হরিদাস দত্ত, চন্দ্রভূষণ নাথ, কালীপদ ধর, রামরাম চন্দ্র, ললিতমোহন ধর, কৃষ্ণপ্রসাদ নাথ। অদ্যকার সভায় শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, মহাশয়কে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নিযুক্ত করা হইল।

গত অধিবেশনের মন্তব্য পাঠ ও বলবৎ করা হইল।

বর্ত্তমান সভায় দাঁইহাট ও বাগদীকরা দুই খানি গ্রামকে অত্র সভার অন্তর্ভুক্ত করা হইল। এই সভা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সহানুভূতি আকর্ষণ জন্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইবেক। শ্রীযুক্তবাবু রাধিকাপ্রসাদ নাথ ও শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র মহাশয়দিগকে এই সভার স্থায়ীভাবে সভাপতিপদে নিযুক্ত করা হইল।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়কে স্থায়ীভাবে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত শিবদাস দত্ত, শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ চন্দ্র, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ নাথ, শ্রীযুক্ত অভয়তারণ দত্ত, শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ ধর, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বড়াল মহাশয়গণকে কার্য্যকরী সভার সভ্য নিযুক্ত করা হইল। গত ২রা ডিসেম্বর তারিখের কেন্দ্র সমিতি ও তমুলক অভ্যর্থনা সমিতির একত্র অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীর প্রস্তাবসমূহের মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবের ২য় শাখার শোভাযাত্রা বিষয়ক, বিবাহের বয়স সম্বন্ধে ও ৭ম প্রস্তাব উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার ব্যতীত অন্যান্য প্রস্তাবগুলি যথাযথ পালন করা অভিপ্রেয়।

শোভাযাত্রা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে তাহাতে দেশীয় শিল্পাদি লোপ পাইবার সম্ভাবনা বিধায় সাধ্যানুসারে আয়োজনে বাধা দেওয়া উচিত মনে হয় না।

বিবাহে কন্যার বয়স সম্বন্ধে ১২ বৎসর কাল যাহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় হইলেও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে (যতদিন পণপ্রথা সম্যকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয় ও কন্যা রজঃস্বলা হওয়ায় বিবাহ দিতে না পারিলে সে সমাজ শাসন প্রচলিত আছে তাহার নিরাকরণ না হয়) বাঞ্ছনীয় মনে হয় না।

উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ইহা কেবল মাত্র আমাদের স্বজাতি-সমাজে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, গুরুদেব ও পুরোহিত সমাজের মত-সাপেক্ষ মনে হয়। এমতে প্রার্থনা যে কেন্দ্র সম্মিলনীতে পূজনীয় গুরু ও পুরোহিত-সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

এই সভা পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের স্বজাতিবৃন্দকে উদ্-বোধিত করিবার চেষ্টা করেন। কারণ তাহাদিগের সহানুভূতি না পাইলে সমাজ-বন্ধন থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক স্বজাতিবৃন্দ এই সভার সভ্য হইতে পারেন। প্রথম অধিবেশনে অনুপস্থিত স্বজাতিবর্গকে মর্ম্ম অবগত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হওক।

শ্রীদেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র
সভাপতি

মাণিকলাল দত্তের দানপত্র

গত মাসের "সমাচারে" শ্রীরামপুর নিবাসী ৺মাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের চরম দানপত্রে দেশের ও জাতির হিতকল্পে যে সমস্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত দানপত্রের পর তিনি

যে অতিরিক্ত দানপত্র (codicil) দ্বারা তাঁহার পরিত্যক্ত নগদ টাকা কোম্পানীর কাগজ ও অলঙ্কারাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার বিবরণ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

১। বাদলা নিবাসী তদীয় গুরুদেব শ্রীলনিত্যানন্দ গোস্বামী ৫০০৲
২। শ্রীরামপুর নিবাসী পুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী ১০০৲
৩। ঐ ঐ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী ২০০৲
৪। ঐ ঐ শ্রীযুক্ত বামাপদ চক্রবর্ত্তী ১০০৲
৫। ইটালি নিবাসী ভিক্ষাপুত্র শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২০০০৲
৬। চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ শীলের পত্নী মাণিক বাবুর ভগ্নী শ্রীমতী আশ্চার্য্যময়ী দাসী ৩০০০৲
৭। জ্ঞাতিভ্রাতা ও অন্যতম সেবায়েত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দত্তের পুত্র তিনকড়ি দত্ত ২০০০৲
৮। ৺লালবিহারী মল্লিকের বিধবা পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা দাসী ১০০০৲
৯। জ্ঞাতি ভ্রাতা উক্ত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যতম সেবায়েত শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত সমান-ভাবে ৩৷৷০ টাকা সুদী কোম্পানীর কাগজ ২১৭০০৲ এবং ৪৲ সুদী মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার ১০০০৲
১০। উক্ত যোগেন্দ্রবাবু এবং মাণিকবাবুর পুত্রবধূদ্বয় যাবতীয় জহরত, সোনা এবং রূপার অলঙ্কার
১১। শ্রীরামপুর নিবাসী ৺জয়গোপাল দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত কন্যার বিবাহ জন্য ১০০০৲
১২। কলিকাতা ১২ নং পঞ্চাননতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মল্লিক বাটী বন্ধকের জন্য টাকা ছাড়
১৩। শ্রীরামপুর নিবাসী উক্ত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত ঐ ঐ
১৪। ঠাকুর সেবার জন্য সমস্ত আসবাব এবং রূপার, কাঁসার ও পিতলের তৈজস।

পরীক্ষা-সংবাদ

কলিকাতা বহুবাজার জেলেপাড়া লেন নিবাসী ৺শ্যামাচরণ শীলের পুত্র শ্রীমান জানকীনাথ শীল বর্ত্তমান বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ এম্ বি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং Midwifery এবং Medicine উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। জানকীনাথের এই যোগ্যতার জন্য তাহাকে কারমাইল হাসপাতালের House surgeon নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা এই কৃতী স্বজাতীয় ছাত্রের কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রমিক উন্নতি কামনা করি।

অনুপনীত সুবর্ণবণিকের পঞ্চদশাহে শ্রাদ্ধ

৩৯।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ পাল মহাশয় উপবীত গ্রহণ না করিয়াও অনুকল্প-বিধান মতে বৈশ্য সুবর্ণবণিকের করণীয় পঞ্চদশাহে তাঁহার ৺মাতা ঠাকুরাণীর আদ্যশ্রাদ্ধ বিগত ১৬ই মাঘ সম্পন্ন করিয়াছেন। বহু সুবর্ণবণিক্ উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

সমালোচনা

শান্তা—উপন্যাস, শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা। বিজয়গোপাল বাবু সাহিত্য জগতে খুব সুপরিচিত না হইলেও, নিতান্ত অপরিচিত নহেন; সমাচারেও তাঁহার লিখিত গল্প পুনর্মিলনে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং আরো অনেক সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা তাহার লেখা অলঙ্কৃত করিয়াছে ও করে।

শান্তা হিন্দু বিধবার এক আদর্শ চিত্র; বিশেষতঃ কামনা-লালসাময়ী কলঙ্কিনীর মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি কমলার পাশে শান্তাকে দেখিয়া মনে হয়, শান্তা বাস্তবিকই শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, আত্মসুখ-স্পৃহা-পরিশূন্যা দেবচরণার্পিতা অনাঘ্রাত কুসুমকলিকা; আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া উঠে। পারিপার্শ্বিক ঘটনা-বৈচিত্র্যে অন্যান্য চরিত্রগুলিও বেশ উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষা সরল ও মধুর; কিন্তু স্থানে স্থানে শান্তার ও তাহার পিতার কথাবর্ত্তার মধ্য দিয়া যে দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন তাহা সহজে বোধগম্য হওয়া দুরূহ। যাহাহউক আমরা বিজয় গোপাল বাবুকে তাহার নবোদ্যমে অভিনন্দিত করিতেছি।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ—শ্রীমন্মথনাথ দে প্রণীত, মূল্য ২৲ টাকা। গ্রন্থকার পাঠকের সুপরিচিত; কারণ এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ধারাবাহিক রূপে সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়, উপন্যাসের অপেক্ষাও অধিক চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হয়। তারপর গল্প, পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও বর্ণনার মধ্য দিয়া চলচ্চিত্রের ছবির মত তিনি পাঠককে যেন সমগ্র দাক্ষিণাত্য সঙ্গে করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখাইয়া দিতেছেন। সাধারণ যাত্রীর অগম্য পক্ষীতীর্থ, সিংহল প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা পুস্তকখানি পরিব্রাজকের পক্ষে মহামূল্যবান হইয়াছে। একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল—সমগ্র ভ্রমণ স্থানের একখানা মানচিত্র দেওয়া উচিত ছিল তাহাতে স্থানগুলির একটি স্পষ্ট ধারণা হইত। কিন্তু বাঙ্গালী আমরা মানচিত্রের মর্য্যাদা বুঝি না—তাহাতে যে পাঠ্য বিষয় বুঝিবার কত সুবিধা হয়, তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না; এমন কি পৃথিবী পর্য্যটক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পুস্তকাবলীতেও ঐ অভাব পরিদৃষ্ট হয়; আশা করি আগামী সংস্করণে মানচিত্র সংযোগ করিয়া লেখক মহাশয় এ ত্রুটি সংশোধন করিবেন। কাগজ, বাঁধাই ও ছাপা অত্যুৎকৃষ্ট, চিত্রগুলিও চিত্তাকর্ষক এবং পাঠ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণার পক্ষে সহায়ক।

আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এ, তত্ত্বনিধি বিরচিত, বহু চিত্র শোভিত, স্বর্ণাঙ্কিত শিল্কের বাঁধাই; কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, ৪১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷৹ আনা।

আর্য্য নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা কিরূপভাবে প্রদান করিলে তাঁহারা আদর্শ মাতৃত্বের অধিকারিণী হইয়া গৃহ শান্তি ও সুখের আদর্শনিকেতনে পরিণত করিতে পারেন, এই পুস্তকে তিনি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তক পাঠে মনে হয়, বর্ত্তমানে শিক্ষাও স্বাধীনতার নামে যে কঠোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হইয়া নারীর স্বভাব-কোমল হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিতেছে এবং পরিণামে তাহাকে সুজননী হইবার পক্ষে অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে, তিনি সেই শিক্ষাও স্বাধীনতার একান্ত বিরোধী। তিনি সে বিষয়ে মহর্ষি মনুর সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া বলেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥"

বিশেষত বর্ত্তমানে আর্টের নামে যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ 'নারীনৃত্যে'র ব্যপদেশে সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের অঙ্গে অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তিনি সে বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়াছেন—সহবতে শিক্ষা অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনিও ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজার মত নারীদের জন্য "Freedom in bondage"-শ্রেণীর স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

এই পুস্তকের দ্বারা সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে আশা করা যায়। ভাষা সহজ ও সরল।

প্রকৃতির উপর রাগরাগিণীর প্রভাব—শ্রীমতি বাণী দেবী।

লেখিকা সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞা। তিনি এই পুস্তকে তাঁহার কতকগুলি অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতির উপর যে সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব, ইহা ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ ঋষিগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই বৈদিক মন্ত্র গানের ব্যবস্থা—সেই জন্য সামবেদ—সামগান নামে অভিহিত। শব্দ ব্রহ্ম এ কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে সঙ্গীতের দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারা যাইবে না, এ কথা বলা চলে না। তার পর রাগরাগিণী গানের সঙ্গে সঙ্গে যে তিনি ব্যক্তিত্ব ও ধ্যানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রণিধান যোগ্য। যে ধ্যান মানবাত্মাকে বিশ্বাত্মা 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান' পরব্রহ্মের সান্নিধ্যে লইয়া যাইতে পারে, সে ধ্যান সামান্য প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বঙ্গ সাহিত্যে এ বিষয়ের রচনা বিরল না হইলেও বহুল নহে। আশা করি লেখিকা এ বিষয়ে আরো কিছু লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত করিবেন যে, ভারতীয় সঙ্গীত শুধু দু'দণ্ডের খেয়াল-পরিতৃপ্তির জিনিষ নহে;—ইহা শাশ্বত শান্তির আধার, জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী, কল্প-কল্পান্তরব্যাপী ধ্যানগম্য সাধনার ধন।

শ্রীহে. বি. সে.

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩৮ সাল { ৮ম সংখ্যা

নোট বা কাগজের মুদ্রা

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

আজকাল সকল সভ্য দেশেই নোট বা কাগজের টাকা চলে। আমাদের দেশেও প্রচুর পরিমাণে নোট চলিতেছে। ব্যবসায়ী এবং কারবারী লোকেরা স্বুবর্ণ এবং রজত মুদ্রা অপেক্ষা নোট অধিক পছন্দ করে। তাহার কারণ, ইহার দ্বারা ধাতু-মুদ্রার কার্য্য অনায়াসেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধাতু-মুদ্রা দ্বারা বিনিময় কার্য্য বা বিকি-কিনির কাজ অনায়াসেই সিদ্ধ হয়। ধাতু-মুদ্রার যে মূল্য তাহার বিনিময়ে আমি দোকানে যাইয়া যে পণ্য কিনিব তাহার মূল্য-পরিমাণ তাহাই হইবে। সুতরাং-ধাতু মুদ্রাও কার্য্যতঃ একটা মধ্যবর্ত্তী বিনিময়সাধক পণ্য। মনে করুন আমি একটা মোহর লইয়া বাজারে চাউল কিনিতে গেলাম। মোহরটিতে এক ভরি সোণা আছে। উহার মূল্য ২২৲ টাকা। আমি দোকানদারকে সেই মোহরখানি দিলে সে আমাকে ২২ টাকা মূল্যের চাউল দিবে। তাহার অপেক্ষা অল্প বা অধিক চাউল দিবে না। আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে সেই মোহর খানি ভাঙ্গিয়া আমার পৌত্রের জন্য বালা গড়াইতে পারি। সেই বালার মূল্যও ২২ টাকা হইবে। বালা গড়িতে হইলে আমার নিকট হইতে সেকরা বানি অর্থাৎ গড়িবার মজুরী লইবে। এ ক্ষেত্রে উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কারণ উহা আমার প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া জিনিষ গড়িয়া দিবার পারিশ্রমিক মাত্র। সে মূল্যটা ঐ জিনিষের মধ্যে থাকে না। কাজেই যখন পুরাতন গহনা বিক্রয় করিতে যাওয়া যায় তখন ঐ গহনার 'বানি' বাবদ কিছুই ধরিয়া পাওয়া যায় না। গহনার যে ধাতুগত মূল্য তাহাই পাওয়া যায় এবং তাহাই ধর্ত্তব্য। এই জন্য আমি প্রসঙ্গত এই কথা বলিতে চাহি যে, অধিক পরিমাণে গহনা গড়ান গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ। উহা অপেক্ষা

টাকাটা ব্যাঙ্কে বা সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে রাখিলে অনেক লাভ আছে।

যাহা হউক, ধাতু-মুদ্রার একটা গুণ এই যে, উহা মূল্যবান। এখন যদি আকবরী মোহর বা আক্‌বরী টাকা কাহারও নিকট থাকে, তাহা হইলে তিনি বাজারে উহা বিক্রয় করিয়া প্রচলিত মুদ্রায় তাহার মূল্য পাইতে পারেন। সুতরাং উহা যে কেবল একটা বিনিময়সাধক নিদর্শনপত্র তাহা নহে, উহা স্বয়ং একটা পণ্য। সর্ব্ব দেশে এবং সর্ব্ব কালে উহা উহার ধাতুগত মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। যদি কাহারও ভিটায় আকবরের আমলের কতকগুলি মোহর পাওয়া যায়, আর সেই ব্যক্তি তাহা পায়, তাহা হইলে তাহার ধনবৃদ্ধি হয় ও পণ্য ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। অথচ আকবরী মোহর আজকাল মুদ্রা হিসাবে চলে না। কিন্তু আকবরের সময়ে নোট বা কাগজের মুদ্রা যদি চলিত থাকিত আর কেহ যদি তাহা পাইত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা সেই লোকের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইত না। সে উহা বেচিয়া এক পয়সাও পাইত না। তবে কৌতুহল তৃপ্তির জন্য যদি কেহ উহা কিনিত সে কথা স্বতন্ত্র। আসল ধাতু-মুদ্রার সহিত নোটের পার্থক্য ঐ খানে। আসল ধাতু-মুদ্রার একটা নিজস্ব মূল্য আছে; উহা অনেকটা উহার প্রচলিত মূল্যেরই অনুরূপ; কিন্তু নোটের সেরূপ নিজস্ব কোন মূল্যই নাই। উহা এক টুকরা কাগজ বা পার্চমেণ্ট মাত্র। এইখানে আসল ধাতু-মুদ্রার সহিত কাগজের মুদ্রা-মূল্যের পার্থক্য লক্ষিত হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্রা মধ্যস্থ-রূপে বিকিকিনির কার্য্য সম্পাদন করে। আমি রামকে একটা টাকা দিলাম, সে আমাকে আধসের ঘৃত দিল। রাম গোবিন্দকে সেই টাকাটাই দিয়া তাহার নিকট হইতে ৬ সের চাউল পাইল। সুতরাং বুঝা যায় যে, মুদ্রার সাহায্যে তাহার বিনিময়ে বাজার-দর অনুসারে সকল পণ্যই পাওয়া যায়। প্রত্যেক পণ্যের বিনিময়-হারের সহিত মুদ্রা-মূল্যের একটা আনুপাতিক সম্বন্ধ আছে। সুতরাং প্রত্যেক মুদ্রাই প্রয়োজনীয় পণ্যলাভের একটা হুকুমনামা মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই হুকুমনামাটা অন্য কোন বস্তুর সহিত গাঁথিয়া দিলে কি ক্ষতি আছে? সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাগজে যদি ঐরূপ হুকুমনামা লিখিয়া দেওয়া যায় আর পণ্যবিক্রেতা যদি সেই হুকুমনামা মানিতে চাহে, তাহা হইলে সেই কাগজের দ্বারা ঠিক মুদ্রার কাজ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে নূতন খাতার সময় অনেক খাতামহরৎকারী দোকানদার তাঁহাদের ঋণ-পরিশোধকারী খরিদ্দারদিগকে মিষ্টমুখ করাইবার জন্য এক এক জন মিষ্টান্ন-বিক্রেতার সহিত একটা চুক্তি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকেন যে, তাঁহার চিরকুট পাইলে মোদক যেন সেই ব্যক্তিকে চিরকুটে লিখিত পরিমাণ সন্দেশ প্রদান করেন। খরিদ্দার তাঁহার দোকানীকে টাকা দিলে দোকানদার তাহাকে একখানা চিরকুট প্রদান করেন। খরিদ্দার সেই চিরকুটখানি সেই মোদকের দোকানে দিলেই মোদক তাহাকে সেই চিরকুটের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সন্দেশ দেয়। মোদক সেই সন্দেশের মূল্য উক্ত খাতা-মহরৎকারী দোকানদারের নিকট পাইয়া থাকে। কিন্তু অন্য কোন মিষ্টান্ন বিক্রেতা সেই চিরকুট দেখিয়া সন্দেশ দিবে না। কারণ অন্য দোকানদার এ চিরকুট মানিয়া লইবে বলিয়া চুক্তি-বদ্ধ হয় নাই। তাহার উহার মূল্য পাইবার অর্থাৎ সেই চিরকুট ভাঙ্গাইবার সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। ইংরাজি ভাষায় ঐ চিরকুটকেও নোট বলা যায়। ঐ চিরকুটগুলি দেখাইলেই খাতামহরৎকার মোদককে তাহার প্রদত্ত মোণ্ডার মূল্য দিবে। সুতরাং সেই চিরকুটগুলি মোদকের নিকট সরকারী নোটের ন্যায়ই মূল্যবান। খাতা-মহরৎ-কারী দোকানদার ঐ চিরকুটগুলি দেখিয়া মোদককে ঐ বাবদ টাকা চুকাইয়া দিলে আর ঐ চিরকুটগুলির কোন্ মূল্য থাকে না। এখন দ্রষ্টব্য এই চিরকুটগুলির মূল্য কোথায়? মোদক যে খাতা-মহরৎকারী দোকানদারের চুক্তি অনুসারে তাহার খরিদ্দারকে ঐ পরিমাণ সন্দেশ দিয়াছে তাহার নিদর্শন-পত্র হিসাবে উহার মূল্য আছে। ঐ চিরকুটগুলি বিক্রয়ও করা যায়। মনে করুন রাম খাতা-মহরতকারী দোকানদারের নিকট একসের সন্দেশ পাইবার একখানি চিরকুট লইয়া ঘরে আসিল। রামের সন্দেশের

তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সে জন্য দোকানদারের নিকট অনেক সন্দেশ পাইয়াছে। শ্যাম সেই একসের সন্দেশের দাম দিয়া ঐ চিরকুটখানি রামের নিকট হইতে লইল এবং তাহা মোদককে দিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সন্দেশ লইল। এ ব্যাপার পল্লীগ্রামে প্রায়ই ঘটে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ধাতু-মুদ্রার দ্বারা যে কাজ হয়, এক খণ্ড চিরকুটের দ্বারা সেই কাজ হইতে পারে। তবে ধাতু-মুদ্রার মূল্য যেমন সকলে মানিয়া লইতে চাহে, চিরকুটে লিখিত মূল্য যদি তেমনই সকলে স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলেই টাকার বদলে চিরকুট চলিতে পারে। ধাতু-মুদ্রার উপর যেমন সরকারী মোহর অঙ্কিত থাকে, যদি কাগজের উপর সেইরূপ সরকারী ছাপ থাকে, আর প্রজা-সাধারণ যদি তাহা মানিয়া লইতে সম্মত হয়, তাহা হইলে সেই কাগজের চিরকুটই মুদ্রা বলিয়া চলিতে পারে। নানা দেশে ধাতুমুদ্রার পরিবর্ত্তে অন্য পদার্থ মুদ্রারূপে চালান হইয়াছে। প্রাচীন কালে কোন কোন দেশে একখণ্ড চামড়ার উপর রাজার সই-মোহরের ছাপ দিয়া মুদ্রা রূপে চালান হইত। কোথাও কোথাও একখণ্ড মৃত্তিকার উপর সরকারী ছাপ দিয়া তাহাই লোক মুদ্রারূপে লইত। শুনা যায় চীনারাই প্রথমে কাগজের টাকা ব্যবহার করিত। ভারতে কস্মিন-কালেও কাগজের মুদ্রা প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। য়ুরোপে প্রায় গত ৩ শত বৎসর ধরিয়া কাগজের মুদ্রা বা নোট নিয়মিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে হুণ্ডীর প্রচলন আছে।

নোটের মূলকথা হইতেছে উহা প্রচলিত ধাতু-মুদ্রার প্রতিনিধি। পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক হইতে নোট প্রচলিত করা হইত। মনে করুন আমি কোন ব্যাঙ্কে ৫ হাজার টাকা জমা দিলাম। ব্যাঙ্ক আমাকে তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমাকে ৫ শত নোট দিল। প্রত্যেক নোটের মূল্য হইল দশ টাকা। ব্যাঙ্ক সেই নোটের উপর প্রতিশ্রুতি দিল যে ঐ নোট তাহার নিকট উপস্থিত করিলেই সে তাহার পরিবর্ত্তে ১০ টি টাকা দিবে। দেশের লোকের যদি তাহার সেই প্রতিশ্রুতির উপর নিশ্চিত আস্থা থাকে, যে তাহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি উহার এক এক খানি নোট উক্ত ব্যাঙ্কে লইয়া গেলে ব্যাঙ্ক তাহাকে প্রত্যেক নোটের জন্য দশটি করিয়া টাকা দিবে, তাহা হইলে সেই দেশের প্রত্যেক দোকানী, পশারী, মহাজন সেই নোট গ্রহণ করিয়া উহাকে তাহার প্রত্যেক খানির বিনিময়ে দশ টাকার পণ্য প্রদান করিবে। সুতরাং সে নোট বাজারে চলিয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক যদি ঐ নোটের বদলে টাকা না দিতে পারে তাহা হইলে সেই নোট মূল্য-হীন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে তাহার ক্ষতি হয়। ব্যাঙ্ক-নোট ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিবামাত্র টাকা না দিতে পারিলে উহাতে ব্যাঙ্কের পশার নষ্ট হইয়া যায়। য়ুরোপে এবং আমেরিকায় অনেক ব্যাঙ্ক এই রূপে "ফেল" হইয়া গিয়াছে। ভারতেও যে তাহা হয় নাই তাহা নহে। সেই জন্য সরকারের অনুমতি না লইয়া কোন ব্যাঙ্কই এখন নোট বাহির করিতে পারে না। সরকার যে সকল ব্যাঙ্ককে নোট বাহির করিতে অনুমতি দেন তাহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন। এই সকল ব্যাঙ্ক-নোটকে গচ্ছিত অর্থের প্রতিভূ বা নিদর্শন পত্র (representative paper money) বলা হইয়া থাকে। মার্কিণ অঞ্চলে ইহাকে নিদর্শন পত্র বা সার্টিফিকেট বলে। তথাকার সুবর্ণের নিদর্শন-পত্র (gold certificate), রজতের নিদর্শন-পত্র (silver certificate) অনেকটা এই ধরণের নোট। উহাকে ট্রেজারীর অব্যাজে পরি-শোধনীয় ঋণ-স্বীকার-পত্র বা খত বলা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে অনেকগুলি বেসরকারী ব্যাঙ্ক এই রূপ নোট বা গচ্ছিত অর্থের নিদর্শন-পত্র বাহির করিয়াছিলেন। সরকারের হুকুম মতে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে বোম্বাই ব্যাঙ্ক এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক বাজারে নোট বাহির করিতে থাকেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ ব্যাঙ্ক গুলির ঐরূপ নোট বাহির করিবার ক্ষমতা ছিল। তৎপরে ভারত সরকারই স্বহস্তে নোট বাহির করিবার ভার গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্ক-নোটকে গচ্ছিত অর্থের রসিদ বা নিদর্শন পত্র (representative paper money) বলা যাইতে পারে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার অর্থের বদলে কারেন্সি নোট চালাইবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহারা মনে করেন যে ধাতুকে আর মুদ্রা-সম্পর্কিত ব্যাপারে অধিক পরিমাণে আটক রাখা উচিত নহে। তাহা হইলে ধাতু-মূল্য এবং তাহার সঙ্গে মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এই ভারতে চির-কালই সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে নিষ্ক নামক সুবর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে য়ুরোপের বহুদেশেই সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত হওয়াতে সুবর্ণের বাজারে বিষম টান উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ভারতের সরকার আর ভারতে সুবর্ণমুদ্রা চালাইয়া সুবর্ণ মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিতে সম্মত হয়েন নাই। ইঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, সুবর্ণমুদ্রা বৃদ্ধি পাইলেই স্বতঃই তাহার সহিত সুবর্ণমুদ্রার মূল্য বাড়িয়া যাইবে। যে সকল দেশ শিল্প-প্রধান এবং যে সকল দেশকে শিল্পজ পণ্য বিদেশে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হয়, সেই সকল দেশের মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পাইলে দেশের অপকার হইয়া থাকে। কারণ তাহাদের শিল্পজপণ্য প্রস্তুত করিতে ব্যয় অধিক পড়ে; সুতরাং তাহারা অল্পমূল্যে সেই শিল্পজপণ্য বিক্রয় করিতে পারে না। অল্পমূল্যে পণ্য বেচিতে না পারিলে সেই পণ্যের কাটতি অধিক হয় না। পণ্যের কাটতি অধিক না হইলে বাণিজ্য ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হইতে পারা সম্ভব হয় না, সুতরাং সমৃদ্ধি লাভ করাও সম্ভব হয় না। অতএব ভারতে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলনে বৃটিশ জাতির ও বৃটিশ সরকারের আপত্তি যে অহেতুকী ছিল ইহা মনে করাই ভুল। সেই জন্য তাঁহারা "শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্‌" হিসাবে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতে কাগজের মুদ্রা বা নোট চালাইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

সরকার ভারতে যে নোট চালাইয়াছিলেন তাহাকে প্রাতিভবিক মুদ্রা (representative paper money) বলা যায়। কারণ চাহিবামাত্র ঐ নোটের টাকা দিতে সরকার বাধ্য ছিলেন ও আছেন। যে সময় এই নোট সম্বন্ধীয় আইন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে তদানীন্তন রাজস্বসচিব সার জেমস উইলসন বলিয়াছিলেন যে, "যেরূপ সাবধানতার সহিত ও সুবন্দোবস্তপূর্ব্বক এই নোট প্রচলনের ব্যবস্থা করা হইল, এবং চাহিবামাত্র এই নোটের বদলে যেরূপভাবে এই নোট যে টাকার প্রতিভূ বা নিদর্শন সেই বাজার প্রচলিত টাকা পাইবার যেরূপ সুবন্দোবস্ত করা হইল, তাহাতে এই নোটের অর্থ সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিন্ত হউন, এই নোটকে ভারতের সর্ব্বত্র নির্ব্বিঘ্নে লিগ্যাল টেণ্ডার বা আইন মতে দেয় ও গ্রহণীয় অর্থে পরিণত করা যাইতে পারে।" তখন যে পরিমাণ নোট বাজারে বাহির করা হইত, সেই পরিমাণ মূল্যবান ধাতু (সুবর্ণ ও রৌপ্য) সরকারী ধনাগারে বা ব্যাঙ্কে মজুত রাখিতে হইত। অর্থাৎ তখন নোট প্রকৃত পক্ষে প্রাতিভব মুদ্রা বা "রেপ্রেজেণ্টেটিভ মণি" ছিল।

ইহাতে লোকের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। লোকের পক্ষে বহু টাকা জামার পকেটে করিয়া লইয়া নানা স্থানে যাইবার সুবিধা হইতে থাকিল। কোন লোককে যদি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ১ হাজার টাকা লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে নগদ টাকা লইয়া যাইতে হইলে তাকে সাড়ে ১২ সের বোঝা বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। দূরে এই বোঝা লইয়া যাওয়া অনেকের পক্ষে ঘোর অসুবিধার কারণ হইয়া উঠে। সেই অর্থবাহকের নিকট যে নগদ টাকা আছে, তাহা অন্য লোক সহজেই বুঝিতে পারে। ইহাতে চোর-ডাকাতের ভয় অত্যন্ত অধিক জন্মে। কিন্তু ঐ লোক যদি সঙ্গে একখানি হাজার টাকার নোট অথবা ১০খানি একশত টাকার নোট লয়, তাহা হইলে কাহারও তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে না। উহা সে অনায়াসেই পকেটে করিয়া লইয়া যাইতে পারে। কেহ তাহা জানিতেও পারে না। সুতরাং দস্যুতস্করের ভয়ে তাহার ধনপ্রাণ বিপন্ন হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই লোক নোট ব্যবহার করিতে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ হইতে থাকিল। সেই জন্য ভারতীয় জনসমাজে নোটের প্রচলন কিরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত হিসাব দেখিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রতি বৎসরের হিসাব দিলে হিসাবের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যাইবে। সেইজন্য আমি প্রতি দশ বৎসর

অন্তর মোট কত নোট চালিত হইয়াছিল তাহারই হিসাব নিম্নে প্রদান করিলাম।

খৃষ্টাব্দ	কত টাকার নোট চালিত ছিল
১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ	৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা
১৮৭৫ " " "	১১ কোটি ২৪ লক্ষ "
১৮৮৫ " " "	১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ "
১৮৯৫ " " "	৩০ কোটি ৭০ লক্ষ "
১৯০৫ " " "	৩৯ কোটি ১৮ লক্ষ "
১৯১৫ " " "	৬১ কোটি ৬৩ লক্ষ "
১৯২০ " " "	১৭৪ কোটি ৫২ লক্ষ "

এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলা আবশ্যক যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সরকার ১টাকার এবং আড়াই টাকার নোট প্রচলিত করেন। ঐ নোট বিশেষ লোকপ্রিয় হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক বাজারে ঐ নোট প্রতি টাকায় ২ আনা করিয়া বাটা না দিলে কেহ গ্রহণ করিতে চাহিত না। রাত্রিকালে এক টাকার নোট দিয়া খাবার চাহিলে মোদক উঠিয়া তাহাকে খাবার দিতে চাহিত না, কিন্তু নগদ টাকা দিলে সে আগ্রহের সহিত খরিদ্দারকে খাবার দিত। কাগজের টাকায় যে পরিমাণ খাদ্যাদি পাওয়া যাইত, রূপার টাকায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্যাদি পাওয়া যাইত। তখন ঐ অঞ্চলে রূপার টাকা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসর মধ্যে নোটের প্রচলন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যাহা হউক, এই ১ টাকার নোট প্রচলনে লোক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে বলিয়া সরকার উহা প্রত্যাহৃত করিয়া লইয়াছেন।

আর এক প্রকার কাগজের মুদ্রা আছে। উহা প্রত্যয়-মূলক। উহাকে ইংরাজী ভাষায় fiduciary paper money বলা হয়। উহার মূলে টাকা বা টাকার মূল্যস্বরূপ ধাতু নোটদাতার নিকট জমা থাকে না। যে লোক বা সঙ্ঘ ঐ নোট প্রচার করিতেছেন, তিনি ঐ নোটের অঙ্গীকৃত টাকা পরিশোধ করিতে পারেন, এবং বিনা ওজরে পরিশোধ করিবেন, লোকের মনে যদি এইরূপ ধারণা ও বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে ঐ নোট চলিতে পারে। অনেক দেশের ব্যাঙ্ক-নোট এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হুণ্ডী ও অনেকটা এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এই নোটে স্বাক্ষরকারীকে লিখিতে হয় যে চাহিবামাত্র আমি এই নোটের বাহককে এই পরিমাণ টাকা দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিতেছি। ইহা কতকটা হ্যাণ্ডনোটেরই মত; তবে হ্যাণ্ডনোটে কোন একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নোট দিবার পর হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিব বলিয়া অঙ্গীকার থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই থাকে না। যে কোন ব্যক্তি এই নোট হাজির করিবে, তাহাকেই ঐ নোটে লিখিত পরিমাণ টাকা দিব এইরূপ অঙ্গীকার থাকে। ইহা অনেকটা প্রাতিভবিক মুদ্রারই মত।

আর এক শ্রেণীর কাগজের মুদ্রা আছে; উহাই হইতেছে আসল কাগজের টাকা। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় conventional paper money অর্থাৎ ব্যবহারিক বা প্রথামূলক কাগজের টাকা বলা যাইতে পারে। এই কাগজের মুদ্রা ভাঙ্গাইয়া আর ধাতুমুদ্রা পাওয়া যায় না। প্রাতিভবিক কাগজের টাকার মূলে যেমন ধাতুমুদ্রা বা ধাতু গচ্ছিত থাকে, নোটের মালিক ইচ্ছা করিলেই উহা ভাঙ্গাইয়া ধাতু মুদ্রা লইতে পারে, সরকারও উহার বিনিময়ে ধাতুমুদ্রা দিতে বাধ্য থাকেন, এ ক্ষেত্রে তাহা হয় না। কোন কোন স্থলে ঐরূপ নোটের উপর লেখা থাকে যে এত প্রচলিত মুদ্রা দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিতেছি, কিন্তু উহা কেবল উহার মূল্য-জ্ঞাপক। সরকার ঐ লিখিত মুদ্রার মূল্যে ঐ নোট চালাইয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার মাত্র করিয়া থাকেন। যে দেশে এই আসল কাগজের টাকা প্রচলিত করা হয়, সে দেশের সরকার সেই দেশের প্রজাবর্গকে জানাইয়া তবে উহা প্রবর্ত্তিত করেন। এই ব্যবহারিক কাগজের মুদ্রা কোন কোন দেশে প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে বা হইয়াছিল কিন্তু কুত্রাপি ইহা সুফল প্রসব করে নাই। সকলেই জানেন যে, ফরাসী বিপ্লবের সময় এইরূপ কাগজের মুদ্রা (assignats) প্রচলিত করা হইয়াছিল। তাহার ফল অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল এবং আর্জ্জেণ্টাইন রিপাবলিকেও ইহার প্রচলনে জনসাধারণের ঘোর অসুবিধা জন্মে।

রুসিয়াতে ইহা চলিয়াছিল। তাহার ফলে তথায় জনসাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কাগজের মুদ্রার প্রবর্ত্তন সাম্যবাদের মত শুষ্কযুক্তি (theory) হিসাবে ঠিক, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার বিনিয়োগ বড় কঠিন—একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শুষ্কযুক্তি (theory) হিসাবে একথা বলা যাইতে পারে যে মুদ্রা মূল্যের নিদর্শন মাত্র। সকলে মুদ্রার সেই নির্দ্দিষ্ট মূল্য মানিয়া লয় বলিয়াই মুদ্রা সর্ব্বক্ষেত্রে বিনিময়সাধনে সমর্থ হয়। আমরা সকলে টাকার মূল্য ১৬ আনা স্বীকার করিয়া লই বলিয়াই ত টাকা ঐ মূল্যের পণ্যের সহিত আত্মবিনিময় করিতে পারে। নতুবা উহাতে যে চাঁদিরূপা আছে তাহার মূল্য কখনও ১০ আনাও হইতেছে, কখনও ১৪ আনাও হইতেছে। কিন্তু তথাপি উহার ছাপের গুণে উহা ১৬ আনারই প্রতিনিধি হিসাবে বাজারে চলে। আমরা টাকা দিয়া ১৬ আনার জিনিষ পাই। যাঁহারা কাগজের টাকা প্রচলনের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন ১০ আনার রূপার উপর সরকারী ছাপ দিয়া যদি উহা ১৬ আনা বলিয়া চালান যায়, তাহা হইলে কাগজের উপর সরকারী ছাপ দিয়া সেই কাগজ ১৬ আনা বলিয়া চালান না যাইবে কেন? মূল্যটা ত আসল ছাপের। যাহার উপর ছাপ দেওয়া হইতে থাকে, তাহার মূল্য ত ধর্ত্তব্য মনে করা হয় না। মূল্যের certificate বা সনন্দ যে কতকটা ধাতুর উপরই দিতে হইবে, কাগজের উপর দিলে চলিবে না ইহার অর্থ কি? যুক্তি হিসাবে ইহাতে কোন দোষই ধরা যায় না। কিন্তু কাজের বেলাই যত গোল ঘটে।

ইহাতে গোল ঘটিবার প্রবল কারণ এই যে, সরকার এই মুদ্রা প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচলিত করিতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছি যে, যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুদ্রা বাজারে চলিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে মুদ্রা শস্তা ও পণ্য মহার্ঘ হইয়া উঠে। গরিব লোকের কষ্ট এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ওলটপালট হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর, ব্রেজিলে ও আর্জ্জেন্টাইন প্রজাতন্ত্র রাজ্যে ইহার প্রচলন ফল সুবিধাজনক হয় নাই, তাহার কারণ, তথাকার সরকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই ভাবের নোট বাহির করিয়াছিলেন। কোনপ্রকার সামাজিক বা আর্থিক ব্যবস্থা করিতে হইলেই মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার কথা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। নতুবা বিশেষ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভবনা। সাধারণ মানুষ কখনই স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিতে পারে না। সুতরাং কোন দেশের সরকারের যদি অর্থের টানাটানি পড়ে, তাহা হইলে তাঁহারা যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাগজের মুদ্রা ছাপিয়া তাহা বাজারে বাহির করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? ইহা করাই ত স্বাভাবিক। ধাতু-মুদ্রায় কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই। কারণ সরকারকে ত বাজার হইতে ধাতু (সুবর্ণ বা রৌপ্য,) কিনিয়া তাহা হইতে ধাতু-মুদ্রা প্রস্তুত করিতে হইবে। সরকার ত ইচ্ছা করিলে যত ইচ্ছা তত বহু মূল্য ধাতু পাইতে পারেন না। অগত্যা তাঁহারা আপনাদের খোস-খেয়াল অনুসারে যত ইচ্ছা তত রজতের টাকা বাজারে বাহির করিতে সমর্থ হয়েন না। কাজেই ধাতু-মুদ্রার টান (demand) অপেক্ষা যোগান (supply) অধিক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আসল ধাতু মুদ্রায় মূল্যের জামিন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। মুদ্রা হিসাবে উহা অচল হইলেও ধাতু হিসাবে উহার একটা মূল্য থাকিয়াই যায়। আমি এখন আকবরী মোহর পাইলে উহা মুদ্রা হিসাবে চালাইতে না পারিলেও পণ্য হিসাবে উহা চালাইতে পারি কিন্তু কোন কাগজের মুদ্রা সম্বন্ধে তাহা করা যায় না। ইহা বড় অল্প অসুবিধার কথা নহে।

মানুষ ভবিষ্যতের জন্য কিছু অর্থ সঞ্চিত রাখে। সকলের পক্ষে সামান্য টাকা ব্যাঙ্কে বা শেভিংস ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখা সম্ভব হয় না। সুতরাং সকলেই কিছু কিছু টাকা বাক্সে পেটরায় রাখিয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় কাগজের মুদ্রা রাখিবার বিশেষ অসুবিধা আছে। ধাতু-মুদ্রায় সে অসুবিধা নাই। মনে করুণ আমি আমার ডেস্কের মধ্যে ৫ খানি ৫ টাকার নোট রাখিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা করিলেন যে ৫ টাকা মূল্যের নোট অত্যন্ত জাল হইতেছে, অতএব উহার প্রচলন রহিত করা হইবে। যাঁহারা অমুক তারিখের মধ্যে কারেন্সি আফিসে আসিয়া আসল ৫ টাকার

নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে নোটের বদলে টাকা দেওয়া হইবে। কিন্তু পরে আর ঐ নোটের বদলে টাকা দেওয়া হইবে না। আমি যদি কোন কারণে ঐ নোট ৫ খানি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাঙ্গাইতে না পারি, তাহা হইলে আমার ঐ ২৫ টাকাই লোকসান। কিন্তু আমি যদি ঐ পাঁচ খানি ৫ টাকার নোট না রাখিয়া ২ খানি সভারেণ রাখিতাম তাহা হইলে আমার এক কপর্দ্দকও লোকসান হইত না।

তবে য়ুরোপের কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এই কাগজের টাকা চালাইবার এরূপ এক ফন্দী বাহির করিয়াছেন, যাহাতে সমাজে কত টাকার প্রয়োজন তাহার একটা হিসাব করা যায়। সেই হিসাব অনুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাগজের টাকা বাহির করিলে আর সেই কাগজের টাকা প্রচলন ফলে মুদ্রা-মূল্যের ইতর বিশেষ হয় না। ইহাকে সমমান পদ্ধতি (isometric system) বলে। নিখুঁত ভাবে এই হিসাব করা বড় কঠিন। দেশে ঠিক কত লোক আছে, প্রত্যেক লোকের কত টাকা হইলে অথবা কত মূল্যের জিনিষ হইলে চ'লে, পণ্য মূল্যের মানরেখা (Price level) কিরূপ স্থানে অবস্থিত, আমদানী-রপ্তানী, বাণিজ্যের বহর প্রভৃতি দেখিয়া কি পরিমাণ নোট বাহির করা উচিত তাহা ঠিক করিতে হইবে। এ সকল হিসাব নির্ভুল হওয়াই কঠিন। সুতরাং এই ভাবে নোট বাহির করিলে ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। অগত্যা এ জটিল বিষয় লইয়া আমি এ স্থানে আর অধিক কথা বলিব না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে দেশের আর্থিক ব্যাপারে দেশের লোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই, যে দেশ পরাধীন অথবা যে দেশের বিজেতা জাতি দেশের সার শোষণে রত সে দেশে কোন মতেই নোট ভাঙ্গাইয়া ধাতু-মুদ্রা পাওয়া যাইবে না এরূপ সর্ত্তে নোট প্রচলিত করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ ব্যবহারিক কাগজের মুদ্রা (Conventional paper money) পরাধীন রাজ্যে চালান কোন মতেই সঙ্গত নহে। ঐ সকল দেশে প্রাতিভবিক কাগজের মূল্য, অর্থাৎ ধাতু-মুদ্রার স্বরূপ নোট চালান যাইতে পারে।

শেষরক্ষা

শ্রীরমেশচন্দ্র শীল বি এল্

এক

রাত্রি তখন অনেক! ঘুটঘুটে অন্ধকার তার উপর ঝুপঝুপ বৃষ্টি! বৃষ্টির শব্দ রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছিল। এইরূপ রাত্রি সাধারণের অতি প্রিয় হইলেও বিরহীদের বড় যন্ত্রণা দেয়! বৃষ্টির শব্দে বাতাসের হাহুতাশ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বিরহী আপনাদের দীর্ঘশ্বাস মিশাইয়া প্রিয়াহীন শয্যায় নিদ্রাহীন-চক্ষে ছটফট করে।

পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটস্থ হোষ্টেলের একটী কক্ষে লোহার খাটে শয়ান আমাদের কুমুদ এমনি সময়ে নিদ্রাহীন চক্ষে সেই অন্ধকার মেঘলা আকাশের পানে চাহিয়াছিল। কুমুদের বিবাহ হইয়াছে মাত্র দেড় বৎসর, সুতরাং নব বিবাহিতের রঙীন স্বপ্ন তখনও তাহার প্রাণমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তার উপর সে বিরহী, সুদীর্ঘ তিন সপ্তাহ ব্যাপী প্রিয়ার বিরহ সে ভোগ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে নিদ্রাদেবী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন তাহা আর বিচিত্র কি! সময়ের মাহাত্ম্যে প্রিয়ার অভাবটী তাহার বেশী রকমেই অনুভূত হইতে লাগিল। তাই বাস্তবপ্রিয়ার পরিবর্ত্তে কল্পনার প্রিয়াকে আনয়ন করিয়া কল্পনানেত্রে তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া

কুমুদ মৃদুকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, "এই নিশীথ রাতের বাদলধারা; স্বপনমাঝে দিশেহারা।" এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাসে নিশীথরাত্রের শুব্ধ কক্ষকে মুখরিত করিয়া তুলিল। পাশের খাটে শয়ান একগৃহবাসী ও সহপাঠী নৃপেন বলিয়া উঠিল "ব্যাপার কি হে?"

একে ত বিরহের জ্বালা, তাহার উপর কৈফিয়ৎ!

কুমুদ রাগতস্বরে বলিল "ব্যাপার যাই হোক এত রাত পর্য্যন্ত জেগে থেকে অপরের গোপনীয় বিষয়ে চোখ রাখা কিন্তু গুপ্তচরের কাজ!"

নৃপেন বলিল "আমি কি আর জেগে ছিলুম! একটা দমকা হাওয়ায় কাঁচা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল! ব্যাপার কি!" ব্যাপারটা যে কি নিশ্চয়ই তাহার অজানা ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়া থাকাই কুমুদের নিকট যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল। কিন্তু নৃপেন ছাড়িবার পাত্র নহে, সে নানারূপ কাল্পনিক সত্য অসত্য গল্প আবিষ্কার করিয়া ঘর ফাটাইয়া হাসিতে লাগিল। কুমুদ মিনতি করিয়া বলিল "ভাই, হাসিটা থামাও, পাশের ঘরের ছেলেরা জেগে উঠবে।"

নৃপেনের হাসির বেগটা একটু কমিলেও থামিল না। কুমুদ রাগিয়া উঠিয়া বলিল "তুই একটা জানোয়ার! একটু সহানুভূতি নেই! তার উপর হাসি! এইসব গোপনীয় ব্যাপারে ইচ্ছা হলেও হাসবি এমন ভাবে যে শুধু শব্দহীন দন্ত বিকাশ হবে মাত্র।"

হাসি থামিলে কুমুদ বলিল "আমি না হয় বিরহের হা হুতাশ করতে ধরা পড়ে গেছি, কিন্তু মহাশয় এতক্ষণ জেগে জেগে করছিলেন কি? সত্যিই ত হাওয়ায় শব্দে কারও ঘুম ভাঙ্গে না! আমারই মত অবস্থা নাকি?"

নৃপেন বলিল "আমাদের ওসব বালাই নেই। সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ী যাচ্ছি! বৃষ্টির শব্দে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল! তারপর এই বিরহের গানের সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাসের পালা! পাগলামী ছেড়ে এখন বাদলার রাতটায় ঘুমিয়ে নে!" বলিয়া নৃপেন পাশ ফিরিয়া লইল ও কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার নাসিকাধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু কুমুদ নিদ্রাহীন চক্ষে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া বৃষ্টির শব্দে নিজের চিন্তাকে ডুবাইয়া দিল। একটী চিন্তা তাহার মনটীকে একটু প্রফুল্লিত করিল, সম্মুখেই মহরমের ছুটি, কয়েকদিনের জন্য বাটি যাইবে; এই দারুণ বর্ষার "বারি ঝরে ঝর ঝর" দিনে আসন্ন প্রিয়াসম্মিলন-সম্ভাবনা কোন বিরহীকে না আনন্দ দেয়!

তখন ভোরের আলো জানালার মধ্য দিয়া ঘরের মধ্যে উকিঝুঁকি মারিতেছিল। কুমুদের মানসনয়নে ভাসিয়া উঠিল আর একখানি চিত্র। এমনি সময়ে সোণার পল্লীর বুকে নিভৃত ভবনের নির্জ্জনকক্ষে রাত্রির অধিকাংশ প্রিয়ার সহিত হাসিগল্পে কাটাইয়া শেষরাত্রে যখন সে নিদ্রায় আচ্ছন্ন, কোকিলের, কুহুতান, দোয়েল পাপিয়ার কাকলী সচকিত করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, প্রিয়ার সহিত দীর্ঘ দিবসের জন্য বিচ্ছেদের সময় আগত প্রায়! কিন্তু সে বিচ্ছেদ কয়েক ঘণ্টার, সে বিচ্ছেদ মিলনের আনন্দকে দ্বিগুণিত করিত।

আর এখন! এখানে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে শুনিতে পায় কাকের কর্কশ চীৎকার, ময়লাফেলা ঠেলাগাড়ীর শব্দ, কলের বাঁশীর শব্দ! দুয়ে কত প্রভেদ!

দুই

এই নৃপেন কুমুদের একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। কলেজে কয়েকটি বৎসর তাহারা একক্লাসে ও একই হোষ্টেলের একঘরে কাটাইয়াছে। নৃপেনের বিবাহ হইয়াছিল যখন সে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। বড় বড় ছুটিগুলা তরুণী পত্নীর সাহচর্য্যে কাটাইয়া যখন সে হোষ্টেলে ফিরিত ও প্রিয়ার বিরহে সেই হোষ্টেল মরুভূমির মাঝে তৃষার্ত্ত পথিকের মত ছটফট করিত তখন কুমুদ ছিল তাহার নিকট সুশীতল ওয়েসিস, কারণ সে তাহার বন্ধুর নিকট হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া, তরুণী পত্নীর সহিত সেই কয়দিনের প্রেমলীলার চিত্রখানি চিত্রিত করিয়া বেশ আনন্দ পাইত। কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া হইত কুমুদের তরুণ প্রাণে;—তাহাদের সোহাগ-ভালবাসার কাহিনী শুনিয়া কুমুদের প্রাণে একটা অভাববোধ জাগিয়া উঠিত, সেই অভাব-পূর্ণ করিতে সে চেষ্টা করিত কল্পনার দেবী তৈয়ারী করিয়া। তারপর একদিন কল্পনার দেবী জীবন্ত হইল। কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়াই হউক কিংবা অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিয়াই

হউক তাহার বিবাহটা একটু শীঘ্রই হইয়াছিল; আই, এ, পাশ করিবার পর তাহার বিবাহ হইল একটি জীবন্ত কল্পনা দেবীর সহিত, অনিমাতে সে তাহার কল্পনার অধিকই পাইয়াছিল; অনিমাকে ভালবাসিয়া, তাহার ভালবাসা পাইয়া কুমুদ জীবনটিকে মধুময় স্বপ্ন বলিয়া মনে করিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন বড় নিষ্ঠুরভাবে ভাঙ্গিয়া যাইত, যখন ছুটির শেষে প্রিয়াটিকে ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে হইত। কুমুদের বাটি কলিকাতা হইতে ট্রেনে কয়েক ঘণ্টার পথ, ঘনঘন বাড়ী যাওয়ার সুবিধা থাকিলেও যাওয়া চলিত না, কারণ কুমুদ দেখিত, ঘন ঘন পাড়ি দিলে বৌদিদিগণের ও বন্ধুবান্ধবদিগের ঠাট্টা করিবার স্পৃহা হঠাৎ তীব্র হইয়া উঠে। তাহাদের তীব্র বাক্যবাণগুলা না হয় সহ্য করা যায়! ঠাট্টার সম্পর্কই ত বটে! কিন্তু বাড়ীর উপর কুমুদের অতিরিক্ত টান দেখিয়া পূজনীয়-পূজনীয়ারা যে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন না তাহা তাঁহাদের মুখভাব দেখিয়া কুমুদের বেশ বোধগম্য হইত! অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ কুমুদের বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহারাই অনুযোগ করিতেন, কলিকাতায় গিয়া কুমুদ কলিকাতার মানুষ হইয়াছে, পল্লীগ্রাম আর ভাল লাগে না ইত্যাদি। এখন তাহাদের সে দুঃখের কারণ না থাকিলেও সন্তুষ্ট যে কেন হয় না, তাহা কুমুদ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না!

তিন

প্রিয়ার মনোরঞ্জনার্থ কয়েকটি উপহার ক্রয় করিয়া একটি সুটকেসে লুক্কায়িত করিয়া কুমুদ আকাঙ্খিত দিবসের অপরাহ্ণে হোষ্টেল হইতে রওনা হইল। সিঁড়িতে পা দিয়াছে, এমন সময় একটি টিকটিকি শব্দ করিয়া উঠিল। কুমুদের প্রথমে খট্‌কা লাগিল, কিন্তু প্রথানুযায়ী কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যাইবারও সময় ছিল না, সুতরাং সে মহাজন বাক্যটিকে অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া লইল—"হাঁচি টিকটিকি বাধা যে মানে সে গাধা।" হায়! তখন ত কুমুদ জানিত না, মহাজনেরা ভুল করেন না, ভুল করে যত অপরিণতবুদ্ধি যুবকেরা!

প্রথমেই সে তাহার প্রমাণ পাইল ট্রামের বিলম্ব দেখিয়া। প্রায় ১৫।২০ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর ট্রাম আসিল, ফলে প্রথম আফিসট্রেনখানি সে ফেল করিয়া বসিল। পরবর্ত্তী ট্রেন দেড়ঘণ্টা পরে। রাত্রি ১০টায় সেই ট্রেণ কুমুদের গন্তব্য ষ্টেশনে পৌছিবে। হঠাৎ যাইয়া অনিমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবার ইচ্ছায় সে পূর্ব্বে কোন পত্র লেখে নাই, ষ্টেশনে কোন লোক থাকিবে না, সেই অন্ধকার রাত্রে কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্যপথে একাকী যাওয়া কুমুদ বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে করিল না। কিন্তু প্রিয়ার জন্য সে সব কষ্টই সহ্য করিতে প্রস্তুত সুতরাং ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সে ট্রেনে উঠিল।

কুমুদ যে কামরাখানি দখল করিয়াছিল তাহাতে যাত্রীর সংখ্যা অধিক ছিল না, ট্রেন একটি জংশন ষ্টেশনে পৌছিলে কামরাখানি একেবারে খালি হইয়া গেল। তখন কুমুদ বেশ আরাম করিয়া একখানি বেঞ্চে শয়ন করিল এবং বোধহয় তাহার প্রিয়ার মুখখানি ধ্যান করিতে করিতেই নিজের অজ্ঞাতসারে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল। একটি ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া শুনিতে পাইল, কুলী হাঁকিতেছে "বাঘমারি, বাঘমারি!" কি সর্ব্বনাশ! বাঘমারি যে তাহার গন্তব্য স্থানের পরবর্ত্তী ষ্টেশন! কোনরূপ চিন্তা করিবার অবকাশ না পাইয়া সে সেই ষ্টেশনেই তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল! ট্রেন ছাড়িয়া যাওয়ার পর সে তাহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, এখানে নামা অপেক্ষা কোন জংশন ষ্টেশনে নামিয়া একরাত্রি সেখানকার ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসাই উচিত ছিল, কারণ এই রাত্রে আর ফিরিবার কোন ট্রেন নাই। এই ষ্টেশনটি নূতন, একখানি লম্বা ট্রেনের কামরা একাধারে টিকিটঘর, ওয়েটিংরুম সকল প্রয়োজন সমাধা করিতেছে। গ্রামও ষ্টেশন হইতে অনেকদূরে! এখন এই বিজন বনে একরাত্রি কোথায় কাটাইবে! কিন্তু সে ভুল তখন সংশোধনের অতীত। অনন্যোপায় হইয়া কুমুদ ষ্টেশন মাষ্টারের শরণাপন্ন হইল। তিনি অতিশয় বিনয় প্রকাশপূর্ব্বক গ্রামের পথ দেখাইয়া দিলেন, কারণ তাঁহার কোয়ার্টারে তাঁহারই সপরিবারে থাকিবার স্থান সঙ্কুলান হয় না, তাহাকে আশ্রয় দিবেন কোথায়? ষ্টেশন ঘরে? সেখানে আশ্রয় দেওয়া

তিনি নিরাপদ্ বিবেচনা করেন না, যেহেতু সম্প্রতি নিকটবর্ত্তী একটি ষ্টেশনে ডাকাইতেরা ষ্টেশনঘর হইতে সিন্দুক উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। কে বলিতে পারে, তাহারই বা কোন মন্দ উদ্দেশ্য নাই! আর একটা আলো তিনি অনায়াসেই দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা ফিরিয়া পাইবার স্থিরতা কি? মাষ্টার মহাশয়ের আতিথেয়তায় কুমুদ মুগ্ধ হইয়া গেল! এখন উপায় কি! তাহাদের গ্রাম সেই ষ্টেশন হইতে তিন চারি ক্রোশের পথ! সেখান হইতে পদব্রজে যাওয়া, বিশেষ অন্ধকারে একেবারেই অসম্ভব। সেই গ্রামে আশ্রয় পাওয়ার আশাও যে দুরাশা তাহা মাষ্টার মহাশয়ের শিষ্টাচারে বেশ বোধগম্য হইল! একটী উপায় সে দেখিতে পাইল যে যদি গ্রামে যাইয়া একখানি গোযান সংগ্রহ করিতে পারে! তাহাহইলে হয়ত.........

নবীন উদ্যমে কুমুদ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম্যপথ ধরিয়া চলিল। কোথায় বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়সম্মিলন আর কোথায় শৃগালের উচ্চ-চীৎকার শুনিতে শুনিতে প্রতিমুহূর্ত্তে সর্পাঘাতের আশঙ্কায় কণ্টকিত দেহে অন্ধকারময় গ্রাম্যপথে গমন। কুমুদ ভাবিল, দুয়ে কত প্রভেদ!

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল পাশের ঝোপের মধ্যে খসখস শব্দে। তারপরই হঠাৎ কয়েকজন তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত দুখানি ও ঘাড়টি চাপিয়া ধরিল ও তৎসঙ্গে সরব আস্ফালনের সহিত তাহার মস্তকে ও পৃষ্ঠে ঘুঁসিকা ও চাটিকা বর্ষণ হইতে লাগিল। আক্রমণকারিদিগের হস্তস্থিত "আঁধারে আলো"র ক্ষীণ আলোকে কয়েকটি বর্ষার সুতীক্ষ্ণ ফলক কুমুদের চক্ষুর সম্মুখে ঝকমক করিয়া উঠিল, তৎসঙ্গে সে কি বিকট উল্লাস,—"ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে!.........."

ধরা যে কে পড়িল ও কি জন্য পড়িল, কুমুদ তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু পরিষ্কারভাবেই বুঝিল যে, সে ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছে। কিন্তু এতদিন যে ধরণের ডাকাইতের কথা উপন্যাসে ও খবরের কাগজে পড়িয়াছে, ইহারা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন! ইহারা "হুররে" দেয়, খাকী হাফপ্যাণ্ট, খাকীর জামা পরে, প্রত্যেকের হস্তে সুদীর্ঘ বর্ষা, কয়েকজনের হস্তে এক একটি "আঁধারে আলো!" স্বদেশী ডাকাইতেরা অনেকটা এই ধরণের হওয়া সম্ভব, কিন্তু তাহারা দরিদ্র পল্লীতে কি লাভের আশায় আসিবে!

কিন্তু কুমুদ ভাবিল, ডাকাত যে প্রকৃতিরই হউক, উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ তাহার নিকট যাহা কিছু আছে হস্তগত করা! সেই কারণে বিনীতভাবে সে বলিল "দেখুন মশায়রা, আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই, যা আছে তাই নিয়ে আমায় যেতে দিন!" একজন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ঘুস! ঘুস! বেটা আমাদের ঘুষ দিয়ে সরে পড়তে চায়! ওহে চন্দর, এ একটা মস্ত প্রমাণ হয়ে রইল, সাক্ষী দেবার সময় কাজে লাগবে!"

কুমুদ দেখিল, ইহা একেবারেই হেঁয়ালী! ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতূহল হইলেও কথা বলিলে পাছে আবার তাহা তাহার বিরুদ্ধে মস্ত একটা প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায় সেই ভয়ে সে চুপচাপ তাহাদের সঙ্গে চলিল।

চলিতে চলিতে একজন কুমুদের মুখের সামনে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া রসিকতা করিয়া বলিল "ওহে মিত্তির, ব্যাটার চেহারাখানার বাহার দেখেছ একবার! আবার একখানা চশমা ঝুলিয়েছে! ওসবে আর ভুলছিনে চাঁদ! সেবার বড় বোকা বানিয়েছ! এবার ঘানি না টেনে যাও কোথা!" কুমুদ মনে মনে বলিল, ঘানি কাহাকে টানিতে হয় তাহা পরে দেখা যাইবে!

একজনের লক্ষ্য পড়িল কুমুদের হস্তস্থিত সুটকেসের উপর। মহা উৎসাহে সে চীৎকার করিয়া উঠিল "আর যায় কোথা! এবার বামালশুদ্ধ ধরা পড়েছে! দাও ত হে বাছাধন চাবীটা!........."

কুমুদ দেখিল, মজা মন্দ নয়, একেবারে উল্টা চাপ, তাহাকেই চোর বানাইতে চায়! প্রতিবাদে কোন ফল হইবেনা বুঝিয়া সে নিরুত্তর রহিল, চাবীটা দিতে সে মনক্ষুণ্ণ হইল, প্রিয়ার্থে ক্রীত উপহারগুলার কি দুর্দ্দশা হইবে এই আশঙ্কায় কিন্তু না দিলেও সুটকেসটি অভগ্ন থাকিবে না!

সুটকেসের ভিতরের জিনিষগুলা দেখিয়া তাহারা হতাশ হইল; তাহারা আশা করিয়াছিল, হয়ত চুরি করিবার

সরঞ্জাম ছোরা সিঁধকাটি ইত্যাদির সন্ধান পাইবে। একজন মন্তব্য প্রকাশ করিল "এটি নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোকের জিনিষ, ভদ্রলোকটি কত আশায় এগুলা নিয়ে যাচ্ছিলেন, উপযুক্ত পাত্রে দান করে কত আনন্দই পেতেন, ব্যাটা তাঁর বড় আশায় ছাই দিয়েছে!" সকলে বিকট শব্দে হাসিয়া উঠিল। কুমুদ দেখিল, ডাকাইতগুলার রসজ্ঞানও আছে, এই জিনিষগুলা ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ কাহাকে দেয়, সে খবরও তাহারা রাখে!

একজন বলিল, "ওহে ভট্চাজ, গভর্ণমেণ্টের পুরস্কার তাহলে কে পাচ্ছে!" "আগে কে ধরেছে?"......উত্তরে তিন চার জন একযোগে চীৎকার করিয়া উঠিল "আমি ধরেছি!" এই ব্যাপার লইয়া তুমুল তর্ক চলিতে লাগিল। একজন বলিল "আমি আগে দেখেছিলুম!" একজন বলিল "আমি আগে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিলুম!......" একজন বলিল "আমি হাতদুটা চেপে না ধরলে কখন সরে পড়ত!......" মোটের উপর কোন মীমাংসাই হইল না, তবে রহস্যটি ক্রমে ক্রমে কুমুদের নিকট পরিষ্কার হইতে লাগিল। কিন্তু এই গোলমালে সে নিজের স্বপক্ষে একটি কথাও বলিবার অবকাশ পাইল না।

গ্রামের মধ্যে দলবল পৌঁছিলে ঘন ঘন হুইসেল বংশীধ্বনি হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে "রে, রে" শব্দ! সেই ভীষণ চীৎকারে অনেকেই জাগিয়া উঠিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। উত্তরে সকলে একযোগে চীৎকার করিয়া উঠিল "চোর ধরেছি! চোর ধরেছি!" একটি দ্বিতল গৃহের নিকট আসিয়া তাহারা "রামধনবাবু, রামধন বাবু" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাট্কলেবর রামধনবাবু কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিয়ে আসিলেন। সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল "চোর ধরা পড়েছে, চোর ধরা পড়েছে!"

রামধনবাবু চোর দেখিবার আশায় চারিদিকে একবার তাকাইয়া বিরক্তভাবে বলিলেন "কোথায় হে তোমাদের চোর!" একজন কুমুদকে ঠেলিয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করিল। রামধনবাবু একটা বিরাট্ হাই তুলিয়া বলিলেন; "আলোটা তুলে ধর ত হে।.........ছোকরাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে,.........আরে ছ্যা ছ্যা, তোমরা করেছ কি, এযে বামনগাছির হরিপদ মল্লিকের ছেলে, কলকাতায় কলেজে পড়ে, তাকে তোমরা চোর বলে ধরেছ! যাও, যাও, খুব বাহাদুরী হয়েছে!......কিছু মনে কোরনা বাবা, ওরা একটা মস্ত ভুল করে বসেছে! আর ওদেরই বা দোষ কি? তুমিই বা এ সময় এখানে কি করে এলে।"

এতক্ষণে কুমুদ রামধনবাবুকে চিনিল, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে সে তাহাদের বাটিতে দুই একবার দেখিয়াছে, বৈষয়িক সূত্রে তাঁহার সহিত কুমুদের পিতার বিশেষ আলাপ আছে।

কুমুদ এখানে আসিবার কারণ সংক্ষেপে বলিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল "আমি কিন্তু ওদের সোজায় ছাড়ব না, প্রত্যেকের নামে criminal case আনব। সকলের নামগুলা বলুন ত, আমি নোট করে নিই!"

চন্দরমিস্ত্রির ভট্চাজের দল তখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার দেখিয়া গভর্ণমেণ্টের পুরস্কারের আশা ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। রামধনবাবু তাহাদের এইরূপ ব্যবহারের কৈফিয়ৎ স্বরূপ ব্যাপারটি কুমুদকে বুঝাইয়া দিলেন। কিছুদিন হইতে সেই অঞ্চলে চোরের উপদ্রব হইতেছে, সেইজন্য গ্রামের ছেলেরা গভর্ণমেণ্টের সনন্দ লইয়া ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করিয়া গ্রাম পাহারা দিতেছে। কিন্তু তথাপি চোরের উপদ্রব কমে নাই। এই কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ভদ্রপরিচ্ছদধারী লোক রাত্রের ট্রেনে নামিয়া এক গৃহস্থের বাটি অতিথি হয়, সেই রাত্রেই সেই গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হয় এবং তৎপরদিন প্রাতে সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেই কারণে কয়েকদিন হইতে ভলাণ্টিয়ারেরা ষ্টেশনের পথে ঘাঁটি বসাইয়াছে এবং সেই কারণেই কুমুদকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

ব্যাপারটি এতক্ষণে কুমুদ সম্পূর্ণরূপে বুঝিল। তখন তাহার স্মরণ হইল কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিয়াছিল বটে। তখন কুমুদের রাগের পরিমাণও কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিল, একটা উপকারও তাহারা করিয়াছে, এই অন্ধকার রাত্রে পথ দেখাইয়া একটি পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ী

পৌঁছাইয়া দিয়াছে। হয়ত এই অন্ধকারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়া প্রাণ হারাইতে হইত! কিন্তু ঘুঁসিকা-চাটিকার কথা মনে পড়িতেই পুনরায় ক্রোধের উদ্রেক হইল। এই ঘুঁসিকা-চাটিকা হজম করিবার অভ্যাস তাহার কোন কালেই ছিল না, স্কুলে সে নিতান্ত খারাপ ছেলে ছিল না।

তিক্তকণ্ঠে কুমুদ বলিল "তা বলে কি এরকম কাণ্ড-জ্ঞানহীনের মত কাজ করবে! একটা লোক দেখলে বুঝবে না যে, এ লোকটা চোর কি ভদ্রলোক! আমি কিছুতেই ছাড়ছি নি, দেখে নোব শা......দের।"

যাহা হউক বাদানুবাদে বৃথা কালক্ষেপ করা কুমুদ তাহার স্বার্থের পক্ষে হানিজনক মনে করিল। কারণ তখন রাত্রি সাড়ে এগারটা, একখানি গোযান সংগ্রহ করিতে পারিলে সেই রাত্রেই বাটি পৌঁছিতে পারে। সুতরাং ক্রোধসংবরণ করিয়া কুমুদ রামধনবাবুকে একখানি গোযান সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। রামধনবাবু অতিশয় আন্তরিকতার সহিত বলিলেন—"তা কি হয় বাবা! এই রাতে কি তোমায় ছাড়তে পারি! তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু! তুমি কলকাতায় থাক, তাই আমাকে বেশী দেখনি! রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালের ট্রেনে ফিরে যেও।"

তাঁহার এই আতিথেয়তায় কুমুদ মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না অথচ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গ্রামের লোকের আতি-থেয়তার অভাব দেখিয়া সে দুঃখিত হইয়াছিল। রামধন বাবুর প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া গোযানের জন্য চেষ্টা করিতে বলিল। রামধনবাবু জানিতে চাহিলেন, এখানে থাকিবার বাধা কি; এতরাত্রে বাটী যাইয়াই বা কি হইবে। কিন্তু বাধা কোথায় তাহা তরুণ কুমুদ প্রৌঢ় রামধনবাবুকে বুঝাইতে পারিল না, তবে এই রাত্রে বাটী যাওয়া চাইই, ইহা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল। অগত্যা রামধনবাবু গোযান সংগ্রহ করিতে লোক পাঠাইয়া তাহার জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। দারুণ ক্ষুধার সময় এই ব্যবস্থা তাহার মন্দ লাগিল না।

* * * *

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, ইহাই জগতের চিরন্তন নিয়ম। আমাদের কুমুদের ক্ষেত্রেও সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। গভীর রাত্রে বাটী পৌঁছিয়া কুমুদ মাতার নিকট সংক্ষেপে ব্যাপারটী (অবশ্য ঘুঁসিকা-চাটিকার কথা বাদ দিয়া) বলিবার পর কাতরভাবে জানাইয়াছিল, হাত পা ভয়ানক কামড়াইতেছে, কারণ এতখানি পথ গরুরগাড়ীতে আসিতে হইয়াছে! বুদ্ধিমতী মাতা সেই রাত্রেই কুমুদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রসময় লাহা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, বি এ, সাহিত্যভূষণ

কবিবর রসময় লাহা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, বন্ধু-বান্ধবদের কাঁদাইয়া, বঙ্গভারতীর কুঞ্জকাননের এক অংশ খালি করিয়া গত ৬ই ডিসেম্বর সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র একজন বিখ্যাত হাস্যরসিক কবি ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, সদালাপী, সরল রহস্যপ্রিয় সাত্ত্বিক পুরুষ বিরল। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের কতখানি স্থান খালি হইল তাহা সুধী-সাহিত্যিক-গণের বিবেচ্য। কবিবরের সহিত আমার পরিচয় আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল। এই কয় বৎসরের ভিতর আমি তাহার যে দেবত্বমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহাই এখানে শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিব।

১৩৩১ সনে আমি 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' "হাস্যরসিক রসময়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধটীতে আমি রসময়বাবুর হাস্যরসের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। সে সময় পর্য্যন্ত কবির সহিত আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রবন্ধটী বাহির হইবার চারি পাঁচদিন পরে একটী রেজেষ্ট্রী প্যাকেট ও একখানা চিঠি আসিয়া উপস্থিত। কবিবর আমাকে তাঁহার সমুদয় কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়া লিখিয়াছেন "তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে তুমি আমাদের স্বজাতি সুবর্ণবণিক। স্বজাতি লেখক বা পাঠক কর্ত্তৃক আমার কাব্যগ্রন্থ কোন দিনই আদৃত হয় নাই। সেই জন্য অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিলাম যে, লেখক সুবর্ণ-বণিক্ তখন একটু আশ্চর্য্য হইলাম। তুমি অবশ্য অবশ্য আমার সহিত একবার দেখা করিবে। তোমার সাদর আহ্বানের জন্য আমার গৃহদ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিল।" দুই মাস পরে তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। সাত নম্বর বাটী অনুসন্ধান করিয়া প্রবেশ করিতেই দেখি একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে দেহ ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। মুখমণ্ডল প্রতিভাব্যঞ্জক কিন্তু ঈষৎ বিষাদ-ক্লিষ্ট, শুনিলাম ইনি কবি রসময়। চরণে প্রণত হইতেই হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন "তোমার জন্যই বাহিরে বসে আছি। ভিতরে এস।" তাঁহার পাঠকক্ষে বসিয়া আলাপ আরম্ভ হইল। তিনি তাঁহার 'পরিহাস' কাব্যের পাণ্ডুলিপি হইতে কবিতা পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিবারের সমস্ত লোকের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। সদর হইতে একেবারে অন্দরে লইয়া গেলেন। কবির নিকট গৃহের বা মনের সদর-অন্দর ছিল না। আমি যেন তাহার কত কালের পরিচিত আত্মীয়-বান্ধব। কলিকাতার ধনি-সমাজের সুবর্ণবণিক সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু রসময়বাবুর সহিত পরিচয় হইবা মাত্র আমার সেই ধারণা অলীক হইয়া পড়িল। আমাকে আহারে বসাইয়া কত আদরে খাওয়াইতেন, পিতৃপ্রতিম ভালবাসা লইয়া তিনি আহারের সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিতেন। মা এবং ভাইরা আমাকে যে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা মনে পড়িয়া আমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছে। হায় আজ তাঁহাদের স্নেহের মায়া কাটাইয়া তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন? বিদায়কালীন আমাকে একখানা বৃহৎ মূল্যবান আয়না উপহার দিয়া স্বহস্তে আয়নার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলেন—

"সাম্‌নে এসে দাঁড়াও যদি
বুকে করে লই।
পিছে কিন্তু থাক্‌লে আমার
আমি তোমার নই।"

আয়না উপহার দিয়া আমাকে বলিলেন—"দেখ, আমার কাঁচের দোকান—আয়নার কারবার। আয়না উপহার দেওয়াই আমার পেশা। দ্বিজেন্দ্রলালকে, ললিত মিত্রকে, সাধ্বী সৌদামিনীকে ও অনেক বন্ধুকে আমি এই আয়নাই উপহার দিয়াছি।"

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কবিবরের পত্র প্রতি সপ্তাহে পাইতাম। পত্রের ছত্রে ছত্রে তাহার স্নেহ অনুরাগ ঝরিয়া পড়িত। 'কবিতা পড়ে বুঝবে যেমন কবি যেমন নয়গো'—ইহা তাঁহার পক্ষে প্রযোজ্য নহে। তিনি কবির মতই আত্মভোলা, সদানন্দময়। ইহার কিছু পরে তাঁহার 'ঋতুলীলার' বিস্তৃত আলোচনা সুবর্ণবণিক সমাচারে প্রকাশ করি। এই প্রবন্ধ পড়িয়া স্বজাতিগৌরব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে মহাশয় আমাকে চুঁচুড়ায় বলিয়াছিলেন "আমাদের স্বজাতির মধ্যে দুইজন কবি হইয়াছেন। একজন 'এবার' অক্ষয়কুমার, অন্য 'আমোদ'-'আরামের' রসময়। তাঁহাকে কেবল জানিতাম পরিহাসরসিক কবি বলিয়াই, কিন্তু আপনার আলোচনা পড়িয়াও তাঁহার ঋতুলীলা কাব্য ভালভাবে পাঠ করিয়া তাঁহার কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হইলাম।" সত্যই রসময় বাবুর 'ঋতুলীলা' ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'ঋতুমঙ্গল' বাংলা সাহিত্যে অমূল্য রত্ন। কেবল এই কাব্য লিখিয়াই রসময় কবিখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন।

রসময়বাবুর বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছি। কত আদরে তিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সকল সময় তাঁহার সহিত কাব্য আলোচনা হইয়াছে। রুগ্ন অবস্থায় তিনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন না। দ্বিতলে শয়নকক্ষে থাকিতেন। আমি আসিলে নিজে আমাকে ডাকিয়া লইয়া নূতন লেখা কবিতা পড়াইয়া শুনাইয়া আমার ন্যায় অক্ষম লোকেরও অভিমত চাহিতেন।

'কবিবরই' আমাকে 'সনাতন' পদাবলী (সুবর্ণবণিক-সমাচারে যাহা বাহির হইয়াছে) লিখিতে উৎসাহিত করিয়া পুস্তকের নামকরণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত বসু, ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর, বিখ্যাত জীবন-চরিতকার মন্মথ ঘোষ, জলধর সেন, নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতির সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছিলেন।

তিনি আজ নাই। আর তাঁহার সরল পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তিনি ছিলেন আমার 'friend, philosopher and guide'. তাঁহার স্নেহমণ্ডিত প্রীতি-প্রফুল্ল মূর্ত্তি আমার অন্তরের অন্তরে চিরকাল প্রোজ্জ্বল থাকিবে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে আমাকে পত্র দিয়া জানাইয়াছিলেন "চিঠি লিখ্‌তে পারি না। হাত কাঁপে বড়। হাত চিরবিদায় চাইছে। আমাকে যে শীঘ্রই পাততাড়ি গুটাইতে হইবে হাত তাহাই জানাচ্ছে। একবার এসে দেখা করো।" কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় শেষ দেখা দেখিতে পারিলাম না।

তাঁহার জীবনীর জন্য আমি অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি আমাকে তাহার জীবন-কথা অনেক বলিয়া গিয়াছেন। তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। তিনি নিজেই বলিতেন—"সাংসারিক জীবন-কথার চেয়ে কাব্য আলোচনাই কবির শ্রেষ্ঠ জীবনী। যদি তুমি পার তবে সেই চেষ্টা করিও—যদিও আলোচনার যোগ্য কিছুই আমি রাখিয়া যাইতে পারিব না।" বারান্তরে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শোকতপ্তহৃদয়ে আজ এখানে বিদায় লইতেছি।

দেব-দর্শনান্তে

শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত

শুনি ভাগবতে নাথ, তোমার লীলার কথা
অতীতের স্মৃতিচয় প্রাণে উপজিলে ব্যথা!
মনে হ'ল—ছিল দিন যবে তুমি নারায়ণ,
নররূপে এজগতে করেছিলে বিচরণ;
খেলেছিলে কত খেলা কত ভাবে হ'য়ে ভোর,
প্রেমবশে হ'য়েছিলে গোপিনীর মনচোর;
রাখাল বালক সনে সখাভাবে গলাগলি,
দাস হ'য়ে পূজেছিলে শ্রীমতীরে বনমালি!
বহিলে নন্দের বাধা বাড়াতে ভক্তের মান;
যশোদার নীলমণি হ'য়েছিলে ভগবান!
কংস আদি দুষ্ট দৈত্য হেলায় করিয়া নাশ
ধরাভার অপনীত করেছিলে শ্রীনিবাস!
উদ্ধব, অক্রূর আদি ভকতের মনোরথ
পরিপূর্ণ করে'ছিলে জেনে মনে অনুগত;
করে'ছিলে কত ভোগ রাজা হ'য়ে মথুরায়,
রেখেছিলে কত কীর্ত্তি অনুপম এধরায়;
প্রভাসে বিরাট্ যজ্ঞ করে'ছিলে অনুষ্ঠান;
যজ্ঞেশ্বর হ'য়ে তুমি কারে পুজ ভগবান?
পাপের করিয়া নাশ পুণ্যের বাড়ালে মান,
যুধিষ্ঠিরে দিয়েছিলে ইন্দ্র হ'তে উচ্চে স্থান!
হায়রে, কালের গর্ভে সকল (ই) হ'য়েছে লীন;
বল মোরে দয়াময়, কোথা আজি সেই দিন?
কত বর্ষ, কত যুগ, মরি, কত যুগান্তর
একে একে গে'ছে কেটে'; কত দৃশ্য, দৃশ্যান্তর;
সেই দিন যেদিনেতে তুমি কৃষ্ণ রূপ ধরে
করে'ছিলে ননীচুরি বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে!
হ'য়ে গেছে লীলা সাঙ্গ—পড়ে আছে লীলা-স্থল;
নাহি ব্রজেশ্বর আজি—শূন্য সে ব্রজমণ্ডল!
তুমি আজি নাহি দেব, আছে শুধু তব নাম;
কৃষ্ণচন্দ্র নাহি আজি—আছে বৃন্দাবনধাম!

স্মরিলে সে সব কথা আজি বুক ভেসে যায়,
নয়নের জলে—হৃদে উচ্চ রব 'হায়, হায়'!
নাহি সে গোপিনীকুল, আছে শুধু পদরজ;
বাজেনা শ্যামের বাঁশী—অন্ধকার আজি ব্রজ!
কি হ'বে কাঁদিলে মিছা, কি উপায় আছে আর—
যুগল মুরতি মরি, রাধাকৃষ্ণ হেরিবার?
যা' গিয়াছে ফিরিবে না—তা'র তরে বৃথা ক্লেশ;
দেখে আসি আজ (ও) সেথা যাহা আছে অবশেষ!
তা'ই গিয়াছিনু ছুটে' দেখিতে সে পুণ্যধাম—
আকাশে, বাতাসে যা'র মাখা আছে তব নাম!
সেথায় পবিত্র রজে লুটিয়া পড়িনু যবে,
মনে হ'ল নাহি মোর কিছুই বাঁধন ভবে!
মধুর অমিয়-ধারে ধু'য়ে গেল মন-প্রাণ,
সকল জ্বালার যেন হ'য়ে গেল অবসান!
পাপের কালিমাটুকু মুছে গেল একেবারে,
ঝরিল নয়ন-জল অবিরল শতধারে!
যত দেবমূর্ত্তি সেথা করিলাম দরশন—
তোমার যতেক দেব, লীলাস্থল অগণন!
মহাপুরুষের কত হেরিনু সমাধি-স্থান—
যুগান্তের বৃক্ষলতা—পত্রপুষ্প ফলবান্!
একে একে কত ঠাঁই ভ্রমিলাম কতদিন;
মনে হল' 'একা কৃষ্ণ বিনে সব প্রাণহীন'!
যমুনার 'দশা হেরে' রহিতে নারিনু আর—
সে বারিতে মিশাইনু নয়নের বারিধার!
কত প্রশ্ন হৃদিমাঝে উদয় হইল মোর,
জিজ্ঞাসিনু তটিনীরে ভাবেতে হইয়া ভোর—
"এখন (ও) পারনি কিগো, ভুলিতে কালার মায়া,
তাই বুঝি স্রোতস্বিনি, মনোদুঃখে ক্ষীণকায়া?"
নিজ মনে কুলুতানে গাহিয়া শোকের গান
ছুটিতেছ প্রবাহিনী বিষাদেতে ম্রিয়মাণ!"

দিল না উত্তর কিছু—সাধ্যবুঝি—নাহি তার
প্রাণের গভীর জ্বালা বচনেতে জানাবার !
কিবলিয়ে বুঝাইব বুঝিতে নারিনু হায়— !
তবুও বলিনু ডাকি 'সান্ত্বনা দানিতে তায়,'—
"কিআর হইবে বল, ভাসিলে নয়ন জলে ?
আরনা আসিবে কালা ফিরিয়া তোমার কূলে।"
নাহিজানি উচ্ছ্বাসিত বাণী মোর সান্ত্বনার
পশিল কি না পশিল শ্রবণেতে যমুনার !

না পারিনু কোন মতে দাঁড়াইতে সেথা আর—
ছুটিয়া চলিনু বুকে লয়ে ভার বেদনার !
শ্যামকুণ্ডে, রাধাকুণ্ডে, মথুরা—বিশ্রাম ঘাটে—
গোবর্দ্ধনে, নিধুবনে, কেশীকূলে, বংশীবটে—
যে খানেতে গেনু ধে'য়ে-সেখানেই হাহাকার ;
সকল (ই) অসার হায়, বিহনেতে সারাৎসার !
আছে শুধু জ্বালাময়ী স্মৃতির করুণ গান ;
হ'য়ে গে'ছে চিরতরে লীলা তব অবসান !

জীব-জীবনের ক্রমবিকাশের গল্প

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

পৃথিবীর জন্মের সঙ্গে যে "অণোরনীয়ান্" জিনিষটি এক কণা প্রাণের স্পন্দন বুকে নিয়ে হেথায় এসেছিল, তাকে ভবিষ্যৎ মানবজীবনের স্রষ্টা বা পূর্ব্বপুরুষ বলে' স্বীকার না কর্লে'ও তার থেকেই যে সূত্রপাত এ কথা উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। পৃথিবী—সবিতার নিকট হ'তে এমন কতকগুলি উপাদান এনেছিলেন, যাতে করে' ঐ ছোট্ট আদি প্রাণীটির প্রাণ-সঞ্চার সম্ভব হয়েছিল,—কতকটা যেমন গরীব স্বামীর বধূ প্রসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর মায়ের নিকট হ'তে আসন্ন সন্ততির জন্যে কাঁথা বালিশ থেকে দুধের ঝিনুকটি পর্য্যন্ত আপন বাক্সের মধ্যে সযত্নে গুছিয়ে আনেন্। সূর্য্যদেব কিরণ দিতে লাগলেন বলেই আদি জীবের জীবন রক্ষা হ'তে লাগল, এবং শুধু জীবন রক্ষা নয়, তার ক্রম-বিকাশ হতে লাগল—যেমন করে' সূর্য্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যমুখী ফুলটি ধীরে ধীরে তার পাঁপড়িগুলি মেলে দিতে থাকে। ওরই কল্যাণ-করের প্রভাবে নবজাত পৃথিবীর কতকগুলি পদার্থ এমন একটা গত্যাত্মক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠ্‌ল যে তারা জীব-জীবনের স্থূল লক্ষণ প্রকাশ করে' ফেল্ল।

'জীবতত্ত্বের অ-আ' শীর্ষক প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা বলেছি যে, প্রাণী-সৃষ্টির আদিতে একটি কোষাণু সমন্বিত জীবাণুর অস্তিত্ব মাত্র থাকে। ঐ জীবাঙ্কুরই আত্মজ (protozoa) হয়ে জীবনাভাসের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে; তারপর ধীরে ধীরে পশ্চাদজে (metazoa) পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বয়স যতদিন, এই এক কোষাণু সমন্বিত জীবের অস্তিত্বও প্রায় ততদিন। মোটামুটি হিসাবে বলতে পারা যায়, পৃথিবীতে জীব-জীবনের সূত্রপাত হয়েছে প্রায় একশ' নিরনব্বই কোটি নব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্ব্বে।

এক-কোষাণুময় জীবাণু কেমন করে' বংশ বৃদ্ধি করে, তা' বোধ হয় আপনারা জানেন্। এদের প্রত্যেকটি একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে' দুটি স্বতন্ত্র সত্তার সৃষ্টি করে; ঐ দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে আবার ষোলটি এবং এমনি করে' অসংখ্য আণবিক জীবাণুর বৃদ্ধি চলেছে। এদের জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধির অনুকূল আবেষ্টনী নির্ম্মিত হয়—মোটামুটি রকমের উত্তাপ, আর্দ্রতা, বাতাস ও খাদ্যের দ্বারা।

আটপৌরে ভাষায় বল্‌তে গেলে বলা চলে যে, পৃথিবীর

ছোট বড় সকল প্রাণীকেই বাঁচতে হ'লে—খেতে হবে, নিশ্বাস ফেল্‌তে হবে, নচেৎ মৃত্যু! প্রত্যেক জীবের দেহের একটা ক্ষুদ্রতম বিন্দুতেই হোক্ বা বৃহত্তম অংশেই হোক্—একটা পেট, আর একটা ফুসফুস-যন্ত্র থাকা চাই। ঐ উদর বা আশয় বা খাদ্য হজম করবার থলির মধ্যে আমাদের সকলেরই জীবনের আলোর তেল্-সলিতা সঞ্চিত রয়েছে। উচ্চতর প্রাণীকুলের মধ্যে আর একটা কি সাধারণ সামগ্রী দেখ্‌তে পাওয়া যায়? তাদের প্রত্যেকেরই আছে এমন একটা ক্রিয়াশীলতা বা গতিশক্তির কলকৌশল—যাতে করে' তারা আহার্য-দ্রব্য সংগ্রহ কর্‌তে অথবা সন্নিকটে থাকলে তাকে আপনার মধ্যে টেনে নিতে পারে।

মানুষ এবং কাঁকড়ার মধ্যে উদর নিয়ে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য হচ্ছে—ঐ ক্রিয়াশীলতার কলকৌশল নিয়ে! দুয়ের মধ্যে এতখানি পার্থক্য যে, মানুষ কাঁকড়াকে ধ'রে উদরসাৎ কর্‌তে পারে। কাঁকড়া বড় জোর মানুষের একটা আঙ্গুল আঁকড়ে ধর্‌তে পারে, তাও আবার মানুষ যদি আঙ্গুলটা তার কাছে আমন্ত্রণজনকভাবে এগিয়ে নিয়ে আসে। এই ক্রিয়াশীলতার গণ্ডী ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ জীবের মধ্যে বৃহৎ এবং মানুষের মধ্যে এসে বৃহত্তম হয়েছে। তা'ছাড়া মানুষ এবং স্তন্যপায়ী প্রায় সকল জীবজন্তুই প্রকৃতির বাঁধা-ধরা ক্রিয়াশীলতার সীমা অল্প-বিস্তর অতিক্রম করে' নূতন নূতন কর্ম-প্রচেষ্টার সৃষ্টি করতে পারে। এই গুণটাকে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি বলে' অভিহিত কর্‌তে পারি। এবং এই বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাভাবিক ক্রিয়া-পদ্ধতির মূলে যে আমাদের মস্তিষ্ক ও নাড়ীতন্ত্র রয়েছে, তা বোধ হয় আপনাদের বুঝতে বাকী নেই।

প্রাণী-রাজ্যের সজীব দেহের ইতিহাস মোটামুটি এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিবেচিত হয়;—খাদ্য লাভের প্রচেষ্টা, পরের দ্বারা ভক্ষিত না হবার প্রচেষ্টা এবং আপনার স্থিতি-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। উচ্চ নীচ সকল প্রাণীরই জীবন ধারণ করবার প্রয়াস ও পদ্ধতি মূলতঃ এক রকমের; তবে ব্যবহারতঃ ভিন্ন বোধ হয় এবং ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে প্রয়োজন মত ইতর-বিশেষ হয়।

জীবনের ঐ তিনটি উদ্দেশ্যকে সফল হ'তে সফলতর, পূর্ণ হ'তে পূর্ণতর করবার জন্যই প্রকৃতিকে ক্রম-বিবর্তন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'য়েছে। প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিক-দের চোখ্ নিয়ে দেখ্‌লে বুঝা যায় যে, বিশ্বটা প্রকৃতি দেবীর ঠিক খেলাঘর নয়, তাঁর সৃজন-লীলাটি ঠিক খেয়াল নয়। জীব-জীবন অসংখ্য রকমের কলেবর নিয়ে পরীক্ষা করেছে।...এলোমেলো ভাবে ছড়ানো এক কোটি খানেক বিভিন্ন আকার প্রকারের জুতোর মধ্যে একটা মানুষকে ধরুন্ ছেড়ে দিয়ে বলা হয়েছে—তোমার পছন্দমতো মাফিক-সই এক জোড়া জুতো বেছে নাও। তার পায়ে কোনোটা বড়, কোনটা ছোট হচ্ছে, কোনোটা পছন্দ হচ্ছে না—এম্‌নি করে' সে পায়ের জুতো বেছেই চলেছে।...জীবনটাও নানা আকার-প্রকারের দেহ নিয়ে অনেকটা এই ভাবেই যুগ-যুগান্ত ধ'রে নাড়া-চাড়া করে' আস্‌ছে, পছন্দ তার একটাও হয় নি, কখনো হবে কিনা সন্দেহ। প্রকৃতি সুন্দরী একটা আলোর কণা নিয়ে হাজার রকমের লক্ষ প্রদীপ গড়ে' একটার পর একটা করে' জ্বালিয়েছেন। কোনটা পছন্দ হয়নি—জ্বালিয়ে আবার নিবিয়ে দিয়েছেন, শুধু তাই নয়—প্রদীপ শুদ্ধ গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে' ফেলেছেন। আবার কোনটা একটু মনের মতো হয়েছিল বলে' এখনো জ্বালিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর 'পরাণ যাহা চায়', অবিকল তেমন প্রদীপটি এখনো তৈরী হয় নি।

কাঁকড়া ও গুগ্‌লি শামুকের কতকগুলি শ্রেণী ছয় কোটি বৎসর পূর্ব্বে তাদের সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল থেকে এখনো পর্যন্ত অপরিবর্তিতভাবে জগতে টিঁকে আছে। প্রকৃতির আরো কত শত জীব-শিল্প তৈরী হয়েছিল—যেগুলির জীবন্ত বংশদুলালরা পৃথিবীর বুক থেকে বহু দিন পূর্বে লুপ্ত হয়ে' গিয়েছে। নিশ্চিহ্ন হবার প্রধান কারণই হ'ল—এই প্রাণীগুলি তাদের কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পূর্ণতার কয়েক ধাপ উপরে নিয়ে গিয়ে ফেলে-ছিল, যাতে করে' বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তার তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সর্বাঙ্গ-বিকাশের শক্তিটুকু তারা একটা শুঁড়্, দুটো দাঁত, দুটো ডানা, দুখানা পা, শুধু পেট্, বুক বা ল্যাজ, অথবা কেবল দৈহিক উচ্চতা, স্থূলত্ব বা পরিধির পুষ্টির প্রতি প্রয়োগ করেছিল। মৃত্তিকার

তলে বা পর্বতের গভীর স্তরে এদের কঙ্কালগুলিই শুধু অতীতের সাক্ষ্য বুকে ধরে' ঘুমিয়ে রয়েছে। মানুষ আজকে মানুষ হ'তে পেরেছে এই কারণে যে, আবেষ্টনীর পরিবর্তন বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার দেহ-বিধান অনেকটা খাপ খেয়ে যায়, স্থান-কাল-ক্ষেত্র নির্বিশেষে সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে পরিচালন করে' জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারে। মানুষ সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এটা নয় যে, সে জীবনে শুধু মানুষের মতো গুণপনাই প্রকাশ করে, পরন্তু সে অনেক ক্ষেত্রে অ-মানুষের মতো ব্যবহার করতে পারে।

তারপর ক্রম-বিকাশের অধ্যয়নে আর একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এক এক কালের, এক এক যুগের বা এক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট জীবের বিবর্তনের মধ্যে এক একটা লম্বা স্তব্ধতার ফাঁক গিয়েছে। তারপর যখন একটা নূতন কলেবরের সৃষ্টি হয়েছে, তখনই পর পর তার থেকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত কায়া-পরিবর্তন বা উন্নতি-সাধনের চেষ্টা চলেছে।

আন্দাজ পঞ্চাশ কোটি বৎসর ধরে' পৃথিবীতে শুধু আণ্ডজ বা সূক্ষ্ম এক-কোষাণুময় প্রাণীরই রাজত্ব চলে ছিল। তারপর পশ্চাদঙ্গ বা বহু-কোষাণুময় অমেরুদণ্ডী (inverte-brates) প্রাণীকুলের উদ্ভব হল; তাঁরা ধরাধামে একাধিপত্য করলেন ধরুন—আরো পঞ্চাশ কোটি বৎসর। এই সুদীর্ঘকাল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পালঙ্কে শুয়ে তোফা নাক্ ডাকিয়ে নিদ্রা দিলেন। আফিসের কেরাণীবাবু যেমন রাত্রে থিয়েটার দেখে এসে পরদিন বেলা নয়টা পর্যন্ত গভীর নাসিকা-গর্জন সহযোগে নিদ্রা দেন; তারপর গৃহিনীর মোলায়েম্ হাতের বজ্রাদপি কঠোরাণি কয়েকটি 'ঠোনা' ভক্ষণ করে' ধড়্ফড়্ করে জেগে উঠেন; এবং তারপর উপর্য্যুপরি ২ মিনিটের মধ্যে স্নান, ৫ মিনিটের মধ্যে আহার সমাধা, ২ মিনিটের মধ্যে বস্ত্র পরিধান, দশ মিনিটে আফিসে পঁহুছানো, এক মিনিটে হাজীরা-সহি, দ্বিতীয় মিনিটে লেজারের মধ্যে গভীর মনোনিবেশ...ইত্যাদি।

পঞ্চাশ কোটি বৎসরের নিশ্চেষ্টতার পর, পার্বতীর পদ্ম-করের ঠোনা খেয়েই হোক্ বা ঘা' করেই হোক্, পদ্মযোনি সজাগ হয়ে উঠে' দ্রুত পর্য্যায়ে—শুক্তি, গুগ্‌লি, শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি, মৎস্য, ভেক্, হাঙ্গর, আদিম সরীসৃপ (কুমীর, গোসাপ প্রভৃতি) ভৌমিক্ সমেরুদণ্ডী (land vertebrates) ইত্যাদির বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠির সৃষ্টি করে' গেলেন। এই নব সৃষ্টির মহামেলা বিছানো রইল প্রায় তিয়াত্তর কোটি বৎসর। তার পর এলেন অতিকায় প্রাচীন সরীসৃপ-শ্রেণী (অধুনা লুপ্ত Dinosaurs); তাঁরা লীলা কর্লেন প্রায় ষোলো কোটি বৎসর ধরে'। তার পর এক এক করে' পাখীর দল বিকসিত হয়ে উঠ্‌ল, প্রাচীন সরীসৃপগুলি একে একে পৃথিবীর পান্থশালা থেকে ডেরাডাণ্ডা তুল্‌ল। পরে হাজীর হলেন্ 'আর্য স্তন্যপায়ী জীবসমূহ (Archaic Mammals); এঁরা কম্‌সে-কম্ চার কোটি বছর ব্যাপী অভিনয়-লীলা প্রকাশ করে' রঙ্গমঞ্চ হ'তে চিরতরে বিদায় হলেন্। তৎপশ্চাতে উচ্চতর স্তন্যপায়ীরা একে একে প্রবেশ কর্‌তে লাগ্‌লেন্; পুরাদমে এদের বিবর্তন বা ক্রমোন্নতি চল্‌তে লাগ্‌ল। আল্‌সে বিশ্বকর্মার সহায়তায় এই স্তন্যপায়ী স্তরের ভাঙা-গড়া শেষ কর্‌তেই ব্রহ্মার লেগে গেল—বেশী নয়, ছ' কোটি বৎসর। তার পর পরম প্রাণীর পশ্চাদ্দেশ থেকে লাঙ্গুলটি ছেঁটে-কেটে চতুর্মুখ দেবতা চাতুরী করে' গঠন কর্লেন মানুষ; বানর থেকে মানুষ গড়্‌তে তাঁর সময় লাগ্‌ল মোটে নব্বই লক্ষ বৎসর। অথচ নরম মাটি পেলে কৃষ্ণনগরের একটা মামুলী মৃৎশিল্পী বানরের মূর্তিকে মানুষে পরিণত কর্‌তে নব্বই মিনিটও সময় নেয় না। মানুষের জন্ম হয়েছে বড় বেশী দিন নয়, মাত্র পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে!

জীব-বৈজ্ঞানিকরা এই সৃষ্টি-নাটকের পাঁচটি অঙ্ক ও একটি প্রস্তাবনা তৈরী করে' ভরত মুনির মর্য্যাদা রেখেছেন। প্রস্তাবনায় এল আণ্ডযুগ—এক-কোষাণুসর্বস্ব প্রাণী ভৈরব রাগে নান্দী পাঠ কচ্ছেন। তার পর প্রথম অঙ্কে কৃমি যুগ (Proterozoic Age); পরে দ্বিতীয় অঙ্কে দেখতে পেলুম, 'মৎস্য যুগ'—স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী গঠন করে' তার পরদা পড়্‌ল। তার পর এল তৃতীয় অঙ্কে 'কূর্ম যুগ (Mesozoic Age), আর্য সরীসৃপদলের সৃষ্টির আনন্দে তার পরিণতি। পরে চতুর্থ অঙ্কে এল 'বরাহ যুগ' (Cainozoic Age), সুবৃহৎ

স্তন্যপায়ী জীবদের ধ্বংসস্তূপের ভিতর দাঁড়িয়ে মানব-সৃষ্টির কল্পনার নেশায় তার যবনিকা পাত হ'ল। পঞ্চম অঙ্ক হল মনোবিকাশক যুগ (Psychozoic Age), এখনো এর যবনিকা-পাত হয়নি। হিন্দু-পুরাণকাররা বলে গেছেন যে, শেষ দৃশ্যে কল্কী এসে তাঁর চরম বক্তৃতা না করলে নাটক খতম হবে না। এক-একটি অঙ্কের মধ্যবর্তী সময়ে কনসার্টও কামাই যায় নি, বৃদ্ধ ব্রহ্মার গুরুগম্ভীর নাসিকা-ধ্বনি অব্যাহত আছে! এই প্রসঙ্গে আরো একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে, এক একটি অঙ্ক বা সৃষ্টি-কাল ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে; অর্থাৎ প্রথম অঙ্ক শেষ হ'তে যেখানে লেগেছে প্রায় এক শ' কোটি বৎসর, সেখানে চতুর্থ অঙ্ক হয়ে গেছে মোটে ছ' কোটি নব্বই লক্ষ বৎসরে। সকলেই আশা কচ্ছেন—পঞ্চম অঙ্কেই নাটক শেষ হয়ে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই এর যবনিকা-পাত হবে; অচিরে মানুষের দেহ-মনকে ঘিরে সকল রসের সমাবেশে প্রকৃতির 'সৃজন-লীলা' নাটক খানি চরম-শীর্ষে এসে পঁহুছবে। দুঃখের বিষয়, এমন সুন্দর মহানাটকের একমাত্র দ্রষ্টা—এর স্রষ্টা; অভিনেতাও বোধ করি তিনিই!

যে যত নীচু হতে পারে, উর্দ্ধে উঠ্‌বার অবকাশ তার তত বেশী আছে। জীব-জীবন এত নিম্নতন অবস্থা থেকে সুরু হয়েছে বলেই মানুষের মধ্যে এসে তার এমন বিস্ময়কর অভিব্যক্তি সম্ভবপর হয়েছে। অনেকে অভিমত প্রকাশ কচ্ছেন যে, মানুষের দেহের যতটা বিকাশ সম্ভব, তা শেষ হয়ে গিয়েছে; এখন কেবল তার মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় নাড়ীতন্ত্র (nervous system) ও মনের বিকাশ চল্‌ছে। ঐ মস্তিষ্ক-বলেই মানুষ আজ সোপানের উচ্চতম ধাপটিতে উঠে সবিদ্রূপ উপেক্ষায় নিম্নেতর প্রাণী-জগতের দিকে তাকাতে পেরেছে। সকল প্রাণীর চেয়ে তার মস্তিষ্ক বড়;—ওজনে বড়, আকারে বড়, পরিসরে বড়; এত বড় যে, করোটি-পেটিকায় তাকে সহস্র ভাঁজে গুটিয়ে রাখতে হয়েছে, নচেৎ মাথা ফেটে সে বেরিয়ে পড়্‌ত একদিন। মানুষের জ্ঞানের সীমানা যত বাড়ছে, তার পুরঃকপাল (frontal lobe) তত বিস্তৃত ও উচ্চ হচ্ছে, আবার তদনুপাতে পশ্চাৎ দিকটা (hind brain) তত ছোট ও চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে।

বাঘের মস্তিষ্ক মানুষের শতাংশের একাংশও আছে কিনা সন্দেহ। বাঘের মাথায় যদি মানুষের মতো মস্তিষ্ক থাকৃত তা'হলে এতদিন পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত; নিতান্ত সৌভাগ্য হলে' হয়ত কেউ কখনো চিঁড়িয়াখানায় বাঘের বদলে মানুষকে পিঞ্জরাবদ্ধ দেখতে পেত। মানুষের মস্তিষ্কের পশরা সমেত একটা চাঁদা মাছ, হাঙর কিংবা হাতীর কথা একটু চিন্তা করে দেখুন দেখি। মস্তিষ্ককে ধরে' রাখবার মাথাই নেই চাঁদা মাছের; হাঙরের মাথা আছে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক রক্ষা করবার জন্যে মাথার খুলি নেই। হাতীর মাথাও আছে, মাথার খুলিও আছে; কিন্তু মস্তিষ্কের চেষ্টাশক্তি প্রস্ফুরণের উপযুক্ত হাত-পাও নেই, বিচিত্র পেশী-সমন্বিত নমনীয় ক্ষুদ্রতর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নেই। মানুষের মস্তিষ্ক—মাছের নিকট একটা ভার স্বরূপ হ'ত, মকরের নিকট নিতান্ত বিরক্তিজনক বোধ হ'ত, হাতীকে একেবারে পাগল করে ছেড়ে দিত! তবে একথাটা সত্যি যে, মস্তিষ্ক বা স্বেচ্ছাধীন মন বল্‌তে যা কিছু, বুঝি তার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব আমরা স্তন্যপায়ী জন্তুদের ভিতর পাই এবং মানুষ তার বুদ্ধির একটা উল্লেখযোগ্য রকমের মূলধন লাভ করেছে—তার পূর্ব্ব পুরুষ পরম প্রাণীদের কাছ থেকে। কিন্তু অবয়বের তুলনায় সিংহ, বাঘ প্রভৃতির যতটা মস্তিষ্ক আছে, বানরদের ততটা নেই। এতখানি মস্তিষ্ক ছিল বলেই আজও তারা পৃথিবীতে টিঁকে আছে। বানরদের সৌভাগ্য যে, তারা গাছে উঠতে শিখেছিল। কারণ তা না জানলে সিংহ বাঘের পেট এতদিনে তাদের হজম করে দিত। সেটা আমাদের পক্ষেও বড় সৌভাগ্যের কারণ হত না, বিশেষত যখন কপিকুলই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ!

আদিকালের মেরুদণ্ডী প্রাণীরা জীবনের পথে শুধু নাক দিয়েই এগিয়ে চল্‌ত! নাসারন্ধ্রের প্রান্ত তাদেরকে খাদ্য, বন্ধু, বান্ধবী, শত্রু ইত্যাদি চিনিয়ে দিত। কুকুরের ভিতর এসে ঘ্রাণ-পরিচয়শক্তি খুব বেড়ে গেছে, তারপর ক্রমশঃ কম্‌তে আরম্ভ করেছে। শেষে জীব-জীবন যখন শাখামৃগ হয়ে' গাছে চড়্‌তে শিখ্‌ল, তখন ঘ্রাণের প্রাখর্য কমে' প্রায় মানুষের মতো হ'ল। নাকের সঙ্গে সঙ্গে

লম্বাটে মুখ গোলাকৃতি হ'তে সুরু কর্ল। বিড়াল হ'ল এই দু রকম পরিবর্তনের একটা মাঝামাঝি ধাপ।

নাসিকা-সমেত ছুচালো মুখখানি ঠেকিয়ে বানর কখনো দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করে না। তারা ও কাযটা হাত দিয়ে সারে; তাদের হাতের আঙুলে তীক্ষ্ণ স্পর্শ-শক্তির সঙ্গে প্রকৃতি যেন জিহ্বার ন্যায় একটু আস্বাদ-গ্রাহীতা-শক্তিও মিশিয়ে দিয়ে রেখেছেন। পরীক্ষা করে' দেখ্‌বেন,—কোন্ খাদ্যটি সুস্বাদু, কোন্ পানীয়টি সুমিষ্ট—বানর তা' হাত দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই প্রায় বুঝ্‌তে পারে।

গন্ধের চেয়ে রূপের—নাকের চেয়ে চোখের মূল্য অনেক বেশী। পরম প্রাণীদের ঘ্রাণ-শক্তি কিছু কম্‌ল বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে তাদের দৃষ্টি-শক্তি ও রূপের বিচার-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা বেড়ে গেল। আমরা কলেজের মেসে যখন থাকতুম্, তখন নিয়ম ছিল—যে ছাত্ররা নিরামিষাশী, তারা যে দিন মাংস রান্না হ'ত, সেদিন একপোয়া করে' রাবড়ী পেত।... পরম প্রাণীদের মধ্য থেকেই হাতের সর্বপ্রথম বিকাশ হ'ল; হাত-পায়ের থাবা থেকে আঙুলের পাঁপ্‌ড়ি একটু একটু করে' ফুটে বেরুল। তাদের চোখ দুটো কপাল থেকে একটু নীচে নেমে এসে পরস্পর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হ'ল। কোনো জিনিস পরখ কর্‌তে হলে' তারা এখন হাত দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে চোখের সাম্‌নে নেড়েচেড়ে দেখে। প্রত্যেক চোখটি অপরের সহায়তা না নিয়েই একটা ছবির প্রায় সবটাই সুস্পষ্ট দেখতে পায়; অন্যান্য চতুষ্পদরা কিন্তু তা পায় না। 'কথামালা'র সেই একচক্ষু হরিণের কথা মনে আছে তো? পরম প্রাণী ও মানুষের চোখ্ দুটি বাইনোকিউলার যন্ত্রের মতো, এক একটা চোখের গৃহীত ছবি পরস্পর জোড়া লেগে একটা অখণ্ড ছবির রূপ ধারণ করে।

বিরাট্‌কায় হাতী তার শরীর সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞান রাখে? শুঁড় দিয়ে বা ছোট ল্যাজ দিয়ে সে তার শরীরের সমস্ত অংশই অনুভব কর্‌তে পারে না, তার চেয়ে ঢের কম অংশই সে তার চোখ্ দিয়ে দেখ্‌তে পায়। গর্দানটা তার খুব ঘুর্‌তে ফির্‌তে পারে না। গরু-ঘোড়ার গলা অপেক্ষাকৃত লম্বা হলেও তারা দুই পার্শ্বে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে গ্রীবাদেশটি ফেরাতে পারে না, যদিচ সহজে উঁচু-নীচু কর্‌তে পারে। কিন্তু একটা বানরের গলা কত দিকেই না খেলে! তার শরীরের এলাকা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। চোখ্ দিয়ে শরীরের যে অংশটা না দেখ্‌তে পায়, হাত বুলিয়ে সেটা বোধ কর্‌তে পারে; এবং তার হাত যে টুকুতে স্বাধীনভাবে স্পর্শ করে, সেটুকু সম্বন্ধে তার চোখ্ একটা মোটামুটি ছবি ধারণা করে' নিয়ে' চিত্তবৃত্তির মধ্যে জমা রাখ্‌তে পারে। এইখান্ থেকেই জীব-মস্তিষ্কের কায বেড়ে চল্‌ল। প্রাণী যত বাহিরের জগতের সঙ্গে নিজেকে সংস্পৃষ্ট কর্‌তে লাগে, তার মস্তিষ্কও প্রয়োজনের খাতিরে তত বেড়ে যায়—তত সক্রিয় হয়ে' ওঠে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুবিধার জন্যে স্মৃতি-শক্তিও তীক্ষ্ণতর হ'তে আরম্ভ করে। ধৃতি ও স্মৃতি-শক্তি খুব পুষ্ট বলেই মর্কটদের এমন চতুর অনুকরণ-প্রিয় দেখ্‌তে পাই।

মানুষ—তার পূর্বপুরুষ বানরের নিকট উত্তরাধিকার-সূত্রে শুধু দেহ-জমিদারির প্রায় সবটাই পেয়েছে—তা নয়; মস্তিষ্করূপ টাকার সিন্দুকটাও সে অক্ষুণ্ণভাবে লাভ করেছে। এই টাকার সিন্দুক ছিল বলেই সে দেহ-জমিদারীর আজ এত উন্নতি-সাধন কর্‌তে পেরেছে। যাহোক, দুটো জিনিষই মানুষের ক্রমবিকাশ-পথে মস্ত বড় সহায় হয়েছে। জোন্স্ নামক এক জীবতত্ত্ববিৎ বলেন যে, স্বীকার করা গেল—মানুষের মস্তিষ্ক আছে বলেই সে বেহালার তারে বিচিত্র সুরের ফোয়ারা ছুটোতে পারে; কিন্তু মানুষের হাতে যদি দু'খানা ঘোড়ার মতো ক্ষুর থাক্‌ত, তা হ'লে মস্তিষ্ক বাবাজী সে ক্ষেত্রে কি কর্‌তেন?...

তৃষ্ণা

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

দেবদত্ত বলিল—"এ কঠোরতায় কি লাভ ?"

স্মিতহাস্যে শীলভদ্র উত্তর করিল—"বল কি! আগে তোমার এ কামনা-বাসনার জঞ্জাল দূরে ফেলে দিয়ে সাধনার কঠোরতায় এসে দাঁড়াও ; একবার চেয়ে দেখ দূরে চন্দ্র-করোজ্জ্বল সিন্ধু-নীলিমার অনন্ত বিস্তৃতির দিকে, আরোহণ কর তুঙ্গ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে, তখনই বুঝ্‌তে পার্‌বে কি লাভ,—জন্ম জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কঠোর হস্ত হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে নির্ব্বাণের গোমুখী-ধারায় স্নান কর্‌তে সমর্থ হবে। দূর হবে তোমার আধি-ব্যাধি, দূর হবে তোমার সংসারের কামনা, বাসনা, কলুষকালিমা ; জীবন শুভ্রতায় স্বচ্ছতায় পবিত্রতায় হেসে উঠ্‌বে।"

দেবদত্ত উত্তর করিল—"কিন্তু কি প্রমাণ আছে তোমার যে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত থেকে তুমি নিষ্কৃতি পাবে ? তুমি কি বল্‌তে পার ব্যাধি তোমার কোন দিন হবে না ? মৃত্যু তোমার হবে না ? তোমার এ দেহ কখনো বার্দ্ধক্যের বিপুল ঝঞ্ঝাবাতে বিধ্বস্ত মহীরুহের মত ভেঙ্গে পড়বে না ভূতলে, মৃত্তিকার জড়পিণ্ডরূপে ? আর আবার যে তুমি জন্মাবে না তাই বা কে বল্‌তে পারে ? তোমার বোধিসত্ত্ব কি এখনো ধরণীর বিশাল বক্ষে ঠিক তেমনি পূর্ব্বের মত জড় দেহ নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ? যদি জন্মজরামরণের কঠোর হস্ত থেকে নিষ্কৃতিই পেলেন, তবে মরলেন কেন ? চিরদিন বেঁচে থেকে ধরাবক্ষে তাঁর অমর কীর্ত্তির জীবন্ত জলন্ত প্রমাণ রেখে গেলেন না কেন ? কাজেই আমার মনে তোমার ঐ বৈরাগ্যের তীব্র কঠোরতা কোন দিন-অনুকরণযোগ্য বলে মনে হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে কি না সন্দেহ।"

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিল—"বৈরাগ্যের কঠোরতা না হয় তোমায় পছন্দ হ'ল না ; কিন্তু যাকে আঁকড়ে ধরেছ, তাই কি তোমার চিরদিনের ? যে জীবন যাপন করছ, সে কি দুঃখবহুল নয় ? তার মধ্যে কি মৃত্যুর করাল ছায়া বিভীষিকা বিস্তার করে ফুটে উঠে না ? হয়তঃ যখন ঘনীভূত সুখের মাঝখানে, বাসন্তী চন্দ্রিকার মৃদু হিল্লোলে, পুষ্পকুঞ্জের সুরভি-বিলসিত নীরবতায় প্রণয়িনীর কণ্ঠালিঙ্গনে জীবনে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব কর, তখন, সেই মিলন-মঙ্গল-মুহূর্ত্তে কি তোমার সমস্ত নিশ্চিন্ত আলস্যের পুঞ্জীভূত মদিরমোহকে নির্জ্জিত করে বিরহের বিষাণ বেজে উঠে না অজ্ঞাতে অলক্ষিতে অতর্কিতে ? পুত্রকন্যার স্নেহরাশির স্বচ্ছ সরোবরে নিমজ্জিতকণ্ঠ তুমি—সেই স্নেহ-রাশি মথিত করে' জেগে উঠে না কি রুগ্ন পীড়িতের আর্ত্ত-নাদ, কম্পিতকরে দিগ্‌দিগন্ত, তরুলতাবনস্পতি, নদনদী-সরোবর ? এই ভাবেই কি চির দিন যাবে মনে কর ?"

দেবদত্ত বলিল—"না, তা যাবে না সত্য ; কিন্তু তাই বলে যা ধ্রুব, যা নিশ্চিত, যা অনায়াসলভ্য করামলকবৎ, তাকে ছেড়ে দিয়ে কেন যাব ছুটাছুটি করতে অনিশ্চিত মরীচিকার পশ্চাতে দিগন্তবিস্তৃত জীবন-মরুর মাঝখানে ? সম্মুখে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য ফেলে রেখে কেন ছুটে যাব দূরে, অজানা অচেনা স্থানের উদ্দেশ্যে কল্পিত খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে ? কে বলতে পারে তুমি যা করছ তা সত্য ? কে বল্‌তে পারে ভোগের পথে মুক্তি হবে না ? কে বল্‌তে পারে ত্যাগের পথে এগিয়ে গিয়েও তুমি আবার ভোগের জন্য লালায়িত হবে না ? অতীত যা, তার কথা ভেবে কোন লাভ নেই ; অতাতে আমি হয়ত খুব বড় লোক ছিলেম ; হয়ত আমার আদেশে লক্ষ লক্ষ লোক উঠত বস্‌ত ; কিন্তু সেই অতীত জীবনের বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব নিয়ে আমি কি করব ? সে আর ত আমার কাছে ফিরে আসবে

না; কাজেই তা নিয়ে মাথা ঘামান দরকার মনে করি না। আর ভবিষ্যৎ সে ত অন্ধকূপে নিহিত; পরমুহূর্ত্তে কি হবে, তা আমি জানিনা; আর তার পরে যুগ-যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তরের কথা ত ধর্ত্তব্যই নয়। ভবিষ্যৎ আমার হাতের মধ্যে আস্‌বে কি না, আর এলেও কি ভাবে আসবে তা আমি জানিনা; কাজেই আমার একমাত্র সম্বল —বর্ত্তমান; এই বর্ত্তমানের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবনের যা কিছু ভোগ-সুখ সব আমি শেষ করে নিতে চাই। আরো দেখ, যখন বৈরাগ্যের বা ত্যাগের পথে গিয়েও তোমাকে ক্ষণত্বের মধ্যে, নশ্বরত্বের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে, তখন কেন আমি জীবনের সুখ-সম্ভোগ ছেড়ে দিয়ে কঠোরতাকে বরণ করতে যাব?"

শীলভদ্র বলিল—"দেখ দেবদত্ত, বাল্যে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তুমি যে দেবদত্ত ছিলে, এখনও কি সেই দেবদত্ত আছ?"

"না।"

"তবে?"

'তবে কি?'

"তবেই দেখ, বাল্যে মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপানরত দেবদত্ত, কৈশোরের বিদ্যাভ্যাসরত দেবদত্ত, এবং যৌবনের কঠোর চাঞ্চল্যের প্রতিমূর্ত্তি দেবদত্ত,—এই তিন দেবদত্তের মধ্যে পরস্পর ধর্‌তে গেলে কোন সাদৃশ্য নাই, কোন সমতা নাই, কোন ঐক্য নাই; কিন্তু তথাপি এই তিন দেবদত্তকে যেমন এক দেবদত্ত বলে অভিহিত কর্‌ছ, তেমনি, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও একটা অদৃশ্য শৃঙ্খল বর্ত্তমান; একটাকে ছেড়ে আর একটা চলতে পারে না। যা বর্ত্তমান, এক মুহূর্ত্তে পরে তাই অতীত এবং এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তমধ্যে বর্ত্তমানের নিয়ন্তা; কাজেই তুমি যে বলবে শুধু বর্ত্তমান-নিষ্ঠা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে, তা হবে না; অতীত এবং ভবিষ্যতের ভাবনা তোমাকে ভাবতেই হবে। আরো দেখ, তুমি বলচ, জন্ম যে হবেনা তার প্রমাণ কি? প্রমাণ শাস্ত্র বা মহাজন-বাক্য।"

"ও সব ভণ্ডামী।"

"না দেবদত্ত ভণ্ডামী নয়; মনে কর তুমি কুশীনগর দেখনি; কেমন? কিন্তু হয়ত একজন লোক দেখেছে; তার কথা কি বিশ্বাস করবে না?"

"করতেও পারি নাও কর্‌তে পারি?"

"কর্‌বেনা কেন?"

"সে যে সত্যকথা বল্‌বে তার প্রমাণ কি? আর সে যে দেখেছে তারই বা প্রমাণ কোথায়?"

"দেখ, সে ভাবে যদি তর্ক কর্‌তে যাও, তবে কোন বিষয়ই মীমাংসা হবে না। যেহেতু, মানব জানেনা তার জন্মদাতা কে, কিন্তু মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করেই জন্মদাতাকে পিতৃসম্বোধন করে। সেইরূপ তোমাকেও মহাজনবাক্য শিরোধার্য্য করে নিয়ে তবে পথ চল্‌তে হবে।"

দেবদত্ত বলিল—"তোমার কথা ঠিক মেনে নিতে পাল্লাম না; শব্দকে প্রমাণ বলে মানবার আগে দেখ্‌তে হবে যিনি শব্দের স্রষ্টা তিনি লোক কেমন; তাঁর প্রকৃতি কি; বাস্তবিক তিনি যা বল্‌বেন, তা কি স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত না নিস্বার্থ ইত্যাদি, এতগুলি বিচার-বিবেচনার পর তবে শব্দকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি প্রত্যক্ষ শব্দের প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তবে সে স্থানে শব্দ প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না। যাদুকর যেমন মিথ্যার ভেল্কী চোখে লাগিয়ে মানুষের সামনে হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রকে নীল বলে প্রমাণ করে, এও ঠিক তেমনি মানুষের মনের উপর বিশ্বাসের রং মাখিয়ে তাকে বস্তুর স্বরূপ দেখ্‌তে দেয় না; বিবেচনা করে না মানুষ বাস্তবিক শাস্ত্র বাক্য কি, কেন তা মানব? আর যিনি শাস্ত্র রচনা করেছেন, তিনি আলোচাল আর কাঁচকলার প্রত্যাশী ছিলেন কি না। তারপর তোমার বোধিসত্ত্ব অপৌরুষেয় বলে খ্যাত বেদকেই অপ্রামাণিক বলে দূরে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করলেন; আর তাঁর বাক্য সম্বন্ধে কি ঠিক সেই কথা বলা চলে না? বেদ যদি মিথ্যা হয়, তবে তাঁর বাক্যও যে মিথ্যা হবে না তার প্রমাণ কি? তার উপর সত্যের একটা নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড কিছুই নেই; তুমি যাকে সত্য বলছ, আর একজন এসে বল্‌ছে—ওহে না—ও মিথ্যা; এ পথে যাস্‌নি, আমার পথে আয়; কিন্তু হয়তঃ তৎপরে আর একজন উপস্থিত হয়ে বল্‌বেন, ওরে ওকি কথা! যে তোকে পথ দেখিয়েছে, সে ভণ্ড

ধূর্ত্ত, নিশাচর, তার কথা শুনিস্‌নি—ও কিছুই জানে না', আমার নির্দ্দিষ্ট পথে আয়; এইরূপে একটি অনন্ত অসীম মত ও পথের মধ্যে পড়ে হয়রান! তার চেয়ে কি দরকার আমার সত্যের অন্বেষণে? যে সত্যের স্থিরতা নেই, যা দেশ-ভেদে, জাতিভেদে, মানসিক গঠনভেদে বহুরূপীর মত রূপান্তর গ্রহণ করে, কি হবে আমার সে সব সত্যের জীর্ণ কঙ্কালে?—আমি চাই আমার জীবনের সময়-অসময়ে, সুখেদুঃখে, ভোগবিলাসের মাঝখানে ডুবিয়ে দি এই ভরা যৌবন, হোক সে বিন্দু, হোক যে অণু-কণা, যা পাই, তাই দু' হাতে লুটে নিয়ে যাই আমার জীর্ণ-কুটিরে স্বচ্ছলতার পরম আনন্দে।"

মধ্যাহ্ন রৌদ্রের প্রখর দীপ্তি দূর প্রান্তরের শ্যামল তরু-শিরে, গঙ্গার জন-বিরল পুলিনে, রাজপথের পিপাসাতুর পথিকের ক্লান্তি-মলিন বদনে ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। অদূরবর্ত্তী বাগানে একটা স্ত্রীলোক কূপ হইতে জল তুলিতে-ছিল। দূরে বটবৃক্ষের কচিডালের উপর একটি দোয়েল বসিয়া আপনার মনে শিষ দিতেছিল।

শীলভদ্র বলিল—"সত্য যদিও বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, দৃষ্টিভেদে, সমাজভেদে, জাতি-ভেদে দেশভেদে; কিন্তু বাস্তবিকই কি সত্য বিভিন্ন?—তা তো নয়; সত্য এক—অখণ্ড, অব্যয়, শাশ্বত। যেমন একই সূর্য্য উত্তর মেরুর সন্নিহিত লোকের নিকট একরূপ, বিষুবমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী লোকের নিকট একরূপ এবং নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অধিবাসীর নিকট ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, সূর্য্য একই থাকে; যেমন বর্ষার বারিধারা সমস্তই এক, কিন্তু আকার ভেদে, কখনো সমুদ্র, কখনো হ্রদ, কখনো সরোবর, কখনো পল্বলরূপে পরিণত হয়; ঠিক তেমনি সত্য চিরদিন এক; যে যেমন উপলব্ধি করার ক্ষমতা লাভ করে, সত্য ঠিক তার কাছে সেই রূপেই প্রতিভাত হয়। সুতরাং তুমি যাকে মিথ্যা বলে অভিহিত কর্‌চ, তা মিথ্যা নয়, তা সত্যের একটি দিক্ মাত্র। পূর্ণ সত্য যেদিন উপলব্ধি হবে, সেদিন এ সমস্ত বৈষম্য তিরোহিত হবে; যতক্ষণ নিচে তোমার চোখে পড়বেই; এটা রামের ধান-জমি, ওটা শ্যামের সরষে-ক্ষেত, সেটা মোহিতের কাঁকুড়-বাগান, অপরটা জগদীশের পটোল-ক্ষেত্র ইত্যাদি। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে তুমি ক্ষুদ্রতার সসীম গণ্ডী অতিক্রম করে, অসীমের চোখ দিয়ে সত্যের দিকে চাইবে, যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজের ক্ষুদ্রত্ব ভুলে গিয়ে মনে করবে আমি ভূমা, তখনই দেখবে পূর্ণ সত্যের দীপ্ত জ্যোতি কৃষ্ণাত্রয়োদশীর নিবিড় আঁধারে পূর্ব্বদিক্-বিভাগে জলন্তরূপে ক্ষীণ চন্দ্রকলার মত তোমার মানসরাজ্য আলোকিত করে ফুটে উঠবে; যে মুহূর্ত্তে তুমি সমতল ক্ষেত্র ছেড়ে, উর্দ্ধে তুঙ্গ পর্ব্বতের শিখরদেশে মেঘ-লোকের সন্নিকটে উঠতে সমর্থ হবে, তখন দেখবে, রামের জমি, শ্যামের ক্ষেত, মধুর বাগান সব লুপ্ত হয়ে গেছে কোন সীমাহীনতার পূর্ণ অবয়বের অন্তরালে; আলি-বিভাগ অদৃশ্য হয়ে গেছে; পড়ে আছে এক অনাদি অনন্ত ভুবন-ভুলানো শ্যামলিমার তরঙ্গায়িত-মৃদু স্পন্দন—আছে দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এক মনোরম শস্যক্ষেত্র; এর কোথাও ভেদরেখা নেই, কোথাও অপূর্ণতা-বৈষম্য নেই, কোথাও সঙ্কোচ-সঙ্কীর্ণতা নেই—সমস্ত জগৎ এক বিরাট্ পূর্ণতার অভিব্যক্তি।"

দেবদত্ত বলিল,—"হতে পারে হয়তঃ তুমি যা বল্‌চ তা সত্য; কিন্তু সে সত্য উপলব্ধি করবার আমার ক্ষমতা আছে কিনা, তাও একবার বিচার করে দেখা দরকার। গোষ্পদে যদি অনন্ত সমুদ্রের জলরাশি নিঃশেষ করতে চাও, তার ফল হবে—একটা বিরাট ব্যর্থতা! আরো দেখ, এই যে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়নিচয়, এর সঙ্গে বাহ্য প্রকৃতির একটা সংযোগ বর্ত্তমান। অন্ধ কিছুই দেখে না; বিরাট্ বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্য তাহার নিকট সম্পূর্ণ অননুভূত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু যে চক্ষুষ্মান, সে ধরণীর বুকে একটা অখণ্ড সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত নিরীক্ষণ করে। সুতরাং মনে হয়, আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলি সৃষ্টি কর্ত্তার এক মহা উদ্দেশ্য সাধন জন্য নির্ম্মিত; প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্যই আমাদের সৃষ্টি। যদি কেহ উপভোগই না করে, তবে সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়?

করে, তবে বৃক্ষের জীবন বিফল হয় না কি ? যে নারীর রূপ-যৌবন অনাস্বাদিত থাকে, তাহার জীবনের মত ভাগ্য-হীন জীবন বোধ হয় ভগবান্ বোধিসত্ত্বও কল্পনা কর্‌তে পারেন না ; তারপর যদি দিন-রাত নশ্বরত্বের চিন্তা কর, মৃত্যুর ভাবনা ভাব, তবেই তোমার ভোগের সারাংশ নষ্ট হয়ে যাবে ;—যদি একবার বৈরাগ্যের পথে পা দাও, তবে দেখ্‌বে, শয়নে স্বপনে, দিবসে মাসে পলে বিপলে, আহারে বিহারে সে তোমার ভোগরাশি পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রের মত অকিঞ্চিৎকর করে তুলবে। ভূগর্ভ-প্রোথিত ধন-উদ্ধারে যত্নশীল গৃহস্থ যেমন সর্প দেখিয়া পিছাইয়া আসে, তোমাকেও তেমনি ভোগ-মন্দিরের দ্বার-দেশ হ'তে বিদায় নিতে হবে ;—পৃথিবীর সমস্ত সুষমা, সমস্ত রস, সমস্ত মাধুর্য্য শ্মশানের চিতা-ভস্মে আচ্ছন্ন হবে ; মানবজীবন একটা নৈরাশ্যে, একটি হাহাকারে পরিণত হবে। তাই বলি যতদিন সময় আছে, হোক সে এক মুহূর্ত্ত—সে মুহূর্ত্তই জীবনব্যাপী সরসতায় পরিণত কর ভোগের মদির মোহে ডুবাইয়া, দুঃখ চিন্তা অশান্তি নির্ব্বাসিত করিয়া, বিশ্বের অস্থি-মজ্জায় অণুতে পরমাণুতে শিরায় উপশিরায় আপাদ-মস্তকে একটা রূপের অনল-শিখা জ্বালিয়া দিয়া ; ফেলে দাও দূরে প্রেমপ্রীতি-ভক্তি—ধর আকড়িয়া মানস ও বাহ্য জগতের বৈষম্যতিরোধানকারীরূপে রূপের একটা অফুরন্ত প্রবাহ, ভোগের একটা তীব্র উন্মাদনা।"

দূরে আকাশের এক প্রান্তে একটা ক্ষুদ্রপক্ষী উড়িতেছিল লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলির অতি নিকটে। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া শীলভদ্র বলিল—"দেখ দেবদত্ত, তুমি যা বল্‌লে তোমার এ যুক্তি, এ বিশ্লেষণ সমর্থন করা চলে না। বাস্তবিকই বল দেখি—উপভোগ করে কে ? একটা নারী তার নব যৌবনের নবীন রূপের ডালি নিয়ে এসে দাঁড়াল তোমার সামনে ; কিন্তু যদি তোমার মন সে সময় অন্য কোন বস্তুতে নিবিষ্ট থাকে, তখন তুমি সে নারীর রূপ উপভোগে সমর্থ হবে কি ? যদি নারীদেহের কোমলতা তোমার ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে ; কিন্তু তোমার মন তাহাতে না থাকে, তখন সে কোমলতার কোন আস্বাদ তুমি অনুভব কর্‌বে কি ?—নিশ্চয় না। তাহলেই দেখ, ভোগ করে কে ? মন ; ইন্দ্রিয় ভোগ করে না ! ইন্দ্রিয় নির্ব্বিরোধী দর্শকের মত নীরবে অবস্থান করে মাত্র। আর মন ঐ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ভোগ্যবস্তু তিলে তিলে তিলোত্তমার রূপরাশির মত চয়ন করে। আরো দেখ ; মনই কি ভোগ করে ? মনেকর, এই মুহূর্ত্তে যে মন নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নে ধীর সমীরণ শীতলবোধে প্রফুল্ল মনে গ্রহণ করছে, আবার অন্য অবস্থায় সেই মন ঐ শীতল বায়ু বিষবৎ পরিহার করতে ব্যস্ত ; যদি মনই উপভোগ করত, তবে ঐ বস্তু সমভাবে চিরদিন মনের নিকট একইরূপে প্রতিভাত হত ; তবেই দেখ, মনও ভোগ করে না ;—তবে কে ভোগ করে ? ভোগকরে সে এমন একটি কিছু আছে মনের অন্তরালে, মানবের প্রত্যেক কার্য্যের অভ্যন্তরে, প্রত্যেক ভাবরাশির গুহ্য গুহায়, সেই অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য শাশ্বত বস্তুই ভোগ করে,—উহা আত্মা। যদি ইন্দ্রিয় কিম্বা মন ভোগ করত, তবে মৃত্যুর পরও দেখ, ভোগ করতে পারত ; যে মুহূর্ত্তে আত্মা দেহ ত্যাগ করে যায়, সে মুহূর্ত্তে ভোগেরও অবসান। কাজেই আত্মাই সব, আত্মাই ভোগী ; আত্মাই যোগী। জন্ম-জন্মান্তরের বিবিধ পুঞ্জীভূত ভোগের সংস্কারে এই আত্মা বিজড়িত, যে দিন যে, মুহূর্ত্তে আত্মা এই পুঞ্জীভূত সংস্কার-রাশি ছিন্ন বসনের মত পরিহার করতে সমর্থ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আত্মা অস্পন্দ, অক্রিয় আসক্তিরহিত হয় এবং নির্ব্বাণ লাভ করে।"

দেবদত্ত বলিল—"কি সে নির্ব্বাণ ?"

শীলভদ্র উত্তর করিল—"সে নির্ব্বাণ কথায় বোঝান যায় না। নির্ব্বাণ অর্থে নিবিয়া যাওয়া ; যেমন তোমার প্রজ্বলিত দীপের নির্ব্বাণ ; তেমনি আত্মাও যেদিন ভোগ সুখের পঙ্কিল সরোবর, এই জগতের মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করে নিজের স্বরূপ বুঝতে পারবে, সেই দিনই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হবে—সেই দিন আত্মা জন্মমৃত্যুর অতীত হবে।"

দেবদত্ত হাসিয়া বলিল—"রেখে দাও তোমার নির্ব্বাণ ; যতদিন এ দেহে জীবন থাকে কামিনীকাঞ্চনের উপভোগই একমাত্র সার বস্তু বলে মনে করব। তুমি যতই বল, ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই, কারণ একটার সঙ্গে আর একটার কোন কার্য্যকারণ-ঘটিত

সম্বন্ধ নাই; অথচ তোমরা সব সাধুর দল অক্রিয় আত্মার একত্ব দেখাতেই ব্যস্ত। যাক, আজ এপর্য্যন্ত।"

অপরাহ্ণের মন্দীভূত কিরণজালে পথিক পথচলা সুরু করিয়া দিল, আর জনকোলাহলের গভীর নিনাদে গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি মিশিয়া একটা বিরাট্ ঐক্যতানের সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার অন্তর্নিহিত গম্ভীর গর্জ্জন আজও ওঁকার-রূপে বিশ্বে বিশ্বে প্রতিধ্বনিত।

(৬)

সমগ্র পাটলীপুত্র সহর নর্ত্তকী তৃষ্ণার গুণগানে মুখরিত। শীলভদ্র সাত দিন পাটলীপুত্রে অতিবাহিত করিল; এখনও সে তৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই, বা তৃষ্ণা কোথায় আছে, কি ভাবে, বাস্তব জগতের পক্ষ হইতে শীলভদ্র তাহার কোন সন্ধান নেয় নাই। এখনও শীলভদ্র ভাবিতেছিল তৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করিবে কি না; কারণ জন্মভূমি দর্শন করিতে গিয়া শীলভদ্র বাল্য স্মৃতির প্রবল তাড়নায় হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়াছে। তাহার সমস্ত সাধনা, সমস্ত কঠোরতা নির্জ্জিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—শৈশবের ধূলিখেলার চিত্র, কৈশোরের বিদ্যাভ্যাসের ছবি, নব যৌবনের উন্মেষে তৃষ্ণার মধুর সাহচর্য্যের লোভনীয় দৃশ্য মানস যবনিকার উপর। তখন শীলভদ্রের ধ্বসিয়া গিয়াছিল দ্বাদশ বর্ষের কঠোর সাধনার বাঁধ; ভরা নদীর বান যেমন উপকূলের ক্ষুদ্র বৃহৎ বস্তুসমূহকে ভাসাইয়া বেগে অগ্রসর হয়, ঠিক তেমনি স্মৃতির বন্যা শীলভদ্রের আন্তর জগৎকে ওলট পালট করিয়া দিতেছিল। অতিকষ্টে শীলভদ্র আত্মসংযম অবলম্বন করিয়া দেবদত্তের উদ্যানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তারপর শীলভদ্র বুঝিয়াছিল, অবলোকিতেশ্বর নেহাৎ মিথ্যা বলে নাই;—জীর্ণ কঙ্কালের মধ্যেও মমতার গন্ধ লুকায়িত থাকিতে পারে, কঠোর বৈরাগ্যের অন্তরালেও যে শাশ্বতী লালসার দীপ্ত মূর্ত্তি বিহার করিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই এখন শীলভদ্রের প্রধান চিন্তা হইল, তৃষ্ণার সঙ্গে দেখা করিবে কি না। সঙ্কল্প-বিকল্পের মাঝখানে পড়িয়া মন সংশয়-দোলায় দুলিতে লাগিল, কিন্তু কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না।

মানসিক চিন্তার তপ্ত ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে শীলভদ্র উদ্যানবাটী ত্যাগ করিয়া নগরের মধ্যে জন-কোলাহলের ভিতর প্রবেশ করিল। সহরে প্রবেশ করিয়াই শীলভদ্র দেখিল প্রাচীর গাত্রে সুবৃহৎ বিজ্ঞাপনে লিখিত—

নবীন নাট্যকাব্য

মহানির্ব্বাণ

ক্ষেমা ও মার সহচরীর ভূমিকায়—নর্ত্তকী তৃষ্ণা;

আগামী বৃহস্পতিবার মহা সমারোহে প্রথম অভিনয়।

আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শীলভদ্র দেখিল পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনের মত অন্য এক বিজ্ঞাপনের সম্মুখে বহুলোক সমবেত হইয়াছে এবং তাহারা তৃষ্ণার বিষয়ে কথোপকথন করিতেছে। শীলভদ্র নীরবে একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল একমনে অবহিতচিত্তে।

একজন বলিল—"এ অভিনয় দেখ্‌তেই হবে—দুটো ভূমিকায় তৃষ্ণা!"

অন্য জন উত্তর করিল—"তা বটে, তৃষ্ণার কি রূপ! অমন রূপ এ সহরে কোন মেয়েমানুষের নেই; শুনেছি রাজরাণীও নাকি তৃষ্ণার চেয়ে কুৎসিত।"

তৃতীয় জন বলিল—"বরাত সব বরাত; নৈলে কার জিনিষ কে ভোগ করে; তৃষ্ণার প্রকৃত অধিকারী শীলভদ্র; সে যে কোথায় গেল সন্ন্যাসী হয়ে, আর তার জায়গায় মজা লুটচে দেবদত্ত।"

১ম জন—"কোন দেবদত্ত হে?"

৩য় জন—"কেন? ঐ যে রত্নমণি শ্রেষ্ঠীর পুত্র।"

২য় জন—"সে কি রকম মজা লুটবে?"

৩য় জন—"তৃষ্ণা যে এখন তারই রক্ষিতা; তৃষ্ণা ঐশ্বর্য্যের মাথায় পা দিয়ে হেসে জীবন কাটাচ্ছে। দেবদত্ত নূতন বাড়ী তৈরী করে দিয়েছে, তারপর আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি এত দিয়েছে, বোধ হয় কোন রাজরাণীরও অত থাকে না। কিন্তু শুনেছি, তাতেও তৃষ্ণা সুখী হয়নি। এখনও নাকি সে নীরবে আকাশের দিকে চেয়ে শীলভদ্রের জন্য কাঁদে—চোখের জলে বুক্ ভেসে যায়!"

২য়—"তুমি কি করে জান্‌লে?"

৩য়—"ঐ ত সেদিন দেবদত্ত সে কথা 'মহা বোধি নাট্যশালার' অধ্যক্ষকে বলছিল। অধ্যক্ষ বল্‌লে, দেখ তাতে

আমাদের সুবিধাই হয়েছে; যখন করুণ ভাবের ভূমিকাগুলো অভিনয় করতে হয়, তখন আর জোর করে চোখের জল আনতে হয় না; আপনা আপনি ভাবাবেগে চোখের জল বেরিয়ে পড়ে। হয়ত তখন শীলভদ্রের কথাই ভাবে। যাক্, সে সব বড় ঘরের বড় কথা; আমরা গরীব গুরবো লোক; আমাদের ভাই ঐ সব ঘোড়া-রোগে কি দরকার? এখন চল কাজে যাওয়া যাক।"

জনতা চলিয়া গেল। শীলভদ্র দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিয়াছিল। এই সমস্ত শুনিয়া শীলভদ্রের মনের এক কোনে একখণ্ড ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিল। বুঝিতে পারিল না শীলভদ্র সে মেঘের অস্তিত্ব; অলক্ষিতে, ধীরে ধীরে তাহা আকার সংগ্রহ করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া শীলভদ্রের মানসরাজ্যে একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করিল। ভাবিতে লাগিল শীলভদ্র,—বোধ হয় তৃষ্ণা এখনও তাহারই দিকে আশা পথ চাহিয়া আছে; এখনও তৃষ্ণা ভাবে হয়ত শীলভদ্র আসিবে একদিন কোন শুভ পুণ্যলগ্নে তৃষ্ণার জীবনরাজ্যে যৌবনকুঞ্জে ভাদ্রের ভরা নদীর বান ডাকাইয়া, বাসন্তী কুসুমের সৌরভরাশি হিল্লোলিত করিয়া, স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টিবিন্দুর মত তাহার হৃদয়-শুক্তিতে প্রেমের মুক্তা উদ্ভূত করিয়া!—তবে—তবে কি হইবে? তৃষ্ণার শুষ্ক ব্যাকুলিত অধরে কি হাস্যরেখা ফুটাইবে না শীলভদ্র? তৃষ্ণা—তৃষ্ণা—বাল্যসখী, কৈশোরের সাথী, যৌবনের প্রথম বিকাশে নব গরিমার পথ প্রদর্শিকা তৃষ্ণা—''

হঠাৎ শীলভদ্র দেখিল উন্মুক্ত অশ্বযানে বসিয়া তাহারই পুরোভাগস্থ রাজপথ দিয়া দেবদত্ত যাইতেছে। সবিস্ময়ে শীলভদ্রের নয়নপথে পড়িল এক রমণী মূর্তি—মুখমণ্ডল দেবদত্তের বক্ষোদেশে নিলীন ও দেবদত্তের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মৃণাল বাহুলতা বিন্যস্ত; চূর্ণ কুন্তলরাজি ঘনকৃষ্ণ মেঘমালাকে নির্জ্জিত করিয়া পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত; কতকগুলি দেবদত্তের অংসে ও বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেবদত্ত একমনে রমণীর মস্তকের কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছে। কখনো বা চম্পকনিভ গৌর কান্তির দিকে অনিমেষে তাকাইতেছে।

শীলভদ্রের মনে হইল—এ রমণী নিশ্চয় তৃষ্ণা। কিন্তু মুখমণ্ডল দেখিতে না পাওয়ায় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। কিন্তু 'এ তৃষ্ণা' এ চিন্তা মনে হইতেই শীলভদ্রের চক্ষের সম্মুখে বিশ্ব যেন ছায়াপথে সরিয়া গেল—জ্বলিয়া উঠিল এক বিরাট্ দাবানল লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া, বুঝি গ্রাস করিবে এই বিশ্বজগৎ! প্রত্যেক ক্ষুদ্র বালুকাকণা যেন সূর্য্যের দীপ্তি ধারণ করিয়া প্রলয়ের অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল;—লুপ্ত হইল তরুলতার শ্যামলিমা, বাসন্তী গগনের কমনীয়তা, পুষ্প-পরাগের কোমলতা, চাঁদের অপরূপ স্নিগ্ধ শুভ্রতা! মনে হইল শীলভদ্রের বিশ্বের বুঝি শৃঙ্খল-রজ্জু খুলিয়া গিয়াছে, তাই আজ সমগ্র বিশ্ব এক উদ্দাম নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়াছে!—নাচিতেছে তরুলতা; নাচিতেছে গ্রহ-তারা-সৌরজগৎ; নাচিতেছে ধূসর বালুকাকণা মরুভূমির সীমাহীন বক্ষে; নাচিতেছে নদনদী-সাগর-সরিতের জলরাশি; আর তাহারই সাহচর্য্যে, তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতেছে শীলভদ্রের শরীরের প্রতি অণুপরমাণু কোন অজ্ঞাত আকর্ষণের বলে! আর শীলভদ্র ভাবিতে পারিল না। দ্রুত পাদবিক্ষেপে উদ্যান বাটিকায় সমাগত হইয়া নীরবে শয্যা গ্রহণ করিল।

(৭)

সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হইতে আজ মহাবোধি নাট্যশালার প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। সমস্ত পাটলীপুত্র সহর যেন এই নাট্যশালায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ মহানির্ব্বান দৃশ্যকাব্যের অভিনয়। সমাগত জনমণ্ডলীর মুখে যেন কি একটা ব্যগ্র আকুলতা প্রকটিত হইতেছে;—প্রত্যেকেরই চক্ষু যেন কাহার সন্ধানে ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য—কিন্তু ব্যর্থ সাধনায়, বিফল কামনায়। দর্শনীয় বস্তু দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল দৃষ্টি বেলাহত সমুদ্র-তরঙ্গের মত ক্ষুব্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিতেছে নিজের আবেষ্টনীর মধ্যে।

অভিনয় আরম্ভ হইবার সামান্যমাত্র বাকী, এমন সময় দেবদত্ত ও শীলভদ্র প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিল। দেবদত্ত পাটলীপুত্রবাসীর পরিচিত; কিন্তু শীলভদ্রকে অনেকেই চেনে না, বিশেষতঃ যখন ১০।১২ বছর ধরিয়া তাহার পৈত্রিক বাস্তুভিটা ত্যাগী। কিন্তু শীলভদ্র প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ

করিতেই সন্ন্যাসীর তেজপুঞ্জবিমণ্ডিত শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া জনমণ্ডলী বিস্ময়-বিকশিত-নয়নে অনিমেষে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

উভয়ে ঠিক অভিনয়-মঞ্চের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিল। দেবদত্ত পূর্ব্ব হইতে অধ্যক্ষকে বলিয়া ঐ দুইখানি আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

ক্রমে অভিনয়-মঞ্চের সম্মুখস্থ পাদ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐক্যতানবাদন আরম্ভ হইল।

এই সময় সমগ্র জনমণ্ডলী উৎসুক চিত্তে উৎকণ্ঠিতভাবে অভিনয়-মঞ্চের উপর একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ক্রমে জনমণ্ডলীর সঘন করতালির মধ্যে প্রারম্ভ-যবনিকা উত্তোলিত হইল। দর্শকের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে দ্বিগুণিত করিয়া, স্বরমাধুর্য্যে কোকিল-পাপিয়ার কমনীয় কণ্ঠ পরাজিত করিয়া, চপল হাস্যে, চটুল লাস্যে সরস প্রেম-মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ ধারা প্রবাহিত করিয়া গাহিতে গাহিতে উপবিষ্ট মারের সম্মুখে অভিনয়-মঞ্চে প্রবেশ করিল মার-সহচরী তৃষ্ণা—

আমারে চাহে সবে—আমি চাহি না!
বাহিয়া নেয় তরী—আমি বাহি না!
খেলিগো ধূলিখেলা সারাটি দিনমান;
সাঁঝের আলো সনে এ খেলা অবসান;
ভাঙ্গে এ ভব-খেলা, গগনে যায় বেলা,
যাত্রী গাহে গান,—আমি গাহি না!
অনিত্য রূপ মাঝে নিত্য উঠে ফুটি,
স্বপন সম এই জীবন যায় টুটি;
দেখেনা কেহ হায় এ মোহ-মহিমায়,—
মৃত্যু পথে ধায়—আমি ধাই না।

তৃষ্ণাকে আজ যেন মানবী বলিয়া মনে হইতেছে না, যেন কোন দেবীপ্রতিমা শাপভ্রষ্টার মত বিশাল ধরণীর বুকে এ অভিনয় মঞ্চে উপনীত হইয়াছে। গোলাপী কপোলের রক্তরাগ যেন শতধারায় উচ্ছলিত; পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশি আগুল্‌ফলম্বিত; মৃণাল বাহুর মৃদু স্পন্দন, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন-যুগলের শান্ত করুণ দৃষ্টি যেন এ ধরণীর কলঙ্ক-কালিমার মধ্য হইতে সমুদ্ভূত নয়—যেন কোন অপার্থিব অশরীরী আত্মিক জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থে বিগঠিত! আনন্দে আহ্লাদে দর্শকমণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শীলভদ্র দেখিল—দ্বাদশবর্ষের পূর্ব্বের তৃষ্ণা, আর এ তৃষ্ণা যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে হাস্যপরিহাসময়ী সদা-প্রফুল্ল তৃষ্ণা শীলভদ্রের কুটিরে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তির মত বিরাজ করিত, তাহার হৃদয়-বৃন্দাবনে নব বংশীবটমূলে প্রেমের বাঁশরী বাজাইয়া ভাব-যমুনায় বান ডাকাইত, এত সে তৃষ্ণা নয়;—এ তৃষ্ণার রূপরাশি ভাদ্রের ভরা নদীর মত দেহের কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত হইলেও তাহার যে আনন্দাংশ, সে প্রফুল্লতা, সে বালকোচিত শান্ত প্রতিচ্ছবি যেন কোন সুদূরে সীমাহীন নভোনীলিমায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, আর তাহার স্থানে একটা বিষাদের মূর্ত্ত ছায়া বাধ্যতার অনুরোধে কলের পুতুলের মত অভিনয় করিয়া চলিয়াছে! চপল হাস্য-লাস্যের মাঝখানে চোখে পড়িল শীলভদ্রের একটা হৃদয়ব্যাপী দৈন্য; একটা বেদনার অস্ফুট আর্ত্তনাদ যেন তৃষ্ণার প্রতি পাদক্ষেপে, প্রতি বাহুর স্পন্দনে, প্রতি কটাক্ষে অঙ্গে অঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছে! ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না শীলভদ্র কেন তৃষ্ণার এ পরিবর্ত্তন। এখন ত তৃষ্ণা সুখের মধ্যে অবস্থিত; বিলাসের পঙ্কিল স্রোতে ভাসমান; নিশ্চিন্ততার একটী বিশ্বব্যাপী আবেষ্টনের মধ্যে বিরাজিত সে—তবু তার একি অদৃষ্ট—কেন সে পূর্ব্বাপেক্ষা অসুখী? শীলভদ্রই কি তাহার কারণ? কে বলিবে?

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল; ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্ব নিরঞ্জনা নদীতীরে উপবিষ্ট। সহসা কুসুমমালায় আকীর্ণ করিয়া বসন্তের মলয় পবনের ঢেউ খেলাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল মার-সহচরী—তৃষ্ণা! গাহিয়া উঠিল—

দাওগো দাও ধরা তৃষিত হৃদে মম,
সন্ধ্যা ছেয়ে আসে ধরণী'পরে।
জ্বলিয়া উঠে দীপ ভবনে ভবনে
পথিক চলে ধীরে আপন ঘরে।
সম্মুখে হাসে দূরে নিবিড় নিশীথিনী
জাগাও বীণা-তারে মধুর সে রাগিণী;
কেন এ কঠোরতা কেন এ আকুলতা,
কেন এ সাধনা কিসের তরে?

জন্ম হোক লীন মৃত্যু-কলরবে,
যৌবন কর ভোগ বিশাল এই ভবে ;
পেয়েছ সাথে যাহা সাদরে লও তাহা,
এস গো রাখি হৃদে সোহাগ ভরে।

সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে মার-সহচরী ভগবান্ বোধিসত্ত্বের ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তির সম্মুখে নিজের হাব-ভাব-লীলা-রঙ্গ-বিলাস প্রকটিত করিতে লাগিল। হঠাৎ বোধিসত্ত্ব চক্ষু মেলিয়া মার-সহচরীর দিকে চাহিতেই বুদ্ধের চক্ষু হইতে সংযমাগ্নি নির্গত হইয়া মার-সহচরীর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিল এবং দেখিতে দেখিতে মার-সহচরী ভস্মীভূত হইয়া গেল—দর্শকবৃন্দ হাহাকার করিয়া উঠিল! পুনরায় বুদ্ধদেব ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

দৃশ্যান্তরে বুদ্ধদেব বেলু বনে সার্দ্ধ সহস্র শিষ্য সহ অবস্থান করিতেছেন। রাজমহিষী ক্ষেমা বিবিধ বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া বুদ্ধদেবকে স্বীয় রূপমোহে মুগ্ধ করিবার জন্য বেলু বনে উপস্থিত হইয়াছে। বুদ্ধ পূর্ব্ব হইতে তাহার মনোভাব অবগত হইয়া মায়া বিস্তার করতঃ ক্ষেমার চেয়েও সুন্দরী শত শত রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহারা বুদ্ধদেবের পদ সেবায় নিরত। ক্ষেমা বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল!

এই সময় হঠাৎ তৃষ্ণা অভিনয়োপলক্ষে জনমণ্ডলীর দিকে চাহিতেই সম্মুখে উপবিষ্ট শীলভদ্রের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। শীলভদ্রকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল তৃষ্ণা; তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটি পুলক কম্পন বহিয়া গেল; তাহার মনে হইল—একি বিসদৃশ কাণ্ড! আজ শীলভদ্রও তাহাকে দেখিল রঙ্গমঞ্চের এক নর্ত্তকী রূপে ঘৃণিত ব্যবসায়ে নিযুক্ত! হঠাৎ তাহার নিকট সংসার শূন্যায়মান হইয়া উঠিল; নিবিয়া গেল তাহার ভাবরুদ্ধ নেত্র সমক্ষে সহস্র দীপালোকিত নাট্যশালার উজ্জ্বল প্রদীপমালা; লুপ্ত হইল জগতের সমস্ত সুষমা; একটা ধিক্কারে, একটা আত্মানুশোচনায় ব্যাকুল প্রাণে কাঁপিতে কাঁপিতে তৃষ্ণা মূর্চ্ছিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে নিপতিত হইল! অসময়ে নাটকের শেষ যবনিকা পড়িয়া গেল।

ক্রমশঃ

(৫)

লণ্ডন বন্দর

অতীত ইতিহাস

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইংরেজের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে, ক্রমে ক্রমে বহির্গামী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও টেমস্ নদীতে আগত জাহাজগুলি বেশী বেশী বোঝাই হইয়া আসে। মাস্কোভি কোম্পানী (১৫৫৫), টার্কি কোম্পানী (১৫৭৯), ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (১৬০০), ও হাডসন বে কোম্পানী (১৬৭০) লণ্ডনের এই বাণিজ্যিক প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সুতরাং বেপারীদের মধ্যে অবিলম্বে সমস্যা দাঁড়াইল কি করিয়া মাল ঠিকমত রক্ষা করা যায়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের অগ্নিকাণ্ডের পর হইতে বন্দরের স্থলসীমা লণ্ডন ব্রিজে আসিয়া ঠেকিয়াছিল।

সেই সময়কার অবস্থার কথা এখন কল্পনা করা সহজ নহে। ভারতবর্ষ বা ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ্ হইতে আগত মাল-বোঝাই বহু জাহাজ মাঝ সমুদ্রে আসিয়া জমা হইত ও সুবাতাসের জন্য অপেক্ষা করিত। তারপর সুবাতাস দেখা দিলে ঠেলাঠেলি লাগিয়া যাইত কে আগে যাইবে। এক এক জোয়ারে দেখা যাইত এইরূপ ৩০।৪০ খানা জাহাজ নদীতে ঢুকিতেছে ও প্রত্যেকে নিজ নিজ মাল খালাসের চেষ্টা করিতেছে। জাহাজে অথবা নৌকাতে মাল রাখিবার ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু তীরে মাল রাখিবার ব্যবস্থার অভাব থাকাতে সমস্ত মাল মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যাইত ও বেপারীদের বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল

গুদামে ৩২,০০০ হগ্‌সহেড (পিপে) চিনির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে ১ লাখের উপর হগ্‌সহেড চিনি আমদানী করা হইয়াছিল।

লণ্ডনের ডক

টেমস্ নদীর প্রথম ডক হইতেছে হাউল্যাণ্ড গ্রেট ওয়েট্ ডক ও ব্রানস্‌উইক ডক। কিন্তু এই দুইটির প্রকৃতপক্ষে মাল রাখিবার গুদাম ঘর ছিল না। মাল গুদামজাত করিয়া রাখিবার জন্য প্রথম ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ডক তৈরী হয়। এই ডক তৈরী হইবার পর হইতে নদী-তীরে চোরের উপদ্রবের উপশম হয়। ইহার আগে মাল ঠাসাঠাসি ও স্থানাভাবের দরুণ চুরি ইত্যাদির খুব সুবিধা ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জলদস্যুর সংখ্যা ছিল ১১,০০০ আর তাহারা বৎসরে প্রায় ৫ লাখ পাউণ্ড বা ৭৫ লাখ টাকার ক্ষতি করিত।

উনবিংশ শতাব্দীতে পর পর নিম্নলিখিত ডকগুলি নির্ম্মিত হয় :—লণ্ডন ডক, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ডক, সেণ্ট ক্যাথারিন্ ডক, রয়্যাল ভিক্টোরিয়া ডক, মিলওয়াল ডক, রয়্যাল আলবার্ট ডক, টিলবারি ডক (উত্তর দিকে), সারে কমার্সিয়েল ডক শ্রেণী (দক্ষিণ দিকে)।

পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটি

কলিকাতায় পোর্ট কমিশনারস্ বলিলে যাহা বুঝায় লণ্ডনে পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটী বা সংক্ষেপে পি এল এ (P. L. A.) বলিলে তাহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহার উদ্ভব একদিনে হয় নাই।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক রয়েল কমিশন বসে ও জাহাজের মালিক, বেপারী, ডক ডিরেক্টার ইত্যাদি সকল রকম ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে আরম্ভ করে। কমিশন বলেন যে নদীর খালগুলির অবস্থা শোচনীয়, ডক কোম্পানী-গুলির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, আর শাসন ক্ষমতা একের অধিক প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকায় বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইতেছে; সুতরাং বাণিজ্য-নাশের বিপদ্ যথেষ্ট রহিয়াছে। রয়েল কমিশনের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটা বিল উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই বিলের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল এই যে, সমুদয় ডক কোম্পানীর ও টেম্‌স কনসারভেন্সির (টেডিংটনের নীচে নদীর সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল) সম্পত্তি, ক্ষমতা ও দায়িত্ব এবং লাইটারম্যান কোম্পানীর কার্য্যাবলী এক বিশেষ কর্ত্তৃপক্ষ বা ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কিন্তু সেই সময় এই চেষ্টা সফল হয় নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট আগে বহুদিন ধরিয়া লণ্ডন বন্দরের ডক কোম্পানীগুলির আর্থিক অবস্থার খবর লইবার পর সরকারের হাতে সেগুলি ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব আনয়ন করেন। ফলে ১৯০৮ সনের পোর্ট অব্ লণ্ডন অ্যাক্ট পাশ করা হয়। এই অ্যাক্ট অনুসারে ডক কোম্পানীর সকল কাজ ও ক্ষমতা পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটির হাতে আসে। এই সম্পত্তি কিনিয়া লইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সুদের হারে ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার পোর্ট ষ্টক বাহির করা হয়। এই অ্যাক্টের বলে টেম্‌স কনসারভেন্সির ক্ষমতাবলিও অথরিটির হাতে বর্ত্তিল। সিটি অব্ লণ্ডনের কর্পোরেশনের হাতে স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান ভার রহিল; নদীতে আলো ইত্যাদি দিবার ব্যবস্থা ট্রিনিটি হাউস্ করিতে লাগিল; মেট্রোপলিটান পুলিশ শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য দায়ী থাকিল। এইরূপে সর্ব্বত্র সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু ব্যক্তিগত গুদাম, জেটি ইত্যাদির সম্বন্ধে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটির মোট সভ্য-সংখ্যা ২৮ জন। তন্মধ্যে ১৮ জন করদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। বাকী ১০ জন নিম্নলিখিত ভাবে নিযুক্ত হয় :—জলসৈন্য বিভাগ কর্ত্তৃক ১ জন, যানবাহন মন্ত্রী দ্বারা ২ জন, লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ৪ জন, সিটি অব্ লণ্ডন কর্পোরেশন ২ জন, ট্রিনিটি হাউস ১ জন। বাহির হইতে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু কথা থাকে যে প্রথম সভাপতি গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন। তদনুসারে প্রথমতঃ সার হাডসন কিয়ার্লি (পরে ভাইকাউণ্ট ডেভনপোর্ট) নিযুক্ত হন। তিনি এই পদে ১৬ বছর ছিলেন। ১৯২৫ সন হইতে ডাণ্ডির লর্ড রিচী ঐ কাজ করিতেছেন।

১৭ বৎসরে ১২০ লাখ পাউণ্ড খরচ

অধিকাংশ সভ্য বণিক্ ও জাহাজের মালিকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। ইহাদের কাহারও কাহারও স্বার্থ হোয়াফ´ বা গুদামের সহিত জড়িত আছে। সেই হিসাবে ইঁহারা বন্দরের হোয়াফ´ বা গুদামের সহিত প্রতিযোগিতা করেন। কিন্তু প্রশংসার কথা এই যে সভ্যেরা সমগ্র বন্দরের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ইঁহারা কেহই নিজ কাজের জন্য মাহিনা হিসাবে কপর্দ্দক পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না।

১৯০৯ সনের ১লা মার্চ্চ হইতে পোর্ট´ অব্ লণ্ডন অথরিটি লণ্ডন বন্দরের শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন হইতে বন্দরের বহুদিকে প্রভূত উন্নতি ও বিস্তার ঘটিয়াছে। বন্দরে স্থানের দরকার খুব বেশী ছিল, এই উদ্দেশ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৬ কোটি টাকা খরচ করা হয়। নদীর খাল পরিষ্কার করিবার জন্যও অনেক টাকা খরচ হইয়াছে।

১৯০৯ হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ১৭ বৎসরের মধ্যে অনেক দিকে বন্দরের উন্নতি করা হইয়াছে ও তজ্জন্য ১২০ লাখ পাউণ্ড বা ১৮ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। পি এল এ'র হাতে শাসনভার আসার পর হইতে প্রধান প্রধান যে সব পরিবর্ত্তন ও সংস্কার হইয়াছে তাহার কতকগুলি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। লণ্ডন, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ও মিলওয়ালি ডকে নূতন জেটি ও শেড্ নির্ম্মাণ; কিং জর্জ্জ ফাইভ্ ডক নির্ম্মাণ; ৬৪ একর স্থান জুড়িয়া এক নূতন ওয়েট্ ডক নির্ম্মাণ; কোল্ড ষ্টোরেজ অর্থাৎ ঠাণ্ডাতে রাখিয়া জিনিষ রক্ষণের ব্যবস্থার জন্য বেশী জায়গা দান; রয়্যাল ভিক্টোরিয়া ডকে ৬তলা তামাকের গুদামঘর তৈরী; টিলবারি ডকের প্রসার বৃদ্ধি; লণ্ডন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, রয়্যাল ভিক্টোরিয়া ও রয়্যাল আলবার্ট্স ডকের জল উঁচুতে তুলিবার জন্য শক্তিশালী পাম্পের প্রবর্ত্তন; ক্রেনের বহুল ব্যবহার; টিলবারিতে "কার্গো" বা মালের জেটি; সারে কমার্সিয়েল ডক শ্রেণীতে কাঠ তার্জ্জাভাড়ি নামান উঠানর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা; নূতন গভীর জলের ডকে ৫টা ৪০০ ফুট বার্থ তৈয়ারী। ইহা ছাড়া ভবিষ্যতে আরও অনেক উন্নতি হইবে। টিলবারিতে একটা প্রকাণ্ড শুষ্ক ডক তৈরী হইতেছে তাহাতে নদীতে যে সব প্রকাণ্ড জাহাজ আসে সেগুলিও ভিড়িতে পারিবে। লোক চলাচলের সুবিধার জন্য টিলবারিতে একটা বড় ঘাটের বন্দোবস্ত হইতেছে।

পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটির কাজের বহর

পোর্ট´ অব্ লণ্ডন অথরিটিকে কত প্রকার কাজ করিতে হয় তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অন্য বহু দেশের বন্দর-কর্ত্তৃপক্ষের মত জল ডক, শুষ্ক ডক, জেটি, হোয়ার্ফ, শেড্ ও ক্রেণ যোগাইতে হয়; কিন্তু লণ্ডনে জাহাজের মালিকদের ও বণিক্‌দের যে সব বিশেষ সাহায্য দান করা হয় তাহা অন্যত্র অনেক স্থানে দেখা যাইবে না। বহির্গামী জাহাজে ৫০ টন শস্য থাক বা উহার টনেজ ২০,০০০ টন হউক, লণ্ডন পোর্ট অথরিটির ষ্টিভোডারেরা সমানভাবে সাহায্য জন্য দান করে।

এখানে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে অথরিটির কাজের বিশালতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মিতে পারে। প্রথমতঃ বৎসরের প্রত্যেক দিন ছোট বড় ১ হাজার জাহাজ গ্রেভ্সেণ্ড অতিক্রম করে। পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটিকে প্রত্যেকটির খবর লইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ শুধু পশম রাখিবার জন্য পি এল এ তাঁহাদের গুদামঘরে ৩০ একর স্থান রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরীক্ষা-গৃহে ৪০ হাজার বেল্ পশম এককালে পরীক্ষার জন্য প্রদর্শিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ মাইলের পর মাইল ব্যাপী গুদাম ঘরে তামাক সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে শুল্কশুদ্ধ ৪ কোটি পাউণ্ড বা ৬০ কোটি টাকা মূল্যের তামাক জমা রাখিতে পারে। তাহাতে গ্রেট বৃটেনের প্রত্যেক পুরুষের জন্য সপ্তাহে ১ আউন্স ব্যবহৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে এক বৎসর চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে বন্দরে ইন্দুরের উৎপাত নিবারণের জন্য বহুশত ভাল শিকারী বিড়াল পোষা হইতেছে, তাহাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সরকার হইতে বাজেটে বরাদ্দ করা হয়। পি এল এ ৬৯ মাইল ব্যাপী নদীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ডকশ্রেণী ইঁহাদের শাসনাধীনে রহিয়াছে।

মাল ডকে উঠাইবার জন্য অথবা এক ডক হইতে অন্য ডকে লইয়া যাইবার জন্য পি এল এ কতকগুলি নৌকা রাখিয়াছেন ও বেপারীদের কাছে মাল পৌঁছাইবার জন্য লরী বা গাড়ীও আছে। ইঁহাদের একটা খাল রদারলাইথে আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৩ মাইল; ২০০ মাইল রেলওয়ে আছে ও সেই পথগুলিতে হাজার হাজার মালগাড়ী বাহির হইতে ষ্টীমারের কাছে আবার ষ্টীমারের কাছ হইতে বাহিরে আসিতেছে। ষ্টেশন আছে ৬টা।

২০,০০০ টনের জাহাজ সমুদ্র হইতে নদীর মধ্যে ৪০ মাইল অবধি চলিয়া আসে। ইহাতে বুঝা যাইবে নদীর পথ সর্ব্বদা কিরূপ জাহাজ চালাইবার উপযুক্ত করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেক দিন লণ্ডন নদীর মুখ পরিষ্কৃত রাখা কর্ত্তব্য, সেই জন্য চ্যানেলের পরিসর হাজার ফীট ও গভীরতা ৩০ ফুটের কম হইতে পারে না।

দুর্ঘটনায় ব্যবস্থা

কুয়াশার সময় নদীর মধ্যে এক জাহাজের সহিত অন্য জাহাজের ধাকা লাগিয়া যাইতে পারে অথবা জাহাজ অন্য কারণে ডুবিতে পারে। সেই সময়ে তাড়াতাড়ি সাহায্য করিবার জন্য "ভগ্ন জাহাজ উত্তোলন করিবার বিভাগ" (Wreck-raising Department) রহিয়াছে। যে জাহাজ ভগ্ন হয়, তাহার সমস্ত টুক্‌রা জল হইতে বা বালি হইতে তুলিয়া লওয়া ইহার কাজ। তাহাতে অন্য জাহাজ দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পায়।

জাহাজের গতিবিধি

পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটীর হারবার সারভিস্ কতকগুলি প্রহরী লঞ্চ নদীর মধ্যে রাখিয়াছে। এগুলি সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। আইনকানুন সব মানা হইতেছে কি না, জাহাজ বা ষ্টীমার হইতে ময়লা ফেলা হইতেছে কি না, পেট্রোল বোঝাই জাহাজ নিয়ম মানিয়া চলিতেছে কি না ইত্যাদি দেখা এইগুলির কাজ।

কোন জাহাজ গ্রেভ্‌সেণ্ড অতিক্রম করিবামাত্র পি এল এ'র কর্ম্মচারী তাহার নাম ধাম টুকিয়া লয়। উহা ডকে প্রবেশ করিতে চাহিলে একটা ডকও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ডকেতে ডকমাষ্টার আসিয়া উহার ভার বুঝিয়া লয়। ঐ জাহাজ যতক্ষণ ডকে থাকে ততক্ষণ ডকমাষ্টার তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। প্রত্যেক দিন অথরিটির "জাহাজদের ষ্টেশনের তালিকা" বাহির হয়। তথা হইতে কোন্ দিন কোন্ জাহাজ কোথায় ভিড়িল ও কবে কোন জায়গা ছাড়িয়া গেল ইত্যাদি খবর বাহির হয়।

মাল গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা

কিন্তু পি এল এ'র যে কাজ দ্বারা বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রসার লাভ করে তাহা হইতেছে মাল গুদামজাত করিয়া রাখিবার যথোচিত ব্যবস্থা। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, পৃথিবীর সকল প্রান্ত হইতে কাঁচা ও অন্যান্য মাল আসিয়া সর্ব্বদা জমা হইতেছে। প্রত্যেক বৎসর ১০ লাখ বেল্ পশম আমদানি হয়। অথচ খাস্ লণ্ডনে পশমের কাপড় ইত্যাদি কোথাও তৈরী হয় না। অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতবর্ষ হইতে পশম আসিয়া জমা হইতেছে। এই পশম এক্সচেঞ্জ গৃহে বিক্রীত হইয়া ইয়র্কশায়ারের ওয়েষ্ট রাইডিং প্রভৃতি স্থানে কাপড় ইত্যাদি তৈরীর জন্য চালান হইবে। তারপর তথা হইতে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মাণি অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাইবে।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে মাল জমা করিয়া রাখিবার জন্য পি এল এ'কে কিরূপ বিপুল ব্যবস্থা করিতে হয়। এক একবারে ১০ লাখ টন মাল গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা আছে। আর গুদামজাত মালের পরিমাণ কোন কালেই ৫ লাখ টনের কম হয় না। বিশেষ বিশেষ মালের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের গুদামঘর তৈরী হইয়াছে, মাংস, ডিম, মাখন, পনীর ও ফলের জন্য ঠাণ্ডা গুদামঘর; মদ, ব্রাণ্ডি ইত্যাদির জন্য কাল ছাদওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর রবার, গাটাপার্চা ইত্যাদির জন্য পৃথক গৃহ। সারে কমার্শিয়েল ডক শ্রেণীতে গেলে দেখা যাইবে

১৫০ একর স্থান কাঠ রাখিবার জন্য রহিয়াছে; কাঠ ভাসাইয়া রাখিবার জন্য ৪০ একর জুড়িয়া ল্যাভেণ্ডার পণ্ড, একর্ণ পণ্ড ও গ্রেঙ্ক পণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। চা, তামাক, মসলা, হাতীর দাঁত, গঁদ, নানা চিত্তাকর্ষক দ্রব্য ও পালক—ইহাদের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন গুদাম রহিয়াছে।

এই গুদামজাত দ্রব্যাদির মূল্য বহু কোটি টাকা, সুতরাং ইহা যে সব কর্ম্মচারীর হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ২।৪টি কথা না বলিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এখানে খুব দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকেরা কাজে নিযুক্ত হয়। সঠিকভাবে মাপা, শ্রেণী বিভাগ ও গুণ নির্দ্দেশ করিয়া ছাপ দেওয়া যে সে লোকের কাজ নয়। ইহাতে যেমন বিচক্ষণতা তেমনি অপক্ষপাতিতা দরকার হয়। কারণ এই দুই কাজের ফলেই মালের কেনাবেচা হয়। পি এল এ'র লোকেরা কর্ম্মতৎপর ও বিশ্বাসী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

মোসাফের্

পঞ্চপুষ্প

ইংলিশ চ্যানেলে সুড়ঙ্গ

ইংলণ্ডের ডোভার বন্দর হইতে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দর পর্য্যন্ত ২২ মাইল দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথে ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করিয়া এক রেলপথ প্রস্তুতের প্রস্তাব চলিতেছে। ১৮ ফিট পরিধি বিশিষ্ট ২টি সুড়ঙ্গ দ্বারা এই রেলপথ গঠিত হইবে এবং একটির দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে ও অন্যটির দ্বারা ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে গাড়ী যাতায়াত করিবে। ইহাতে দৈনিক ২০০ খানা ট্রেন চলাচল করিতে পারিবে। এই সুড়ঙ্গের দ্বারা ইংলণ্ড ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের সহিত সংযুক্ত হইবে। এই সুড়ঙ্গের দ্বারা তিনটি বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন হইবে :

(ক) বেকার সমস্যার সমাধান—কারণ এই সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতে ২৪০০০ হাজার লোকের দরকার।

(খ) অধিকতর অর্থাগম—অনেক ভ্রমণকারী ইংলিশ প্রণালীর তরঙ্গসঙ্কুল অবস্থায় ভীত হইয়া ক্ষুদ্র জাহাজে ঐ প্রণালী অতিক্রম করিতে চাহে না। এই সুড়ঙ্গের দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে বার্লিন বা মস্কো হইতে বরাবর লণ্ডনে উপনীত হইতে পারিবেন; তাহাতে ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যধিক অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা।

(গ) ভবিষ্যৎ যুদ্ধাদির অজুহাতে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান লোকার্ণো সন্ধি ও কেলগ প্যাক্ট প্রভৃতির দ্বারা ঐ আপত্তিও দূরীভূত হইয়াছে, বিশেষতঃ ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে এমন ব্যবস্থাও থাকিবে যে বিপদকালে প্রয়োজন হইলে ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যভাগ জল-প্লাবিত করা চলিবে।

ফরাসী ও ইটালীর গভর্ণমেণ্ট এই সুড়ঙ্গ-পথের অনুকূলে মত দিয়াছেন। এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণে ২৯,০০০,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৩০ কোটি টাকা) ব্যয় হইবে। ট্রেন ৬ ঘণ্টায় লণ্ডন হইতে প্যারিসে পৌছিবে এবং বার্ষিক ২৫,০০০,০০০জন যাত্রী ও ৮,০০০,০০০টন মাল লইয়া যাইতে পারিবে।

অগ্নি-নির্ব্বাণকারী পিপীলিকা

এক ফরাসী মহিলা-বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি পিপীলিকার বুদ্ধি সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার গবেষণাগারে পিপীলিকার বাসার নিকটে জ্বলন্ত সিগারেট রাখিয়াছিলেন; অগ্নি-নির্ব্বাণকারী পিপীলিকার দল বাহির হইয়া মুখ হইতে এক প্রকার এ্যাসিড নিক্ষেপ করিয়া উহা নিবাইয়া দেয়। তৎপরে জ্বলন্ত মোমের বাতি স্থাপন করা হয়, তাহাও ঐ পিপীলিকার দল নিবাইয়া দেয়। অধিকন্তু যে সমস্ত পিপীলিকা আগুণের অতি নিকটে আসিয়াছিল, অন্যান্য পিপীলিকারা তাহাদিগকে টানিয়া নিরাপদ্ স্থানে লইয়া গিয়াছিল।

আকাশযানে ঘণ্টায় ৩১৯২ মাইল ভ্রমণ

লেফ্‌টেন্যাণ্ট গ্রেইগ্ আকাশপথে ঘণ্টায় ৩১৯২ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন লোক এত দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন নাই। এই ভ্রমণের দ্বারা তিনি ইটালীর সুবিখ্যাত পোতচালক মেজর ডে বার্ণনাডিকে পরাজিত করিলেন। বার্ণনাডি ঘণ্টায় ৩১৮·৬২ মাইল ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ভ্রমণকারীরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

চোরের অদৃশ্য শত্রু

সম্প্রতি ইংলণ্ডে চুরি নিবারণের জন্য নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উপায় এক অদৃশ্য আলোকরশ্মি। যখনই কোন চোর কক্ষে প্রবেশ করে, এবং অদৃশ্য আলোকরশ্মি দ্বারা পরিরক্ষিত অংশে প্রবেশ করে, অমনি সমস্ত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তীব্র ঘণ্টা নিনাদিত হয়। এই অদৃশ্য আলোক রশ্মি একটি গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত থাকে এবং অদৃশ্য শক্তি বিকীরণ করিয়া সমস্ত কক্ষ সুরক্ষিত করে। যে ভাবে যে কোন উপায়ে চোর আলোক রক্ষিত স্থানে পদার্পণ করিলেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে। ঘণ্টা বাজিবার পর যদি ঐ চোরকে ধরিবার জন্য আলো জ্বালিবার প্রয়োজন হয়; তবে দূর হইতে কক্ষের দিকে আলো দেখাইলেই কক্ষস্থ সমস্ত বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিবে এবং আলো সরাইয়া লইলেই কক্ষস্থ আলো নিবিয়া যাইবে।

কুয়াসা ও অন্ধকারে আলো-প্রজ্বলন

লণ্ডনের বার্ণেশ অঞ্চলে রাস্তায় অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে আলো জ্বালিবার ও নিবাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যখন দিবসের আলো ম্লান হইয়া আসে, সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়, তখন অদৃশ্য আলোক অন্ধকারের আগমনে ক্রীয়াশীল হইয়া আলোক প্রজ্জ্বলিত করে। কুয়াসায়ও ঐরূপ আলোক আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠে এবং দিনের আলো বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া যায়।

রেল-সংঘর্ষ নিবারণ

অদৃশ্য আলোকের কার্য্যকারিতায় রেল-সংঘর্ষ নিবারণের উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। যখনই রেলগাড়ী বিপজ্জনক স্থানে উপস্থিত হয় অমনি, অদৃশ্য আলোকের ক্রিয়ায় একটি রক্তিম আলোক জ্বলিয়া উঠে এবং গাড়ীর গতি রোধ করে। এই আবিষ্কারে যদি গাড়ীর চালক নিদ্রিত বা মৃতও হয়, তথাপি গাড়ী বিপজ্জনক স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। রেডিও ভাইসার পেরেণ্ট লিমিটেড কোম্পানীর পরীক্ষাগারে এই আবিষ্ক্রিয়ার পরীক্ষা বৃটিশ রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে সমস্ত রেলওয়েতে পরিগৃহীত হইবে।

একসঙ্গে ৪টি সন্তান প্রসব

মিসেস ম্যাক্‌কোগায়ার একজন রেল কর্ম্মচারীর স্ত্রী, তিনি একসঙ্গে ৪টি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, সন্তানগুলি সকলেই সুস্থ শরীরে জীবিত আছে। বর্ত্তমান বর্ষে এইরূপ ৪টি সন্তান প্রসবের বিবরণ গ্রেট্ বৃটেনে ও অন্যান্য বৈদেশিক রাজ্যে আরো পাওয়া গিয়াছে।

এট্‌নার অগ্ন্যুদ্গার

সম্প্রতি এট্‌না আগ্নেয়গিরি ৬০০০ ফিট উর্দ্ধস্থিত নূতন মুখ বিস্তার করিয়া অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতে নিকটবর্ত্তী শ্যামল পল্লীসমূহ ধ্বংস-পথে অগ্রসর হইতেছে। শূন্যপথে অগ্নিকণা নির্গত হইয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এবং গলিত ধাতু-নিঃস্রাব প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত নদীর আকার ধারণ করিয়াছিল।

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি

সুবিখ্যাত লেখক বার্ণার্ড স গত জুলাইমাসে এক স্ত্রীসমিতির সম্পাদিকার নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হন। তাহাতে ঐ মহিলা বার্ণার্ড সকে তাঁহার The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism

পুস্তকের এক খণ্ড ঐ সমিতির জন্ম উপহার দিতে অনুরোধ করেন। ৭ সপ্তাহ পরে বার্ণার্ড স ঐ চিঠির নিম্নে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়া ফেরত পাঠান যে, "যে সমিতি ১৫ শিলিং ব্যয় করিতে পারেনা সে সমিতি কোন সভ্যেরই চিত্তাকর্ষক নহে, দ্বিতীয়তঃ বই পয়সা না দিয়া না কিনিলে কেহই পড়ে না। সুতরাং বই দেওয়া হইবে না।" স্ত্রীলোকটি ঐ চিঠিখানা ওয়েষ্টেওের এক পুস্তক-বিক্রেতার নিকট ১৫ শিলিংএ বিক্রয় করিয়া বার্ণার্ড সএর একখণ্ড পুস্তক কিনিয়াছেন। আবার নিউইয়র্কের এক পুস্তক-বিক্রেতা ঐ চিঠি ৫ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

১৫ মাইলব্যাপী সুড়ঙ্গ

বেননেভিস্ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া ১৫ মাইল দীর্ঘ ১৫ ফুট পরিধিবিশিষ্ট সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ হইলে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের এক বৃহৎ নিদর্শন সম্পূর্ণ হইবে। তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে কেলিডোনিয়া উপত্যকা এই সুড়ঙ্গের জন্ম অস্থায়ী সহরে পরিণত হইয়াছে। এই সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ব্রিটিশ এলুমিনিয়াম কোম্পানীর কাজের জন্ম জলের শক্তি (water-power) ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বৃটিশ দ্বীপ পৃথিবী বিখ্যাত। এই জন্ম অনেকেই বালকবালিকাগণের শিক্ষার জন্ম বৃটিশ দ্বীপে আসিতে চায়। এখানে সাধারণ স্কুল ব্যতীত প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যাও কম নয়, এবং অনেক স্কুলে ছাত্রগণের পরীক্ষা-পাশের উপযোগী শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যকরী শিক্ষাও প্রদত্ত হয়। অধিকাংশ স্কুলই রেলপথ দ্বারা লণ্ডনের সহিত সংশ্লিষ্ট। লণ্ডন মিড্ল্যাণ্ড স্কটিশ রেল পথের ধারে ৮—১৯ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার জন্ম থারপেনডেনে সেণ্ট জর্জ্জের স্কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের ব্যায়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। নিম্নে কয়েকটি বিদ্যালয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সাটন বিদ্যালয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন কার্য্যকরী শিক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ পাইতে পারে। ১০০ একর জমির উপর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। ছাত্রগণের সমস্ত ভার গ্রহণ করা হয়। খেলিবার মাঠ, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। হল্ নামক স্থানের আইডিয়েল প্রিপেরাটেরী স্কুলে বালকগণের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিষয়ের সুবন্দোবস্ত আছে। ফুটবল, হকি, টেনিস প্রভৃতির ক্রীড়াক্ষেত্র বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন খোলা বাতাসের স্নানাগারও আছে। ২৪০ একর জমির উপর এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। শারীরিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়।

আরও একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, যাহারা দূরে অবস্থান করে, এবং কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার বিষয় অবগত নহে, তাহাদের সুবিধার জন্য সংবাদ দাতা রূপে অনেক এজেণ্ট বর্ত্তমান। কোন বিদ্যালয় সম্বন্ধে কাহারো কোন কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে, কিম্বা যদি কেহ পুত্রকন্যার শিক্ষার বিষয়ে কোন পরামর্শ চাহেন, তাহাও এই কোম্পানী তাঁহাদিগকে প্রদান করে।

লণ্ডনে বৃহত্তর সিনেমা-গৃহ

বর্ত্তমানে সিনেমা-গৃহে দিন দিন দর্শকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান সিনেমাসমূহ দর্শকের স্থান সঙ্কুলানে অক্ষম। নিউ গ্যালারি সিনেমায় ১৪০৭ জনের স্থান আছে; প্লাজা সিনেমায় ২০০০ দর্শক বসিতে পারে। নিউ এম্পায়ার সিনেমায় ২৫০০ সিট বর্ত্তমান; কিন্তু ইহার চেয়েও বৃহত্তর সিনেমা-গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব চলিতেছে। নিউ ইয়র্কের সিনেমা-গৃহের মত উহাতে কমপক্ষে ৬০০০ লোকের স্থান হইবে। বর্ত্তমানে দর্শকেরা ছায়াচিত্র দেখার সঙ্গে সঙ্গে বসিবার আসনের সুবন্দোবস্ত, বৃহত্তর ভোজনাগার, আরাম কক্ষ প্রভৃতিও চায়; কেবল মাত্র চিত্র দেখিয়াই সন্তুষ্ট নহে। কাজেই সিনেমা গৃহের সত্ত্বাধিকারীগণকেও সেই ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

ইয়োরোপে বিষম ঝড়

দক্ষিণ ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে ১৬ই নভেম্বর তারিখে বিষম ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের প্রকোপে ৪৯জন লোক নিহত এবং বহু সংখ্যক লোক আহত হইয়াছে। ইয়োরোপের ৮০টি সহরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের বিলম্ব ঘটিয়াছিল। মন্ মাউথ শায়ারের বহু গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং ৩০টি পরিবার আশ্রয় বিহীন হইয়াছিল। বৃক্ষাবলী উন্মূলিত হওয়ায় রেলপথ বন্ধ হয়। একখানি কাঠের গৃহ ভূমিসাৎ হওয়ায় একটি লোক চাপা পড়ে এবং পরে তাহাকে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে পাঠান হয়। মেরিয়্যান নামক স্কুনার জাহাজের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক একজন মাত্র নাবিককে পাইলট বোট ডিউলাস রকৃস নাইক দ্বাপ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এই নাবিক ৩৬ ঘণ্টা অনাহারে ছিল। অন্যান্য নাবিকগণ সকলেই সলিলগর্ভে নিহিত হইয়াছে। এই ঝড়ে লণ্ডন সহরেরও ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। কোন কোন দোকানের জানালা উড়িয়া গিয়াছিল। একখানা মটরকার অন্য এক খানির উপর নিপতিত হওয়ায় দুই খানিই জখম হইয়াছে। বেকার ষ্ট্রীটে একখানি গৃহের কাঠের প্রাচীর নিপতিত হইবার সময় একটি পুলিশ কনষ্টবলের প্রত্যুৎপন্নমতিতে অনেক লোকের জীবন বাঁচে।

বৃটিশ ফিল্মের চাহিদা

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ ফিল্মের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৪ সনে মাত্র ২০-৩০ খানা ফিল্ম প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯২৬ সনেও ৪০খানা ফিল্ম প্রস্তুত হয়। ১৯২৮ সনে ১৮০ খানা ফিল্ম প্রস্তুত হইয়াছে। হোম সেক্রেটারী বলেন ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে যখন বৎসরে ২৫০ খানা ফিল্ম প্রস্তুত হইবে। বর্ত্তমানে, জাপানে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ ফিল্মের চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে।

যাত্রীবাহী আকাশযান-পরিচালনায় রমণী

ফ্রান্সের মাদাম মারিশ বাস্তিয়ে নাম্নী পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া এক মহিলা একখানি ছোট আকাশযান ক্রয় করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানে যাত্রী লইয়া যাইবার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ট্যাক্সীক্যাবের মত ইহাকেও ট্যাক্সী আকাশ-যান নামে অভিহিত করা চলে। তিনি নিজেই এই আকাশযানের চালক।

৪ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বক্তৃতা শ্রবণ

কানাডার শিল্প-বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী মিঃ জেম্‌স ম্যাকম, অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশের কার্ডিফ নগরের প্রদর্শনীতে 'কানাডা দিবস' উপলক্ষে কানাডার অটোয়া নগরে ১২ মিনিটব্যাপী এক বক্তৃতা করেন; ঐ বক্তৃতা কার্ডিফের ৫০০০ হাজার অধিবাসী স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল।

সার জর্জ্জ উইল

ইম্পিরিয়েল টুবেকো কম্পেনীর অংশীদার সার জর্জ্জ উইল মৃত্যুকালে ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবিত অবস্থায় বহু সহস্র পাউণ্ড বৈজ্ঞানিক উন্নতি, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য দান করিয়াছেন। তিনি বৃষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড, হাসপাতালে ৬০,০০০ পাউণ্ড, এবং আর্ট গ্যালারীর বিস্তার কল্পে ৭৬,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মরণ-শুল্ক বাবদ এক্সচেকার ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড গ্রহণ করিয়াছে।

বালকবালিকার সাম্রাজ্য ভ্রমণ

ঈটন মধ্য বিদ্যালয়ের ১৫ জন বালিকা এবং ৩৫ জন বালক কানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ভ্রমণে গমন করিয়াছে। এই ভ্রমণে শিক্ষা ও বিশ্রাম উভয়ই লাভ হয়। জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ছাত্রগণ গ্রেটবৃটেনে ভ্রমণার্থ সমাগত হয়।

প্রাচ্যে প্রতীচ্য পোষাক

আফগানিস্থান, তুরস্ক ও পারস্যে বর্ত্তমানে ইয়োরোপীয় পোষাক প্রচলিত হইতেছে, মুস্তাফা কামালপাশা ফেজের

পরিবর্ত্তে ইয়োরোপীয় টুপী ব্যবহারের নিয়ম করিয়াছেন। ইহাতে বাহ্যতঃ প্রাচ্য প্রতীচ্য ভাবাপন্ন হইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তবিকই কি ইহাতে প্রতীচ্যের ভাবধারা প্রাচ্য ভাবসমূহকে নির্জ্জিত করিয়া প্রাবল্য লাভ করিবে? সার ডেনিসন রস্ মনে করেন, তাহা কখনো সম্ভবপর নহে। কারণ প্রাচ্য যতই প্রতীচ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হউক না কেন, সে তাহার নিজস্ব জিনিষ ছাড়িতে পারিবে না। কোন দিনই তুরস্কের মস্‌জিদ্‌সমূহ উঠিয়া গিয়া তাহাদের স্থানে খৃষ্টানের গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

নিমজ্জমান জাহাজের যাত্রী

মেসার্স লেম্পার্ট হোল্ড কোম্পানীর যাত্রী জাহাজ আমেরিকার উপকূল হইতে ২০০ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ জাহাজে নাবিক ও যাত্রী লইয়া সর্ব্বসমেত ৩৩৯ জন লোক ছিল। যখন সমুদ্র-তরঙ্গ জাহাজের ডেকের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন নৌকায় করিয়া ২১০ জন যাত্রীকে নামাইয়া দেওয়া হয় এবং জাহাজের কাপ্তেন ও অবশিষ্ট নাবিক জাহাজেই অবস্থান করে। মাইকেল লেউলিন বিনাতারের সংবাদ প্রেরণে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অবিরত চতুর্দ্দিকে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। বেতার সংবাদে প্রকাশ ২১০ জন যাত্রীর জীবনরক্ষা হইয়াছে।

নাচঘরের মূল্য ১২৭,০০০ পাউণ্ড

লণ্ডন ওল্ড বণ্ড ষ্ট্রীটের এম্বেসীক্লাব নামক নাচঘর ১২৭,০০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। এই নাচঘরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ লুইগি প্রথমে প্রতি সপ্তাহে ৬ শিলিং বেতনে বাট্‌লারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এখন তাঁহাকে নূতন সত্ত্বাধিকারী বার্ষিক ৬,০০০ পাউণ্ড বেতনে পূর্ব্বপদে বাহাল রাখিয়াছেন। ৮ বৎসরে মিঃ লুইগি প্রায় ১২০,০০০ পাউণ্ড লাভ করিয়াছে।

রেলগাড়ীর প্রতিযোগী নূতন মটরকার

গ্লাসগো মটর প্রদর্শনীতে বিলাসিতার চরম উৎকর্ষ সাধক নূতন মটরগাড়ী প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গাড়ী রেলগাড়ীর চেয়ে অধিক আরামপ্রদ এবং নিরাপদ্। প্রত্যেক গাড়ীতে ১২টি বার্থ আছে এবং প্রত্যেক বার্থে একজন লোকের উপযুক্ত শয্যা ও পড়িবার জন্য আলো এবং গার্ডকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা সংলগ্ন আছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গাড়ীতে রান্নাঘর ও বাথরুম আছে এবং রাত্রির যে কোন সময়ে সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বহুদূরব্যাপী নৈশ ভ্রমণের পক্ষে এ গাড়ী অত্যন্ত সুবিধাজনক। ইহাতে আমেরিকার পুলম্যান কারের সমস্ত সুবিধাও বর্ত্তমান। বিশেষ প্রয়োজন হইলে এই গাড়ী হইতে যাত্রীগণকে ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে অবতরণ করান চলিতে পারে। এই গাড়ীর যাতায়াতের ভাড়া সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর ভাড়ার সমান, শয়নের বন্দোবস্ত রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর চেয়েও ভাল। কোন কোন গাড়ীতে ক্ষুদ্র লাইব্রেরী এবং গাড়ীর গতিনির্দ্দেশক যন্ত্রও রহিয়াছে; তাহাতে যাত্রীরা পুস্তক পাঠ করিতে পারে, এবং গাড়ী ঘণ্টায় কত মাইল চলিতেছে, তাহাও জানিতে পারে।

বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তার

মিঃ উইলিয়ম হ্যারিসন এবং থমাস উড নামক দুই ব্যক্তি বৈদ্যুতিক শক্তির এক পেটেণ্ট যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাদ্বারা ক্ষুদ্র একটি ব্যাটারির সাহায্যে একটি বৃহৎ বাড়ী আলোকিত করা যায়। মিঃ হ্যারিসন বলেন যে বৈদ্যুতিক শক্তিকে ঘনীভূত অবস্থা হইতে বিস্তৃত করা সম্ভব; এবং ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ঐ পেটেণ্ট যন্ত্রের ক্ষুদ্র ব্যাটারীর দ্বারা অতি সামান্য খরচে একটি বাড়ী বা ভিলাকে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আলোকিত করা সম্ভবপর। যদি বাড়ীতে পূর্ব্বেই বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকে, তবে ল্যাম্পের ছিদ্রের মধ্যে যন্ত্রের কাচখণ্ড প্রবিষ্ট করাইলে অবিলম্বে ২০০ ভোল্টের অর্দ্ধ ডজন আলো জ্বালান সম্ভবপর হইবে, অথচ পূর্ব্বের বাতির একটি জ্বালাইতে যে খরচ হইত, তাহার এক কপর্দ্দকও বেশী হইবে না।

জেনারেল বুথ ও স্যালভেশান আর্ম্মি

জেনারেল বুথের পিতা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্যালভেশান আর্ম্মির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে তাহা পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়াছে। ৮৩টি দেশে ইহার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীতে ১৫০০০ শাখা কার্য্যালয় এবং ১০০,০০০জন বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী আছে। এই প্রতিষ্ঠান বৎসরে ১৫,০০০,০০০ নরনারীকে আহার এবং ১০,০০০,০০০ জনকে আশ্রয় প্রদান করে। পৃথিবীর বহু দেশের অপরাধীগণকে উহারা সৎপথে আনিবার চেষ্টা করে, অনাথকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। জেনারেল বুথ ও তাঁহার পিতা তাঁহাদের নব দীক্ষিতদিগের মধ্যে অনেক উপযুক্ত নরনারী লাভ করিয়াছিলেন, যাহাদের সহায়তায় এই গঠনকার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু জেনারেল বুথই ইহার সর্ব্বময় কর্ত্তা। জেনারেল বুথ ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

জাপান-সম্রাটের অভিষেক

জাপান-সম্রাট হিরোহিতো বিগত ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাহার পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি ১২৪ তম সম্রাটরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন এবং যথারীতি অভিষেক কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। লণ্ডনের জাপান দূত-নিবাসে বহুসংখ্যক জাপানী ঐ অভিষেক দিবসে সমাগত হইয়া সম্রাটের অভিষেক কার্য্য বিঘোষিত করিয়াছিল।

কৃষি-ব্যাঙ্ক

লণ্ডনে কৃষকদিগকে ঋণ দানের জন্য ৬৫০,০০০ পাউণ্ড মূলধনে নূতন কৃষি-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি অংশ ১ পাউণ্ড হিসাবে এই মূলধন ৬৫০,০০০ অংশে বিভক্ত। এই ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব এই যে, ইহার অংশীদার সমস্তই লণ্ডনের বড় বড় ব্যাঙ্ক। জনসাধারণ ইহার অংশ ক্রয় করিতে পারে না। ইহার উপর প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্ট ৬০ বৎসরের জন্য মূলধনের সমান টাকা ধার দিবেন। এতদ্ভিন্ন ট্রেজারী ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ১০,০০০ পাউণ্ড হিসাবে প্রদান করিবে। এই ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা বার্ষিক ৫½ টাকা সুদে জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষকগণ টাকা ধার লইতে পারিবে; ঐ ধার ছয়মাস অন্তর কিস্তিতে ৬০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধনীয়। টাকা ধার লইবার সময় কোন ব্যাঙ্কের মারফৎ দরখাস্ত করা দরকার, নতুবা ধার দেওয়া হইবে না।

লণ্ডন-ভারতীয় আকাশপথ

আগামী ৩০শে মার্চ্চ তারিখ হইতে ক্রয়ডন হইতে করাচী পর্য্যন্ত আকাশপথে ডাক ও যাত্রীবাহী আকাশযান সর্ব্বপ্রথম যাত্রা করিবে ও আকাশপথ রীতিমত খোলা হইবার প্রস্তাব চলিতেছে। এখন হইতে আকাশযানে সিট রিজার্ভের জন্য আবেদনপত্র ক্রমাগত আসিতেছে। আকাশ-পথে চিঠির মাশুল প্রতি আউন্সে ৯ পেন্স করিয়া লাগিবে। প্রতি সপ্তাহের শনিবার আকাশযান ক্রয়ডন ত্যাগ করিবে ও করাচী হইতে প্রতি সোমবার আকাশযান লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইবে। এই ভ্রমণে ছয় দিন ৫¾ ঘণ্টা লাগিবে। নিম্নে বিস্তৃত সময় তালিকা প্রদত্ত হইল :—

ক্রয়ডন	ছাড়িবে	৫—৪৫	সকাল	শনিবার
প্যারিস	পৌঁছিবে	৮—১৫	ঐ	”
বাসেল	”	১২—০	মধ্যাহ্ন	”
জেনোয়া	”	২—৫০	রাত্রি	রবিবার
রোম	পৌঁছিবে	৯—০	রবিবার	সকাল
স্যারাকুজ	”	২—২৫	”	অপরাহ্ণ
নেভেরিনো	”	৯—৪৫	সোমবার	সকাল
তোব্রাক	”	৩—০	”	অপরাহ্ণ
আলেকজেন্দ্রিয়া	”	৯—৪৫	মঙ্গলবার	সকাল
গোজো	”	২—৪০	”	অপরাহ্ণ
রাতবর	”	৮—৪৫	বুধবার	সকাল
বাগদাদ্	”	১২—০	”	মধ্যাহ্ন
বস্‌রা	”	৩—৪৫	”	অপরাহ্ণ
বুশায়ার	”	৫—৪০	বৃহস্পতিবার	সকাল
লিন্‌গে	”	১০—১৫	”	ঐ

জাস্ক	"	১—২০	বৃহস্পতিবার	অপরাহ্ণ
গোয়াদের	"	৬—০	শুক্রবার	সকাল
করাচী	"	১০—৩০	"	ঐ

এই আকাশ পথ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) ইয়োরোপীয় বিভাগ—লণ্ডন হইতে জেনোয়া—৬৩৫ মাইল

(২) ভূমধ্যসাগরীয় বিভাগ—জেনোয়া হইতে আলেকজান্দ্রিয়া—১৫০০ মাইল

(৩) পূর্ব্ব বিভাগ—আলেকজান্দ্রিয়া হইতে করাচী—২৫০০ মাইল

বর্ত্তমানে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রথম মাসে কেবলমাত্র ডাক বহন করা হইবে ও যাত্রী বহন করা হইবে না। এই আকাশ যানে ২২ জন যাত্রীর স্থান আছে। এবং উহা প্রতি বারে ১ টন (২৭মন) ডাকের জিনিষ বহন করিবে। ৩০শে মার্চ্চ ক্রয়ডন ছাড়িয়া ৬ই এপ্রেল্ করাচী পৌঁছিবে।

(ইংলিসম্যান)

বেলুড় ৺রামকৃষ্ণ মিশন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল

এই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত ছাত্রগণকে তাঁতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ ও কাঠের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহাতে বালকগণ ব্যবহারোপযোগী কাপড়, গামছা, ঝাড়ন প্রভৃতি বস্ত্রাদি বয়ন করিতে পারে, পরিচ্ছদের জন্য ফতুয়া, পিরাণ, সার্ট, কোর্ট প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারে এবং গৃহাদির আসবাব পত্রাদির মধ্যে আবশ্যকীয় চেয়ার, টুল, বেঞ্চ, আলমারি প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ে ২১টি ছাত্র উক্ত প্রকার শিল্প শিক্ষা করিতেছে। তাঁতের কাজের জন্য ৭।৮খানি তাঁত এবং সেলাইএর কাজের জন্য তিনটি সেলাই কল ব্যবহৃত হইতেছে। কাঠের কাজ শিখাইবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হইয়াছে। বালকগণ যাহাতে হাতের কাজ ছাড়া লেখাপড়া শিখিতে পারে তজ্জন্য প্রাতঃকাল ও রাত্রিকালে বাঙ্গালা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইংরাজী, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মঠের নাতিদূরে ষ্টিমার ঘাটের উপরিভাগে একটি পুরাতন দ্বিতল বাড়ীতে ছাত্রাবাস খোলা হইয়াছে। ছাত্রাবাসের যাবতীয় কার্য্য পালাক্রমে শিক্ষার্থীদের উপর ন্যস্ত থাকায় অতি অল্প বয়স হইতে বালকগণ স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বালকগণকে ব্যায়াম, ক্রীড়া ও ভক্তিমূলক স্তোত্রাদি পাঠ করিতে হয়। দরিদ্র বালকগণকে বিনামূল্যে গ্রাসাচ্ছাদন সরবরাহ করা হয়।

নীহার

সরকারী কৃষি-কমিশন

ভারতের কৃষি ও কৃষকদিগের উন্নতির পন্থা নির্দ্ধারণ জন্য মার্কুইস অফ লিনলিথগোর সভাপতিত্বে একটি কৃষি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহার সুদীর্ঘ বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষিশিল্প সম্বন্ধে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—

(১) কৃষির উন্নতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত এক করা, (২) কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য অর্থ ব্যবস্থা, (৩) গ্রাম, (৪) গ্রাম্য শিল্প ও শ্রমিক এবং (৫) কৃষি বিভাগীয় চাকরী।

কৃষির উন্নতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত এক করা সম্বন্ধে রিপোর্টে—সার দেওয়া, বীজ বোনা ও চাষ করার পক্ষে যে কৃষকদের কত সুবিধা হইবে, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। খৈল, হাড় ও মাছের সার ব্যবহারের জন্যও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পশুর মৃত্যুহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। আরও বিস্তৃতভাবে পশু-রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা আবশ্যক। সে জন্য পশু চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। অন্ততঃ প্রতি ২৫ হাজার পশুর জন্য একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও প্রত্যেক জেলায় যেখানে ৬ লক্ষ পশু আছে, সেখানে একজন সার্জ্জন রাখিতে হইবে। হিসাব করিয়া দেখা যায় সমগ্র ভারতে ৬ হাজার এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন আছে; বর্ত্তমান সংখ্যার ৬গুণ নিযুক্ত করিতে হইবে।

কমিশনের মতে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কৃষকদের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা। ভারতের কৃষক দেনার দায়ে

সর্ব্বস্বান্ত হইতে চলিয়াছে। অর্থাভাবে জমির চাষ ভালরূপ হয় না এবং দেনার দায়ে জমি কৃষকের হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে। ভাল ও খাঁটি বীজ না পাওয়ার জন্য ফসল ভাল হয় না, বেশীও হয় না।

যে ফসল হয় বাজার দর সম্বন্ধে অজ্ঞাতাবশতঃ তাহাও তাহারা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে না। জমির জোত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় উন্নত প্রণালীতে চাষের অসুবিধা হয়। অবসর সময়ে কৃষকেরা যাহাতে আরও কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার।

আরও দরকার গ্রামের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা এবং পশু-চিকিৎসা ব্যবস্থা। এ বিষয়ে সরকারী এবং বে-সরকারী অনেক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হইয়াছেন।

রাস্তা কমিটি বড় বড় রাস্তার উপরই মনোযোগ দিতেছেন; অথচ গ্রামের রাস্তার উন্নতি করা আরও বেশী প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে নদী-পথেরও উন্নতি করিতে হইবে। রাস্তার সঙ্গে রেলপথের যোগ রাখিতে হইবে। তাহাতে মালপত্র চলাচলের এবং বাজার সম্বন্ধে খোঁজ রাখার পক্ষে সুবিধা হইবে। ভারতের ফসল যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে বাহিরে বিক্রয় হইতে পারে, সেজন্য বিলাতের কৃষি কমিশনারের অফিসে ভারতের ফসল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জনৈক কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে। কলিকাতার ব্যবসা সম্বন্ধীয় সংবাদ সরবরাহের অফিসেও অনুরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি রাখিতে হইবে।

সর্ব্বোপরি কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা-বিভাগ না খুলিলে সত্যিকার কোন উন্নতিই হইতে পারে না। এজন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা-বিভাগ এবং প্রত্যেক প্রদেশে গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিভিন্ন ফসলের জন্য পৃথক পৃথক গবেষণা-বিভাগ খোলা প্রয়োজন। সেই সেই ফসলের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ জড়িত, ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাদের অর্থেই সেই সেই বিভাগ চলিতে পারে, তাহার উপর সরকার কিছু দিবেন এবং কৃষি-বিভাগের সহিত এই গবেষণা-মন্দিরগুলির যোগ রাখিতে হইবে।

কৃষকদের স্ত্রী ও পুরুষদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী উন্নত করিয়া অভাবের সম্বন্ধে সচেতন করিতে হইবে। তখন তাহারা নিজেরাই সেজন্য চেষ্টিত হইয়া উঠিবে।

সর্ব্বশেষে কমিশনার জানাইয়াছেন, উর্দ্ধতন কৃষি বিভাগে বাহির হইতে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক রাখিতে হইবে, নহিলে কাজের কাজ কিছু হইবে না।

নীহার

ভারতে কৃষি

১৯২৭-২৮ সালে বঙ্গে রবিশস্য

সমগ্র ভারতে যতটা জমীতে গ্রীষ্মকালীন ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ০'৫ ভাগ জমী বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ৩০২৪৫০০ একর জমীতে রবিশস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ বৎসর ২৬০৭৩০০ একর জমীতে রবিশস্য রোপিত হইয়াছে, গত বৎসর ২৭৫৩০০ একর জমীতে রবিশস্য হইয়াছিল। এই পরিমাণ জমীর মধ্যে ৩৯৯৭০০ একর জমীতে বোরো ধান্য রোপিত হইয়াছে, গত বৎসর ৪০৮২০০ একর জমীতে বোরো ধান্য হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ২৯০৩০০ একর জমীতে তামাক হইয়াছে, গত বৎসর ২৯৫২০০ একর জমীতে তামাক হইয়াছিল।

এ বৎসর স্বাভাবিকের শতকরা ৭৮ ভাগ বোরো ধান্য হইবে। প্রতি একর জমিতে ১৪ মণ চাউল উৎপন্ন হয়, এই হিসাবে ধরিলে এই বৎসর ৪৪৮৮৪০০ মণ ধান্য হইয়াছিল।

দেশীয় রাজ্য ছাড়িয়া দিলে সমগ্র ভারতে	জমীর পরিমাণ	
জমীর পরিমাণ	৬৬৮০০০০০০	একর
কৃষির উপযোগী নহে	২৩৬০০০০০০	„
জঙ্গল	৮৭০২৯০০০	„
কৃষির উপযোগী কিন্তু চাষ হয় না	১৫২৫৩১০০০	„
অনুর্ব্বর জমী	৪৯৬০৮০০০	„
চাষের জমী	২২৬০১২০০০	„
একাধিকবার বপন হয় এরূপ জমী	২৫৬০০০০০০	„

বিভিন্ন প্রকারে জলসেচ করা চাষের জমির পরিমাণ

খাল দ্বারা জলসেচ করা	জমীর পরিমাণ	২৫০০০০০০	একর
কূয়ার দ্বারা	”	১২০০০০০০	”
পুষ্করিণীর দ্বারা	”	৬০০০০০০	”
অন্যান্য উপায়ে	”	৫০০০০০০	”
ধান্যের	”	৭৮৫০২০০০	”
গমের	”	২৪৯১৮১০০০	”
যবের	”	৬৩৮৭০০০	”
ডালের	”	২৯১৫৪০০০	”
ছোলার	”	১৪৬৬৪০০০	”
ইক্ষুর	”	৩০৪১০০০	”
চিনির	”	৩০৪১০০০	”

বিভিন্ন প্রকার শস্যের জমির পরিমাণ

মশলা, ফল, শাকসব্জী প্রভৃতি

খাদ্য দ্রব্যের জমির পরিমাণ		৭৫৩৭০০০	একর
তিষির	”	২৩২৫০০০	”
তিলের	”	৩১৭২০০০	”
সরিষার	”	৩২৮০০০০	”
চিনা বাদামের	”	৩৮৬৪০০০	”
নারিকেলের	”	৬৩৪০০০	”
রেড়ীর	”	৫৭৬০০০	”
তুলার	”	১৫৬৮৭০০০	”
পাটের	”	৩৬০৬০০০	”
শণ প্রভৃতির	”	৮০৫০০০	”
নীলের	”	১০৪০০০	”
আফিমের	”	৫৯০০০	”
কফির	”	৯১০০০	”
চায়ের	”	৭৩৮০০০	”
তামাকের	”	১০৫৫০০০	”
পশ্বাদির খাদ্যের	”	৮৯৪০০০০	”

সঞ্জীবনী

ভারতের গরু

আমরা জন প্রতি মাত্র এক ছটাক দুগ্ধ খাইতে পাই—

সাল	গরুর সংখ্যা
১৯১৭-১৮	১৮৫,১১,১২,০০৯
১৯২০-২১	১৪৫,১১,০৯,০০৯
কমিয়াছে	৪০,০০,০৩,০০০

ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ গরু কেবল খাদ্যের জন্য নষ্ট হয়।

পৃথিবীতে অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রতিশত লোকের মধ্যে গড়ে কতকগুলি গরু আছে তাহার তালিকা :—

দেশ	সংখ্যা
অষ্ট্রেলিয়া	২৫৯
নিউজিল্যাণ্ড	১৪০
কেপ কলোনি	১২০
কানাডা	৮০
আমেরিকা	৭৯
ডেন্‌মার্ক	৭৪
ভারত	৫০

ভারতে একশত লোকের ৫০টি গরু আছে। এ দেশের গরু দুগ্ধ কম দেয় সুতরাং গড়ে আমরা প্রত্যেকে এক ছটাক দুগ্ধ সেবন করিতে পাই। শিশুর পক্ষে এক ছটাক মাত্র দুগ্ধ কি প্রচুর? অষ্ট্রেলিয়ার লোকে গো-মাংস খায় ও গো-সেবা করে ও প্রচুর দুগ্ধ পায়, তাহাদের মধ্যে গরুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা গোমাতা করিয়া চীৎকার করি কিন্তু গরুর সেবা করি না। এই ভণ্ডামীর জন্য আমাদের দেশের গরুর অভাব সুতরাং দুগ্ধেরও অভাব ও তাহার ফলে অপুষ্ট ও দুর্ব্বল দেহে আমরা জীবন যাপন করি ও অল্পদিন বাঁচি। আমাদের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য এখন বিদেশ হইতে টিনে করিয়া দুগ্ধ আসে আর আমরা এই অস্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষিত দুগ্ধ সেবন করি।

সঞ্জীবনী

গোজাতির উন্নতি

গোজাতির উন্নতি এবং গোরক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

(১) যাহাতে গোপালন বিষয়ে লোকের পূর্ব্বকালের ন্যায় ধর্ম্মভাব ফিরিয়া আসে তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(২) আবশ্যকমত গোচারণ-জমি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৩) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গোখাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৪) যাহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গো-জননের সাহায্য হয় তজ্জন্য উৎকৃষ্ট গো-বৃষের রক্ষার এবং সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৫) বর্ত্তমানে দেশের গো-র সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে অনিয়মিতভাবে গোহত্যা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং অন্ততঃ যাহাতে দুগ্ধদানক্ষম ও কৃষিকার্য্যাদির উপযোগী গো এবং গোবৎস হত্যা নিবারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৬) দেশ হইতে অবাধে বিদেশে গো চালান যাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৭) স্থানে স্থানে গোরক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে এবং যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাবে গরু বেচিয়া ফেলে তাহাদিগের নিকট হইতে গো ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ঐ সকল আশ্রমে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৯) গো সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নির্ম্মাল্য

খাদ্য ও রোগ

বাঙ্গালা দেশে ক্রমাগত বেরিবেরি রোগ এবং এমন অন্যান্য রোগ সকল হইতেছে যাহা খাদ্যের দোষে বা অখাদ্য ভক্ষণে হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগ বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের খাদ্য কি ও তাহারা কি খায় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অনুসন্ধান সম্প্রতি কলিকাতায় আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ফণ্ড এসোসিয়েশন ১৬ হাজার টাকা দিয়াছেন ও তিনজন ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন এমন এক চিকিৎসকের সহিত সংবাদপত্রের একজন প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই চিকিৎসক বলিয়াছেন যে মোটামুটিভাবে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, জনসাধারণ কি সেবন করিতেছে তাহা তাঁহারা জানেন। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় একটা দিনে কোন দ্রব্য কতটা পরিমাণে সেবন করিয়াছে তাহা অতি অল্পলোকেই বলিতে পারে এবং তাহারা যাহা সেবন করে তাহা প্রচুর কিনা, কিম্বা তাহাতে শরীরের প্রয়োজনীয় সকল পদার্থ আছে কিনা একথা প্রায় কেহই জানে না।

মানুষের খাদ্যে এবং জীবের শরীরের ক্ষয় ও পূরণ কার্য্যে ভিটামিন বা খাদ্য বীর্য্যের যে স্থান তাহা আধুনিক আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে এবং খাদ্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান থাকার প্রয়োজন বুঝা গিয়াছে। মোটামুটি ভাবে দেখা যায় যে অনেক জাতির মধ্যে, ইউরোপীয় এবং শিক্ষিত ভারতবাসী ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সকল খাদ্যদ্রব্য প্রচলিত তাহাতে ভিটামিন বা খাদ্যবীর্য্য ও কতকগুলি খনিজ দ্রব্য যথা, চূণ, লৌহ প্রভৃতি কম থাকে। ইহা ব্যতীত প্রায় সকলেই এমন খাদ্য সকল সেবন করে যাহাতে অম্লের উৎপত্তি হয়। যথা শস্য, চাউল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি সকলেই অম্লোৎপাদক। তেমনি মাংস, মৎস্য, মুর্গীর মাংস, ডিম্ব প্রভৃতিও অম্লোৎপাদক খাদ্য, অপরদিকে ডাল, শিম, মটর, ছোলা এবং সকল ফল ও শাকসব্জী ক্ষার উৎপাদক খাদ্য। দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি সেবনে (ঘি ও মাখন ব্যতীত) অম্ল ও ক্ষার কোনটারই উৎপত্তি হয় না। সহজ কথায় বলিতে গেলে ইহা বলা যায় যে, যে সকল খাদ্য সেবনে অধিক অম্লের উৎপত্তি হয় তাহাতে ভিটামিন ও চূণ থাকে না।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র দোষযুক্ত খাদ্য সেবনের ফল সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতেছে। একথা জানা আছে যে অনেক রোগ যথা শিশুর শরীর বৃদ্ধির অভাব, নরম হাড় হওয়ার কারণ, চর্ম্মরোগ, দন্তের পাইওরিয়া রোগ, বেরিবেরি প্রভৃতি খাদ্য নির্ব্বাচনের ভ্রমের ফলে হইয়া থাকে। একথাও অনেকে বিশ্বাস করেন যে, কুষ্ঠ, ক্ষয় কাশ, কাস এবং অনেক প্রকার

চর্ম্মরোগ খাদ্য দ্রব্যের অপূর্ণতার দরুণ হয়। সম্প্রতি আরও সন্দেহ হইয়াছে যে ক্যান্সার বা কর্কট রোগ, ধমনীর কঠিনত্ব, কোন কোনও রকম হৃদরোগ এবং কোন কোনও যকৃত ও মূত্রাশয়ের রোগ গৌণ বা মুখ্যভাবে অপূর্ণ খাদ্যের দোষে হইয়া থাকে। যে সকল খাদ্য সেবন করা যায় তাহা ব্যতীত, যে প্রকারে খাদ্য তৈয়ারী হয় তাহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক খাদ্য কাঁচা অবস্থায় অতি উত্তম খাদ্য বলিয়া পরিগণিত কিন্তু তাহা রন্ধন করিলেই তাহার গুণ নষ্ট হয়। আজকাল আধুনিক মানব তাহাদের খাদ্য এরূপভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছে যে তাহার খাদ্য একদিকে নানা উপচারে অতি মাত্রায় রন্ধন করা, না হয় সাধারণ ভাবে রন্ধন করা। রন্ধন করা খাদ্য শক্তি বা জীবন হীন এবং মৃত মাংসকে যেমন প্রাণযুক্ত জীব করা যায় না তেমনি রন্ধন করা খাদ্য হইতে জীবনশক্তি কম পাওয়া যায়।

এই কারণে এখন দেখা প্রয়োজন যে ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের খাদ্যের কি কি পরিবর্ত্তন হইতেছে ও আমরা কি খাইতে অভ্যাস করিতেছি। এই সকল অনুসন্ধানে আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ পাইবে।

ইহা জানা কথা যে সেকালের ন্যায় পুরাতন রকম জাতীয় খাদ্য যথা ছোলা ভিজান, চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি আজকাল সহরবাসী বাঙ্গালী অতি কম আহার করে। এই সঙ্গে এটাও বলা প্রয়োজন যে বাঙ্গালীর মধ্যে অজীর্ণ রোগ প্রায় সকলেরই আছে। এই দুইটির মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহাও দেখা উচিত। ইহা ব্যতীত আজ কাল মোটা আটা ছাড়িয়া দিয়া সাদা ময়দা হইতে প্রস্তুত দ্রব্য সকলে আহার করিয়া থাকেন। সেকালে টাট্কা আটা প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত হইত। ঢেঁকী ছাঁটা চাউল ছাড়িয়া দিয়া কলের মার্জ্জিত শুভ্র চাউল আজকাল ব্যবহৃত হয়। দেশীয় মিষ্টান্ন ও কলের উদ্ভিজ্জ তৈল আজকাল ব্যবহৃত হয় এবং সেকালের গুড়ের তৈয়ারী মিষ্টান্ন আর পছন্দ হয় না ইহাতে অতি মূল্যবান্ ভিটামিন বা খাদ্য বীর্য্য আছে এবং সাদা ময়দায় চুণের ভাগ নাই বলিলেই হয় কিন্তু আটায় অনেক পরিমাণ চুণ আছে।

সেই চিকিৎসক বলিয়াছেন যে ইহা খুবই সম্ভব যে এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইবে যে বাঙ্গালীর যে খাদ্য তাহাতে জীবন রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় পদার্থ অতি কম আছে কিন্তু বাঙ্গালী যে খাদ্য খায়, তাহা দেখিতে ভাল ও রসনা তৃপ্তিকর বলিয়া আপন মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে।

সঞ্জীবনী

ভাতের অপকারিতা

ম্যাট্সমুয়া নামক জনৈক জাপানী পণ্ডিতের মতে এশিয়াবাসী জাতিবর্গের অবনতির কারণ এই যে, ভাতই তাহাদের প্রধান আহার্য্য। ম্যাট্সমুয়া বলেন, হিন্দুজাতি ভাত খাইয়া ধ্বংস ও অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। চীন এককালে সভ্যতার চরমসীমা অধিকার করিয়াছিল কিন্তু এখন চীনের পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ, ভাতই তাহাদের প্রধান আহার্য্য। রুটি, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি প্রচুর ভিটামিনপূর্ণ খাদ্য ভক্ষণ করিলে শরীরে সামর্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ও বুদ্ধির বিকাশ জন্মায়। ইউরোপীয়ান্ ও আমেরিকান্গণ সেই কারণে আসিয়াবাসীগণ অপেক্ষা বলে, দৈহিক বর্ণে, সৌন্দর্য্যে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছেন।

ভারতে ও চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর হইতে মাংসের ব্যবহার কমিয়া যায়। সেই হেতু ভিটামিনের অভাবে ভারতবাসী ও চীনাবাসীগণের শরীরের ও মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমিয়া যায়। জাপানের বুদ্ধিবৃত্তি এশিয়াবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন ? ইহার কারণ—জাপান চতুর্দ্দিকে সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত থাকায় জাপানীরা প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরিবার সুযোগ পায়। মৎস্য ভক্ষণ করিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মায়।

যেমন ভাত হইতে রুটি অধিক সারবান্, আবার রুটি হইতে মৎস্য মাংসাদি অধিকতর সারবান্, তেমন ডিম সর্ব্বাপেক্ষা সারবান্। পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দ ডিম্ব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। বাঙ্গালীর সুস্থ ও সবলকায়

হইতে হইলে উপযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করা চাই। যে খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ, ছানা, গব্যঘৃত, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি খাওয়া উচিত। বাঙ্গালীজাতি দুর্ব্বল এই অপবাদ ঘুচাইতে হইলে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। গোমাংস, শূকরমাংস প্রভৃতি অখাদ্য ও কুখাদ্য বাদ দিয়া পাশ্চাত্য জাতিদের খাদ্য অনুকরণ করায় ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে।

সঞ্জীবনী

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ

কলিকাতায় প্রতিদিন ৩ হাজার মণ দুগ্ধ প্রয়োজন হয়। ইহার ৮ শত মণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসে এবং ৫০ মণ হাওড়া ষ্টেশনে আসে। কলিকাতার চতুর্দ্দিকের ২৫ মাইল স্থানের মধ্য হইতে এই দুগ্ধ আমদানি হয়। কলিকাতায় ১৫ হাজার দুগ্ধবতী গাভী ও ১১০০ মহিষ আছে। কলিকাতার মিউনিসিপালিটির সীমানার মধ্য হইতে এক হাজার মণ এবং সহরতলী হইতে এক হাজার মণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। গড়ে প্রত্যেক সহরবাসী ১ ছটাক ৩ কাঁচ্চা দুগ্ধ প্রত্যহ সেবন করে। কলিকাতাবাসীর প্রত্যেকের অন্ততঃ অর্দ্ধসের দুগ্ধ সেবন করা উচিত ; এই হিসাবে কলিকাতায় প্রত্যহ ১৩৪৬৫ মণ দুগ্ধের প্রয়োজন কিন্তু মাত্র ৩০০০ মণ দুগ্ধ কলিকাতায় পাওয়া যায়। দুগ্ধের ক্রেতা অনেক, কিন্তু দুগ্ধ কম পাওয়া যায় সেই জন্যই কলিকাতায় ভাল দুগ্ধ টাকায় ২ হইতে তিন সের পাওয়া যায়। গত দশ বৎসর দুগ্ধের দাম বাড়িয়াছে। দর বেশী বলিয়া দুগ্ধে জল, বাতাসা শঠি প্রভৃতি ভেজাল জিনিষ মিশাইবার লোভ বিক্রেতাগণ ছাড়িতে পারে না।

গোয়ালাদের যত্নের অভাবে গাভীর অবস্থা দিন দিন হীন হইতেছে সেজন্য ক্রমে এরূপে গো-জাতি নির্ম্মূল হইতে পারে। শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞগণ উৎকৃষ্ট জাতির গাভী আনিয়া, গাভীর ব্যবসায় ও দুগ্ধের ব্যবসায় করিতে পারেন। ইহাতে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন গাভী পালকদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের নিযুক্ত দুগ্ধ দোহনকারীর দ্বারা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা স্বাস্থ্যসম্মত প্রণালীতে গাভী রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সংগৃহীত দুগ্ধ আনিয়া ইউনিয়নের কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে প্যাষ্টুরাইজ করা হয় অর্থাৎ বাষ্প দ্বারা জীবাণুহীন করা হয় ও তৎপরে বিক্রয় করা হয়।

সঞ্জীবনী

ঘি ও মাখনে ভেজাল ধরিবার উপায়

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মাখন ও ঘি ভেজাল। এই ভেজাল ধরার সহজ উপায় আবিষ্কার করার জন্য পুনা কৃষি কলেজের অধ্যাপক মিঃ গাঙ্গুল অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন, যাহা কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। এই উপায়টি এই—অনার্দ্র এসেটিক ঈথার ও সুরাসার নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে থাকা কালীন বিশুদ্ধ ঘি বা মাখন তাহাতে দিলে কোনও প্রকার তলানি পড়ে না। কিন্তু তাহাতে জন্তুর চর্ব্বি থাকিলে তলানি পড়ে ও যতটা তলানি পড়ে তাহাতে শতকরা কত পরিমাণ জন্তুর চর্ব্বি আছে তাহা সহজে বুঝা যায়। এই সহজ উপায়ে জান্তব চর্ব্বি মিশ্রণের মাত্রা জানিবার উপায়ের সহিত নির্ভুলভাবে জানিবার উপায়ের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শতকরা জান্তব চর্ব্বির পরিমাণ প্রায় একই। ইহা ব্যতীত নানা প্রকার খাদ্য ও ঘনীভূত খাদ্য গবাদিকে খাওয়াইয়া ঘি বা মাখন যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও এই উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পরীক্ষা প্রায় নির্ভুল।

সঞ্জীবনী

শিশু মৃত্যু

১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতে শিশু মৃত্যুর হার

প্রতি সহস্রে মৃত্যুর হার

প্রদেশ	১৯২১	১৯২২	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫ সাল
বঙ্গদেশ	২০৬'১	১৮৭'৭	১৮২'১	১৮৭'১৭	১৭৯'০৫
যুক্ত প্রদেশ	২৬৫'৮	১৮৩'৮	১৯১'৪	১৯১'৯৯	১৭৫'৫১
দিল্লী	২১৭'২	১২০'২৬	২১২'৮৫	১৭৯'৩৩	১৯২'৩৩
আসাম	১৮৮'৫	১৯'৮২	১৭৯'৫	১৮৪'৭৫	১৭৪'৩৫
বিহার ও উড়িষ্যা	১৯১'৪	১৩৯'৯	১৪৬'৫	১৫৮'৪	১৩৭'৬৬
মাদ্রাজ	১৬৬'০	১৬৬'৪	১৭৩'৭	১৭৯'২১	১৮০'৯৪
বোম্বাই	১৭৮'১	১৬৯'১	১৫৯'৭	১৯১'১৭	১৬২'০১
মধ্যপ্রদেশ	২৭৯'৫	২২৮'৭	২২০'৩	২৩৪'৯৪	২০৪'৪৪
পাঞ্জাব	১৯১'৬	১৬৯'৬	১৯৬'৬২	২১২'৫৭	১৮৭'৭১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১৯৫	১৫১'৫	১৪৯'৫	১৬১'৩৬	১৩৯'১৩
ব্রহ্ম	১৭২	১৮৫'৩	১৮৪'১	১৯৭'৮৬	১৮৯'৯৯
কুর্গ	২২৫	২৭২'৫	২১৭'৩	৩৩১'০৩	২৯৩'৫৬
আজমীর মাড়ওয়ার	২৫৬'৩	২০৮'২	২৩৬'৫	২২৭'৪৫	২০৭'৩৫

সঞ্জীবনী

হিন্দুমতে ইয়োরোপ ভ্রমণ

হিন্দু এক্সপ্রেস কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে হিন্দু যাত্রী লইয়া একখানি জাহাজ ইয়োরোপ গমন করিবে। জাহাজে যাহাতে আহারাদি হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য উচ্চ শ্রেণীর পাচক ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী খাদ্য খাইতে অনভ্যস্ত বা যাঁহারা শুদ্ধাচারে থাকিতে চাহেন, অথচ যাঁহাদের ইয়োরোপ ভ্রমণের বাসনা আছে তাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধি, ব্যবসা বা ভ্রমণের জন্য এই সুযোগে ইয়োরোপ দেখিয়া আসিতে পারেন। জাহাজখানি আগামী ১লা জুন বোম্বাই হইতে রওনা হইবে ও তিন মাস পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পোঃ বক্স ৬৭৩১, কলিকাতা এই ঠিকানায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিলে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত বি লাল মহাশয় এই ভ্রমণের উদ্যোক্তা। মেসার্স কক্স এণ্ড কিংস্ কোম্পানীর মারফৎ এই ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা হইতেছে। এই কোম্পানী এখান হইতে যাত্রীদের টাকা পয়সা গ্রহণ করিয়া letter of credit প্রদান করিবে। পত্র লিখিলে বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা পাঠান হয়। এই ভ্রমণে মোট ৯৭ দিন অতিবাহিত হইবে। নিম্নে ভাড়া, আহার ও সময় তালিকা প্রদত্ত হইল।

ভাড়া :—(যাতায়াত, আহার ও দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখিবার খরচ সহ)

বিশেষ শ্রেণী	৩৬০০৲
কেবিন বি „	৩২০০৲
„ সি „	৩১০০৲
„ ডি „	৩০০০৲
ডেক	১২০০৲

আহারের তালিকা :—

প্রাতর্ভোজন	সকাল ৬ টা	চা, দুই রকমের মিষ্ট ও দুই রকমের নোন্তা খাবার
লাঞ্চ	" ৯ টা	ভাত, খিচুরী, ডাল, রুটি, ৪ রকমের নিরামিষ তরকারী, আচার পাঁপড়, ফল ইত্যাদি
টিফিন	অপরাহ্ন ৩ টা	চা, দুই রকমের মিষ্ট ও দুই রকমের নোন্তা খাবার
ডিনার	সন্ধ্যা ৭ টা	লুচি, কচুরী, ৪ রকমের নিরামিষ তরকারী, আচার, পাঁপড়, শুষ্ক ফল ইত্যাদি।

ভ্রমণস্থানের তালিকা

৩রা জুন বম্বে	২৬ দিন
১১ " পোর্টসুদান	
১৩ই " সুয়েজ	
১৪ই " পোর্টসৈয়দ	
২১শে " মার্শেলিস্	
২৮শে " লিভারপুল	
২৯শে " লণ্ডন	১৬ দিন
১৫ই জুলাই প্যারিস	১০ দিন
২৫শে " বার্লিন	৮ দিন
২রা আগষ্ট ভিয়েনা	৫ দিন
৭ই " লুসার্ণ	৮ দিন
১৫ই " নেপল্‌স্	৬ দিন
২১শে " হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর প্রত্যাবর্ত্তন	১৮ দিন

অবস্থিতি সময়

১।	কায়রো	১ দিন
২।	মার্শেলিশ ও মন্টিকার্লো	২ দিন
৩।	লিভারপুল	১ দিন
৪।	লণ্ডন	৩ দিন
৫।	অক্সফোর্ড, বার্মিংহাম্ মানচেষ্টার, গ্লাসগো এডিনবরা, ইয়র্ক, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি	১০ দিন
৬।	প্যারিশ	২ দিন
৭।	ফ্রান্স, বেলজিয়ম, এন্তোয়ার্প, ব্রুসেল্‌স্, আমষ্টার্ডাম, কোলন প্রভৃতি	৭ দিন
৮।	বার্লিন	২ দিন
৯।	লাইপজিগ্ ড্রেসডেন, ব্রেমেন, হামবুর্গ	৫ দিন
১০।	ভিয়েনা, মিউনিক প্রভৃতি	৩ দিন
১১।	লুসার্ণ	১ দিন
১২।	জেনেভা, বার্ণ, জুরিক, ইটালির হ্রদ প্রভৃতি	৬ দিন
১৩।	নেপল্‌স্	১ দিন
১৪।	ভেনিস্, ফ্লোরেন্স, রোম প্রভৃতি	৫ দিন

প্রেরিত পত্র*

শ্রীযুক্ত সুবর্ণবণিক্ সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

আমার এই পত্রখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

বর্ত্তমানে সুবর্ণবণিকবৃন্দের মধ্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের ধুম দেখিয়া কবিবর Wordsworthএর কথাই মনে পড়ে—"What man has made of man."

বাস্তবিক ধরিতে গেলে মানুষের এই দুঃখ-দুর্দ্দশার মূল কে? মানুষের এই দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিলে দেখা যায়, মানুষই মানুষের দুঃখ-দৈন্যের অত্যাচার-উৎপীড়নের মূলীভূত কারণ। বাইবেলের গল্প বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, ইভ-ই জগতের আদি দুঃখের কারণ। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য, আপন সুখ-সম্ভোগের জন্য অন্য মানবের উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না; তাহার প্রমাণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। লঙ্কা, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ, ট্রয়-অভিযান, বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমর সমস্তই একের অন্যের উপর অযথা আধিপত্য লাভের প্রয়াসের ফল।

আবার মাঝে মাঝে এমন মানবও পৃথিবীর বক্ষে আসে, যাহারা সমস্ত মানবজাতিকে এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বদ্ধ করিবার প্রয়াস পায়; বুদ্ধ, খৃষ্ট, সক্রেটিশ, চৈতন্য প্রভৃতি মহামানবগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহারাজ অশোককেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। বর্ত্তমান যুগের রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঋষি টলষ্টয়, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকেও মহামানব নামে অভিহিত করা চলে।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি মানবের মধ্যে দুই বিভাগ বর্ত্তমান। একদল জগতের বক্ষে অশান্তির দাবানল জ্বালিয়া দিয়া আমোদ উপভোগ করেন; অন্য দল জগতের বিরোধ-বিসম্বাদ দূর করিয়া সাম্য ও মৈত্রী সংস্থাপনে সচেষ্ট। বর্ত্তমানে বিংশ শতাব্দীতে জগতের সমস্ত জাতিই উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিরোধ-বিসম্বাদে সুখ নাই, শান্তি নাই—আছে একটা বিরাট্ অশান্তির জ্বালা একটা, হাহাকার! তাই এখন league of nations, disarmament প্রভৃতির জন্য উচ্চ চীৎকার শোনা যাইতেছে—আবার পৃথিবী ব্যাপিয়া সেই সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বুদ্ধমুখ-নিঃসৃত গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হইতেছে—অহিংসা পরমো ধর্ম্ম।

এখন এই সাম্যবাদের বিরাট্ বিস্তৃতির মধ্যে সুবর্ণবণিক্-গণ যে তাঁহাদিগকে গুটিপোকার মত স্বীয় তন্তুজালে আবৃত করিয়া বিশ্বজগৎ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন, বাস্তবিক ইহা সমীচীন কিনা তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

সুবর্ণবণিক্গণ বৈশ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু যে গুণাবলীর একত্র সম্মিলনে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় না দিয়াও বণিক্জাতি ইংরেজ আজ বিশ্বপূজিত, জাপানী অপ্রতিদ্বন্দ্বী, জার্ম্মাণি অর্থ-সম্পদে বলীয়ান, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া পার্শী প্রভৃতি বাণিজ্যের কল্যাণে ধনী হইতেছে, সেই গুণাবলী তাঁহারা সংগ্রহ করুন, বাণিজ্যের তরী বঙ্গসাগরের বিশাল নীল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমন করুক, বৈদেশিক বাণিজ্যে জাপানী, জার্ম্মাণ ও ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হউন, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পার্শীর হাত হইতে ব্যবসা ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া নিজেরা ধনসম্পদে কুবের সদৃশ হউন, পৃথিবী তাঁহাদের নিকট মস্তক অবনত করিবে। যজ্ঞোপবীতের দ্বারা বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন হইবে না।

আরও এক কথা, চরিত্র বল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বল; তাহার নিকটে বিশ্বের সমস্ত শক্তি পরাজয় স্বীকার করে। আর চরিত্র-বলহীনকে কেহই গ্রাহ্য করে না। চরিত্রবলহীন

---

* মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নহেন।

উপবীতধারীকে হয়ত কেহ গ্রাহ্য করিবে না, কিন্তু চরিত্রবান্ অনুপবীতীকে সাগ্রহে মস্তকে ধারণ করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ সন্তান অথচ বহু ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপবীত ত্যাগই করিয়াছিলেন, তথাপি সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিত। ভক্তবীর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে আজও বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজ নতশীর্ষে স্মরণ করিতেছে, শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং যবন হরিদাসের সমাদর করিয়াছিলেন অথচ তিনি ছিলেন যবন—ম্লেচ্ছ! বর্ত্তমানে সুবর্ণবণিক্‌গণ এই সাম্যবাদ-মুখরিত জগতে উপবীত গ্রহণ করিয়া আবার ছুঁৎমার্গের প্রসারে ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। কারণ যাঁহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যাঁহারা যজ্ঞোপবীত নেন নাই, তাঁহাদিগকে বলিবেন—"ওরে আমায় ছুঁস্‌নে—তোরা অপবিত্র, অনুপনীত," এইরূপে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে একটা ভেদ-রেখা, একটা বৈষম্য ফুটিয়া উঠিয়া এই একতাসূত্রে গ্রথিত সুবর্ণ-বণিক্‌জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করিবে। তাহাতে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

তাহার চেয়ে, এই যজ্ঞোপবীতরূপ অহঙ্কারের বোঝা দূরে ফেলিয়া দিয়া সাম্যবাদের বিশাল মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া তাঁহারা দাঁড়ান; আবার উদাত্ত কণ্ঠে গাহিতে আরম্ভ করুন —"কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম-স্বভাবজম্"। আবার দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, বৈশ্য-সুবর্ণবণিকের কোষাগার প্রতিষ্ঠিত হউক; পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে বৈশ্য-সুবর্ণবণিকের বাণিজ্য-তরণী নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করুক, আবার তাঁহাদের অসম-সাহসিক কার্য্যাবলীর দ্বারা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি-রচিত হউক; বাঙ্গলার ভাষা তাঁহাদের কীর্ত্তি-গরিমা বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হউক।

সর্ব্বশেষে, তাঁহারা এ প্রাচীন যজ্ঞোপবীত-প্রথা ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলুন—

"চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ"। আর সমগ্র বাঙ্গলার সপ্ত কোটি কণ্ঠে নদনদী-সরোবর কম্পিত করিয়া আকাশ-পাতাল বন-উপবন মুখরিত করিয়া গাহিয়া উঠুন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্!" তবেই তাঁহারা ধন্য হইবেন, বঙ্গবাসীও ধন্য হইবে। ইতি

বশম্বদ

শ্রীপঞ্চানন রায়

পরলোকগত রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুর

অধ্যবসায়শীল নিরাড়ম্বড় উৎসাহবান্ কর্ম্মি-পুরুষ সর্ব্ব সমাজেই বিরল। এইরূপ কর্ম্মিগণ নীরবে সমাজের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিয়া যান। তাঁহারা লোকের নিন্দা বা প্রশংসার দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রচালিত হইয়া সকল কর্ম্ম সাধন করেন; এবং কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আত্মপ্রসাদকেই স্বীয় কার্য্যের পুরস্কাররূপে গণনা করিয়া প্রীত হন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় মাত্র যে কয়জন লোক তাঁহাদের সহিত ভালরূপে মিশিবার সুযোগ পান তাঁহারাই তাঁহাদের গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। পরলোক-গত রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ ধর এইরূপ একজন কর্ম্মি-পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে বাংলাদেশ বিশেষতঃ সুবর্ণবণিক সমাজ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

জন্মঃ—রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ ১২৬৪সালের ২৯ এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে হুগলীর ঘুটিয়াবাজার নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺সূর্য্যকুমার ধর হুগলীর জজ আদালতে উকীল ছিলেন। স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার বাবু পণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ভারতীয় জ্যোতিষ এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অতি সরল ভাষায় গল্পচ্ছলে বালক-বালিকাদের পাঠের "সহজ রামায়ণ" ও "সহজ শ্রীমদ্ভাবত" মুদ্রিত করেন। পাঠশালার

ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষার সুবিধার জন্ম পদ্যে "সহজ ব্যাকরণ" প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি "জাতি প্রবন্ধ" নামে একখানি সুচিন্তিত পুস্তক লিখেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তাঁহার লিখিত একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে, তাহা মুদ্রিত করা হয় নাই। সূর্য্যকুমার বাবুর ন্যায় স্বাবলম্বী পুরুষ সংসারে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা পরীক্ষায় বৃত্তি অর্জ্জন করতঃ সিনিয়র স্কলারশিপ্ লাভ করেন। তৎপর হুগলী ইমামবাড়ীতে কেরাণীরূপে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তিনি ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর হুগলি থানার দারোগার কার্য্য গ্রহণ করেন এবং অবকাশ কালে আইন অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ আদালতের উকীল হন।

বিদ্যাশিক্ষা :—নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবেশ করেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। হুগলী কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে একদিন নগেন্দ্রনাথ একজন কর্ম্মকারের নিকট হইতে একটা পুরাতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করেন। সেই যন্ত্রটা দেখিয়া স্বয়ং দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়, এবং পরবর্ত্তী জীবনে দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ তাঁহার অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপায় হইয়াছিল। হুগলী কলেজ হইতে ১৮৭৫ সালে এফ্ এ ও ১৮৭৮ সালে বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৯ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার পরীক্ষায় ও উদ্ভিদ্ বিদ্যায় এম্ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮১ সালে হুগলী কলেজ হইতে বি এল্ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং সমস্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

কর্ম্মজীবন :—আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নগেন্দ্রনাথ হুগলী জজ আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ছয় বৎসর ওকালতী করিবার পর ১৮৮৭ সালে তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ভাঙ্গায় মুনসেফ নিযুক্ত হন এবং কুড়ি বৎসর কাল নানাস্থানে মুনসেফী করিয়া ১৯০৭ সালে সবজজ পদে উন্নীত হন। তাঁহার মুনসেফ থাকার সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় যাহাতে বিচার কার্য্যে তাঁহার নির্ভীকতা ও অপক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৬ সালে সার ব্যামফিল্ড ফুলার (তদানীন্তন পূর্ব্ববঙ্গের লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর) মালদহ পরিদর্শন করিতে গমন করিলে মালদহ মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন সরকার-মনোনীত কমিশনার মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিবার উদ্যোগ করেন। অপর কমিশনারগণ ইহাতে আপত্তি করেন এবং সভা পরিত্যাগ করেন। অবশেষে তিনজন সরকার-মনোনীত কমিশনার মিলিয়া এক অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত করিয়া মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতে উহা দিবার মনস্থ করিলে অধিকাংশ কমিশনারগণ মিলিত হইয়া মুনসেফ-আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আদালতের নিকট প্রার্থনা করা হয় যে উক্ত অভিনন্দন পত্র মিউনিসিপাল কমিশনারগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইতেছে বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না যেহেতু যে সময় ঐ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয় সে সময় মাত্র তিনজন কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে হইলে যত সংখ্যক কমিশনারের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহা হইতে কম সংখ্যক কমিশনার তথায় উপস্থিত ছিলেন। যাহাতে ঐ অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত না হয় তাহার জন্ম ইনজংসন প্রার্থনা করা হয় এবং অধিকাংশ কমিশনারগণ নামমাত্র ক্ষতিপূরণের দাবী করেন। নগেন্দ্রনাথ তখন কয়েকদিনের জন্ম ছুটীতে ছিলেন। তাঁহার স্থলে একজন অস্থায়ী মুনসেফ কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে ইন্‌জংসনের মোকদ্দমা বিচার করেন এবং ইন্‌জংসন দিতে অস্বীকার করেন। যাহা হউক ইহার পরই নগেন্দ্রনাথ পুনরায় কার্য্যে যোগদান করেন এবং মূল মোকদ্দমার বিচার তাঁহার নিকট হয়। তের দিন ধরিয়া এই মোকদ্দমার শুনানি চলে। একদিকে ন্যায়পরায়ণতা ও অন্যদিকে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তার অসন্তোষ উৎপাদনের সম্ভাবনা এবং তজ্জন্য তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির অন্তরায়, এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও নগেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হইয়া বিচারাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অভিনন্দন পত্রটিকে

বেআইনী সাব্যস্ত করেন, এবং অধিকাংশ কমিশনারগন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হন। সেই সময় এই মোকদ্দমা লইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে খুব একটা আন্দোলন হইয়াছিল, এবং তৎকালীন স্বদেশীযুগের মুখপত্র "বেঙ্গলী" পত্রিকায়ও এই মোকদ্দমার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক ইহার পর বৎসরে সরকার বাহাদুর নগেন্দ্রনাথকে সবজজ পদে উন্নীত করেন। নগেন্দ্রনাথ সাত বৎসর বিশেষ সুখ্যাতির সহিত নানাস্থানে সবজজের কার্য্য করিয়াছিলেন। পক্ষ, প্রতিপক্ষ ও ব্যবহারাজীবগণ সকলেই তাঁহার বিচার কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যাহা সঙ্গত বুঝিতেন তদনুরূপ রায় প্রকাশ করিতেন। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হইতেন না বা দ্বিধা বোধ করিতেন না। ১৯১৪ সালের জুন মাসে তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে তিনি সরকারের নিকট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯১৪ সালের জুন মাসে নগেন্দ্রনাথ রাজকার্য্য হইতে হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারী (তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগ করার দিন) পর্য্যন্ত সেইখানেই অতিবাহিত করেন। এই পনেরো বৎসরকাল তিনি আলস্যে, দিবা-নিদ্রায় বা তাম্রকুট সেবনে পরমানন্দ লাভ করিয়া তাঁহার সময় ক্ষেপন করেন নাই। তিনি ধূমপান বা কোনরূপ মাদকদ্রব্যের বশবর্ত্তী ছিলেন না। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নানাপ্রকার পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতেন। মধ্যাহ্নে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার দূরবীক্ষণের যন্ত্র নির্ম্মাণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ তাহার জীবনের একটি প্রিয় কার্য্য ছিল এবং এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। যখন তিনি বিচার-বিভাগের গুরুভার বহন করিতেছিলেন তখনও তিনি অবসর সময়টুকু দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণে নিয়োজিত করিতেন। গয়াতে মুনসেফি কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে হোমউড্ সাহেব ও ওলড্হাম সাহেবের সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হন। অনেক সময় তাঁহারা সস্ত্রীক তাঁহার বাসায় আসিয়া তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কখনও বা তাঁহাদের স্ব স্ব আবাসস্থলে তাঁহার দূরবীক্ষণ লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। হোমউড্ সাহেব পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি হইয়াছিলেন, এবং ওলড্হাম সাহেব কলিকাতার আবগারী কমিশনার হইয়াছিলেন।

একবার কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার লরেন্স জেনকিন্স্ তাঁহার বাটীতে একটা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অভ্যাগতদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য ধর মহাশয়ের দূরবীক্ষণ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সার লরেন্স পূর্ব্ব হইতেই ধর মহাশয়ের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। উক্ত নিমন্ত্রণ সভায় তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল, বাংলার কর্ম্মবীর সার রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। লর্ড কারমাইকেল দূরবীক্ষণ দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, এবং সার রাজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "জজিয়তির কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে আপনি এই দুরূহ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছেন তাহা খুবই বিস্ময়ের কথা।" বাস্তবিকই তাঁহার দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বিস্ময়কর ছিল। ইহা আজকালকার কতকগুলি 'স্বদেশী' জিনিষের মত বিলাত হইতে প্রত্যেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাদের একত্র সমাবেশে জিনিষটা খাড়া করিয়া 'স্বদেশী' আখ্যা দেওয়া বাজারচলন জিনিষ নহে। দূরবীক্ষণের কাঠের বা পিতলের নল হইতে আরম্ভ করিয়া, কাঁচঘসা, কাঁচ পলিস করা ও অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে তাহার figure নির্ণয় করা প্রভৃতি সমস্তই তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত কারিকর দ্বারা এবং স্বহস্তে করাইতেন ও করিতেন। এইকার্য্যে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। সার জগদীশচন্দ্র, সার প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার দূরবীক্ষণের বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

কিন্তু দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ যে তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল,

তাহা নহে। সাবান প্রস্তুত, চরকা নির্ম্মাণ ও চরকায় সূতাকাটা, সূর্য্যঘড়ি নির্ম্মাণ, ভৌগোলিক গোলক নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণেও তাঁহার উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি উদ্ভিদ্ বিদ্যায় এম্ এ পাশ করিয়াছিলেন এবং বরাবর ঐ বিদ্যার চর্চ্চা রাখিয়াছিলেন। নূতন প্রকার উদ্ভিদ্, ফল, ফুল ইত্যাদি দেখিতে পাইলেই তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিতেন এবং Watt Roxburgh, Prain, প্রভৃতি লেখকের পুস্তক সাহায্যে তাহাদের শ্রেণীনির্দ্দেশ করা তাঁহার আমোদের বিষয় ছিল।

চরকার দ্বারা সূতাকাটায় তাঁহার খুব উৎসাহ দেখা যাইত। এবিষয়ে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পরম বৈষ্ণব স্বর্গীয় উকীল মিহিরলাল দাস মহাশয় তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন। তাঁহার পৌত্র-পৌত্রীগণকে চরকায় সূতাকাটা কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য সময় সময় তাহাদের জন্য গান ও কবিতা রচনা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা আবৃত্তি করাইতেন।

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে বহু সদ্‌গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যাইত। তিনি অধ্যবসায়শীল, সাহসী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাস তাঁহাকে সাংসারিক নানাপ্রকার বিপদের মধ্যে স্থির রাখিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল মৃত্যুতেও তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই। অনেকে মনে করিয়াছিলেন তিনি শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িবেন, কিন্তু তিনি বাহ্যিক চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার তদানীন্তন শান্ত ধীর ভাব দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে অণুমাত্র কঠোরতা ছিল না। তাঁহার স্বভাব সর্ব্বদাই কোমল এবং দয়ার্দ্র ছিল। পুত্র, কন্যা বা আত্মীয় স্বজন কেহ পীড়িত হইলে যতক্ষণ না তাহারা সুস্থ হইত ততক্ষণ তিনি তাহাদের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন, তবে তজ্জন্য তাঁহার চিত্তের অধীরতার ভাব পরিলক্ষিত হইত না। যে কেহ অভাবগ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহার সে অভাব সাধ্যমত দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। সে বাস্তবিক অভাবগ্রস্ত কি না, বা তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না, তাহা বিবেচনা করিবার কথা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত না। এবিষয়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে তিনি তাহা আমল দিতেন না। তাঁহার দানকার্য্য কখনও 'নাম কা ওয়াস্তে' ছিল না। তিনি নিজেকে কোন প্রকারে প্রচার করিতে ভাল বাসিতেন না। অনেক সময়ে তাঁহার দানের বিষয় পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যেও অবিদিত রহিত।

তিনি অসাধারণ স্বজাতিবৎসল ছিলেন। কি কার্য্য দ্বারা স্বজাতির উন্নতি হয় এই চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। তাঁহার নিকট 'সুবর্ণবণিক্' বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ সাহায্যপ্রার্থী হইলে তাহার অন্য পরিচয় বা সুপারিসের দরকার হইত না। ১৩২৩ সালে যশোহরে দ্বিতীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মেলনে তিনি সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন বিষয়ে একটু বড় হইলেই নিজেকে সর্ব্ববিষয়ে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। এরূপ ব্যক্তি কোন প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সেরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন না। তিনি দৃঢ় চরিত্র হইলেও অপরের স্বাধীন চিন্তার বা স্বাধীন ব্যবহারের প্রতি বাধা দিতেন না। এমন কি তাঁহার সন্তানদের উপরও জোর করিয়া কোন কাজ করান বা নিজের মতানুযায়ী করার চেষ্টা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

স্বদেশপ্রীতি নগেন্দ্রনাথের মজ্জাগত ছিল। সরকারী চাকরী করিয়া ও সরকারী উপাধিধারী হইয়াও তিনি অন্তরে প্রগাঢ় স্বদেশভক্ত ছিলেন। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। স্বদেশজাত বিবিধ পণ্যদ্রব্যের উন্নতিকল্পে নানারূপ উপায় উদ্ভাবনে সময় অতিবাহিত করিতেন। স্বয়ং খদ্দর পরিধান করিতেন এবং দেশীয় চরকার উন্নতির জন্য সবিশেষ যত্নবান থাকিতেন। তাঁহার স্বহস্তে সূতাকাটা এবং পৌত্র পৌত্রীদের সূতাকাটা শিক্ষার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মালদহে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের মোকদ্দমার বিবরণে তাঁহার স্বাধীনতার কতক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। দীর্ঘকালব্যাপী সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নগেন্দ্রনাথ অনেক উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীগণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখনও কাহার নিকট নিজের পুত্রগণের চাকুরীর জন্ম বা অন্ম কোন বিষয়ে উমেদারী করেন নাই।

অন্যান্ম অশেষ সদ্‌গুণাবলীর মধ্যে নগেন্দ্র বাবুর বন্ধুপ্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি একবার তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন তিনি আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ভূতপূর্ব্ব পরিদর্শক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রমদাকুমার বসু মহাশয়ের নাম বিশেষভাগে উল্লেখ যোগ্য। প্রমদাবাবু কর্ম্ম জীবনের শেষভাগে হুগলীতে অবস্থান কালে নগেন্দ্রবাবুর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আবাস স্থলের নিকট বাবুগঞ্জ গ্রামে স্বীয় বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। উভয়েই সমান কর্ম্মকুশল ও উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় একত্রে অতিবাহিত করিতেন। নগেন্দ্রবাবুর পূর্ণিয়ায় অবস্থানকালে T. B. Byers নামে জনৈক ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান চলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে যশোহরের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র মহাশয়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্র মহাশয় দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদিতে পারদর্শী থাকায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের রজ্জু সুদৃঢ় ছিল। কৃষ্ণনগরের প্রবীণ উকীল পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বসু মহাশয়ও নগেন্দ্রবাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে হুগলী আসিয়া নগেন্দ্রবাবুর সহিত দুই চারি দিন অতিবাহিত করিয়া যাইতেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য নদীয়ার মহারাজা ৺ক্ষৌণীশচন্দ্রও একবার নগেন্দ্রবাবুর হুগলীর বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথের অনুরক্ত গুণমুগ্ধ স্বগীয় অনেকগুলি বন্ধু প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার বসিবার ঘরে একত্র সম্মিলিত হইতেন। এমন কি মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বের রাত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৭ই পৌষ ১৩৩৫ সাল মঙ্গলবার বেলা দুইটার সময় যখন তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয় তখন তাঁহার অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ একজন অকৃত্রিম বন্ধু কিরূপ বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে শ্মশান ঘাটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র বাবুর সাত পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যা প্রভাবতী ও বিভাবতী সন্তানাদি রাখিয়া তাঁহার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্রটি শৈশবাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়। তাঁহার উপযুক্ত ও প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরণনাথ অত্যন্ত সুখ্যাতির সহিত গভর্ণমেন্টের কার্য্য করিতে করিতে ১৩২৬ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুই বৎসর পরে ২রা বৈশাখ তারিখে তাঁহার মধ্যমপুত্র সনৎকুমারের প্রাণ বিয়োগ হয়। তাঁহার জীবিত সন্তানগণের পরিচয় এইরূপ :—গোকুলনাথ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরীয়ান, রবীন্দ্রনাথ, মুন্সীগঞ্জে মুন্সেফ, নৃপেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, দ্বিজেন্দ্রনাথ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম্ বি ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ডাক্তার। তাঁহার একমাত্র জীবিত কন্যা বীণাপাণির হুগলিতেই বিবাহ হইয়াছে।

জনৈক বন্ধু

জাতীয় সংবাদ

শশিভূষণ দে বালক ও রাজরাজেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯, শনিবার, শশিভূষণ দে বালক ও রাজরাজেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশন উক্তবিদ্যালয়গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ মিত্র, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। রায় শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ শীল এটর্ণী, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ দে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত বি এল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় এবং অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্র মহিলা এই পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়গৃহ সুরুচিসঙ্গতভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণের পর বালক-বালিকাগণ, গান, আবৃত্তি, ড্রিল ও ক্রীড়া প্রভৃতির দ্বারা সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে সবিশেষ আনন্দ দান করে। অতঃপর বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উদ্ধব চন্দ্র মল্লিক মহাশয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। এই কার্য্য বিবরণী দ্বারা বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি সূচিত হয়; তন্মধ্যে গত বৎসরের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ১১টি ছাত্রের মধ্যে ১০টি প্রথম বিভাগে এবং ১টি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তন্মধ্যে একটি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় সভায় প্রকাশ করেন যে, রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বাহাদুর পূর্ব্বের দেওয়া দু হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বাদে বর্ত্তমানে আরো দু হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি সরকার একটি বালকের জন্য ও অপরটি বালিকার জন্য দুইটি রৌপ্য পদক দান করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ আঢ্য বালিকাগণের আবৃত্তির জন্য একটি রৌপ্য পদক প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতায় বালক-বালিকাগণের শৃঙ্খলা রক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে বাহাদুর এবং তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দে মহাশয় সমাগত ভদ্র মহোদয়-গণের সাদর অভ্যর্থনায় সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় রায় শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত বাহাদুর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। প্রায় ৬০০ বালক-বালিকাকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

সুবর্ণবণিকের বিলাত যাত্রা

কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায় বিগত ১৭ই মার্চ্চ পি এণ্ড ও কোম্পানীর রাওলপিণ্ডী নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার এ বিদেশ যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত করুন।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৬ সাল | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শান্তিপুর সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ*

রায় ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ডি লিট্, বাহাদুর

আজ আপনারা এই দীন লেখককে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে এমন একটা সুবিধা দিয়াছেন, যাহা হয়ত তাঁর জীবনে ঘটিত না। এ ভাগ্য সামান্য নহে। এই তীর্থ দর্শনে আমার মনের উপর দিয়া যে ভাব বহিয়া যাইতেছে তাহা বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। বৃন্দাবন এ দেশ হইতে বহু দূরে, কাশীও কাছের পথ নয়; কিন্তু আমরা ভক্তির রাজ্যে তিনটি নূতন রাজধানী, তিনটি নূতন তীর্থ স্থাপন করিয়াছি তাহা বাঙ্গালীকে বিশেষ করিয়া গৌরব দিতেছে, তাহা একান্তভাবে আমাদের নিজস্ব। নদীয়া, খড়দা, শান্তিপুর বাঙ্গালীর ছাপমারা; এখানকার ঠাকুরেরা বাঙ্গালী, এখানকার ঠাকুরাণীরা আমাদেরই বাঙ্গালা দেশের মেয়ে।

বাঙ্গালীর এই তীর্থগুলিতে রাক্ষসদৈত্যসংহারের ইতিহাস নাই। এই তীর্থত্রয়ের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া যে জাহ্নবী যাইতেছেন তাহা ভক্তির উচ্ছ্বাসে "ছল ছল কল কল, টুল টুল তরঙ্গ"। সেই ভক্তির বন্যা ঐরাবত প্রমাণ পাপীকে ভাসাইয়া অবগাহন-পূত করিবার শক্তি রাখে।

অন্যান্য তীর্থে কোথাও ভগবানের শঙ্খচক্র পাপীর হৃদয়ে ভীতি জন্মাইতেছে, কোথাও দেবাদিদেব মহাদেবের রুদ্র তেজে যমরাজের মহিষের ঘণ্টা পর্য্যন্ত থামিয়া গিয়াছে, কোথাও ত্রিবিক্রমের পদতলে বলি ছলিত, দশভুজার শূল অসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী এই যে তিনটি তীর্থ গড়িয়াছে এখানে ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপের মূল্য নাই। জগতের ভীষণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কে আর বাঙ্গালীর মত মধুরকে বরণ করিয়া লইতে

* এই অভিভাষণ সভাপতি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কয়েক বৎসর পুর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাপি হারাইয়া যাওয়ায় তাহা এত দিন প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

পারিয়াছে? পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ পরাভূত করিয়া এদেশে যে এক কড়া মূল্যের বাঁশের বাঁশীর সুরটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে, তাহারই নিকটে বাঙ্গালী মন প্রাণ বিকাইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা" এ কথা এমন জোরে বাঙ্গালী ভিন্ন কে আর বলিতে পারিয়াছে? আমাদের তীর্থে কোন অমানুষিক কাণ্ড নাই, কোন দেব-শক্তির দর্প নাই। বঙ্গদেশের করুণ প্রাণের উপর, প্রেমাশ্রুর উপর, বিরহমথিত হৃদয়-ব্যথায় এই তীর্থত্রয়ের জন্ম। দর্শনানন্দে চোখের কোণে যে অশ্রু-বিন্দু টল টল করে, সেই নির্ম্মল সাত্ত্বিক অশ্রুই এই বৈষ্ণব তীর্থের ভিত্তি। এই তীর্থে মানুষ হারান ধন খুঁজিয়া পায়, এই তীর্থে চোখের ইঙ্গিত পাইলে সোনার প্রাসাদ ফেলিয়া লোকে ভাবের কাঙ্গাল হইয়া চলিয়া যায়; এই তীর্থের যাত্রীরা যমকে তত ভয় করে না,—ভগবদ্ বিরহকে যত ভয় করে। অঘাসুর-বকাসুর এই তীর্থ ধ্বংস করিতে পারে না, কিন্তু মাথুরের ভয়ে এই তীর্থের ফুলের কলি শুকাইয়া ঝরিয়া প'ড়ে। যেখানে প্রাণ নাই, আছে কেবল লড়াই ও বড়াই, এই তীর্থবাসীরা সে পথের ত্রিসীমা মাড়ায় না। এই তীর্থত্রয়ের তুলনা নাই, এই তীর্থত্রয় ভাব জগতের রাজা—তীর্থযাত্রীরা কিন্তু প্রাণের কাঙ্গাল, তাঁরা ভক্তির হরিলুটের জন্য হাত পাতিয়া আছে।

মাধবেন্দ্রপুরী

এই শান্তিপুরে দাঁড়াইয়া একদা এক অযাচকবৃত্তি সন্ন্যাসী মেঘ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। মেঘ তো আমরা দিন রাত্রিই দেখিতেছি। বর্ষা ঋতুতে আকাশের সুদূর প্রান্ত মেঘপুঞ্জে ভরা, কত নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম নীরদ খণ্ডে দশদিক শ্যামীকৃত। তারা বিপুলকায় হস্তীর মত অথবা উৎকট অঙ্গভঙ্গীময় পাগলের মত আকাশের অরুণরাগরঞ্জিত রাঙ্গাধুলি গায় মাখিয়া লুটাপুটি করিতেছে। এই মেঘের জলধারা শীতল বায়ুস্পর্শে "নিশীথরাতের বাদল ধারা" প্রভৃতি কত কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, ছোট ছোট কবিরা সেই সুরে সুরে মিশাইয়া "বর্ষামঙ্গল" গাহিতে-ছেন। কিন্তু যে সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, তাঁর মত কে কবে মেঘ দেখিয়া সত্য সত্যই প্রেমে অজ্ঞান হইতে পারিয়াছেন? কে সে ভাগ্যবান্—যিনি এই নিত্য-দৃষ্ট জড় মেঘপুঞ্জের মধ্যে অপার্থিব ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দে গদগদ ও হর্ষে দিশাহারা হইতে পারিয়াছেন? কে মেঘের মধ্যে তাঁর আরাধ্যকে পাইয়া আপনা হারাইয়া—বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সেরূপ তন্ময় হইয়া গিয়াছেন? এই সন্ন্যাসীর নাম মাধবেন্দ্রপুরী। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে ভক্তির জীবন্ত-ধারা আনিয়াছিলেন। ইহাঁরই রচিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে" শ্লোক, যাহা উদ্ধৃত করিয়া রূপ গোস্বামী তাঁর পদ্যাবলী গ্রন্থ হীরকখচিত করিয়াছেন—সেই শ্লোক আবৃত্তি করিতে যাইয়া অশ্রুপূরিত চক্ষে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,—"যেরূপ মণিসমূহের মধ্যে কৌস্তুভ রাজা, সেইরূপ এই শ্লোক পৃথিবীর সমস্ত কবিতারাজ্যের রাজা" এই শ্লোকটি মুখে বলিতে যাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া অজস্র অশ্রুবিন্দুতে তাহা অভিনন্দিত করিয়া আধ উচ্চারিত বোলে কেবল "অয়ি দীন অয়ি দীন" মাত্র কহিতে কহিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মাধবেন্দ্রপুরী একদা বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন পাহাড়ের পাদমূলে উপবাসী হইয়া নাম জপ করিতেছিলেন। কেহ না দিলে তো তিনি যাচিয়া খাইবেন না। সেদিন তাঁকে কেহ কিছু দেন নাই। অভুক্ত, তথাপি সতত প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে আনন্দধারা—সন্ন্যাসী বৃক্ষমূলে বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। এমন সময় এক শ্যাম সুন্দর গোপ বালক দুগ্ধভাণ্ড হস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "যে চাহিয়া খায়, ব্রজবাসিনীরা তাহাদিগকে ভিক্ষা দেয়। কিন্তু যে কাহারও কাছে কিছু চায় না, আমি স্বয়ং এইভাবে গোপনে আসিয়া তাকে খাবার দিয়া যাই।" বালক চলিয়া গেল; বালকের অপার্থিব রূপে মুগ্ধ হইয়া ও তাঁর দেওয়া দুগ্ধ পানে প্রসন্ন হইয়া মাধবেন্দ্র রাত্রিতে যেন কার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন,—মঞ্জীর পায়ে ও কে আসিতেছে; যাঁর রুনু রুনু শব্দ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর হৃদয় এরূপ অধীর করিয়া তুলিল? তন্দ্রার ঘোরে মাধবেন্দ্র দেখিলেন; সেই বালক ময়ুরপাখা মাথায় পরিয়া তাঁর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বালক বলিতেছে "মাধব, বহুদিন আমি তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম, কারণ তুমি যেমন সকল ভুলিয়া আমাকে ভাল বাসিয়াছ,

এমন আর কেহ পারে নাই।" বালকের নির্দ্দেশ অনুসারে মাধব গোবর্দ্ধন পাহাড় খুঁড়িয়া "গোপাল-বিগ্রহ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তারপর মাধবেন্দ্র একদিন রেমুণায় গোপীনাথ দর্শনে গিয়াছেন। তিনি শুনিলেন, গোপীনাথের ক্ষীরভোগের ন্যায় উপাদেয় জিনিষ মন্দিরে দুর্লভ; "সেই ক্ষীরের স্বাদ কিরূপ, জানিতে পারিলে, আমি গোপালকে সেইরূপ ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিতাম" এইরূপ একটা চিন্তা মনে হওয়া মাত্র সন্ন্যাসী অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলেন "এ লোভ তো গোপাল-বিগ্রহের নহে, এ লোভ আমারই, ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণার কথা সন্ন্যাসী হইয়া খাদ্যের প্রতি লোভ।" তখন অনুতপ্ত সন্ন্যাসী মন্দির ছাড়িয়া বাজারের দূর প্রান্তে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে আসন করিয়া বসিলেন।

হঠাৎ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, গোপীনাথ বলিতেছেন "আমি আজ কিছু খাই নাই। আমার মাধব উপবাসী রহিয়াছে, তার জন্য আমি কতকটা ক্ষীর পীতধড়ায় লুকাইয়া রাখিয়াছি।" পাণ্ডা যাইয়া বিস্মিত চক্ষে দেখিল, সত্যই গোপীনাথের পীতধড়ায় ক্ষীর বাঁধা। কৈ সে সাধক—কে সে পুণ্যবান্? কত লোক ত না খাইয়া মরিতেছে, কে তার খোঁজ রাখে? ইনি কে যাঁর উপবাসে ব্যথিত হইয়া স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরী করিয়াছেন? সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে গোবর্দ্ধনের পাদমূলে পাণ্ডা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দরবিগলিতধারা ভক্তির মূর্ত্তিমান ছবি প্রেমের প্রদীপ মাধবেন্দ্র উপবাসশীর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতিভায় যেন সেই স্থানটি দীপ্ত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

এই মাধবেন্দ্র শান্তিপুরে আসিয়া স্বয়ং অদ্বৈতকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইঁনি বঙ্গের ভক্তি রাজ্যের হরিদ্বার স্বরূপ, ইহার নিকটই অদ্বৈত ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিতে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়াছিল। অযাচিতভাবে শান্তিপুরে আসিয়া তিনি শান্তিপুরনাথের নেত্রদ্বয়ে পাবনী গঙ্গাধারা ছুটাইয়া দিয়াছিলেন, শান্তিপুরাগত যাত্রীর সর্ব্ব প্রথমেই তাঁকে স্মরণ করা উচিত। তাই তাঁর প্রসঙ্গ লইয়া আমি মুখবন্ধ করিলাম। মাধবেন্দ্র পুরীকে শ্রীপর্ব্বতে দেখিয়া নিত্যানন্দের চিত্তে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল। চৈতন্য চরিতামৃতকার নিত্যানন্দের মুখে বলিয়াছিলেন:—

"নিত্যানন্দ বলে যত তীর্থ করিলাম।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ্॥
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন॥"

অদ্বৈতের বিশাল প্রাসাদ এক সময় শান্তিপুরে বিখ্যাত ছিল। সেই রাজপ্রাসাদোপম গৃহের নাম ছিল "উপকারিকা"; উপকারিকার কোন চিহ্ন কি আপনারা আজ আমায় দেখাইতে পারেন?

যিনি মহাপ্রভুর জন্মের অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে তাঁহারই আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন, যাঁর ধূর্জ্জটি-কুটিল শ্মশ্রুর ব্যূহে কত ভক্তি অশ্রুগঙ্গা ঘুরিয়া বেড়াইত, যাঁহার প্রাণের আবেগ এত বড় ছিল যে তাহা বৈকুণ্ঠের সিংহাসনকে টলাইবার শক্তি রাখিত, যাঁহার বাল্যাবস্থার অসীম সাহস ও চরিত্রবল লাউরের রাজ প্রাসাদকে প্রকম্পিত করিয়াছিল, যাঁহার বাল্যলীলা সূত্র স্বয়ং লাউর-রাজ কৃষ্ণদাস সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেই আমাদের প্রিয়তম পাগল সদাশিবের পায়ের ধূলার খোঁজে এখানে আসিয়াছি। বিদেশী ভিখারী এখানে আসিলে আপনারা সেই মহাপুরুষের পবিত্র জীবন স্মৃতির এক মুষ্টি ভিক্ষা অবশ্যই দিতে পারিবেন—এই আশায় আসিয়াছি। যে স্থানের প্রতি রেণুতে তাঁর পদধূলির প্রেরণা আছে, যে স্থানে দশদিন মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্গে নাচিয়া গাইয়া উপকারিকার আঙ্গিনাকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছিলেন, যে স্থান ছাড়িয়া যাইবার সময় পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই অশিতিপর বৃদ্ধ বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিলেন দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁকে হাতে ধরিয়া বলিয়াছিলেন "তুমিই যদি এমন কর, তবে আমার মাকে কে বুঝাইবে?"—এই সেই ভক্তি-রাজ্যের নানা স্মৃতি-জড়িত শান্তিপুর। যেখানে একদা অদ্বৈত গৃহিণী সীতা মহাপ্রভুর জন্য অমৃতোপম রান্না রাঁধিয়া তাঁহাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইয়া মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, এইখানে অদ্বৈত-

ভৃত্য ঈশান নাগর মহাপ্রভুর পদ সম্বাহন করিতে গেলে তিনি তাহাকে মানা করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি ব্রাহ্মণ কুলজাত, তোমার পরিচর্য্যা আমি কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি ?" এই কথা শুনিয়া তেজস্বী ব্রাহ্মণ ঈশাননাগর তাঁহার পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ব্রাহ্মণ্য গৌরবকে গলা ধাক্কা মারিয়া তাড়াইয়া দিয়া চৈতন্য দেবের সেবার অধিকারের দাবী করিরাছিলেন!

এই শান্তিপুরেই অদ্বৈত শান্তাচার্য্যের নিকট প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এইখানেই মুসলমান কুলতিলক হরিদাস অদ্বৈত সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং হিন্দুসমাজ অদ্বৈতকে কতদিন জাতিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছিল। এইখানে যদুনন্দন আচার্য্যের সঙ্গে হরিদাসের বিরাট তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যদুনন্দন সেই যুদ্ধে ভক্তি-ধর্ম্মের নিকট পরাজিত হইয়া গোঁড়াদের দল ছাড়িয়া "জাতনাশাদের" দলে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিলেন। অদ্বৈত প্রসঙ্গ অমৃতের ন্যায়, তাহার সুস্বাদ ফুরায় না, আমরা কত দিক্ দিয়া কতভাবে তাঁকে পাইতেছি। পঞ্চদশবৎসরের শিশু বিশ্বরূপ যখন ইঁহার নিকট নবদ্বীপে পড়িতে যাইতেন, তখন পঞ্চ বৎসরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিমাই মঞ্জীরের ক্ষুদ্র ঘণ্টা চরণে বাজাইয়া বড় ভাইয়ের পীতধড়া ধরিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন, এবং খাইবার জন্য বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার তাগিদ দিতে থাকিতেন। দুই ভাই যখন অদ্বৈত-গৃহ হইতে মিশ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন সমস্ত নবদ্বীপের লোকের চক্ষু এই দুই শিশুর প্রতিভা-দীপ্ত মুখের উপর যেন লুব্ধ হইয়া উড়িয়া উড়িয়া পড়িত। সদাশিব সেই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু শচীদেবী অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রসন্ন ছিলেন না। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের জন্য তিনি অদ্বৈতকেই দায়ী করিয়াছিলেন এবং নিমাইও পাছে অদ্বৈতের শিক্ষায় সেই পথে যা'ন, এই আশঙ্কায় তাঁর সঙ্গে শিশু নিমাইয়ের ঘনিষ্ঠতা তিনি একটুকুও ভালবাসিতেন না। শোকোন্মত্তা শচীদেবী অদ্বৈতকে 'দৈত্য' উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমার চাঁদের মত এক ছেলেকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া একমাত্র অবশিষ্ট পুত্রটিকেও দেখ্‌ছি ইনি ঘরে থাকিতে দিবেন না। ইঁহাকে কে পণ্ডিত বলে ? ইনি পরের সর্ব্বনাশ করেন, ইনি অদ্বৈত ন'ন দৈত্য।" কিন্তু পরে সলজ্জ ও অপ্রতিভ মহাপ্রভুর একান্ত অনুরোধে শচীমাতা এই অশিষ্টতার জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য জুড়িয়া অদ্বৈতের কথা। মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্ব হইতে তাঁর তিরোধানের পরেও সেই কথার শেষ নাই। এক সময়ে পুরীতে একথা রাষ্ট্র হইয়াছিল যে অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভক্তি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানবাদ প্রচার করিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী এই কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এমন কি বঙ্গদেশ হইতে এই সংবাদের সত্যতা সমর্থন করিয়া নিত্যানন্দও মহাপ্রভুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পুরীর পাণ্ডা মন্দির হইতে সুদীর্ঘ আদেশমাল্য আনিয়া বলিলেন—"আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, জগন্নাথ প্রসন্ন আছেন, বঙ্গদেশে বৈষ্ণব প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" চারিদিকের অবিশ্বাসের মধ্যে কিন্তু মহাপ্রভু তিলার্দ্ধের জন্যও অদ্বৈতের প্রতি বিশ্বাস হারাণ নাই। তিনি তাঁহার নিজের জনকে চিনিতেন। শেষে অদ্বৈত হেয়ালীচ্ছলে এক তরজা লিখিয়া মহাপ্রভুকে জানাইয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণের পাওয়া সংবাদ সত্য নহে। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে তাঁর অচলা ভক্তি আছে।

আপনাদের মধ্যে তাঁহার বংশধর অনেকে উপস্থিত আছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে অদ্বৈত শিবের অবতার, তাঁহার বংশধরগণ শিবাংশ, আমি তাঁহাদিগকে করজোড়ে প্রণাম জানাইতেছি। এই ৪।৫ শত বৎসর যাবৎ কি অদ্বৈতচার্য্য সম্বন্ধে কোন প্রবাদ, কোন কাহিনী আপনাদের পরিবারে প্রচলিত নাই ? আপনাদের পিতামহগণ ও পিতামহীরা কি আপনাদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই ? সেই সকল প্রবাদ কথা হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কি আপনাদের মধ্যে কেহ নাই ? কোন পুরাতন কাগজপত্র কিংবা পুথিপত্র কি এ সম্বন্ধে নাই ? অদ্বৈত ও তাঁর বংশের ইতিহাস কি লিখিবার কাহার প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই ? আমরা তো একটু হইলেই দিল্লীর রাজা বাদশাহদের সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিতে যাই এবং পোপক্যাটিপেটল ও বিসুভিয়সের নানা

তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের এই শান্তিপুর-নাগের খোঁজ খবর কি চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত ও ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশেই নিঃশেষ হইয়া থাকিবে? এই শান্তিপুরে যখন অদ্বৈত ভক্তি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার টোলের দুই মারাহাট্টা ছাত্র রামদাস নাগর ও শঙ্কর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান কি আপনারা শোনেন নাই? এইখানে আপনাদের নিকট একটু সময় চাহিয়া লইয়া জাহ্নবী বিধৌত অদ্বৈতের পবিত্র পদরজভূষিত শান্তিপুরে দাঁড়াইয়া আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। আমার এই আলোচনার কোন মূল্য নাই, ইহা মৌলিকত্ব দাবী করে না, আপনারা সকলেই যে কথা জানেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিব মাত্র। বৈষ্ণবধর্ম্ম ঠিক বঙ্গদেশে যেরূপভাবে বিকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহারই কথা বলিব। ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মে ঐশ্বর্য্যের পূজা হইতেছে, সেখানে বাঙ্গালা দেশের হাওয়া বহে নাই; সেখানে বড় বড় বিষ্ণুমন্দিরের ভিত্তি যুগ যুগ ব্যাপী সংস্কার গড়া, সেই সকল বিষ্ণু বিগ্রহের সুদর্শনচক্র গদার প্রতাপে ক্ষীণ পদ্মটী মলিন হইয়া আছে, তাঁহাদের শঙ্খনিনাদে বাঁশীর সুর কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশে লোকমতের প্রবাহ পদ্মার মত জোরে চলিয়াছে, তাহার ঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গ-বন্যায় প্রাচীন সংস্কার-গঠিত মন্দিরের লৌহ দ্বার ধ্বসিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের কৃষ্ণ মন্দির কোথায় দেখিবেন ঐ মাধবী কুঞ্জের তলায় দৃষ্টিপাত করুন। বিগ্রহ দেখিবেন জগদীশ মহাবিষ্ণু পীতধড়া গলায় বাঁধিয়া রাধিকার পায়ের কাছে বসিয়া প্রেমের তপস্যা করিতেছেন, এত বড় দুর্জ্জয় সাহস ধর্ম্মজগতে বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তি ও প্রেমের নিকট জগদারাধ্যের এরূপ পরাজয় শুধু বাঙ্গালীরা মাত্র কল্পনা করিতে পারিয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের পাঁচটি বিভাগ এদেশে স্বীকৃত হইয়াছে। ১ম শান্ত; জপ তপ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক শান্তভাবকে আনিতে হয়। মন শান্ত না হইলে, ইন্দ্রিয় জয় না হইলে ভগবানের সঙ্গে কি করিয়া পরিচয় হইবে? শান্তভাব মুনি ঋষির।

তারপর যখন মন প্রস্তুত হইল সাধক তখন ভগবানের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন, প্রথম সম্বন্ধ দাস্য;—তুমি কর্ত্তা আমি তোমার দাস। য়ুরোপের ধর্ম্ম জগতে এই ভাবটি আদায় করিতে চেষ্টা চলিতেছে—সেখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের প্রাণ সম্পর্ক প্রভু ভৃত্যের; যিশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু পুত্রের পিতার প্রতি যে ভাব তাহা দাস্য, বাৎসল্য নহে; পিতামাতার ভাব বাৎসল্য, কিন্তু পুত্র পিতামাতার প্রতি যে কর্ত্তব্য পালন করিবে তাহা দাস্য। তাহা রস সঞ্জাত নহে, কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। রসই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণ—কর্ত্তব্যবুদ্ধি নহে।

এই দাস্যভাব পার হইয়া ভক্ত সখ্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন কর্ম্মক্ষেত্র লীলাক্ষেত্র হইল। বোঝা গেল যাঁহারা আমার চারিদিকে তাঁহারা আমাদের খেলার সাথী। মূল খেলোয়াড়কে যখন চিনিলাম, তখন পৃথিবীর সমস্ত কাজের মধ্য হইতে আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি চলিয়া গেল। "কর্ত্তব্য খুঁড়িয়া হাটে, প্রেম দৌড়ায়" যখন প্রেম হইল, তখন এটা করিতে নাই, এটি করা উচিত; এই সকল শিশুপাঠের নীতি চলিয়া গেল। আনন্দ স্বরূপকে মধ্যে রাখিয়া যাহারা খেলিতেছে, তাহারা পৃথিবীটা একটা কঠোর কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র মনে করে নাই, তাহারা আনন্দের জীব প্রত্যেকের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার পৃথিবীটা লীলাস্থলী করিয়া দাঁড়াইল। ভগবানকে বেড়িয়া তাঁহারা খেলিতেছেন। যখন অঘাসুর, বকাসুর তাঁহাদিগকে ভয় দেখায় তখন তাঁহারা নিজেদের অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আত্ম নির্ভর ও অহমিকার তেজে অগ্রসর হন না, তখন তাঁহারা কাঁদিয়া শরণ লন, যাঁহারা নিজেকে ভুলিয়া তাঁহার হইয়াছে, নিজেদের দায় তাঁহাকে দিয়াছে, তাঁহাদের নিকট অঘাসুর বকাসুরের ভ্রুকুটি কোথায় উড়িয়া যায়, তাহা আর্ত্ত ও যাঁহারা তৎপদে সমর্পিত, তাঁহারাই জানেন।

সখ্যের পর বাৎসল্য। আপনারা বলিতে পারেন, জননী তাঁহার কুৎসিত ছেলেটির মুখ দেখিয়া কোন অপরূপ রূপের সন্ধান পান যাহাতে তাঁহার কালো ছেলেটা "কাল মাণিক" "কাল চাঁদ" হইয়া দাঁড়ায়? এমন অদ্ভুত কথাও

বাঙ্গালী বলিতে পারিয়াছে। 'কাল চাঁদ'—মাণিকটা কালো হইতে পারে কিন্তু চাঁদ কি করিয়া কালো হয়? এই যে কালো ছেলেটার প্রতি একটা সৃষ্টিছাড়া আনন্দের ভাব আনিয়া এখানে ভক্ত করজোড়ে আনন্দ স্বরূপকে দেখিয়া জননী কত রাত্রি উজ্জ্বল বাতি জ্বালাইয়া কালো কুৎসিত ছেলেটার অপূর্ব্বরূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন, তাহার নিরর্থ কাকলিতে কোকিলের কণ্ঠ, বাল্মীকির কবিত্ব তাঁহার নিকট ধরা পড়িল। অপর কেহ যেখানে প্রশংসা করিবার মত কিছুই পাইল না, জননী সেখানে সৌন্দর্য্যের খনি আবিষ্কার করিলেন। ভক্তিশাস্ত্র বলেন, জীব রক্ষার জন্য ভগবানের পালনশক্তি, মাতৃহৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন জননী শিশুর ছলে ভগবৎ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়া মুগ্ধ হইয়া নিজেকে স্নেহের সমুদ্রে ঢালিয়া দেন, এখানে কর্ত্তব্যের বুদ্ধি নাই; আনন্দের নিকটে আত্মসমর্পণ। বৈষ্ণবগণ বলেন ভগবান প্রত্যেক জননীর চক্ষে শিশুরূপে ধরা দেন। এজন্য নৃশংস বাঘের চোখদুটি তাহার স্বাভাবিক ক্রূরতা ভুলিয়া স্নেহার্দ্রভাবে শাবককে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। শিশুরূপী ভগবান্ এই পলিত-কেশ স্খলিতদন্ত পৃথিবীটাকে নিত্য নূতন করিয়া দেখাইতেছে, ধ্বংসের মধ্যে নিত্য সত্য স্বরূপ ভগবান্ এই ভাবে দেখা দিয়া জগৎটাকে পুরাতন হইতে দেন নাই। তারপর মাধুর্য্য—কোন্ সম্পর্কের গৌরব উপলব্ধি করা সহজ, মাতা যাহা করেন, দাস যাহা করে প্রণয়িনী তাহার সমস্ত করেন এবং আরও কিছু বেশী আনন্দ পাইয়া থাকেন "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" সর্ব্বস্ব সমর্পণ তিনিই মাত্র করিতে পারেন। নবজাত শিশুকে পাইয়া জননী মৃত শিশুর শোক ভুলিয়া যান কিন্তু দাম্পত্যে এক লক্ষ্য, এই হেতু বাৎসল্য হইতে বৈষ্ণবেরা মাধুর্য্যের বেশী মর্য্যাদা দিয়া থাকেন।

দাস্যে শান্তভাব আছে, এবং আর একটু বেশী আছে; সখ্যে শান্ত ও দাস্য আছে আর একটু বেশী আছে; বাৎসল্যে শান্তভাব আছে, দাস্য আছে কারণ কোন্ দাস দাসী মাতার অপেক্ষা বেশী সেবা করিতে পারেন? বাৎসল্যে সখ্য আছে কারণ শিশুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সাহচর্য্য অনুভব করিবার জন্য মাতা নিরর্থ কাকলি অর্থাৎ ছেলে ভুলানো ছড়ার সৃষ্টি করিয়া তাহার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন, তজ্জন্য নিজেকেও অবুঝ হইতে হইবে—এই জন্য অর্থশূন্য ছেলে ভুলানো ছড়ার সৃষ্টি। রোমের এক সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া কোন রাজদূত হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইলেন, সম্রাট তাঁহার শিশুপুত্রকে পৃষ্ঠে লইয়া নিজে ঘোড়া সাজিয়া হামাগুড়ি দিয়া ঘরময় ছুটিতেছেন। শিশুর সঙ্গে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা বাৎসল্যে এইভাবে দেখা যায়। মাধুর্য্যে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আছে। তার উপর আর কিছু আছে, যাহারা এই তত্ত্ব জানিতে চাহিবেন তাঁহারা পুরাতন মালঞ্চমালার গল্পটি পাঠ করুন।

ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই সম্পর্কে প্রথম ভৃত্যের বহির্গৃহে, তারপর সখার সঙ্গে আঙ্গিনায় গলায় গলায়, শেষে মাতার প্রকোষ্ঠে এবং সর্ব্বশেষে দাম্পত্যের মাধবী কুঞ্জে; সংসারের যে ঘরগুলি আছে তাহার জানালা উঁচু দিকে খুলিয়া রাখিলেই এই পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়া আমরা নিরবধি ভগবৎ সঙ্গ লাভ করিব।

ভগবানকে যদি স্বীকার করি (সর্ব্বজাতিই তাহা স্বীকার করিয়াছে) ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতানটাই মানবের শ্রেষ্ঠ কাজ হইয়া থাকে (সকল জাতিই এটুকু অবশ্য স্বীকার করিয়াছে) তবে কোন সম্পর্ক সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্টতম—প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ কিংবা সখ্য বাৎসল্য? মাধুর্য্যই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কারণ দাম্পত্যই শ্রেষ্ঠ, গৃহিণীই গৃহ, স্ত্রীই সংসারের অপর নাম। ভগবানের পরিবারে নাম লিখাইতে হইলে মাধুর্য্যবলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ হইতে পারা যায়।

যাঁহারা অদ্ভুত সাধনাবলে ভগবানকে তেমন করিয়া পাইয়াছেন, তাঁহারা উজ্জ্বল-নীলমণিপ্রোক্ত, খণ্ডিতা, কলহন্তরিতা বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি সকলরূপই এই প্রেমের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই নিগূঢ় সম্বন্ধ আস্বাদযোগ্য, বক্তব্য নহে, এই জন্যই রামরায় যখন তাহা বলিতে চাহিতেছিলেন তখন মহাপ্রভু তাঁহার মুখ চাপা দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে হইতেছে। বাউলরা নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন কিন্তু বাউল আর বৈষ্ণব এক নহে; বৈষ্ণব আনন্দময়, বাউল দুঃখতত্ত্বজ্ঞ—

বাউল জানে দেহ ক্ষণভঙ্গুর, বৈষ্ণব জানে এই দেহ শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের স্থান; বাউল প্রতি কথায় মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত; বাউল গায় "যে মুণ্ডেতে পর ভাই সোনা বাঁধা পাগ। শ্মশানেতে পড়বেন মুণ্ড উড়ে বসবেন কাগ।" বৈষ্ণব মৃত্যুর সময় শ্যাম কুণ্ডের মৃত্তিকায় কৃষ্ণনাম দেহে লিখাইয়া তাহা অঙ্গের ভূষণে পরিণত করিয়া মরিতে চায়। বৈষ্ণব মৃত্যুর পরেও তমালের কালো রঙ্গে নিজেকে ঘিরিয়া রাখিতে চায় এবং কখন কৃষ্ণ আসিবেন তার স্পর্শে পুনর্জীবন পাইবেন এই প্রতীক্ষায় মৃত্যুকেও মধুর করিয়া চিত্রিত করেন, বৈষ্ণবের মৃত্যু প্রেমের আনন্দ-লোক, বাউল মৃত্যু ভাবিয়া ভয় পায়। এক কথায়, বাউলের ধর্ম্ম দুঃখবাদী বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছাপ, আর বৈষ্ণব উপনিষদের আনন্দবাদ—আনন্দই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণ, আনন্দের উপর কিছু নাই।

এই বাউল ও বৈষ্ণবদের কথা বলিতে গিয়া একটা কথা মনে হইল।

প্রত্যেক গ্রামেই অনেক শিক্ষিত যুবক আছেন, তাঁহারা জানেন না কি করিয়া তাঁহারা দেশের বা সাহিত্যের একটা কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা অনেক সময় কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিতে চাহেন, কিন্তু কি লিখিবেন তাহা জানেন না; বই পড়া বিদ্যা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সময় সময় যে সন্দর্ভ লিখেন তাহা একরূপ অযথা বাক্য-পল্লবে আড়ম্বরময় হইয়া উঠে। সেই বিষয়টায় পূর্ণ জ্ঞান না থাকাতে শিক্ষিত সাধারণ তাহার দর কষিয়া সেটিকে অগ্রাহ্য করেন। কেউ বা পাণ্ডিত্যের পথে না গিয়া আকাশের তারা, নদীর ঢেউ, গাছের পাতার মর মর শব্দে মুগ্ধ হইয়া কবিতাদেবীকে তুষ্ট করিতে চাহেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কবি হওয়া যায় না।

এইভাবে প্রকৃত সাহিত্যিকের আশা ভরসা লইয়া চেষ্টা করিয়াও অনেকে সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। তাঁরা একটা পথ আবিষ্কার করিতে পারিলে হয়ত সফল হইতেন কিন্তু কেহ তাঁহাদের সে পথ দেখাইয়া দেন না। এই জন্য সরস্বতীর দরজা ঠেলিয়া তাঁহারা প্রবেশ করিতে পান না—তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমি এই নবযুবকদিগকে কতকগুলি পথ দেখাইয়া দিতে পারি, যদি আপনাদের মধ্যে একজনকেও আমি প্রবুদ্ধ করিতে পারি, তবে আমার এই লেখাটা সার্থক মনে করিব।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বাউলের ধর্ম্ম বৌদ্ধমতের ছাপমারা। বঙ্গদেশে বহুস্থানে বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, অভ্যাগত, সাঁই, রামবল্লভী, প্রভৃতি তথাকথিত বৈষ্ণবের শ্রেণী বিদ্যমান আছে। ইঁহাদের সম্বন্ধে আমরা এতই অল্পজানি যে আপনারা যদি বাড়ীর কাছে বসিয়া নোট সংগ্রহ করেন তবে আপনাদের চেষ্টায় ইতিহাসের এক একটা পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে। সাধারণভাবে বৌদ্ধ মহাযানের ইতিহাসটা যদি একটু পড়িয়া লইতে পারেন, তবে পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৌদ্ধমত আপনারা অনায়াসে আবিষ্কার করিতে পারিবেন। যদি সেইরূপ মহাযান তত্ত্ব সম্বলিত পুস্তক পড়ার সুবিধা না ঘটে—নাই বা হইল—তথাপি এ সকল দলের ধর্ম্মমত, রীতিনীতি ও নেতাদের জীবনী, তাঁহাদের মতের বিশেষত্ব ও শিষ্য সংখ্যার এক সুস্পষ্ট বিবরণ যদি দিতে পারেন, তবে যে অনেক কাজ হয়। হিমাদ্রি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যদি পাথরের খণ্ড ও তরুগুল্মে দেশ জুড়িয়া থাকে তবে যেরূপ হয়, মহামহিমান্বিত বৌদ্ধ শ্রী এখন সেইভাবে হিন্দুসমাজে জুড়িয়া পড়িয়া আছে। এই গুলি যিনি কুড়াইয়া লইবেন, তিনি শুধু সংগ্রাহকের সম্মান লাভ করিবেন না, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করিবেন। আমি জানিনা শান্তিপুরের নিকট এই সকল সংগ্রহ করিবার কোন কিছু আছে কিনা কিন্তু আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই আছে। কর্ম্মের খোঁজে যে সকল যুবক ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, যাঁহারা সাহিত্যিক যশের কিরীট মাথায় পরিতে চাহেন, তাঁহারা এই কাজটায় লাগিয়া গেলে মন্দ কি? ঘরে বসিয়া এই ভাবে যদি রোজ রোজ এক পৃষ্ঠার উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে যে বৎসরান্তে ৩৬৫ পৃষ্ঠায় একটি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়া যায়। সেই একখানি পুস্তক লিখিয়া যে তিনি সাহিত্যের আসরে আসিয়া প্রথম হইতেই প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন। কেউ মৌলিক সন্ধান করেন না, কেউ নিজের সমাজ চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখেন না, কেবলই বই পড়া বিদ্যা লইয়া নকলবাজি। এই সকল

সম্প্রদায়ের সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতি অনুশীলন করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে এখনও বাউলাদিমতের কোথায় প্রভেদ বর্ত্তমান তাহা বুঝিতে পারিবেন। কোথায় কোথায় সেই মতাবলম্বীরা বৈষ্ণব মতের সঙ্গে একটা ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে তাহাও ধরা পড়িয়া যাইবে।

এই শান্তিপুর গ্রাম বহু প্রাচীন। অদ্বৈত যখন লাউর হইতে এখানে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্তির জন্য আগমন করেন তখন তিনি নিতান্ত তরুণ বয়স্ক, তখনও এই শান্তিপুর শিক্ষার একটা বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। সুতরাং মহাপ্রভু জন্মিবার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও যে এই স্থান শিক্ষা বিষয়ে এত বড় একটা খ্যাতি সম্পন্ন ছিল যে সুদুর শ্রীহট্ট হইতেও পড়ুয়াগণ এখানে অধ্যয়ন শেষ করিতে আসিত—তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও এই স্থান শিক্ষা-হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা নানা প্রমাণ বলে অনুমান হইতেছে, এই শান্তিপুরের অদূরে নবদ্বীপের সন্নিহিত সুবর্ণবিহার একদা মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুর একটা প্রকাণ্ড আড্ডা ছিল। রাজা সুবর্ণচন্দ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নামেই সম্ভবতঃ সুবর্ণবিহার হইয়াছিল। যে শিক্ষা সুবর্ণবিহার হইতে নিঃসৃত হইয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ললাটে জ্ঞান-গরিমার ছাপ মারিয়া দিয়াছিল বোধ হয় পার্শ্ববর্ত্তী বাউলদের আশ্রমে সেই শিক্ষার অস্তপ্রায় শেষ রশ্মি রেখা এখনও খেলিতেছে।

আপনারা শান্তিপুরের একটা ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিতে পারেন, ঐতিহাসিকের চক্ষু লইয়া অগ্রসর হউন, যেখানে এখন কিছুই দেখিতেছেন না, মনে হইতেছে এখানে আবার কোন দুর্লভতত্ত্ব থাকিতে পারে, সেই সকল স্থানে ঐতিহাসিকের উৎসুক ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তাহা হইলে ইতিহাসের মৌন ভারতী চুপে চুপে আপনাদের তাহার মনের কথা জানাইবেন।

ধরুন, শান্তিপুর পূর্ব্বে যে জায়গায় ছিল এখনও তাহাই আছে কিনা এইটি প্রথম লক্ষ্য করুন। গ্রামটি যে নদীর পারে সেই নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা, যে স্থানে মুসলমানের বাস, অনেক গ্রামেই সেই স্থানে হিন্দু রাজপ্রাসাদ কিংবা শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল, কারণ বিজয়ীজাতি হিন্দুদের ভাল জায়গাগুলিই দখল করিয়া তাহাতে নিজেদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অনেক স্থানে মঠের পাথর দিয়া মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছে। কোন কোন মসজিদের পাথরের পশ্চাৎ দিকে খোঁজ করিলে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ধরা পড়িয়া যায়। মুসলমান পাড়ার যে সকল প্রবাদ পাওয়া যায়, অনেক সময় ঐতিহাসিক তথ্য তাহা হইতে বেশী আবিষ্কৃত হইতে পারে, কারণ হিন্দুরা বৌদ্ধ কাহিনীগুলি একবারে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তৎস্থানে পুরাণোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের কথা অথবা রামায়ণের কথা দিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর গ্রামের প্রাচীন পাড়াগুলির নাম খুঁজিয়া অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, পাইকপাড়া অর্থাৎ সৈন্য নিবাস, পাটগ্রাম অর্থ রাজধানী, কোটবাড়ী, অর্থ দুর্গ এইভাবে বহুপাড়ার নাম হইতে ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। পুকুর, মন্দির, বাজার প্রভৃতি ও ইতিহাসের দিক্‌দর্শনী, বঙ্গদেশের বহু পুষ্করিণীর জলের তলে ইতিহাস লক্ষ্মী শাপগ্রস্তা হইয়া বাস করিতেছেন—মুসলমান বিজয়ের সময় অনেক হিন্দুরাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া দেব বিগ্রহ, মণিমুক্তা, স্বর্ণমুদ্রা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি পুকুরের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান। আপনারা হয়ত জানেন যে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমাণ করিয়াছেন যে ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম রূপান্তর। অনেক স্থানে ধর্ম্মঠাকুর কচ্ছপরূপী। ইহাদের মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তিও পাওয়া যায়। আপনারা ঘরে বসিয়া একটি কেন্দ্র স্থির করিয়া তাহার চারিদিকে ছ-সাত মাইলের পরিধি অঙ্কন পূর্ব্বক যদি ঐতিহাসিক চর্চ্চা করেন তবে এখান হইতেই কোন অজ্ঞাতনামা যুবক কালে যশের তুঙ্গশৃঙ্গে অধিরোহণ করিতে পারিবেন। গ্রামছড়ায় বহু ঐতিহাসিক তথ্য অনেক সময়ে সুলভ হয়, আপনারা তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন। পুরাতন পুঁথি ও দেবমূর্ত্তি হইতেও অনেক তথ্য সুলভ হইতে পারে। এই শান্তিপুরে বস্ত্রবয়ন শিল্প সাফল্যলাভ করিয়াছিল তাহার অবশ্য একটা ইতিহাস আছে তাহা

এখন অজ্ঞাত। মোট কথা স্বদেশের কোথায় কি আছে একবার নিজ চক্ষে চাহিয়া দেখুন—আপনারা কি এ সকল চেষ্টা করিয়াছেন? না করিয়া থাকিলে যদি কেহ আমার উপদেশ গ্রহণ করেন তবে আমার পর্য্যটন ও আপনাদের আতিথ্য সার্থক হইবে।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যের কৌস্তুভ মণি অদ্বৈত প্রসঙ্গ সেই যুগাবতার বুদ্ধের গুণগরিমার প্রসঙ্গ আপনারা কি সাঙ্গ করিয়াছেন? একজন পদকর্ত্তা লিখিয়াছেন,—তাঁহার শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় দেহজ্যোতিতে ভক্তি ছুটিয়া বাহির হইত। গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন তাঁর "পক্ককেশ, পক্কদাড়ী বড় মোহনীয়া দাড়ী পড়িয়াছে হৃদয় ছাইয়া।" অপর এক পদকর্ত্তা তাঁহার গান করিবার সময় সুন্দর ভ্রূভঙ্গী ও কর দ্বারা তাল রক্ষার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেন তাঁহাকে চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেখাইতেছে। আমি এই পল্লীর প্রতি ধুলি-কণায় তাহারই যুগযুগান্তরব্যাপী অঙ্গস্পর্শ অনুভব করিতেছি। তিনি যেন কাহাকে ডাকিয়াছিলেন—তাঁহার ডাকে কে আসিয়াছিলেন—সুতরাং তাঁহার কথা শেষ করিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহারই বংশধরগণের নিকট তাঁহার প্রসঙ্গ যে বঙ্গদেশবাসী অজস্র শুনিতে পায়। বিলাতে সামান্য কবি, সামান্য গ্রন্থকারের গৌরবে এক একটি গ্রাম অট্টালিকামণ্ডিত হইয়া উঠে—আর যাঁহারা জগৎপাবন, তাঁহাদের স্থানে আমাদের মধ্যে কত জন পবিত্র হইতে আসেন? বায়রণ-স্কটের জন্মভূমি দেখিবার জন্য, মার্কিণ, অষ্ট্রেলিয়া হইতে পঙ্গপালের ন্যায় যাত্রীর প্রবাহ ছুটিয়া আসে; কিন্তু অদ্বৈতের এই লীলাক্ষেত্র দেখিতে তাঁহার কথা বলিতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আগমন করেন বলিয়া তো আমি জানি না। বরঞ্চ যাহাদিগকে আমরা ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি, তাহারাই যে ছিন্নবাসে ঢাকিয়া আমাদের অমূল্য রত্ন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই তো দলে দলে শান্তিপুরনাথের শান্তিপুরের ধূলা মাথার তিলক করিতে লইয়া যায়, তাহারাই তো এখনও এই তীর্থের যাত্রী, ভগবান করুন যেন সেই তথাকথিত ছোটলোকদের পায়ের ধুলা লইবার যোগ্যতা আমার হয়।

আমাদের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা

শ্রীসুধাকান্ত দে.এম্ এ, বি এল্

অধ্যাপক **বিনয়কুমার সরকার** মহাশয় প্রণীত শিক্ষা সম্বন্ধে তুলনামূলক একখানি অপূর্ব্ব কেতাব সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।* তাহা হইতে কিছু কিছু আঁকজোক নীচে তুলিয়া দেওয়া গেল। এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের অবস্থাটা সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে।

কোন্ দেশে কত লোক ?

	১৯১৪	১৯২৩
	কোটি	কোটি
যুক্তরাষ্ট্র	৯·৮	১১
ফ্রান্স	৪	৩·৯
জার্ম্মেণী	৬·৮	৬·১
গ্রেট বৃটেন	৪·৬	৪·৭
ইতালি	৩·৬	৪
জাপান	৫·৩	৫·৬
রুশিয়া	১৭·৪	১৩·২
বৃটিশ ভারত	২৪·৪	২৪·৭
বাঙ্গালা		৪·৭

জাতীয় ধন

	১৯১৪		১৯২৩	
	মোট টাকা কোটি	মাথা পিছু	মোট টাকা কোটি	মাথা পিছু
যুক্তরাষ্ট্র	৬০,০০০	৬,১৮৩৲	৬৯,০০০	৬,২৭০৲
ফ্রান্স	১৭,৩৭০	৪,৩৪১৲	১৭,৩৭০	৪,৪৫২৲
জার্ম্মাণি	২৪,১৫০	৩,৫৪৯৲	১৬,৫০০	২,৭০৩৲
গ্রেট বৃটেন	২১,১০০	৪,৫৬৩৲	২১,০০০	৪,৪৬৭৲
ইতালি	৬,৫৪০	১,৮১৫৲	৬,৩৭৫	১,৫৯৩৲
জাপান	৩,৪৯৫	৬৬০৲	৪,৫০০	৮০১৲
রুশিয়া	১৭,৫২০	১,০০৫৲	১৩,৫০০	১,০২০৲
বৃটিশ ভারত	৯,০০০	৩৬৬৲	১০,৫০০	৪২৩৲

জাতীয় আয়

	১৯১৪		১৯২৩	
	মোট টাকা কোটি	মাথা পিছু	মোট টাকা কোটি	মাথা পিছু
যুক্তরাষ্ট্র	১০,৩২০	১,০৫৩৲	৯,৩০০	৮৪৩৲
ফ্রান্স	২,১৯০	৫৪৬৲	২,১০০	৫৩৭৲
জার্ম্মাণি	৩,১৫০	৪৬২৲	২,১০০	৩৪২৲
গ্রেট বৃটেন	৩,২৭০	৭০৮৲	৩,০০০	৬৩৬৲
ইতালি	১,১৭০	৩২৪৲	১,০২০	২৫৫৲
জাপান	৪৮০	৯০৲	৬০০	১০৫৲
রুশিয়া	২,২৫০	১২৯৲	১,৬৮০	১২৬৲
বৃটিশ ভারত	৯০০	৩৬৲	১,০৫০	৪২৲

শিক্ষার বাহন

শিক্ষার উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব-কথা বলা চলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দান খরচের ব্যাপার, টাকা আনা পাই সাপেক্ষ, তা স্বীকার করিতেই হইবে। যে দেশে গড়পড়তা মাথা পিছু আয় মাত্র ৪২৲ টাকা (১০ বছরে ৬৲ টাকা বাড়িয়াছে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই) সে দেশে সরকার কর বসাইয়াই বা কত টাকা শিক্ষার জন্য উদ্বৃত্ত রাখিতে পারে আর জনসাধারণ নিজের গাঁট হইতে কত খরচ করিতে পারে ?

* Comparative Pedagogics in relation to Public Finance and National Wealth, 1929. (N. M. Ray Chowdhury & Co). পৃঃ ৮+১২৬

সুতরাং শিক্ষাদান প্রসঙ্গে জাতীয় ধনতত্ত্ব ও আয়তত্ত্ব আলোচনা নিরর্থক নহে। ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। অন্য দিকে যথোচিত শিক্ষার, বিশেষতঃ উচ্চ, বৈজ্ঞানিক ও টেক্‌নিকাল শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে শীঘ্র ধনোৎপাদন বা ধন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হইবে না। আমরা এ বিষয়ে যে কত পশ্চাৎপদ্ তা এই পুস্তিকার পাতা একবার উল্টাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

শিক্ষার জন্য খরচ হয় দুই খাতে (১) বেসরকারী (২) সরকারী। অধ্যাপক সরকার মহাশয় বিভিন্ন দেশের সরকারী খরচ এরূপ দেখাইয়াছেন :

	মাথা পিছু গড়ে	
যুক্তরাষ্ট্র	২৯৷৵৪ পাই	(১৯২০)
জার্ম্মাণি	১৭৷৷৴০	(১৯২৫-২৬)
গ্রেট বৃটেন	১৭৷৴৪ পাই	(১৯২৬)
ফ্রান্স	৫৷৴৩ পাই	(১৯২৭)
ইতালি	৪৲	(„)
জাপান	২৷৩ পাই	(„)
সোভিয়েট রুশিয়া	৬৯ পাই	(১৯২৪)
বৃটিশ ভারত	৷৷০	(১৯২৬-২৭)
বাঙ্গালা	৷৴৬ পাই	(„)

গ্রন্থকার আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে শুধুমাত্র খরচের পরিমাণটা দেখিয়া কোন জাতির এফিসিয়েন্সি বিচার করিতে বসিলে ভুল হইবে। জাপান ২৷৩ পাই ব্যয় করিলেও কোন কোন দিকে যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলণ্ডের কাছাকাছি যায়। কিন্তু তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে গোটা ভারতে মাথাপিছু গড়ে শিক্ষার জন্য যা ব্যয় হয় বাঙ্গালা প্রদেশে তদনুরূপ না হওয়ায় আমাদের নিশ্চিত বঞ্চিত হইতে হইতেছে।

এই খরচটা মোট সরকারী বাৎসরিক খরচের শতকরা কত অংশ তার হিসাবটা জুড়িয়া দেওয়া যাইতেছে।

ফ্রান্স	৫%
জাপান	৯·৬%
ইতালি	৭·৬%
সোভিয়েট রুশিয়া	৩·৮%
গ্রেট বৃটেন	৫·৪%
বাঙ্গালা	৪·৭%

পুস্তিকার পরিচ্ছেদ পরিচয়

এই পুস্তিকা বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক শিক্ষা-তাত্ত্বিক ইহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে নূতন আলোক লাভে সমর্থ হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। অধিকন্তু এই প্রকার তুলনামূলক আলোচনাও যে বিজ্ঞান বিশেষ ও তার চর্চ্চার প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এখানে সমগ্র পুস্তিকার সমালোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। এমন কি বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্কগুলিও তুলিয়া দিবার স্থান নাই। এখানে শুধু মোটামুটি সূচীটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে পাঠকগণ "হালে পানি পাইতেছে" কি না দেখিবেন।

১। ভূমিকা
২। সামাজিক সূচী সংখ্যার কার্য্যকারিতার পরীক্ষা
৩। ফ্রান্স
৪। জাপান
৫। ইতালি (সিসিলি ও সার্দ্দিনিয়া শুদ্ধ)
৬। জার্ম্মাণি (সা'র শুদ্ধ)
৭। সোভিয়েট রুশিয়া (ইউ আর এস্ এস্)
৮। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
৯। গ্রেট বৃটেন
১০। বৃটিশ ভারত
১১। বাঙ্গালা
১২। জাতীয় ধন ও জাতীয় আয়
১৩। তুলনামূলক শিক্ষা সমালোচনায় বাঙ্গালার স্থান
১৪। লোকবল, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সরকারী ফিন্যান্সের তুলনামূলক আলোচনা
১৫। ষ্ট্যাটিষ্টিক ঘটিত তথ্যের ব্যাখ্যা
১৬। পরিশিষ্ট—পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট পাঠ্যাবলী সম্বন্ধে মেমোরেণ্ডাম (অর্থশাস্ত্র ও অনুরূপ বিজ্ঞানাদির সম্পর্কে)।

পুস্তিকার ইজ্জৎ

যে কেহ এই পুস্তিকার পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ইহার জন্য অনেক খাটিতে হইয়াছে, অনেক অঙ্ক কষিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার নাম ঘুরাইয়া ম্যাথেমেটিকাল পেডাগজিক্স রাখিলেও চলিত। এই দিক্ দিয়া বাস্তবের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া এই সাহিত্যের যে একটা বড় সম্ভাবনা রহিয়াছে তার আভাষমাত্ররূপে (অগ্রদূত বলিব কি?) এই পুস্তিকা দেখা দিয়াছে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু অধ্যাপক সরকার মহাশয় সর্ব্বত্র টাকা আনা পাইয়ে কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুদ্রাকে ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে হইয়াছে। তাহাতে তুলনাটা সহজসাধ্য হইয়াছে।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুদিন হইতে অনেক প্রকার সংস্কার (হয়ত কুসংস্কার!) আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছিল। সেগুলি অপক্ষপাতভাবে যুক্তির আলোকে বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যুক্তিটা কি? না, দুনিয়ার মধ্যে শিক্ষা-ব্যাপারে কোন্খানে আমাদের স্থান? চক্ষু বুজিয়া আমরা অবশ্য সর্ব্বদা মনে করিতে পারি যে আমাদের চেয়ে বড় কেহ এ জগতে নাই। কিন্তু তর্কের ও তুলনামূলক সমালোচনার আলোকে আমাদের সে অন্ধতা মুহূর্ত্তে দূর হইয়া যায়। এই পুস্তিকায় সেই কাজ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করিবার দিকে বিশেষজ্ঞদের মনকে প্রণোদিত করিবে।

এই পুস্তিকা সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় সমালোচনা হইতেছে, ইহা বহু দিকে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাকে নব বিজ্ঞানের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকারী বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না। যদি বাঙ্গালীর ছেলে নানাদিক হইতে এই বিষয়টাকে পাকড়াও করিয়া বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন ও এই পুস্তিকাখানিকে অচিরে "সেকেলে" বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারেন, তবে গ্রন্থকারের চেয়ে কেহ বেশী খুসী হইবে না। বস্তুতঃ সেই উদ্দেশ্য লইয়াই ইহার জন্ম।

প্রার্থনা

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল, সাহিত্যরত্ন, কবিভূষণ

এস হে গেহে; গভীর স্নেহে
বুকের মাঝে টানিয়া লহ।
তোমারি বাণী মাধুরী দানি'
শ্রবণমূলে নীরবে কহ।

আমার যা কিছু সকলি তোমার,
সকলি তোমার, প্রভু হে!
আমার জীবন, মান ধন জন
সকলি আবার ফিরায়ে লহ!

সুখ ও দুঃখ হাসি ও কান্না
এ বৃথা ধরায় বৃথায় হে!
মায়ার বাঁধন, সোণার স্বপন,
জীবের শুধুই দুঃখবহ।

গরজে আঁধারে অকূল সাগর,
কাণ্ডারি হে! দেখাও পথ!
দূর ক'রে দাও সকল ভয়;
তোমার গোপন বারতা কহ।

এস হে গেহে; গভীর স্নেহে
বুকের মাঝে টানিয়া লহ।

সুভাষিত সংগ্রহ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস, বি এ, সাহিত্যভূষণ, কবিরঞ্জন

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন :—

জন্ম ১৭২৩ খৃঃ

মৃত্যু ১৭৭৫ খৃঃ

১। মন গরীবের কি দোষ আছে,
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচে।

২। মা হওয়া কি মুখের কথা
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।

৩। ও তুই না চিনিয়ে কাঞ্চের গোড়া
লাভে মুলে হারাইলি।

৪। এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়্বে ধারা।

৫। জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে, কোন লাজে সাজাতে চাস্ তায়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়
আলো চাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা,
সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা।

৬। ছেলের হাতে মোয়া নয় যে
থাবে ছমকো দিয়ে।

৭। কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে
কারু পেটে ভাত গেঁাটে সোনা॥
কেহ যায় মা পাল্‌কী চড়ে।
কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায় দেয় শাল দোশালা
কেহ পায় না ছেড়া টেনা।

৮। ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়।

৯। তুই কাঁচ মূলে কাঞ্চন বিকালি।

১০। আমায় দেও মা তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী
পদ রত্ন ভাণ্ডারে সবাই লুটে
ইহা আমি সইতে নারি।

১১। মা আমায় ঘুরাবে কত ?
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।

১২। মন রে কৃষিকাজ জান না
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোনা।

১৩। বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।

১৪। ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই।

১৫। ওরে সুরা পান করিনে আমি।
সুধা খাই জয় কালী বলে॥
মন মাতালে মাতাল করে।
মদ মাতালে মাতাল বলে॥

১৬। এই সংসার ধোকার টাটি।

১৭। গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমায় পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব্ না।

১৮। মা মা বলে আর ডাক্‌ব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলেম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,

আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব।
মা বলে আর কোলে যাব না।

১৯। কালী গো কেন ন্যাংটা ফের
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা।
রাজার মেয়ে গৌরব কর॥
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম।
পতির উপর চরণ ধর॥

২০। তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বোঝে মন।

২১। জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা।
ছি ছি কথা তুলো না॥
ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়।
তার মুখে কি তুলনা হয়॥

২২। খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ।

২৩। কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত।

২৪। লোকে বলে কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকি।

২৫। আকাশে ফেলিলে ছেপ এসে গায়ে পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥

২৬। কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে।

২৭। আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে।

২৮। ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে।

২৯। জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।

৩০। পরস্ত্রী জননী তুল্য থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানী মান ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম তবে যাবে নীচ সঙ্গ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥

গোবিন্দ দাস (গোবিন্দ কবিরাজ)
জন্ম ৯৪৪ সাল—
মৃত্যু ১০২০ সাল।

১। নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরী মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥

২। গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন,
তুহুঁ কি না জানসি রীত।
গোবিন্দ দাস কহে, উঠি চলু সুন্দরী
বিঘটন কানুক পিরীত॥

৩। নুপুরের নাদে জাগল পাঁচ বাণ।

৪। দুহুঁজন মিলন উপজল প্রেম।
মরকতে যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক লতাবলি তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥

৫। দশনক জ্যোতি, মতি নহে সমতুল,
হসইতে খসই মণি জানি।
কাঁচা কাঞ্চন, বরণ নহে সমতুল,
বচন জিনিয়া পিকবাণী।

৬। নয়ন যুগল নীলকমল সমান।
হের ইতে যুবতী জন অথির পরাণ॥

৭। দুহুঁ দুহুঁ অধরে করয়ে মধু পান।
চাঁদ চকোর জনু মিলায়ল আন॥

৮। অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি।

৯। কলিযুগ কলুষ, তিমির ঘোর নাশক,
নবদ্বীপ চাঁদ উজোর।

১০। গোরা করুণাসিন্ধু অবতার।
নিজগুনে গাঁথিয়া, নাম চিন্তামণি,
জগতে পরাওল হার।

১১। গৌরাঙ্গ পতিত পাবন অবতারি।
কলি ভুজঙ্গম দেখি, হরি নামে জীব রাখি
আপনি হইলা ধন্বন্তরি॥

১২। কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য,
পতিত পাবন যার বানা।
পুরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইল এবে,
নিজ রূপ ধরি কাঁচা সোনা।

১৩। হের দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ চাঁদের চরিত,
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল নয়ন যুগল,

ভকতি যাচিঞে সব জীবে ॥

১৪। পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা তনু,
অবনি ঘন পড়ি যায় ॥

১৫। শচীর কোঙর, গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়ান বাণে।

১৬। মরমে ভরমে জাগে পীরিতি আরতি।

১৭। সজনি, কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা বদন দেখিয়া
ঘুচাব মনের ব্যাথা ॥

১৮। এ হেন গৌরাঙ্গগুণ, না করিলাম শ্রবণ,
হায় হায় করিরে হুতাশ।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, মুখভরি না লইলাম,
জীবন্মৃত গোবিন্দদাস।

১৯। বিদ্যাপতি পদযুগল সরোরুহ,—
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস, মাতল মধুকর,
পীপইতে করু অনুবন্ধে ॥

২০। ছুঁওনা ছুঁওনা, নিলজ কানাই,
আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের, পবন পরশে
সকলে সিনান করি ॥

২১। সুন্দরী রাধা আও রে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুট মণি ॥

২২। ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির, তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায় ॥

২৩। যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকর হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে ফল ফলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই ॥

২৪। চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়ানে চায় ॥

২৫। কি শুনি সুধা মুরলী রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব ॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন ॥

২৬। প্রতি পদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিফল প্রাণ ॥

২৭। হরি নাকি যাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুলবাস জীবনে কি আর আশ,
বধভাগী হইল অক্রুর।
ছাড়িবে গোকুলচন্দ পরাণে মরিবে নন্দ,
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে
সবার আগে মরিবেক রাধা ॥

২৮। মাস গণি গণি, আশ গেলহু
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব, হিয়াক বেদন,
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া ॥

২৯। একে বিরহানল, দহই কলেবর,
তাহে পুন তপনকি তাপ।

৩০। আজু কি পেখনু বিনোদ নাগর
কেলি কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসিল আনন্দ জলে ॥

[অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী]

৩১। আধ আধ অঙ্গ মিলন রাধাকানু।
আধ কপালে শশী আধ ভালে ভানু ॥
আধ গলে গজমতি আধ বনমালা।
আধ নবগৌরী তনু আধ চিকনকালা ॥ ঐ

৩২। প্রতি অঙ্গে রতি চিহ্ন আঁখি ঢুলুঢুল।

খসিল কেশবেশ মালতি বকুল ॥

[অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী]

৩৩। প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আস।
এমতি নিলাজ হাসি সেইখানে হাস ॥
বিজহ বিজহ বন্ধু আইলা কোন কাজে।
সেই সে রমণী ইনি তোমাকে সে সাজে ॥

[অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী]

৩৪। যে দিকে পসারি আঁখি দেখি শ্যামময়।
কুলবতী বরত ধৈরজ নাহি রয় ॥

বাউনি বাঁধা ও সুওদুও পর্ব্ব

শ্রীশিবচন্দ্র শীল, কনকাঙ্কুর, দেবশ্রেষ্ঠী

সেকালে পৌষ সংক্রান্তির পর মাঘের প্রথমে বণিক্‌দের বাণিজ্য যাত্রা হইত, পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইত; তাহার নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন বাণিজ্য যাত্রার প্রবহণ, শৌকী অর্থাৎ নৌকাবন্ধন স্থান হইতে ঘাটে আনিয়া বন্ধন করা হইত। উহা হইতে বাউনি বাঁধা পর্বের উৎপত্তি। প্রবহণ—সমুদ্রগামী পোত। প্রবহণের সংক্ষেপ—বহন, বহন হইতে বহনি, বহনি হইতে বাউনি। ছোট ছোট প্রবহণকে বহনার নৌকা বলিত—নাটুরে মাঝিদের ভাষায় উহার নাম হইয়াছে—গহনার নৌকা। আমাদের সে বাণিজ্য নাই, বহনাও নাই। থাকিলে ত, পুরুষেরা বা নাবিকেরা ঘাটে গিয়া বহনাবন্ধন করিবে? পুরুষ হীনবল বলিয়া, পুরুষের কাজ মেয়েরা লইয়াছেন—তাঁরা ঐ দিন চাউল কোটা, পিটে আস্কে গড়া প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত। রাত্রে অবসর পাইয়া তাঁরা বাউনি বাঁধেন—ঘরের সিন্দুক, খাট, কেদরা, আলমারি, হস্তপীঠ (table), ইস্তালাং প্রভৃতি দ্রব্যে লম্বা লম্বা তৃণের গুচ্ছ পাকাইয়া দড়ি করিয়া তদ্দ্বারা বহনা বাঁধা হইত। লম্বা তৃণের অভাবে খড়ের দড়িতে এখন বাউনি বাঁধা হয়। পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন হইতে ১লা মাঘ পর্য্যন্ত বাউনি, বাঁধা থাকে। ২রা মাঘ বন্ধন খুলিতে হয়। সেইদিন হইতে বাণিজ্য যাত্রার দিন। পৌষ সংক্রান্তির দিন সুওদুও ব্রত। ঐদিন প্রবহণের পূজা হইত। গৃহিনীরা ঐদিন সুওদুও ব্রত করিয়া উপবাস করেন। সুওদুও পূজার ডিঙ্গি কলাগাছ কাটিয়া তৈয়ারি করিতে হয়। মধ্যাহ্নের পর পুরোহিত আসিয়া ডিঙ্গি পূজা করেন। তৎপরে পুরোহিতের গৃহিণী আসিয়া সুওদুও ব্রত কথা শুনাইয়া দিলে পর গৃহিণী জলযোগ করেন। ডিঙ্গিতে এই এই জিনিষ দিতে হয়,—ক্ষীরের পুতুল ২টি, নারিকেলের পুতুল ২টি, কুল ১ জোড়া, সিস ১ জোড়া, কলাই সুটি ১ জোড়া, লাউ ফুল ১টা, ইক্ষু ২ পাব, রাঙ্গা আলু ১ খানা, কাঁটালি কলা ২টা, মূলো ২টা, ঘৃত প্রদীপ ১টা, কড়ির ভার ১টা (১টা কাটিতে দুই দিকে ২টা কড়ি দিলে কড়ির ভার হয়)। অপরাহ্নে নদীতে ডিঙ্গি ভাসাইয়া দিতে হয়। ১ জন ভৃত্য উহা ভাসাইতে যায়। ছেলে মেয়েরা কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে সঙ্গে যায়। ভাসানের কালে বলে—"সুও দুও যায় ভেসে সাত ভাই আসে হেঁসে"। মনে হয়, সে কালে প্রবহণগুলির নাম ছিল—শুকচ্ছন্দ, মধুকরচ্ছন্দ, ইত্যাদি। শুকচ্ছন্দের সংক্ষেপ—শুক। উহা হইতে ভাষায় সুও। দুও ধন্যাত্মক শব্দ, উহার কোন অর্থ নাই। অথবা দুওর অর্থ—দূর। তবেই অর্থ হইতেছে সুও ভাসিয়া যাইতেছে বা সুও দূরদেশে ভাসিয়া যাইতেছে অথবা দুও নিন্দা বাচক শব্দ। অর্থ—সুও তুই শীঘ্র যেতে পাচ্ছিস না, শীঘ্র ভেসে যা, আর সাত ভাই হাঁসিতে হাঁসিতে আসিয়া পড়ুক। এই সাত ভাই কে? এ আর কে না জানেন? চাঁদ সদাগরের সাত ব্যাটা।

পদ্মা পুরাণ প্রভৃতি মনসার গান, প্রাচীন কবিতা, ব্রত কথা, ও জনবাদে চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর প্রসিদ্ধ আছেন। ইহাদের জীবন কথা,

সুও দুওর ব্রত কথা, লক্ষ্মী পূজার ব্রত কথা, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথা অন্যত্র কীর্ত্তন করিয়াছি। দীনেশবাবু তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে" বলেছেন—"রাজপুত্র কি সদাগরের পুত্রকে নায়করূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইত। আমরা শৈশব কালে সেই সব উপাখ্যান শুনিয়া রাজপুত্র ও সদাগরের পুত্র উভয়কে তুল্যরূপ সম্মানিত জ্ঞান করিতাম। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডী ও মনসার গীতের নায়ক ও নায়িকা সদাগর-কুলোদ্ভব।" এখন বণিক্ সম্প্রদায় য়ুরোপে সম্মানিত, আমাদের দেশে নিগ্রহভাজন।

শান্তিপর্ব্বে রাজ ধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বে,—

ধনিনং পূজয়েন্নিত্যং পানাচ্ছাদন-ভোজনৈঃ।
বক্তব্যাশ্চানুগৃহ্নীধ্বং প্রজাঃ সহ ময়েতি চ ॥
অঙ্গমেতন্মহদ্রাজ্যে ধনিনো নাম ভারত।
ককুদঃ সর্ব্বভূতানাং ধনস্থো নাত্র সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ রাজা ধনীদেরকে পান, আচ্ছাদন ও ভোজন দ্বারা নিত্য পূজা করিবেন এবং তাঁদেরকে বলিবেন,—আমার সহিত আমার প্রজাদেরকে অনুগ্রহ করুন। হে ভারত! রাজ্যে ধনীরা এক মহৎ অঙ্গ। ধনবান্ ব্যক্তিসকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ইহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্যকালে এক বণিক্ অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া বদর দ্বীপে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার আধিবাসিনী কিন্নরীরা তাঁহাকে আদর করিয়া বলেন,—

ইদঞ্চ কিন্নরপুরং বয়ঞ্চ প্রণয়ার্পিতাঃ।
রত্নঞ্চ সৌভাসনিকং সাধো! স্বাধীনমেব তে ॥

এই ত কিন্নর পুর, আমরা প্রণয়ের সহিত আস্বাদান করিতেছি। হে সাধো! এই সুন্দর শোভাবিশিষ্ট রত্ন, আপনারই। বদর দ্বীপটা কোথায় তা ত জানিনা। নারিকেলী কুলের মত যাহার আকৃতি, সেই দক্ষিণ আমেরিকা না কি? মনে হয়, তাই বটে। ভারতীয়েরা মধ্যকালে আমেরিকায় গিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই—"আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতি পিরুবিয়া দেশে* প্রচলিত 'রামসিতোয়া' নামক মহোৎসব ও ঐ দেশীয় নৃপতিগণের সূর্য্য বংশ হইতে উৎপত্তি প্রবাদ (A. R. Vol. 1, P. 426.) ঐ খণ্ডের মধ্যস্থল-বাসী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু (ভা. উ. স. ২য় ভাগ, উপ, ১৩৭ পৃ.)।

এই যে বণিক্ সমুদ্র যাত্রা করিয়া দীর্ঘকাল আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তিনি পোতে অলিগুঞ্জব ও জম্বুলক হইতে মিঠা পানি অবশ্যই খাইয়াছিলেন ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং অনার্য্য দেশে গিয়াও জলাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে কোন দোষ হয় নাই? না, হয় নাই। ধনাদি শুদ্ধির মন্ত্র দ্বারা তিনি অবশ্যই ব্যবহার্য্য সকল বস্তু শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। শুদ্ধির মন্ত্র এই,—

"জল সুদ্দ থল সুদ্দ সুদ্দ কাটের পিড়ে।
সকল মৃত্তিকা সুদ্দ সুদ্দ প্রীথিবী জুড়ে"।

* মানচিত্রে পিরুবিয়া নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় আছে Peru। একখানি ছোট Geographyতে ঐ দেশের কথায় লিখিয়াছে—প্রাচীন রাজধানী Cuzes; এখানে একটি জমকাল সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

দুঃখিনী

শ্রীমতী রেণুকণা বসু

(১)

"মা ! মা !"

"কেন বাবা !"

"মা গো আমায় একটা পয়সা দাওনা"

"কেন রঘু ! পয়সা কি করবে বাবা !"

"দরজায় একজন কানা ভিখারী এসেছে তাকে দেব ! মা গো বেচারা সারা দিন কিছু খায়নি, দাওনা মা একটা পয়সা !" মাতা নীলিমা কিছুক্ষণ তাহার পুত্রের সুন্দর সরলতামাখা মুখখানির দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন, আনন্দে তাঁহার দুঃখকাতর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। যদিও তাঁহার নিকট একটি পয়সাও বহুমূল্য তথাপি তিনি পুত্রের এইরূপ সদিচ্ছায় বাধা দিলেন না। সহাস্য বদনে রঘুর হস্তে একটি পয়সা দিলেন। রঘু আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান ভিখারীটির হস্তে দিল। অন্ধ ভিখারী রঘুর দীর্ঘজীবন কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

(২)

নীলিমা বিংশ বর্ষীয়া সুন্দরী বিধবা যুবতী। তাহার একটি মাত্র পুত্র সন্তান সম্বল। তাহার স্বামী বহরমপুরের একজন সামান্য উকীল ছিলেন। নীলিমার স্বামীর নাম বিমলকৃষ্ণ বসু। বহরমপুরে বিমলবাবুর সেরূপ পসার ছিল না, অবশেষে তাঁহার বন্ধু ক্ষিতীশচন্দ্রের পরামর্শে বহরম পুরের বাটি বিক্রয় করিয়া কুমিল্লাতে আসিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ কলেরা রোগে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও একমাত্র পুত্র রঘুকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া, ইহধাম ত্যাগ করেন। কুমিল্লাতে নীলিমার আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। নীলিমাদের পাশের বাটিতে অবনীবাবু নামে এক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। ইহার পত্নী বিমলার সহিত নীলিমা সখীত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, উভয়ে উভয়কে দিদি সম্বোধন করিতেন। বিমলার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রের নাম মণ্টু ও কন্যার নাম মণিকা। ইহাদের সংসার বেশ স্বচ্ছল। বিমলবাবু মারা যাইবার পর তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বাল্য বন্ধু বিধবা নীলিমাকে মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করিতেন, কিন্তু এই সামান্য দশ টাকায় আজ কালকার দিনে কি হইবে! ৫৲ পাঁচ টাকা বাড়ী ভাড়া যাইত এবং অন্য পাঁচ টাকায় খাওয়া পরার বড়ই কষ্ট হইত। এই জন্য সে মোজা, টুপী, কাঁথা ইত্যাদি সেলাই করিয়া যাহা পাইত তাহাতে তাহাদের দুই জনের কায়ক্লেশে দিন কাটিত। নীলিমা এই নগরে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় আসিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছিল।

(৩)

"মা, বাবা কোথায় ?"

আজ একি প্রশ্ন ? হায় ভগবান, দুঃখিনী বলে কি আমাকে এমনি করেই আঘাত করতে হয় ! নীলিমা মনে মনে এই কথা কয়টি বলিয়া পুত্রের সেই ব্যাকুল কাতর মুখখানির পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে কি উত্তর দিবে ? তাহার এ সকল কথার উত্তর দিবার কি শক্তি আছে ? আজ পুত্রের কোমল কাতর মুখখানির দিকে চাহিয়াও তাহার চক্ষু হইতে এক বিন্দুও অশ্রু ঝরিল না। আজ তাহার হৃদয় শুকাইয়াছে, সে পাষাণের মত অটল হইতে শিখিয়াছে।

মাতাকে এইরূপ নিরুত্তর দেখিয়া রঘু বড়ই চঞ্চল হইল ও একটু ব্যগ্রভাবে বলিল "মা গো ! ও মা ! বলবে না ? বলোনা মা !"

নীলিমা ধীরে ধীরে বলিল,—"বাছারে তোর বাবা অনেক দূর দেশে চলে গেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের সুখে আছেন বাবা ! এখানে এলে তাঁর খুব কষ্ট হবে। নীলিমা

আর পারিল না তাহার পাষাণ হৃদয়ে বারিপাত হইল, তাহার চক্ষু দিয়া নীরবে দুইটি বড় বড় মুক্তার মত তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বালক নীরবে এতক্ষণ মাতার দিকে চাহিয়াছিল, সরলমতি বালক আবার বলিল "কেন মা, আমরা কি বাবার কাছে যেতে পারি না? কেন কাঁদছ মা? কেঁদ না। আমি আগে বড় হই তার পর তোমাকে নিয়ে বাবার দেশে রেল গাড়ী চড়ে যাব, তুমি কেঁদ না!"

সেই দুঃখেও তাহার ম্লান ছল ছল মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরক্ষণেই কোন অজানিত বিপদের আশঙ্কায় সে শিহরিয়া উঠিল।

রঘু তাহার কচি কচি বাহু দুটির দ্বারা মাতার অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

অবোধ শিশু তুই কি বুঝিবি!

নীলিমা আপন মনে বলিল "বিধাতা আর কত পরীক্ষা করবে আমাকে! দয়াময়, দয়া কর, আর পারি না। আজ যদি তিনি থাকতেন তাহলে কি আমাদের এমনি করে থাকতে হতো? ওগো একবার এস, দেখে যাও তোমার বড় আদরের নীলিমা ধুলায় লুটিয়ে কাঁদছে, তার অশ্রু মুছাবার আর যে কেউ নেই! ওগো তোমার চরণে কি দোষ করেছি যার জন্য আমাদের এমনি করে ফেলে চলে গেলে?"

আজ যেন পতিশোক তাহার হৃদয়ে নূতন করিয়া বাজিল; আর ভাবিতে পারিল না, তাহার ভাবিবার শক্তিও ছিল না ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ধারার পর ধারা অশ্রু নামিয়া তাহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই।

রঘু যে বহুক্ষণ হইতে তাহার কোমল কচি বাহুর দ্বারা মাতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া সযত্নে অশ্রু মুছাইতেছে নীলিমা তাহা বুঝিতেও পারে নাই। রঘু কাতরস্বরে ডাকিল "—মা! আর কত কাঁদবে! চল ঘরে চল।"

মাতা পুত্রের কাতরতাব্যঞ্জক মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন বালকের সুন্দর সুঠাম গণ্ডদ্বয় তাঁহারি অনুকরণে সিক্ত হইয়াছে। পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনকে অবরোধ করিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় বিমলা আসিয়া ডাকিল,—"দিদি!"

(৪)

একদিন প্রভাতে যখন পূর্ব্ব গগন রক্তিমরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন সেই সময় নীলিমা শয্যা ত্যাগ করিয়া পুত্রের গাত্রস্পর্শ করিল। অমনি তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল।

রঘু ঘরে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে।

নীলিমা বড়ই চিন্তিত হইল, এই সহায়সম্বলহীন নগরে সে কি করিবে! পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া সে আকুল হইয়া দীনের শরণ জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল।

অন্যদিন প্রভাতে রঘু কত দুষ্টামী করে, মণ্টু ও মণিকার সহিত কত খেলা করে, কিন্তু কই আজ তো সে সব কিছুই নাই।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া মণ্টু ও মণিকা তাহার খোঁজ লইতে আসিল। আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

মণিকা নীলিমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"মাসীমা রঘু কেন আজ খেলতে যায় নি?"

নীলিমা বলিল, "রঘুর জ্বর হয়েছে মা!"

মণিকা একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কি করে জ্বর হল মাসীমা?"

নীলিমা ব্যথিত স্বরে বলিল,—"কি জানি মণি! ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়।"

"তবে আমি যাই মাসীমা! মা'কে গিয়ে বলি।"

নীলিমা ব্যগ্রভাবে অথচ ধীরে ধীরে বলিল,—"না মণি, তোমার মা'কে বোলো না তিনি ব্যস্ত হবেন।"

মণি শুনিল না, ছুটিয়া চলিয়া গেল।

মণ্টু ইহার কিছুই বুঝিল না, সে সবে তিন বৎসরের, সে রঘুকে অত্যন্ত ভালবাসে। সে রঘুর একটু কাছ ঘেঁসিয়া বসিল, কিছুক্ষণ বসিয়া মণ্টু বলিল:—

"দাদিয়া লঘুদাদাল অচুক কলেচে!"

নীলিমা সেই কচি মুখের মধুমাখা কথাগুলি শুনিল,—

তাহার মাতৃ হৃদয় গলিয়া গেল।—সে মণ্টুকে ক্রোড়ের কাছে টানিয়া তাহার সুন্দর সরল মুখখানিতে সস্নেহে চুম্বন করিল, সেও প্রতিদান স্বরূপ মাসীকে একটু ক্ষুদ্র চুম্বন দান করিল।

ইতিমধ্যে বিমলা আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিমলা ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,"—হ্যাঁদিদি রঘুর কি হয়েছে ভাই?"

নীলিমা অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে বলিল,"—কি জানি দিদি আজ ভোর থেকে বড্ড জ্বর, কথা বলতে পারছে না—"

কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল "বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, কি হবে ভাই!"

বিমলা বলিল,—"দিদি ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।"

"ডাক্তার? কি করে ডাকব বল দিদি, ভিজিট কোথা থেকে দেব? এ অনাথার যে কিছু নেই বোন্! আমি যে কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"দিদি তুমি ভেব না ভাই আমিই ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি।"

বিমলা চলিয়া গেল, নীলিমা কিছুই বলিতে পারিল না, কারণ রঘু তাহার বড় আদরের বংশের দুলাল। কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

নীলিমা শুধু একবার তাঁহার উদ্দেশে মাথা নোয়াইল।

হঠাৎ রঘু একবার চমকাইয়া উঠিল।—তখন বেলা একটা বাজিয়াছে, কল্যকার যে দুগ্ধ ছিল তাহা রঘুকে একবার খাওয়াইয়াছে। আজ আর গয়লা দুধ দিয়া যায় নাই।

নীলিমা পুত্রকে ধীরে ধীরে বিছানায় শোয়াইয়া বিমলার নিকট হইতে অল্প একটু দুধ চাহিয়া রঘুকে খাওয়াইতে গেল, কিন্তু সে দুই চামচের বেশী খাইল না। আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বিমলা আবার তখনই আসিল।

হঠাৎ বাহিরে কাহার জুতার শব্দ হইল।

"দিদি, ডাক্তার বাবু, আসছেন বোধ হয়।" বলিয়া বিমলা একটু পাশ কাটিয়া দাঁড়াইল।

বিমলার স্বামী অবনীবাবুর সহিত ডাক্তার আসিয়া ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

নীলিমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া অদূরেই রহিল।

ডাক্তার রঘুর বক্ষ ও পৃষ্ঠ দেশ পরীক্ষা করিয়া শেষে নীলিমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আপনার খোকার বিশেষ কিছু হয়নি, তবে ওকে একটু সাবধানে রাখবেন, যাতে সর্দ্দি না লাগে।

তার পর এক খণ্ড কাগজে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ লিখিয়া বলিলেন,—"এই ওষুধটা দিনে তিনবার করে খাওয়াবেন। কোনও ভয় নেই, একটু সাবধানে রাখলেই সেরে যাবে।"

ডাক্তার অবনীবাবুর সহিত চলিয়া গেলেন।

(৫)

"দিদি এই ওষুধটা রঘুকে খাইয়ে দাও ভাই।"

বিমলা হাতে ঔষধের শিশিটি লইয়া দ্রুত পদে কক্ষে প্রবেশ করিল।

নীলিমা বলিল,—"কেন দিদি তুমি দাম দিয়ে ওষুধ আনিয়ে দিলে? আমার যা পয়সা ছিল তাদিয়ে অনায়াসেই আনাতে পারতাম।"

"দিদি, তোমার অবস্থা তো দেখছি ভাই! কি কষ্টেই না তোমার দিন কাটছে, আর ভাই সত্যিই যদি তুমি আমার বোন্ হ'তে তা'হলে কি আমি তোমার সাহায্য করতাম না? আমি যে তোমাকে নিজের বোনের মতই মনে করি ভাই!"

নীলিমা কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার দুঃখ কাতর হৃদয় কাহারো সহানুভূতি পাইবার জন্যেই যে ব্যাকুল হইত! সে তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অশ্রু দ্বারা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করিত।

উভয়েই ক্ষণকালের জন্য নীরব রহিল।

"দিদি আমি এবার যাই ভাই, রান্নার যোগাড়টা দিয়ে আসি, বেলা তো গড়িয়ে এলো।" বিমলা চলিয়া গেল। রঘু একবার চক্ষু মেলিল। নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল "কি বাবা জল খাবে?" রঘু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল খাইবে। রঘু দুই চার ঢোক জল খাইল। নীলিমা আবার তাহার কাছে আসিয়া বসিল। সে আজ সকাল হইতে উপবাসী, তাহার আজ আহারের কথা মনেও ছিল না। হায়রে মাতৃ-হৃদয়, তোমার স্নেহের শেষ কোথায়?

নীলিমা তাহার আদরের দুলাল রঘুর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনা করিতেছিল। বিমলা আসিয়া তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিল। নীলিমা বিমলাকে বলিল,—"দিদি, ডাক্তারবাবু কি বলে গেলেন? রঘুর আমার কি হয়েছে?"

"দিদি, তুমি অত ভাবছ কেন? ও সামান্য জ্বর। অমন সবারই হয়ে থাকে। ভয়ের কোনই কারণ নেই।"

নীলিমা এই কথা কয়টি বিমলার মুখে শুনিয়া যেন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল। বিমলা একটু ব্যস্ত ভাবে বলিল,—"আচ্ছা দিদি একটা কথা মনে পড়ে গেল, তুমি বোধ হয় কিছু খাওনি। কিছু খেয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"না ভাই, আমার কিছু দরকার নেই, এমনিতেই তো কতদিন উপোস করতে হয়। বাছা আমার সেরে উঠুক, আমার খাওয়ার দিন তো পালিয়ে যাচ্ছে না।"

"দিদি এসময় যদি তুমি খাওয়া দাওয়া ছাড়, তবে কদিন বাঁচবে বলো তো?"

"আর ভাই আমার বেঁচে কি সুখ, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কি করব ভাই তিনি যখন রঘুর ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন তখন কোনও রকম করে বেঁচে থাকতেই হবে। দিদি আমি ভাই বড় অভাগী এমন আঘাত এমন শোক কে পায়। আমার জন্মের কিছুদিন পরে মা মারা গেছেন। তার পর বাবা আমাকে কত কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দিলেন। তার পরই বাবা আমায় ফেলে চলে গেলেন। বাবা বরাবরই বোলতেন আমার নীলু একটিমাত্র মেয়ে তাকে কখনও কষ্ট পেতে দেব না। কিন্তু হায়, বিধাতা যার কপালে সুখ লেখেন নাই সেকি কখনও সুখী হতে পারে? দিদি আর আমি কি বলব? অমন দেবতুল্য স্বামী তাকেও বিসর্জ্জন দিলাম।" বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিমলা সস্নেহে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল ও বলিল, "যা হবার তাতো হয়েই গেছে ভাই, তার জন্য আর দুঃখ কোর না, কি করবে বল, এজগতে আমরা নিমিত্তমাত্র তিনি যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। আমরা মনে করি ভগবান বড় নিষ্ঠুর, তিনি আমাদের কপালে সুখ লেখেন নি, কিন্তু বোন একবার ভেবে দেখো তিনি দুঃখেই এসে দেখা দেন, তিনি যাকে যত ভালবাসেন তাকে তত আঘাত দেন। কেঁদো না দিদি ছিঃ ভাই কোলের ছেলে তোমার রোগা। এই ভর সন্ধ্যাবেলা কেঁদো না। ভগবান করুন আবার তোমার সেই সুদিন হোক। দিদি তোমায় আর কি বলব ভাই? এখন ওই কচি মুখটীর পানে চাও। ওই তোমাকে একদিন সুখী করবে। যে চিরদিন দুঃখ করে জীবনের শেষে সে সুখী হয়। তোমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসি, তুমি কান্নাকাটি কোর না দিদি।"

"না দিদি অতো ব্যস্ত হয়ো না। আমার এখন না খেলেও কোন ক্ষতি হবে না।"

তাহার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া বিমলা দ্রুতপদে গৃহে আসিল ও কিছু ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া নীলিমার নিকট উপস্থিত হইল। খাবার দেখিয়া নীলিমা বড়ই লজ্জিত হইল। কিছুতেই খাইতে চাহিল না। কিন্তু বিমলার জোরের কাছে তাহার জোর টিকিল না। তাহার খাইবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু বিমলা ছাড়িবার পাত্রী নয়। কিছু কিছু খাইয়া নীলিমা উঠিয়া পড়িল। রঘুর নিকট গিয়া দেখিল সে তখনও খুব ঘুমাইতেছে।

(৬)

জ্বর বাড়িতেছে, কমিতেছে। এইরূপে ছয়দিন অতিবাহিত হইল। পাঁচ দিনের দিন জ্বরটা কিছুক্ষণের জন্য ছাড়িয়াছিল, কিন্তু আবার প্রবল বেগে জ্বর আসিল।

আজ সাত দিন। ডাক্তার বলিয়াছে "আজ রাত্রি খুব সাবধানে অতিবাহিত করিতে হইবে, আমার মনে হয় ইহা টাইফয়েড্ জ্বর।"

নীলিমা প্রাণপণে রঘুর সেবা করিতেছে। খাওয়া দাওয়া প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া রোগিণী বলিয়া ভ্রম হয়। আজ সন্ধ্যা হইতে সে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। আজ সে যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজে জয়ী হইতে চায়।

রঘুর অবস্থা বড়ই খারাপ, দিন যদি বা কাটিল, রাত যেন আর কাটিতে চাহে না।

ক্রমে রাত্রিও বেশ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। যতই

রাত বাড়িতে লাগিল ততই রঘুর জ্বর বাড়িতে লাগিল। বিমলা তাহার মানুষ করা বৃদ্ধা দাসীকে নীলিমার নিকট পাঠাইয়া দিল যদি কিছু দরকার হয়। সে বিমলাকে যেরূপ স্নেহ করিত নীলিমাকেও সেইরূপ করিত। যাহা হউক, ক্রমাগত ছয়দিন ছয়রাত্রি জাগরণে নীলিমা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়াই তন্দ্রা আসিয়া তাহার জাগরণে ব্যাঘাত জন্মাইতে ছিল।

সে গভীর রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিল কে এক অপূর্ব্ব মাতৃমূর্ত্তি রঘুকে তাহার ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ তাহার তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল! দেখিল রঘু তার কোল হইতে চ্যুত হইয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি তাহাকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল ও কোন এক ভীষণ মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাহার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বৃদ্ধাও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল। এই ভোরের দিকে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলিমা আর তাহাকে জাগাইল না। নীলিমা দেখিল ভোর হইয়া আসিতেছে। পশু-পক্ষিগণ জাগিয়া উঠিয়া প্রভাত বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছে; সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে রক্তিমরাগে তাঁহার প্রতাপ ছড়াইয়া গগনমণ্ডল অধিকার করিতে আসিতেছেন। নীরব জগৎ আপন আপন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, আমাদের দুঃখিনীর ধনও তার নূতন রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। নীলিমা ব্যস্তভাবে বলিল "কেন বাবা, কেন অমন করছ? কি হয়েছে?" রঘু কিছুই বলিল না শুধু একবার মাতার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত করিয়া ডাকিল "মা—" ও তাহার দুই চক্ষুর দুই পাশ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, মাতার সহিত সব কথা শেষ করিয়া জন্মের মত চলিয়া গেল, পক্ষী শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিল। নীলিমা ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

"আমার কি হবে গো—রইলি না বা-বা চলে গেলি—! ওরে তুই যে আমার বড় আদরের ধন ছিলি রে—! রঘু রঘু! বাবা! মাণিক আমার!"

নীলিমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তৃষ্ণা

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে জীবজগতের একাঙ্ক নাটিকার অভিনয়ে পটক্ষেপন করিয়া; আবৃত করিয়া কত উজ্জ্বল গরিমাময় ছবি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কুহকমায়ার যাদুদণ্ড দুলাইয়া নীরবে নিভৃতে; ঐ দূরে গ্রামখানির কাল ছায়া আকাশপটে ধূম্র জলধর-পটলের মত প্রতীয়মান হইতেছে, আর অদূরবর্ত্তী গঙ্গার পুলিন বাহিয়া চলিয়াছে সারিবদ্ধ কুলকামিনী জলপূর্ণ কলসীকক্ষে লইয়া, চরণাঘাতে শ্যামল দূর্ব্বাদলের বুকের পরে একটা নবীন পথের রেখা সৃষ্টি করিয়া আনন্দে, গর্ব্বে, মহাসুখে। ঐ দূর গ্রামে ক্ষুদ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরের শান্তি-শীতল স্নিগ্ধ ছায়ায় স্বামী-পুত্রের আহ্লাদ নিমন্ত্রণের পথ-প্রদর্শিকারূপে চলিয়াছে নারী—প্রতি পদক্ষেপে মর্ত্ত্যে স্বর্গের অমর বালিকার চপল নৃত্যের গভীর ছন্দ বাজাইয়া, বিশ্বরঙ্গভূমে দিবস-রজনীর ক্রম-বিবর্ত্তন তালে তালে নিতম্বের উত্থানপতনে সূচিত করিয়া, কোন অনাদি মহানের পূজার ডালি মাথায় করিয়া যুগযুগান্তরের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। কি সে সুষমা, কি সে মাধুরী, কি সে অতীন্দ্রিয় জগতের স্বপ্ন-সুন্দর দৃশ্য!

আরো দূরে—আরো দূরে যেখানে তরুলতার শ্যামল আভা ধীরে ধীরে ঘননীলে মিলাইয়া গেল আকাশের প্রকাণ্ড উদর-গহ্বরে—বিরাট নিস্তব্ধ শূন্যতার বিভীষিকা গ্রাস করিল বিশ্বজগতের সজীব চঞ্চলতা; সেখানে ছুটি চোখের দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অনিমেষে তৃষ্ণা তাকাইয়া রহিয়াছে।

তৃষ্ণার বুকের উপর দিয়া একটা প্রলয়ের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। শীলভদ্রের চোখে আজ নিজেকে সামান্য নর্ত্তকীরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তৃষ্ণা বিরাট্ দাবানলের মত বিশ্বগ্রাসী অনুতাপাগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছে। তাহার এ কি হইল।—আর কি কোন পন্থা তাহার জন্য ছিল না; অভাবের তাড়নায়, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে পিষ্ট ক্লিষ্ট দেহে সে কি করিয়া বসিল, কোন পথ অবলম্বন করিল জীবনযাত্রার সহায়করূপে?—চমৎকার! রূপের ব্যবসা! কেন সে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিল না কিম্বা বৃক্ষডালে রজ্জুর সাহায্যে এ ঘৃণ্য ক্রিমিকীটকলুষিত পূতিগন্ধময় দেহ বিনষ্ট করিল না—তাহা হইলে ত আজ তাহার ঐ অভীষ্ট দেবতা, তাহারই আঁধার ঘরের সাত রাজার ধন হারাণ মাণিক ফিরিয়া আসিয়া দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ পরে এমনি করিয়া তাহাকে কুলটার বৃত্তিতে নিযুক্ত দেখিত না! একদিন নৈদাঘী সন্ধ্যায় লক্ষ লক্ষ দর্শকের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে নিজের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়া সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠার গরিমাময় আনন্দ লাভ করিয়া যে অননুভূতপূর্ব্ব গর্ব্বে তৃষ্ণার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, যে আত্মপ্রসাদ হৃদয় পাত্রের কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উথলিয়া পড়িতেছিল, আজ এই পাণ্ডুর ধরণীর গোধূলীম্লান আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তৃষ্ণা দেখিল তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর—অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণ্য, অতি হেয়, অতি অপদার্থ; কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ লইয়া যেমন বালক তৃপ্তি অনুভব করে ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহার ঐ মোহ ভাঙ্গিয়া না যায়, যতক্ষণ সে কাঞ্চন ও কাচের পার্থক্য বুঝিতে না পারে, যতক্ষণ কুয়াসাময় গিরি শৃঙ্গ প্রভাতী তপনের স্বর্ণকর স্পর্শে ঝকমক করিয়া না উঠে; পরে যখন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে, প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তখন যেমন তাহার অন্তর পুত্রহারা জননীর মত ব্যাকুল ক্রন্দনে দিগ-দিগন্ত কাঁপাইয়া তোলে মথিত করিয়া নৈদাঘী মধ্যাহ্নে ঘুঘুর উদাস স্বর-লহরী, নৈশ-চন্দ্রালোকে ঝিল্লীর উদাস করুণ রোদনধ্বনি; তৃষ্ণাও আজ ঠিক তেমনি অন্তরে অন্তরে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে বিশ্বের প্রতি কেন্দ্র ধ্বনিত করিয়া তুলিল—কিন্তু বাহিরে তার দু'ফোঁটা নির্ম্মল স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু ব্যতীত আর কোন চিহ্নই ফুটিয়া উঠিল না।

আবার তাহার মনে হইল—শীলভদ্র কি আসিয়াছে তাহারই জন্য? তাহারই শুষ্ক হৃদয়-গঙ্গায় প্রেমের বান ডাকাইতে, তাহারই যৌবন-উচ্ছলিত দেহ-বেলাভূমির দুকূলপ্লাবী রূপতরঙ্গে সাঁতার খেলিতে, তাহারই অন্তরের মরুময় প্রদেশে ভাব-মন্দাকিনীর লহরীমালা প্রবাহিত করিতে? হয়তঃ বা তাহাই; হয়ত বা ফিরিয়া আসিয়াছে শীলভদ্র দীর্ঘ তপস্যার অবসানে সিদ্ধি-প্রফুল্ল চিত্তে তাহারই কোমল কোলে সুষুপ্তির নিবিড় অলসতায় নিরুদ্বেগে ভুলিয়া যাইতে দীর্ঘ তপস্যার কঠোরতার ক্লেশ; শীতল করিতে তাহারই প্রশান্ত বক্ষের গভীর স্নেহে হৃদয়ের যত কিছু উগ্রতা বারিবিন্দু সংস্পর্শে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত; ঐহিক পারত্রিক উভয় সিদ্ধির পুঞ্জীভূত আলোক-রেখা মহীয়ান করিয়া তুলিবে তাহার জীবনকে রমণীর কণ্ঠহারে স্থূলমধ্য ইন্দ্রনীল-মণির মত, শুক্তিগর্ভে শুভ্র সমুজ্জ্বল মুক্তার মত, খনির তিমিরের মাঝখানে হীরকখণ্ডের অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতার মত নৈশতারকালোকিত বসুন্ধরার শুষ্কতপ্ত বক্ষে গঙ্গার জন-বিরল পুলিনে, মাধবীকুঞ্জে নিবিড় আলিঙ্গনে! তবে আবার এ কি করিয়া বসিল সে!

চিন্তার ধারা ভিন্নভাবে ছুটিয়া চলিল পরাজিত করিয়া বিদ্যুতের তীব্রগতি;—ঐ যে দরিদ্র নারী সন্ধ্যার অস্ফুট অন্ধকারে তুলসীমূলে পুণ্য দীপ জ্বালিয়া দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া শিশু পুত্রকে কোলে করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল, সে কি সুখী; কি পবিত্র, কি প্রাণারাম তাহার সংসার-পথের পথ চলা! সত্য বটে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, নবীনতা নাই, উন্মাদনা নাই; কিন্তু যে শান্তির ধীর প্রবাহ তাহাতে বর্ত্তমান, যে অচঞ্চল গাম্ভীর্য্য তাহার দরিদ্র-জীবনকে ঘিরিয়া নবোদ্গত কিসলয়ে রসাল তরুর বুকে স্বর্ণলতার মত বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল্য যে বিশ্ব-

সংসার খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না। হয়তঃ নারী অভাব উৎপীড়নে জর্জ্জরিতা; কিন্তু যখন নিশীথের সুপ্ত পল্লীর উপর জোৎস্নার ধবলিত আভা ছড়াইয়া পড়ে তরুশিরে, গঙ্গার নির্ম্মল সলিলে, কুটিরের প্রান্তস্থিত মাধবীকুঞ্জের শ্যামপত্র পুঞ্জে, ধনীর প্রাসাদ প্রাঙ্গণে, মুক্ত পথে, প্রান্তরের গহন-গভীর নির্জ্জনতায়, বৃক্ষমূলে সুপ্ত পথিক-বধূর নিদ্রা-নিমীলিত চক্ষে; তখন ঐ নারী বাঞ্ছিতের সুখস্পর্শ অনুভব করিয়া যে আনন্দ-সাগরে ভাসমান হয়, যে অবাধ অগাধ মুক্ত প্রকৃতির কলধ্বনিতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, তাহা বুঝি পৃথিবীর কোথায়ও নাই! কি পবিত্র, কি মহান্, কি গরিমাময় শাশ্বত শান্তি! আর তাহার নিজের জীবন—কি এ জঘন্য বৃত্তি, কি এ রূপের ব্যবসা—দেহ বিক্রয় করিয়া পোড়া উদরের অন্ন সংস্থান! যাহাকে সে চাহে না, যাহার সঙ্গ তাহার অন্তরের নিকট বিষবৎ পরিত্যজ্য, যাহার বাক্য কাকের কর্কশ কণ্ঠের মত বিরক্তিকর, তাহারই বক্ষে তাহার নৈশ শয়নের ব্যবস্থা, তাহারই কোলে তাহার আমোদ প্রমোদের আয়োজন! তাহারই তুষ্টি সম্পাদন তাহার জীবন-রঙ্গ-ভূমির অভিনয়ের বিষয়! তাহার চাইতে যদি শীলভদ্র সন্ন্যাসী না হইয়া তাহাকে লইয়া সামান্য কুটিরে সহস্র অভাব-অভিযোগের মধ্যেও অবস্থান করিত, তবু সে তাহা মাথা পাতিয়া লইত পরম আনন্দে, পরম পরিতৃপ্তিতে, পরম উৎসাহে! অথচ আজ তাহার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই; ইঙ্গিতে দাস দাসী ছুটিয়া আসে হুকুম তামিল করিতে—কিন্তু কিসের বিনিময়ে?—হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক-দংশনজালা লইয়া প্রতারণাময় জীবনের অভিনয়ে! কি ঘৃণ্য, কি হেয় সে!

এমন সময় তাহার চিন্তা-তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ করিয়া বেহারা আসিয়া জানাইল, নাট্যশালার অশ্বযান আসিয়াছে—তাহাকে শিক্ষাভিনয়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। অধ্যক্ষ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে।

একটুও না নড়িয়া, একটুও ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ না করিয়া তৃষ্ণা অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল—"বল্‌গে আমি যেতে পারব না—আমার শরীর ভাল নেই।"

বেহারা নীরবে চলিয়া গেল।

পুঞ্জীভূত অন্ধকার দিকে দিগন্তরে প্রেতপুরীর আতঙ্ক বিস্তার করিয়া জাগিয়া উঠিল; আর তাহার একটা মসীবর্ণ ছায়া তৃষ্ণার হৃদয় কুঞ্জে ঘনাইয়া আসিল। দেবদারু গাছের ফাঁকে একটা তারা রক্তাভ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া তৃষ্ণার শ্রান্ত প্রসারিত কেশপাশের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তৃষ্ণা তেমনি ভাবে ধ্যানমগ্ন চিত্তে গভীর রহস্যের অনুসন্ধানে নীরবে শূন্যপানে তাকাইয়া রহিল।

ক্রমে রাত্রি মধ্যপথে অগ্রসর হইল। পাচক তৃষ্ণাকে রাত্রির আহারের জন্য আহ্বান করিল। তৃষ্ণা উত্তর দিল, "শোবার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও; এখন খাব না। ক্ষিধে নাই।" মনে হইল তৃষ্ণার একটা চরম সত্য—মানুষ এই দগ্ধ উদরের জন্য কি না করিতেছে—কত লোকে চুরি করিতেছে; কত ডাকাতি, নরহত্যা, লুণ্ঠন দ্বারা শ্যামল ধরার বিপুল শান্তির বুকে নিষ্ঠুরতার আগুন জ্বালিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে—কেন? ঐ দগ্ধ উদরের জন্য! তাই কি?—তা নয় ত কি? এবার যেন তৃষ্ণার মনে হইল—ঠিক তা নহে; বৃক্ষের গলিত পত্র ভক্ষণ করিয়াও ত মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারে; অযত্নসম্ভূত ফলমূলে কত ভিক্ষু জীবন ধারণ করিতেছে—ভগবান বোধিসত্বও ত সুদীর্ঘ ছয় বৎসর অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তবে—তবে মানুষ কিসের জন্য এ অনন্ত অফুরন্ত আদিঅন্ত-হীন কর্ম্মপ্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া অবিরাম ছুটাছুটি করিতেছে? ক্ষুধা ত দুদণ্ডে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু প্রাণের তৃপ্তি হয় না বলিয়াই মানুষ এত কর্ম্মের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মানুষ চায় প্রাণের তৃপ্তি—প্রাণের পরিপূর্ণতা।

সে কি তাহা পাইয়াছে? কৈ? এ দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ তাহার ত কোন ঐহিক অভাব ছিল না; সম্পদের কোলে বসিয়া সে নিজের বাসনাবেগকে ইরম্মদ গতিতে ছুটাইয়া দিয়াছিল ভোগ-বিলাসের বিশাল প্রান্তরের উপর দিয়া বন্ধন ছিন্ন অশ্বের মত; কিন্তু প্রাণের তৃপ্তি তাহার অদৃষ্টে জুটিয়াছে কি? রঙ্গমঞ্চের দর্শকবৃন্দের সঘন করতালির মধ্যে, প্রশংসমান দৃষ্টির নিম্নতলে, রূপমুগ্ধ জনমণ্ডলীর বিস্ময়-বিকশিত নয়নের জ্যোতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে সে ত নির্ব্বিবাদে বিহার করিয়াছে, তবে তাহার প্রাণে শান্তি আসিল না কেন? কেন সে অশান্তির অতৃপ্তির দাব-দহন-

বিদগ্ধ বনস্থলীর ধূসর মরুবুকে সঙ্গীহারা পথহারা পথিকের মত ব্যাকুলপ্রাণে অশ্রুজলে ধরণীর তপ্ত বক্ষ শীতল করিতেছে ? বুক ফাটিয়া ক্রন্দন জাগিয়া উঠিতেছে কেন ? মানুষের যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু প্রার্থনীয়, যাহা কিছু অভীপ্সিত, তাহা ত সে পাইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের অপূর্ব্ব পূজার ডালি ষোড়শোপচারে তাহার চরণতলে লুটিয়া পড়িয়াছে ; অনেকে তাহার নিকট ভালবাসার অভিনয়ও যথেষ্ট করিয়াছে ; কিন্তু যে একটি সৌম্যদর্শন যুবক তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে তাহার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিল কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে হিরণ্ময়ী সন্ধ্যাকালে কোমল নীল গগনের তলে বকুলমূলে মলয়ের হিল্লোলে—সে মূর্ত্তিকে ত কেহই স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না ! সে যে ঠিক তেমনিভাবে নিজের আসনে অটল অচল ভাবে বসিয়া রহিয়াছে তাহার হৃদয় জুড়িয়া, শত বিচ্ছিন্ন কাম-কামনাকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মানব জীবন যেমন খণ্ড কর্ম্ম-সমষ্টিকে একতা প্রদান করে, ঠিক তেমনি ; সে যে শত দূরে অবস্থান করিয়াও তাহার অন্তরে বাহিরে, বিশ্বচরাচরে, বারিধির নীল বক্ষে, আকাশের গোপন গহনপুরে, বনস্থলীর শঙ্কাকুল নীরবতায়, শেফালিকার কোমল বৃন্তের মধ্যে, রসালের নবমঞ্জরীর অপূর্ব্ব সুরভির মাঝখানে, নিশীথিনীর নিবিড় তিমির আলোকিত করিয়া, সন্ধ্যার গরিমাময় মৌন-ছায়া উদ্ভাসিত করিয়া গঙ্গার জনহীন পুলিনে দূরাগত বাঁশরী বাজাইয়া, আজো ঠিক তেমনি দেদীপ্যমান !

এই চিন্তা মনে হইতেই তৃষ্ণার প্রাণ ব্যাকুল হইল। আর সে হৃদয়ের আবেগ রুদ্ধ করিতে পারিল না ; কাঁদিয়া উঠিল তাহার মনপ্রাণ ব্যাকুল ক্রন্দনে নিশীথের সুপ্ত তারার চোখে করুণার বন্যা প্রবাহিত করিয়া, নিশাচর পাখীর উড্ডীয়মান পক্ষ সঞ্চালন স্তব্ধ করিয়া, যামঘোষের তীব্র আর্ত্তনাদ মন্দীভূত করিয়া দূর বনান্তচারিণী তটিনীর কুলুকুলু ক্রন্দনধ্বনির সাহচর্য্যে, পাপিয়ার 'চোখ গেল' ডাকের করুণ তীব্রতার দ্রবীভূত মহিমায়, পুষ্পকুঞ্জে বিরহিণীর সপ্রেম অশ্রুজলের সঙ্গে ! বলিয়া উঠিল তৃষ্ণা—"ওগো এস, এস এ ভাঙ্গাবুকে, হই আমি কলুষিতা, অপবিত্রা, ঘৃণিতা সমাজ-পরিত্যক্তা কুলটা নারী জগতের চোখে, বিশ্বের দর যাচাই করার অভ্যন্তরে ; কিন্তু তুমি একবার এসে দেখে যাও, অনাঘ্রাত নবকিসলয়ের মত, সদ্যোজাত শিশুর মত প্রেমরসবোধহীন কুমারীর হৃদয়ের মত, আমার এ আন্তর জগৎ,—মানস জীবন—সেকি পবিত্র, কি বিশুদ্ধ, কি শুভ্র, কি সমুজ্জ্বল ! ওগো বিচার করোনা আমার এ দেহটাকে দিয়ে,—এ কৃমিকীট-পরিপূরিত, শ্মশানের ধূলিমুষ্টি দিয়ে গড়া শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য অকিঞ্চিৎকর দেহটাকে দিয়ে, চেয়ে দেখ শান্ত-নির্ম্মল-শ্রী হৃদয়কুঞ্জের কুসুম-বিলসিত মহিমার দিকে ; চেয়ে দেখ নিস্তরঙ্গ সিন্ধুনীলিমার মত জ্যোৎস্নাধৌত প্রাণের দিকে, দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী মর্ম্মভেদী হাহাকারের দিকে ! ওগো এস—আমি যে তোমারি—জীবনে মরণে—"

এই বলিয়া তৃষ্ণা হতাশ হৃদয়ে মাটিতে লুটিয়া পড়িয়া অশ্রুজলে ভূমিতল ধৌত করিতে লাগিল।

(৯)

দেবদত্ত ধনীর সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর অগাধ ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে পড়িয়া জীবনতরী ঠিক পথে চালাইতে সমর্থ হয় নাই। ভরা যৌবনের আকুল উচ্ছ্বাসে যখন ধরণী নবোঢ়া কন্যার মত মুগ্ধ চকিত সৌন্দর্য্য লইয়া তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল ; যখন সে দেখিয়াছিল প্রতি তরুর শ্যামল পল্লবে, প্রতি বনানীর মর্ম্মর রবে, প্রতি পিকের কুহুধ্বনিতে, প্রতি তটিনীর কলগানে একটা নবীন রূপ, নবীন মাধুরী তাহার সুপ্ত প্রাণে জাগাইয়া তুলিত ; যখন নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নে ঝরা বকুলের গন্ধবাহী ধীর সমীরণের মৃদুমন্দহিল্লোলে তাহার প্রাণের পরতে পরতে কি যেন একটা তীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিত ; কি যেন একটা হারাণ কাহিনী স্মৃতি-যবনিকার উপর ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিত না, কি যেন চাই—অথচ কি চাই জানি না এমনভাবে প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত ; যখন গোলাপপুষ্পগুলি দেহের রক্তবিন্দুর মত উজ্জ্বল বলিয়া মনের মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল হইত, ছায়াপথের দীর্ঘ শান্ত আলোকরেখা দূরবর্ত্তী দেবদারু শীর্ষের শ্যামলিমার ফাঁকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া যেন একটি সুপ্তিময় গন্ধর্ব্ব পুরীর বিস্মৃত ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিত ; আর সর্ব্বোপরি নারীর রূপ বিশ্ব প্রকৃতির বৈষম্যের

মাঝখানে সংহতিসাধিকা সাম্যের মত, সমস্ত সৌন্দর্যাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পলে পলে বর্ষার বারিধারা সিঞ্চনে সুপ্ত বীজের অঙ্কুরের মত একটু একটু করিয়া প্রাণে প্রেমের বাণী বহিয়া আনিত; এমনি যৌবনে দেবদত্তের পিপাসিত উপোষিত হৃদয় তৃষ্ণার অলোকরূপরাশি দেখিল মহাবোধি নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে—কি সে ছবি—ঘনায়মান অন্ধকারে ছায়া-সমাচ্ছাদিত বিশ্বচরাচরের বিস্ময় ব্যাকুলিত দৃষ্টির সম্মুখে মুক্তির বাণী বহনকারী শুক্র তারার মত, মৃত্যুপথযাত্রী পথিকের মুগ্ধ নয়ন সম্মুখে রোগমুক্তির আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্যের মত, অভুক্ত ক্ষুধিত পথিকের সম্মুখে বিপুল খাদ্য ভাণ্ডারের মত;—মুগ্ধ হইল দেবদত্ত; রূপের কাঙ্গাল অমূল্য হীরকখনি লাভ করিয়া বসিল!

আজো তৃষ্ণা শিক্ষাভিনয়ে গিয়াছে মনে করিয়া দেবদত্ত গভীর রাত্রে তৃষ্ণার গৃহে উপনীত হইয়া দেখিল—মেঝেয় ঘুমাইতেছে তৃষ্ণা—ধূল্যবলুন্ঠিতা মাধবীলতা অনাদরে, উপেক্ষায়, অবহেলায়!

তৃষ্ণাকে এই অবস্থায় দেখিয়া দেবদত্তের প্রাণে ভয়ানক কষ্ট হইল। অতি প্রিয় সাধের বস্তুটিকে কেহ অনাদরে ভূমিতলে ফেলিয়া রাখিলে যেমন কষ্ট হয়, গৃহস্থ পরিজনের উপর মন ক্রোধে তিক্ত হইয়া উঠে; দেবদত্তের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। সে গৃহস্থ পরিচারিকাকে ডাকিয়া তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। হঠাৎ তৃষ্ণার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ইঙ্গিতে দেবদত্তকে চুপ করিতে বলিল। দেবদত্ত ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া মেঝের উপর তৃষ্ণার পাশে বসিল। আলুলায়িত অবিন্যস্ত কেশপাশের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"নাট্যশালা থেকে কখন ফির্‌লে?"

তৃষ্ণা উত্তর করিল,—"যাই নি।"

"সেকি?"

"হাঁ, যাই নি; আর আমার এ ঘৃণিত জীবন ভাল লাগ্‌চে না।"

"হঠাৎ?"

"কি জানি!"

"সেদিন থেকে তোমার কি হয়েছে?"

"সেত আমি তোমায় বোঝাতে পার্ব্বনা, আজ সত্যি সত্যি আমার জীবনের উপর ধিক্কার এসেছে! কি করছি আমি? কি আছে আমার নিজের বল্‌তে? আমার দেহ পরের তৃপ্তি বিধানের জন্য; আমার কণ্ঠস্বর, তাও পরের তুষ্টি সম্পাদনের জন্য; আমার হাসি কান্না, তাও পরের আমোদ-প্রমোদের জন্য; যখন আমার প্রাণ দুঃখভারে নুইয়ে পড়ছে, হৃদয় হাহাকারে পৃথিবী বিদীর্ণ করতে চাইচে, তখন আমাকে তোমাদের তৃপ্তির জন্য, সে কান্না, সে হাহাকার জোর করে বুকের মধ্যে চেপে রাখ্‌তে হবে—যে বিপুল ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌চে, তাকে বালির বাঁধ দিয়ে চেপে রাখ্‌তে হবে; শুধু তাই নয়—ঠিক তার বিপরীত অভিনয় করতে হবে—হাস্‌তে হবে, তোমাদের হাসাতে হবে! ভেবে দেখ দেখি, কি দুঃখময় আমার জীবন!"

দেবদত্ত চুপ করিয়া রহিল। আস্তে আস্তে তৃষ্ণার মাথাটি তাহার কোলের উপর তুলিয়া লইল।

তৃষ্ণা আবার বলিতে লাগিল, "তার পর দেখ; আমি সমাজ পরিত্যক্তা কুলটা নর্ত্তকী! গৃহস্থ বধূরা আমার অভিনয় দেখে প্রশংসা করে,—তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু পরক্ষণেই বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করে তোলে—কি ঘৃণাই আমাকে তা'রা করে। তার প্রমাণ দেখ্‌লাম সেদিন—যেদিন অধ্যক্ষের মেয়ের বিয়েতে আমাকে দেখে পুরস্ত্রীরা বরণ-ডালা সরিয়ে নিলেন, পাছে আমার অঙ্গস্পর্শে তা কলুষিত হয়ে উঠে!—কেন আমি কি নারী নই? আমারও কি তাঁদের মত হৃদয় নেই?—আছে কিন্তু যে বস্তু সব চেয়ে কাম্য তা আমার নেই—আমি কুলটা—বেশ্যা—নর্ত্তকী!" বলিয়া তৃষ্ণা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দেবদত্ত সযত্নে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কেঁদে কি কর্‌বে বল। আবার এও জেনো অনেকে তোমার মত হতে পার্‌লে জীবন ধন্য মনে করে।"

তৃষ্ণা এই মন্তব্যে একটু হাসিয়া ফেলিল যেন বর্ষা-ধৌত প্রকৃতির সজল শ্যামলিমার উপর প্রভাতী রৌদ্র বিকশিত হইল। তারপর বলিল—"হতে পারে, তেমন হতভাগিনীরও

ক জগতে অভাব নেই! যারা স্বামীপুত্রকে ফেলে রেখে **সাধের সংসারে আগুন** জ্বালিয়ে দিয়ে ছুটে চলে আসে **অজানা পথে একটি ইন্দ্রিয়ের** পরিতৃপ্তির জন্য, কামনার **পরিপূর্ণতার জন্য,** অবাধ স্বেচ্ছাচারের দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা **মিটাবার জন্য—কিন্তু** জানেনা ও মরীচিকা দু'দণ্ডের, ও **ভোগলালসা** ধুয়ে যাবে একদিন তপ্ত অশ্রুজলে, লুপ্ত হবে **ইন্দ্রিয়ের কোমল কণ্ঠধ্বনি** মর্ম্মভেদী হাহাকারের **গভীরতায়! সেদিন** আর ফিরে যাওয়ার কোন পথ থাকবে **না, পাষাণ প্রাচীর সামনে** এসে দাঁড়াবে তুঙ্গ হিমালয় শীর্ষের **মত, তখন তাকে উত্তীর্ণ** হয়ে শ্যামল-সরসতায় ফিরে যাওয়া **মুখের কথা হবে না!** যেমন আমি—কি ছিলেম—কি **হয়েছি! কোথায় এসে** দাঁড়িয়েছি একটি জঘন্য নরকস্তূপের **মধ্যে—ইচ্ছা থাকলেও** আর সে সাধের অলকাপুরীতে ফিরে যাওয়া **সম্ভব** হবে না! আরো দেখ, কি তোমাদের সমাজ! **পুরুষ শত অপরাধ করুক,** তার কোন দোষ হয় না; সে **নির্ব্বিবাদে সমাজের বুকে** হেসেখেলে বেড়ায়, **গঙ্গাজলের মত সব কিছুকেই পবিত্র করে** তোলে—কেউ তার পবিত্রতা হরণ করতে পারে না; কিন্তু চেয়ে দেখ একবার নারীর **দিকে**—কি তার **অবস্থা?**—যদি কোন দিন, কোন কারণে কোন **অশুভ লগ্নে, কোন** প্রলোভনের ছলনায় মুগ্ধ হয়ে—সে **পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে,** তবে আর তার রক্ষে নেই!—সমাজ **সহস্র উন্নত ফণা** তুলে তাকে গ্রাস করতে যায়, নিপীড়নের **কঠোর শাসন দণ্ড তুলে তার** মস্তকে নিক্ষেপ করে; কোন **অনুতাপ, কোন প্রায়শ্চিত্ত** আর তাকে সমাজের চক্ষে **পবিত্র করে তুলতে** সমর্থ নয়! এ কি অবিচার? এ কি **অত্যাচার?—কেন?** নারী কি মানুষ নয়? নারীর **কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলে, প্রাণ** বলে, হৃদয় বলে কিছুই নেই? **আরো দেখ, হয়তঃ তোমরাই** পাপের প্রলোভনে ভুলিয়ে **নারীকে কুপথে নিয়ে** যাও; আবার তোমারই সমাজের **কর্ত্তা হয়ে তার মস্তকে** যষ্টির আঘাত কর! ধন্য তোমরা **পুরুষ—হৃদয়হীন, স্বার্থপর,** প্রতারক!" ক্রোধে তৃষ্ণার **সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।**

দেবদত্তবলিল, "যদি কেউ তোমাকে বিয়ে করে তুমি **রাজী হও তার সংসার করতে?"**

তৃষ্ণা বলিল—"তেমন ভাগ্যহীন কি জগতে কেউ আছে?"

দেবদত্ত বলিল—"ভাগ্যহীন কেন হবে?"

তৃষ্ণা উত্তর করিল—"ভাগ্যহীন নয়ত কি?"

দেবদত্ত সোৎসাহে বলিল—"কেন?"

তৃষ্ণা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"একশবার ভাগ্যহীন! আমার কি আছে যে সে আমাকে বিয়ে করে সুখী হবে?"

দেবদত্ত বলিল—"কি নেই তোমার? রূপ, যৌবন, সর্ব্বোপরি কুসুমপেলব হৃদয়!"

তৃষ্ণা উত্তেজিত হইয়া বলিল—"বুঝতে পারনি তুমি আমাকে, আমার হৃদয় বলে কিছু নেই; আর এ দেহ—জড়মাংসপিণ্ড, দুদিন পরে রোগে শোকে জীর্ণ হয়ে ধূলায় লুণ্ঠিত হবে! কি আছে ওর মূল্য?"

দেবদত্ত বলিল—"যে তোমাকে ভালবাসে, তার কাছে এ যে মহামূল্য!"

তৃষ্ণা বলিল—"কি বল্লে ভালবাসা? ও মিথ্যে কথাটা আর না বল্লেই কি হত না? ভালবাস তোমরা? সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর পাষাণ বক্ষ ভেদ করে ভগবান্ স্বয়ং এসে যদি বলেন, তাহলেও আমি বিশ্বাস কর্ব্ব না। তোমরা নারীকে দেখ একটা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পথের মত, একটা সুখভোগের উপায় স্বরূপ, একটা অন্ধ আবেগ পরিতৃপ্তির সোপান; তাও কতক্ষণ? যতক্ষণ অন্য নারী এসে তার রূপ যৌবনের দীপ্ত প্রভায় তোমার নয়ন ঝলসে না দেয়, যতক্ষণ ভোগ-স্পৃহা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহ মনের উপর একটা অবসাদের যবনিকা না বিস্তৃত হয়; যতক্ষণ সে নারীর লাবণ্য-ধারা তোমার ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে জাগরিত করে একটি আনন্দ রস-ধারা প্রবাহিত করে—ততক্ষণ নারী তোমার নিকট মহা আদরের, মহা ভালবাসার, মহা আরাধনার বস্তু হয়ে উঠে, পৃথিবীর মহীয়সী ছায়া তখন নারীর মধ্যে তুমি দেখতে পাও, নারীর গুণগানে কত কাব্যের সৃষ্টি কর! কিন্তু যেই তোমার প্রয়োজন ষোল আনা আদায় করে সরে পড়ে, তোমার চোখের সম্মুখ থেকে কুহক-গরিমা উষালোকে অন্ধকারের মত দূরে চলে যায়, অমনি নারী তোমার কেউ নয় জার্ণ বস্ত্রের মত, মধুহীন

পুষ্পের মত তাকে পরিত্যাগ করে অপর একটা নারীর নব গরিমার সন্ধানে তোমার মন ছুটে যায়—এই ত তোমরা পুরুষ ?''

দেবদত্ত বলিল—"সত্যি তৃষ্ণা, আমি তোমায় কখনো ঘৃণা করিনি—আমি সত্যি তোমায় ভালবাসি।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তৃষ্ণা বলিল—"বোলোনা—বোলোনা—ভালবাসার কথা! তোমরা ভালবাসার জানই বা কি বোঝই বা কি ? বৈশাখী আকাশের মত পলে পলে যার রুচির পরিবর্ত্তন, দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে নবনিত্য নূতনের আকাঙ্খা সন্ধ্যার আকাশের পশ্চিম দিগ্‌বিভাগে মেঘমালার বর্ণ বৈচিত্রের মত ফুটে উঠে, যার মনে, তার মুখে ভালবাসার কথা শোভা পায় না। তুমি ভালবাস আমার এ দেহ, আমার এ রূপ। পুরুষ ভালবাস্‌তে জানে না—পারে না। ভালবাসা যদি কখনো কোথাও সম্ভবপর হয়, সে নারীর ক্ষুদ্র বক্ষপঞ্জরে, শত শত ব্যাকুল বেদনার পরিবেষ্টনে, শত সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝখানে, অশ্রুহাসির লুকোচুরী খেলার অন্তরালে এক নিত্য শাশ্বত বাণী—বাঞ্ছিতের প্রতি অকৃত্রিম অবিমিশ্র অনুরাগ অনাহত পদ্মের স্পন্দনের মত দিবানিশি ধ্বনিত হচ্ছে। হোক নারী শত কলুষিতা, শত অপবিত্রা, কিন্তু কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে যে মূর্ত্তিকে একদিন সে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, আর কখনো তাকে সে নির্ব্বাসিত কর্‌তে পারে না। বাইরে পোড়া উদরের জ্বালায় সে অন্যের নিকট নিজের দেহ বিক্রয় কর্‌লেও, কখনো সে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে সে-মূর্ত্তি মুছে ফেলে দিতে পারে না—শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, আমোদপ্রমোদে, অশ্রুতে হাসিতে, রোগে শোকে, শ্মশানে বিলাসে সে মূর্ত্তি তার সহযাত্রী—এ স্থির জেনো।"

দেবদত্ত উত্তেজিতা তৃষ্ণার মাথায় ও কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"যারা স্বামী ছেড়ে অপরের প্রতি আসক্ত—তারা কি স্বামীকে ভালবাসে নি ?''

দৃঢ় কণ্ঠে তৃষ্ণা উত্তর করিল—"না। কখনো তারা স্বামীকে ভালবাসে নি। যে স্বামীকে ভালবাসে, সে কক্ষনে, শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারে না ; আর যদিও সাময়িক ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে পড়ে মুগ্ধ হয়, কিন্তু তুমি স্থির জেনো, তার প্রাণ দিনরাত গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে স্বামীর জন্য বা বাঞ্ছিতের জন্য। তার বিলাস-ব্যসনকে শ্মশানের ধূলি-মুষ্টির মত অকিঞ্চিৎকর করে বেজে উঠে প্রেমের ভৈরব বিষাণ প্রলয়ের প্রথম বিশ্বধ্বংশকারী রুদ্রের বিরাট্ স্পন্দনের মত ভৈরব তালে। কাজেই তুমি যে বল্‌চ আমাকে ভালবাস, তাতেই বা আমার সুখ কোথায় ? আমি ত তোমাকে ভালবাসতে পারিনি, পারবও না। সেই—সেই একজন আমার জীবনের সব সুখ সব আশা, সব ভরসা হরণ করে নিয়ে গেছে। আচ্ছা বলত সেদিন তোমার পাশে যে সন্ন্যাসী বসেছিল তাকে তুমি চেন ?"

"চিনি বৈকি, ওত শীলভদ্র, আমার একসঙ্গে পড়েছে।"

"বল কি ? এখন কোথায় আছে ?"

"কেন আমারই বাড়ীতে—সহরের বাহিরে উদ্যান গৃহে।

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে চল, আমি তার কাছে যাব।" এই বলিয়া তৃষ্ণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দেবদত্তকে হাত ধরিয়া টানিয়া বিস্রস্ত বসনে রাস্তায় বাহির হইল। দেবদত্তেরও আর কিছু বলিবার ক্ষমতা রহিল না ; যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত তৃষ্ণাকে পথ দেখাইয়া চলিল।

(১০)

যেদিন রঙ্গমঞ্চে তৃষ্ণা মূচ্ছিত হইয়া পড়ে, সেদিন হইতে শীলভদ্র যেন কেমন হইয়া গেল। শীলভদ্র বুঝিয়াছিল, লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়াই তৃষ্ণার এ ভাব-বিকলতা, তাহার জন্যই তৃষ্ণার এ মূর্চ্ছা—দুঃখ বা সুখের আবেগ বড় তীব্রভাবে স্নায়ুতন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছে, আর তাহাতে তৃষ্ণা আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া শীলভদ্রের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; আর সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণার চিন্তাও বক্ষপঞ্জরের দ্বারে দ্রুত করাঘাত করিতে লাগিল, কি করিবে

শীলভদ্র? সে যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সাধের সাধনক্ষেত্র প্রস্ত-গঙ্গা-দুকূল অলকার প্রান্তবর্ত্তী তুষার মরুর অপরূপ শুভ্রতা, মনোরম ঔজ্জ্বল্য ছাড়িয়া আসিয়াছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ত কোন পন্থাই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না—অথচ চলিয়াছে দিনরাত্রির ছন্দ-লয় সমন্বিত নৃত্যের তালে তালে বিশ্বপ্রকৃতির নির্ণীত সময়! শীলভদ্র একবার ভাবিল, তৃষ্ণাকে লইয়া যাইতেই হইবে তাহাকে ফেলিয়া সে মহা-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াও শান্ত সমাহিত চিত্তে সে মাধুরী উপভোগ করিতে পারিবে না। খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল শীলভদ্র নিজের অন্তর প্রদেশে অনুসন্ধিৎসুর তীব্র আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করিয়া, প্রতি বৃত্তি, প্রতি কার্য্য, প্রতি আচরণ, প্রতি ভাস্বরেণু—দেখিল প্রতি বস্তুতেই অলক্ষিতে অজ্ঞাত-সারে তৃষ্ণার ছবি,—তৃষ্ণার প্রতি অনুরাগ যেন মূর্তিমান হইয়া বিহার করিতেছে! অমনি কোথা হইতে ঝটিকাবেগে সমস্ত উদ্যান বৃক্ষ কাঁপাইয়া, মঞ্জীর ধ্বনির তালে তালে শীলভদ্রের প্রাণের তারে একটা নবীন অজানা ছন্দ বাজাইয়া দূর বাঁশবনের শাখা-বাহুপল্লবে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি প্রতিহত করিয়া দাঁড়াইল ত্রিতন্ত্রী হস্তে এক রমণী—অঙ্গজ্যোতি বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারাকে লাবণ্যে ম্লান করিয়াছে, সরসীর শান্ত বক্ষে অগণিত কুমুদ-কহলারের মধ্যে সদ্য বিকসিত পদ্মফুলকে গৌরবে হতমান করিয়াছে, বিশাল নীল জলধির সীমাহীন বক্ষ হইতে সমুদ্ভূত তরুণ তপনের লোহিত ছবিকে শ্রীহীন করিয়াছে। অতিরিক্ত টানিতেই ত্রিতন্ত্রীর প্রথম তার ছিড়িয়া গেল; দ্বিতীয় তার অত্যধিক শিথিল ছিল—বাজিল না; সুরসপ্তকের উপযুক্তরূপে যখন তৃতীয় তার বাঁধা হইল, তখন সুন্দর মধুর স্বরলহরী সৃষ্টি করিয়া বিশ্বজগতের নৃত্যতালে বাজিয়া উঠিল। তারপর সেই একটি তারের সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তৃণবীথী স্পন্দিত করিয়া শীলভদ্রের শুষ্ক হৃদয়-গঙ্গায় সরসতার বাণ ডাকাইয়া রমণী গাহিয়া উঠিল—

প্রেমের পথে এগিয়ে যা না—কঠোরতা শুষ্ক ছবি!
মধ্য পথে চলতে হবে—নৈলে হবে ভরাডুবি!
নীল আকাশে তারা দোলে, উর্ম্মিমালা সিন্ধু কোলে;
রসাল গলে লতা দোলে, চক্রবালে রক্তরবি।
সবাই মিলে, দেখায় যারে, বিকাশ যাহার বিশ্বময়,
তারে, সৃষ্টি ছেড়ে কোথায় পারে?—সে ত সৃষ্টি-
ছাড়া নয়;
নরনারীর প্রেমের তলে তাহার ছায়া নিত্য চলে—
প্রেমে হবে ক্ষুদ্র মহান বিশ্বব্যাপী বিরাট্ কবি।

ধীরে ধীরে সঙ্গীত লহরীর শেষ রেশ দিগন্তের কোলে মিলাইয়া যাইতে না যাইতে নারী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, পলকে শীলভদ্রের মনে এক নূতন সমস্যা জাগিয়া উঠিল—কি এ সঙ্গীতের অর্থ? বিশ্বসৃষ্টি কেন? যদি প্রেমকে হৃদয়ে শুষ্ক করিয়া বিনাশ করিতেই হয়, তবে প্রেমের সৃষ্টি মানবহৃদয়ে ভগবান্ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন? কোন্ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এ জগৎ-প্রপঞ্চের রচনা? ভগবান্ বোধিসত্ত্ব নির্ব্বাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন বটে, স্থূল দেহের আসঙ্গ-লিপ্সা পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু আত্মিক মিলনের পথ ত তিনি রুদ্ধ করেন নাই। দেহের সঙ্গে আত্মার যখন কোন সম্পর্ক নাই, তখন দৈহিক পবিত্রতা অপবিত্রতার উপর আত্মিক পবিত্রতা অপবিত্রতা নির্ভর করিতে পারে না; আর আত্মা—সে ত নিত্য শুদ্ধ মুক্ত অপাপবিদ্ধ, সুতরাং তৃষ্ণাকে ভালবাসিয়া, তাহারই মধ্য দিয়া কি বোধিসত্ত্বকে পাওয়া যাইতে পারে না? যিনি সামান্য কৃমিকীটকে পর্য্যন্ত করুণার চোখে দেখিয়াছিলেন, তিনি কি নারীকে ঘৃণা করিতে পারেন? সহজে ত তাহা মনে হয় না! তবে—

দেখিল শীলভদ্র অদূরে যেন নৈশান্ধকার উজল করিয়া মঙ্গল গ্রহের রক্তরাগ মন্দীভূত করিয়া শ্যাম প্রান্তরের নিভৃত বনস্পতিতলে দণ্ডায়মান—গুরুদেব রাধাগুপ্ত! মুখে যেন মসীমাখা কালছায়া—তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে শীলভদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন! একটু পরেই শীলভদ্র আর সেখানে কিছুই দেখিতে পাইল না।

গুরুদেবের ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়া শীলভদ্র অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইল! তাহার মনে হইল—বোধ হয় সে ভিন্নপথে চলিয়াছে—এ পথ তার ঠিক পথ নহে; কাজেই গুরুদেব বিষণ্ণ ম্লানমূর্ত্তিতে তাহাকে সাবধান করিতে আসিয়াছেন।

তবে—তবে কি শীলভদ্র ফিরিয়া যাইবে পুনরায় সাধনক্ষেত্রে, মানসসরসীর তীরে, নির্জ্জনে নীরবে ?

শয্যা ত্যাগ করিয়া শীলভদ্র কক্ষের ভিতরে পায়চারি করিতে লাগিল। দুই বিভিন্ন ভাব সমস্যার মাঝখানে পড়িয়া শীলভদ্র হাবুডুবু খাইতে লাগিল! স্থির করিতে পারিল না কোন দিকে যাইবে—কোন পথ অবলম্বন করিবে। কে এ নারী, এক নূতন রহস্য, নবারুণ-রাগরঞ্জিত অপূর্ব্ব স্বপ্ন-মাধুরী-মণ্ডিত অলোক লোকের সন্ধান নিমেষে পলকে অন্তর্হিত হইল ? আর কেনই বা গুরুদেব বিষণ্ণ মলিন মূর্ত্তিতে তাহাকে দেখা দিয়া সরিয়া পড়িলেন ? নদী যেমন কত জলধারার রস সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন বঙ্কিম পথে বহিয়া একদিন না একদিন অনন্ত মহাসাগরে গিয়া পৌঁছে ; শীলভদ্রও কি তেমনি তৃষ্ণার প্রেমবারিধারা পান করিয়া একদিন ভগবান্ বোধিসত্ত্বের চরণতলে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না ? জন্মজরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে বৈরাগ্যের কঠোরতার মধ্য দিয়া না দেখিয়া যদি প্রেমের কোমলতার মধ্য দিয়া দেখা যায়, তবে কি তাহা ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না ? সরসতার, কোমলতার, প্রেমের অমিয় মাধুরী পান করিয়া যদি জন্মজরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভবপর হয়, তবে কি কাজ এ কঠোর বৈরাগ্য-নির্দ্দিষ্ট পথে ?

আবার ভাবিল শীলভদ্র—কিন্তু প্রেমের পথে যে দৈহিক ভ্রান্তি মনকে আবৃত করিয়া ফেলে, আত্মিক মিলনের স্পন্দন দৈহিক ভোগ সুখে লীন হইয়া যায় ; আত্মা অস্পন্দ অক্রিয় আসক্তিরহিত হইয়াও মায়ার কঠোর নিগড়ে নিবদ্ধ হইয়া পড়ে ; তখন তাহা হইতে মুক্তিলাভ সম্ভবপর হয় না। কাজেই বৈরাগ্যের পন্থাই শ্রেষ্ঠ।

সঙ্কল্প স্থির করিল শীলভদ্র—না আর থাকিবে না ;—এখানে থাকিলে একদিন না একদিন তৃষ্ণার কলুষিত দেহমনের উপর তাহার অনুরাগ উপস্থিত হইয়া তাহাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিবে, তাহাকে পাপের গভীর কর্দ্দমে নিক্ষেপ করিবে। সংসারের আশা-বাসনার ধূলি-কালিমায় ম্লান করিয়া দিবে, তাহার সাধন-প্রভাব দূরে পলায়ন করিবে! না—আর শীলভদ্র এ মৃত্যু-পুরীতে এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিবে না। চলিয়া যাইবে সাধন ক্ষেত্রে—ঠিক তেমনি আবেগে, উদ্দাম গতিতে, যেমন ঠিক দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে গমন করিয়াছিল। আবার ঠিক তেমনি উৎসাহে, ভগবান্ বোধিসত্ত্বের ধ্যান-পথে অগ্রসর হইবে জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া।

অবিলম্বে শীলভদ্র উদ্যান-গৃহ ত্যাগের সঙ্কল্প করিল। দেবদত্তকে সংবাদ দেওয়ার কথা একবার মনে হইল—না বলিয়া চলিয়া গেলে হয়ত দেবদত্ত মনক্ষুণ্ণ হইতে পারে ; কিন্তু আর তাহাকে সংবাদ দেওয়ার সময় কোথায় ? এই মুহূর্ত্তই উপযুক্ত সময়—এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলে এ জীবনে আর তাহার যাওয়া নাও হইতে পারে ; এই ভাবিয়া শীলভদ্র গৃহের রুদ্ধ কবাট মুক্ত করিল।

অদূরে কৃষ্ণা দ্বাদশীর খণ্ড চাঁদ আকাশের প্রান্তে বনরাজিনীলা ধরণীর মিলন-ক্ষেত্রে উঁকি মারিতেছিল। তাঁহারই কিরণে সুপ্ত ধরণীর মুখে এক অপরূপ শুভ্রতা ফুটিয়া উঠিল ; আর তাহারই আলোকে শীলভদ্র অগ্রসর হইবার জন্য পাদক্ষেপ করিল। অমনি ঝড়ের বেগে তৃষ্ণা আসিয়া তাহার চরণ-তলে নিপতিত হইল।

ক্রমশঃ

ব্যাঙ্ক-যোগে যুবক বাঙলা*

প্রঃ—ব্যাঙ্ক ব্যবসায় আজকাল বাঙ্গালীর অবস্থা কিরূপ?

উঃ—বাংলা দেশের বড় বড় ব্যাঙ্ক সব কয়টাই বিদেশী। মফঃস্বলে অনেকগুলা লোন-অফিস দেখা যায়। তা ছাড়া, নানা সহরে ও গ্রামে অনেক মহাজন আছে। এরাই বাংলা দেশের চাষবাসের বা ব্যবসার জন্য যা কিছু টাকার দরকার হয় তা যুগিয়ে থাকে।

কিন্তু মফঃস্বলে যে সব লোন-অফিস বা মহাজন দেখা যায় তারা প্রধানতঃ জমিদারদের ও চাষীদেরকে টাকা দিয়া থাকে। বাংলাদেশের পল্লীগুলা হইতে প্রধান প্রধান সহরে, সহরগুলা হইতে পল্লীতে এবং বাংলার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কম মাল আসা যাওয়া করে না। এর জন্য ব্যবসাদারদের মূলধনের খুবই দরকার হয়।

অপর দিকে, দেশে মূলধনের যে অভাব আছে তাও বলা চলে না। সুযোগ পাইলে, টাকা হারাইবার ভয় না থাকিলে এবং খাটানো টাকা থেকে লাভ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, দেশের লোক যে টাকা ঢালিতে অরাজী নয় তার প্রমাণের অভাব নাই।

সুতরাং, একদিকে টাকা খাটাইবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে; অপর দিকে, টাকারও অভাব বড় একটা নেই।

প্রঃ—এ অবস্থায় ব্যাঙ্কের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াই ত স্বাভাবিক। অথচ, ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়িতেছে না। এর কারণ কি?

উঃ—এর গোটাকয়েক কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে:—

প্রথম—মাল চালানের রসিদ দেখিয়া টাকা ধার দেওয়ার অভ্যাসের অভাব;

দ্বিতীয়—যে সব বাণিজ্য-কাগজ আইনে গ্রাহ্য হইতে পারে, সেগুলার সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ;

তৃতীয়—সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধীয় আইন অত্যন্ত জটিল। অনেকের দামী সম্পত্তি থাকিলেও, আইনের জটিলতার জন্য সম্পত্তির অধিকারিত্ব সম্বন্ধে ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করা, অথবা ব্যাঙ্কের সন্তুষ্ট হওয়া, বর্ত্তমানে সহজ নয়;

চতুর্থ—ব্যাঙ্ক-পরিচালকরা যাতে আমানতের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য হয়, আর ব্যাঙ্কের হিসাব নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে, সে সম্বন্ধে যথোচিত আইনের অভাব;

পঞ্চম—বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য কল্‌কাতায় অনেক গুদাম ঘর আছে তাও বিদেশীর হাতে;—কিন্তু বাংলার অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্য বাংলার সর্ব্বত্র গুদামঘরের অত্যন্ত অভাব। সর্ব্বত্র গুদামঘর প্রতিষ্ঠিত হইলে, ব্যবসাদারেরা গুদামে মাল রাখিয়া, গুদামের রসিদ দেখাইয়া ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তখনি টাকা পাইতে পারে;

ষষ্ঠ—কলকাতার বড় বড় মহাজন সোজাসুজি বড় বড় ব্যাঙ্কে গিয়া টাকা ধার করিতে পারে—মহাজনদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের এখানে একটা ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে। কিন্তু মফঃস্বলে যে সব মহাজন আছে, তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগ নাই। তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার সুযোগ হইলে, ব্যাঙ্কের কার্য্যকেন্দ্র যে বাড়িবে, ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়িবারও যে সম্ভাবনা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের পথে যে বাধাগুলা আছে, সেগুলা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করা ও সরানো একান্ত দরকার;

৭ম—আমাদের দেশে সাধারণ মহাজনেরা বাজারে খুব চড়াহারে সুদ পায়, যার হাতে নগদ টাকা আছে সেই লগ্নী কারবারটায় বেশ লাভবান হইতে পারে। তাহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা পচ্ছন্দসই নয়। কাজেই সুদের হার দেশের ভিতরে কমিতে থাকিলেই ব্যাঙ্কের দিকে

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সঙ্গে কথোপকথন; লেখক অধ্যাপক শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল।

এবং ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ব্যবসার দিকে টাকাওয়ালা লোকের নজর পড়িবে। এখন চলিতেছে ধনিক মহলে লগ্নীকারবার বনাম ব্যাঙ্ক-সমস্যা। তবে বিগত ১৫।২০ বছরের ভিতর সুদের হার কিছু কিছু কমিয়াছে। পয়সাওয়ালা লোকেরা লগ্নী-কারবারটিকে যখের মতন আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে আর তত বেশী ইচ্ছুক নয় এ একটা সুলক্ষণ।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত কি কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ?

উঃ—আধুনিক নানাশ্রেণীর ব্যবসাতে বাঙ্গালী অনেক-দিন বড় হইয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙালী অতি অল্পদিনই হাত দিয়াছে। তবুও, ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে বাঙালীর কীর্ত্তি বেশ গৌরবময় ও উৎসাহজনক। গত ২৪ বৎসর যাবৎ, অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইতে, যুবক বাংলা ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিংএর সকল দিকেই সাফল্যের পর সাফল্য লাভ করিয়া আসিতেছে। আমাদের অনেক গলদ আছে সত্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা কি অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছি তাহা ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের জানিয়া রাখা উচিত।

প্রঃ—সারা ভারতের কথা ধরিলে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে কি ?

উঃ—হাঁ, অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বৈকি।

বর্ত্তমানের সহিত ১৯০৫ সনের অবস্থার তুলনা করাই ইহা মাপিবার একটি উপায়। সারা ভারতের অঙ্কগুলা আলোচনা করা যাউক্‌। ১৯০৫ সনে ভারতে ভারতীয়দের তাঁবে মাত্র ৯টি যৌথ ব্যাঙ্ক ছিল। এই প্রতিষ্ঠান কয়টার মোট মূলধন ও আমানতের পরিমাণ ১৩½ কোটি টাকার বিশেষ বেশী ছিল না। যে সকল ব্যাঙ্কের অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা মূলধন ছিল তাহাদের কথাই আলোচনা করিতেছি।

১৯২৭-২৮ সনে ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা কত ? এখন ইহা ২৭এর অঙ্কে ঠেকিয়াছে। মূলধন ও আমানতের পরিমাণও ৭০ কোটি ৩ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। এই সোজা অঙ্কগুলা যে কোন লোককে বুঝাইয়া দিবে যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারত উল্লেখযোগ্য একটি কিছু করিয়াছে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে ভারতের উন্নতি, কাপড়ের ব্যবসাতে স্বদেশী আন্দোলনের ঠিক পাশাপাশি চলিয়াছে। ১৯০৫ সনে গোটা ভারতে মাত্র ১৯৭টা কাপড়ের কল ছিল। এদের টাকু ছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষটি আর তাঁত ছিল ৫০ হাজারটা। আজকাল কাপড়ের কলের সংখ্যা—৩৩৪। এদের টাকুর সংখ্যা ৮ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তাঁতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। মজুরের সংখ্যা হিসাব করিলে দেখিতে পাই ১৯০৫ সনে কাপড়ের কলগুলাতে ২ লক্ষেরও কম লোক খাটিত, কিন্তু এখন কাপড়ের কলের মজুরদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭৪ হাজারের কাছাকাছি। বহির্ব্বাণিজ্য ঘটিত আঁকজোকেও বস্ত্রশিল্পের এই উন্নতির প্রভাবটা দেখা যাইতেছে। ১৯০৫ সনে আমরা বিদেশী বস্ত্রের উপর যতটা নির্ভর করিতাম, এখন আর ততটা করি না। তূলার সূতার আমদানিও অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। কম নম্বরের সূতার (২১ হইতে ৩০) আমদানি নিতান্ত নগণ্য। ভারতে মোট ২১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের কম নম্বরের সূতা প্রস্তুত হয়, আমদানি করা সূতার মোট ওজন মাত্র ১১ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতে প্রস্তুত কাপড়ও বিদেশী বস্ত্রকে অনেকটা হটাইয়াছে। বিদেশী বস্ত্রের বিতাড়ন বেশ জোরের সঙ্গে এবং অবিচ্ছিন্নভাবেই চলিতেছে। বিদেশী কাপড়ের আমদানি শতকরা ৫০।৬০ ভাগ কমিয়াছে—১৯১৩।১৪ সনে ৩১৫ কোটি ৯৩ লক্ষ গজ আমদানি করা হইয়াছিল। এখন আমদানি দাঁড়াইয়াছে ১৫৪ কোটি গজ। কাপড় সম্বন্ধে আমাদের আত্ম-নির্ভরতা কিরূপ বাড়িতেছে তাহা এই অঙ্কগুলা হইতেও মালুম হয়। আরও কয়েকটা অঙ্ক দেখা যাউক্‌। ১৯০৪-৫ সনে ভারতের মোট দরকার ৩৫২ কোটি গজ কাপড়ের ২১৫ কোটি গজ, অর্থাৎ শতকরা ৬০ ভাগ, বিদেশ হইতে আসিয়াছিল; ১৯২৬-২৭ সনে মোট দরকার ৫০৯ কোটি গজ কাপড়ের মধ্যে ১৭৩ কোটি গজ, অর্থাৎ শতকরা মাত্র ৩৪ ভাগ, বাহির হইতে আসিয়াছিল। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই শিল্পে স্বদেশীভাব বিশেষ জয়ী হইয়াছে।

প্রঃ—এইবার বাংলা দেশের উন্নতির কথাটা সবিস্তারে বলুন। এই সম্পর্কে সমবায়-ব্যাঙ্কগুলার কথাই বোধ হয় প্রথম আলোচনা চলিতে পারে ?

উঃ—হাঁ, প্রথমে সমবায়-ব্যাঙ্কের কথাই বলিব। ১৯০৪ সনে সমবায়-সমিতি সম্বন্ধীয় আইন প্রথম পাশ হয়। অর্থাৎ, যে সময়ে যুবক বাংলা স্বদেশী আন্দোলন সুরু করে, সে সময়ে সমবায়-ব্যাঙ্ক স্থাপনের কল্পনা জল্পনা মাত্র চলিতেছিল। আজ বাংলাদেশে, বড়, মাঝারি ও ছোট এবং প্রাদেশিক ও পল্লী সকল প্রকারের প্রায় ১৩ হাজারটি সমবায়-ব্যাঙ্ক আছে। সমবায়-নীতিতে ব্যাঙ্ক চালানোর অর্থটা তলাইয়া বুঝিবার জন্য এইখানে একটু থামা দরকার। প্রধানতঃ পল্লীগ্রামের চাষীদের টাকাই এই ব্যাঙ্কগুলা চালাইতেছে। তাহারা নিরক্ষর হইলেও তাহাদের পুঁজিতেই ব্যাঙ্কগুলা চলিতেছে। এই ব্যাঙ্কগুলা এখন প্রায় ৮ কোটি টাকার মূলধন লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সমবায়-ব্যাঙ্কগুলা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং এদিকে গত ২৪ বৎসরে যে উন্নতি হইয়াছে তাহার জন্য যুবক বাংলার বাহাদুরি লইবার কোন অধিকার নাই। চাষীদের মধ্যে সমবায়-ঋণ-সমিতি বাড়াইবার জন্য আমাদের স্বদেশ-সেবকরা যে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু সমবায়-ব্যাঙ্কের ফলে সমবেত চেষ্টায় ব্যবসা চালাইবার অভ্যাস বাড়িয়াছে এবং পরস্পরের সাহায্য করা ও সদ্ভাব বজায় রাখার অভ্যাসও বাড়িয়াছে। এই গুণগুলা মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। ইহারা বাঙ্গালী জাতির (বিশেষতঃ চাষীদের) চরিত্রের প্রধান উপাদান হইয়া উঠিয়াছে। ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত নয়। কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে এই সঙ্ঘবদ্ধতা একটি অমূল্য জিনিষ। আগামী কয়েক বৎসরের আর্থিক উন্নতি সাধনে ইহার সহায়তা বড় তুচ্ছ হইবে না। দেশের ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার ও শিল্প-পতিগণ এই কথা অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রঃ—সরকারী সাহায্য না লইয়া বাঙালী কয়টা ও কি শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়িয়াছে ?

উঃ—ইহার হিসাব পাইতে হইলে বাংলার জেলায় জেলায় যে সকল যৌথ-ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের দিকে চাহিতে হইবে। এই সকল ব্যাঙ্ককে নিম সরকারী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা কিছু কিছু সহিতে হইয়াছে। সুতরাং, যৌথ-ব্যাঙ্ক ব্যবসাতে বাংলা যতটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর ব্যবসা-পটুতা, সাধুতা এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে অভ্যস্ত হওয়ারই ফল—তাহা বুঝিলে ভুল বুঝা হইবে না।

১৯২৫ সনের শেষাশেষি আমি ভারতে ফিরি। সেই সময় হইতে বাংলায় যতগুলা যৌথ-ব্যাঙ্ক আছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। বাংলার ব্যাঙ্কগুলার সংস্থান সম্বন্ধে সংখ্যামূলক সম্পূর্ণ বিবরণ এবং কি কি কাজে তাহার হাত তাহার বৃত্তান্ত ও জোগাড় করিতে সচেষ্ট আছি। নানা কারণে এই তথ্যগুলা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে যে, বাংলার পল্লী, মহকুমা ও জেলা কেন্দ্র-যৌথ প্রণালীতে পরিচালিত প্রায় ৫০০টি ব্যাঙ্ক বা লোন-অফিস আছে। ১৯০৫ সনে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক এত অল্প ছিল যে, আঙ্গুলে গণা যাইত ; ১৯১২-১৩ সনে কয়েক ডজন মাত্র ছিল ; এই অঙ্কগুলা মনে রাখিলে বর্ত্তমানের অঙ্কটা চমক লাগাইবার মত মনে হইতে বাধ্য। লোন-অফিসগুলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতনটি ১৮৭০-৭৫ সনের কাছাকাছি স্থাপিত হয়।

প্রঃ—বাঙ্গালীর কত মূলধন এই ব্যাঙ্কগুলাতে খাটিতেছে ?

উঃ—ইহাদের প্রত্যেকের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ গড়ে ২৫ হাজার টাকা। পরিমাণটা খুব অল্প করিয়াই ধরিতেছি। তাহা হইলে আমাদের মোট পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক মূলধনের দশগুণ টাকা (আন্দাজটা খুব কম করিয়াই ধরা হইতেছে) লইয়া কারবার করিতেছে ধরিয়া লইলে, আজ বাঙালী এই ৫০০ ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া ১২½ কোটি টাকার কারবার করিতেছে বুঝিতে হইবে। ইহার মানে, বাংলার লোক সংখ্যা যদি ৫ কোটি হয়, আমাদের প্রত্যেকের ২॥০ আনা করিয়া ব্যাঙ্ক কারবারে খাটিতেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাঙ্গালী—স্ত্রী, পুরুষ বা শিশু, ধনী বা দরিদ্র—ব্যাঙ্কের সাহায্যে বৎসরে আড়াই টাকার কারবার চালাইতেছে। ১৯০৫ সনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট উন্নতি সন্দেহ নাই। কারণ, ১৯০৫ সনে যৌথ প্রণালীতে চলিত

ব্যাঙ্কগুলা এত **নগণ্য ছিল** যে, ব্যাঙ্ক কারবারে খাটানো টাকাকে বাংলার লোক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে বাঙ্গালীর মাথা পিছু একটা অঙ্কই পাওয়া যাইত না।

নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করিবার দরকার নাই। কারণ, আমার কাছে ৪২টি প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র আছে। ইহাদের আদায়ী মূলধন ১৮ লক্ষ টাকা। প্রতি ব্যাঙ্কের গড়ে মূলধন দাঁড়ায়—৪২,৮৫৭ টাকা। এই গড়ে ধরিয়া হিসাব করিলে ৫০০ ব্যাঙ্কের মোট মূলধন হইবে—২,১৪,২৮,৫০০৲ টাকা। ৪ কোটি ৭০ লক্ষ বাঙ্গালীর মাথা পিছু মূলধন আট আনারও কিছু কম।

প্রঃ—এই ব্যাঙ্কগুলার আমানতের পরিমাণ কিরূপ তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

উঃ—যে ৪২টি ব্যাঙ্কের কথা বলিলাম তাহাদের আমানতের পরিমাণ ৩,৯৩,৮৫,২২৬৲ টাকার কাছাকাছি। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায়—৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তাহা হইলে ৫০০টি ব্যাঙ্কের মোট আমানত হইবে—৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। বাংলার লোকসংখ্যা যখন ৪ কোটি ৭০ লক্ষ, তখন মাথাপিছু আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইল—১০৲ টাকা। অনুমানটি বরাবরই খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

সম্পূর্ণভাবে বাঙালীর কর্তৃত্বে চালিত যৌথ-ব্যাঙ্কগুলাকে লইয়াই এ হিসাব করা হইয়াছে। বাঙালীর মোট আমানতের হিসাব করিতে হইলে, অ-বাঙ্গালী ভারতীয়দের এবং বৈদেশিকদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলাতে বাঙালীর যে সব স্থায়ী বা অস্থায়ী আমানত আছে, সেগুলারও হিসাব করা দরকার।

প্রঃ—৫০০টি লোন-আফিস বাঙালীর জাতীয় চরিত্রকে নূতন রূপ দিতে বা বাঙালীকে নূতন কিছু শিখাইতে সাহায্য করিতেছে কি ?

উঃ—নিশ্চয়ই। ৫০০ ব্যাঙ্ক থাকার অর্থ এই যে অন্ততঃ ৫০০০ জন ডিরেক্টার আছেন এবং এই ৫০০০ জন যৌথ-কারবারের প্রণালীতে কাজ চালাইতে আইনতঃ বাধ্য। সভা করিতে, হিসাবের খসড়া তৈয়ার করিতে এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করাইতে ইঁহারা অভ্যস্ত। আর, এই ৫০০০ জনের সকলেই উকীল বা জমিদার নন্। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পাকা ব্যবসাদার, খাঁটি কারবারী লোক, কন্ট্রাক্‌টার, ইঞ্জিনিয়ার, আমদানি-রপ্তানি-কারক ও খুচরা জিনিষের বেপারী। সুতরাং, যৌথ-প্রণালীতে ব্যাঙ্ক চালানোর অভ্যাসটা বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিদের মজ্জাগত হইয়া আসিতেছে। আর এই অভ্যাসটা কলিকাতায় বা জেলা-সহরগুলাতেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সর্ব্বত্র, এমন কি সুদূর পল্লীতেও, ইহা ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলা মধ্যবিত্তদের কতটা কাজ যোগায় ?

উঃ—একটা ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে ম্যানেজার শুদ্ধ অন্ততঃ ৬।৭ জন লোক দরকার। তাহা হইলে ম্যানেজার, হিসাব-নবিস্, পরিদর্শক, কেরাণী প্রভৃতি লইয়া অন্ততঃ ৩৫০০জন ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী আজ বাংলাদেশে আছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই গ্র্যাজুয়েট নয়—ইহা ধরিয়া লইতে পারি। লেখাপড়ায় ইহাদের কৃতিত্ব যাহাই হউক না কেন, ইহাদের সকলেই ভদ্রলোকের সন্তান। ইহারা সকলেই ব্যাঙ্ক-পরিচালনা-তত্ত্বে ও ব্যাঙ্কের বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা কাজে দক্ষ হইয়া উঠিতেছে। ইহারা দক্ষ হইয়া উঠুক বা না উঠুক, স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে যে সকল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে সে গুলাতে বহু সংখ্যক বাঙালী মস্তিষ্কজীবী যে কাজ পাইয়াছে, সে বিষয় ত' সন্দেহ করা যায় না। যুবক বাংলা গত ২৪ বৎসর যাবৎ নানা নূতন নূতন পেশায় প্রবেশ করিতেছে ; ইহার নানা প্রমাণ আছে। ব্যাঙ্ক ব্যাবসা ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা তাহাদের একটি।

প্রঃ—বিদেশী ব্যাঙ্কগুলার সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলার শ্রীবৃদ্ধির তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন কি ? তুলনা করিলে আমরা অগ্রসর হইতেছি, না পিছাইয়া যাইতেছি, বলিয়া মনে হয় ?

উঃ—ভারতে যে সকল বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আছে, সাধারণতঃ সে গুলাকে 'বিনিময়-ব্যাঙ্ক' বলা হইয়া থাকে। ১৯০৫ সনে ইহারা সংখ্যায় ১০টি ছিল. এবং ইহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকা। আজ ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—১৮ এবং ইহাদের মোট আমানতের পরিমাণ হইয়াছে ৭১½ কোটি টাকা।

বর্তমানে অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা মূলধনওয়ালা ২৭টি **ভারতীয় ব্যাঙ্কের আমানতের** পরিমাণ—৬০ কোটি টাকা। **১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা মূলধনওয়ালা** ৪৬টি প্রতিষ্ঠানকেও **ইহাদের সহিত যোগ দেওয়া** যাইতে পারে; এই ৬৪টি **প্রতিষ্ঠানের আমানতের** পরিমাণ প্রায় ৩½ কোটি টাকা। **ভারতীয়দের দ্বারা চালিত** এই ৭৩টি বড় ও মাঝারি যৌথ-ব্যাঙ্কের **মোট আমানত হইতেছে** ৬৩½ কোটি টাকা।

সহজেই বুঝা যায় যে, ১৯০৫ সনে আমানত হিসাবে **বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলা** ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলার চেয়ে যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিল **এখনও সেইরূপ** আছে। কিন্তু 'আপেক্ষিক' ভাবেই দেখিয়া **বুঝা যাইবে যে, ১৯০৫** সনে ভারতীয় ও বৈদেশিক **ব্যাঙ্কগুলার আমানত** ছিল যথাক্রমে ১২ ও ১৭ **কোটি এই অনুপাতে এবং** এখন উহাদের আমানতের **অনুপাত দাঁড়াইয়াছে ৬৩½** ও ৭১½ কোটি—ভারতীয় **ব্যাঙ্কের আমানত ৫·২৯** গুণ বাড়িয়াছে কিন্তু বিদেশী **ব্যাঙ্কগুলার আমানত কিছু কম (৪·২ গুণ)** বাড়িয়াছে। **ইহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু সিদ্ধান্ত** করা যায় যে, ভারতীয়েরা **তাহাদের উন্নতির** গতি-বেগটা বজায় রাখিয়াছে। আরও বুঝা যায় যে, বৃদ্ধির দৌড়ে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলা তাহাদিগকে **আরও পিছনে** ফেলিয়া চলিয়া যায় নাই।

ভারতের লোক সংখ্যা ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ, সুতরাং **ভারতীয় যৌথ-ব্যাঙ্কগুলার আমানত** লইয়া হিসাব করিলে **মাথাপিছু আমানত দাঁড়াইবে—মাত্র** ২৲ টাকা। ভারতে **প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলাতে** এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে **ভারতীয়দের যত আমানত** আছে তাহা এইখানে ধরা হয় নাই।

প্রঃ—বিলাতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সহিত তুলনা করিলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবসার **স্থান কোথায়**?

উঃ—১৯২৪ সনে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে (লোক সংখ্যা **—৩ কোটি ৯০ লক্ষ, বাংলাদেশেরও কম**) ১৩টি যৌথ-ব্যাঙ্ক **কর্তৃক চালিত ৮০০০টি** ব্যাঙ্ক অথবা ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল। **ইহাদের** আমানতের পরিমাণ ছিল—২০০ কোটি পাউণ্ড এবং **ইহাদের মোট পুঁজি** ছিল ৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। **তাহা হইলে প্রত্যেক** ইংরেজ সন্তানের ব্যাঙ্ক নিয়োজিত পুঁজি দাঁড়াইবে—২ পাউণ্ড ৪ শিলিং (২৯৲ টাকা) এবং আমানত দাঁড়াইবে—৫১ পাউণ্ড ৬ শিলিং (৬৮৪৲ টাকা)। বিলাতে প্রতি ৪,৭৭৭ জন লোকের জন্য একটি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে। ব্যাঙ্কের সুবিধা বিলাতে কত বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়াছে তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে ব্যাঙ্কের কারবারে বিলাতের উন্নতিই জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলার কার্য্যকলাপের সঙ্গে বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক-প্রচেষ্টার সহিত তুলনা করিতে যাওয়া, দৈত্যের সহিত বামনের শক্তি পরীক্ষা করিতে যাওয়ার মতই মূর্খামি।

প্রঃ—মার্কিণেরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আমাদের সাজে কি?

উঃ—মার্কিণেরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে জগতে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু সে জন্য মার্কিণেরা কতটা উন্নতি করিয়াছে তাহার **হিসাব** লইতে **ইতস্ততঃ** করিবার দরকার নাই। ১৯২৭ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২৭ হাজার ব্যাঙ্ক ছিল। ইহাদের মোট আমানত ছিল—৫৬,৭৩৫,৮৫৮,০০০ ডলার। ইহার এক তৃতীয়াংশ হইতেছে **১০০টি** বৃহত্তম ব্যাঙ্কের আমানত। অর্থাৎ, ছোট ও মাঝারি সাইজের ব্যাঙ্কের সংখ্যা অগণ্য। যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যা ১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৬ হাজার। সুতরাং প্রতি ৪৩৩৮ জন লোকের জন্য একটা ব্যাঙ্ক-অফিস আছে। ব্যাঙ্কের সুবিধা-বিস্তৃতির তরফ হইতে যুক্তরাষ্ট্র বিলাত হইতে সামান্য শ্রেষ্ঠ। কিন্তু **অন্যান্য দিক্‌** দেখিলে যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্ব বিলাত হইতেও অনেক **ঊর্দ্ধে**। কারণ, প্রত্যেক মার্কিণের গড়ে আমানত হইতেছে ৪৮৪ ডলার (১৩৩১৲ টাকা) এবং ব্যাঙ্কে খাটানো **পুঁজি**—২৫ ডলার (৬৮৸০ আনা)। (এক ডলার ২৸০ আনা)।

প্রঃ—বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্র না হয় আমাদের চেয়ে উন্নত। কিন্তু ইয়োরামেরিকার অন্যান্য দেশগুলাও কি বিলাত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতই আধুনিক?

উঃ—প্রত্যেক পাশ্চাত্য বা স্বাধীন দেশই বিলাত বা যুক্তরাষ্ট্র নয়। মার্কিণ বা বিলাতী মাপে অনেক ছোট বড় স্বাধীন জাতই "সেকেলে" বলিয়া মালুম হইবে। তুলনায়

সমালোচনার জন্য ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত আঁকজোকের খুঁটিনাটি দিয়া এখানে আপনাদের বোঝা বাড়াইতে চাহি না। সকলকে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিতে বলি যে, বিলাত বা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জীবনযাত্রার ধরণধারণ, জাতীয় আয় বা সাধারণ আর্থিক পটুতা বিষয়ে টক্কর না দিয়াও স্বাধীন হওয়া ও "একেলে" হওয়া সম্ভব।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে ইতালির কৃতিত্ব কতদূর? আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ইতালিতে কতদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে?

উঃ—ইতালি একটি ইয়োরোপীয় দেশ এবং একটি জবর শক্তিও বটে। কিন্তু ব্যাঙ্ক-কারবারে ইতালির অতীত বা বর্ত্তমানের কীর্ত্তিকলাপ নিতান্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

আধুনিক ইয়োরোপ তাহার প্রাচীনতম ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের জন্য ও ব্যাঙ্ক কাগজগুলার জন্য যে ইতালির নিকট ঋণী, তাহা সত্য। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব জনিত সামাজিক ওলটপালটের সময়ে ইতালির সকল পুরাতন ব্যাঙ্কই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেবল মন্তে দেইপাশি নামে একটি "জমি-বন্ধক ব্যাঙ্ক" বাঁচিয়াছিল। এই ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থাপিত হয়। মোটামুটি ধরা যাইতে পারে যে ইতালিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক কারবারের প্রতিষ্ঠা ১৮১৫ সনের শান্তি-স্থাপনের পূর্ব্বে নয়। বস্তুতঃ, ১৮৪৪—৪৯ সনে জেনোয়া ও টিউরিনের দুইটি ব্যাঙ্কের মিলনে যখন বাঙ্কা নাৎসনালে নেল্-রেগ্নো নামে ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই ইতালিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রতিষ্ঠা বলিলেই ঠিক হয়।

এই ব্যাঙ্কটির নোট জারি করিবার ক্ষমতা ছিল। গভর্মেণ্টকে ইহা ক্রমাগত ধার দিত। নোটের জন্য কতখানি ধাতুমুদ্রা রিজার্ভ রাখিতে হইবে সেই সম্বন্ধে, এবং নোটকে ধাতুমুদ্রাতে ভাঙ্গাইতে বাধ্য করিবার জন্য ইতালিতে তখন একটি আইন ছিল। এই আইন মানা হইতে বারবার অব্যাহতি দিয়া গভর্মেণ্ট ব্যাঙ্কের উপকার শোধ দিত। ঐ ব্যাঙ্কের ইতিহাসটি কেবল এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙ্কা নাৎসনালে ও ইহার অগ্রগামী ব্যাঙ্কগুলা অনেকদিন ধরিয়া—১৮৪৮, ১৮৫৯, ১৮৬৬, ১৮৬৮ প্রভৃতি সনে—নোটগুলাকে মুদ্রারূপে গণ্য হইবার অধিকার ভোগ করিতেছিল। ঠিক ঐ কয়টা বৎসরেই যন্ত্রণাপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনের ভিতর দিয়া ইতালি স্বাধীনতা ও একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ইতালির ব্যাঙ্কগুলা ঐ সময়ে যে শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-কারবার চালাইত তাহাকে স্বদেশী, রাজনৈতিক বা সামরিক ব্যাঙ্কিং বলা চলে। সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যাঙ্কিং—যাহা ঝুঁকির যথাযথ বিচার ও মূলধন বিবেচনার সহিত খাটানোর উপর নির্ভর করে—তাহার মধ্যে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না।

রিসর্জি মেন্ত (১৮৪৮—১৮৭০) এই যুগটার (মাৎসিনি, গারিবাল্দি, কাভুর প্রভৃতির কীর্ত্তিকলাপের জন্য জাতীয়তার ইতিহাসে ইহা বিখ্যাত) সমস্তটিতে মাত্র ৬টি নোট-ব্যাঙ্ক ছিল। ইহাদের প্রত্যেকটাই রাজশক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া এমন এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক-কারবার চালাইতেছিল, যাহা আইন বিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর এবং, এক কথায় বলিতে গেলে, অস্বাভাবিক। যে জাতি আইন ও নীতি-সঙ্গত প্রথায় ব্যাঙ্ক-কারবারের প্রসার চাহে তাহার পক্ষে ইতালির দৃষ্টান্ত কোনও কাজেই লাগিতে পারে না।

আধুনিক ইতালির প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই ১৮৭৪ সনে একটি আইন পাশ হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—ব্যাঙ্ক-জগতের অরাজকতা দূর করিয়া শৃঙ্খলা আনয়ন করা। কিন্তু, কি রিজার্ভ রাখা, কি নোট ভাঙানো—কোন বিষয়েই ১৮৯৩ সন পর্য্যন্ত আইনটি মানাই হইত না। ঐ সনে "বাঙ্কা দিতালিয়া" স্থাপিত হয়। ইতালির অন্যান্য সম-সাময়িক ব্যাঙ্কগুলার ভিত্তিও ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সনের পূর্ব্ব বিশ বৎসরে রাজনৈতিক নেতা ও ব্যাঙ্ক-গুলার লজ্জাকর ঘনিষ্ঠতা দেখা গিয়াছিল। কেবল যে ফরাসী ও অন্যান্য বিদেশী সমালোচকরাই ইহার নিন্দা করিয়াছেন তাহা নহে। পারেত প্রভৃতির ন্যায় নামজাদা ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পণ্ডিতরাও ইহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। রাজস্ব-সচিবরাও ঐ সব হাঙ্গামায়, এমন কি হিসাব ও রিপোর্ট গোলমাল করার অভিযোগেও জড়াইয়া পড়িয়া-ছিলেন। ইতালি "ট্রিপ্ল্ অ্যালায়েন্স" নামক রাষ্ট্র-সন্ধিতে

যোগ দিয়াছিল, ফলে যুদ্ধের খরচ অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে সমরাভিযানগুলাও ব্যর্থ হয়। সুতরাং, ব্যাঙ্কগুলার কাছ হইতে ধার পাইবার জন্য যাহা কিছু বে-আইনী ও অর্থ-নীতি-বিরুদ্ধ কাজ চলিতেছিল, গভর্মেণ্ট সেদিকে নজরই দিত না। ঘরবাড়ী, জমিজমা এবং সরকারী পূর্ত্তকার্য্য সম্পর্কিত ঝুঁকিদার ব্যবসাতেও ব্যাঙ্কগুলাকে টাকা খাটাইতে দেওয়া হইত। ১৮৯৩ সনে বাঙ্কো রোমাণা ফেল মারে; অন্য ৫টা নোট ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ি হয় নষ্ট হইয়াছিল, না হয় এমনভাবে খাটানো হইয়াছিল যে তাহা তুলিয়া লওয়া অসম্ভব হইল।

প্রঃ—ইয়োরোপীয় দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাতেও সমূহ গলদ থাকা যে সম্ভব, তাহা জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ইয়োরামেরিকার ব্যাঙ্ক ব্যবসার ইতিহাস হইতে আর কোনও মূল্যবান কথা শিখিতে পারি কি?

উঃ—হ্যাঁ, একটি কথা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার যোগ্য। তাহা এই ইয়োরামেরিকার নানাদেশে আধুনিক যৌথ-প্রণালীতে চালিত ব্যাঙ্ক-কারবারের আরম্ভের দিকটা, বাংলায় আমরা ব্যাঙ্ক-কারবারের যে অবস্থা এখন দেখিতেছি, তাহার চেয়ে বেশী গৌরবজনক বা আশাসপূর্ণ ছিল না।

কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বিলাতের ব্যাঙ্ক-গুলার মোট পুঁজিকে ১ কোটি হইতে ৪ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত দাঁড় করাইতে ৫০ বৎসর (১৮৩৬—১৮৮৬) লাগিয়াছিল। ১৮৪০ সনের কাছাকাছি বিলাতে বৎসরে প্রায় ২৪।২৫টা করিয়া ব্যাঙ্ক ফেল মারিত। ১৮৭০ সনে ১৩৩টা যৌথ কোম্পানীর অধীনে ৯৭০টার বেশী ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল না। অধিকন্তু, বিলাতের ব্যাঙ্ক-কারবারে "সীমাবদ্ধ দায়িত্বের" নীতিটা কায়েম করিতে ১৮৫৮ সন পর্য্যন্ত দেরী হইয়াছিল।

১৮৪৮ সনের পূর্ব্বে ফ্রান্সে আধুনিক যৌথ ব্যাঙ্কিংএর চিহ্নই পাওয়া যায় না। ১৮৪৮ সনে "কঁতে আর দেস্কঁৎ" স্থাপিত হয়। ১৮৭০ সন পর্য্যন্ত মাত্র ১৯টা দেপৎর্মাঁতে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান (ব্যাঙ্কের প্রধান বা শাখা আফিস) ছিল। অর্থাৎ, ঐ সময়ে ৭৪টা দেপৎর্মাঁতে কোন ব্যাঙ্ক আদবেই ছিল না। কেবলমাত্র ৫।৬টী সহরে একের বেশী ব্যাঙ্ক ছিল। ১৮৭০ সনে প্রুশীয়-ফরাসী যুদ্ধ আরম্ভ হইবা মাত্র "ক্রেদি লিয়নের" আমানতের শতকরা ৭০ ভাগ, এবং "সোসিয়েতে জেনেরাল" শতকরা ৮৫ ভাগ তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। ১৮৭০ সনের কাছাকাছি ফরাসী ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় মনস্তত্ত্ব কি ধরণের চীজ ছিল তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও সমঝানো চলে।

১৮৫১ ও ১৮৭০ সনের জার্ম্মাণিতে সব কয়টা যৌথ ব্যাঙ্কের মোট পুঁজি কখন ১০ কোটি মার্ককে (১ মার্ক=৸০ আনা) ছাড়াইয়া যায় নাই। ১৮৭০ সনে যে কয়টা বড় বড় ব্যাঙ্ক নূতন স্থাপিত হয় তাহাদের মোট পুঁজি প্রায় ১০ কোটী মার্ক ছিল। অঙ্কগুলা খুব বড় সন্দেহ নাই। কিন্তু ১৯২৯ সনের বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও কল্পনার পক্ষে উহারা ধারণাতীতরূপে বড় নয়।

তাহা হইলে মোটামুটি বুঝা যাইতেছে যে গোটা স্বদেশী যুগটায় যুবক বাংলা ও যুবক ভারত যৌথ-ব্যাঙ্ক কারবারে যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক ব্যাঙ্ক-কারবারের আরম্ভের দিকটার সহিত তুলনায় নগণ্য নয়। আজকাল যে সব অবস্থার জন্য ফ্রান্স বা জার্ম্মানি দুনিয়ার মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে, ১৮৭০ সনে ইহাদের কেহই সেই অবস্থা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সেই সময়ে ইতালির অবস্থাও এখনকার তুলনায় দুর্ব্বল ছিল। আজকালও ইতালি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। ১৮৭০ সনে আধুনিক জাপান জগতে ছিল না বলিলেই হয়। মাত্র ১৮৮৬ সনের কাছাকাছি জাপান আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ও আধুনিক বাণিজ্য ও শিল্পে শিক্ষা-নবিশী সুরু করে।

প্রঃ—ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে জাপানের স্থান কোথায়? জাপানের তুলনায় আমাদের কৃতিত্বের মূল্য কিরূপ?

উঃ—১৯২৭ সনে সকল শ্রেণীর জাপানী ব্যাঙ্কের (বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যাঙ্ক) মোট আমানত ছিল ১১,৪০০,৩৯৯,০০০ ইয়েন এবং মোট আদায়ী পুঁজি ছিল ২০০ কোটি ইয়েন। জাপানের লোক সংখ্যা ৬ কোটি, সুতরাং জন-প্রতি আমানত ছিল ১৯০ ইয়েন (২৩৮৲ টাকা) এবং পুঁজি ছিল ৩৩ ইয়েন (৪১৲ টাকা)। আজকাল কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২,১০০ এবং ইহাদের শাখার সংখ্যা ৬০০০। তাহা হইলে, জাপানের

প্রত্যেক ৭৪০০ জনের জন্ত একটী করিয়া ব্যাঙ্ক-আফিস আছে। বিলাতের ৪,৭৭৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬৩৮—এই দুটা অঙ্কের সহিত জাপানের অঙ্কটা তুলনা করা যাইতে পারে। তুলনা করিলে দেখা যায় যে কোন কোন দিকে জাপান ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ কৃতিত্বের স্তরে পৌঁছিয়াছে। ৪ কোটি ৭০ লক্ষ বাঙ্গালীর মাত্র ৫০০টি কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক বাঙালীর ব্যাঙ্ক-পুঁজি নগন্য—১৲ টাকারও কম। সুতরাং জাপান বাঙালীর পক্ষে অনেক উচ্চে।

কিন্তু জাপানের আধুনিক ব্যাঙ্কিং আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ১৮৭২ সনের "জাতীয় ব্যাঙ্কিং আইন" হইতে। ১৮৭৬ সন পর্য্যন্ত মাত্র ১৫০টি ব্যাঙ্ক ছিল। ১৯০৭ সনে ২,১৯৪টি প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের ৯২১টি শাখা—সর্ব্বশুদ্ধ ৩১১৫টি ব্যাঙ্ক-অফিস ছিল। ইহাদের মোট আদায়ী পুঁজি ছিল ৪৪৪,২০৪,০৪১ ইয়েন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে জাপানের লোক সংখ্যা ছিল ৫ কোটি। তাহা হইলে ১৯০৭ সনে প্রত্যেক জাপানীর ব্যাঙ্ক পুঁজির পরিমাণ ছিল ৯ ইয়েন (১৩৷৷০ আনা)। আজকাল এক ইয়েনের দাম ১৷০ আনা।

অর্থাৎ, আধুনিক জাপানের প্রথম ৩৫ বৎসরে মাথাপিছু ব্যাঙ্ক পুঁজির পরিমাণ ১৩৷৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছিল। পরের কুড়ি বৎসরে যে হারে ব্যাঙ্ক পুঁজি বাড়িয়াছিল, (১৩৷৷০ আনা হইতে ৪১৲ টাকা) তাহার তুলনায় এই বৃদ্ধি নিতান্তই সামান্ত। পরিষ্কার মালুম হইতেছে যে, ১৯০৭ সনে যেমন বাঙ্গালী জাপানের পিছনে ছিল এখনও তেমনি আছে।

প্রঃ—জগতের প্রধান শক্তিগুলার অবস্থা ত' আলোচনা করা হইল। ইহার ফলে, আমাদের দেশকে কোন্ দিকে এবং কি ভাবে চালাইতে হইবে সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব কি ?

উঃ—ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার এই জাতিগুলা আমাদের ৬০।৭০ বৎসর আগাইয়া গিয়াছে। তবে আরম্ভটা মন্দ হয় নাই, এবং যে গতিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি, তাহাতে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম মাথাওয়ালা বাঙ্গালী ব্যবসাদারেরও বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে যে, আমাদের উন্নতি যে কোনও জাতির পক্ষেই গর্ব্বের বিষয়।

যাহা হউক, মূল নীতিটা অতি পরিষ্কার। ফ্রান্স, এবং ইতালি ও জাপানের অভিজ্ঞতার আলোচনা সকল উদীয়মান জাতিরই চোখ খুলিয়া দিবে। ব্যাঙ্কিং বিদ্যা, কারখানা শিল্পের প্রসার, ও ব্যবসা পত্তন প্রভৃতি বিষয়ে "আধুনিক" হইতে শত শত শতাব্দী লাগেনা। ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিক্ষার বিষয়ে জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতেও শত শত শতাব্দী লাগে না।

যুবক বাংলা আজ পুঁজি ও শিল্প-শক্তি বাড়াইতে উন্মুখ। সেই জন্য যুবক বাংলার দরকার—জগতের নবীন জাতি-গুলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা। যুবক বাংলার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল সে সম্বন্ধে প্রেরণা আহরণ করা সম্ভব হইবে, কেবল এই মেলামেশার ভিতর দিয়াই। বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণাটা দূর করিবার জন্যই, জাপানী, ইতালীয়, ফরাসী ও জার্ম্মাণদের আর্থিক ক্রম-বিকাশের খবর রাখা, এবং ঐ সকল জাতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো, একান্ত দরকার।

প্রঃ—বাংলায় বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিংএর আরম্ভ কিছু দেখা যাইতেছে কি ?

উঃ—বলা হইয়াছে, বাংলায় ৫০০টি লোন-আফিস আছে। জিনিষ বন্ধক রাখিয়া ধার দিবার কারবার ইহারা কিছু কিছু করে। কিন্তু ইহাদের প্রধান কাজ হইতেছে জমি ও বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া। ইহারা "জমি বন্ধক ব্যাঙ্কের"ই শ্রেণিভুক্ত। ইহাদের মধ্যে গোটা-কয়েক, ব্যবসাতেও টাকা খাটায়। এখন এমন কয়েকটি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে যাহার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে ব্যবসাতে টাকা খাটানো।

এই যে নূতন শ্রেণীর ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে সুরু হইয়াছে, তাহার উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। দুনিয়ার মাপকাঠিটি ব্যবহার করিলে দেখানো যাইতে পারে যে, নানা শ্রেণীর ব্যাঙ্কিং কাজ-কর্ম্মের ভিতর এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিংএ হাতেখড়ি ছাড়া কিছুই নয়। ইয়োরা-মেরিকা ও জাপানের বাণিজ্য-ব্যাঙ্কগুলা এবং এদেশের বিদেশী বিনিময়-ব্যাঙ্কগুলা আরও উচ্চশ্রেণীর ও জটিল কাজে হাত দেয়। নানাশ্রেণীর বিল বেচা কেনা, "অ্যাক্সেপটেন্স",

"রি-ডিস্কাউন্ট"—ব্যাঙ্ক-ভাষার এই সব অ, আ, ক, খও এখনও বাঙ্গালী আয়ত্ত করে নাই। নূতন নূতন শিল্প খাড়া করা, শেয়ারে টাকা খাটানো,—এই সব কাজও আছে। অনেক আধুনিক ব্যাঙ্ক এই সব বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আমরা এখনও শিশু ঐ সব বড় বড় ব্যাপারে হাত দেবার ক্ষমতাও আমাদের নাই। তাহা হইলেও, কয়েকটা বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক যে স্থাপিত হইয়াছে ইহা বাংলার ব্যাঙ্ক-ব্যবসার ক্রম-পরিণতির ইতিহাসে কার্য্যগত বৃদ্ধির দিক্ হইতে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশা করা যায় যে, আগামী কয়েক বৎসরে যে সব নূতন নূতন ব্যাঙ্ক আরম্ভ হইবে সেগুলা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলিবে।

প্রঃ—লোন আফিসগুলার কয়েকটা উপকারের কথা আগেই বলিয়াছেন। ওগুলা হইতে আমরা কি আর কোনও উপকার পাইতেছিনা?

উঃ—ইহারা বাঙালীর আর্থিক জীবনের একটা অভাব পুরণ করিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাঙালীদের ব্যাঙ্কে আমানত রাখার অভ্যাস বাড়িতেছে। জমিদাররাও লোন-অফিসে জমি বাঁধা রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পারে; সুতরাং তাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখাও ইহাদের সহায়তায় সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু লোন-আফিসগুলার টাকা যথার্থই লাভ-জনক কাজে খাটানো হইতেছে কিনা, তাহা ব্যবসায়ী মহলে আলোচনার যোগ্য।

প্রঃ—বাংলার ব্যাঙ্কগুলাকে এখন কোন কোন দিকে উন্নত করা দরকার?

উঃ—ইয়োরোমেরিকার ইতিহাস হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনীতিতে দখল পাইতে হইলে, ইয়োরামেরিকার ১৮৫০ হইতে ১৮৭৫ এবং জাপানের ১৮৭৫ হইতে ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় তুলনা-সহায়ক অঙ্কগুলার মত মূল্যবান আর কিছুই নাই। ঐ তারিখগুলায় জগতের প্রধান প্রধান জাতের ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় সংখ্যাগুলা আলোচনা করিলেই, আমাদের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের গলদ্‌গুলা ধরা পড়িবে। আর, এই তুলনামূলক আলোচনা হইতেই খুবই পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে, ব্যাঙ্কের সংখ্যার দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, বাঙ্গালীকে এখনও অনেকটা পথ অগ্রসর হইতে হইবে; সংখ্যার দিকে বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসীম বলিলেও চলে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের নানা শ্রেণীর কাজগুলার তরফ হইতে আলোচনা করিলে বলা চলে যে, বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলা সবেমাত্র নব-জীবনের হাতেখড়ি সুরু করিয়াছে। ব্যাঙ্কের কার্য্যগত বৃদ্ধির জন্য অসংখ্য পরীক্ষা ও অসংখ্য দুঃসাহসিক কার্য্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের আর একটি তৃতীয় গলদ্ আছে। কি 'তাত্ত্বিক', কি 'কাজের লোক', ইহা সকলেরই নজর এড়াইতে পারে। কিন্তু, তুলনা-সহায়ক সংখ্যাগুলা এই দোষটা বিশেষ করিয়াই দেখাইয়া দেয় এবং বৃদ্ধির নূতন দিকটাও নির্দ্দেশ করে। আমি ব্যাঙ্কগুলার গড়ন-গত দোষগুলার কথাই বলিতেছি। আজ আমরা যৌথ কারবার, অসীম দায়িত্ব এবং যৌথ কোম্পানীর সাহায্যে ব্যবসা চালানো—এ সব ব্যাপারে যে অভ্যস্ত হইতেছি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসা পরিচালনার একটি প্রধান নীতি আমাদের আর্থিক ধুরন্দরেরা এখনও দখল করিতে পারেন নাই। চাষের কাজে যেমন জমির টুকরা একটি নির্দ্দিষ্ট মাপের ছোট হইলে লাভ পাওয়া সম্ভব হয় না, তেমনি প্রত্যেক ব্যবসারও একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ আছে, যাহার চেয়ে ছোট হইলে লাভ থাকিতে পারে না—এই কথাটি তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যাঙ্কগুলা সম্বন্ধে এই মাপটি বেশ উঁচু। আজ যে দুনিয়া হইতে কুটির-শিল্প বিলীন হইতেছে তাহার একটা প্রধান কারণ—ব্যবসার বহর সম্বন্ধীয় উক্ত আইনটি। কারবারগুলা লাভ-জনক করিতে হইলে সেগুলার মাপ বেশ বড় হওয়া চাই। যদি তাহারা এই মাপের চেয়ে ছোট হয় তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। "ছোট ছোট "যোতগুলা" নেহাৎ ছোট হইলে চলিবে না।

বর্ত্তমান বাংলার ধনদৌলতের পরিমাণও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক হইতে ব্যাঙ্কগুলা ঠিক কতবড় হইলে "আর্থিক একক" বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা বলা শক্ত। এই বৎসরে জাপানীরা একটা নূতন আইন করিয়াছে—তাহাতে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে

প্রতিষ্ঠানের অন্ততঃ ৫লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ ইয়েন আদায়ী পুঁজি নাই তাহাকে ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে নামিতে দেওয়া হইবে না। তবে, আমাদের দেশে এই কথাটার উপর এখন বিশেষ জোর দিবার দরকার নাই। কারণ, জাপান ইতিমধ্যেই ইয়োরামেরিকার স্তরে উঠিয়াছে।

প্রঃ—অন্যান্য দেশে ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণ কিরূপ চলিতেছে? এদেশের ব্যাঙ্কগুলার কেন্দ্রবদ্ধ হওয়া এখন দরকার আছে কি? যদি দরকার হয়, তাহা কি শ্রেণীর হইবে? তাহার উদ্দেশ্যই বা কি হওয়া উচিত?

উঃ—ইয়োরামেরিকা ও জাপানে, অবস্থার চাপে পড়িয়া, ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলা তাহাদের স্বার্থ কেন্দ্রীভূত করিয়া বড় বড় ব্যাঙ্কে পরিণত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই কেন্দ্রীকরণের ফলে তাহাদের আর্থিক সংস্থান বাড়িয়াছে। ঝুঁকি বহিবার ক্ষমতাও বাড়িয়াছে। একীকরণ, মিলন, স্বার্থ সঙ্ঘর্ষের লোপ সাধন, ট্রাষ্ট বা কার্টেল-স্থাপন—যে নামই ব্যবহার করা যাউক না কেন—দুনিয়া আজ কেন্দ্রীকৃত ও সঙ্ঘবদ্ধ পুঁজি-প্রতিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পুঁজির পরিমাণ যত বেশী, আধুনিক দুনিয়ায় সফল হইবার সম্ভাবনাও তত বেশী। দুনিয়ার উন্নতিশীল জাতি কয়টার গত ৫০ বৎসরের ইতিহাসের মূল কথাটাই এই। অন্যান্য দিকে "বৃহৎ কারবার" যেমন একান্ত আবশ্যক জিনিষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তেমনি ব্যাঙ্কের একীকরণও একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, আজকাল "যুক্তিযোগে"র নামে কেন্দ্রীকরণের আন্দোলন বিশেষ বল পাইয়াছে—এমন কি ইহা শিল্প বাণিজ্য জগতে বিপ্লব আনিয়া ছাড়িয়াছে।

বাংলাদেশের ব্যাঙ্কগুলাকে এমন সব কর্ম্মকৌশলের কথা ভাবিতে হইবে যাহাতে আমাদের লোকসান সহিবার ক্ষমতা এবং আবশ্যক হইলে আরও ঝুঁকি লইবার ক্ষমতা বাড়িতে পারে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহাদের শক্তির বৃদ্ধি ঘটিতে পারে এবং পুঁজিওয়ালা ও ব্যবসাদারদের বিশ্বাস বাড়িতে পারে। তাহাদের সংস্থানগুলা বুদ্ধিমানের মত খাটাইতে হইবে, এবং ১৯২৯ সনে জগতে প্রচলিত কেন্দ্রীকরণ যদি সম্ভব না হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর

পাদে যে শ্রেণীর কেন্দ্রীকরণ প্রচলিত ছিল, অন্ততঃ সেই শ্রেণীর কেন্দ্রীকরণ অবলম্বন করিতে হইবে।

ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীকরণের দিকে গত তিন চার বৎসর ধরিয়া আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা আমার একান্ত বিশ্বাস যে, নিছক ব্যবহারিক কাজের চাপেই বাধ্য হইয়া আমাদের কর্জ্জ-প্রতিষ্ঠানগুলা ছোট ছোট কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবেই।

প্রঃ—ব্যাঙ্কগুলার ভিতর মিলন সাধিত হইবে কাহাতে কাহাতে?

উঃ—যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক মিল বা লেন-দেন আছে।

কোন্ জেলার কোন্ ব্যাঙ্ক, সেই জেলা বা অন্য কোন জেলার কোন্ ব্যাঙ্কের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, তাহা একজন "বাহিরের লোকের" (তিনি "বিশেষজ্ঞই" হউন বা "নামজাদা দেশভক্ত"ই হউন) পক্ষে বলিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারবারে অভিজ্ঞতা, কারবারের রীতি-নীতি এবং আগেকার লেনদেন এইগুলাই কোন্ ব্যাঙ্কের সহিত অপর কোন্ ব্যাঙ্কের মিলন ঘটিবে তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবে। যে ভাবেই কেন্দ্রীকরণ ঘটুক না কেন, ইহার প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত—প্রথমতঃ, মূলধন-বৃদ্ধির দিকে এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়িদের বিশ্বাস বাড়াইবার দিকে।

প্রঃ—আগামী ৫।৭ বৎসর কোন্ কোন্ দিকে আমাদের চেষ্টা চালানো দরকার তাহা সংক্ষেপে বলিতে পারেন?

উঃ—বাংলার ব্যাঙ্কগুলার সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রও প্রসারিত করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক পরিচালনা-কর্ম্ম-কৌশলে (কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের পরিচালনাই হউক বা ব্যাঙ্কগুলার পরস্পরের সম্বন্ধ-সম্পর্কিত পরিচালনাই হউক) আমাদিগকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। আগামী ১০ অথবা ২৫ বৎসর, নানা বাধার সহিত যুঝিতে যুঝিতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার সকল দিকেই আমাদের উন্নতি করিতে হইবে। এইরূপে, সজ্ঞানে ও বর্ত্তমানের বাধাগুলা পরিষ্কাররূপে জানিয়া লইয়া, বাংলাকে নিকট ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইবে।

আমার বক্তব্য শেষ করিব। যুবক বাংলার সাধনা হইতেছে, জগতের শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বে অধিকারী হওয়া। কিন্তু বর্ত্তমানের উৎকট সত্যগুলা আমরা না দেখিয়া পারি না। আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রথম পথ-প্রদর্শকেরা ১৮৮৬ বা ১৮৭০ সনের কাছাকাছি যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্যাঙ্ক-ব্যবসাতে (সংখ্যা, কাজ-কর্ম্ম ও গড়নের দিক হইতে) আমাদের বর্ত্তমান কীর্ত্তি তাহারই কাছাকাছি। তাহা হইলেও, আমাদের উন্নতির গতি-বেগ বজায় থাকিবে ও বাড়িবে এবং আগামী ২৫বৎসরের মধ্যে আমরা শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে প্রধান দেশগুলার নাগাল ধরিতে পারিব অথবা কাছাকাছি পৌঁছিতে পারিব—এই বিশ্বাস লইয়া আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারি।

পঞ্চপুষ্প

মার্কিনে তুর্কী মহিলা

হ্যালিডে এডিব তুরস্কের জনৈক চিকিৎসকের পত্নী। তিনি তথায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম তথায় পর্দ্দার বাহির হন।

বাল্যকালেই শিক্ষালাভার্থ তাঁহাকে আমেরিকা প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি তথা হইতে বি এ উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে তুরস্কের আর কোনও মহিলা এই সম্মানজনক উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন। বলকান যুদ্ধের সময় তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেন আর সভাস্থ সকলেই যুদ্ধের সাহায্যার্থ তাহাদের অঙ্গের মূল্যবান বসন-ভূষণাদি প্রদান করিতেন। ১৯১৯ সালে প্রায় এক লক্ষ তুরস্কবাসীর সমক্ষে তিনি এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি আমেরিকার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

সঞ্জীবনী

বরিশাল স্ত্রীশিক্ষায় অগ্রসর হইল

বরিশালে বালিকা-কলেজ স্থাপন হইতে চলিল। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সহরে বালিকাদিগের জন্য একটি গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলেজ ও দুইটি খৃষ্টানদিগের দ্বারা পরিচালিত কলেজ আছে কিন্তু বালিকাদিগের জন্য একটীও প্রাইভেট কলেজ নাই। উপরন্তু বঙ্গদেশের কোনও জেলায়ও বালিকাদিগের সরকারি বা বেসরকারি কলেজ নাই। বরিশালের জনসাধারণের চেষ্টায় ৪৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বালিকা কলেজ স্থাপনের কথা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট ১৷৷০ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবেন। সম্প্রতি ২৷৷০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। শুনা যাইতেছে এই বালিকা কলেজের নাম বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে হইবে। বরিশালের বিরাট্ পুরুষ অশ্বিনীকুমারের নামে ইহা স্থাপন করা উচিত। বরিশাল স্ত্রী শিক্ষায় অগ্রণী হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইল তাহা অন্যান্য জিলায় অবিলম্বে অনুকরণ করা উচিত। বরিশাল স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

সঞ্জীবনী

কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়

গত ৯ই মার্চ্চ উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের গবর্ণর স্যার ষ্টান্লি জ্যাকসন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাননীয়া গবর্ণরপত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। সভায় বহুলোক এবং তন্মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত যে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে,

বিভিন্ন দিক্ দিয়া বিদ্যালয় ক্রমোন্নতির দিকেই চলিয়াছে। শ্রমশিল্পের নানা শাখার পরিবৃদ্ধি সাধন এখনও আবশ্যক এবং ইহাতে অর্থের প্রয়োজন। ১৯২১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় যে, বঙ্গে মূক-বধিরের সংখ্যা ৩২৫৬০ ইহার মধ্যে ১৪০০০ জন স্কুলে যাইবার বয়সবিশিষ্ট। ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বিস্তর ব্যয়ের প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়ে ১৭৫টি মূক-বধিরকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষাসমাচার

ঢাকা মূক-বধির বিদ্যালয়

ঢাকা সহরে একটি মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। উহাতে মূক-বধিরদিগকে কথা বলিতে, লিখিতে, পড়িতে, এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়টি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং বার বৎসর যাবৎ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহার কার্য্য দেখিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লিটন বাহাদুর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "আমি এই ভাবের প্রতিষ্ঠান এই প্রথম দেখিলাম, এই বিদ্যালয়স্থ বধির ছাত্রগণ যে কোন লোকের অধর ও ওষ্ঠের সঞ্চালন দেখিয়া সেই ব্যক্তি কি বলিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারে এবং নিজেরা কথা কহিতে পারে। ইহা দেখিয়া আমি বিশেষ বিস্মিত হইলাম। এই বিদ্যালয়টি সাধারণের সাহায্য এবং উৎসাহ পাইবার বিশেষ যোগ্য।" এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অনেক মূক-বধির বিশেষ যোগ্যতার সহিত জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া প্রায় ৬।৭টি বালিকা কথা কহিতে শিখিবার পর বিবাহিতা হইয়াছে। এখানে বালক-বালিকাদিগকে কেবল কথা কহিতে, এবং লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় না, অধিকন্তু তাহাদিগকে চিত্র অঙ্কন করিতে, বস্ত্রবয়ন করিতে এবং দর্জ্জির কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, উহাতে প্রায় ১৫০০০৲ পনের হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। সরকার পক্ষ হইতে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পাইবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। সাধারণের নিকট হইতেও পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ঢাকা ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে ২৭৮১৲ এবং ঢাকা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ২২২০৲ টাকা, মোট ৫০০১৲ টাকা জমা আছে। এই নূতন বৎসরে আরও দুই হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বাকী তিন হাজার টাকার অকুলান রহিয়াছে। সাধারণের নিকট হইতে এই তিন হাজার টাকা বর্ত্তমান মাসের ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত তুলিতে না পারিলে সরকার বাহাদুর ঐ প্রতিশ্রুত ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করিবেন না। এ বিষয়ে দেশের বদান্য জনগণের বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক। কিছুদিন হয়, চঞ্চলের রাজা বাহাদুর কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের জন্য দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা দান করিয়া আপনার মহত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের এই অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানটির জন্য এই ভাবে অর্থ দান করিতে পারেন, এমন কি কেহ নাই? আমরা সহৃদয় ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

শিক্ষাসমাচার

ভারতের চিত্র শিল্প

"ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান" লণ্ডনে একটি প্রদর্শনী বসাইবেন। ইহাতে অজন্তার যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় চিত্র-শিল্পের যে বিকাশ হইয়াছে তাহা বিভিন্ন চিত্র দ্বারা প্রদর্শন করা হইবে। প্রদর্শনী আগামী জুলাই মাসে বসিবে।

শিক্ষাসমাচার

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস সম্মেলনে সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘের উদ্যোগে রংপুরে নিখিল বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক ও লোন-আফিস সম্মেলনের সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যায় ব্যাঙ্কিংএর সার্থকতা যেমনই সুমহৎ আমাদের দেশে উহার অভাব এবং তজ্জনিত আমাদের দৈন্যও তেমনই গুরুতর। আমাদের মহাজন, শেঠ, নিধি, চোট্টি প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ যে দেশীয় প্রণালীতে ব্যাঙ্কিং চালাইতেছেন, তাহা পৃথিবীর অন্যদেশীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে উদ্ভাবিত সন্দেহ নাই। আমাদের হুণ্ডী কারবার একান্ত ভাবেই আমাদের নিজস্ব, অতি পুরাতন যুগ হইতেই কার্য্যকারিতায় উন্নত ব্যাঙ্কিং প্রণালীর সহিত সমতা রাখিয়া চলিয়াছে। তথাপি বর্ত্তমানে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিং যে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ তাহা, পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহের মাপকাঠিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান বলিয়াই, আজ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। প্রণালী বিশেষের উৎকর্ষ বিচার না করিয়া বিভিন্ন দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা, মূলধন ও আমানতের মোট পরিমাণ এবং লোক সংখ্যার অনুপাতে ইহাদের তারতম্যের পর্য্যালোচনা করিলেই ব্যাঙ্কিংএ আমাদের দেশ এখনও কতটা নিম্নস্তরে তাহা সুস্পষ্ট হইবে।

অন্য দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক

প্রথমতঃ বিলাত, মার্কিণ এবং জাপানের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ধরা যাক্। ১৯২৪ সনে প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে বিলাতে মোট ব্যাঙ্ক সংখ্যা ১১,৯৭৬ মার্কিণে ৩০,০০০, জাপানে ৭৪৬৫, ভারতবর্ষে কথঞ্চিৎ-বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৯৬টী মাত্র। কাজেই প্রতি দশলক্ষ লোকের মধ্যে আমাদের দেশে গড়ে মাত্র দুইটী ব্যাঙ্ক দাঁড়ায়; অথচ ঐ অনুপাতে বিলাতে, মার্কিণে এবং জাপানে যথাক্রমে ২৮৫টী ২৫৬টী ও ৯২টি ব্যাঙ্ক আছে। এই সকল দেশের আর্থিক উন্নতির মূলে তাহাদের ব্যাঙ্ক সমষ্টির সংখ্যাধিক্য আর আমাদের দেশে ঐ সংখ্যার অল্পতা দেশের আর্থিক দুরবস্থারই অনুরূপ। এই ত গেল বাহিরের কথা; এখন বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কের অর্থসম্পদের অনুপাতটা কি রকম দেখা যাক। এ বৎসর বিলাতের, মার্কিনের এবং জাপানের ব্যাঙ্কগুলির শুধু আদায়ীকৃত মূলধনই ছিল যথাক্রমে কিঞ্চিদধিক ১১ কোটি, ৬৬ কোটি ও ১৫ কোটী পাউণ্ড, পক্ষান্তরে তখন আমাদের দেশের আদায়ী মূলধন মাত্র এক কোটি পাউণ্ড। আমানতের হার মার্কিণের সর্ব্বোপরি মোট ১ হাজার ৩৭ কোটি পাউণ্ড; বিলাতের ও জাপানের ভাগে ২৫১ কোটি এবং ১০১ কোটি করিয়া। একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি বাদে আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ মোট ৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড (অর্থাৎ জন প্রতি ৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং মাত্র)। অথচ বিলাত, মার্কিণ ও জাপানের জন প্রতি ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ পাউণ্ড, ৮৭ পাউণ্ড ও ১৪ পাউণ্ড করিয়া। এই সকল দেশের তুলনায় ভারতীয় ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ এতই স্বল্প যে উহার সমষ্টি বিলাতের বিগ্ ফাইভের (Big Five) যে কোনও একটি ব্যাঙ্কের আমানত হইতে ন্যূন।

এই ত গেল অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কিংএর স্থান নির্ণয়। এইবার দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা প্রয়োজন। আজ দেশে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক এবং সমবায়-ঋণদান-সমিতি প্রভৃতি একযোগে কারবার চালাইতেছে।

একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক প্রায় বিগত ৭০ বৎসর ধরিয়া এ দেশে ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে; একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক মাত্রই বিদেশে গঠিত, কাজেই তাহাদের মূলধন বা রিজার্ভের কি পরিমাণ ভারতবর্ষে খাটান হয় তাহা প্রকাশিত হয় না। বিগত ইউরোপের মহাসমরের ফলে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে ১৯১৩ হইতে ২৪এর মধ্যে নূতন নূতন দেশ ভারতে তাহাদের ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করে; বর্ত্তমানে এই বিদেশী ব্যাঙ্ক সংখ্যায় ১৯টি। একস্‌চেঞ্জের কাজ যদিও ইহাঁদের বিশেষত্ব তথাপি দেশী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতায় সাধারণভাবে সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য ইহারা করিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের বাৎসরিক ৬০০ শত কোটি টাকার বহির্ব্বাণিজ্য ইহাদের হাত দিয়াই চলিতেছে। যুদ্ধের পর তাহাদের ভারতীয় আমানত বিশেষ

বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। মোট ২২২ কোটি টাকার ভারতীয় ব্যাঙ্ক-আমানতের মধ্যে ইহাই প্রায় এক তৃতীয়াংশ। অপর এক তৃতীয়াংশ ৮৪ কোটি টাকা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাতে। ইম্পিরিয়াল ও একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক, এই দুই প্রতিষ্ঠানই বিদেশীয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন বলিয়া ইহাদের আমানতের টাকা ভারতীয় হইলেও তাহাদের নিকট ব্যবসার ক্ষেত্রে এতদ্দেশীয়ের ঋণ লাভের ভরসা অত্যল্প। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর পাণ্ডে এবং স্যার বি, এন্ শর্ম্মা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কএর 'পাবলিক ডিপজিট' যদিও ভারতীয় করদাতাগণের অর্থ-সম্ভূত ইহা হইতে বিদেশীয় বণিকেরাই বেশীর ভাগ সাহায্য লাভ করে। পরন্ত এ দেশের স্বল্প-সুদের আমানতের টাকা অনেক সময়েই একস্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি নিজের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ভারতের বাহিরে দাদন করে; ইহাও সত্য।

ভারতীয় কোম্পানী বিধি অনুসারে গঠিত ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের উল্লিখিত পরিমাণ, মোট ৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু এক কোটি টাকার উপর আমানত আছে এমন ব্যাঙ্ক দেশে বর্ত্তমানে মাত্র ৬টী:—এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্ মহীশূর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৪টিই ইউরোপীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে বলিয়াই সর্ব্বাংশে ভারতীয় বলা চলে না। কাজেই হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতীয় পরিচালিত দেশী ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানত ৪২ কোটি টাকার বেশী নহে; অর্থাৎ সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক আমানতের এক পঞ্চমাংশ মাত্র। ইহা হইতে পরিতাপের বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে!

স্বদেশী যুগের সুফল

ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের অর্থশক্তি সম্যক সংহত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াই একমাত্র দেশের আর্থিক দৈন্য দূরীকরণ সম্ভব,—এই সত্যিকার দৃষ্টিই পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন স্বদেশী ব্যাঙ্কের উদ্ভবের কারণ। আমাদের দেশে আজ যে বাঙ্গলার প্রতি জেলায় বিশেষ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে ক্রম-বর্দ্ধমান ছোট খাট ব্যাঙ্ক বা লোন-অফিস-গুলি জাতীয় সম্পদ্ লইয়া উঠিয়াছে, তাহারও সূচনা স্বদেশী যুগে। কিন্তু আবেগের মুখে যার সৃষ্টি ভাবের আতিশয্যে বাস্তবকে সে প্রতিনিয়ত প্রতিহত করে বলিয়াই স্থায়িত্ব তার অনধিক। কাজেই ১৯১৩ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত বৎসরত্রয় ব্যাপী ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের যে অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে, তাহাতে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা অনেকাংশে নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে সেই গৌরবময় যুগের কীর্ত্তি "বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক" ও নানা প্রতিকূল অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে ১৯২৭ সনে ২৮শে এপ্রিল তারিখ বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের পতন ও তাহার শিক্ষা

বেঙ্গল ন্যাশানালের পতন বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য নিঃসন্দেহ; আমানতকারিগণের ক্ষতি ছাড়া দেশীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিয়া বাঙ্গালী ব্যাঙ্কিং এর ভবিষ্যত উন্নতির মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়াছে, সে অনিষ্ট আরও গুরুতর। তথাপি এই বিপদের মুখে দেশীয় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পরস্পরের যোগাযোগের অভাবজনিত গোড়ার গলদ যে এত মারাত্মক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই অভিজ্ঞতার দিক্ হইতে পরম লাভ।

ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার আর যে কোন কারণই থাক না কেন, ইহা অবিসংবাদী সত্য যে দেশীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার (organisation) মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ না থাকা এবং অর্থসঙ্কটের সময় নিশ্চিত অর্থসাহায্য করিতে পারে এরূপ যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্কের অভাবই অন্যতম কারণ। বিশ্বাসের উপরই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। কাজেই কোনরূপ সামান্য কারণে ব্যাঙ্কের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিলে ব্যাঙ্ক স্বভাবতঃই টলমল করে। সন্ত্রস্ত আমানতকারিগণের টাকার চাহিদা মিটাইয়া আশঙ্কা প্রশমিত করিতে প্রায়ই বাহিরের অর্থ সাহায্য প্রয়োজন হয়, অনেক সময়ে ব্যাঙ্কের পক্ষে

অন্যত্র সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেই সাধারণের আতঙ্ক কাটিয়া যায়। আমাদেরই মত ব্যাঙ্কে ফেলের মধ্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বর্ত্তমানে অন্য সকল দেশেই ছোট বড় অপরাপর ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য সঙ্কল্প ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ দেশের সমস্ত অর্থ শক্তি একই ভাবে জাতির সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণে সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং ব্যাঙ্কিংকে শক্তিশালী করিয়া তাহার ক্রমোন্নতি সাধন করিতেছে। সংহতি শক্তি আজ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে যুগান্তর আনিয়াছে। আর সেই শক্তির অভাবই আমাদের ব্যাঙ্কিংএর দুর্ব্বলতার গোড়ার কথা; এবং তাহারই ফলে বারম্বার ব্যাঙ্ক-ধ্বংসের যুগে ক্ষতির পরিমাণও অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সঞ্জীবনী

বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ সম্মেলন

প্রথমদিনের অধিবেশন

গত ২৩শে মার্চ্চ শনিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় হিন্দু-সমাজ সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থিত বিরাট মণ্ডপে হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের অনেক জেলা হইতে বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বাহির হইতেও কয়েকজন পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। মণ্ডপের ভিতরে একটি সভামঞ্চ তৈরী করা হইয়াছিল। তাহার উপর অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ ও অনেক বিশিষ্ট দর্শক উপবেশন করিয়াছিলেন। মঞ্চের দক্ষিণ দিকে মহিলাদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও অনেক বিশিষ্ট হিন্দুনেতৃবৃন্দের সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। তিনি সভামঞ্চের ঠিক মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি তাঁহাকে পুষ্পমাল্য বিভূষিত করেন।

প্রথমে বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

"অবনত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারী"

এই গানটি কয়েকটি ছোট ছেলে কর্ত্তৃক সুললিত স্বরে গীত হয়। তৎপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে পর ঐ দিনের মত সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন:—শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রী, গিরিজাকান্ত শর্ম্মা গোস্বামী, দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ জে, এন, মৈত্র, হরিশঙ্কর পাল, প্রোফেসার গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, স্বামী ভোলানন্দ গিরি, মাখনলাল সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রফুল্লকুমার সরকার, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শৈলেশনাথ বিশী। সভায় প্রায় ২০০০হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবিকাগণ শ্রীযুক্ত লতিকা বসুর অধীনে ও স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্রীযুক্ত মহাতাব ব্যানার্জ্জীর অধীনে কাজ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

শুদ্ধি সংগঠন অত্যাবশ্যক

গত ২৪শে মার্চ্চ রবিবার বেলা তিনটার সময় বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বেলা ২টার সময় অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বেলা ১২॥০টা পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন বসিয়াছিল, কাজেই প্রতিনিধিবর্গের স্নানাহারান্তর ফিরিয়া আসিতে দেরী হওয়ায় ৩টার পূর্ব্বে অধিবেশন সম্ভবপর হয় নাই। বেলা ৩টার পর সভাপতি মহোদয় তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে সভা-গৃহে প্রবেশ করেন। তখন স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সমবেত কণ্ঠে সংস্কৃত ভাষায় একটি স্তোত্র আবৃত্তি করে। তৎপর স্বেচ্ছা-সেবিকাগণ কর্ত্তৃক "অবনত ভারত চাহে তোমারে" শীর্ষক সঙ্গীতটি গান করার পর সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

প্রথমতঃ সভাপতি মহোদয়, লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া শোকসূচক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। অতঃপর স্বামী জ্ঞানানন্দ, মহাত্মা

গান্ধীর গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সকলে একবাক্যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তৎপর পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হয় ও গৃহীত হয় :—

ধর্ম্মপ্রচার ও শুদ্ধি

১। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ববাসী সকল মানবের জন্য বিহিত এবং স্মরণাতীত কাল হইতে ইহা সার্ব্বজনীনভাবে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী কাল প্রচারকার্য্য উপেক্ষিত থাকার দরুণ ইহা জন্মগত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় বিশ্বমানবের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইতেছে। অতএব এই সম্মিলনী সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে হিন্দুধর্ম্মপ্রচার অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া হিন্দুসভা ও হিন্দুমিশন প্রভৃতি হিন্দু-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করতঃ উক্ত প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

২। যে সমুদয় হিন্দুসন্তান ভ্রান্তবুদ্ধি চালিত অথবা বাধ্য হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যাগমনেচ্ছু হইলে এই সম্মিলনী তাহাদিগকে উপযুক্ত শুদ্ধি করিয়া স্ব স্ব সমাজে পুনর্গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিবেচনা করেন।

৩। যে সব অহিন্দু সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া উহার আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষী, এই সম্মিলনী তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ সামাজিক সুবিধা ও আধ্যাত্মিক অধিকার প্রদান করাও একান্ত সঙ্গত মনে করেন।

(ক) পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কার্য্যে যাজন।

(খ) রজক, নরসুন্দর, পাটনী, বেহারা, মালী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর দ্বারা সামাজিক কার্য্য নিষ্পাদন।

(গ) সাধারণ দেবমন্দিরে পূজাধিকার।

সংগঠন

৪। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার ফলে হিন্দুসমাজের বহুশ্রেণী নানাবিধ সামাজিক সুবিধা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকার দরুণ হিন্দুসমাজের মধ্যে মিলন ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে; অতএব এই সম্মিলনী সমাজের পূর্ব্বোক্ত দোষত্রুটী সংশোধন করিয়া এক সুগঠিত প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ শক্তিমান হিন্দুজাতি গঠন পক্ষে একান্ত আবশ্যক মনে করেন।

৫। এই সম্মিলনী ঘোষণা করিতেছেন যে, সাধারণের মন্দিরে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর পূজা করিবার অধিকার আছে।

৬। এই সম্মিলনী ঘোষণা করিতেছেন যে শ্রেণী হিসাবে কোন হিন্দু জল-অনাচরণীয় নহে এবং কোন হিন্দুর হাতে কোন হিন্দুর জল গ্রহণে কেহ কোন প্রকার আপত্তি করিবেন না।

৭। এই সম্মিলনী সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর সম্মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

৮। হিন্দুগণকে সবল, সুস্থ ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার প্রচলন এবং স্বাস্থ্য ও নীতি প্রচারের ব্যবস্থা করা এই সম্মিলনী অত্যাবশ্যক মনে করেন।

৯। দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক নারীহরণ ও নারীধর্ষণ ব্যাপারের প্রতিকার ও নিবারণ কল্পে বাঙ্গলার প্রতি হিন্দুপল্লী ও নগরে সেবাদল গঠন, অপহৃতা বা ধর্ষিতা নারীকে সমাজে পুনর্গ্রহণ, সহায়সম্বলহীনা নারীগণের আশ্রয়ার্থ অবলাশ্রম প্রভৃতি গড়িয়া তুলিবার জন্য বাঙ্গলার হিন্দুগণকে অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা সাহায্য করিতে এই সম্মিলনী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ক) এই সম্মিলনী আত্মরক্ষার্থ নারীজাতিকে তাহাদিগের মধ্য হইতে অস্বাভাবিক ভীরুতা ও অক্ষমতা দূরীকরণার্থ শারীরিক শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক মনে করেন।

(খ) সমাজের মঙ্গলকল্পে বালবিধবা ও পুনর্ব্বিবাহেচ্ছু বিধবার বিবাহ এই সম্মিলনী সঙ্গত বিবেচনা করেন।

১০। এই সম্মিলনী হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত অবান্তর শাখা-সমূহের সর্ব্ববিধ মিলন বিশেষভাবে

মঙ্গলজনক মনে করিয়া তাহাদের একত্ব সম্পাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন।

১১। সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু-প্রতিনিধি দ্বারা একটি স্থায়ী সমাজ সম্মেলন পরিষদ্ গঠন এই সম্মিলনীর মতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সকল শ্রেণীর হিন্দুর ব্রাহ্মণত্ব, সভায় বিষম বিতর্ক ও উত্তেজনা, সভাপতির পদত্যাগ

২৪শে মার্চ্চ রবিবার দিবসের হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, সকল হিন্দুই এই মুহূর্ত্তেই "ব্রাহ্মণ" বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহা লইয়া সভায় ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনেকে ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজনার সহিত বক্তৃতা করেন।

প্রস্তাবক নরেনবাবু সভাপতির পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বক্তৃতা করিতে থাকেন। কিন্তু সভার অবস্থা দেখিয়া সভাপতি মহাশয় সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন।

সভাপতি মহাশয় যখন ভোট লইবার জন্য সকলকে মণ্ডপ হইতে বাহির হইতে অনুরোধ করেন, তখন প্রস্তাবক বলেন, তিনি সভা হইতে বাহির হইবেন না, এইখানে বসিয়াই ভোট দিবেন। সভাপতি মহাশয়ের প্রতি এরূপ আচরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তখনই শোনা যায় যে, সভাপতি মহাশয় আর সভার কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন। সেই রাত্রিতে অভ্যর্থনা সমিতির এক সভা হয়। তাহাতে সভাপতির নিকট একটি ডেপুটেশন পাঠাইয়া তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরদিন বেলা ২টায় সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হয়, কিন্তু পণ্ডিত প্রমথনাথ কিছুতেই সভাপতিত্ব করিতে রাজী হন না। তখন স্বামী জ্ঞানানন্দকে সভাপতি করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়, এবং নরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। আরও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভার অধিবেশন শেষ হয়।

আনন্দবাজার

খাদ্যে ভেজালের প্রাবল্য

কলিকাতার হেলথ অফিসার ডাক্তর টি এন্ মজুমদার ১৯২৬ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে খাদ্যে ভেজাল বৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বুঝা যায়, সহরে খাঁটি বলিয়া যেন কোন জিনিষই নাই; যত কিছু খাদ্যদ্রব্য কলিকাতার বাজারে দেখা যায়, সে সবই ভেজালে পরিপূর্ণ। দুধ, ঘি, দই, ছানা, মিষ্টান্ন, সরিষার তৈল,—এ সবই অতিমাত্রায় ভেজাল মিশ্রিত। এমন কি, রোগীর খাদ্য সাগু এবং বার্লি পর্য্যন্ত খাঁটি পাওয়া যায় না। কোন্ জিনিষে কি পরিমাণ ভেজাল বাড়িয়াছে, তাহাও ডাক্তার মজুমদার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। দুধের ভেজালের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—আলোচ্য বৎসরে দুধের বাজার হইতে ১০০৩ দফা নমুনা লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল; তাহার মধ্যে ৩৪৯ দফা ভেজাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইলেই ভেজালের হার শতকরা প্রায় ৩৫ দাঁড়াইল। পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে এই হার ছিল শতকরা ২৯ মাত্র। অর্থাৎ এক বৎসরে ভেজাল আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই ভাবে তিনি দোকানের ঘৃত, মিষ্টান্ন, তৈল প্রভৃতি সকল জিনিষেরই নমুনা পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সব জিনিষেই ভেজাল ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, কমিবার কোন লক্ষণই নাই। ১৯২৬ সালে ঘৃতের ভেজালের হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৮১ ভাগ। পূর্ব্ব বৎসর এই হার কিঞ্চিদধিক ১৬ ভাগ মাত্র ছিল। মিষ্টান্নের ভেজালের হার ১৯২৫ সালে ছিল শতকরা ২১ ভাগ, ১৯২৬ সালে হইয়াছে ২৩ ভাগের উপর; সরিষার তৈলের ভেজালের হার ১৯২৫ সালে ছিল শতকরা মাত্র সাড়ে ৯ ভাগ, ১৯২৬ সালে উহা দাঁড়াইয়াছে সাড়ে ৩৫ ভাগ। ছানা, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ভেজাল আছে। শিশুর খাদ্য এবং রোগীর পথ্য যে সাগু, বার্লি, তাহাও আর খাঁটি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কলিকাতা সহরের লক্ষ লক্ষ নরনারী—শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই—এমন কি, রোগীরাও—নিত্য খাদ্য দ্রব্যের সহিত কত অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছে,

সুধা ভ্রমে বিষ পান করিতেছে। ইহার ফলে, সহরবাসীদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ডাক্তার মজুমদার স্বীকার করিয়াছেন যে, সহরের স্বাস্থ্য ক্রমেই অধিক মাত্রায় খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রাবল্যে মৃত্যু-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে।

বঙ্গবাসী

আমেরিকান্ কৃষি-শিক্ষার ৫০ বৎসর

সরকারী আইনসমূহ

আমেরিকায় কৃষি-বিষয়ে গবেষক তৈরী করাই প্রথমতঃ উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইতে ধীরে ধীরে আজ গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও গবেষণা কৃষি-গবেণার অন্তর্গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৫০ বৎসরের কম সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের এইদিকের প্রসার বুঝিতে হইলে কয়েকটি বৎসরে অনুষ্ঠিত আইনের কথা মনে রাখিতে হইবে।

১৭৮৭ খৃঃ অঃ—যুক্তরাষ্ট্রের কনষ্টিটিউশনে কৃষি বা কৃষি গবেষণার কোন উল্লেখ নাই।

১৮৬২ খৃঃ অঃ—মরিল্ অ্যাক্ট। রাষ্ট্রীয় কলেজসমূহকে ফিডারেল সরকার এই আইনের বলে সরকারী জমি দান করেন ও সেই জমির আয় হইতে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করান।

১৮৮৭ খৃঃ অঃ—হ্যাচ্ অ্যাক্ট। সরকারী সাহায্যের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে পরীক্ষা-ক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব হয়।

১৯০৬ খৃঃ অঃ—অ্যাডাম্স্ অ্যাক্ট। আরও অর্থ সাহায্য করা হয়।

১৯১৪ খৃঃ অঃ—স্মিথ লেভার অ্যাক্ট। পরীক্ষা-ক্ষেত্রে-সমূহ আগেই স্থাপিত হওয়ার দরুণ প্রদর্শনী ও প্রচার কার্য্য বিস্তৃত ভাবে করা সম্ভবপর হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য বহুল অর্থ সাহায্য করা হইল।

১৯২৫ খৃঃ অঃ—পার্ণেল অ্যাক্ট। যুদ্ধকালে বৈজ্ঞানিক সাহায্য ও আর্থিক গবেষণা অত্যন্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে একদল বিশেষজ্ঞেরও সৃষ্টি হয়। এক্ষণে এই বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য আরও অধিক অর্থ ও বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইল। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন, প্রস্তুত করণ, ব্যবহার, বণ্টন ও বাজারে আনয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য, স্থায়ী ও কার্য্যকারী কৃষি-শিল্পের রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য এবং গ্রামের পরিবার ও জীবনকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে যে আর্থিক ও সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দরকার তাহা চালাইবার জন্য ও সেই সব গবেষণা প্রচার করিবার জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হয়।

আইনের মূল্য

এখানে কয়েকটি আইনের ভিতরকার কথা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

হ্যাচ্ অ্যাক্টে বলা হইয়াছে, "কংগ্রেস প্রতি বৎসর প্রত্যেক রাষ্ট্রকে ১৫,০০০ ডলার করিয়া দিবে।" ৪০ বৎসর যাবৎ পরীক্ষামূলক কার্য্যের অভিজ্ঞতার পর কংগ্রেস পার্ণেল অ্যাক্ট দ্বারা শুধু একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বৎসর বৎসর এই পরিমাণ বাড়াইয়া দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। "পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রসমূহ এখন যাহা পায়, তাহা ত পাইবেই। তাহা ছাড়া প্রতি আর্থিক বৎসরে (৩০শে জুন শেষ হয়) প্রত্যেক রাষ্ট্রকে নিম্নলিখিত হারে দেওয়া হইবে—

১৯২৬—২০,০০০ ডলার
১৯২৭—৩০,০০০ „
১৯২৮—৪০,০০০ „
১৯২৯—৫০,০০০ „
১৯৩০—৬০,০০০ „

১৯৩০ সনের পর হইতে প্রতি বৎসর ৬০,০০০ ডলার করিয়া দেওয়া হইবে।"

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে ১৯১৪ সনের আইনের ফলে ফেডারেল সরকার হইতে ১৯২৫-২৬ সনে ৪৫,৮০,০০০ ডলার খরচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যের প্রসার হেতু কংগ্রেস ঐ বৎসর আরও ১৩ লক্ষ ডলার দান করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিশিক্ষা বিষয়ে এক নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ষ্টেট্স্ রিলেশন্স্ ডিপার্টমেন্টের তাঁবে স্মিথ লেভার

অ্যাক্টের দ্বারা বরাদ্দ অর্থ ব্যয়িত হয়। ১৯২৭ আর্থিক সনে ঐ ডিপার্টমেন্ট ৫৮,৮০,০০০ ডলার (=১৬১ লাখ টাকা) খরচ করিয়াছে।

হ্যাচ্, অ্যাডাম্স্ ও পার্ণেল অ্যাক্টের বলে গবেষণার জন্য যে অর্থ সাহায্য করা হয় তাহা অফিস অব্ এক্সপেরিমেন্ট ষ্টেশনস্ নামক বিভাগের অধীন। ১৯২৭ সনে ঐ বিভাগ ২৮,৮০,০০০ ডলার (=৭৯ লাখ টাকা) সাহায্য দিয়াছে। পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ ১৯২৬-২৭ সনে মোট প্রায় ১২,৫০০,০০০ ডলার (৩৪৩ লাখ টাকা) খরচ করিয়াছে। ফেডারেল সরকার ১৯২৭ সনে ১০০৬,০০০০ ডলার (=২৯১ লাখ টাকা) খরচ করিয়া অনুসন্ধানের জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান খাড়া রাখিয়াছেন।

অদ্ভুত আবিষ্কার

পাটের বদলে নূতন তন্তু

ব্রাউনিং নামক একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক এক প্রকার নূতন গাছের তন্তু আবিষ্কার করিয়াছেন। বহু বৎসর পরীক্ষার পর ইহা পাটের প্রতিযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গাছ হইতে তিন রকমের কাঁচা মাল উৎপন্ন হয়; (১) পাট বা শণের মত তন্তু; (২) কাষ্ঠময় পদার্থ,—ইহা কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে; (৩) শতকরা ১৫ ভাগ তৈলযুক্ত বীজ;—ইহা পিষ্ট হইয়া গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলিতে পারে।

এই গাছের নাম ব্রোটেক্স (Brotex) ইহা বীজ হইতে উৎপন্ন হয় এবং এক বৎসর হইতে দেড় বৎসরের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ণতা প্রাপ্ত গাছ ৮ হইতে ১০ ফিট উচ্চ হয়। এক একর জমিতে উৎপন্ন গাছে ১·৬৭ টন তন্তু, ৫·৩৭ টন কাষ্ঠময় পদার্থ এবং ২·৩৪ টন বীজ পাওয়া যাইবে। যদি বার্ষিক ফসলরূপে ইহাকে উৎপাদন করা হয়, তবে প্রতি একরে দুই টন তন্তু পাওয়া যাইতে পারে।

প্রতি একরে খরচ পড়ে প্রায় ৪০ পাউণ্ড; কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্য ৯০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হইবে।

বয়ন-শিল্পের যন্ত্র-ব্যবসায়িগণও বলিয়াছেন যে ব্রোটেক্স তন্তু বর্ত্তমানে পাট প্রভৃতি যে যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়, সেই যন্ত্রে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ইংলণ্ডের বহু গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত লোক এই গাছের বিস্তৃত চাষের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

ইংলিশম্যান

ধর্ম্ম-সংস্কারে কামালপাশা

নবীন তুরস্কের জন্মদাতা কামাল পাশা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত সংস্কার সাধন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে সমস্ত মঠ ছিল তাহাদিগকে বন্ধ করিয়া তাহার অলস অধিবাসীদিগকে অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বাধ্য করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিদ্যালয় সকলকে পুনর্গঠন করিয়া সাধারণের উপযোগী করিয়াছেন এবং কনষ্টাণ্টিনোপলের অনেক মসজিদকে সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে (যেমন লাইব্রেরী প্রভৃতিতে) পরিণত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে সমস্ত সাধুর কবরের নিকট সাধারণ লোক রোগারোগ্য কামনায় গমন করিত। তিনি তাহাও বন্ধ করিয়া কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অধিকন্তু পোষাক পরিচ্ছদেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। সুতরাং স্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জনসভা যে সংস্কারের প্রস্তাব তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে এখনো ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনের সময় আসে নাই। কারণ ধর্ম্ম-সংস্কার একদিনের জিনিষ নহে। উহা ধীরে ধীরে সাধন করিতে হইবে।

দ্বিতল রাস্তা

যান-বাহনের দ্রুত বৃদ্ধিহেতু একতল বিশিষ্ট রাস্তা ক্রমশঃ অচল হইয়া পড়িয়াছে। সেই সমস্যার মীমাংসাকল্পে প্যারিশে দ্বিতল রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। এই রাস্তা Rue du Fanbourg Saint Honoré হইতে Rue de Courcelles পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এই রাস্তার উপর তল কেবল দ্রুতগামী যাত্রী গাড়ীর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং কোন গাড়ী এই রাস্তায় অপেক্ষা করিতে বা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। মালবাহী, ধীরগামী গাড়ীসমূহ নিম্নতল দ্বারা যাতায়াত করিবে। এইরূপে জিনিষপত্র গৃহের

ভিত্তি সংলগ্ন দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। লণ্ডন ভূগর্ভস্থ রেলপথে মাত্র রেলগাড়ী যাতায়াত করিতে পারে, লোক চলাচল বা সাধারণ যান-বাহন চলাচলের বন্দোবস্ত নাই। এই দ্বিতল রাস্তায় সমস্ত সুবিধাই নিম্নতলে বর্ত্তমান থাকিবে। অধিকন্তু বাতাস ও আলো প্রবেশের সুব্যবস্থা করা হইতেছে। জলের পাইপ, গ্যাসের পাইপ প্রভৃতি নিম্নতলের রাস্তার উভয় পার্শ্বে সংস্থাপিত হইবে এবং যাহাতে উপরের রাস্তার গাড়ী চলাচলের চাপ উহাদের গায়ে লাগিয়া কোনরূপ জখম না হয়, তাহার দিকেও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে। সার সিডনি লো মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি প্রত্যেক বড় বড় সহরে দ্বিতল রাস্তা অবশ্য প্রয়োজনীয়রূপে গণ্য হইবে; নতুবা ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল মোটরগাড়ীর চলাচলের জন্য কোন রাস্তাই পর্য্যাপ্তরূপ বিস্তৃত বলিয়া অনুমিত হইবে না।

নব তুরস্কে অনবগুণ্ঠিতা রমণী

সার পার্শিভেল ফিলিপের অভিমত

একদিন ছিল, যখন তুরস্কের নারী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া অসূর্য্যম্পশ্যা শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিত; কিন্তু কালচক্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমানে অবগুণ্ঠন যেন তুরস্ক হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। নবীন তুরস্কের জন্মদাতা মুস্তাফা কামাল পাশার বিচক্ষণতার প্রথম এবং জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুরস্কের নারী স্বাধীনতা, কিন্তু তিনি এই অবগুণ্ঠন উন্মোচনের জন্য কোন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই; আজও তুরস্কে অবগুণ্ঠন ব্যবহার আইনের চক্ষে দোষাবহ নহে; কিন্তু কামালপাশা নারীদের বিচার শক্তির উপর অধিকতর নির্ভর করিয়া এই যুগান্তর আনয়নে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বলেন, অবগুণ্ঠন দোষাবহ নহে; কিন্তু যে পোষাক নারীর সৌন্দর্য্যকে, নারীর মহত্ত্বকে আবৃত করে, সে পোষাক নারীর কখনই পরিধান করা সমীচীন নহে। এই যুক্তির বলে আজ কনষ্টাণ্টিনোপলে ৪০,০০০ হাজার তুরস্ক রমণী শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত। পথে হাটে বাজারে অনবগুণ্ঠিতা রমণী অবলীলায় চলাফেরা করিতেছে। দেশে নবীন প্রাণের, নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐ মহতী বুদ্ধি বলেই আজ কামালপাশা তুরস্কে নব বর্ণমালার প্রবর্ত্তক এবং একটি জাতি তাহার পুরাতন রীতি-পদ্ধতি পরিহার করিয়া সভ্য জগতের সঙ্গে দ্রুত পাদবিক্ষেপে উন্নতি-শিখরে উঠিতে চলিয়াছে।

এক সঙ্গে বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

সার রবার্ট ডোনাল্ড বেতার বার্ত্তাজগতে এক নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের দ্বারা বেতারের সাহায্যে এক সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান (Telegraph) এবং কথা বলা (Telephone) একসঙ্গে চলিবে। এই পরীক্ষার পর লণ্ডনের 'বীম' বেতার যন্ত্র প্রণালীকে একসঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান এবং কথাবলার কার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছে। এই আবিষ্কারে অদূর ভবিষ্যতে বেতার জগতে যুগান্তের উপস্থিত হইবে।

বৃটিশ ফিল্মের বিক্রয়

বর্ত্তমানে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বৃটিশ ফিল্মের বিক্রয়ের মাত্রা বেশ বাড়িয়া চলিয়াছে। জার্ম্মাণি ১৯২৭ সনে মাত্র ২ খানা ফিল্ম কিনিয়াছিল কিন্তু ১৯২৮ সনে ১৫ খানা ক্রয় করিয়াছে। ফ্রান্সও ১৯২৮ সনে ২৩ খানা কিনিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সিনেমাসমূহ একটি বৃহৎ সিনেমা কোম্পানীর সমস্ত ফিল্ম ক্রয় করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকার আধা-সরকারী খবরে প্রকাশ আমেরিকাও ৩৭ খানা বৃটিশ ফিল্ম ক্রয় করিয়াছে।

শিক্ষার জন্য দান

জার্সি প্রদেশের টমাস বেঞ্জামিন ফ্রেডারিক ডেভিস নামক এক ব্যক্তি বিগত মহাযুদ্ধে নিহত তাঁহার পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থ গভর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০,০০০ পাউণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালকগণের শিক্ষা-নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব্যাঙ্কসমূহ

যে ১২টি ব্যাঙ্ক পৃথিবীর মধ্যে অর্থ সম্পদে শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে ৬টী বৃটিশ, ৪টী আমেরিকান এবং ২টি কানেডিয়ান,

নিম্নে প্রত্যেকের নাম ও আমানতের সংখ্যা প্রদত্ত হইল :—

নাম		আমানতের পরিমাণ
মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লণ্ডন		৩৬৪,৩৭৯,৭২৩ পাউণ্ড
লয়েডস্ ,, ,,		৩৪৭,৬৪৮,০৬০ ,,
বার্কলেস্ ,, ,,		৩০৯,৮৭২,৮৯৯ ,,
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ,,		২৭৪,৪৯৫,১৪৬ ,,
ন্যাশানাল প্রোভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক লণ্ডন		২৬৬,২৯২,১৫৬ ,,
ন্যাশানাল সিটি ,, ,,	নিউইয়র্ক	২৫৫,০০৮,৩৯৩ ,,
ফেডারেল রিজার্ভ ,, ,,		১৯৯,১৩০,৪০০ ,,
চেজ ন্যাশানাল ,, ,,		১৫৪,৪৬৭,৮৯৮ ,,
রয়েল ব্যাঙ্ক অব কানাডা	মন্ট্রিল	১৪৪,৫২৭,২১৮ ,,
গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং	নিউইয়র্ক	১৪৪,০০৫,৮৩৪ ,,
ব্যাঙ্ক অব্ মন্ট্রিল	মন্ট্রিল	১৪১,৮৩৫,৯৩৯ ,,
ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড	লণ্ডন	১৩৪,৮৩৭,৮৬৯ ,,

ছয় পক্ষ বিশিষ্ট আকাশযান

স্থল পথে মোটরকারে ভ্রমণ অত্যন্ত আরামদায়ক, এবং বায়ু সেবন বিশেষ সুখসাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে ছয় পক্ষ বিশিষ্ট আকাশযানের সাহায্যে আরোহণীর (lift) মত শূন্য-মার্গে উঠিয়া কিছুক্ষণ নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া পুনরায় গৃহের ছাদে কিম্বা বাগানের মধ্যে অবতরণ করা সম্ভবপর হইবে। এই ক্ষুদ্র যন্ত্র যে কোন চালক অনায়াসে চালাইতে পারিবে এবং মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে গৃহস্বামী বায়ুসেবনের জন্য এইরূপ আকাশযান গৃহে রক্ষা করিতে পারিবে।

লণ্ডনের বিস্তার

লণ্ডন নগর এত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে পৃথিবীর অন্য কোন সহর এত বিস্তার লাভ করে নাই। বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে লণ্ডন সহর সহরতলীতেও প্রায় ২৫ মাইল বিস্তৃত হইয়াছে। ১৯০২ সালে জন সংখ্যা ৬,৫০০,০০০ ছিল ; বর্ত্তমান এই সংখ্যা ৮,০০০,০০০ জনে উঠিয়াছে—সমস্ত স্কটলণ্ডের জন-সংখ্যার দ্বিগুণ। বৃহত্তর লণ্ডনের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর গড়িয়া উঠিতেছে। এত বড় সহরে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে অল্প সময়ে যাতায়াতের জন্য টিউব রেলওয়ে ও অমনিবাসের বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিনা তারে উত্তাপ

প্যারিশ সহরস্থ আইফেল টাওয়ারকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র প্যারিশ সহরে বিনা তারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বিস্তার করতঃ গৃহাদিতে শীত নিবারণের জন্য উত্তাপ প্রদান করিবার কল্পনা চলিতেছে। বর্ত্তমানে গৃহে বিনাতারে উত্তাপ প্রদানের কার্য্য পরীক্ষা স্বরূপ চলিতেছে, তবে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বিনা তারে উত্তাপ প্রদান কার্য্য বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব এবং ক্রমে এই প্রক্রিয়া প্রত্যেক সহরেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

গ্রেট্‌বৃটেনের কয়েকটি বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের পরিচয়

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে দীনদুঃখীর জন্য যে কত রকমের প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান, তাহার আভাস্ পাওয়া যাইবে। কুইন্স হাসপাতাল লণ্ডন—এইখানে কেবল বালকবালিকা ও শিশুগণকে চিকিৎসা করা হয়। ইহার বাৎসরিক ব্যয় ৪০,০০০ পাউণ্ড। কুইন মেরি হাসপাতাল, ইষ্ট এণ্ড—ইহা জনাকীর্ণ জেলায় অবস্থিত। বহু দরিদ্র নরনারী এই হাসপাতালের সাহায্যে রোগ মুক্ত হয়। ক্যান্সার হাসপাতাল লণ্ডন—ক্যান্সার চিকিৎসাই এই হাসপাতালের বিশেষত্ব।

রয়েল অরফেনেজ, উলভার হ্যামটন—এইখানে ৭-১২ বৎসর বয়স্ক অনাথ বালকবালিকাগণকে আশ্রয় ও শিক্ষা দান করা হয়। প্রায় ৩৩০টি অনাথকে ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিপালন করা হয়।

শ্যাফ্‌টেবেরী হোম ও আরেথুজা ট্রেনিং শিপ—বালক-বালিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ; এইখানে বালকবালিকাগণের শিক্ষার সমস্ত ভার গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেকের বার্ষিক খরচ ৩৬—৮৫ পাউণ্ড।

ন্যাসানাল চিল্‌ড্রেনস্ হোম এণ্ড অরফেনেজ—এই প্রতিষ্ঠান ইহার ৩০টি শাখা কার্য্যালয় সহ প্রায় ৪০০০ অনাথ বালকবালিকাকে আশ্রয় দান করিয়াছে।

চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড ওয়েফ্স্ এণ্ড ষ্ট্রেইস্ সোসাইটিতেও ৪৫০০ বালকবালিকা খাদ্য ও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

সোসাইটি অব লেডিস্ ইন্ রিডিউস্‌ড্ সারকামষ্টেন্সেস্—এই প্রীতিষ্ঠান রুগ্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বৃদ্ধ ও অনাথ নারীদিগকে ঘরভাড়া, খাদ্য, ঔষধ, পরিধেয় প্রভৃতি প্রদান করে।

ফীল্ড লেন ইনষ্টিটিউট্—এই প্রতিষ্ঠান, দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবার ও পিতামাতাকে সাহায্য করিয়া থাকে।

শ্যাফ্‌টুবেরী ইনষ্টিটিউট্—এই প্রতিষ্ঠান কর্ম্মহীন নারী ও বালিকাদিগকে আশ্রয় দান করে। গত বৎসর ইহা তেত্রিস হাজার নয় শত নারীকে আশ্রয় দান করিয়াছিল।

ন্যাসানাল ইনষ্টিটিউট—অন্ধগণকে সাহায্য করার জন্য প্রতিষ্ঠিত।

রয়েল এসোসিয়েসন ইন এইড্ অব দি ডেফ্ এণ্ড ডাম্—এই প্রতিষ্ঠান মুক-বধিরকে শিক্ষাদান করে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার খরচ

আলিপুর চিড়িয়াখানা পৃথিবীর বৃহত্তম চিড়িয়াখানার মধ্যে অন্যতম।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রায় ২০০০ প্রাণী আছে; তাহাদের খাওয়া খরচ প্রতিমাসে প্রায় ৪০০০ টাকা। সমস্ত পূর্ণ বয়স্ক প্রাণীকে বুধবার উপবাসী রাখা হয় এবং সর্প জাতীয় প্রাণী কেবলমাত্র সপ্তাহে একবার খাবার পায়। বর্ত্তমানে চিড়িয়াখানায় ৩৫০টি স্তন্যপায়ী জন্তু, ১৪০০ পক্ষী, এবং ২০০০ সরীসৃপ আছে।

দৈনিক খাদ্য

মাংসভোজী প্রাণীদের মধ্যে সিংহ-ব্যাঘ্রকে ১০ সের গোমাংস দেওয়া হয়। চিতাবাঘ ৪ সের হইতে ৬ সের মাংস খায়। বাঘের বাচ্চাগুলিকে প্রথমে দুধ, পরে মুরগীর যুষ ও অবশেষে ছাগমাংস খাইতে দেওয়া হয়। হস্তিদ্বয়কে ১৮ সের মিশ্রিত খাদ্যশস্য, ২ মণ খড় ও ২ গাড়ী কাঁচা পাতা খাইতে দেওয়া হয়। ২টি গণ্ডার (প্রত্যেকটির মূল্য ৫০,০০০ হাজার টাকা) ৫০ সের ছাতু ও ভিজান ছোলা, কাঁচা পাতা, খড়, গুড় ও ভাত খায়। জীরাফ চূর্ণ শস্য

আহার করিয়া থাকে। ভল্লুকদিগকে বহু প্রকারের খাদ্য দেওয়া হয়—কোন ভল্লুক ভাত, কেহ রুটি, দুধ ও পাউরুটি আহার করে। বানর ও বনমানুষই সর্ব্বাপেক্ষা খাদ্য বিলাসী; তাহারা মানুষের মত চা, বিস্কুট, দুধ, ডিম, ভাত ফল প্রভৃতি আহার করে। সর্পদিগকে সপ্তাহে একবার খাইতে দেওয়া হয়। সর্পভুক সর্পকে জলবাসীসর্প ও ঘাসের ভিতরে যে সমস্ত সর্প বাস করে তাহাই খাইতে দেওয়া হয়। অজগর জাতীয় সর্প, মুরগী হাঁস প্রভৃতি খায়। কোন সর্প ব্যাঙ্ আরশোলা প্রভৃতিও খাইয়া থাকে। কুমীরেরা সাধারণতঃ হাঁস খায়, মধ্যে মধ্যে বড় মাংসখণ্ডও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। পাখীরা তিন জাতিতে বিভক্ত কতকগুলি মাংস খায়, কতকগুলি মৎস্যভোজী এবং কতকগুলি নিরামিশাষী; প্রত্যেককে তাহার রুচি অনুযায়ী আহার প্রদত্ত হয়।

মোটামুটি দৈনিক খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ

প্রত্যহ ৫ মণ গোমাংস, ৫।৬ মণ খাদ্যশস্য, ১৫ সের মৎস্য, একমণের উপর চূর্ণশস্য, দেড় মণ খড় এবং এক মণের কিছু উপর ছাতু ও তিন মণ চূর্ণখাদ্য প্রয়োজন হয়। এই খাদ্য একজন ঠিকাদার সরবরাহ করে। মাঝে মাঝে অক্ষম অশ্বগণকে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ ৫।৬টি করিয়া অশ্ব প্রতি মাসে আসে। ইহাদিগকে নিহত করিয়া মাংসভোজী পশুদিগকে দেওয়া হয় ও তাহারা এই খাদ্য পরিবর্ত্তন আনন্দের সহিত গ্রহণ করে। ইংলিশম্যান

বিচিত্র ঘড়ি

লণ্ডন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পোপ ৫ম সিক্সটাসের প্রদত্ত একটি বিচিত্র ঘড়ি রক্ষিত আছে। এই ঘড়িটি ত্রিতলের সমান উচ্চ; ইহাতে সময় নির্ণয় ব্যতিরেকে উপবাসের দিন, রাশি-চক্র এবং চন্দ্রসূর্য্যের গতি নির্ণীত হয়। ঘড়িটির উচ্চভাগের একাংশে দিবসের ও সপ্তাহের দেবতাগণ ক্রমান্বয়ে পরিভ্রমণ করে, তাহার উপরের স্তরে যিশুকে কোলে লইয়া উপবিষ্ট মেরীকে দেবদূতগণ প্রণাম করিয়া ঘুরিতে থাকে। তদুর্দ্ধস্তরে ৪ যুগের মানবগণ ঘন্টা বাজায়; সর্ব্বোচ্চ স্তরে মৃত্যুর প্রতিমূর্ত্তি উপস্থিত হইয়া ঘন্টাধ্বনি করে। গম্বুজের উপরে একটি মোরগ

লণ্ডনের বিদেশী বাসিন্দা

লণ্ডনে পররাষ্ট্র প্রতিনিধি

প্রত্যেক নির্ব্বাচনের পর ইংলণ্ডে একজন করিয়া মন্ত্রী পররাষ্ট্র সচিবরূপে নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া স্বাধীন সভ্য দেশের প্রথা এই যে শান্তির সময়ে প্রত্যেক দেশে একজন করিয়া রাজদূত রাখা হয়। এইরূপে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনেও ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের দূতেরা ও তাঁহাদের অন্যান্য কর্ম্মচারী অবস্থান করিতেছেন। লণ্ডনে ১০ জন বিদেশী রাজপ্রতিনিধি (ambassador), ৪৯ জন (ministers plenipotentiary), অনেক envoys extraordinary, charges d'affairs, তাঁহাদের চ্যান্সেলার, সেক্রেটারি ও সহকারী ইত্যাদির সহিত বাস করেন। ইঁহারা যেখানে বাস করেন সেস্থান স্বতন্ত্র নিয়ম কানুনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানকার লোকেরা ইংলণ্ডে বাস করিলেও ইংরেজের আইনের অধীন নন। প্রত্যেক দূতাবাস যেন দূতের স্বদেশের এক টুকরা মাত্র। সেখানে লোকে অপরাধ করিলে বৃটিশ আইন-আদালতের সাহায্যে তাঁহাদের শাস্তি দেওয়া চলে না।

বিদেশী দূতদের সম্মান খুব বেশী। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দেশের রাজা, সম্রাট্ বা প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি রূপে বিবেচনা করা হয়। যখন তাঁহারা কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তখন রাজা ও রাজপরিবারের লোকদের পরেই তাঁহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। ক্যান্টারবারির আর্কবিশপ ও লর্ড হাই চ্যান্সেলার বিশেষ সম্মানের পাত্র হইলেও তাঁহাদের পশ্চাতে বসেন।

তাঁহাদের সহিত চিঠিপত্র লিখিতে হইলে বা কথাবার্ত্তা চালাইতে হইলেও কতকগুলি বিশেষ আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। সম্বোধনে ইওর এক্সসিলেন্সি (Your Excellency) বলা দস্তুর। তার চিঠির শেষভাগে পাঠ এইরূপ হইবে

I have the honour to be,
My Lord,
Your Excellency's Most Obedient and Humble Servant.

ইঁহাদের সেক্রেটারী প্রভৃতিকে অবশ্য এতখানি সমীহ করিয়া চলিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দূতদের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাধিতে পারে।

পররাষ্ট্র বিভাগ কি কাজ করে ?

বনেদী বংশ, ধন আর উচ্চ-শিক্ষার সহিত অন্যান্য গুণাবলি থাকিলে পররাষ্ট্র বিভাগে প্রবেশ করা যায়। বড় ঘরের যে সব ছেলে এইদিকে শিক্ষা লাভ করেন তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ও কর্ত্তব্য সাধন সম্পর্কে অনেক খরচ করিতে হয়। তাঁহারা মাহিনা হিসাবে যাহা পান তাহা অনেক সময় যথেষ্ট নহে। কিন্তু তাঁহারা শুধু মাহিনার লোভে এই কাজে প্রবৃত্ত হন না। এই কাজে প্রচুর সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে। বিদেশে রাজা অথবা প্রেসিডেন্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বিদেশী দূতের আদর, আপ্যায়ন ও সম্মান করিতে বাধ্য থাকে।

পররাষ্ট্র বিভাগের কাজ সমস্ত জগৎ জুড়িয়া চলিতেছে, বলা যায়। সমগ্র পৃথিবীটাকে ফরেন্ অফিস্ কাজের সুবিধার জন্য কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়া লয় ও তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করে।

ফরেন্ অফিস্‌কে সব দিকে চোখ রাখিতে হয়, সব রকম জায়গায় লোক পাঠাইতে হয়। ফরেন্ অফিসের কাজ সহজ নয়, বিশেষতঃ দুই রাষ্ট্রের ভিতর যখন মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। কখনো কখনো দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পররাষ্ট্রদূতকে নানারূপ লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হয়। ইহা নিয়ম বিরুদ্ধ হইলেও

অপমান করে। তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতে হয় কিসে নিজেদের স্বার্থ বজায় থাকে। পক্ষান্তরে কিসে অন্য দেশের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা বা বৃদ্ধি পায় সেজন্যও তাঁহাকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। পররাষ্ট্র বিভাগের অধিকাংশ কাজই লোকচক্ষুর অগোচরে হয়। নিজেদের ছাপাখানা ও কাগজ থাকিলেও খবর প্রকাশ করার চেয়ে না প্রকাশ করার দিকেই বেশী দৃষ্টি থাকে।

পররাষ্ট্র দূতের কোন্ কোন্ গুণ থাকা চাই ?

ইংরাজীতে যাহাকে ডিপ্লমেসি বলে তাহার জন্য কোন লোকের যে সব গুণ থাকা চাই, তন্মধ্যে নিমন্ত্রণ রক্ষা ও নিমন্ত্রণ করার শক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিক পক্ষে লোকের সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিবার ক্ষমতা না থাকিলে পররাষ্ট্র দূত কখনও প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। ইয়োরোপ, আমেরিকা ও প্রাচ্যেও কোন কোন দেশে আহারের নিমন্ত্রণ করা অথবা রক্ষা করা নানাবিধ লোকের সহিত মিশিবার প্রধান উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই জন্য দূতের গৃহে রন্ধন ও পরিবেশন ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আবশ্যক হইলে দূতকে দিনের পর দিন পার্টি ইত্যাদিতে কাটাইতে হইতে পারে অথবা নিজ বাড়ীতেই নানা রকম লোককে খাওয়াইবার ও আদর আপ্যায়ন করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইতে পারে। ইহাতে পশ্চাৎপদ্ হইলে তাঁহার চলিবে না।

এইজন্য সাধারণতঃ দূতদিগের আবাস খুব জমকালো রকমের হইয়া থাকে। বৈদেশিক রাজপ্রতিনিধির আবাসের মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বে ৫০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১ লাখ পাউণ্ড (৭½ লাখ টাকা লইতে ১৫ লাখ টাকা) পর্য্যন্ত হইত।

লণ্ডনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধির আবাস

প্রকাণ্ড ফরাসী দূতাবাস লণ্ডনে নাইট্‌স্‌ব্রিজ নামক স্থানে অবস্থিত। ওয়েষ্ট এণ্ডের চমৎকার বাড়ীটি, চেশাম ভবন, রুশিয়ার; কার্লটন হাউস্ টেরেসের জার্ম্মাণ আবাস ইয়োরোপের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৬২ সনে প্রথম জাপানী দূত লণ্ডনে পদার্পণ করেন। আর আজ গ্রভ্‌নার স্কোয়ারে তাঁহাদের দূতাবাসটি প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতেছে।

লণ্ডনের বিদেশী মহল্লা

লণ্ডনে মাত্র বিদেশী পল্লীগুলি দেখিলে মনে হইবে যে লণ্ডনের বিদেশীর সংখ্যা বুঝি খাঁটী লণ্ডনবাসীর চেয়ে বেশী। কিন্তু এই ধারণা অমূলক। কলিকাতা বা শিকাগোর মত লণ্ডনে বিদেশীর সংখ্যা স্বদেশীয়দের চেয়ে বেশী নয়। লণ্ডন-বাসীর শতকরা ৯৬ জন বৃটিশ প্রজা এবং শতকরা ৯৩ জন বৃটনে জাত বাপমার সন্তান।

তথাপি লণ্ডনের লোকবল এরূপ বিপুল যে তথাকার মোট বিদেশীর সংখ্যা কম নয়। প্রায় প্রত্যেক জাতের লোককে লণ্ডনে দেখা যাইবে। সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ইহুদীরা (বৃটিশ ও অবৃটিশ ধরিয়া)—১,৮০,০০০ জন, আর সব চেয়ে কম বোধ হয় কোরিয়ান্‌রা—৭১৮ জন। এত জাতের লোকে লণ্ডনে বাস করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। লণ্ডনে কেহ ইচ্ছা করিলে গ্রীক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাজিলিয়ান রেস্তোরাঁতে পর্য্যন্ত আহার করিতে সমর্থ হয়।

লণ্ডন কাহাদের বাসস্থান ?

প্রশ্ন হইতে পারে বিদেশীরা কি জন্য লণ্ডনে আসে ? তাহারা অনেক উদ্দেশ্যে লণ্ডনে আসিয়া বসবাস করে। অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য ও ধর্ম্ম বা রাজনীতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভের জন্যও আসে। লোম্বার্ড ষ্ট্রীটের নাম ধনবিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পরিচিত। বৃটিশ বাণিজ্যের এক বড় আড্ডা হইল লোম্বার্ড ষ্ট্রীট, যেমন কলিকাতায় আমাদের ক্লাইভ ষ্ট্রীট। লোম্বার্ডেরা বিলাতে বর্ত্তমান ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনে অগ্রগামী হন।

সম্প্রতি লণ্ডন বিদেশীদের প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হইয়াছে। যাহারা এখানে আছে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে না, কিন্তু তাহাদিগকে ভালভাবে থাকিতে ও পুলিশের

নিকট গিয়া নিজেদের খবর দিতে হয়। যে সব বিদেশী লণ্ডনে ২০ বৎসর বাস করিয়াছে তাহারা লণ্ডন ছাড়িয়া যাইবার তিন মাসের মধ্যে আবার ফিরিয়া না আসিলে তাহাদের পুনঃপ্রবেশ মুস্কিলের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। নবাগতদের যদি কোন প্রকারে বৃটিশ মজুরদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয় না। ছাত্র হিসাবে, দেশ বেড়াইতে অথবা বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য আসিলে কেবল বিদেশীয় কাহাকেও বাধা দেওয়া হয় না। ফরাসী রাঁধুনী হোক, আর জার্ম্মাণ বা সুইস ওয়েটার হোক্, কাহারও পক্ষে এক্ষণে লণ্ডনে কাজ পাওয়া সহজ নহে। কারণ, ইহাদিগকে নিযুক্ত করার অর্থ অতগুলি দেশী লোককে বেকারের দলে ঠেলিয়া দেওয়া।

এশিয়াবাসীর বাসস্থান

এশিয়াবাসীর স্থান হইতেছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ডক রোডে। ইহা অনেক কালের। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃটেনের সহিত প্রাচ্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করে তখন ইহা স্থাপিত হয়। ভারতীয় লস্করদের জন্য ঐ রাস্তায় একটি সুন্দর বাড়ী আছে। এই বাড়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

চীনাদের আড্ডা

চীনারা থাকে প্রধানতঃ দুইটি রাস্তায়—পেনীফীল্ডস্ ও লাইমহাউস্ কজওয়ে। আজ অবশ্য লণ্ডনের রাস্তায় চীনার বেণী বা প্রাচ্য পোষাক দেখা যাইবে না, সে পূরা সাহেব বনিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার আচার ব্যবহার, বিশেষতঃ খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ বদলায় নাই। ১৫।২০টা চীনা দোকানে সকল রকম চীনা খাবার পাওয়া যায়। শুক্‌না মাছ, তরকারী, ওষুধের পিল, চা, মিষ্টান্ন—সমস্তের সমাবেশ এখানে দেখা যাইবে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় অনেক চীনা নাবিক লণ্ডনে আসিয়াছিল। তাহাদের অনেকে ফিরিয়া গিয়াছে। যাহারা রহিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ ইংরেজ রমণীদের বিবাহ করিয়া এইখানেই বসবাস করিতেছে। চীনাপাড়ায় জুয়াখেলা, আফিং খাওয়া ইত্যাদি অবৈধ কাজও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লণ্ডনে চীনাদের সংখ্যা হাজার খানেক হইবে।

ইহুদী মহল্লায়

লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিদেশী মহল্লা ইহুদীদের। ইহাদিগকে ইষ্ট এণ্ডে দেখা যাইবে। বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্রিক লেনের চারিদিকে ইহুদী পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের লোক সংখ্যা গড়ে ৩০ হাজারের কাছাকাছি। অধিকাংশই দরজী বা ঐ রকম কিছু সামান্য কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। রুশিয়াতে জারের অত্যাচার আরম্ভ হইবার পর মাসের পর মাস হাজার হাজার ইহুদী রুশিয়া হইতে, পোল্যাণ্ড হইতে ও বাল্‌টিক প্রদেশ হইতে আসিতে লাগিল। এই ইহুদীরা আসিয়া তাহাদের খৃষ্টান ভাইদের অত্যন্ত কাবু করিয়া ফেলিল। ইহারা অত্যন্ত নীচু হারে মজুরি লইয়া অনেক বেশী সময় খাটিতে লাগিল। শুধু তাই নয়। ইহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী উন্নত নয়। এক বাড়ীতে অনেকে একত্র বাস করে। নানা কারণে ইহুদী সমস্যা প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রুশ ইহুদীদের আসা থামিয়া যাওয়ায় ও ইহুদীর ছেলেমেয়েরা স্কুলে শিক্ষালাভের পর ইংরেজ বনিয়া যাওয়ায় সমস্যার কতকটা সমাধান হইয়াছে।

লণ্ডনে ফরাসী

বিগত দুই বৎসর ধরিয়া সোহো ফরাসীদের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য দেশের লোকেরা সোহোতে বহু পরিমাণে আসিয়াছে বটে, কিন্তু উহার ফরাসীত্ব এখনও অটুট রহিয়াছে। এখানে বহু ইতালিয়ানকে দেখা যাইবে। রুশ, গ্রীক, বুলগেরিয়ান্ এমন কি বৃটিশও আছে। রেস্তোরাঁও বিভিন্ন দেশের লোকেরা চালাইতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই ফ্রান্সের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। সোহো স্কোয়ার ও পিকাডেলি সার্কাসের মধ্যে রাস্তাগুলিতে পা বাড়াইলেই মনে হইবে যেন ফরাসী দেশে আসিলাম। "তাঁ" ও "পেতি জুর্ণাল" নামক ফরাসী কাগজদ্বয় এখানে নিয়মিতভাবে পঠিত হয়।

বিভিন্ন প্রকারের ফরাসী বেপারী লণ্ডনে আপনাদের দোকান ইত্যাদি খুলিয়া বসিয়াছে। অনেকগুলি ইংরেজের হাতে যেমন চলিয়া গিয়াছে, তেমনি প্রতি বৎসর নূতন নূতন ফরাসী দোকানও খোলা হইতেছে। আজকাল লণ্ডনে আসিয়া ব্যবসা চালাইবার অনুমতি পাওয়া দুষ্কর বলিয়া ফরাসী পোষাক নির্ম্মাতারা এক চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছে। তাহারা লণ্ডনে আসিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অনেক টাকার অর্ডার লইয়া গিয়া প্যারিস হইতে সব কাপড় চোপড় পাঠাইয়া দেয়। লোক সংখ্যায় ইহুদীদের নীচেই ফরাসীদের স্থান।

ইতালিয়ান নরনারী

লণ্ডনে ইতালিয়ান্ নরনারীর সংখ্যা কম নহে। প্রায় ফরাসীদের সমান। কারিগর ও মিস্ত্রীর কাজ করিয়াই অধিকাংশ লোক জীবন যাপন করে। বিশেষ কতকগুলি ব্যবসা ইহারা একেবারে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। যেমন, এক ধরণের ফুটপাথ ইত্যাদি তৈরী করা। যাহারা ব্যালেট নৃত্য করে তাহাদিগকে বিশেষ এক ধরণের জুতা পায়ে দিতে হয়। এই জুতা ইতালিয়ান্‌রা ভাল তৈরী করে। লণ্ডনে ইতালিয়ান্ রেঁস্তোরার সংখ্যা অনেক—তন্মধ্যে গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড ষ্ট্রীটে অবস্থিত পাগানির রেঁস্তোরা ইতিহাস-বিখ্যাত। এখানে বহু বিখ্যাত গায়ক ও কলাবিদের মজ্‌লিস্ বসিয়া থাকে। গরীব ইতালিয়ান নরনারী জাফরন হিলের চারিদিকে ছড়াইয়া বসবাস করিতেছে। ক্লার্কেন-ওয়েলের আয়ারষ্ট্রীটে অবস্থিত সেণ্ট পীটারের গির্জ্জায় ইতালিয়ান নরনারী ভজনা করিয়া থাকে।

জার্ম্মাণ লণ্ডন

যুদ্ধের পর হইতে "জার্ম্মাণ লণ্ডনে" ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধের আগে ৩০ হাজার জার্ম্মাণ লণ্ডনে বাস করিত। জার্ম্মাণ যুবকেরা দলে দলে পড়িতে অথবা ব্যবসা শিক্ষা করিতে লণ্ডনে আসিত। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ইহারা বিনা পয়সায় কাজ করিয়া দিত। জার্ম্মাণ ও জার্ম্মাণ-সুইস্ ওয়েটাররা হোটেলে হোটেলে সর্দ্দারী করিত। জার্ম্মাণ ব্যাণ্ড রাস্তায় বাজান হইত। এক কথায় আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে লণ্ডনে জার্ম্মাণদের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর এই সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে। এক্ষণে লণ্ডনে ১০ হাজারের বেশী জার্ম্মাণ বাস করে না। তাহাদের পূর্ব্বেকার সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ বাড়ীঘর যুদ্ধের সময় সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। তবে জার্ম্মাণ ব্যবসাদাররা আবার ধীরে ধীরে মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে, ইহা দেখা যাইবে।

রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতের আশ্রয়ভূমি

সমগ্র পৃথিবীতে রাজনৈতিক নির্ব্বাসিতের আশ্রয় ও স্বাধীনতার ভূমি বলিয়া লণ্ডনের খুব নাম আছে। লণ্ডনে কত রাজনৈতিক কারণে নির্ব্বাসিত বিদেশী ব্যক্তি যে স্থান পাইয়া বাঁচিয়াছে, বলা যায় না। কোন ব্যক্তিকে হয়ত অর্দ্ধেক ইয়োরোপের পুলিশ অনুসরণ করিয়াছে, লণ্ডনে পদার্পন করিবামাত্র তাঁহার আর ভাবনা থাকিত না। তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতেন।

বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানবিৎ কার্ল মার্কস জার্ম্মাণি হইতে বিতাড়িত হইবার পর লণ্ডনের ক্যাম্বারওয়েলে আসিয়া বাস করেন। লণ্ডনের বাড়ীওয়ালী তাহার পাওনার জন্য মার্কসের সামান্য সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল বিক্রয় করিয়া ভাড়া আদায় করিয়া লয়। তখন তিনি সোহোতে, ১৮নং ডীন ষ্ট্রীটে, উঠিয়া যান ও একতলা ভাড়া লইয়া স্ত্রীপুত্রদের লইয়া বাস করিতে থাকেন। এইখানেই তিনি তাঁহার দল গঠন করেন।

মোসাফের্

জাতীয় সংবাদ

কাঙ্গালী ভোজন

বিগত ১৭ই চৈত্র কলুটোলা চীনাপাড়া শীল পরিবারের মদনমোহনজির দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রায় ২০০০ কাঙ্গালীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল। সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন শীল, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন শীল, শ্রীযুক্ত বনমালী শীল এবং শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র শীল ও পল্লীর অন্যান্য উৎসাহী যুবক উক্ত কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং যত্নসহকারে খাদ্যাদি পরিবেশিত হইয়াছিল। ওয়ার্ড কমিশনার শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর এম্ এ, বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাস বি এ মহাশয় আমাদিগকে জানাইতেছেন যে পাবনা সুবর্ণবণিক্ সমাজের শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দে মহাশয় গত ১১ই চৈত্র সোমবার রাত্রিতে পুণ্য হোলি উৎসবের পবিত্র সময়ে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। পাবনা সুবর্ণবণিক্ সমাজকে কলিকাতার তথা বাঙ্গালার সুবর্ণবণিক্ সমাজের সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন রাধাবল্লভ বাবু। ইদানীং তিনি পক্ষাঘাতে অবশ অঙ্গ হইয়া উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণবণিক্ সমাজকে উন্নত করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল আন্তরিক ও অদম্য। নিখিল বাঙ্গালা সুবর্ণবণিক্ সমাজের প্রথম কলিকাতার অধিবেশনে তিনি বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের শক্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাধাবল্লভবাবু একজন সুধী সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার অনেক প্রবন্ধের সহিত 'সুবর্ণবণিক্ সমাচারের' পাঠকবর্গ পরিচিত আছেন। তাঁহার যৌবনকালের অনেক প্রবন্ধ তদানীন্তন "বান্ধবে" প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত বহু পুস্তিকা সুধী সমাজে আদৃত হইয়াছিল। যুবক সম্প্রদায়কে তিনি অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন তাঁহার সহপাঠী।

তাঁহার মৃত্যুতে পাবনা সুবর্ণবণিক্ সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বিলাত যাত্রা

বহুবাজার শীল বংশের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীল মহাশয় লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র শীল মহাশয়ের পত্নী

তাঁহার পত্নী স্বামীর সেবা শুশ্রূষার্থ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি উভয়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দাঁইহাট সুবর্ণবণিক্ সমিতির চতুর্থ অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩৩৫ সাল

ইং ৩১শে মার্চ্চ ১৯২৯ সাল সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা

স্থান—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র বড়ালের পূজার দালান

উপস্থিত স্বজাতিবৃন্দের নাম :—

১। শ্রীদেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, ২। শ্রীবামনচন্দ্র দাস,
৩। শ্রীঅমরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, ৪। শ্রীচন্দ্রভূষণ নাগ,
৫। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সেন, ৬। শ্রীব্যোমকেশ বড়াল,
৭। শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র, ৮। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বড়াল,
৯। শ্রীসত্যনারায়ণ চন্দ্র, ১০। শ্রীকালীপদ ধর,
১১। শ্রীশিবদাস ধর, ১২। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ নাথ,
১৩। শ্রীললিতমোহন ধর, ১৪। শ্রীশিবদাস দত্ত,
১৫। শ্রীঅবনীমোহন নাথ

গত সভার মন্তব্য পাঠ ও বলবৎ করা হইল।

১। প্রথম অধিবেশনে যে সকল সভ্যের অঙ্গীকার-পত্রে সহি নাই তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ডাকাইয়া সহি করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

২। পূর্ব্ব সভার মন্তব্য অনুযায়ী কাটোয়া সমাজকে জানাইয়া তথায় একটি অধিবেশন করা হইয়াছে এবং তাঁহারাও আমাদিগের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আশাকরি তাঁহারা এ বিষয়ে যতদূর কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন তাহা জানাইয়া ভবিষ্যতে আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

৩। পণ্ডুলী, আমডাঙ্গা, ঘোড়ানাল ও পাঁচবেড়িয়া গ্রামস্থ স্বজাতিগণকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করা হউক।

৩। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ নাথ মহাশয়কে এবিষয়ে পত্রাদি লিখিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তথায় একটি অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হউক।

৪। পণপ্রথা নিবারণকল্পে স্বজাতিগণকে একটা প্রবন্ধ লেখার জন্য আহ্বান করা হইতেছে, অত্র সমাজ হইতে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাহাকে একটা "রাধাগোবিন্দ চন্দ্র স্মৃতি রৌপ্য পদক" প্রদান করা হইবে। উক্ত প্রবন্ধ আগামী ১৩৩৬ সালের ৩০শে ভাদ্র সংক্রান্তি মধ্যে দাঁইহাট সুবর্ণবণিক্ সমিতির সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। আমাদের জাতীয় পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন প্রচার করা হউক। যে প্রবন্ধটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাহা জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে ও প্রবন্ধ লেখকের নাম ও ঠিকানা প্রচার করা হইবে। অত্র সমিতি হইতে উক্ত স্মৃতি পদক প্রদাতা শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতিকল্পে যে সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তজ্জন্য এই সমিতি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

৫। ফাল্গুন মাসের ৬৵১৫ খরচ মঞ্জুর করা হইল।

৬। চাঁদা আদায়ের টাকা যতদিন সেভিংসব্যাঙ্ক হিসাব খোলা না হয় ততদিন সম্পাদকের নিকট গচ্ছিত থাকিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র
সভাপতি

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"পণপ্রথা নিবারণ কল্পে" স্বজাতিগণকে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাহাকে একটি "রাধাগোবিন্দ চন্দ্র স্মৃতি রৌপ্য পদক" প্রদান করা হইবে। উক্ত প্রবন্ধ আগামী ১৩৩৬ সালের ৩০শে ভাদ্র সংক্রান্তি মধ্যে আমার নামে পাঠাইতে হইবে। যে প্রবন্ধটা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহা সুবর্ণবণিক সমাচারে যথাসময়ে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনারাণ চন্দ্র
পোঃ দাঁইহাট, বর্দ্ধমান
২৩শে চৈত্র

প্রেরিত পত্র*

শ্রীযুক্ত সুবর্ণবণিক্ সমাচার সম্পাদক মহাশয়, সমীপেষু

মহাশয়,

নিম্নস্থ পত্রখানা আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিলে বিশেষ সুখী হইব।

মনে পড়ে বহুদিন পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'তপোবল' নাটকের অভিনয় দেখি। ঐ নাটকের একস্থানে আছে, যখন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ত্রিবেণীতে গমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণের জন্য দেহত্যাগে সঙ্কল্প করিতেছেন, তখন ব্রহ্মণ্যদেব আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি মরতে চাও কেন ?"

বিশ্বামিত্র—"মরে ব্রাহ্মণ হ'বার জন্য।"

ব্রহ্মণ্যদেব—"মরে কি করে ব্রাহ্মণ হবে ?"

বিশ্বামিত্র—"কেন ? ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে।"

ব্রহ্মণ্যদেব—"তাহ'লে তোমার কি হবে—চারটে হাত বেরোবে না একটা ল্যাজ বেরোবে ? এখন কোনটা কম আছে যে সেটা বেশী হবে ?"

বর্ত্তমান সময়ে সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়ন গ্রহণের ব্যবস্থা দেখিয়া সেই ব্রহ্মণ্যদেবের কথাই মনে পড়ে। এখন তাঁদের কোনটা কম আছে, যেটা উপবীত গ্রহণ মাত্রেই বেশী হইবে ?—একথা স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। আর ব্রহ্মণ্যদেবের কথাতেই বলিতে ইচ্ছা যায় যে "দুগাছা সুতো গলায় দিয়ে বৈশ্য বৈশ্য কর্‌লেই কি বৈশ্য হয় ?"—চাই সাধনা, চাই তপস্যা।

সকলেই জানেন, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করার পরও বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কারণ তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণসুলভ ক্ষমা গুণের অভাব ছিল। তেমনি যতদিন সুবর্ণবণিক্‌গণ পরাধীন জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বৃত্তি ও গুণ—'কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং' অবলম্বন না করিবেন, ততদিন, সুতোই গলায় দিন, আর যাগযজ্ঞের ধূমে আকাশমণ্ডল ধূম্র করিয়াই তুলুন, তাঁহারা গীতোক্ত বৈশ্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না—অবশ্য জন্মগত হিসাবে তাঁহারা বৈশ্য, তাহাতে কেহই সন্দেহ করে না; তবে গুণগত ও কর্ম্মগত বৈশ্যত্বই খাঁটি বৈশ্যত্ব; কারণ জন্মগত জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে; গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।" সেখানে জন্মগত জাতিভেদের কোন উল্লেখ নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেই বৈশ্যের গুণকর্ম্ম আপনাআপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে যাহমন্ত্র বলে; যজ্ঞসূত্রই বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত সুবর্ণবণিক্ জাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রকৃত বৈশ্যত্বের পথে পরিচালিত করিবে।

এই উক্তির কোন সারবত্তা দেখা যায় না। কারণ—

(১) যদি যজ্ঞসূত্র ধারণে প্রকৃত গুণাবলী আপনি আসিয়া জুটিত, তবে আজ যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ চাকরীর জন্য লালায়িত কেন ? অথচ—

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—"সেবাশ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ"। কোথায় ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ? তাই কান্ত কবি ৺রজনীকান্ত বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন—

"যদিও করেছি চটীর দোকান ঠেল্‌চি বেড়ি ও হাতাটা,
টিকিটি শুদ্ধ বজায় রেখেছি মহর্ষি ব্যাসের মাথাটা।"

কাজেই সুবর্ণবণিক্‌গণ যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেই চাকরী ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা ত মনে হয়না, যেহেতু এখনও উপবীতধারী অনেক সুবর্ণবণিক্‌কে চাকরী করিতে দেখা যায়।

---

* মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নহেন।

(২) যদি যজ্ঞসূত্র প্রকৃত একতা দান করিত, তবে আজ ভারত একতাহীন হইয়া নিম্নস্তরে নিপতিত কেন? জগতের বাজারে তাহার মূল্য কানাকড়িও নাই কেন?—এখনও ত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া অবস্থিত? যেদিন সপ্তদশ জন অশ্বারোহী বঙ্গ সিংহাসন দখল করিল, সেদিনও ত সহস্র সহস্র যজ্ঞসূত্রধারী বাঙ্গালী বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিল? কৈ সেদিন যজ্ঞসূত্র আক্রমণকারীর সে প্রভাব রোধ করিতে পারে নাই?

চাণক্যের মুখে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—"দেখ্‌ছি ভবিষ্যতে এক মহাশক্তি এই গলিত শবের উপর তার বাহুদণ্ড তুলিয়ে এক বিরাট্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্‌বে, আর তার কঠোর শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চষে সমভূমি কর্‌বে" আজকাল ঐ কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। রেলে, ষ্টীমারে, ট্রামে, রাজকার্য্যে জাতিভেদ কার্য্যতঃ অনেক উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতের সাম্য ভাবের বন্যা দেশকাল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; এখন পুরাতন গতানুগতিক পথে চলিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। বৈদিক যুগ কাল-সাগরে লীন হইয়া গিয়াছে; পৌরাণিক যুগ লুপ্ত; এখন বর্ত্তমানের পাশ্চাত্যভাবের যুগে বাঁচিতে হইলে কৃষিশিল্প-বাণিজ্যকে পাশ্চাত্যজাতির মত আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে; নতুবা যজ্ঞসূত্র ধারণ করুন বা না করুন অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস অনিবার্য্য।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে অনেক ধনশালী সুবর্ণবণিক্ আছেন। তাঁহাদের সংহতি-শক্তিতে দেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হউক; তাঁহাদের বৈশ্যত্বের চিহ্ন জড় সূত্রখণ্ডে প্রকটিত না হইয়া মিলে, ফ্যাক্টরীতে, ব্যাঙ্কে, জাহাজে, বাণিজ্য সঙ্ঘে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করুক; আর শত শত বুভুক্ষু নরনারী তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের ছায়াতলে প্রতিপালিত হউক। ধন্য হউন তাঁহারা, ধন্য হউক বঙ্গবাসী। ইতি—

বশংবদ
শ্রীযামিনীমোহন সেন

(২)

স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের দলস্থ সুবর্ণবণিক্ মহোদয়গণ সমীপেষু

বিহিতসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন,

মহাশয়,

কলিকাতাস্থ সপ্তগ্রামীয় স্বজাতীয়গণের মধ্যে নিমন্ত্রণ করিবার সময় সুপারি দেওয়ার প্রথা বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা এই বিষয় লইয়া দলপতিগণের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। এই প্রথাটী সম্ভাষণের একটি অঙ্গ এবং বহুদিবস হইতে সমাজে চলিয়া আসিতেছে, এতৎসম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে দলস্থ সমগ্র স্বজাতিবর্গের যুক্তি এবং পরামর্শ অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের দলস্থ বণিক্‌গণের তালিকা ন্যূনাধিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই সমস্ত বণিক্‌গণের বংশধরগণ কলিকাতার নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কলুটোলা, সুরতিবাগান, বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে জমি দখল করায় অনেকেই পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতদবস্থায় দলস্থ স্বজাতীয়গণের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অসুবিধার প্রতীকার মানসে আমি আমাদের জাতীয় মুখপত্র সুবর্ণবণিক্ সমাচারের মারফৎ উক্ত রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের দলস্থ স্বজাতীয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নিজ বর্ত্তমান নাম ধাম আমার নিকট সত্বর পাঠাইয়া দেন। এই সমস্ত নাম ধাম সংগৃহীত হইলে দলস্থ স্বজাতীয়গণকে লইয়া আগামী বৈশাখ মাসে একটী পরামর্শ সভা আহ্বান করা হইবে।

বশংবদ
শ্রীগোলকবিহারী মল্লিক
২২, বৃন্দাবন বসুর লেন,
কলিকাতা

সমালোচনা

রামায়ণের কথা ও অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত, মূল্য ১৲টাকা।

পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত; প্রথমার্দ্ধে রামায়ণের কথা; ইহাতে রামের জন্মবিবরণ, রাবণ, সীতা, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক গবেষণা সন্নিবদ্ধ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার-বহু পরিশ্রম করিয়া অনেক শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ তথ্য সংগ্রহের মাঝখানে আসলবস্তু চাপা পড়িয়াছে—তাঁহার বক্তব্য কোথাও সুপরিস্ফুট হয় নাই। বিশেষতঃ রামায়ণের কথায় তাঁহার বক্তব্য বিষয় যে কি, তাহা পুস্তকের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কখনো রাম, কখনো রাবণ, কখনো বুদ্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ এত উদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্য পাঠে কাহারো ধৈর্য্য থাকা সম্ভব কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে। আখ্যানবস্তু সহজবোধ্য না হইলে শুধু শাস্ত্র বচন মানুষ হজম করিতে পারে না। অনেক স্থলে গ্রন্থকার ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন; যথা—ঋগ্বেদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে মিস্ মেও এবং স্নেহলতার আগুনে পুড়িয়া মৃত্যু স্থান পাইয়াছে (৩৭ পৃষ্ঠা); স্নেহলতা ও মিস্-মেও কি রামায়ণের ব্যক্তি? অলমতিবিস্তরেণ।

ভূদেব-নির্ব্বাণ—বিদ্যাদিত্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত। ১০৭ পৃষ্ঠা মূল্য ৸০ আনা।

এই কাব্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমন অবলম্বনে রচিত। প্রাচীন কবির অনুকরণে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। আদর্শ গৃহী ভূদেবের দেব-চরিত্র বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। তবে বর্ত্তমানে এইরূপ কাব্যের যুগ নহে; কাজেই সাধারণের নিকট তাদৃশ সমাদৃত হইবে কিনা সন্দেহ, গদ্য হইলে অনেকেই পাঠে উৎসাহিত হইত সন্দেহ নাই। তথাপি গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়।

ঝরা ফুল—শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। রচয়িত্রী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী। লেখিকা পাঠকের পরিচিতা। গত বৎসরে তিনি ৺ কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের এষা কাব্যে নারী চরিত্র প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমাচারেও তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতাগুলি ঝরা ফুলের মতই নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নে প্রাণে শান্তি-ধারা ঢালিয়া দেয়। লেখিকার কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার উচ্ছ্বাস নাই; হা হুতাশ নাই, দীর্ঘশ্বাস নাই; আছে, জীবনের শ্রান্ত অবসন্ন অপরাহ্নে সংসারের আশা-বাসনা হইতে বহুদূরে অবস্থিত মহামহানের চরণে নীরব আত্মনিবেদন; আছে বিশ্বময়, পৃথিবীর ক্ষুদ্র ধূলিকণা হইতে নৈশাকাশের অনন্ত অপরিমেয় জ্যোতিঃপুঞ্জের বিরাট্ কলেবরের মধ্যে বাঞ্ছিতের মধুর মূর্ত্তি দর্শন; আছে একটা শাশ্বত শান্তির মুক্ত নির্ঝর-ধারা।

সংসার-গহন-বনে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় কচ্চকণ্ঠে বলিতেছে—

> ছিঁড়ে গেছে একেবারে
> এহৃদি-বীণার তার;
> মরমের পথে শুধু উঠিতেছে
> হাহাকার!

তারপর নিভৃতে অন্যের অলক্ষিতে বাঁশী বাজিয়া উঠিল হৃদয়-বৃন্দাবনে—

> জোছনা মণ্ডিত রজত যামিনী;
> গভীর নিশীথে নীরব অবনী;
> সুপ্ত গোকুল ব্রজের রমণী—
> সহসা বাজিল বাঁশি!

আর সেই সুর শ্রবণে পশিয়া—"করিল আপন হারা!"

ভাষা সহজ, সরল ও মধুর। লেখিকার লেখনী জয়যুক্ত হউক।

হিমালয় ভ্রমণ—শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত। মূল্য ১৲টাকা। এই পুস্তকে অনন্ত রত্নপ্রসূ হিমগিরির দুর্গমস্থান স্থিত কেদারনাথ ও বদরী নারায়ণ গমনের বিবরণ লিপিবদ্ধ। আখ্যানবস্তু নূতন নহে; বিশেষতঃ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের অনুগ্রহে বাঙ্গালী পাঠক বদরী নারায়ণের সহিত ও পথিপার্শ্বস্থ বহু চটী, তীর্থ ও চড়াই-উৎড়াইর সহিত সুপরিচিত। তৎপরে নিকুঞ্জবিহারী মল্লিক, অখণ্ডানন্দ স্বামী, শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বহু লেখক কেদার-বদরীর বিবরণ দ্বারা বাঙ্গালী পাঠকের চিন্তারাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান লেখিবার বিশেষত্ব, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লেখকগণ হইতে স্বতন্ত্র। ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রত্যেকস্থল একটি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে অভিষিক্ত। ভক্তিমতী হিন্দু মহিলা কি ভাবে তীর্থ দর্শন করেন,—কোন অভীষ্টের উদ্দেশ্যে তিনি দুর্গম পথ-ক্লেশ আধিভৌতিক দুঃখ অম্লানমুখে সহ্য করেন এবং অবশেষে গম্যধামে পৌছিয়া তাঁহার হৃদয় কিভাবে উচ্ছ্বসিত হয়,—এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন।" এই বিশেষত্বই পুস্তকখানিকে জন সমাজে আদৃত করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীকে. বি. সে.

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ সাল | ৭ম সংখ্যা

ম্যাডাম টুসো

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, বার-এ্যাট্-ল

যাঁহারাই বিলাতে গিয়াছেন অথবা বিলাত সম্বন্ধে কিছু জানেন বা শুনিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই লণ্ডনে ম্যাডাম টুসোর আর্ট এক্‌জিভিশনের বিষয় অবগত আছেন। লণ্ডনে যে গুলি প্রধান দ্রষ্টব্য তাহাদের মধ্যে ম্যাডাম টুসোর আর্ট এক্‌জিভিশনটি অন্যতম, এবং ইহার নাম জগৎ-ব্যাপ্ত। এই এক্‌জিভিশনটি একটি দেখিবার জিনিষ। এখানে ইউরোপে নানা বিষয়ে যাঁহারাই খুব প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদেরই মোমের প্রতিমূর্ত্তি রাখা হয়। এই প্রতিমূর্ত্তি-গুলি বাস্তবিকই অদ্ভুত—এগুলি এরূপ প্রাণময় যে দূর হইতে দেখিলে জীবন্ত মানুষ বলিয়াই ভ্রম হয়। এগুলি ছাড়া ইহাতে আরও অনেক দেখিবার জিনিষ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য chamber of horrors। পূর্ব্বে ইউরোপে যে সব ভীষণ আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল এখানে তাহারই বৃত্তান্ত জীবন্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সব দেখিলে পূর্ব্বে ইউরোপে কিরূপ ভয়াবহ সব আচার-ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহার বেশ একটি মোটামুটি ধারণা হয়, এবং বুঝিতে পারা যায় যে ইউরোপ এক্ষণে সভ্যতার পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। মোটের উপর এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইহা একটি বিশেষ শিক্ষার স্থল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই এক্‌জিভিশন্‌টি হঠাৎ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় ইহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উদ্যোগ চলিতেছে। এই বৃহৎ একজিভিশন্‌টি কিরূপে একজন মহিলার অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে অনেকেরই বোধ হয় বিশেষ জানা নাই, সুতরাং ইহা একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় বোধে আমি ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীর জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুইজারলণ্ডের বিখ্যাত

বার্ণ (Berne) সহরে একজন সুইস্ ধর্ম্মযাজক বাস করিতেন। ইঁহার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না, কেবল এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে ইঁনিই ম্যাডাম টুসোর পূর্ব্বপুরুষদিগের একজন ছিলেন। এই ধর্ম্মযাজকের পরিবারে কয়জন লোক ছিল তাহাও জানা যায় না, কেবল এই মাত্র জানা যায় যে ইঁহার মেরি (Marie) নামে একটি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথম বার্ণ সহরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই মহিলাটির সাতটি পুত্র সন্তান ছিল। বার্ণ সহরে অবস্থান কালে Joseph Grosholtz নামে একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত মেরির বিবাহ হয় এবং তাঁহারই ঔরসে ১৭৬০ সালের ৭ই ডিসেম্বর—Joseph Grosholtzএর মৃত্যুর দুইমাস পরে—ম্যাডাম টুসোর জন্ম হয়। ইঁহার মাতার নামের অনুকরণে ইঁহার নামও মেরি রাখা হয়।

মেরির জন্ম গ্রহণের দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতুল John Christopher Curtius বার্ণ সহরে ডাক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং এই সম্পর্কে তিনি মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির মোমের 'মডেল' তৈয়ার করিতে উদ্যত হন; এবং খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তিও তৈয়ার করিতে থাকেন; ফলে তিনি শীঘ্রই বড় বড় ঘরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে Louis XVএর এক ভাই (cousin) Prince de Conti এই সময়ে বার্ণ সহরে বেড়াইতে গমন করেন এবং সে স্থানে এই ডাক্তারের ঐ কার্য্যনিপুণতার বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়; ইহার ফলে ঐ রাজকুমার ডাক্তারকে প্যারিস সহরে যাইতে আহ্বান করেন ও রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা দানে অঙ্গীকৃত হন। এই প্রস্তাবে ডাক্তার তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া প্যারিস নগরে গমন করিলে সে স্থানে রাজকুমার তাঁহার থাকিবার জন্য একটি হোটেলে কয়েকটি সুন্দর ঘর দান করেন ও আরও অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। তদবধি Curtius ডাক্তারী ব্যবসা একেবারেই পরিত্যাগ করতঃ শিল্পীর ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে Curtiusএর সংসার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন লোকের বিশেষ আবশ্যক হয় এবং তাহার জন্য তিনি তাঁহার ভগ্নী ম্যাডাম Grosholtzকে প্যারিসে আনয়ন করেন। তাঁহার সহিত মেরিও (ম্যাডাম্ টুসো) প্যারিসে আগমন করেন, এবং Curtius তাঁহাকে তাঁহার কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেরি যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার মাতুলই তাঁহাকে এ শিল্প বিদ্যায় শিক্ষা দান করেন এবং মেরিও একজন নিপুণ শিল্পীহইয়া উঠেন।

এই সময়ে মোমের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করা প্যারিসে এক ফ্যাসনের জিনিষ ছিল এবং Curtiusএর ষ্টুডিওটি এই শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের এক আড্ডা হইয়া পড়িল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই Curtius যখন প্যারিসে বেশ একটু নাম করিয়া ফেলিলেন তখন তিনি যে সকল সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়াছিলেন সেইগুলির প্রদর্শনীর জন্য দুইটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে Voltaire, King Louis XV ও তাঁহার রাণী, King Louis XVI ও Marie Antoinette, ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিল।

এইরূপে মেরি (ম্যাডাম টুসো) যখন তাঁহার মাতুলের কার্য্যের সহায়তা করিতেন তখন একদিন King Louis XVI এর ভগ্নী ম্যাডাম্ এলিজাবেথ Curtiusএর ষ্টুডিওটি দেখিতে আসেন, এবং মেরির কার্য্য দেখিয়া তিনি এত মুগ্ধ হ'ন যে Curtiusএর নিকট মেরিকে তাঁহার সহিত তাঁহার ভার্সেলস্থ গৃহে যাইবার জন্য ও তাঁহাকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার প্রার্থনা জানান। বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও Curtius মেরিকে যাইবার অনুমতি দান করেন, এবং তদবধি মেরি রাজদরবারের সম্পর্কে আসেন। এই ঘটনা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ঘটে। মেরি এই কার্য্য সম্পর্কে Versailles ও Montreuil এ নয় বৎসর কাল আনন্দে যাপন করেন। মেরির সহিত রাজকুমারীর খুব ঘনিষ্টতা হয় এবং মেরিরও তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতি জন্মায়।

ইত্যবসরে তথায় ফরাসী বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইতেছিল, সুতরাং Curtius মেরিকে ভার্সেল হইতে প্যারিসে আনয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন।

সুতরাং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মেরি প্যারিসে প্রত্যাগমন করেন। মেরি প্যারিসে প্রত্যাগমন করিতে না করিতেই বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে এবং Louis ও Marie Antoinette রাজ্যচ্যুত হইয়া কাঠগড়ায় হাজির হ'ন। যদিও মেরি এই ঝড় সামলাইলেন, কিন্তু তিনি একেবারে অক্ষত রহিলেন না।

১৭৯৩ সালে Curtiusএর রাজনীতি সংক্রান্ত কোনও কার্য্য হওয়ায় তাঁহাকে প্রায়শঃই বহুদিনের জন্য প্যারিস ছাড়িয়া যাইতে হইত, সুতরাং মেরি ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতার উপরেই মিউজিয়মের সকল ভার পড়িত। এই সময়ে মেরিকে সব বড় অপ্রীতিকর কার্য্য করিতে হইয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিত তাহাদের মস্তক ছিন্ন হইবার পরেই মেরিকে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিতে হইত, এবং এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকে মেরির বিশেষ পরিচিতও থাকিত। সুতরাং এই কার্য্য মেরির পক্ষে যে কি ভীষণ ছিল তাহা কথায় বলা যায় না। এই ভীষণ কার্য্য করিতে মেরি কেন, যে কোনও দৃঢ়চেতার পক্ষেও উন্মাদ হইয়া যাওয়া কিছুই অসম্ভব ছিল না। এইরূপ কথিত আছে যে Napolean Bonaparte যখন প্রথম 'কন্সাল' হইয়া Tuileries এতে আসেন তখন মেরিকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিতে পাঠান হয়। মেরি এককালে রাজপরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় তিনি নির্দ্দোষী হইলেও তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য কারাবাস করিতে হয়।

Curtius এর মৃত্যুর পর মেরি ১৭৯৫ সালের ২৯শে অক্টোবর François Tussaud নামক এক ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। মেরির বিবাহের অনেকদিন পূর্ব্বেই Palais Royalএ Curtius এর যে মিউজিয়ামটি ছিল তাহা তিনি বন্ধ করিয়া দেন ও তাঁহার যে অপর একটি মিউজিয়াম ছিল সেইখানে তথাকার প্রতিমূর্ত্তিগুলি লইয়া যাওয়া হয়।

প্যারিসে বিদ্রোহের অনল নির্ব্বাপিত হইলে ও শান্তি স্থাপিত হইলেই ম্যাডাম টুসো একেবারে ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া যাইতে মনস্থ করেন, এবং এতদ্দিনে তাঁহার দৃষ্টি প্রথম ইংলণ্ডের উপরই পতিত হয়। Joseph ও Francis নামে তাঁহার দুইটি ছোট পুত্র সন্তান ছিল, তাহারাও তাঁহার সহিত আগমন করে। ম্যাডাম টুসোর বিবাহিত জীবন সুখের না হওয়ায় এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার স্বামী হইতে পৃথক্ হইয়া যান, সুতরাং তাঁহার স্বামী প্যারিসেই বাস করেন। ম্যাডাম টুসো ইংলণ্ডে আগমনকালে Curtius এর মিউজিয়ামে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি ছিল সেগুলি সঙ্গে লইয়া আসেন। লণ্ডন সহরেই তাঁহার প্রদর্শনীর প্রধান কেন্দ্র গড়িয়া উঠে।

ম্যাডাম্ টুসো যখন ফ্রান্স পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল ৪২ বৎসর; ইহার মধ্যে ৩৮ বৎসর তিনি প্যারিসে কাটান এবং জীবনের অবশিষ্ট ৪৮ বৎসর ইংলণ্ডেই অতিবাহিত হয়, এবং ইংলণ্ডে প্রায়শঃ তিনি লণ্ডন সহরেই থাকিতেন। ম্যাডাম্ টুসো ১৮০২ সালের মে মাসে ইংলণ্ডে পদার্পন করেন এবং প্রথম কয়েক বৎসর তিনি কোথায় কোথায় ঘুরেন সে বিষয়ে জানা একটু শক্ত। যাহাই হউক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিগুলি ষ্ট্রাণ্ড নামক রাস্তায় পুরাতন Lyceum Theatre এ প্রদর্শন করেন। এই লাইসিয়াম থিয়েটারটি পূর্ব্বে ইংলিশ অপেরা হাউস্ নামে খ্যাত ছিল। ম্যাডাম্ টুসো এই স্থানটি ১৮০৩ সালে পরিত্যাগ করেন। তাহার পর কিছুদিনের জন্য এই প্রদর্শনীটি Fleet Street এতে স্থাপিত হয়, এবং কিছুদিন পরে অপর জায়গায় স্থানান্তরিত করেন। ইহার পর ম্যাডাম্ টুসো তাঁহার প্রদর্শনীটি সর্ব্বসাধারণে দেখাইবার জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হ'ন। তিনি এই প্রদর্শনীটি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের বড় বড় সহরে দেখান, এবং এমন কি, তিনি আয়ার্লণ্ডেও গমন করেন। তিনি যখন জাহাজে চড়িয়া একটি নদী পার হইতেছিলেন তখন এক দুর্ঘটনা হয়—তিনি যে জাহাজে যাইতেছিলেন সেই জাহাজখানি আংশিকরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার অনেকগুলি মহামূল্য প্রতিমূর্ত্তিও নষ্ট হইয়া যায়। অপর ব্যক্তি হইলে ইহাতে নিশ্চয়ই অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িতেন, কিন্তু ম্যাডামের এরূপ সাহস ও বল ছিল যে তিনি ইহাতে কিছুমাত্র দমিত না হইয়া পূর্ণ উৎসাহে অপর কয়েকটি বন্ধুর সহিত মিলিয়া সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত

প্রতিমূর্ত্তিগুলি পুনরায় গড়িয়া ফেলিলেন এবং ফলে তাঁহার প্রদর্শনটি বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিতই হইল। ম্যাডাম্ যেখানেই গমন করিতেন সেইখানেই তাঁহার প্রদর্শনীর জন্ম তথাকার যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হল তাহাই তিনি লইতেন এবং সেই স্থানের মেয়র সাহেব তাঁহার এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতেন।

এই সময়ে ম্যাডাম্ যে কেবল দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা নহে, তিনি সমসাময়িক খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি গড়েন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হইতেছে—রাণী কেরোলীন, (১৮০৮), সম্রাট্ তৃতীয় জর্জ্জ (১৮০৯), ডিউক অফ্ ইয়র্ক (১৮১২), রুষ সম্রাট্ প্রথম আলেকজাণ্ডার (১৮১৪), বিখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস্ সিডন্স, সম্রাট্ চতুর্থ জর্জ্জের কন্যা ওয়েল্সের রাজকুমারী সারলট্, বেলজিয়ামের সম্রাট্ (১৮১৭), নরউইচের বিসপ্ (১৮২০), সম্রাট্ চতুর্থ জর্জ্জ (১৮২১), জর্জ্জ ক্যানিং (১৮২৭), স্যার ওয়ালটার স্কট, প্রভৃতি।

১৮৩১ সালে ম্যাডামের প্রদর্শনীটি ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে ছিল এবং সেই সময়ে তথায় এক ভীষণ দাঙ্গা হওয়ায় এই প্রদর্শনীটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়। কোনও অজানা কারণে দাঙ্গাকারীরা এই প্রদর্শনীর বাড়ীটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার যোগাড় করে। এই প্রদর্শনীর বাড়ীটির সংলগ্ন আর সকল বাড়ী ভস্মীভূত হইলে দাঙ্গাকারীরা যখন এই বাড়ীটি অগ্নিসাৎ করিতে আসে তখন ম্যাডামের এক বলশালী নিগ্রো ভৃত্য বাড়ীর পাহারায় ছিল; সে-ই দাঙ্গাকারীদিগকে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে কাল বিলম্ব ঘটাইয়া দেয়; এই অবসরে সৈনিকেরা আসিয়া পড়ে ও দাঙ্গাকারীদিগকে বিতাড়িত করে। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে ম্যাডামের সহিত তাঁহার ভৃত্যদিগের কিরূপ সম্পর্ক; ভৃত্যদিগের প্রতি তাঁহার যেমন খুবই প্রীতি ছিল, তেমনই তাহারাও তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৩২ সালে ম্যাডাম্ Prince Talleyrand এর ও ১৮৩৩ সালে Lord Eton এর প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করেন।

১৮৩৩ সালে এই প্রদর্শনীটি কিছু দিনের জন্ম ব্রাইটনের টাউন হলে স্থানান্তরিত হয়। এখানে রাজপরিবারের লোকেরা এই প্রদর্শনীটি দর্শন করেন। এই প্রদর্শনীটি দর্শন করিয়া প্রিন্সেস্ অগষ্টার অত্যন্ত ভাল লাগে, এবং তিনি পত্রদ্বারা ম্যাডাম্‌কে তাহা জানান। ব্রাইটন হইতে প্রদর্শনীটি Blackheath এ Green Man Hotel এর assembly room এতে স্থানান্তরিত হয়, এবং তথা হইতে লণ্ডনের Gray's Inn Road এ তখনকার Royal London Bazar এর Great Assembly Room এতে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে প্রদর্শনীটি ১৮৩৫ সালের ২১শে মার্চ্চ অবধি থাকে, এবং তাহার পর Baker Street এ Portman House এতে স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়। এই বৎসর ম্যাডাম্ ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন ও স্যার রবার্ট পিলের প্রতিমূর্ত্তি গড়েন এবং পরবর্ত্তী বৎসর লর্ড মেলবোর্ণের মূর্ত্তি গঠিত হয়। ১৮৩৭ সালে তিনি কুইন ভিক্টোরিয়ার মাতা ডাচেস্ অফ কেণ্টের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করেন। এই সময়ে তিনি রাশিয়ার প্রথম নিকোলাস্, লুই ফিলিপ, কিং অফ দি ফ্রেঞ্চ, ডিউক্ অফ্ কামবারলাণ্ড ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হিউমের প্রতিমূর্ত্তি গড়েন।

বেকার ষ্ট্রীটে এই প্রদর্শনীটি খুলিবার অল্পকাল পরেই একটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। বিখ্যাত গায়িকা Madame de Malibron যাঁহাকে লোকে দেবীর ন্যায় পূজা করিত, তিনি হঠাৎ ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই ম্যাডাম্ টুসো তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া তাঁহার ঐ প্রদর্শনীতে রাখেন, এবং এই সংবাদে বহুলোক তাহা দেখিতে গমন করে। ম্যাডাম্ টুসোর ব্যবসায়ে খুব বুদ্ধি ছিল, তিনি যখন দেখিলেন যে এই প্রতিমূর্ত্তিটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছে তখন হইতে তিনি ঠিক করিলেন যে যখনই কোনও ব্যক্তি খুব খ্যাতনামা হইয়া উঠিবেন তখনই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ঐ প্রদর্শনীতে রাখা হইবে।

এই প্রদর্শনী চালনের কার্য্যে ম্যাডাম্ টুসো তাঁহার দুই পুত্রের যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও তিনি নিজেই তাঁহার জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্য্যন্ত ইহার এক প্রধান উদ্যোগকারিনী ছিলেন। ম্যাডাম্ টুসো খর্ব্বাকৃতি

ও কৃশা হইলেও, কিন্তু তাঁহার আদব কায়দা অত্যন্ত জীবন্ত ধরণের ছিল। ম্যাডাম্ খুব বাক্‌পটু ছিলেন; যখনই কোন বিষয় বলিতেন তখনই তিনি তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতির কথাই বলিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ এবং তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন; বিপন্ন লোকের উপর তাঁহার অত্যন্ত সহানুভূতি ছিল, এবং তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করিতেন। তাঁহার অনেক প্রকার সক এবং রুচিও খুব উদার ছিল। তিনি তাঁহার বিশেষ শিল্পে জগৎকে বিচিত্র করিতে গিয়া বাহিরের দিকেই দৃষ্টি দিয়াছেন, ভিতর দেখেন নাই, এবং তাঁহার ক্ষেত্রও বিশাল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কদাচিৎ তাঁহার নিজের বিষয় অথবা নিজের কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতার বিষয় বলিতেন, এবং কখনও লোকনিন্দা করিতেন না। তিনি যখন দেখিতেন যে বহুলোক তাঁহার প্রদর্শনীটি দেখিতে আসিতেছে তখন তাঁহার এই ভাবিয়াই সুখ হইত যে, তিনি ইঁহাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কিছু করিতে পারিয়াছেন ও ইহাদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধিরও একটি উপায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহু কাজ সত্ত্বেও ম্যাডাম্ সর্ব্বদা উৎফুল্ল থাকিতেন এবং সেই কারণেই তিনি এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই নির্ভীকচিত্তা ছিলেন এবং কখনও অভাব-অভিযোগ লক্ষ্য করিতেন না। যে কোনও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইত তিনি তাহা অতিক্রম করিতেন। তিনি একথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার ভিতর হইতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইবে এবং সেই জন্যই তিনি এই সব বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। ম্যাডাম্ বলিষ্ঠকায়া না হইলেও তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল এবং মৃত্যুর পূর্ব্বাবধি তাঁহার স্বাস্থ্য কখনও ভঙ্গ হয় নাই। ১৮৫০ সালের ১৫ই এপ্রিল ম্যাডাম্ ইহলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং বলেন—"তোমরা কখনও পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিওনা"। অতঃপর তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দুইজনকে সমানভাগে ভাগ করিয়া দেন।

উদ্বোধন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

নির্জ্জিতা আজি কুলনারী
দণ্ডিত কোথা অত্যাচারী ?
করিয়া কেবল অশ্রু মোচন
রচিয়া কেবল ক্রুদ্ধ বচন
দেখাইয়া শুধু রক্ত লোচন
কি দিবে শাস্তি তা'রি ?
শক্তিতে উঠ হইয়া অটল
দলিতে নিয়ত নীচ পশুবল
দেহে মনে ভরি তেজের অনল
মান রাখো মহিলারি।

কাহিনী

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু বি এ

নামটি আমার বিজয়চাঁদ। থাক্‌, আর সে নাম ধামে প্রয়োজনই বা কি? জীবনের দুঃখ-সুখের আগাগোড়া ইতিহাসটা আমি বল্‌তে চাই না, আর সে বলবার চেষ্টাও বৃথা; কারণ ছোট বড় অনেকানেক ঘটনাই তো বিস্মৃতির অতল গর্ভে এমন ডুব মেরে আছে, আমার সাধ্য নেই যে আমি তাদের হাতড়ে বার করি। হয়ত, এ জীবনের এখনও অনেক বাকি, অনেক দুঃখও হয়ত এখনও এ জীবনে সইতে বাকি। তা থাক্‌, যা সয়েছি, তার চেয়ে বড় দুঃখ আর কিই বা আছে?

এখন আমি বলি, সব বাদ দিয়ে, শুধু যেগুলি আমার হৃদমর্ম্মে দাগ কেটে অনপনেয় চিহ্ন এঁকে বসে আছে সেই-গুলি বল্লেই যথেষ্ট হবে বোধ হয়। তবে কথা হচ্ছে কি যে সেইগুলিই কি ঠিকভাবে বলে সমাধা করতে পারবো? হয়ত তাইই পারবো না। হয়ত কণ্ঠ আমার কেঁপে যাবে, সুর আমার অর্দ্ধপথেই থেমে যাবে। বড় বেদনার সুর কিনা, ঘন নিবিড় ব্যথার সুর। যদি বলে শেষ করতে পারি, তাহলে কিন্তু এ কাহিনী ঠিক কাহিনীই হবে।

তোমাদের তো যৌবন নদীতে বান ডেকেছে। শরতের নদীর মত দুকূল ছাপিয়ে কুলু কুলু রবে মহানন্দে নৃত্য করে করে ছুটে চলেছে। এমন সুখ-শান্তির দিনে আমার অকালে মরা নদীর লয়হীন, তালহীন তরঙ্গহারা বেদনভরা ছিন্ন সুর ভাল লাগবে কি? কি করবো? এ ছাড়া যে আমার আর নেই, ঐ সুরই যে হৃদয়তারে আগেই বেজে ওঠে।

আজ যে তোমরা আমাকে পত্র-পুষ্পহীন একটি নীরস শুষ্ক কাণ্ডের মত দেখছো, কম ঝড়ে কি এর এ অবস্থা করেছে! কম ঝঞ্ঝা কি এ দেহতরুর ওপর দিয়ে প্রবলবেগে বয়ে এর ডাল-পালাগুলিকে এমন মুচড়ে মুচড়ে ভেঙ্গেছে। সে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝা তা আমার দিকে একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেই বেশ বোঝা যাবে। এ কাহিনী তোমাদের ভাল লাগবে না জানি, কারণ বাসর-ঘরে সীতা-হরণ পালা কি ভাল লাগে না তেমন জমে? কিন্তু কি করবো? আর যে নেই।

তোমরা একটু স্থির হয়ে শোন, যে বিজয়কে একদিন সবাই, বিজয়, বিজুলী, বিজু, কেউবা ও সব ছেড়ে শুধু চাঁদ, চাঁদু, চাঁদুমনি বলে আদর করে, স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত ঠেলে দিয়ে আসতো, সেই বিজয় আজ কোনখানে কি অবস্থার মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে এবং আকুল হয়ে সেই শেষের দিনটার জন্য অপেক্ষা করছে। হায়রে, কেমন করে, কতদিনে, কে যে তাকে আজ এই মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে এসেছে, কেইবা তার খোঁজ রাখে?

মরণ আর কি? আমি আমার পিতামাতার একমাত্র আদরে দুলাল ছিলাম। অবশ্য একটী ছোট বোন আমার ছিল। কিন্তু তাতে আমার আদর কমে কিসে? আমি যে পুত্র আর সে কন্যা। থাক্‌ আর সে কথায় প্রয়োজন নেই, আর লাভই বা কি? বেশী আদরই যে এ হতভাগার সর্ব্বনাশের পরিমাণ এমন করে বাড়িয়েছে সে কথা আর কেই বা বোঝে? তাই ত বলি, তা না হলে আর এমন করে জ্বলে মরবো কি করে?

তখন আমি সবে ১৬ বছরে পড়েছি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বৎসর। Test এর পরে final এর জন্য মামার বাড়ী বসে প্রস্তুত হচ্ছি। অতিরিক্ত আদরে বাড়ীতে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, তাই এ ব্যবস্থা। হঠাৎ একদিন বাবার টেলিগ্রাম হাজির:—"“Come sharp, mother seriously ill” সেইদিন বাড়ী রওনা হলুম। হায়রে অদৃষ্ট! এসে যা দেখলুম—এই দুটো পোড়া চোখে যা প্রত্যক্ষ করলুম—উঃ, তা আর কেমন করে ব্যক্ত করি, আর কতটুকুই বা তার ব্যক্ত করতে পারবো?

দেখলুম সেই করুণাময়ী স্নেহের জীবন্ত দেবী মূর্ত্তি করুণার সুধাধারায় স্নাত মা আমার, মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে শুধু আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তখনও সেই অসাড় নিস্পন্দ দেহে প্রাণের উত্তাপ একটুকু অবশিষ্ট ছিল। কথা কইবার শক্তি ছিল না। আমাকে চিনতে পারলেন কিনা জানি না। শুধু নির্ব্বাক হয়ে, সেই নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ নিমেষহারা, অপলক স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমার মুখপানে নিবদ্ধ করে চেয়ে রইলেন। কাতর নয়নে অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠে ঝলমল করতে লাগলো। আর মুখেও কথা ফুটলো না। সেইখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন তাঁকে এ জনমের শেষ দেখা দেখে নিতে লাগলুম। দেখতে দেখতে, সেই নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন প্রদীপ আমার চোখের সম্মুখেই চিরতরে নিবে গেল। মনে পড়ছে, আমার মুখ থেকে আপনা হতে একবার মাত্র বেরিয়ে এসেছিল "মাগো"—তারপর কিছু সময়ের কথা আমি কিছুই জানি না।

জ্ঞান হলে দেখলুম, মায়ের মৃতদেহ ছেড়ে আমাকে নিয়ে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন আমার মস্তকের ক্ষতস্থান চেপে ধরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখলুম, রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।—ওঃ কেন তখন এ চোখ আবার খুলেছিলাম, কেন তখনই এ জীবন-নাটকের যবনিকা সেইখানেই পড়লো না! আর তাই যদি হবে, তাহলে এমন একটী করুণ কাহিনীর সৃষ্টি হবে কেমন করে?

দিন কতক বাদেই আবার একদিন পরীক্ষার চিন্তা মগজের মাঝে উঁকি মেরে গেল। শেষে কিনা এমনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললো যে, আমার সাধ্য রইল না আমি চুপ করে বসে দিন কাটাই! পরীক্ষা দিতেই হোল। পাশও কিন্তু হয়ে গেলুম। বাইরের সে ক্ষত তখন শুকিয়ে গেলেও, অন্তরের ক্ষত তখনও তেমনি কাঁচা। বাগদেবীর অসীম কৃপা না হলে কি আর সে যাত্রা পাশ করা সম্ভব হোত?

গ্রামে ছিল না কলেজ। আবার কলেজে পড়বার জন্য সেই মাতুলালয়েই আশ্রয় নিতে হোল। দুঃখ আর কাকে বলে? "বিপদ একলা আসেনা" সে কথার সত্যতা প্রমাণ কি আমাকে দিয়েই হতে লাগলো! খুব শীঘ্রই প্রতিবেশী রমেশ কাকার চিঠি পেলুম। সে ত চিঠি নয়। সাক্ষাৎ যমের দূত ঐ চিঠির রূপ ধরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল! প্রাণপ্রিয় ভগ্নীর মৃত্যু সংবাদ এবং একমাত্র স্নেহাধার পিতার মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ একেবারে বিষের ছুরির মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধলো। জানি কলেরার আক্রমণ মারাত্মক, তবু ভগবানের নাম জপ করতে করতে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলুম। এসে কি আর সেই একমাত্র স্নেহাবলম্বন পিতাকে আর এ পোড়া চোখে দেখতে পেলুম? শূন্য বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ করে আমাকে গিলে খেতে এল! প্রতিবেশী রমেশ কাকা ছুটে এলেন এবং সান্ত্বনাবারি বর্ষণে তাপিত তৃষিত এ প্রাণ শীতল করবার বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। পিতা নাকি শুনলুম, এই হতভাগ্যের নাম নিয়েই শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন! পুণ্যের জোর তাঁর খুব বেশী ছিল, তাই এ হতভাগ্যের মুখ মৃত্যুকালে দেখে যেতে হোল না। মনে মনে জানলুম হা ভগবান, এত শীঘ্র সব শেষ করে দিলে? বসুন্ধরার গর্ভে সহস্র কামনা করেও একটু স্থান লাভে সমর্থ হলুম না!

আর একটা কথা বলা হয়নি। মামার বাড়ীটা আমার কেবল নামেই মামার বাড়ী। মামার নাম গন্ধও সেখানে নেই, ছিল না কখনও। বৃদ্ধ মাতামহ ও বৃদ্ধা মাতামহী সেখানকার সম্বল। মায়ের মৃত্যু শোক তাঁদের মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেও একেবারে মৃত্যুর কবলিত করতে পারেনি। পিতা ও ভগ্নীর এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ তাঁরা কোন প্রকারে সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা চির বিদায় নিলেন, এ হতভাগ্যের কথা আর ভাববারও অবসর হোল না। এ পৃথিবীতে আর আমার কে রইল? কি আশ্চর্য্য! ভগবানের নিষ্ঠুর বিধানে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা কি শুধু আমার জন্যই ছিল না!

এই ভীষণ অন্ধকারেও কিন্তু ক্ষীণ আশার আলোক দেখতে পেলুম। আমার বাবার বাল্য বন্ধু কলিকাতা-নিবাসী উপেন বাবুকে মনে পড়লো। সমস্ত সংবাদ বিশদরূপে বিবৃত করে তাঁর কাছে পত্র লিখলুম; আরও লিখে পাঠালুম যে তাঁর ওখানে থেকে আমার পড়াশুনা

চলতে পারে কিনা। উপেন কাকার অসীম দয়া। প্রার্থনা তো মঞ্জুর হলই আরও তিনি পিতার এই অভাবিতপূর্ব্ব মৃত্যুর জন্য অনেক শোক প্রকাশ করেই পত্রের জবাব দিলেন।

তারপর কাকাবাবুর বাড়ীতে সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে কত বৎসর কেটে গেছে। এখন আমি এম্ এ ক্লাশের ছাত্র। কাকাবাবুর মহত্বের পরিচয় আর বেশী দিতে হবে না। তাঁরই অনুপম দয়ায় আজ আমি বি এ পাশ করে এম্ এ পর্য্যন্ত পড়তে সমর্থ হয়েছি। পড়া ত দূরের কথা, তাঁর দয়ার অভাব হলে, এ হতভাগ্যের অস্তিত্ব বোধকরি এ জগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতো। কিন্তু তাও যে ভাল ছিল। তা হলেও আজ আমায় এমনি করে দগ্ধ হয়ে মরতে হোত না।

এখানে এসে আমি যে কি পেয়েছিলুম এবং কি হারিয়েছি, সেই আমার সব চেয়ে বড় পাওয়া এবং সব চেয়ে বড় হারানর কথা তোমাদের আমি বলবো। বলে উঠতে পারবো কি? কত টুকুনই বা তার বলে বোঝাব? সে ত বলে বোঝাবার নয়। সে যে অন্তরের—একেবারে নিভৃত স্তরের। যদি কেউ একটি বার আমার অন্তরের মাঝে উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে বুঝতে কি নিদারুণ ভীষণ বেদনায় হৃদয়-মর্ম্ম আমার আমার দিবারাত্র আলোড়িত হয়ে যাচ্ছে। তোমরা তখন একবার অন্ততঃ জিজ্ঞাসা না করে পারতে না, কোন ভীষণ ঝঙ্কার ভীষণ বেগ আমি অন্তরের মাঝে এমন গুমরে গুমরে সহ্য করছি।

সেই কথাই ত বলছি শোন, তবে শুনতে শুনতে অধীর হয়ো না। কেঁপে যেও না। একটু স্থির হয়ে শোন আমি বলি—

উপেনবাবুর দ্বিতল বাড়ীর উপর একটী কোণের ঘরে আমার থাকবার যায়গা নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। এই ঘরের সম্মুখ দিয়ে একটা সরু গলি পশ্চিম দিক থেকে সোজা পূর্ব্বদিকে চলে গেছে। এই গলির অপর পারে আমার ঘরের সম্মুখে আর একটি ভদ্রপরিবারের দ্বিতলবাড়ী। সেই বাড়ীর একটি ঘরের একটি জানলা ও আমার ঘরের একটা জান্‌লা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনন্ত আগ্রহে পরস্পরকে কত কাল থেকে নিরীক্ষণ করে আস্‌ছে কে তার খোঁজ রাখে?

একদিন ভাল ছেলের মত বসে মাথা হেঁট করে একান্ত নিবিষ্টচিত্তে বই পড়ছিলুম। পুঁথিনিবদ্ধ চোখ দুটী হঠাৎ তুলতেই অপর জান্‌লা সংলগ্ন আর একজোড়া লজ্জাজড়িত আধখোলা চোখের সঙ্গে দৃষ্টির বিনিময় হয়ে গেল। মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত দেহটায় যেন একটা দোলা দিয়ে উঠলো। সরে যেতে যেতেই সেই অনিন্দসুন্দর দেবতা-বিনিন্দিত তরুণীর মূর্ত্তি আমার চোখে পড়ে গেল। সেই রূপসীর অপরূপ রূপের জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য, অমানিশার ঘনান্ধকার সমাচ্ছন্ন বৃষ্টিবাদল ভরা আষাঢ়ের রাত্রিতে বিদ্যুল্লেখার মত আমার চক্ষু ঝলসিয়ে দিয়ে গেল। আমি যেন এক নূতন জগতে গিয়ে পড়লুম। সেই অজানা অচেনা পরিরাজ্যে আমার অতৃপ্ত নয়ন দুটি, রূপকথার তরুণীর মত অদ্ভুত শ্রী-সম্পন্না, সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা তরুণীর সন্ধান করেই বেড়াতে লাগলো। যখন চমক ভাঙ্গলো তখন চেয়ে দেখি বেলা অনেক হয়ে গেছে। মধ্যাহ্ন সূর্য্য রুদ্রতেজে সমস্ত আকাশটাকে পুড়িয়ে এই জগৎটাকে পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করবার উপক্রম করছে। তাড়াতাড়ি করে কাজ সেরে কলেজে চলে গেলুম। তৃতীয় ঘণ্টাটাও নষ্ট হয়ে গেল। আজ থেকে এই তরুণীকে দিনান্তে একবারও দেখা সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়ে উঠ্‌ল। ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে ব্যর্থকাম বড় একটা হতে হয়নি। দুজনে দুজনকে শুধু দেখেই যেতে লাগলুম। কিন্তু কারও সাহস হোল না, সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করে দুটো কথা বল্‌তে।

একদিন কি একটা বিশেষ ছুটিতে বিকালের দিকে হেদোর ধারে বেড়াচ্ছিলুম। পশ্চাতে মুষ্টি নিবদ্ধ আমার হস্ত দুখানির উপর হঠাৎ একটা কোমল হস্তের স্পর্শ অনুভব করে চেয়ে দেখি সেই মেয়েটি। আমি তো একেবার নির্ব্বাক। সে কিন্তু স্মিতমুখে বলে উঠলো,—"এক মনে কার ধ্যান হচ্ছিল।"

আমি নির্লজ্জের মত উত্তর দিলুম,—"ধ্যান যার করছিলুম, সেই ত দেখছি সম্মুখে।"

লজ্জায় তার কাণ পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে গেল। সে

কতকটা যেন অপ্রতিভ এবং কতকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বল্লে,—"ছিঃ, আপনি এমন ?"

আমি ওপ্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বল্লুম,—"আপনি এখানে, এ বেশে ?"

সে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্লে,—"আপনার উত্তর পরে দিচ্ছি। আগে আমার অভিযোগ শুনুন। আমি আপনার ছোট বোনের মত, বয়সে অনেক ছোট, আপনি "আপনি" সম্বোধন করে আমাকে অপরাধী ও অপমান করেছেন, তার কৈফিয়ৎ দেবার মত আপনার কি আছে ? আর আপনার প্রশ্নের উত্তরে এই বল্লে যথেষ্ট হবে বোধহয় যে, আমি এখানে বেথুন কলেজের ছাত্রীর বেশে। স্কুলের ছুটির পর গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, দেখি আপনি। আপনাকে একটু প্রয়োজনও ছিল। মা আপনাকে আজ সন্ধ্যা বেলায় একবার যেতে বলেছেন, ভুলে যাবেন না নেমন্তন্ন রইল কিন্তু ?" বলেই উত্তরের জন্য একটুও অপেক্ষা না করেই সে দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বস্‌লো।

নিজেকে কতকটা ভাগ্যবান্ বলে মনে হলো। সন্ধ্যা বেলায় কিন্তু ঐ বালিকার নেমন্তন্নের কথা স্মরণ করেও তাদের বাড়ীতে ঢুক্‌বার সাহস কিছুতেই পাচ্ছিলুম না। তারপর সে যখন তার ভাইকে পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে ডাকালো, তখন লজ্জা, সরম, সঙ্কোচ দ্বিধা কিছুই আর আমার মনে রইল না। গিয়ে দেখি ষোড়শ উপচারে খাবারের ব্যবস্থা। সেই মেয়েটির মাতা কাছে বসে আমাকে "এটাখাও, ওটাখাও, করে পরম যত্নে খাওয়াতে লাগলেন। মেয়েটির ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছিলুম; ততোধিক বিস্মিত হলুম তার মায়ের ব্যবহারে। খাওয়ানর পালা শেষ করে তিনি একান্ত অনুরোধ জানালেন, আমি যেন মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কথায় কথায় জানতে পারলুম, তাঁরা হিন্দু নন্, ব্রাহ্ম। জানিনা, কেন একটা অব্যক্ত বেদনায় অন্তর বাহির একাকার হয়ে গেল। আমার বুকের মাঝে হৃদপিণ্ডটা সমস্ত শরীরটাকে যেন একটা সজোরে দোলা দিয়ে মোচড় খেয়ে নড়ে উঠ্‌লো। কোন প্রকারে কথাবার্ত্তা সেইখানেই শেষ করে দিয়ে বুক চেপে উঠে চলে এলুম।

মাঝে মাঝে ওবাড়ীতে যাবার তাগিদ আসতে লাগলো। আমার দিক্ দিয়েও তার কোন ত্রুটি হোল না। বালিকার সঙ্গে বেশ অবাদে প্রাণে খুলে মিশতে লাগলুম। বায়স্কোপ, থিয়েটার, ফুটবল ম্যাচ কত যে দুজনে একসঙ্গে বসে দেখলুম, তার আর আদি অন্ত নেই। এ সমস্ত ব্যাপারে বালিকার পিতামাতা কেন বাধা না দিয়ে প্রশ্রয় দিতেন, আমি তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যেতুম। এমনি করে দিনে দিনে আমাদের ভালবাসার বন্ধন যে কি সুদৃঢ় অচ্ছেদ্য হয়ে উঠ্‌ল, তা আমরাই জানি।

একদিন খবরের কাগজে দেখলুম, ভদ্র ঘরেরই একটি স্ত্রীলোক বিষ প্রয়োগে তার স্বামীকে হত্যা করেছে। হঠাৎ যেন শারীরিক সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়া এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হোল। ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবল বেগে বয়ে সমস্ত শরীরটাকে যেন অসাড় অস্পন্দ করে নিয়ে এলো। নারীজাতির উপর একটা কঠোর বিদ্বেষে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ এমন বিষিয়ে গেল যে আপাদমস্তক, জ্বালা করতে লাগ্‌লো। আমার মুখ থেকে স্বতই বেরিয়ে এলো, "এই নারী চরিত্র !"

এর পর থেকে ঐ বালিকার বাড়ী যাওয়া ত দূরের কথা, তার সঙ্গে একটা কথা বলা বা তার মুখ দেখার প্রবৃত্তিও আমার মনে আর অবশিষ্ট রইল না। যদি কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছি। অভ্যাস দোষে যদি কখনও তার দিকে তাকিয়েছি, তার জন্য নিজেকে সহস্র গালাগালি দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছি। ব্যাপারটা কি সে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। তার ভাইকে দিয়ে কয় দিন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তাও যাইনি। শেষে সে নিজেই একদিন জান্‌লা দিয়ে আমাকে একটীবার গিয়ে একটি কথা শুনে আস্‌তে বিশেষভাবে অনুরোধ করলো; থাকতে পারলুম না কেমন যেন দুর্ব্বলতা এসে পড়লো। তার কাছে যেতেই সে ধীরে গায়ের কাছে এসে হাত ধরে বল্লে;—"পারলে থাকতে ? এমনি নিষ্ঠুরের মত ? আবার সেই কথা মনে পড়ে গেল। অন্তঃকরণের সমস্ত দুর্ব্বলতা কোমলতা নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলুম, "থাক্ আর ন্যাকামো করতে হবেনা।" উঃ কি কঠোর আঘাতই না তাকে

সেদিন করেছিলুম! আরো বল্লুম,—"দয়ামায়া স্নেহ মমতা, প্রণয় প্রীতির লেশমাত্র তোমাদের শরীরে নেই, তা আমি জানি।" বেশ লক্ষ্য করলুম তার সর্ব্বশরীর বার দুই কেঁপে উঠলো।

একটু সামলে নিয়ে সে বল্লে "কি বল্লে তুমি আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা। তোমার কি হয়েছে একবার খুলে বল ত?"

রেগেই বলে উঠলুম,—"তাতে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। আজ জেনে রাখ, আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবেনা।"

সে কেঁদে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে চীৎকার করে বল্লে, "আজ এ তুমি কি বলছো?"

কোন উত্তর না দিয়ে ছুটে চলে এলুম। পেছন থেকে কানে এলো—"বিজুদা! একটা কথা শুনে যাও আচ্ছা শুনলে না। তবে বলে রাখি আমার জন্য তোমাকে এক দিন এমনি করে কাঁদতে হবে।" মিথ্যা ত সে কিছুই বলেনি। এই ত সত্য হয়ে উঠলো! হায়রে মানুষের মন!

কিছু দিন কেটে গেল। একদিন গায়ে একটু বেদনা অনুভব করলুম। ২।১ দিন যেতে না যেতে জ্বর দেখা দিল এবং সঙ্গে বসন্তরোগ আমার সমস্ত শরীরের উপর দুর্জ্জয় আধিপত্য বিস্তার করে আমাকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেললে। অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করে বিনিদ্র দিন-রাত্রিগুলি কাটিয়ে দিতে লাগলুম। উপেন কাকা ও তাঁর স্ত্রী আমার কাকীমা, আমাকে বেশ স্নেহ করতেন। সে স্নেহের যে কি মূল্য তা এতদিন ধরা পড়েনি; তবে কথা হচ্ছে কি মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে কেইবা স্নেহ দেখাতে পারে? রোগের প্রথম সূচনায় পথ্যের বাটীটা নিয়ে দরজা পর্য্যন্ত এসে তাঁরা যে সান্ত্বনাটুকু দিয়ে যেতেন, এই আসন্ন মৃত্যুর রোষ কষাইত কুটিল ভ্রুকুটির সম্মুখে, তা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যেতো। রোগ খুব বেড়ে যাবার পর থেকে খাদ্যাদি সব চাকরের হাত দিয়েই আসতো।

এই অবস্থায়—এই মহা সঙ্কটের দিনে নিজের জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে কে আমাকে তার মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল তা জান? আর কেউ নয়—সেই উপেক্ষিতা—পদদলিতা—অপমানিতা— প্রপীড়িতা—ঘৃণিতা —লাঞ্ছিতা অনাদৃতা সেই পরিত্যক্তা নারী—যাকে আমি অবিশ্বাসী মনে করে পদাঘাত করে চলে এসেছিলুম। উঃ, আমি ভাবি, সে কি মানবী না দেবী! সবাই যখন আমাকে স্নেহের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলো, তখন সেই অপমানিতাই ত সমস্ত লাঞ্ছনা গ্লানি ভুলে—জীবনের মমতা ত্যাগ করে আপন বক্ষ দিয়ে আমাকে আড়াল করে দাঁড়ালো! তখন সে যদি লজ্জা সঙ্কোচ গ্লানি যা কিছু সব পরিত্যাগ করে না আসতো, তাহলে কারো সাধ্য ছিল, সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনে? দুরন্ত বসন্ত রোগ কি আর এমনি ফিরে গেল! সে যে একটি প্রাণ নিয়ে তবে এ প্রাণটা ছেড়ে গেল। কি আত্মদান! ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এমন আত্মদানের সাক্ষী আছে নাকি—! জানিনা কেন সেই অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই অনাবশ্যক, অর্থহীন ব্যর্থ প্রাণটা রেখে গেল! যাবার সময় সেই দেবী অম্লান বদনে আমাকে বলে গেল,— "দুঃখ কোর না স্বামী! আজ তোমার অলকার মরণ, কিন্তু বড় শান্তিময়—বড় আনন্দের। এর চেয়ে গৌরবময় মৃত্যু স্ত্রীলোকের ভাগ্যে আর কি হতে পারে?"

এমন নিঃস্বার্থ জীবন দান কেউ কখনও দেখেছে? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ক'টা এমন জীবন দানের কথা লেখা আছে? ক'টা হয়েছে এমন নিঃস্বার্থ জীবন দান? সে অমনি করে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে আমাকে স্বামীত্বের পদে বরণ করে—অন্তরের মাঝে আমার মূর্ত্তি স্থাপন করে প্রেম-পুষ্পফলে নিরন্তর আমার যে পূজা করেছিল, তার মূল্য আমি কি দিয়েছি? পুরুষ আমি, সেই ভালবাসার, সেই প্রেম পূজার পুরস্কার কি তাকে দিলুম? পদাঘাত? উঃ, প্রাণের বিনিময়ে পদাঘাত? ঠিক পুরুষের কাজই করেছি না? উঃ, না, না, আর আমি বলতে পারছিনা। তোমরা আর কিছু শুনোনা। তোমরা শুধু একবার বল, আমি কেমন করে বেঁচে থাকবো? ওগো! তোমরা বলতে পার এর চেয়ে বড় ব্যথা বুকে চেপে কেউ কি বেঁচে আছে? এত বড় দুর্ঘটনা কারো জীবনে ঘটেছে কি? কেমন করে সহ্য করবো? বিশ্ব কবির মত কি গান গেয়ে বেড়াব?

"এই করেছ ভালো নিঠুর
এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।"

—না, গাইব? "যত তাপ পাই
সহিবারে চাই
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।"

গেয়েছি। অনেকবার ও গান গেয়ে যন্ত্রনা ভুলতে চেষ্টা করেছি। তা তো পারিনি,—তাকে ভুলতে পারিনি। পারবোও না। ওইটুকু বয়সে এই দুটো পোড়া চোখে কতই ত দেখলুম, কৈ, এমন একটি প্রাণ ত আর দেখিনি! ভগবান কি তার ভাণ্ডারের সেরা ঐ একটি মাত্র প্রাণ পাঠিয়েছিলেন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। কবিকে তো গাইতে শুনেছি,— "দুঃখের পর পরম দুঃখে
তারই চরণ বাজে বুকে
সুখে কখন বুলিয়ে দেয়
সে পরশ-মণি।"

সেই ত আমার সান্ত্বনা। আচ্ছা, দেখি দুঃখের পর পরম দুঃখে, তাঁর চরণ বুকে বাজে কি না। এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি আছে?

বৃন্দাবনে চৌষট্টি মহান্তের সমাজবাড়ী

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

গত ফাল্গুনের শেষে বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। এই যে এখনকার শ্রীবৃন্দাবন ইহা আমাদের জগদ্গৌরব শ্রীচৈতন্য দেবের সৃষ্টি। আজিও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রভাব তথায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। একথা মথুরার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার গ্রাউস সাহেবও তাঁহার মথুরা বিবরণের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কন্থা-কৌপীন-করঙ্গধারী ভক্তগণের অবিনশ্বর কীর্ত্তি, জগদ্বাসী আজিও তথায় গিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে দর্শন করে। লর্ড কার্জ্জনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সগৌরবে বলিব যে পুরাতন গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য।

বর্ত্তমানে আমরা—প্রধানতঃ ৬৪ মহান্তের সমাজবাড়ী এবং আমলি তলা ও জগদীশ পণ্ডিতের পাটের দুর্দ্দশার কথা সঙ্ক্ষেপে বলিব। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে ছয় গোস্বামী, দ্বাদশ গোপাল, অষ্ট কবিরাজ, ৬৪ মহান্ত এবং ছয় চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশের এবং অপরাপর বহু ভক্তের সমাধি একটি স্থানে পাশাপাশিভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। ইহাই ৬৪ মহান্তের সমাজবাড়ী নামে বিখ্যাত।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা— আমার হতে ভক্তের পূজা বড়।" বড়ই দুঃখের বিষয় এই সমস্ত ভুবন-পাবন ভক্তবৃন্দের সমাধিস্থান গত ১৩৩১ সাল ১৯ আশ্বিন তারিখের শ্রীযমুনা আগমনে ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই স্থানের মহান্ত মহাশয় যে সমস্ত ভক্তের সমাধিগুলি সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করিয়াছেন তাহাদের নাম ও জমাখরচের তালিকা দিলাম। যথা,—রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ৬৮৷১০, কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ৭৭৲, নরহরি সরকার ঠাকুরের ফুল সমাধি ২০৳, বাসুদেব ঘোষ ২৪৲, মুরারি মুকুন্দ ৬৳৵০, ব্রহ্ম হরিদাস ফুল সমাধি ১২৲, বসু রামানন্দ চরণ পাদুকা সমাধি ২৪৷৴০, প্রিয় চক্রবর্ত্তী ৩৮৲, মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী ফুল সমাধি ৬৳৴০, কেশব ভারতী চবু তারা বাঁধাই ১৩৷৵০, সেন শিবানন্দ ৮৷৵০, একুনে ৩০০৲১০ খরচ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৩৩৲১০ এখনও বাজার দেনা আছে। অপরাপর সমাধিগুলির সংস্কার জন্য এখনও প্রায় চারিশত টাকার প্রয়োজন। বৃন্দাবনে বাঙ্গালীর এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থানটির গৌরব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য আমরা করযোড়ে ভক্ত পাঠকবৃন্দের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

এই ৬৪ মহান্তের সমাজবাড়ী গৌর ভক্তবৃন্দের বড়ই আদরের স্থান। ভক্তগণ এইস্থানে মহীর ক্রোড়ে চিরনিদ্রা-বৃত রহিয়াছেন। শিবানন্দ সেন তাঁহার তিন পুত্রসহ পাশাপাশি বিরাজ করিতেছেন। এই তিন পুত্রের সমাধি-গুলির সংস্কার হয় নাই। এইরূপ বহু সমাধি অসংস্কৃত রহিয়াছে।

গত কুম্ভের সময় কাশীমবাজারের মহারাজ, বামাচরণ বসু মহাশয়ের সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। বসু মহাশয় প্রত্যহ এইস্থানে আসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। তিনি বলিতেন বৃন্দাবনের মধ্যে ইহাই পরম শান্তিময় স্থান। আমরা তাঁহার কথার সত্যতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি। মহারাজা দশ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন এবং আরও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। গত ২৭।১২।২৭ তারিখে মহান্ত মহাশয় রেজিষ্ট্রী ডাকে তাঁহাকে শেষ পত্র দেন, ঐ পত্র নগেন্দ্রকুমার রায় সহি করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পত্রের কোন উত্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত রামায়ন বসু রাধাকুণ্ড তীরে গোপনে ভট্ট গোস্বামী ভজন কুটিরের সংস্কার করিয়া দিয়া তাঁহার গৌরভক্তের নামের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। আমরা এই স্থানটির প্রতি মহারাজের এবং তাঁহার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

ভাগলপুর, ৩০ নং বুড়ানাথ রোড নিবাসী জমিদার শ্রীবিশ্বেশ্বরলাল সিংহ সমাজবাড়ীর শ্রীশ্রীগোপীবল্লভের গৃহ পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তি বড়ই চিত্তাকর্ষক ও জাগ্রত। দুই বৎসর পূর্ব্বে পুরী রামচন্দ্র রাজসাহির উকিল যোগীন্দ্রনাথ মিত্রের ভগ্নি লীলাবতী দাসী উন্মাদিনী ভাবে এই স্থানে আসিয়া মুখে "সুধা" "সুধা" উচ্চারণ করিতে থাকেন। "রাধা" শব্দ উচ্চারণ হইতেছিল না। তাঁহাকে স্নান জল ও তুলসী দেওয়া হইলে কতক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন আজ হইতে ঠাকুরাণীর নাম "সুধা" হউক। আর তদবধি এই স্থানের শ্রীমূর্ত্তির নাম শ্রীশ্রীগোপীবল্লভ সুধারাণী হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি প্রায় দুই হস্ত উচ্চ, শুভ্রবর্ণের অঙ্গরাগ—দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

গত ১৯।১১।২৬ তারিখে কলিকাতা ৬নং ওল্ড পোষ্টাফিস ষ্ট্রীট নিবাসী সলিসিটর এ, কে, রুদ্র মহাশয় সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবন ধামে আগমন করেন। তাঁহার স্ত্রীর প্রতি সুধারাণীর স্বপ্নাদেশ হয় আমাকে চরণ চাঁদ ও পাঁজর দাও। ভাগ্যবান রুদ্র দম্পতি সুধারাণীর আদেশ প্রতিপালন করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া পত্র দিয়াছি।

গত ১৩৩৪ ১লা ভাদ্র তারিখে হরিদাসী সাহা নাম্নী জনৈকা যাত্রী মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর সমাধি হইতে কথা কীর্ত্তন শুনিয়া বিভোর হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রাম কুচিমরা, জেলা পাবনা নিবাসী কৃষ্ণসুন্দরী চৌধুরাণী জয়দেবের নিকট হইতে খোলবাদ্য ধ্বনি শুনিয়াছিলেন।

গত ১৩৩২ সালে কলিকাতা পোস্তা রাজবাটীর রাণী মাতা সখীসোনা দাসী একটি তুলসীমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। যাহাতে এই তুলসী তলায় প্রত্যহ সন্ধ্যা পড়ে তাহার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি এ বিষয়ে আর কোন সংবাদ রাখেন নাই। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহার কৃপা দৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি।

আমলি তলা—এই স্থানের অবস্থাও শোচনীয়। চরিতামৃতে উক্ত আছে;—

"কৃষ্ণলীলা কালের বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কন॥"

প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া এই প্রাচীন বৃক্ষটির নিম্নে উপবেশন করিয়াছিলেন। অদ্বৈত বংশীয় কোন প্রভু সন্তান কর্ত্তৃক এই স্থানে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরের সেবা প্রকাশ হইয়াছিল। একমূর্ত্তি শ্রীবৈষ্ণবের উপর সেবার ভার রহিয়াছে। স্থানের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সেবা কুঞ্জে একটি অন্ধ গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। ব্রজ-বাসীরা এই স্থানের কোন সংবাদ রাখেন না। সুতরাং কোন যাত্রীই যে এই স্থানে গমন করে না, তাহা বলা বাহুল্য! আমলি তলার অর্থাৎ তেঁতুল তলার তেঁতুল গাছটি এখন আর সেই কৃষ্ণলীলা কালের পুরাতন বৃক্ষ নহে। তবে ৭০।৮০ বৎসরের পুরাতন হইবে। তলাটি বাঁধান

এবং তাহাতে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আঁকা আছে। যাহাতে এই স্থানটির উন্নতি হয় তজ্জন্য দয়ালু ভক্তবৃন্দের কৃপাদৃষ্টিপাত প্রার্থনা করিতেছি।

জগদীশ পণ্ডিতের পাট—বড়ই পরিতাপের বিষয় এই এই প্রাচীন শ্রীপাট, এখানকার "কাত্যায়নী পীঠ" প্রতিষ্ঠাতা ধনী সন্ন্যাসী কেশবানন্দের তত্ত্বাবধানে আছে। শ্রীপাটের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের তিনি সেবার ভার লইয়াছেন। তাঁহার একজন কর্ম্মচারী প্রতিদিন নামমাত্র ঠাকুরের পূজা করিয়া গৃহ তালাবদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সামান্য যে কয়খানি দোকানের ভাড়া পাওয়া যায় তাহা তিনি এখনও দখল করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে এই গোস্বামী বংশের সেবাইত একজন বালক মাত্র।

আমাদের বক্তব্য বিষয় ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে সুতরাং আমরা এইস্থানে প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চাঁদা, মহান্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ, ৬৪ মহান্তের সমাজবাড়ী, বৃন্দাবন এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

দিগন্তের পারে

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন, কবিভূষণ

এইরূপে একে একে চল সবে চল যাই
দিগন্তের পারে।
বাজিছে শ্রবণমূলে মরণের বাঁশীখানি
নীরব ঝঙ্কারে।
চাহিবে না আর তুমি, চাহিলেও আর কিছু
নাহি পা'বে ফিরে।
ব্যর্থ জীবনের তরে সোনার জগৎখানি
বাঁধা আঁখিনীরে!
কি জীবন তব তরে রহিয়াছে মৃত্যুপরে,
নাহি আছে জানা;
তথাপি যেতেই হ'বে মরণের এই ডাকে,
শুনিবে না মানা!
খুলে দাও তরীখানি, ছেড়ে দাও ভাঙ্গা হাল,
তুলে দাও পাল!

অজানা দিগন্তহারা অকূল সিন্ধুর পারে
যেতে হ'বে কাল!
পশ্চাতে স্বজনগণ তুলিবে ভীষণ রোল,
শুনিবে না কাণে!
সব সাধ, সব সুখ ধরা-তটে রেখে চল
মরণের টানে।
এসেছিলে যবে হেথা, এসেছিলে অন্ধকারে,
স্মরণ না আছে।
যাইতেছ হেথা হ'তে, বিস্মৃতি তোমার সাথে
যায় পাছে পাছে!
এ শুধু ধূলার খেলা! সোনার স্বপন সব
ভেঙ্গে চুরমার!
এ খেলা করিতে শেষ পিছে পিছে মৃত্যুছায়া
ঘুরে অনিবার।

বাংলার প্রাণিসঙ্ঘ*

ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্ ডি

কোন দেশ বা প্রদেশে যে সমুদয় প্রাণী দৃষ্ট হয়, তাহাদের সমষ্টির নাম প্রাণিসঙ্ঘ। বঙ্গদেশে বহুবিধ প্রাণী দৃষ্ট হয় এবং তৎসম্বন্ধে অনেক জানা আছে এবং জানিবারও আছে। আমরা এই বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

সাহিত্যে প্রাণী

প্রথমতঃ, দেখা যাউক আমাদের নিজেদের সাহিত্যে ইহাদের বিষয় কি জানিতে পারি। অতি প্রাচীনকাল হইতে আমরা বহু প্রাণীর নাম লিপিবদ্ধ দেখিয়া আসিতেছি। চারি বেদ, ব্রাহ্মণাদি, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ, কাব্য, অভিধান ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে বহু প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাকৃত এবং বঙ্গভাষায় ঐ সকল প্রাণীর নামের অপভ্রংশ এবং অন্যান্য নূতন নামও আমরা দেখিতে পাই। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বহু পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উভচর, মৎস্য, পর্ব্বপদীর অন্তর্ভুক্ত অনেক প্রাণী, কীট ও ক্রিমির নাম জানিতে পারি। কিন্তু কোনও গ্রন্থে তাহাদের পরিচয়ের জন্য কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ, চক্ষে দেখিয়া বংশানুক্রমে বহু প্রাণীর পরিচয় হইয়া আসিতেছে, ইহার ফলে দাঁড়াইয়াছে যে বহু প্রাণীর নাম মাত্র পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের পরিচয়ের কোন উপায় নাই; এইরূপে আমাদের প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের অনেক হ্রাস হইয়াছে। যে প্রাণিগুলি নানাকারণে মানবের সহিত সম্বন্ধ (যেমন যে সকল পশু, পক্ষী ও মৎস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যাহারা নানা উদ্দেশ্যে গৃহে পালিত হয়, যে সকল প্রাণী সচরাচর বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয় অথবা যাহারা নানাপ্রকারে ক্ষতিসাধন করে), সেগুলি আমাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আমরা অভিধান হইতে প্রাণি-পরিচয়ের সাহায্য পাই। অভিধান-কারগণ একটা প্রাণীর বহু নাম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ঐ সকল নামের অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা প্রাণীটির আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে অনেক জানিতে পারি। ঐ সকল লক্ষণ একত্রে প্রাণীটির পরিচয়ে অনেক সহায়তা করে। এই সকল লিপিবদ্ধ নাম ভিন্ন আমরা প্রাণীর অনেক দেশীয় নাম লোকমুখে শুনিতে পাই; পুনশ্চ এক প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এইরূপে এক মৎস্যের বহু নাম পাওয়া যায়। এই সকল দেশীয় নাম বহুস্থলে সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত কথার অপভ্রংশ হইলেও তাহাদের অনেকগুলি নূতন গঠিত বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু, বহু প্রাণী অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি; আরও বহু প্রাণী আছে যাহাদিগকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল প্রাণীর বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি; আমাদের আদি সাহিত্যে তাহাদের উল্লেখ থাকাও সম্ভবপর নহে। আমরা আধুনিককালে অভিধান এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেশীয় প্রাণিগণের উল্লেখ এবং যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বেদাদি গ্রন্থে বহু প্রাণীর নাম এবং কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন। আমিও ঐ বিষয় লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছি; ইহা প্রবন্ধাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ইংরেজ-রাজত্বে প্রাণিসঙ্ঘ

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইল, তাহা হইতে বাংলার, কেবল বাংলা কেন, সমুদয় ভারতের প্রাণিসঙ্ঘের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতে আগমনপূর্ব্বক এদেশের প্রাণিগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক নাম সঙ্কলন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা

* মাজু (হাওড়া) সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

যে কেবল এই কার্য্যে রত হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা ভারতের নানাস্থান হইতে নানা প্রাণী সংগ্রহ করতঃ তাহাদের মৃতদেহ সুরা প্রভৃতি দ্রব পদার্থে রক্ষিত করিয়া ইউরোপে পাঠাইতে লাগিলেন। ইউরোপের নানা সাময়িক পত্রে ঐ সকল প্রেরিত প্রাণিগণের বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিনিয়াস্ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত তাঁহার প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞানগ্রন্থে ভারতীয় অনেক পশু, পক্ষী ও মৎস্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যে সমুদয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আমাদের দেশে আগমনপূর্ব্বক বাংলার প্রাণিগণের পরিচয়ের উন্নতিকল্পে মনযোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে হামিল্‌টন বুকানন সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গদেশের বহু পশু, পক্ষী এবং মৎস্যের রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করাইয়া তাহাদের সঙ্গে দেশীয় এবং বৈজ্ঞানিক নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল চিত্রের কতকগুলি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বহু মৎস্য এবং পক্ষীর রঞ্জিত চিত্র Asiatic Society of Bengal-এর গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। সম্প্রতি যাদুঘরের গ্রন্থাগারের জন্য মৎস্যগুলির চিত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করান হইয়াছে। হামিল্‌টন সাহেব Fishes of the Ganges নামে একখানি গাঙ্গেয় মৎস্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন; গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য হইলেও অনেক গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার এক বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি দেশীয় নামগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন এবং যথাসম্ভব ঐ নামগুলি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গঠিত বৈজ্ঞানিক নামগুলিতে অনেক মৎস্যের দেশীয় নাম রক্ষিত হইয়াছে। আমরা সকলে জানি যে, কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। একটি নাম দুই শব্দে গঠিত—প্রথম শব্দটি গণের (genus) নাম এবং দ্বিতীয়টি জাতীয় নাম (name of the species)। দুইটিতে মিলিয়া নামকরণ হইল। যেমন রুইমাছের বৈজ্ঞানিক নাম Cyprinus ruhu; এস্থলে Cyprinus কথাটি গণের নাম (রুই প্রভৃতি মাছ যে গণের অন্তর্ভুক্ত)। দ্বিতীয় শব্দটি জাতীয় নাম এবং এস্থলে দেশীয় নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। হামিল্‌টন সাহেবের নামকরণের এই রীতির জন্য আমাদের অনেক দেশীয় নাম রক্ষিত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ অনেক নাম লোপ পাইত। আজকাল পক্ষীদিগের বহু অন্তর্জাতি (sub-species) নির্ণীত হওয়ায় তিনটি শব্দ যুক্ত বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহৃত হইতেছে—প্রথম শব্দটি গণের, দ্বিতীয়টি জাতীয় এবং তৃতীয়টি অন্তর্জাতীয়। ক্রমশঃ অন্যান্য প্রাণিগণের নামও এইরূপে গঠিত হইতে থাকিবে। যাহা হউক হামিল্‌টন-বুকাননের গঠিত নামগুলির অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ জাতীয় নামগুলি চলিত আছে, এবং তাঁহার নাম এ সম্পর্কে চিরদিন বিরাজমান থাকিবে। তাঁহার পদানুসরণ করিয়া রাসেল, ফ্রেয়ার, ডে, জর্ডান প্রভৃতি বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতীয় প্রাণিগণের বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও অনেক স্থলে জাতীয় নামের জন্য দেশীয় নাম গ্রহণ করিয়া ঐসঙ্গে দেশীয় নামগুলিও লিপিবদ্ধ করিলেন। এইরূপে বহু ভারতীয় (তৎসঙ্গে বঙ্গদেশীয়) পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, পতঙ্গ, লৌতেয় প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই কার্য্যে বহু অগ্রসর হইলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় Fauna of British India নামক পুস্তক ধারাবাহিকরূপে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পুস্তকে ভারতবর্ষ, লঙ্কাদ্বীপ এবং ব্রহ্মদেশের প্রাণিগণের বিবরণ এবং যথাসম্ভব প্রকৃতি লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। আজিও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতেছে এবং এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে খণ্ডে খণ্ডে ভারতীয় পশু, পক্ষী (ইহার দ্বিতীয় বর্দ্ধিত এবং পরিশোধিত সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে), সরীসৃপ ও উভচর, মৎস্য, কোমলাঙ্গী, কয়েক বর্গান্তর্গত পতঙ্গ, লৌতেয় স্পঞ্জ, পুরুভুজ এবং সজ্জপ্রাণী জলৌকা প্রভৃতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও বহু প্রাণির বিবরণ প্রকাশিত হইতে বাকি আছে। আমরা এস্থলে আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পুস্তকখানি বঙ্গদেশে মৎস্যের চাষ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। মিঃ কে, সি, দে, আই সি এস্ মহাশয় বঙ্গদেশীয় মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত

হইয়া পুস্তকখানি সম্পাদন করেন। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বৈজ্ঞানিক নামের সহিত অনেক স্থানীয় নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। যদিও মৎস্যের চাষ বঙ্গদেশে স্থায়ী হইল না, তথাপি দেশীয় মৎস্যের নাম রক্ষার দিক্ হইতে দেখিলে পুস্তকখানি দেশের হিত সাধন করিয়াছে। আমরা এজন্য গ্রন্থকারের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আজকাল Zoological Survey of Indiaএর সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের প্রকাশিত Records of the Indian Museum নামক সাময়িক পত্রে ক্রমশঃ বহু প্রাণীর বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে স্বর্গীয় Nelson Annandale সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পূর্ব্বেও যাদুঘরের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরূপে বহু প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতে আগমন করিয়া বহু ভারতীয় প্রাণিসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে Neville, Anderson Finn, Alcock প্রভৃতি সাহেবগণ বিশেষভাবে পরিচিত। Alcock সাহেব অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত ভারতীয় দশপদী খোলকীর বিবরণ তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। আজকাল বিদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যতীত কয়েকজন বঙ্গবাসী বঙ্গের প্রাণিতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। তন্মধ্যে এই নগণ্য অভিভাষণকারী ভিন্ন ডাঃ বি, কে, দাস, শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের অধীন গবেষণাকারী ছাত্র মিঃ ভাদুড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকল দেশেই প্রাণিসত্ত্বের বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

প্রাণি-সমষ্টির জ্ঞান

তৃতীয়তঃ, প্রাণিসমষ্টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ভারতীয় প্রাণিসত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, অবশ্য তাহাতে বঙ্গীয় প্রাণিসত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আমরা প্রাণিগণের শ্রেণীবিভাগ ধরিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিতে থাকিব।

আদ্যপ্রাণী

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর প্রাণিগুলি আদ্যপ্রাণী (Protozoa) নামে অভিহিত। সাধারণতঃ ইহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—Sarcoda বা উপপাদিক, Mastigophora বা প্রতোদী, Ciliophora বা লোমাঙ্গী এবং Sporozoa বা রেণুজপ্রাণী। ইহারা জলে, জলসিক্ত স্থলে এবং অন্য প্রাণীর দেহ-মধ্যেও বাস করে। আদ্যপ্রাণিগণ বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় আদ্যপ্রাণিগণের বিবরণ যৎসামান্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমি দ্বিতীয় শ্রেণী ভিন্ন বাকি তিনটির অন্তর্গত অনেকগুলি প্রাণীর বিবরণ নানা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। বহু বৎসর পূর্ব্বে Asiatic Society of Bengalএর সাময়িক পত্রে কতকগুলি প্রতোদীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরান্তঃবাসী প্রতোদী লইয়া আলোচনা করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় আদ্যপ্রাণিগণের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় আদ্যপ্রাণিগণের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহার প্রণয়নে বহু কর্ম্মীরও প্রয়োজন।

ছিদ্রালদেহী ও সুষিরাস্ত্রী প্রাণী

অতঃপর আমরা ছিদ্রালদেহী (Porifera) এবং সুষিরাস্ত্রী (Phyla) নামক দুইটি বিভাগের প্রাণিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। স্বর্গীয় Annandale সাহেব Fauna of British Indiaতে এ সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ছিদ্রালদেহীকে চলিত কথায় স্পঞ্জ বলা হয়, তবে কথাটি বিদেশীয়। আমরা পুকুরে Spongilla জাতীয় কয়েক প্রকার স্পঞ্জ দেখিতে পাই। এই বিভাগের প্রায় সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবাসী হইলেও একটিমাত্র বংশ (Spongillidæ) স্বাদু জলে জন্মিয়া থাকে; আমাদের পুকুরের স্পঞ্জ এই বংশের অন্তর্গত। পুকুরের স্পঞ্জগুলি কখন কখন সবুজবর্ণ এবং কখনও মলিন শ্বেতবর্ণ। ইহা কোন জলমগ্ন পদার্থকে আশ্রয়

করিয়া থাকে এবং প্রায়ই বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করে। ইহা দেখিতে গোলাকার অথবা দীর্ঘাকার।

সুষিরান্ত্রীর প্রকারভেদ

সুষিরান্ত্রী বিভাগের অন্তর্গত Hydra নামক এক প্রাণী আমাদের দেশে পুকুরে দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে দেখা যায়। ইহা একটি ১/৪ ইঞ্চি লম্বা সরু কাঠির মত; একদিকে কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকে, অপর দিকে সরু চুলের মত কয়েকটি শুণ্ড সংলগ্ন থাকে। ইহার বর্ণ শ্বেত। Hydra জাতীয় আর এক প্রকার প্রাণী লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হয়; বাদার খালে সময়ে সময়ে ইহা বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ইহার নাম Irene ceylonensis। এই প্রাণীর জীবনে দুইটি অবস্থা লক্ষিত হয়। প্রথম অবস্থায় ইহা দেখিতে অনেকটা Hydraর মত, ইহাদের অনেক-গুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া একত্র বাস করে। ইহার গাত্র হইতে মুকুলের মত প্রবর্দ্ধন উত্থিত হয় এবং তাহা হইতে একটি প্রাণী জন্মায়। প্রাণীটি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহার গাত্র হইতে স্খলিত হয় এবং জলে স্বাধীনভাবে জীবিত থাকে। এই প্রাণী দেখিতে উন্মুক্ত ছত্রের ন্যায় এবং ইহাকে Medusa বা ছত্রকপ্রাণী বলা হয়। ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। ছত্রকপ্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষভেদ লক্ষিত হয়। তাহাদের দেহাভ্যন্তরে ডিম্বাণু এবং শুক্রকীটাণু জন্মিয়া পরে জলে ক্ষরিত হয়; তাহারা জলে একত্র হইয়া ক্রমশঃ একটি Hydraর মত প্রাণীতে পরিণত হয়। সুষিরান্ত্রী বিভাগের অন্তর্গত আরও অনেক প্রাণী দৃষ্ট হয়, যাহারা সমুদ্রের জলে বাস করে। ইহারা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে দৃষ্ট হয়। প্রবাল ইহাদের মধ্যে সুপরিচিত; ইহাদের কঙ্কাল দেখিতে অতি সুন্দর এবং নানাপ্রকার আকৃতি ধারণ করে। এই সকল সুষিরান্ত্রী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ যাদুঘর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা পুরী গিয়াছেন, তাঁহারা সমুদ্রের ধারে এইরূপ বহু প্রাণী দেখিয়া থাকিবেন।

চিপিট কৃমি

আমরা এক্ষণে চিপিট কৃমি (Platyhelminthes) সম্বন্ধে দেখিব। আমাদের ফিতা কৃমি, পাতার ন্যায় কৃমি, প্রভৃতি চেপ্টা কৃমিগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের অধিকাংশ অন্যান্য প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে বাস করে; কিন্তু একজাতীয় কৃমি (Turbellaria) জলে বাস করে। পুকুরের জলে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। মানবের দেহে যে সকল ফিতা-কৃমি ও পত্র-কৃমি (flukes) দৃষ্ট হয় তাহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে সকল ফিতা ও পত্র-কৃমি মানুষের দেহে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু অধিকাংশ মেরুদণ্ডীর অন্ত্র এবং দেহ-গহ্বরে ফিতা-কৃমি ও পত্র-কৃমি পাওয়া যায়। বাংলায় যে সকল মৎস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহাদের দেহে নানাপ্রকার ফিতা-কৃমি দেখা গিয়াছে। আমাদের সাধারণ ভেক, গৃহগোধিকা, নানাজাতীয় সর্প, কচ্ছপ, অনেক প্রকার পক্ষী এবং গৃহপালিত পশুর অন্ত্রাভ্যন্তরে নানাজাতীয় ফিতাকৃমি পাওয়া গিয়াছে; এইগুলি শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। পত্র-কৃমিও ঐরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভেড়ার পিত্তনালীতে এক প্রকার পত্র-কৃমি দেখা যায়।

বর্ত্তুল কৃমি

আর এক বিভাগের কৃমি দৃষ্ট হয় যাহাদিগকে বর্ত্তুল কৃমি বলে (Nemathelminthes)। আমাদের ছেলেদের মলদ্বারের ছোট কৃমি, বয়স্ক ব্যক্তিগণের অন্ত্রস্থ বড় কৃমি, প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত; Ankylostoma duodenalis এবং Filaria medicinensis নামক দুই প্রকার কৃমিও বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। ইহাদের প্রথমোক্ত কৃমিটি এক প্রকার রক্তাল্পতা রোগ উৎপাদন করে। দ্বিতীয় কৃমি দ্বারা এক প্রকার নালী ঘা উৎপন্ন হয়; অথর্ব্ব বেদ এবং কৌশিক সূত্রে ইহার উল্লেখ আছে। মানুষের অন্ত্র এবং রক্তে বহুপ্রকার বর্ত্তুল কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি আমাদের সব জানা আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রাণীর অন্ত্রে এইরূপ কৃমি দৃষ্ট হয়। সাধারণ আরসুলা, টিকটিকি, ভেক, গিনিপিগ, প্রভৃতির অন্ত্রে বহু প্রকার বর্ত্তুল ক্রিমি পাওয়া যায়। পুনশ্চ, বহু প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বর্ত্তুল কৃমি ভিজা মাটিতে বাস করে। এইগুলি দেখিতে শিশুদিগের মলদ্বারের ছোট কৃমির ন্যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাণের পোকার যে হুজুক উঠিয়াছিল, তাহাতে এই কৃমিগুলিকে পাণের পোকা বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মাটিতে বাস করে এবং পাণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

কণ্টকশুণ্ডী

কণ্টকশুণ্ডী (Acanthocephala) নামক এক প্রকার কৃমি জাতীয় বিভাগের প্রাণিগুলির সম্বন্ধে এদেশে কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। আমি সাধারণ কোলাবেঙের দেহাভ্যন্তরে এই জাতীয় কৃমি দেখিয়াছি।

পিণ্ডালদেহী

কোমলাঙ্গী বা পিণ্ডালদেহী (Mollusca) নামক বিভাগের অন্তর্গত শামুক, গুগ্‌লি, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণী বঙ্গদেশে বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। Fauna of British India এবং Records of the Indian Museumএ এই বিভাগের বহু প্রাণীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসামের আবর প্রদেশ হইতে বহুবিধ প্রাণী সংগৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে কতকগুলি খোলাবিহীন শামুকজাতীয় প্রাণী পাওয়া যায়। ঐ প্রাণিগুলির বিবরণ লিখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। Records of the Indian Museumএ ঐগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

চক্রবাহী

চক্রবাহী (Rotifera) নামক বিভাগের অন্তর্গত বহু প্রাণী বঙ্গদেশে দৃষ্ট হয়। এইগুলি আণুবীক্ষণিক। ইহারা সচরাচর জলের ভিতর গাছে সংলগ্ন থাকে এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। ইহারা দেখিতে এত সুন্দর যে বহু সাধারণ ব্যক্তি সখ করিয়া ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। Hudson এবং Gosse সাহেবের Rotifera নামক পুস্তক জগদ্বিখ্যাত। Asiatic Society of Bengal হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রে বহু দিন পূর্ব্বে কয়েকটি চক্রবাহী প্রাণীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহাদের আলোচনা, গবেষণার এক নূতন পথরূপে এখনও উন্মুক্ত রহিয়াছে।

পর্ব্বিত কীট

এক্ষণে আমরা পর্ব্বিত কীট সম্বন্ধে (Annelida) দেখিব। কেঁচুয়া এবং জোঁক এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Michaelson নামক একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ভারতবর্ষ এবং লঙ্কা দ্বীপের কেঁচুয়া জাতীয় পর্ব্বিত কীটগুলির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তীকালে Stevenson নামক আর একজন সাহেব ঐ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন; ইনি Fauna of British Indiaতে কেঁচুয়া জাতীয় পর্ব্বিত কীট-গুলির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অল্প দিন হইল, ভারতীয় জলৌকাগুলির বিবরণ Fauna of British Indiaতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতায় কয়েক প্রকার সবিষ ও নির্বিষ জলৌকার উল্লেখ এবং অতি সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। আমি সেই পুস্তকের সাহায্যে ঐ জলৌকাকয়টির পরিচয় এবং বৈজ্ঞানিক নাম নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। Asiatic Society of Bengalএর মাসিক অধিবেশনে ঐ প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছে, এখনও প্রকাশিত হয় নাই। আর এক জাতীয় পর্ব্বিত কীট (Polychacta) লবণাক্ত জলে দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনে বাদার জলে এইরূপ কয়েক জাতীয় কীট পাওয়া যায়; সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নাই।

পর্ব্বপদী

আমরা এক্ষণে পর্ব্বপদী (Arthropoda) নামক এক বৃহৎ বিভাগে উপনীত হইলাম। অসংখ্য প্রাণী এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। খোলকী (Crustacea) (যেমন চিংড়ি, বিছাচিংড়ি, কাঁকড়া) পতঙ্গ বা ষট-পদী (Insecta) (যেমন আরসুলা, প্রজাপতি, মাছি, ফড়িঙ্), লৌতের

(Arachnida) (যেমন মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা, এঁটুলি), শতপাদিক (Chilognatha) (তেঁতুলিয়া বিছা), দ্বিযুগ্ম-পদী (Diplopoda) (কেন্নুই) এই বিভাগের অন্তর্গত। ইহাদের সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা হইয়াছে, তথাপি বহু গবেষণার আবশ্যক। Fauna of British India তে কয়েক বর্গীয় পতঙ্গ এবং লৌতেয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। Alcock সাহেবের পুস্তকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ দশপদী খোলকীর বিবরণ পাওয়া যায়। যাদুঘর হইতে প্রকাশিত পত্রিকাখানিতে Kemp সাহেব অনেক-গুলি খোলকীর বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এখনও অনেক করিবার আছে। আমাদের পুকুরে বহুবিধ ক্ষুদ্রাকার খোলকী দৃষ্ট হয়; সেগুলির বিবরণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের কাদা চিংড়ি (Mysidacea) এক বর্গের খোলকীর অন্তর্গত। পর্ব্বপদী বিভাগের অন্তর্গত আন্তপর্ব্বপদী নামে একটা শ্রেণী আছে, যাহার অন্তর্গত প্রাণিগুলি দেখিতে কীটের ন্যায়। এই শ্রেণীর প্রাণি-গুলিকে পর্ব্বদেহী এবং পর্ব্বপদীর মধ্যবর্ত্তী মনে করা হয়। আরব হইতে এই জাতীয় অনেকগুলি প্রাণী সংগৃহীত হইয়াছিল। Kemp সাহেব ইহাদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

সঙ্ঘ-প্রাণী

শৈলজ বা সঙ্ঘ-প্রাণী (Polyzoa) নামে এক বিভাগে অনেকগুলি প্রাণী দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি প্রাণী একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করে। বঙ্গদেশে কয়েক প্রকার সঙ্ঘপ্রাণী দৃষ্ট হয়। ইহারা পুকুরের জলে গাছের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া বাস করে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়, কলিকাতার পুকুরে বহুবার এই জাতীয় প্রাণী দেখা গিয়াছে।

মন্দগামী (Tardigrada) নামক কয়েকটি আণুবীক্ষণিক প্রাণী আছে, যাহারা দেখিতে ঠিক ভালুকের মত। এদেশে এ প্রাণীর কোন আলোচনা হয় নাই। বহুদিন হইল, আমি গাছের টবের মাটিতে এই প্রাণী দেখিয়াছিলাম। সুতরাং ইহারা যে বঙ্গে দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কণ্টককর্ম্মী

কণ্টককর্ম্মী (Echinodermata) নামে এক বিভাগে তারা মৎস্য, ভঙ্গপ্রবণ তারা, জল-কণ্টকী, জল-কুষ্মাণ্ড নামে বহু প্রাণী দৃষ্ট হয়। ইহারা সমুদ্রের তলায় বাস করে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই সকল প্রাণী দৃষ্ট হয়। যাদুঘর হইতে ইহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

মেরুদণ্ডী

অবশেষে আমরা মেরুদণ্ডী প্রাণিগুলির নিকট উপস্থিত হইলাম। কয়েক জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী ভিন্ন মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও পশু এই বিভাগের অন্তর্গত।

মৎস্য

মৎস্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। Hamilton সাহেবের Fishes of the Ganges প্রকাশিত হইবার পর Day সাহেব Fishes of India নামক এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন; ইনিই আবার Fauna of British Indiaতে ভারতীয় মৎস্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের পর আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ বি এল চৌধুরী মহাশয় বহুদিন যাবৎ মৎস্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন; তিনি বহু অজ্ঞাত মৎস্য আবিষ্কার এবং তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন। ইনি অবসর গ্রহণ করিলে ডাঃ সুন্দরলাল হোরা মহাশয় এখনও মৎস্যের চর্চ্চা করিতেছেন। সম্প্রতি আমি বঙ্গভাষায় বাংলার মৎস্য পরিচয় নামক প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকৃতি নামে দ্বৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে যতদূর সম্ভব মৎস্যগুলির দেশীয় নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

উভচর ও সরীসৃপ

ভারতীয় উভচর এবং সরীসৃপগুলির বিবরণ Fauna of British Indiaতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ভেক উভচর শ্রেণীর অন্তর্গত। সরট, সর্প, কুমীর ও

কচ্ছপ সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত। Fayrer নামক সাহেব ভারতীয় বিষধর সর্প এবং তাঁহাদের বিষ সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল Wall নামক এক সাহেব Poisonous Terrestrial Snakes of India নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থে বঙ্গদেশের সর্পের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্যান্য বঙ্গীয় সরীসৃপ সম্বন্ধে আর কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

পক্ষী

Fauna of British Indiaতে দুই সংস্করণে ভারতীয় পক্ষীর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; পক্ষীদের বিবরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বঙ্গদেশে ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা মহাশয় বহুদিন হইতে পক্ষী সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিতেছেন এবং কয়েকখানি পুস্তকও সঙ্কলন করিয়াছেন।

পশু

পশু সম্বন্ধেও আমরা Fauna of British Indiaএর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে পারি। ইহার পর সময়ে সময়ে নানা পত্রিকায় পশু সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমরা বিভিন্ন বিভাগের প্রাণিদিগের সম্বন্ধে আলোচনায় দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্গদেশের, বঙ্গদেশ কেন, সমুদয় ভারতবর্ষের প্রাণিসঙ্ঘের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এখনও অতিশয় অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতি দৃক্‌পাত করি তখন দেখিতে পাই—সকল দেশেরই প্রাণিসমষ্টি সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কেবল ভারতবর্ষ অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও অনেক পিছাইয়া পড়িয়া আছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম দুঃখ এবং লজ্জার কথা নহে। আজকাল যেমন এদেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, প্রাণিবিজ্ঞানের আলোচনা যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রাণিবিজ্ঞানের এইদিক্—প্রাণিসঙ্ঘ—কেন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিবে? যাহাতে বঙ্গের প্রাণিসঙ্ঘের জ্ঞান শীঘ্রই সম্পূর্ণতা লাভ করে, তদ্বিষয়ে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনোযোগী হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা। এতদিন বিদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আমাদের দেশে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আজ যেন আমাদের স্বদেশীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই কার্য্যে ব্রতী হন, ইহা আমার ঐকান্তিক বাসনা।

তৃষ্ণা

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১১)

"তারপর ? এখন কি বল্‌তে চাও ?"

"তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।"

"কেন ?"

"আমার আর এখানে থাকৃতে ইচ্ছে নেই।"

"কারণ ?"

"কারণ অনেক।"

"তবু।"

"সে শুনে কি কর্‌বে ?"

"বলই না ?"

"কারণ তুমি। ভাগ্যক্রমে যদি এতদিন পরে হারাণ-মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি, তাকে কি আমি ছাড়্‌তে পারি ?"

"তবে কি আঁচলে বেঁধে রাখ্‌বে ?"

"রাখ্‌বার হলে কি ছাড়্‌তুম ? সত্যি বল্‌ছি তুমি আমায় নিয়ে বল। আমি তোমার সাধনার শ্রমের অনেক লাঘব কর্ব্ব।"

"চমৎকার !" বলিয়া শীলভদ্র ঈষৎ হাস্য করিল।

"হাস্‌ছ কেন গা ? একবার আমায় নিয়ে দেখ, পরিশ্রমের লাঘব হয় কিনা।"

"তা বটে লাঘব যা হবার তা বেশ বোঝা গেছে ; শেষ কালে তোমাকে সাম্‌লাতে গিয়ে একূল ওকূল দুকূল যাবে।"

"কি রকম ?"

"যেমন গৃহীদের হয়ে থাকে ; যতদিন একলা থাকে, কোন ভাবনা চিন্তা নেই ; দিব্বি আমোদ-আহ্লাদে দিন কেটে যায় ; যেই গৃহিণী ঘরে আসে, অমনি, আজ এটা চাই, কাল সেটা চাই, পরশু অমুক জিনিষটার অভাব ; আজ ছেলের অসুখ, কাল মেয়ের বিয়ে, পরশু গৃহিণীর মাথা ধরা—এই সব সার বন্দী ঢেউয়ের উপর ঢেউ দৈত্য-দানার মত চারিদিক্ ঘিরে নেচে বেড়াতে লাগ্‌ল ! আর তার মাঝখানে পড়ে কর্ত্তা বেচারীর প্রাণান্ত ! তখন বেচারীর সুখ ত চুলোয় যাক্, কলুর বলদের মত সংসার-ঘানির চারদিকে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ ! কেউ বোঝে না তার দুঃখ, কেউ বোঝে না তার মর্ম্ম-জ্বালার তীব্রতা, কেউ ফিরে চায় না তার দিকে ! তোমাকে নিয়ে গেলে আমারও ত সে দশাই হবে ?"

নৈশান্ধকারের বিপুল মসীমাখা কাল ছায়ার অন্তরালে যে অপূর্ব্ব খদ্যোতমালা অদূরবর্ত্তী রসাল বৃক্ষের শীর্ষদেশস্থিত স্বর্ণলতার গায়ে একবার জ্বলিতেছিল, আবার নিবিতেছিল, সেই দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তৃষ্ণা বলিল—"তোমরা শুধু সংসারের মন্দটাই দেখ। ভাল জিনিষটা তোমাদের চোখে পড়ে না—ভারি একচোখো যাহোক !"

"ভাল নেই, তা দেখ্‌ব কি করে ?—থাকৃলে ত দেখ্‌ব ?"

"তা' কি কখনো হয় ?"

"কেন হবে না ?"

"তবে এত লোক সংসারে রয়েছে কি করে ?"

"কি কর্‌বে, জালে জড়িয়ে পড়েছে—বেরোবার উপায় নেই ; কাজেই চোখবুজে পড়ে আছে ;—কিন্তু যেদিন চোখ খুল্‌বে, বুঝ্‌তে পার্‌বে আপনার দৈন্য, নিজের স্বরূপ-অবস্থা, সেদিন আর থাকৃতে পার্‌বে না ; ছুটে বেরিয়ে যাবে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত, নীল মেঘ-বক্ষবিহারী বিদ্যুতের তীব্র জ্বালার মত, জলোচ্ছ্বাসের ভীম কল্লোলের মত ; গুটি পোকা যেমন নিজের ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকে অজ্ঞানতার মোহে, আর ভাবে ঐ বদ্ধতাই একটা সুখের

ঘনীভূত মাধুরী, ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রজাপতিরূপে পরিণত হয়ে তার চোখ না খোলে, যতক্ষণ আকাশের সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলিমার দীপ্ত ছবি তার মানস নেত্রপটে প্রতিবিম্বিত না হয়, ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, নদীর কলোচ্ছ্বাস তার কাছে এসে না প্রাণের নিবেদন জানায়; কিন্তু স্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সূত্রের বন্ধনী ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে মুক্ত অম্বরের অসীমতার মাঝে, আনন্দের অপূর্ব্ব দ্যুলোক রাজ্যের প্রজা হ'তে; মানুষও ঠিক তাই, যেদিন বুঝ্‌বে—সেদিন আর থাক্‌বে না।''

"তোমার একথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, তোমার কথা মত যদি সকলেই সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, তবে যে বিধাতার সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যাবে! তখন প্রজা বৃদ্ধি বন্ধ হবে; বালকবালিকার হাস্য কোলাহলে ধরণীর শুষ্কতপ্তবক্ষে প্রফুল্লতার মন্দাকিনী প্রবাহিত হবে না—একটা নীরব নীরসতা পৃথিবী আচ্ছন্ন করবে—তারপর সৃষ্ট জীবের মৃত্যুর সঙ্গে মানব জাতির নাম বসুন্ধরার বিশাল বক্ষ হতে লুপ্ত হয়ে যাবে—এ কখনো বিধাতার অভিপ্রেত বলে মনে হয় না। তারপর আরও দেখ, শুষ্কতা, রুক্ষতা, প্রাণহীনতার অন্তরালেও সুখের, শান্তির, আনন্দের উৎস-ধারা বয়ে যাচ্ছে নীরবে, নিভৃতে, অন্যের অলক্ষিতে; তুমি একটু আগে যে সংসার-চিত্র আঁক্‌লে, ঠিক তার প্রতিকূল ছবিও ত একে দেখান যেতে পারে; যেমন ধর মানুষ যত দিন একা থাকে, ততদিন তার প্রাণের মাঝখানে একটা অপূর্ণতা, একটা শূন্যতা, একটা মসীমাখা কৃষ্ণছায়া বসেছিল নিশ্চল স্থাণুর মত; তারপর যখন সে প্রাণের সঙ্গী পেলে, তখন তার আনন্দের উৎসমুখ খুলে গেল; পুত্রকন্যার আগমনে তাহার গৃহ আনন্দোজ্জ্বল রমণীয় হয়ে উঠ্‌ল; হয়ত, যখন সে কঠোর পরিশ্রমের অবসানে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী এল মধ্যাহ্ন রৌদ্রের তীব্র প্রখরতার মাঝখানে, যখন আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য ধরাবক্ষে অগ্নিবৃষ্টি করচে, তখন গৃহিণী এসে মিষ্ট বচনে, তাল বৃন্তের ব্যজনে তার ক্লান্তি দূর করে দিল; সুমিষ্ট পানীয় দানে শুষ্ককণ্ঠে সরসতা নিয়ে এল, তুমি কি বল্‌তে চাও এর কোন মূল্য নেই? রোগে জীর্ণদেহ স্বামী মৃত্যুর সঙ্গে যুঝ্‌বে, আর স্ত্রী দিনরাত অক্লান্ত সেবায় স্বামীর রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে আনন্দের ছবি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করবে—তার কি কোন মূল্য নেই? অবশ্য তোমার মত পাষাণের কথা স্বতন্ত্র!"

"তুমি যা বল্‌লে তা একটি দিক্ মাত্র; হয়তঃ তার মধ্যে সামান্য একটু তৃপ্তি মানুষ পায়, নৈলে মানুষ তার মাঝখানে থাক্‌তে পার্‌ত না। দুঃখকে মানুষ বরণ করে নিতে পারে তখন, যখন দুঃখের মাঝেও সে দেখে সুখের মধুর মূর্ত্তি হেসে উঠেছে বসন্তের প্রথম স্পর্শে শুষ্ক তরুর দেহে নব-কিসলয়-উদ্গমের মত। কিন্তু চেয়ে দেখে না—সে কত ক্ষণস্থায়ী, কত নশ্বর! রোগ শোক জরা ব্যাধি মৃত্যু—দিনরাত লুব্ধ আগ্রহে মুখ ব্যাদান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কখন, কোন অবসরে কল-কোলাহল মুখরিত সুখ-পুরীতে প্রবেশ করে, সেখানে কেমন করে দুঃখবিষাণ বাজিয়ে তুল্‌বে, কেমন করে কুসুমিত উপবনের জ্যোৎস্নালিঙ্গিত নীরবতায় শ্মশানের ভৈরবরব প্রতিধ্বনিত করবে, কেমন করে বাসর শয্যার কম আলিঙ্গন মৃত্যুর অগ্রদূত এসে কঠোর হস্তে বিচ্ছিন্ন করে দেবে! এই ত সংসারের সুখ, এই ত তৃপ্তি, এই ত আরাম! আরো দেখ, এখানে শান্তি কৈ? তৃপ্তি কৈ? এই ত তুমি রূপরাশি নিয়ে কত লোকের উপ-ভোগের সামগ্রীরূপে জীবনে কত সুখই অনুভব কর্‌লে, কিন্তু বল্‌তে পার, তাতে তোমার পূর্ণতৃপ্তি লাভ হয়েছে? বল্‌তে পার, ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে থেকে তোমার মন আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে নি, আর কিছু চায় নি, যা শাশ্বত, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, যা পেলে জগতে আর কোন কিছু চাইবার থাকে না? বিলাসিতার পঙ্কিল পল্বলের মাঝখান থেকে কি জেগে উঠে নি একটা অতৃপ্তির মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস? উপভোগের কলুষ-কালিকার অভ্যন্তরে কি ফুটে উঠেনি একটা নৈরাশ্যের ভীষণ ছবি? আরো দেখ, যাকে আপাততঃ মানুষ সুখ বলে, তৃপ্তি বলে, আনন্দ বলে, সে একটা বাহ্যিক অবিদ্যার মূর্ত্তি; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যেমন কোন অজানা আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন অনাদি কাল হ'তে এই বিশ্ব চক্রের মধ্যে, মানুষও তেমনি ঐ সুখের মোহে মুগ্ধ হয়ে জন্ম-জন্মান্তর কল্প-কল্পনান্তর বাসনার তীব্র তাড়নার অন্তর্দাহে পরিভ্রমণ

কর্‌চে! মৃগ যেমন মরুভূমির বিশাল বক্ষে ধুধু বালুকা রাশির মধ্যে মিথ্যা সরোবর নিরীক্ষণ করে ছুটাছুটি করতে করতে জীবন হারায়; মনুষ্যও তেমনি সুখ-মৃগ-তৃষ্ণিকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক অন্তহীন ভ্রমণ-চক্রে। প্রতি পলে বিপলে দুঃখে হৃদয় ভেঙ্গে পড়্‌চে; প্রতি মুহূর্ত্তে দেখচে সুখের মরীচিমায়া, তবু ছাড়তে পারুছে না। যেমন উট কাঁটা ঘাস খেয়ে কষ্ট পায়, তবু সে কাঁটা ঘাসই খায়! তাই বল্‌চি এইভাবে জীবন যদিও দুঃখে পড়ে হাবুডুবু খায় মানুষ তাই আঁকড়ে ধরে থাকে, কারণ জানে না তারপর কি আছে—সত্যপথ খুঁজে পায় না!"

তৃষ্ণা নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল, একমনে শীলভদ্রের কথা শুনিতেছিল, নৈশাকাশে একটি তারা হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া খসিয়া পড়িয়া গেল ভূমিতলে—কে জানে কেন?—কি আকর্ষণের বলে? তাহা দেখিয়া তৃষ্ণা বলিল—"এমনিই মানুষ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই ঐ ভ্রষ্ট তারার মত কোথায় ছুটে চলে যায়; আর তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না! একটিবারও মনে করে না, হয়তঃ একজন তারই আশাপথ চেয়ে কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিচ্ছে উষ্ণ অশ্রুজলে, নীরব হাহাকারে, বুক ভাঙ্গা বেদনায়!"

"আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছ কেন?"

"তুমি পাষাণ! কি করে তোমায় বোঝাব কেন চাই? তুমি কি আজো বুঝতে পারনি তুমি আমার কে? তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কোন খানে? হয়তঃ তুমি মনে করতে পার, আমি কুলটা, নর্ত্তকী, বেশ্যা; বাইরের আবরণ দেখে আমায় ঘৃণা করাও তোমার পক্ষে কঠিন হবেনা—তবে এতক্ষণ যে কেন ঘৃণা করছ না তাই ভেবে পাচ্ছিনা—কিন্তু দেখেছ কি একবার আমার বাহ্য আবরণের অন্তরালে আমার মানস জগতে, এ কুলটাবৃত্তির সম্পর্ক হ'তে দূরে বহু দূরে অবস্থিত আত্মিক ভুবনে, কি আছে আমার সেখানে? যদি আন্তর জগতের শুভ্রতা, শুচিতা, পবিত্রতা কোন দিন মানুষ গণনার মধ্যে আনে, তবে জেনো—কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে যে আশার রেখা একদিন তুমি আমার প্রাণে এঁকেছিলে, সেখানে সেই আশার রেখা পূর্ণাবয়বে চিত্রিত হয়ে গেছে, যে বীজ একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিলে অলক্ষ্যে, তাই বিরাট্ মহীরুহ হয়ে শাখা-বাহু পল্লবে যোজন যোজনান্তর ব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তুমি—তুমি—তুমি যে আমার সব! তবু জিজ্ঞেস্ করছ কেন যেতে চাই?"

শীলভদ্র অন্তরে অন্তরে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল; কোন উত্তর দিল না। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পূর্ব্বগগনের প্রভাতী তারার জ্যোতির সঙ্গে মিশিয়া গেল কোন লক্ষ্যহারা অনন্তের পথে।

তৃষ্ণা আবার বলিল—"শোন, এ দ্বাদশ বর্ষ আমার কি ভাবে কেটেছে জান?"

শীলভদ্র অবজ্ঞাভরে উত্তর করিল—"খুব জানি, সুখে, স্বচ্ছন্দে, নির্ব্বিঘ্নে, আনন্দে!"

তৃষ্ণা খুব গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল—"না, তা নয়। তুমি দ্বাদশ বর্ষ কাটিয়েছ বোধিসত্ত্বের ধ্যানে—আর আমি কাটিয়েছি তোমার ধ্যানে।"

"কি রকম?"

"শুন্‌বে?"

"হাঁ।"

"সত্যি—না উপহাস কর্চ্ছ?"

"তোমাকে উপহাস করে আমার লাভ?"

"আমোদ উপভোগ!—আবার কি লাভ! তোমরা সব ভিক্ষুর দল ত ঐ করে থাক। যাক; বলছি শোন।"

"কি বল।"

"চলে গেলে তুমি—কোথায় গেলে, কেন গেলে, কখন ফির্‌বে কিছুই বলে গেলে না। অথচ আমি তোমার প্রতীক্ষায় দু'দিন দু'রাত্রি অবসন্ন প্রাণে অপেক্ষা করলুম!

খাদ্য ভাণ্ডার নিশেষ হয়ে গেল,—সঞ্চিত অর্থ নেই!—কে খাবার দেবে? প্রতিবেশীরা দু'একদিন একটু জিজ্ঞেস করল; তারপর কেউ খবর নিলেনা! একদিকে প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে—অন্য দিকে ক্ষুধার জ্বালায় দেহ দগ্ধ হচ্ছে! কি করি, কোথায় যাই। মনে হল আমি ত গান গাইতে পারি, ভিকিরিদের মত গান গেয়ে ভিক্ষে করে উদরান্নের সংস্থান করা যাবে। প্রথম দিন সর্ব্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বড় ফটকের ধারে বাগানের পাশে, ছোট

বেলায় যেখানে তুমি বেড়াতে নিয়ে যেতে—সেখানে যাব মনে করলুম। ঠক্ ঠক্ করে পা কাঁপতে লাগল! বুক ধড়্ফড়্ করতে লাগল। ফিরে চলে এলুম। পরদিন আবার অতি কষ্টে বেরিয়ে ফটকের ধারে গেলুম; মুখ দিয়ে কথা বেরোল না, গাইতে পারলুম না। ফিরে এলুম। তিন দিনের অনাহারে শরীর ভয়ানক দুর্ব্বল; তৃতীয় দিন মনে হল, তুমি আমার সঙ্গে আছ, ভয় কি? নির্ভয়ে ফটকের ধারে গেলুম। কি করে গান গাইব—একে কণ্ঠ ক্ষীণ—তার উপর লজ্জার সহস্র বাধা এসে জিহ্বা আটকে ধরল। তখন মনে হল তুমি আবার বলচ—'তৃষ্ণা একখানি গান গাওত' অমনি কোথা হ'তে পলকে এক অমানুষী শক্তি এসে আমার কণ্ঠে আবির্ভূত হল; গাইতে লাগলুম; অনেক লোক জড় হল। শেষে একটি ভদ্রলোক আমার কাছে এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ঠিক পরিচয় দিলুম না—বললুম—আমি অনাথা—কেউ নেই—তাই ভিক্ষে করচি। তিনি আমাকে সঙ্গে করে তাঁর বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন; প্রথমে সম্মত হলাম না; কিন্তু পরে যেন তার ভিতর তোমাকে দেখ্‌তে পেলাম। তিনি দ্বিতীয়বার বল্‌তেই সম্মত হয়ে তার বাড়ী উপস্থিত হলাম। তিনিই মহাবোধি নাট্যশালার অধ্যক্ষ অবশ্য তখন আমি তা জানতুম না। বাড়ীর মেয়েরা আমাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগলেন। পরে একদিন নাট্যশালায় নিয়ে গেলেন; আমাকে নৃত্য শেখাতে লাগ্‌লেন; প্রথমে জড়তা এসে বাধা দিলে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তোমার ছবি মনে পড়্‌ল, তখন সব বাধা দূর হয়ে গেল। আমি নাট্যশালার অভিনেত্রীরূপে শিক্ষিতা হতে লাগলুম। প্রথম দিন যখন রঙ্গমঞ্চে বেরোলুম—একটি কথাও মুখ দিয়ে বেরোল না! বাধ্য হয়ে অধ্যক্ষ যবনিকা ফেলে দিলেন। অনেক রাগ ও দুঃখ করতে লাগলেন। পরদিন রঙ্গমঞ্চে বেড়িয়ে মনে হল ঐযে প্রেক্ষাগৃহে তুমি বসে রয়েছ—এ জনতার আকারে—তোমারি মূর্ত্তি সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে,—আমি যে তোমারি সঙ্গে কথা বল্‌ছি—তখন কথা বেরোল—তখন অভিনয় করলুম—যা কেউ কোন দিন কল্পনা করতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ দর্শক মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই দিন থেকে অধ্যক্ষের নাট্যশালায় অজস্র অর্থাগম হতে লাগল। কিন্তু নাট্যশালায় আসার পর থেকে, অভিনয়ের সুখ্যাতি পাটলীপুত্রময় ছড়িয়ে পড়্‌বার পর থেকে অধ্যক্ষের বাড়ীর মেয়েরা যেন আমাকে ঘৃণা করতে লাগল—একদিন একজন মুখ ফুটে বলেই ফেল্‌লে—'তুমি ত আর গেরস্ত নও।' এ কথার অর্থ তখন ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না, তবু প্রাণে ভয়ানক দুঃখ হল। কি কর্ব্ব গুমরে গুমরে তোমার জন্য কাঁদতে লাগলাম। পাষাণ তুমি, নিষ্ঠুর তুমি, কঠোর তুমি—তখন কোথায়?"

এই বলিয়া তৃষ্ণা একটু চুপ করিয়া রহিল আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। দু'এক ফোঁটা চোখের জল ভুমিতলে নিপতিত হইল। শীলভদ্র লক্ষ্য করিল, কিছু বলিল না।

আঁচলে চোখ মুছিয়া তৃষ্ণা আবার বলিতে লাগিল—"একদিন এক বাসন্তী সন্ধ্যায় এক ধনী যুবক আমার কাছে হাজির অর্থের এক বিষম প্রলোভন নিয়ে। প্রত্যাখ্যান করলুম—কেন? এ দেহ ত আমার নয়—এযে তোমার পায়ে উৎসৃষ্ট—আমার দেবার অধিকার কি? পরদিন আবার অধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে নাট্যশালায় আমার কক্ষে উপস্থিত। অধ্যক্ষও বল্‌লেন—'এ রূপ, এ যৌবন, এ গুণপনা—এর বিনিময়ে যদি রাজার মত ঐশ্বর্য্য লাভ হয় মন্দ কি?' তখন মনে পড়্‌ল—অধ্যক্ষের বাড়ীর মেয়েদের ঘৃণার কথা—জ্বলে গেল সর্ব্বাঙ্গ,—সমাজে আমার স্থান হবে না—আমি নর্ত্তকী—আমি অভিনেত্রী। আর দেখলুম যেন ঐ যুবকের মধ্যে তুমি বর্ত্তমান, যেন তুমিই আমাকে ডাক্‌চ—'আয়—আয়—আয়!' যুবক অনেক ভালবাসার কথা বল্‌ত, অনেক সাধ্যসাধনা করত—কিন্তু আমি তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতুম কতক্ষণ?—যতক্ষণ তোমার ছবি তার মধ্যে দেখতুম ততক্ষণ। তিন মাস পরে যুবক বিসূচিকা রোগে ইহলোক ছেড়ে চলে গেল—তখন এল ঐ তোমার সহপাঠী দেবদত্ত—অতুল ধনের পসরা নিয়ে—তার মধ্যে দেখলুম তোমাকে—তুমি ডাক্‌চ—'আয়—আয়—আয়!' যেদিন যেমুহূর্ত্তে তোমার মূর্ত্তি দেবদত্তের মধ্যে দেখিনি, সেদিন তাকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছি—সে মনে

করেছে আমার গর্ব্ব—আমার অহঙ্কার—কিন্তু বুঝ্‌তে পারে নি আমার অন্তরের জ্বালা! কি একটা দাবদাহে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যেত, শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুঠ্‌ত—মনে হত গঙ্গার জলে গিয়ে আত্মহত্যা করি—তখনি দেখ্‌তুম আকাশপটে মেঘলোকের ওপার হ'তে হস্ত সঙ্কেতে তুমি নিষেধ কর্‌চ—তখন আর সর্ব্বার সাহস থাকত না; কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম!"

তৃষ্ণা চুপ করিল। শীলভদ্র দু'একবার 'উঃ' শব্দ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেই দেখিল দূর মেঘলোকের উপর হইতে এক স্বর্ণকান্তি পুরুষ সুদীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার ও তৃষ্ণার মস্তকের উপরিভাগ স্পর্শ করত কি এক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ভাবিয়া পাইল না শীলভদ্র এ কি অমানুষিক কাণ্ড! কে ঐ স্বর্ণকান্তি মূর্ত্তি—কি উদ্দেশ্য নিহিত এর আশীর্ব্বাদের মধ্যে? নীরবে শীলভদ্র চিন্তা করিতে লাগিল।

তৃষ্ণা কম্পিত কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল—'ভগবান্ যেমন মানুষকে সব সময় হাতে ধরে নিয়ে যান সুপথে কুপথে, বহুপথে সাগরাভিমুখিনী নদীর মত বিভিন্ন বঙ্কিম পথে ঘুরাইয়া অবশেষে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, আমিও তেমনি তোমার নির্দেশে চালিত, আমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত তুমিই নিয়ন্ত্রিত করেছ। গোপবালিকা রাধা যেমন বিশ্বময় কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া তাহারই ধ্যানে দিবস-রজনী বিভোর হয়ে থাকৃতেন আমি ও প্রতিপদক্ষেপে তোমার মূর্ত্তি দেখেছি—তুমিই আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলেচ!"

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ত দীর্ঘ দিন বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত; এখন এ সন্ন্যাসজীবনের কঠোরতা সহ্য হবে কি?"

"কেন হবে না? তুমিই যে আমার সব—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই সুখে থাকৃব। সেখানেই আমার আনন্দ ধাম, সেখানেই আমার স্বর্গ—সেখানে যত কষ্টই হোক।"

"তোমার এ বাড়ী ঘর, এ তৈজসপত্র, এ বিলাসিতার উপকরণ, এ সব ফেলে যেতে মায়া হবে না? আবার সেই জগন্নাথ দর্শনকারীর মত নির্ব্বাণের বদলে লাউ শাকের মাচা দেখ্‌বে না ত?"

তৃষ্ণা কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমি ত নিজের বলে' কোন দিন কোন জিনিষ গ্রহণ করিনি, যা পেয়েছি, মনে করেছি, এ তোমারি দান, এ তোমারি জিনিষ; কাজেই আমার ত ওসবের উপর কোন মায়া বসেনি। যখন তাতে আমিত্ববোধ নেই, তখন মায়া আস্‌বে কি করে? আমার এ দেহ-মন-প্রাণ সবই যে তোমার।"

শীলভদ্র শান্ত কণ্ঠে বলিল—"এখন থেকে সব ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে দিতে—"

বাধা দিয়া তৃষ্ণা বলিল—"ওকথা বলো না—তা আমি পার্ব্ব না, আমি ভগবান্ জানি না, দেবতা জানি না, বোধিসত্ত্ব জানি না; জানি একমাত্র দেবতা, একমাত্র ধ্রুবতারা তুমি জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, রোগে শোকে, দুখে সুখে—আমার নিজের বল্‌তে কিছুই নেই—সব তুমি" বলিয়া তৃষ্ণা পুনরায় শীলভদ্রের চরণতলে নিপতিত হইল।

এইবার শীলভদ্র তাহার ললাটে মঙ্গল হস্ত বুলাইয়া দিল।

(১২)

আজ তৃষ্ণার বড় আনন্দের দিন; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে এমন দিন সে আর পায় নাই; এমন বিপুল পুলক-স্পন্দন তাহার জীবনের উপর দিয়া আর বহিয়া যায় নাই; তাহাকে এমন আকুল করিয়া এমন আপনহারা আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া, বিশ্বসংসারের সমস্ত তত্ত্ব প্রভাতী তপনের নবালোক রেখায় এমন সুপরিস্ফুট করিয়া। আজ শীলভদ্র তৃষ্ণার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছে;—তাই আজ আনন্দের অফুরন্ত ধারা তৃষ্ণার হৃদয় বাহিয়া উপচিত হইয়া পড়িতেছে, প্রত্যেক পদক্ষেপে, প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে, প্রত্যেক কার্য্যে।

শীলভদ্রের পাটলীপুত্র ত্যাগ করা হয় নাই; তৃষ্ণার ব্যাকুল ক্রন্দনে বিগলিতচিত্ত শীলভদ্র তৃষ্ণার সঙ্গেই তাহার বাড়ীতে চলিয়া আসিয়াছে। আজ তৃষ্ণাই তাহাকে ভিক্ষা দান করিবে। শীলভদ্রের মনও একটু যেন প্রফুল্ল; কত দীর্ঘ দিবসের স্মৃতি, কত বাল্য ধূলিখেলার চিত্র, কত সুখ, কত দুঃখ আজ শীলভদ্রের আন্তর জগৎ আলোড়িত করিতে

লাগিল—একে একে পূর্ব্বস্মৃতি সান্ধ্য তারকার মত মানস গগনে দেখা দিতে লাগিল ;—আর তাহারই অপূর্ব্ব আলোক যেন দিকে দিকে ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

তৃষ্ণা রন্ধননিরতা—আজ পাচককে রন্ধন করিতে দেয় নাই। আজ তৃষ্ণা স্বহস্তে উপাদেয় ভোজ্য বস্তুর সমবায়ে শীলভদ্রের চরণে নবভাবে, নবীনরূপে আত্মসমর্পণ করিবে—আর পড়িয়া থাকিবে না এ পল্বল-পঙ্কে, কলুষরাশির মধ্যে। দীর্ঘ সাধনার অবসানে বাঞ্ছিতের দর্শন মিলিয়াছে—এ সুযোগ অবহেলা করা চলিবে-না। অবহেলায় পরিত্যাগ করিলে এ সুযোগ হয়ত এ জীবনে আর নাও আসিতে পারে ; কে বলিবে ?

মনে পড়িল তৃষ্ণার বাল্যজীবনের কথা—সে কি পবিত্র, কি মধুর, কি শুভ্রশান্ত ! আর আজ—সে কোথায় ? একবার তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া বলিল—কেন ? সেও যে পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে—একনিষ্ঠ প্রেমের ধ্যানে, বিশ্বময় একই বাঞ্ছিতের মূর্ত্তি দর্শনে এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে ; তবে সে কিসে অপবিত্র ?—

আবার তাহার মনে হইল—যেদিন একমাত্র জননীর মৃত্যুতে শোকে কাতর চিত্তে বহিঃপ্রাঙ্গণে বসিয়া সে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল ; শীলভদ্র আদরে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়াছিল তাহাকে নিজের গৃহে—সেইদিন কি শুভ পুণ্যময় দিন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার চোখে ; সেদিন হইতে শীলভদ্র জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে ভোজনে গমনে তাহার সাথী হইয়া দাঁড়াইল—কত মান অভিমান, কত কলহ কোলাহল উভয়ের জীবনকে ক্রমশঃ ঘনীভূত মিলনে পরিণত করিতেছিল ! শীলভদ্র বিদ্যালয়ে যাইত, সে তাহার আসার আশায় দ্বারে দাঁড়াইয়া তৃষিত চাতকের মত পথিপানে অপলকে চাহিয়া থাকিত ; যখন শীলভদ্র সঙ্গী ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে গৃহে ফিরিত, দূরে শীলভদ্রকে দেখা যাইত, অমনি তাহার তৃষিত হৃদয়ে সরসতার বান ডাকিত—একটা নবীন পুলকরেখা ফুটিয়া উঠিত জীবনের উপর দিয়া মেঘাবৃত আকাশে সূর্য্যকিরণ ও বৃষ্টিধারার একত্র সম্মিলনে ইন্দ্রধনুর মত মনোরম, লোভনীয়, সুন্দর ! তারপর শীলভদ্রের

ধুইবার জল দিয়া সত্বর খাবার সাজাইতে চলিয়া যাইত। শীলভদ্র আহারে বসিলে সে কত আগ্রহে তাহার রুচিকর খাদ্য মাথার দিব্য দিয়াও বহু পরিমাণে আহার করিতে বাধ্য করিত ! শীলভদ্রের জননী তৃষ্ণার এ সেবাপরায়ণতা দেখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেন এবং একদিন মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলেন—'আসছে বছর শীলভদ্রের সঙ্গেই তৃষ্ণার বিয়ে দোব !' ঐ কথার পর সে তিন দিন লজ্জায় শীলভদ্রের সম্মুখে বাহির হয় নাই ! তারপর কি দুর্দ্দিন তাহার জীবন পটে ঘনাইয়া আসিল—শীলভদ্রের জননীর মৃত্যুতে উদাস হৃদয় শীলভদ্র কিছুদিন পরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল—তাহার সাধের কল্পবৃক্ষ মাথায় বজ্রাঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল ভূতলে !—তারপর কি দুঃখময় ঘৃণ্য নারকীয় জীবন—এ দ্বাদশ বর্ষের ইতিহাসে !

* * * * *

আহারে বসিয়া শীলভদ্র দেখিল দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে সে যাহা যাহা আহার করিতে ভালবাসিত তৃষ্ণা সবই আনন্দে সুসজ্জিত পাত্রে পরিবেষণ করিয়াছে। পাশে বসিয়া তালবৃন্ত হস্তে ব্যজন করিতেছে।

আহারে বসিয়া শীলভদ্রের মনে এক নব ভাবনা ফুটিয়া উঠিল উষার উন্মেষে পক্ষিকুলের জাগরণের মত। তৃষ্ণার দিকে তাকাইয়া শীলভদ্র দেখিল যৌবন-পুষ্ট দেহে লাবণ্য উচ্ছলিত। মনে হইল শীলভদ্রের এই যে বিশ্ব-সৌন্দর্য্য—ফলে ফুলে পল্লবে, নির্ঝরিণীর নির্ম্মল প্রবাহে, পার্ব্বত্য প্রকৃতির তরঙ্গিত শ্যামলিমায়, কাবেরীর চপল উর্ম্মিমালায় শরতের কৌমুদী বিকাশে বিহসিত অপরূপ লোভনীয় সুষমা—সবই নারীর রূপের রূপান্তর ; বিন্দুরূপী কেন্দ্র যেমন মধ্যস্থলে বসিয়া পরিধির সাহচর্য্যে বৃত্ত অঙ্কিত করে, নারীও তেমনি বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝখানে বসিয়া এ অনন্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতেছে। নারীর রূপ যে শুধু বহির্জগতে বিকশিত, তাহা নয় ; আন্তর জগতেও নারীর মহীয়সী ছবি দেদীপ্যমান ; স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি যে সমস্ত কমনীয় বৃত্তি মানব হৃদয়কে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায় ; মর্ত্ত্যের মানবকে স্বর্গের সিংহাসনে উপস্থাপিত করিয়া কল্পবৃক্ষের

বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্ত অনুপ্রেরণা দান করে, সেই সমুদয়েরও উৎস-মূলে নারীই মূর্ত্তিমতী হইয়া বিহার করিতেছে। নারীর সাহচর্য্য ব্যতিরেকে কি বাহ্য, কি আন্তর কোন জগৎই বিকাশ লাভ করিতে পারে না, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত অভিব্যক্তিরূপে মানব হৃদয়ে আসন লাভ করিয়া শিল্পে কাব্যে সঙ্গীতে অমরতা লাভ করিতে পারে না। মানুষ যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু উচ্চ আদর্শ কল্পনা করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনের সারভূত রূপে স্থির করিয়াছে, নারীই তাহাদের প্রাণ, নারীই তাহাদের অভ্যন্তরস্থিত জীবনীশক্তি, নারীই তাহার প্রাণের দ্যোতনা। নারীকে বাদ দিলে যে বিশ্ব সৃষ্টি অর্থহীন হইয়া পড়ে; তাই বোধিসত্ত্বও গোপাকে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ গঠনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

শীলভদ্রের চিন্তা-স্রোতে বাধা দিয়া তৃষ্ণা বলিল—"কি গো, হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে কি ভাব্‌ছ?"

শীলভদ্র কোন উত্তর না দিয়া আহারে মনঃ সংযোগ করিল, কিন্তু তাহার অন্তরে বাহিরে এক শাশ্বতী নারী মূর্ত্তি বিহার করিতে লাগিল—সে তৃষ্ণা!

আহার করিতে করিতে শীলভদ্র ভাবিল—"মন্দ কি তৃষ্ণার সাহচর্য্যে জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা কাটাইয়া দেওয়া, নিশ্চিন্ত আলস্যে, নির্ব্বিঘ্ন ঔদাসীন্যে, সিদ্ধির পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিতে!

সহসা অট্টহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া মার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—কাঁপিয়া উঠিল শীলভদ্র মারের দর্শনে!

মার বলিল—"কেমন? আজ কোথায় তোমার বোধিসত্ত্ব? এখন তুমি সম্পূর্ণ আমার অধিকারে—ঐ দেখ আমারই সহচরী তৃষ্ণার ছবি তোমার অন্তরে বাহিরে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে—আজ দেখুক বোধিসত্ত্ব, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত মনুষ্যকে কেমন করে আমি নিজের দলে নিয়ে আসি—আর তুমিও দেখ ঐ দূরে—"

সহসা যেন শীলভদ্রের নেত্র-পথে একটা নব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল; দেখিল শীলভদ্র—এক সুসজ্জিত বিলাস কক্ষ; কুসুম-স্তবকের নিঃসারিত সুরভি বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত করিয়া শূন্য হৃদয়ে যেন কোন অনন্ত মিলন রাজ্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঢলিয়া পড়িয়াছে শীলভদ্রের মস্তক তৃষ্ণার যৌবনপুষ্ট উন্নত বক্ষের উপর; নেত্র-কনীনিকা তৃষ্ণার অপরূপ মাধুরী-মণ্ডিত মুখের উপর স্থির হইয়া রহিয়াছে; তৃষ্ণাও শীলভদ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া অর্দ্ধশায়িতা; সূক্ষ্ম কৌষেয় বসনে দেহবল্লী আচ্ছাদিত; কুন্তলরাজি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; আর অদূরে শূন্য নয়নে দাঁড়াইয়া বোধিসত্ত্ব ভিক্ষা পাত্র করে; মুখ বিষণ্ণ মলিন, চক্ষু যেন গভীর দুঃখে ছলছল করিতেছে; একদৃষ্টে শীলভদ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—আর সমস্ত জগৎ যেন করুণায় ভরিয়া যাইতেছে; কিন্তু শীলভদ্রের প্রাণে তাহার কোন রেখা অঙ্কিত হইতেছে না; শীলভদ্র তৃষ্ণার মধ্যেই নিমগ্ন!

পর মুহূর্ত্তে অন্য দৃশ্য তাহার চোখে প্রতিভাত হইল—অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার—আলো নাই, জ্যোতি নাই; তার মাঝে দাঁড়াইয়া মার একটি চক্র ঘুরাইতেছে—তাহাতে বসিয়া শীলভদ্র ও তৃষ্ণা—একবার উপরে উঠিতেছে, আবার নিম্নে পতিত হইতেছে—সে কি দুঃখ!

আর শীলভদ্র স্থির থাকিতে পারিল না; এই দৃশ্যে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমিয়া হিম-শিলায় পরিণত হইল, সাহস কোন অজ্ঞাত রাজ্যে পলায়ন করিল; শীলভদ্র 'গুরুদেব' বলিয়া চীৎকার করিয়া ভোজন পাত্রের উপরেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

তৃষ্ণা—"কি হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

বিদুষী মুসলমান মহিলা

মৈমনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইলের কুমল্লী গ্রামের শ্রীওয়াহেদ আলী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ফজিলতন্নেছা এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য গমন করিয়াছেন ; তৎপরে তিনি জার্ম্মাণীতে যাইবেন। তাঁহার এক ভগ্নী মৈমনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছেন।

জনমত

সাইকেলে কাশ্মীর

কলিকাতার কেপিটেল ক্লাবের তিন জন সভ্য, নীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী, করুণারঞ্জন বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বসু বাইসাইকেল যোগে কাশ্মীর যাইবেন বলিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছেন।

শিক্ষাসমাচার

বিজ্ঞানের ভবিষ্যদুক্তি

প্রফেসার এ এম্ লো ইংলণ্ডের এক বৈজ্ঞানিক। কিছুকাল হইল বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উন্নতি দ্বারা মানবের কি হইবে, তাহা লইয়া তিনি ভবিষ্যৎ বাণী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা যেমন উদ্ভট তেমনি আশ্চর্য্যজনক। গত ১লা মার্চ্চের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি মনে করেন, মানবের চিন্তা বিদ্যুতের একটা রূপ এবং সেজন্য অবশ্যই একটা তরঙ্গ উত্থিত হয়। হয়ত ভবিষ্যতে কোনও মানুষ সমাজের অনিষ্ট চিন্তা করায় গ্রেপ্তার হইবে অথবা প্রতিবেশীর চিন্তাধারা অসহনীয় হওয়ায় মানুষ বাড়ী পরিবর্ত্তন করিবে। মানুষ ভবিষ্যতে রাত্রে পুষ্টি প্রদায়ী বটিকা সেবন করিয়া থাকিবে এবং যখন নিদ্রা যাইবে, তখন রশ্মির দ্বারা চিকিৎসিত হইবে। তখন হয়ত অপরাধীর অপরাধ রোগ বলিয়া গণ্য হইবে এবং অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা তাহার রোগ আরাম হইবে।

সঞ্জীবনী

অধিক শব্দবিশিষ্ট ভাষা

পৃথিবীতে যত রকম ভাষা আছে, তাহার মধ্যে ইংরেজী ভাষার শব্দসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চীনের ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সঞ্জীবনী

৬ শিলিং মূলধন হইতে ৭০০০ পাউণ্ড

লণ্ডনের দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলে পিটার টাইলার নামে এক ব্যক্তি পেঁয়াজ ছাড়াইয়া তাহা আচারওয়ালাদিগকে বিক্রয় করিত এবং এইরূপে তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিত। সম্প্রতি সে ৭০০০ পাউণ্ড রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।

অন্য কোন সংবাদিকের নিকট তাহার বিধবা বলিয়াছে যে, তাহারা ৬ শিলিং পুঁজি লইয়া ৫০ বৎসর পেঁয়াজ ছাড়াইবার কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এই দীর্ঘকালে তাহাদিগকে কখনও অন্নের জন্য হাহাকার করিতে হয় নাই। সে আরও বলিয়াছে যে, তাহার স্বামী প্রতিদিন ১০।১২ হন্দর পরিমাণ পেঁয়াজ ছাড়াইতে পারিত।

বসুমতী

বহু-সন্তান-প্রসবিনী জননী

হাঙ্গেরীর "বীর-জননী"দিগের উৎসবে ১০ হাজারের অধিক স্ত্রীলোক যোগদান করিয়াছিল। ইহাদের প্রত্যেকেই ৭টি হইতে ১০টি সন্তানের জননী এবং এমন শতাধিক স্ত্রীলোক যোগদান করিয়াছিল, যাহারা সকলেই ২০টি সন্তান প্রসব করিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ১২০টি মেডেল বিতরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের ইসাবেলা নাম্নী মহিলা ৯টি সন্তানের মা। হাঙ্গেরীর জনৈক মন্ত্রীর মাতাও পুরস্কার পাইয়াছেন। ইঁহার ১০টি সন্তান আছে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইয়াছেন একটি সৈনিক-বধূ। এই বধূটি ২৭টি সন্তান প্রসব করিয়াছেন এবং ইঁহার স্বামী গত মহাযুদ্ধে লড়িতে গিয়া বিকলাঙ্গ এবং ফলে অক্ষম হইয়াছেন।　　　　জনমত

ফেডারেশন ও ফেডারেল ব্যাঙ্ক

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিমত

বাঙ্গালীকে আজ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। আজ পরস্পরের সাহায্যে বাঙ্গালীকে ব্যাঙ্কিংএর ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এইজন্য ফেডারেশন গঠন ও ফেডারেল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব খুবই সময়োপযোগী সন্দেহ নাই। কারণ বিপদের মুখে অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যলাভের আশা আমাদের পক্ষে দুরাশা মাত্র। বড় বড় বিদেশী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক যে আমাদের ঋণ-ব্যবসায়কে তাহাদের স্বার্থের বিরোধী এবং প্রতিযোগী হিসাবে দেখে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে Karnani Bankএর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯২০ সনে এই ব্যাঙ্কের প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, "এলায়েন্স ব্যাঙ্ক" এ দেশী ব্যাঙ্কটির উপর এতটা বিরূপ ছিল যে ইহার প্রতি চেক ভাঙ্গাইতে ১৲ টাকা করিয়া ফি আদায় করিত। ইহা ছাড়া এই ব্যাঙ্কটিকে কলিকাতা clearing houseএ প্রবেশাধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছিল। "সিমলা এলায়েন্স ব্যাঙ্ক" ১৯২৩ সনে ফেল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহার দায় গ্রহণ করে, অথচ পাঞ্জাবের 'পিপলস ব্যাঙ্ক' ১৯১৩ সনে যখন প্রায় একশত ব্রাঞ্চ সহ ফেল পড়িল তখন "ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল" কোম্পানীর কাগজের উপরেও টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে "এলায়েন্স ব্যাঙ্ক" বিদেশী-পরিচালিত এবং "পিপ্‌ল্‌স্ ব্যাঙ্ক" দেশীয় প্রতিষ্ঠান। এই দেশী ব্যাঙ্কের আমানতকারী প্রত্যেককে লিকুইডেটরগণ সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাময়িক সাহায্যের অভাবেই এত বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি বিধ্বস্ত হইল। আমাদের মধ্যে যদি কিছু দেশাত্মবোধ থাকে, তবে এই কঠোর শিক্ষা যেন আমরা না ভুলি।

বর্ত্তমান যুগে সঙ্ঘ এবং সংহতি ব্যাঙ্কিংএর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং প্রাণস্বরূপ বলিয়াই আমি এই বিষয়ে এত কথার অবতারণা করিয়াছি। ঋণ-প্রতিষ্ঠানসমূহের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক দেশেই সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। এক লণ্ডনেই এমন ৫টি সঙ্ঘ আছে। অ-ভারতীয় স্বার্থ-প্রণোদিত বিদেশীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঙ্কএর প্রতিযোগিতায় দেশী ব্যাঙ্কএর পক্ষে প্রসারলাভ করিতে হইলে আমাদের পক্ষে যে এইরূপ ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ সংস্থাপন করা কত প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মাত্র সাময়িক বিপদে পরস্পরের সহায়তা ছাড়া এইরূপ সংগঠনের যে আরও উপকারিতা আছে তাহার প্রতিও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এইরূপ ব্যাঙ্ক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় পত্রিকা পরিচালন, হিসাব রক্ষণ প্রণালীর পুস্তিকা প্রণয়ন, আধুনিক উন্নত প্রণালীর ব্যাঙ্কিং শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন বোধে ব্যাঙ্কিংএর উন্নতি বিধায়ক আইন প্রবর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ উপযুক্ত সাহায্য পাইলে গ্রহণ করিতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটিতে দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা দাবী করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিবকে তার প্রেরণ করিয়া এবং ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কের স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে সঙ্ঘ যাহা করিয়াছে তাহা প্রশংসার্হ। ব্যবসা-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ও লোন আফিস মাত্রেরই অর্থ সাহায্যের জন্য ফেডারেল ব্যাঙ্ক নামক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনও সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

দেশীয় ঋণ-প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা

এই ত গেল সঙ্ঘ সম্বন্ধে বক্তব্য; এখন সংঙ্ঘাধীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। লোন আফিস ত দেশে বাড়িয়াই চলিয়াছে বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা অন্যূন ৬০০ শত।

লভ্যাংশের উচ্চ হারেই প্রমাণ যে অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও ইহাদের সার্থকতা কতটা। ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন মোটের উপর ১০ কোটী টাকা ধরা যাইতে পারে। ইহাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনও বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই; তবে গত বৎসর ফেডারেশনের রিপোর্টে এ সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানিতে পারা যায়, ফেডারেশন যে ৫৭টি প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচিত আছে, তাহাদের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ সমেত মোট কার্য্যকরী মূলধন (working fund) ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকটির প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। এই ৫৭টি প্রতিষ্ঠানের শুধু আমানতই ২ কোটি টাকার উপর।

কাজেই একথা স্বীকার্য্য যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ফলে দেশে আপামর জনসাধারণের ভিতরও ব্যাঙ্কের সহিত লেন দেন করিবার অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে সমবায়-ঋণ-সমিতিগুলির কথাও উল্লেখ করা চলে, কারণ তাহাদের আমানতের পরিমাণও ক্রমেই আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে আমাদের তথাকথিত গুপ্ত সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের প্রসার না হইলে এরূপ সব দেশেই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকার কথা বলা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কের বহুল প্রসারের পূর্ব্বে তথায়ও এইরূপ অবস্থা ছিল। কাজেই পল্লী ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের কিয়দংশ যে ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া ব্যবসায়ে খাটিতেছে, তাহা একান্ত আপনাদেরই কৃতিত্ব বলিতে হইবে।

এই ভাবে সংগৃহীত মূলধন দেশীয় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া যতই স্থানীয় কৃষিতে ও ব্যবসায়ে খাটে, ততই দেশের মঙ্গল। মফস্বলে এই সকল ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে চাষী অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা পায় এবং "ওয়াশীল ছুট" প্রভৃতি মহাজনের অন্যান্য উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে আমাদের ব্যাঙ্ক প্রভৃতির অন্তর্বিধ দাদনের তুলনায় চাষের জন্য দাদনের পরিমাণ কম; কাজেই মহাজনের সহিত প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা সামান্য। কারণ F. D. Ascoli সাহেবের মতে প্রতি ১৫০ শত চাষীর মধ্যে মাত্র ১ জন ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পায় এবং যেখানে চাষের জন্য ব্যাঙ্কের দাদনের পরিমাণ এক টাকা, সেখানে মহাজনের দাদন ২৫৮ টাকা। কাজেই চাষের জন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত যে খুব বেশী কিছু করিয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

খাঁটি ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং শিক্ষা

দেশে যাহাতে খাঁটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রসার হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্কটল্যাণ্ড দেশের গ্রামে গ্রামে এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে তথাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বাংলা দেশে আজ প্রায় ৬০০ শত ব্যাঙ্ক নামে চলিতেছে বটে কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেকেরই অর্থ আদান প্রদানের রীতি তথাকথিত "বিধবার ব্যবসা" এর নামান্তর মাত্র। ইহার আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। এই চিরাচরিত মহাজনী কারবার ছাড়িয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন বর্ত্তমান কালের প্রয়োজন অনুসারে নূতন নূতন পথে তাহাদের অর্থশক্তিকে নিয়োগ করিতে হইবে। স্থায়িত্ব, সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন এবং অর্থবিনিয়োগের নব নব উপায় উদ্ভাবন,—ইহাই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রাণ। আমাদের ব্যবসায়ের মধ্যে যে ইহা নাই তাহার কারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ পরিচালকের অভাব। ফিণ্ডলে সিরাজ এই মতের পোষকতা করেন এবং ভারতীয় ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশনও দেশীয় ব্যাঙ্কের দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ইহারই উল্লেখ করিয়াছে। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ব্যাঙ্ক পরিচালন শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

ফেডারেল ব্যাঙ্কের উপকারিতা

আমাদের এই শোচনীয় পঙ্গুত্ব ঘুচাইতে পারিলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নব-যুগের সূত্রপাত হইবে, আর দেশের অচল মূলধন সচল হইলে আপনারাও বিশেষ লাভবান হইবেন। প্রস্তাবিত ফেডারেল ব্যাঙ্কের সৃষ্টি আপনাদের এই পথে সহায়ক হইবে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া কলিকাতার কম সুদের টাকা মফস্বলে, মফস্বলের বাড়্‌তি ভাণ্ডার কলিকাতায় সরবরাহ

সহজ সাধ্য হইবে। খুব অল্প ব্যয়ে টাকা চালান (transfer) এবং হুণ্ডীও কাটা যাইবে। বিভিন্ন জেলার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এবং কলিকাতা ও মফস্বলের মধ্যে পরস্পরের টাকার আদান-প্রদান অতি সহজে এবং অল্প-ব্যয়ে এই ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া চলিতে পারে।

এই সূত্রে দেশী ব্যাঙ্কের দাদন প্রণালীর একটা অভাবের কথা আসিয়া পড়ে। প্রত্যেক দেশেই প্রয়োজন অনুসারে Exchange, Commercial, Industrial, Rural, Land Mortgage প্রভৃতি ব্যাঙ্ক এর সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে Exchange এর কাজও সম্পূর্ণ বিদেশীর হাতে; বাণিজ্যও সেইরূপ বিদেশীয় পরিচালিত এবং "ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক" এর অর্থে পুষ্ট। দেশীয় বড় ব্যাঙ্কও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেরই অনুকরণে কার্য্য চালাইয়া আসিতেছে। দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে কোনও ব্যাঙ্ক নাই। কৃষিতেও তথৈবচ। অথচ এই দুই পথেই বাঙ্গলার অন্তর্বাণিজ্য অর্থশক্তিসম্পন্ন অ-বাঙ্গালীগণ দখল করিয়া লইতেছে, বাঙ্গালী অর্থহীন অসহায় ভাবে চাহিয়া আছে। বিশেষভাবে এইজন্য দাদনের ব্যবস্থা না থাকিলে এদিকে কিছু করিয়া উঠা অসম্ভব। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালের জন্য দাদনের আবশ্যক। চাষীর ঋণ পরি-শোধের জন্য চাষ হইতে ফসল বিক্রী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সমবায়-সমিতি বা আপনাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত বিশেষ করিয়া কৃষি-ব্যাঙ্কও আমাদের নাই। লোন আফিসের আমানত বেশীর ভাগ স্থির (fixed) বলিয়াই কৃষিতে দাদন কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবপর। কিন্তু উহাদের দাদন বেশীর ভাগ জমীর উপর এবং সুদের হারও উচ্চ। কাজেই চাষীকে ফসল উঠিলে মন্দাবাজারেও বাধ্য হইয়াই গোমস্তার হাতে গিয়া পড়িতে হয় এবং সেও দরের সুবিধা করিয়া নিতে ছাড়ে না। ব্যাঙ্কের গুদামে ফসল জামিন রাখিয়া যদি চাষীর পক্ষে ঋণ পাইবার ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহাকে গোমস্তার শরণাপন্ন হইয়া মন্দা বাজারে মাল ছাড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আর চাষীর মালের বাজার দর হইতে কিছু হাতে রাখিয়া বক্রীটাকা দাদন করিলে ব্যাঙ্কের লোকসানের কোনও কারণ থাকে না। অথচ চাষীর মাল ধরিয়া রাখিয়া সুবিধাদরে বিক্রীত হইলে ব্যাঙ্কেরও সুদের টাকা সহজেই আদায় হয়, এবং ক্রমে চাষীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কেরও প্রসার সুনিশ্চিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমি এস্থলে সমবায়-ঋণদান-সমিতির কার্য্যের কথা উল্লেখ করিব। রাজসাহী জেলার নওগাঁ অঞ্চলে গাঁজা সমবায়-সমিতির কথা আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত আছেন। সমিতি প্রথমতঃ গাঁজা চাষের জন্য টাকা ধার দিয়া থাকে এবং পরে স্থানীয় উৎপন্ন সমস্ত গাঁজা বিক্রয়ের ভার লইয়া দালালের হাত হইতে চাষীকে উদ্ধার করিয়াছে। পাটের চাষে ও ধান, রেশম এবং অন্যান্য বিষয়ে সমবায়-সমিতির দ্বারা এইরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সমবায়-সমিতি যাহা করিয়াছে বা করিতেছে আপনারা ভার লইলে আরও বিস্তৃতভাবে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। বাঙ্গালীর দৈন্য ঘুচাইতে আপনাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। চাষীর কাঁচা মাল ব্যাঙ্ক-গুদামে রাখিয়া বিক্রয়ে লাভবান হওয়া সম্ভব; বাঙ্গালী ব্যবসাদার আমদানী-করা তৈয়ারী মালও ব্যাঙ্কের মারফতে ধারে ক্রয় করিতে পারে। ইহাতে বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসা-ক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশলাভে সহায়তা করিবে। আজ বিশেষ করিয়া এই ভাবে অন্তর্ব্বাণিজ্যে টাকা খাটাইয়া প্রকৃত ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করুন। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষি দেশের অর্থে পরিপুষ্ট হইলেই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব।

সঞ্জীবনী

জার্ম্মাণীর যুব-আন্দোলন

জার্ম্মাণীর যুব-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া কোয়েনলিং বলেন যে, জার্ম্মাণীতে ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শিল্প-যুগের সূত্রপাত হয় ও দেশ প্রায় শিল্পজীবী হইয়া পড়ে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের গ্রাম্যবাস ত্যাগ করিয়া দলে দলে নগরে আসে ও কল-কারখানায় মোটা মাহিনায় কাজ করিয়া নগরের সুখভোগ করিতে আরম্ভ করে। গ্রাম পরিত্যক্ত; নগর বর্দ্ধিষ্ণু; এ দিকে লোকাভাবে গ্রামে স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থার লোপ হইতে লাগিল, অন্যদিকে নগর-নগরী

নিজদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইল। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বালকগণকে উৎকৃষ্ট ব্যবসাদার করিয়া তুলিতে লাগিল কিন্তু জনসাধারণ শীঘ্রই বুঝিতে পারিল যে, নগরের পর নগরের উত্থান দেশের পক্ষে শুভপ্রদ নহে।

জার্ম্মাণীতে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তরুণ তরুণী নগরবাসে তৃপ্তি না পাইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া গেল। তথায় তাহারা সুন্দর অনাবিল গ্রাম্য সভ্যতা ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিল। বালকগণ যে সহরে থাকিয়া শিক্ষিত হইয়া ব্যবসায়ী হইবে, এ আকাঙ্ক্ষা আর জার্ম্মাণ জাতির রহিল না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষা করিতে লাগিল। পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিল—গ্রাম সমৃদ্ধ হইল। জনসাধারণ ও রাজসরকার এই যুব-আন্দোলনকে সাহায্য করিতে লাগিল। এই যুব-আন্দোলনই জার্ম্মাণীর ছাত্র-আন্দোলনের জনক। ছাত্রগণ স্বাবলম্বী হইতে লাগিল এবং তরুণদল প্রতিষ্ঠিত যুব-প্রতিষ্ঠান সকল জার্ম্মাণদের শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হইল।

হিন্দুরঞ্জিকা

তুরস্ক অগ্রসর

তুরস্কের নব জাগরণে গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার নাম জগৎ বিখ্যাত। তাঁহার অলৌকিক স্বদেশানুরাগ, অনুপম সাহসিকতা ও হৃদয়ের অমিত শক্তির পরিচয় পাইয়া পৃথিবীর লোক বিস্মিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুরস্ক নবজাগরণের সাড়া দিয়াছিল। তাহার বর্ত্তমান গৌরবের একমাত্র কারণ মুস্তাফা কামাল পাশার বুদ্ধি ও বীরত্ব। তাহার ন্যায় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির নেতৃত্বে আজ তুরস্কের সুখ-সৌভাগ্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে সংগঠন স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে বহুকাল হইতে জাগরূক ছিল, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই তিনি সেই সকল পূর্ণ করিতে অধিকতর উদ্‌যোগী হইলেন। দেশের নানারূপ রীতি নীতি পরিবর্ত্তন, শিক্ষার বহুল প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রসার তাঁহাকে চিরকাল গৌরব-মণ্ডিত করিবে। যে তুরস্কে নারীদিগের আবরণ ব্যতীত বাহির হইবার উপায় ছিল না, আজ তিনি তাহা একেবারে রহিত করিয়া নারীকেও জগৎ সমক্ষে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে তুরস্কের নারী সমাজ আজ জগৎ সমক্ষে শিক্ষায়, জ্ঞানে ও গরিমায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে।

মুস্তাফা কামাল পাশার সকল কার্য্যই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তাঁহার সৈন্য চালনা ও যুদ্ধ প্রণালী সম্পূর্ণ বর্ত্তমান কালোপযোগী। তিনি জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। জাতীয় ক্রমোন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন।

নব্য তুরস্কে জনসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমিতির দ্বারা দেশের রাস্তাঘাট ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের সহিত দেশের সর্ব্বত্র রেল লাইন প্রস্তুতেরও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী দেশের এই সকল রেলওয়ে গবর্ণমেন্টের নামানুসারে পরিচালিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী মুস্তাফা কামাল তৎক্ষণাৎ তাহা রহিত করিয়া সাধারণের প্রতিষ্ঠান রূপে রেলওয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তুরস্কের প্রত্যেক সহর এবং ক্ষুদ্র পল্লী হইতেও যেন এই রেলের সুবিধা বিশেষভাবে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পল্লী হইতে উত্তম রাস্তা প্রস্তুত হইয়া রেল লাইনের সংযোগ স্থল নির্ম্মাণ হইবে, ইহা অতি উত্তম আদর্শ। আজ এক বৎসর অতীত হইয়াছে মুস্তাফা কামাল পাশা তাঁহার রাজ্যে এক আইন করিয়াছেন, তদনুসারে রাজ্যের সকল প্রজাই প্রত্যেকের সাধ্যানুসারে এই সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিতে বাধ্য। ইহা জাতীয় উন্নতির পথে সহায়ক হইবে। দেশময় যে রেল লাইন প্রস্তুত হইতেছে তাহা দেশের জনসাধারণের সম্পত্তি। জনসাধারণ তাহার দ্বারা উপকার লাভ করিবে ও অবশেষে তাহার আয়ের অংশও ভোগ করিতে পারিবে। মুস্তাফা কামাল তাঁহার পূর্ব্ব রাজধানী বহু বিষয়ে অনুপযুক্ত ভাবিয়া এঙ্গোরায় নূতন ভাবে নূতন পদ্ধতিতে নূতন রাজধানী প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার বহুমুখী

প্রতিভার পরিচয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান রাজধানী তাঁহার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

এঙ্গোরা সহরে জনৈক ফরাসী কোম্পানীর দ্বারা একটি অতি উত্তম বে-তার বার্ত্তাবহ কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কনস্টান্টিনোপলেও ঐরূপ আর একটি কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কোন সুইডিস্ কোম্পানীর সহিত সমগ্র এসিয়া মাইনর ও এঙ্গোরা সহরে টেলিফোন বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল গঠন কার্য্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পাদন করিতে হইবে, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। অপর একটি কোম্পানীকে ত্রিশ বৎসরের সর্ত্তে সমগ্র তুরস্কের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের সুবন্দোবস্তের ভার অর্পিত হইয়াছে। বিশেষ সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া এই সকল কোম্পানী তাহাদের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। সর্ত্তের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে তাহা গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি ভুক্ত হইবে। আরও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, সেই সকল বিষয় কার্য্যকরী হইবার আঠার মাস পরে তাহার সকল দায়িত্বপূর্ণ কাজে ও কর্ম্মচারীরূপে তুরস্কের লোককেই নিয়োজিত করিতে হইবে।

তুরস্কের সমগ্র অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। সাধারণ তন্ত্র প্রণালী অভিলাষী ব্যক্তিদিগের চেষ্টার ফলেই আজ তুরস্কের এই অবস্থা। তখন সকলকেই গবর্ণমেন্টের খাসের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইত। এবং সেই সকল জমি যথাসময়ে আপনা আপনি তাহাদের আপন সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে; এখন তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যায় সঙ্গত উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে আইনের দ্বারা সেই সর্ত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তিন বৎসর পর তাহা পুনরায় গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি রূপে পরিণত হইবে।

পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীর আয়ের দশমাংশ করস্বরূপ নির্দ্ধারিত ছিল। তাহা রহিত করিয়া সেই স্থানে জমির নাম মাত্র কর স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণের পক্ষে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় ১৮ মাস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু শস্য উৎপন্নের সময় তাহাদিগকে আপন আপন ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশের জাইগীর ঘটিত শাসনপ্রণালী যাহা অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও কার্য্যকরী ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হইয়াছে। মুস্তাফা কামালের সংস্কারে কৃষকদিগের জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে তিন বৎসরের মেয়াদে বিনা সুদে অর্থ প্রদত্ত হইতেছে। বীজ, কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ও পশু বিনামূল্যে অর্পিত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের সহায়তার জন্য "কৃষিব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাতে সকল কৃষক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

তুরস্কের স্বাধীনতা সমরে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থিত অধিবাসীদিগের দুই লক্ষাধিক গৃহ গ্রীকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। শত শত দ্রাক্ষালতাকুঞ্জ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। কত জীব জন্তু ও প্রসিদ্ধ এঙ্গোরা ছাগ বিনষ্ট হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু ইহা সুখের বিষয়, আজ সেই প্রদেশ তাহার লুপ্ত বিভব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তুরস্কের কৃষককুলের মিতব্যয়িতা গুণে ও গবর্ণমেন্টের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তাহা সাধিত হইয়াছে।

বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির দ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য ও শক্তি বৃদ্ধি করাই বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। তাই মুস্তাফা কামাল পাশা নানাবিধ উপায়ে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি দ্বাদশটি কৃষি বিষয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য অধিকতর উন্নত প্রণালীর শিক্ষালয় সানষ্টিফানোতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐরূপ অপর একটি বিদ্যালয় এঙ্গোরাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার বন্দোবস্তও চলিতেছে। দেশের বিদ্যালয়ে শিল্পকার্য্য শেষ হওয়ার পর ছাত্রগণকে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিয়া জ্ঞানার্জ্জনের ব্যবস্থাও বিশেষভাবে হইতেছে। যে সকল ছাত্র ও অধ্যাপক শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিদেশে প্রেরিত হইবেন তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেশে কৃষি বিষয়ের শিক্ষাবিভাগ প্রচুর শক্তিশালী হইবে সন্দেহ নাই। তখন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্মারনার কৃষিবিদ্যালয় এই বিষয়ের গবেষণায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

তুরস্কের নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কি উপায়ে দেশের মৃত্তিকা পরীক্ষা করা হইবে, কোন শস্যে কোন জমীতে বিশেষরূপ ফসল উৎপন্ন হইবে, সে বিষয়ে গভীর গবেষণা চলিতেছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে। কৃষিকার্য্যোপযোগী পশুদিগের স্বাস্থ্যের দিকেও সকলের যথাসম্ভব দৃষ্টি রহিয়াছে। দেশের বন জঙ্গল সংরক্ষণ করিবার জন্য বিশেষ আইন প্রচলিত হইয়াছে। সঞ্জীবনী

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা

চট্টগ্রামে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সন্তোষজনকরূপে হইতেছে। তথাকার মিউনিসিপালিটির গত বৎসরের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯২৭ সনে প্রাথমিক স্কুলে বালকের সংখ্যা ছিল ২১৩০, পর বৎসর এই সংখ্যা হইয়াছে ২৫০০। বালিকাদিগেরও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে,—১৯২৭ সনে সংখ্যা ছিল ১০৫২, ১৮২৮ সনে হইয়াছে ১৩৫২।

শিক্ষা-সমাচার

ভ্রাম্যমান বিশ্ববিদ্যালয়

নিউইয়র্ক হইতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকবর্গ পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখা হইয়াছে ভ্রাম্যমান-বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার প্রেসিডেন্ট মিঃ সিড্‌নি গ্রিনবাই কলিকাতা পৌছিয়াছেন। আগামী ২৭এ ফেব্রুয়ারী একশত দশজন ছাত্র ও অধ্যাপক কলিকাতা আগমন করিবেন। নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিয়া এই বিশ্ব-বিদ্যালয় পানামা দিয়া স্যান ফ্রান্সিস্‌কো, তথা হইতে হ্যানোয়েল, জাপান চীন, যাভা, শ্যাম ভ্রমণ করিয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মদেশ হইয়া ভারতে পৌছিবে। প্রেসিডেন্ট শ্যাম হইতে বরাবর কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। ভারতে পৌছিয়া ছাত্রবৃন্দ কাশী, দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলম্বো গমন করিবেন। অতঃপর মিশরাভিমুখে যাইবেন। তাঁহারা দুইমাস কাল ইউরোপে অবস্থান করিবেন।

ইঁহাদের মধ্যে ৩৮টী বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী আছে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কলেজের ষোলজন অধ্যাপক আছেন। ভ্রমণ এবং দৃশ্য অবলোকন করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। ছাত্রগণ নগরে প্রবেশ করিয়া প্রাতঃকালে রীতিমত অধ্যয়ন করে। জাহাজে অবস্থান কালেও তাহাই করিয়া থাকে। অপরাহ্নে অধ্যাপকবর্গের নির্দ্দেশানুযায়ী দ্রষ্টব্য স্থানে গমন করে এবং তথায় তাহাদের গবেষণা ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া ইচ্ছামত ভ্রমণ করে। এই নূতন রকমের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দানের ক্ষমতা আছে। এই বৎসারন্তে একটী মহিলা 'এম্ এ' উপাধি লাভ করিবে।

চীন, জাপানের ছাত্রবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ভারতের ছাত্রবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং অতঃপর ইউরোপের ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইবে।

সঞ্জীবনী

বিনা রক্তপাতে অস্ত্রোপচার

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জ্জন ডাঃ কার্ল হাটার এই ঘোষণা করিয়াছেন যে অদূর ভবিষ্যতেই অস্ত্র চিকিৎসকেরা বিনা রক্তপাতে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করিতে পারিবেন। তিনি সফলতার সহিত এমন অনেকগুলি অস্ত্রোপচার করিয়াছেন যাহাতে এক বিন্দু রক্তপাতও হয় নাই। জার্ম্মান ডাক্তার হাটারের আবিষ্কার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে চিকিৎসা জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

শিক্ষা-সমাচার

ভারতীয় আকাশযান চালক

শ্রীযুক্ত পি এন্ কাবালী একজন ভারতীয় আকাশযান চালক। তিনি আগামী ৩১সে মে ক্রয়ডন হইতে যাত্রা করিয়া দশদিনে ৫৭০০ মাইল পরিভ্রমণ করতঃ ভারতে আসিবেন। তাঁহার নিজের আকাশযান আছে, তাহার নাম আর্য্য;

উহা ৮৫।৯৫ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট এবং ৩০ গ্যালন পেট্রোল বহন করে। তিনি প্রথমে ক্রয়ডন হইতে প্যারিশ, মার্সেলিস্, রোম, নেপল্‌স্, টিউনিস্, কাইরো, গাজা হইয়া ইম্পিরিয়েল এয়ার রুট ধরিয়া করাচী পৌঁছিবেন।

তাঁহার সম্বন্ধে লণ্ডন মেগেজিনে কর্ণেল হেণ্ডারসন্ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন :—

"শ্রীযুক্ত পি এন্ কাবালী বৃটিশ আকাশযান-চালকের 'বি' শ্রেণীর অনুমতি-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনিই প্রথম ভারতীয় আকাশযান চালক ; মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে তিনি ৪২ ঘন্টাব্যাপী পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ লিম্নী পরীক্ষা ক্ষেত্রে ৯০০০ ফিট ঊর্দ্ধে ২৫ মিনিট কাল অবস্থান করিয়া তিনি যেভাবে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা নবীনের পক্ষে দূরের কথা, যে কোন পুরাতন পোত-চালকের পক্ষেও গর্ব্বের বিষয়। যখন তিনি প্রথমে আকাশ-যান চালনা শিক্ষার জন্য আবেদন করেন, এখন আমার ধারণা ছিল তিনি প্রাথমিক পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য্য হইবেন ; কিন্তু আজ তাঁহার এই অসামান্য প্রতিভা দর্শনে আমি বিশেষ আনন্দিত।"

ইংলিশম্যান

নূতন এম্পায়ার থিয়েটার

হুমায়ুন প্লেসে এম্পায়ার থিয়েটারকে নবভাবে গঠিত করা হইতেছে যাহাতে ইহা প্রাচ্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যশালা বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। দর্শকের জন্য সুপ্রশস্ত বিশ্রামাগার, বায়ু সেবনের জন্য দ্বিতলে বারাণ্ডা এবং মটর প্রভৃতি দাঁড়াইবার জন্য বিস্তৃত স্থানের বন্দোবস্ত হইতেছে। বিশেষতঃ প্রেক্ষাগৃহে ও সাজঘরে শীতল বায়ু প্রবাহের প্রবর্ত্তন করিয়া কক্ষ সুশীতল রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে, যাহাতে বৈদ্যুতিক পাখার কোন প্রয়োজন হইবে না এবং শীতকালে উষ্ণ বায়ুর দ্বারা কক্ষ উত্তপ্ত রাখা চলিবে। বক্স, ষ্টল, অর্চেষ্ট্রা প্রভৃতি দর্শকের আসন এমন ভাবে নির্ম্মিত হইতেছে যাহাতে প্রত্যেকেই রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ দৃশ্য দেখিতে পারে। অধিকন্তু রঙ্গমঞ্চ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সমস্ত যন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইবে, বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা দৃশ্যপট পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত করিবার আয়োজন চলিতেছে, সূর্য্যাস্ত, গোধূলি, ঊষা প্রভৃতি প্রদর্শন করিবার জন্য বিভিন্ন শক্তির বৈদ্যুতিক আলোকমালা প্রবর্ত্তিত করা হইবে।

অধিকন্তু যাহাতে অধিক দর্শক সুখে স্বচ্ছন্দে অভিনয় দর্শন করিতে পারে সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। সাজঘরে অভিনেতাদের বসিবার সুবন্দোবস্ত থাকিবে। প্রত্যেকেই যাহাতে অক্ষুণ্ণ শিল্পকলার নিয়মানুযায়ী বেশবিন্যাসে সমর্থ হন, তজ্জন্য প্রত্যেক অভিনেতার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিশেষতঃ যাঁহারা বহুক্ষণ পরে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহারা যাহাতে আরামে থাকিতে পারেন, বা লোকজনের সঙ্গে দেখা শুনা করিতে পারেন, সেজন্য ভিন্ন কক্ষের ব্যবস্থা হইতেছে। এক কথায় থিয়েটার গৃহকে সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাজনক করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

জে এফ্ ম্যাডান্ কোম্পানী এই থিয়েটার গৃহ দীর্ঘকালের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। তাঁহারা ইহাতে বায়স্কোপ প্রদর্শন করিবেন। খুব সম্ভবতঃ আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইবে।

ইংলিশম্যান

মৃত্যুহীন দেশ

দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মেণীর ভিজার জেলা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, সমস্ত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান আর নাই। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শুধু শরীর সুস্থ থাকে এমন নহে ; পরন্তু মৃত্যু সংখ্যাও খুব কম। বিগত সাত বৎসরের মধ্যে একটি লোকেরও মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয় নাই।

আকাশ-পথে টেলিফোন

নিউইয়র্কে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে আকাশ-পথে বিচরণ করিতে করিতে ভূতলে টেলিফোনে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভবপর। এখন হইতে সংবাদ পত্রের সংবাদ-প্রেরকেরা আকাশ-পথে ভ্রমণে বাহির হইয়া বেতারের সাহায্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের অফিসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিবেন।

মানসিক পীড়াগ্রস্তের জন্ম-শাসন

জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি জাতির স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে; যে জাতি শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে যত বেশী শক্তিমান, বিশ্ব-নিয়মে তাহার উন্নতিও তত দ্রুত ও বিস্তৃত। কিন্তু শারীরিক বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর মিলনে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহা জাতির ভবিষৎ অমঙ্গলের কারণ হয়; কারণ পীড়াগ্রস্ত পিতামাতার মিলনোৎপন্ন সন্তান কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে না। পরিণামে ঐ সমস্ত শারীরিক ও মানসিক পীড়াগ্রস্ত সন্তানগণের লালন পালনের ভার গবর্ণমেণ্ট বা জনসাধারণের স্কন্ধে নিপতিত হয় এবং জাতির ভবিষ্য বংশধরগণ বিবিধ দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া জাতিকে অধঃপতিত ও কলঙ্কিত করে। ম্যাক্স জুক্‌ নামক একব্যক্তি ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় বসবাস করিয়াছিল; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, যেখানে ঐ ব্যক্তির বংশধর ছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় চোর, প্রতারক, উন্মাদ কিম্বা গণিকা। এবং তাহাদের জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রায় ১৫ লক্ষ ডলার ব্যয় করিতে হয়। এই রূপ দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জাতির ভবিষ্যৎ যে ক্রমশঃ আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জাতির উন্নতির জন্য আমেরিকা, নরওয়ে, ডেনমার্ক, চেকো-স্লোভেকিয়া, নিউজিলণ্ড, কানাডা প্রভৃতি রাজ্যে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে মানসিক পীড়াগ্রস্তের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন না হয়, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইংলণ্ডেও এই মর্ম্মে স্বাস্থ্যবিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট আবেদন করা হইয়াছে যে, মানসিক পীড়িত নরনারীর মিলন বন্ধ করিয়া সন্তানোৎপাদন বন্ধ করা হউক, নতুবা দূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে দুষ্কৃতকারী ও মানসিক পীড়া গ্রস্তের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিবে যে তাহাতে জাতির বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবে।

গ্রেটবৃটেনে গৃহ-নির্ম্মাণ

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে গ্রেটবৃটেনে মোট ৪১৩,১৪২ খানা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

মেঘলোকে বিশ্রাম

দিনের পর দিন জগতে বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের মনোরাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিতেছে। আমেরিকার যুদ্ধ-বিভাগের আকাশ-যান অন্য আকাশ-যান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ১৫০ ঘণ্টা শূন্যমার্গে মেঘ-লোকে অবস্থান করিয়াছিল। শূন্যমার্গে আকাশযানের চালকগণকে সংবাদ-পত্রাদি প্রদান করিয়া তাহাদের পরিশ্রম অপনোদনের চেষ্টা হইয়াছিল। এখনও শূন্যমার্গে অবস্থানের পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই, যদিও বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, গমনশক্তির উপরই অবস্থান সময়ের পরিমাণ নির্ভর করে। যাহা মানুষ কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, তাহাই পরীক্ষায় সিদ্ধ হইয়া গেল। হয়তঃ এমন সময়ও আসিবে যখন মানব কর্ম্ম ক্লান্ত অক্ষম শরীরের সুস্থতা বিধানকল্পে সমুদ্র বক্ষে পরিভ্রমণ ত্যাগ করিয়া আকাশ-যানের সহায়তায় মেঘলোকে অবস্থান করিবে এবং উর্দ্ধে আকাশের অনন্ত নীলিমা এবং নিম্নে বিপুল বসুন্ধরার শ্যামল-কুঞ্জ-কানন-শোভিত বিরাট্‌ বিস্তৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া দীর্ঘ তিন সপ্তাহ বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

পার্ল্যামেণ্ট-নির্ব্বাচনে নারী

আগামী পার্ল্যামেণ্ট নির্ব্বাচনে ৬১৫ জনের মধ্যে মাত্র ৮০ জন নারী সভ্যপদপ্রার্থিনী রূপে অগ্রসর হইয়াছেন, কন্‌সারভেটিভ দলে ৮জন, লিবারেল দলে ২২জন এবং সোসিয়ালিষ্ট দলে ৫০ জন। এই জন সংখ্যা হ্রাসের কারণ যে নারীর অক্ষমতা তাহা নহে; কারণ এই যে, অনেক জেলা-সমিতি নারীকে সভ্যপদপ্রার্থীর অধিকার দানে সম্মত নহে। বিশেষতঃ পুরুষের অপেক্ষা নারীরাই নারীর সভ্যপদপ্রার্থীর বাধা স্বরূপ দণ্ডায়মান। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে, ক্যানভাসার, বক্তা ও গঠনকারী রূপে নারীর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। মিস্‌ মার্জোরী ম্যাক্সস্‌ কন্‌সারভেটিভ্‌ দলের নেত্রী, মিস্‌ মারগেরেট হার্ভে লিবারেল দলের গঠন কার্য্য

পরিচালনা করিতেছেন এবং ডাঃ মেরিয়ন ফিলিপ্‌স্ সোশিয়ালিষ্ট দল পরিচালনা কার্য্যে নিযুক্ত।

স্মিথফিল্ড কৃষিযন্ত্র-প্রদর্শনী

লণ্ডনে বিগত ১০ হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্মিথফিল্ড ক্লাবে কৃষিযন্ত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইহা ঐ সমিতির বার্ষিক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ১৯২৯ সনের কৃষিকার্য্যের জন্য নব বিজ্ঞানানুমোদিত যন্ত্রাবলী সুসজ্জিত অবস্থায় দর্শকের নেত্র-পথে নিপতিত হইয়া ভবিষ্য কৃষির সুযোগ সুবিধা স্পষ্ট প্রতীয়মান করিয়াছিল। মেসার্স বামফোর্ড কোম্পানীর গোলাবাড়ীর যন্ত্রপাতি, মেসার্স জে আর ওয়ালেস্ কোম্পানীর পশুদিগের অটোমেটিক ড্রিংকিংবৌল বা পানপাত্র, মেসার্স কার্টার্স ব্রাদারের খড় গাদা করিবার যন্ত্র ও এতদ্ভিন্ন মেসার্স মার্শেল সন্স এণ্ড কোম্পানীর এঞ্জিন, ট্র্যাকটর প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত হইয়া উহার শোভা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

(৭)

লণ্ডনের দৃশ্য-বৈচিত্র্য

টেম্‌স্ নদীর সেতু

টেম্‌স নদীর উপর কতকগুলি ব্রীজ বা সেতু রহিয়াছে। তন্মধ্যে লণ্ডন, সাউথ ওয়ার্ক, ব্ল্যাক ফ্রায়ারস্, ওয়াটার্লু ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার নামক সেতুগুলি বিখ্যাত।

লণ্ডন সেতুর ইতিহাস

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লণ্ডনে টেম্‌সের একমাত্র সেতু ছিল লণ্ডন সেতু। প্রাচীন পুস্তকে ইহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে ইহা পাথরে নির্ম্মিত এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৯২৬ ফুট, প্রস্থ ৪০ ফুট ও উচ্চতা ৬০ ফুট ছিল। এই সেতু ১১৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল—নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে ৩০ বৎসর লাগে।

সংস্কারের অভাবে এই পুরাতন সেতুর অবস্থা ক্রমে ক্রমে এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়ে যে সে সময়কার সাহিত্যে ইহার উল্লেখ দেখা দেয়। অবশেষে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই পুরাতন সেতুর ১৮০ ফুট পশ্চিমে নূতন লণ্ডন সেতু নির্ম্মিত হয়। এই দুয়ের ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। পুরাতন সেতুর এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তৎস্থলে আধুনিক এঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের জয়-ঘোষণা করিয়া নূতন লণ্ডন সেতু দাঁড়াইয়া আছে।

আফিসের সময়ে লণ্ডন

কলিকাতায় ট্রামে ও বাসে আফিসগামী ও আফিস-ফের্ত্তা বাবুদের কিরূপ ভীড় হয়, তাহা সকলেই জানেন। লণ্ডনে আসিলেও ঐরূপ দৃশ্য চোখে পড়িবে। তবে কলিকাতার চেয়েও লণ্ডনে অনেক বেশী লোক বাহির হইতে কাজকর্ম্ম করিতে আসে। দেখা যাইবে যে সকাল ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রাস্তা দিয়া ক্রমাগত লোক হাঁটিয়া চলিতেছে। অথবা ট্রামে, বাসে বা রেলে করিয়া লণ্ডন অভিমুখে ছুটিতেছে। রবিবার ব্যতীত সপ্তাহের আর সকল দিনেই এই দৃশ্য চোখে পড়িবে। এইরূপে প্রতিদিন প্রায় ৭০ লক্ষ লোক আফিস কাছারি করে।

লণ্ডনবাসীর কাগজ পড়িবার সখ

লণ্ডনে পৌছিবার জন্য নানারকম যান বাহন রহিয়াছে। কেহ ট্রামে আসে, কেহ বাসে, কেহ রেলে, কেহ বা টিউবে অর্থাৎ মাটির নীচের রেলে। এই লক্ষ লক্ষ লোকের এক

বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সকাল বেলা ইহারা প্রায় সকলেই কাগজ পড়িতে পড়িতে আসে। বাস্তবিক, খবরের কাগজ পড়িবার রেওয়াজটা লণ্ডন যানগুলির ভিতর এরূপ বহুলভাবে প্রচারিত রহিয়াছে যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এমন লোক কম পাওয়া যাইবে যে সকাল বেলার কাগজটা কিনিয়া অন্ততঃ সমস্ত হেডিং গুলি পড়িয়া না ফেলে। কর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই দিনের প্রধান প্রধান ঘটনার কথা অনেকেরই জানা হইয়া যায়। এই কাগজ পড়িবার আগ্রহ ইহাদের মধ্যে এরূপ প্রবল যে সে সময়ে তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট কাহারও সহিত কেহ আলাপ পর্য্যন্ত করিবার সময় পায় না। এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে কিরূপে কোন কোন ইংরেজী পত্রিকার লক্ষ লক্ষ গ্রাহক হওয়া সম্ভবপর হয়। সেখানে প্রায় প্রত্যেক নরনারী লিখিতে পড়িতে জানে। তাহার উপর প্রত্যেকের নিজ নিজ কাগজ কিনিয়া পড়িবার ইচ্ছা প্রবল। আমাদের দেশে একে ত কাগজ পড়িয়া বুঝিতে পারে এমন লোকের সংখ্যাই কম, সেই জন্য কোন কাগজেরই গ্রাহক সংখ্যা ২৫।৩০ হাজারের বেশী হয় না; তাহার উপর যাহারা লেখাপড়া জানে তাহারাও নানা কারণে প্রত্যেকে কাগজ কিনিয়া পড়ে না। লণ্ডনের আরোহীদের মধ্যে কচিৎ কখনো কাহাকেও উপন্যাস পড়িতে দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই স্ত্রীলোক। যাহাদের আফিসে কাজের মধ্যে অবসর থাকে, তাহারা সেই সময় কাগজ পড়িতে পারে বলিয়া যানারোহনে যাইবার সময় ঘুমায় বা গল্প করে।

কোথা হইতে লোক আসে

সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন প্রত্যহ প্রাতে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ ভাবে আফিসগামী লোকদিগকে লণ্ডনে আসিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ খাঁটি লণ্ডনবাসীরা যান-বাহনে চড়িয়া আসে। প্রশ্ন হইতে পারে, হাঁটিয়া আফিসে আসে কাহারা? বাস্তবিক পক্ষে ইহাদের অধিকাংশই হাঁটিয়া আফিস করে না। আফিসের কিছু আগে বাস্ বা ট্রেণ হইতে নামিয়া আফিস পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। এই সব নরনারী লণ্ডন হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে আফিস করিতে আসে। ট্রেণগুলি ২।৩ মিনিট অন্তর এক এক ষ্টেশন হইতে ছাড়ে; বাস্ ও ট্রাম অনবরত যাওয়া আসা করে। অধিকাংশ যান সকাল বেলায় লণ্ডন অভিমুখে আসিবার সময় বোঝাই হইয়া থাকে, আর সেই সময়ে ফিরিবার কালে প্রায় খালি অবস্থায় যায়।

সকাল ৯টা ও ১০টার মধ্যে ভীড় খুব বেশী হইলেও সারাদিন ধরিয়াই লোকজন আসিতে থাকে। এই আসাটা বেলা বারোটা পর্য্যন্ত দেখা যাইবে। বেলা বারোটার পর স্রোতটা উল্টা দিকে বহিতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে বাড়ী ফেরা আরম্ভ হয়। সকাল বেলায় যাহারা আসিয়াছে বিকালে ৫টায় তাহাদের প্রায় সকলেই ছাড়া পায়। তখন কে আগে বাড়ী যাইবে তাহার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষে যানগুলি ঠাসাঠাসি হইয়া যায়। ঝুলিতে ঝুলিতেও অনেকে যায়। স্থান নাই বলিয়া অনেককে নামাইয়া দেওয়াও হয়। কলিকাতার রাস্তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী যান বাহন লণ্ডনের রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে, তথাপি কুলাইয়া উঠে না। এই অসুবিধার প্রতীকারের কোন উপায় নাই। পিকাডেলি সার্কাস, অক্সফোর্ড সার্কাস, চেয়ারিং ক্রস্, লাড্‌গেট সার্কাস, ব্রিটানিয়া—প্রত্যেকটা বাস থামিবার বড় ষ্টেশন। দেখা যাইবে রাস্তা জুড়িয়া সারি সারি বাস দৌড়াইতেছে, তথাপি যেখানে বসিবার জায়গা মাত্র ১টি সেখানে ২০ জন লোক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ট্রাম, বাস, ট্রেণ, টিউব কোনটাতেই এই সময়ে জায়গা পাওয়া সহজ নহে।

সন্ধ্যায় লণ্ডন

সকাল বেলা যে সকল লোক আসে তাহাদের সকলের গতি একদিকে, সকলেই লণ্ডনে কাজ করিতে আসে। কিন্তু আফিস্ হইতে ফিরিবার পথে অনেক লোক সহরেও ঢের সময় কাটাইয়া যায়। লণ্ডনে আমোদে কাল কাটাইবার অনেক উপায় রহিয়াছে। বায়স্কোপ, থিয়েটার, বন্ধুবান্ধবের সহিত হোটেল বা রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া মনোরঞ্জনের উপায়। কেহ কেহ মাত্র সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য কিছুক্ষণ থাকিয়া যায়।

কিন্তু সাধারণতঃ লণ্ডনবাসী দিনের কাজের পর আপনার গৃহাভিমুখে ছুটিতেই ভালবাসে। এ বিষয়ে প্যারিস্‌বাসীর সহিত তাহার বেশ পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু বাড়ী ফিরিবার পথে ট্রামে, ট্রেণে, বাসে লোকেরা আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। তাহারা অন্যান্য আরোহীদের সঙ্গে পরিচয় ও গল্প করিতে করিতে যায়। তখন আর কাগজ পড়িবার তাড়া থাকে না। যাহারা পড়ে, তাহারা আর খবরের জন্য লালায়িত নয়, তাহারা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মনোযোগ দেয়। কেহ মোটর সাইকেলের তত্ত্ব, কেহ ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস, কেহ বা অন্য কোন দুরূহ বিষয় লইয়া মাথা ঘামায়।

লণ্ডনের পায়রা ও পাখী

লণ্ডনে চড়াই পাখী ও পোষা পায়রার সংখ্যা অনেক। কিন্তু লণ্ডন হইতে ঘোড়ার গাড়ী লোপ পাওয়ায় ঘোড়া যে দানা খাইত তাহার অভাবে পায়রাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই দুই রকম পাখী লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা।

হাঁস জাতীয় পাখী

নানা প্রকারের বন্য হাঁস লণ্ডনের জলাশয়গুলিতে সাঁতার দিতেছে দেখা যাইবে। বৎসরের গোড়ার দিকে ইহারা দল বাঁধিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশ পথে যাত্রা করে ও কোন কোন দল লণ্ডনে নামিয়া কিছুদিন থাকে।

লণ্ডনের বিহগ ও বিহগাশ্রয়

লণ্ডনে এক এক ঋতুতে এক এক রকম পক্ষীর আবির্ভাব হয়। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত কোকিল জাতীয় পক্ষী অনেক আসে। ইহাদের গানে বাগানগুলি মুখরিত হইয়া উঠে।

১৯২২ সনে অনেক রাজকীয় পার্কে সরকারী বিহগাশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিহগাশ্রয়ে পক্ষীর জন্য আবাস তৈরী করিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের খাওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার যত্ন লওয়া হয়। সেখানে কেহ পক্ষীদের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। এই সব বিহগাশ্রয় নির্ম্মাণের ফলে বসন্ত ঋতুতে পাখী আরও বেশী করিয়া আসিতেছে। ১৯২২ সনে রিচমণ্ড পার্কে ৪২টি এবং হাইড্‌ পার্কে ও কেন্‌সিংটন গার্ডেনসে ২০টি নূতন জাতীয় পক্ষী আসিয়াছিল। গ্রীণউইচ পার্কে ১টি, রিজেণ্ট পার্কের হ্রদের দ্বীপে ১টি ও বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের বাগানে ১টি বিহগাশ্রয় আছে। এগুলি সরকারের ব্যয়ে পরিচালিত। সেলবোর্ণ সোসাইটি ব্রেণ্ট ভ্যালি বিহগাশ্রয় চালাইছে।

লণ্ডনের দৃশ্য

সকালে ও সন্ধ্যায় লণ্ডন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। যে সকল বিষয়ে লণ্ডনের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার কিছু কিছু এখানে বর্ণিত হইতেছে।

ইয়োরোপে লণ্ডনের মত এত পার্ক কোথাও নাই, গাছপালা, ঘাস ও ফুল বসন্তকালে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বসন্ত সমাগমে হাইড্‌, রিজেণ্ট ও ব্যাটারসী পার্কে যখন গাছে গাছে কচি পাতা দেখা দেয় তখন লণ্ডন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই মনোহর দৃশ্য দেখিলে লণ্ডনের হৈ চৈ, লোক চলাচল ভুলিয়া যাইতে হয়। ব্যাটারসী পার্কের বিশেষত্ব প্রণিধান যোগ্য। এই পার্কের সম্মুখে চেলসির তীর হইতে টেম্‌স্‌ নদীর ধারে ধারে গাছের সারি দেখিলে মনে হয় যেন বনের দিকে তাকাইতেছি। চারিদিকে অসংখ্য রাস্তার মধ্যে এই সবুজ দৃশ্য চক্ষুর প্রীতিকর।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার বা সেণ্ট পলের গির্জা হইতে লণ্ডনের দৃশ্য উপভোগ করা যায়, কিন্তু তেমন ভাল করিয়া নহে। ভাল করিয়া দেখিতে হইলে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের উপর দাঁড়ানো দরকার। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইহার উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার এক বিখ্যাত সনেট রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন "Earth has not anything to show more fair." (পৃথিবীতে ইহার চাইতে মনোরম দৃশ্য আর নাই)।

কর্ম্মব্যস্ত লণ্ডনের অভ্যন্তরে

সকলে ও সন্ধ্যার শোভা নীরবতার শোভা। লণ্ডন সারাদিন কর্ম্মব্যস্ত থাকে, গাড়ী ঘোড়া, লোকজনের চলাচল

হয়। লণ্ডনের এই বিক্ষিকার শোভা ও তাৎপর্য্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে ব্যাঙ্কগুলিতে, ট্রাফালগার স্কোয়ারে ও পিকাডেলি সার্কাসে যাওয়া দরকার।

সমগ্র নগরীর কর্ম্মকেন্দ্র হইল ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে আর ওয়েষ্ট এণ্ডের কেন্দ্র পিকাডেলি সার্কাস। এই দুই জায়গা হইতে লণ্ডনের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে। ট্রাফালগার স্কোয়ারে নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ ও অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। প্রথম চার্লস ঘোড়ার উপর আসীন। রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্লক টাওয়ার। হোয়াইট্ হল দেখা যায়।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে পার্ল্যামেণ্ট স্কোয়ারে যাওয়া কয়েক মিনিটের কাজ মাত্র। এই স্কোয়ারের এক দিকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি, অন্যদিকে পার্ল্যামেণ্ট ভবনদ্বয়। ইতিহাস বিখ্যাত এই স্থান না দেখিলে লণ্ডনে আসা ব্যর্থ হইবে। লোয়ার রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের অথবা হ্যাম্পষ্টেডের উপর হইতে লণ্ডনের বেশ একটা চমৎকার ছবি গ্রহণ করা সম্ভব হইবে।

মোসাফের্

প্রেরিত পত্র*

মাননীয় শ্রীযুক্ত "সুবর্ণবণিক্ সমাচার"
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

গত ১৩৩৫ সালে ৯ই মাঘ এবং ২৬শে ফাল্গুন তারিখে জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে সপ্তগ্রামী শ্রেণী সুবর্ণবণিক্‌গণের সামাজিক কার্য্যে কুটুম্ব নিমন্ত্রণ পদ্ধতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সভা হয়। ঐ সভার কার্য্য বিবরণী আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

জোড়াসাঁকো রাজবাটী
কলিকাতা ৫ মে, ১৯২৯ সাল

বিনয়াবনত
শ্রীগোকুলচন্দ্র সিংহ

বর্ত্তমান সময়ে সুবর্ণবণিক্ সমাজের উন্নতিকল্পে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকো রাজবাটিতে, গত ৯ই মাঘ ১৩৩৫ সালের অপরাহ্নে, সপ্তগ্রামী শ্রেণীর দলপতিদিগের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় ৭টী দলেরই প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিয়া একযোগে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু গোপেশ্বর মল্লিক—সভাপতি, কুমার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ রায়, জিতেন্দ্র মল্লিক, কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, বিশ্বনাথ রায়, গোপেন্দ্র মল্লিক, বিহারীলাল মল্লিক, পান্নালাল মল্লিক, দুনিয়ালাল মল্লিক, প্রেমলাল মল্লিক, মুরারীমোহন মল্লিক, (চিৎপুর রোড) নন্দলাল মল্লিক, কাশীনাথ মল্লিক, পঞ্চানন মল্লিক, যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক, মাণিকলাল মল্লিক, সহরলাল মল্লিক, শরৎচন্দ্র মল্লিক, হরিহর দাস মল্লিক, শিবদাস মল্লিক, দুর্গাদাস মল্লিক, জিতেন্দ্রমোহন মল্লিক, মুরারীমোহন মল্লিক, গোলকবিহারী মল্লিক, (পক্ষে উপেন্দ্রনাথ মল্লিক) গিরিহরদাস মল্লিক, প্যারীলাল মল্লিক, অমৃতলাল মল্লিক, উমাচরণ মল্লিক, গদাধর মল্লিক, প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক, গোপীনাথ মল্লিক, প্রিয়লাল মল্লিক, কুমার দীনেন্দ্র মল্লিক, রঘুনাথ মল্লিক, ঠাকুরলাল মল্লিক।

শ্রীযুক্ত কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার এই সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোপেশ্বর মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

* মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নহেন।

শ্রীযুক্ত কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক ইহা সমর্থন করেন ও সকলে তাহা অনুমোদন করেন।

শ্রীযুক্ত কুমার কার্ত্তিক চরণ মল্লিক নিম্নলিখিত ৩টী প্রস্তাব করেন :—

১। বর্ত্তমানে দেখা যায় কুটুম্ব নিমন্ত্রণে অনেকেই সম্ভাষণ করেন না। সুপারি, সম্ভাষণের অংশ মাত্র বলিয়া, তাহা না দেওয়ায় কোনরূপ দোষার্হ হইবে না। সুপারি দিলে পুরা সম্ভাষণ করিতে হইবে, অর্থাৎ ক্ষীর, ফেণী ও সুপারি দিতে হইবে।

২। কুটুম্বদিগের মহিলাগণের নিমন্ত্রণ, কর্ত্তৃপক্ষ নিমন্ত্রণ করিলেই গ্রাহ্য হইবে। তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে দাসী পাঠাইতে হইবে না।

৩। বিবাহের নিমন্ত্রণের সঙ্গে পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে। স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণের কোন আবশ্যকতা নাই।

শ্রীযুক্ত কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক উল্লিখিত ৩টি প্রস্তাবই সমর্থন করেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

পরে ধার্য্য হইল যে, দলপতিগণ নিজ নিজ দলভুক্ত বণিক্‌গণ ও কুটুম্বদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া, ফাল্গুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পরবর্ত্তী সভায় তাঁহাদের মত জ্ঞাপন করিবেন।

শ্রীগোপেশ্বর মল্লিক
সভাপতি

গত ২৬শে ফাল্গুন অপরাহ্নকালে কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের জোড়াসাঁকো রাজবাটিতে রাজার দলের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় নিম্নলিখিত সুবর্ণবণিক্‌গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপেশ্বর মল্লিক, বিহারীলাল মল্লিক, হরিদাস দত্ত, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার হরিশ্চন্দ্র রায়, বাবু উমাচরণ লাহা, তারকনাথ মল্লিক, লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক, শম্ভুনাথ দত্ত, রাধানাথ মল্লিক, তারাপদ দে, দুলালচাঁদ রায়, বিপিনবিহারী ধর, মণীন্দ্রনাথ রায়, শ্যামসুন্দর মল্লিক, কার্ত্তিকচন্দ্র ধর, মাণিকলাল নন্দী, কান্তচন্দ্র মল্লিক, গোপীনাথ সেন, বিনোদবিহারী সেন, বিপিনবিহারী সেন,

বঙ্কুবিহারী সেন, কুঞ্জবিহারী সেন, সুরেন্দ্রনাথ সেন, রসিকলাল দত্ত, নবকুমার মল্লিক, কালিচরণ মল্লিক, ভোলানাথ মল্লিক, গোসাইদাস দত্ত, কুঞ্জবিহারী ধর, বনমালী সেন, গগনচন্দ্র মল্লিক, শ্যামাচরণ দত্ত, রঘুনাথ মল্লিক, ধনঞ্জয় মল্লিক, মনোরঞ্জন ধর, যুগলকিশোর ধর, রূপলাল ধর, গোপীনাথ মল্লিক, পূর্ণচন্দ্র বর্দ্ধন, জীবনকৃষ্ণ মল্লিক, বেণীমাধব ধর, রাসবিহারী ধর, মধুসূদন মল্লিক, ব্রজনাথ মল্লিক, বৈদ্যনাথ রায়, উমাচরণ মল্লিক, গোরাচাঁদ দত্ত, হারাধন চন্দ্র, লালমোহন ধর, কালিচরণ ধর, নিলমণি মল্লিক, নিত্যানন্দ ধর, বটবিহারী দত্ত, কার্ত্তিকরাম দে, বনবিহারী ধর, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ দে, মাণিকলাল দে।

অপর দলের নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ রায়, কালিদাস দত্ত, ইন্দ্রচন্দ্র দত্ত, বলাইচাঁদ দত্ত, কৃষ্ণদাস নন্দী, যতীন্দ্রমোহন মল্লিক।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রস্তাব করেন যে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু গোপেশ্বর মল্লিক, মহাশয় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামসুন্দর মল্লিক এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সভাস্থ সকলে উহা অনুমোদন করেন, এবং সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বজাতীয় দলপতি-গণকে ও তাহাদের দলস্থ কুটুম্ব মহাশয়গণকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন—

আমাদের পরম প্রীতিভাজন স্বজাতীয় দলপতিবৃন্দ ও তৎ তৎ দলস্থ কুটুম্ব মহোদয়গণ—

আমাদিগের স্বজাতিবৃন্দের মধ্যে জাতীয় উন্নতিকল্পে বহুদিন হইতে সমাজ হিতকর অনেক বিষয়ের আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত ঐ সকল প্রয়োজনীয় কোন একটি বিষয়েরও স্থির মীমাংসা হইতে দেখিলাম না!

গত ৯ই মাঘ অপরাহ্নে এই স্থানেই সপ্তগ্রামী শ্রেণীর দলপতিদিগের একটি সভা হইয়াছিল, উহাতে ৭টি দলেরই প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, উক্ত অধিবেশনে আমার

স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত কুমার-কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, ৩টি প্রস্তাব করেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইলেও ফাল্গুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ মধ্যে দলপতিগণ স্ব স্ব দলভুক্ত কুটুম্বদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অভিমত গ্রহণ করিবেন, এইরূপ স্থির হয়, সেই উদ্দেশ্যেই অদ্যকার সভা।

উক্ত ১ম প্রস্তাবে বলা হয় "কুটুম্ব নিমন্ত্রণে অনেকেই সম্ভাষণ করেন না। সুপারি সম্ভাষণের অংশ মাত্র বলিয়া তাহা না দেওয়ায় কোনরূপ দোষই হইবে না সুপারি দিলে পুরা সম্ভাষণ করিতে হইবে।" এই উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য, কারণ সুপারি সম্বন্ধে স্বর্গীয় কুঞ্জলাল ভুতি মহাশয় তদীয় "সুবর্ণবণিক্" পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় "সুপারি দেওয়া নিমন্ত্রণের রীতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উহাকে তিনি সম্ভাষণের অংশমধ্যে ধরেন নাই, এবং প্রচলিত ব্যবহারে ও তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ দেখা যায়, পক্ষান্তরে, যদি উহাকে অঙ্গমধ্যে গণনা করা হয়, তাহা হইলেও সম্পূর্ণ সম্ভাষণে অসমর্থ পক্ষে তাহার অঙ্গ বিশেষের অনুষ্ঠান অসঙ্গত বা সদাচার বিরুদ্ধ বলিতে পারা যায় না। বরং প্রচলিত সদাচার পরিত্যাগেই দোষ দেখা যায়, যেহেতু বেদ, স্মৃতি ও সদাচারই ধর্ম্মরক্ষার মূল, পিতৃ-পিতামহ ক্রমে আগত আচারই শাস্ত্রে সদাচার নামে অভিহিত হইয়াছে। স্ব স্ব প্রাধান্যের এই নবযুগে সম্মানার্হ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করিতে অনেকেই কুণ্ঠা মনে করেন, এমত অবস্থায় সভা করিয়া কুলোচিত সম্মানের পরিচায়ক প্রথা রহিত করা কতটা সঙ্গত তাহা সকলে বিবেচনা করিবেন। আমার মনে হয় সুপারির আলোচনা অতি নগণ্য, যতদিন দল, সমাজ, দলপতি থাকিবে ততদিন কুলোচিত সম্মান প্রথা থাকা কর্ত্তব্য। পশ্চিম প্রদেশেও বিবাহে নারিকেল সুপারি প্রভৃতি প্রদান প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। নিমন্ত্রণের সুপারি লইয়া আন্দোলনে আমরা যে সময়ক্ষেপ করিতেছি ইহাপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-বাণিজ্য প্রভৃতি আবশ্যকীয়, আলোচনার অনেক বিষয় আছে; যাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিবাহে পণপ্রথা, ইহা বর্ত্তমান সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। নেতৃবৃন্দের প্রথম দেখা কর্ত্তব্য যে কার্য্য করিলে সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের অধিক উপকার হয়। তৎপক্ষে পণপ্রথা রহিত করিতে পারিলে অনেক ঘর রক্ষা হইয়া যায়, কারণ আমাদের স্বজাতি মধ্যে ভদ্র গৃহস্থের সংখ্যাই অধিক। সত্যের অনুরোধে অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি বর্ত্তমানে অনেক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত গৃহে যেরূপ আর্থিক অবনতি দেখিতেছি তাহাতে সর্ব্বাগ্রে পণপ্রথার উচ্ছেদ অথবা সম্মানার্থে নির্দ্ধারিত স্বল্প পরিমাণের একটি ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য।

আমার প্রীতিভাজন দলপতিবৃন্দ ও কুটুম্ব মহোদয়গণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আপনারা এতৎপক্ষে মনোযোগী হউন। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আমি ভরসা করি, আমরা যদি কোন প্রকারে এই কার্য্যটি করিতে পারি তাহা হইলে কন্যাদায়-পীড়িত পিতামাতার অন্তরের ধন্যবাদ ও পরম-কল্যাণময় শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভে সক্ষম হইব।

আমার বক্তব্য আমি সভ্যগণ সমীপে ব্যক্ত করিলাম। আপনারা বিচারপূর্ব্বক ইহার সদসৎ নির্দ্ধারণ করিবেন।

পরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামসুন্দর মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ রায়, হরিদাস দত্ত ও ভোলানাথ দত্ত এবং অন্যান্য অনেকে উপরি উক্ত তিনটি প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন। তিনটি প্রস্তাব পৃথক পৃথকরূপে সমালোচনা ও বিশেষ তর্কবিতর্ক করিয়া বিচার করা হয়; অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিতরূপে গৃহীত হয়।

১। বর্ত্তমানে সুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা যেমন প্রচলিত আছে তাহা বিদ্যমান থাকিবে ও নিমন্ত্রণ-কালে ক্ষীর ও ফেণী দিয়া সম্ভাষণ করা হউক বা না হউক প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

২। কুটুম্বদিগের মহিলাগণের নিমন্ত্রণের সংবাদ নিমন্ত্রণকালে নিমন্ত্রণকারীর কোন লোকের দ্বারায় মহিলা-দিগকে জানাইতে হইবে। তাহাদিগকে আনিবার জন্য আর সতন্ত্র দাসী না পাঠাইলেও চলিবে।

৩। বউভাতের (আমাদের পাকস্পর্শের প্রথা নাই) নিমন্ত্রণ প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যেমন চলিয়া আসিতেছে সেইরূপই বজায় থাকিবে, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তনের

আবশ্যক নাই। **কিন্তু** প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ বিবাহের **নিমন্ত্রণের সঙ্গে করিলেই** চলিবে।

অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল মল্লিক মহাশয় **সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ** দিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগোপেশ্বর মল্লিক
সভাপতি

(২)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত সুবর্ণবণিক্ সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

গত **বৈশাখ মাসের "সমাচারে"** মৎপ্রেরিত যে পত্রখানি **প্রকাশিত হইয়াছে তাহার** উপসংহার স্বরূপ জ্যৈষ্ঠ মাসে **স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের** দলস্থ বণিক্গণের পুরাতন তালিকা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। এক্ষণে **দলস্থ বণিক্গণের বংশধরদিগের** নিকট অনুরোধ তাঁহারা **যথাসম্ভব সত্বর নিজ নিজ বর্ত্তমান** ঠিকানা ও **জ্ঞাতি গোষ্ঠীবর্গের সবিশেষ তথ্য আমার** নিকট পাঠাইয়া দেন। ইতি

বশম্বদ
শ্রীগোলকবিহারী মল্লিক
২২নং বৃন্দাবন বসুর লেন, কলিকাতা।

স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের দলস্থ বণিক্গণের তালিকা

বড় বাজার

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ মল্লিক, হরিমোহন দে, কানাইলাল দে, **পুলিনচন্দ্র রায়, কালিচরণ** রায়, গোষ্ঠবিহারী রায়।

সোনাপটী

শ্রীযুক্ত মতীলাল বড়াল, কার্ত্তিকচন্দ্র বড়াল।

আমড়াতলাগলি

৺রামনাথ শীলের পুত্র শ্রীযুক্ত হীরালাল শীল, নবীনচন্দ্র আঢ্য, **৺অদ্বৈতাচরণ আঢ্যের পুত্র শ্রীযুক্ত** গোবিন্দচরণ আঢ্য, **কার্ত্তিকচন্দ্র আঢ্য, পুলিনবিহারী** দত্ত।

চোরবাগান

৺রূপচাঁদ দের পুত্র শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দে, কিশোরী **মোহন দে।**

হাওড়া

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নন্দী, বিশ্বনাথ দে, ৺রামচরণ শীলের পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শীল, রামচন্দ্র দে, ঠাকুরদাস সেন, ৺দিগম্বর বড়ালের পুত্র কালীচরণ বড়াল, দ্বারিকানাথ শীল, কানাইলাল মল্লিক।

জোড়াসাকো, ষষ্ঠীতলা গলি ও মনসাতলা

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল নন্দী, ৺রূপচাঁদ রায়ের পুত্র সাধুচরণ রায়, ৺বিশ্বনাথ দের পুত্র ভীমচরণ দে, ৺শিবচরণ মল্লিক, ৺অভয়চরণ মল্লিকের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৺বৈদ্যনাথ শীলের পুত্র হরিমোহন শীল, ৺চন্দ্রকুমার নন্দীর পুত্র, ক্ষেত্রমোহন শীল, ৺হরিমোহন রায়ের পুত্র গুরুচরণ রায়, ৺মদনমোহন দের পুত্র সূর্য্যকুমার দে, শ্রীনাথ দত্ত।

চাষাধোপা পাড়া

৺শ্রীনাথ দত্তের পুত্র বিপিনবিহারী দত্ত, ব্রহ্মপ্রসাদ আঢ্য, তুলসীদাস আঢ্য, ৺রামচাঁদ বর্দ্ধনের পুত্র তুলসীদাস বর্দ্ধন, ৺গোপাল চন্দ্রের পুত্র গোঁসাই দাস চন্দ্র, বিনয়চাঁদ মল্লিক, দয়ালচাঁদ শীল, কানাইলাল শীল, ৺রাজনারায়ণ দের ভ্রাতা শ্যামলাল দে, ৺রামনারায়ণ বর্দ্ধনের পুত্র নন্দলাল বর্দ্ধন, বীরচাঁদ আঢ্য, ৺মদনমোহন দত্তের পুত্র সুবোলচন্দ্র দত্ত (মলাঙ্গ), নকুলচন্দ্র দে, কেশবলাল মল্লিক ৺গোপীনাথ দের পুত্র বলাইচাঁদ দে, গোবিন্দচন্দ্র সেন, উমাচরণ দে।

বিডন ষ্ট্রীট

৺মদনমোহন দের পুত্র গোষ্ঠবিহারী দে, ৺দীননাথ দের পুত্র বলাইচাঁদ দে, হরিমোহন দে, অক্ষয়কুমার দে।

পাথুরিয়া ঘাটা

শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস পাইন, ৺নন্দলাল মল্লিকের পুত্র মাণিকলাল মল্লিক।

জোড়াশাঁকো দয়েহাটা

শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়, বিপিনলাল শীল।

জগন্নাথ ঘাট

৺মদনমোহন আঢ্যের পুত্র, বলাইচন্দ্র দত্ত, ৺বিধুভূষণ দের পুত্র, বীরচাঁদ দের পৌত্র, ক্ষেত্রমোহন দে।

বাঁশতলা গলি

শ্রীযুক্ত জগমোহন বড়াল।

সুপারিহাটা ও সোনাপটী

৺রূপচাঁদ দের পুত্র যদুরাম দে, মতিলাল মল্লিক, রামনারায়ণ মল্লিক।

তুলা পটী

৺রাধাবল্লভ সেনের পুত্র কৃষ্ণমোহন সেন, ৺রাধামোহন সেনের পুত্র বলাইচাঁদ সেন।

মেছুয়াবাজার পায়রা টোলা গলি

৺মধুসূদন বড়ালের পুত্র জগমোহন বড়াল।

কৃষ্ণ সেনের গলি, উমেশচন্দ্র দত্তের গলি

৺মাধবচন্দ্র সেনের পুত্র দ্বারিকানাথ সেন।

ঢাকাপটী শিব ঠাকুরের গলি

শ্রীযুক্ত নকুরচন্দ্র মল্লিক, শীবচাঁদ মল্লিক, মধুসূদন দে, আশুতোষ মল্লিক, হরপ্রসাদ দে, ধনঞ্জয় মল্লিক।

ঠনঠনে

৺বিশ্বম্ভর রায়ের পুত্র, সিংহদাস রায়, ৺বৈদ্যনাথ দের পুত্র।

চূণাগলি

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস, দেবেন্দ্রনাথ মলিক, ঠাকুরদাস সেন, ৺রাধানাথ শীলের পুত্র (চীনেপাড়া), গোপালচন্দ্র শীল, শ্যামচন্দ্র পাইন, নিতাইচন্দ্র দত্ত, ৺রামমোহন মল্লিকের পুত্র অদ্বৈতচরণ মল্লিক।

সুর্ত্তিবাগান

৺নিতাইচন্দ্র বড়ালের পুত্র লালমোহন বড়াল, বিপিন বিহারী মল্লিক, ৺গুণমণি শীলের ভ্রাতা দীননাথ শীল, ৺রামানন্দ সেনের পুত্র শীতলচন্দ্র সেন, ৺সনাতন শীলের পুত্র রামচাঁদ শীল, ৺শ্যামচাঁদ সেনের পুত্র মহেন্দ্রনাথ সেন, ৺দামোদর পাইনের পুত্র পুলিনবিহারী পাইন, ৺কার্ত্তিকচন্দ্র দত্তের পুত্র দীননাথ দত্ত, ৺দীননাথ ধরের পুত্র শ্যামচাঁদ ধর, হীরালাল ধর, গঙ্গানারায়ণ ধর, ৺দর্পনারায়ণ বড়ালের পুত্র কৃষ্ণমোহন বড়াল, দীননাথ বড়াল, ৺গোবিন্দচন্দ্র শীলের পুত্র কালীচরণ শীল।

সিন্দুরপটী

৺বিশ্বম্ভর রায়ের পুত্র সাধুচরণ রায়।

কলুটোলা ধোপাপাড়া

শ্রীযুক্ত পিতাম্বর দত্ত, ৺উদয়চাঁদ ধরের পুত্র রাজনারায়ণ ধর, ৺বীরচাঁদ দের পুত্র নীলমণি দে, গঙ্গানারায়ণ পাইন, অদ্বৈতচরণ দত্ত, রাজনারায়ণ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন নন্দী, গোপাল চন্দ্র ধর, ৺রাধারমণ দত্তের পুত্র হরনাথ দত্ত, ৺ভবানী দের পুত্র হেমচন্দ্র দে, গৌরমোহন ধর, নরসিংহ মল্লিক।

শ্রীযুক্ত কেশবলাল দে, ৺শিব দের পুত্র শ্যামলাল দে, নিতাইচাঁদ দে, ৺রামকান্ত বড়ালের পুত্র চুণিলাল বড়াল, বৈদ্যনাথ দত্ত, ৺বীরচাঁদ দের পুত্র শিবচন্দ্র দে, ৺রূপচাঁদ দের পুত্র মতিলাল দে, ৺মাধবচন্দ্র দের পুত্র ব্রজনাথ দে, বেণীলাল দত্ত (কলেজ ষ্ট্রীট)।

গোপালচন্দ্রের গলি

শ্রীযুক্ত দীননাথ দে, নন্দলাল চন্দ্র, নয়ানচাঁদ দত্ত।

গোয়ালা পুকুর ও হাড়কাটা গলি

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ পাইন, বীরচাঁদ পাইন, যাদবচন্দ্র দত্ত, নসীরাম বড়াল, ৺রমানাথ ধরের পুত্র ব্রজনাথ ধর, কানাই লাল পাইন, ব্রজমোহন মল্লিক, তারাচাঁদ মল্লিক, ব্রজনাথ শীল, মন্মথনাথ ধর (শ্রীগোপাল মল্লিক লেন)।

আরফুলি ও শক্রুঘ্ন সেনের গলি

৺দয়ালচাঁদ দত্তের পুত্র গোবর্দ্ধন দত্ত।

মৃজাপুর

৺রমানাথ শীলের পুত্র সুবলচন্দ্র শীল।

পটলডাঙ্গা আরফুলি লেন

শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মল্লিক।

চূণারি পুকুর

৺বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, ৺দয়াল চাঁদ দের পুত্র, ক্ষেত্রমোহন দে, চুণিলাল দত্ত, কৃষ্ণমোহন শীল, দীননাথ ধর।

চাঁপাতলা

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চন্দ্র, ৺হলধর সেনের পুত্র গণেশচন্দ্র সেন, ৺প্রসন্নকুমার পাইনের পুত্র ভোলানাথ পাইন, নিলমণি দাস, ৺প্রেমচাঁদ মল্লিকের পৌত্র কানাইলাল মল্লিক, নিলমণি রায়।

সুর্ত্তিবাগান

৺গোবিন্দচন্দ্র সেনের পুত্র দীননাথ সেন, দুর্গাচরণ ধর, গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক।

ভুবন ধরের গলি

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, ব্রজনাথ শীল, ৺গোবিন্দচন্দ্র সেনের

পুত্র দ্বারিকানাথ সেন, হরিচরণ সেন, ৺সনাতন দের পুত্র বেণীমাধব দে, কালীচরণ দে, মথুরামোহন দে, ব্রজনাথ মল্লিক।

রামকান্ত মিস্ত্রির লেন

৺ভীম দের পুত্র বিহারীলাল দে, ৺মদনমোহন মল্লিকের পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক।

স্কটস লেন ও বৈঠকখানা

শ্রীযুক্ত তিলকচাঁদ ধর, শম্ভুচন্দ্র পাল, মতীলাল দে, রামধন দে, সুবোলচন্দ্র ধর।

ছরাসে পাড়া

৺রাধানাথ রায়ের পুত্র শ্যামচাঁদ রায়।

চাঁপাতলা রাস্তার উপর

৺রূপচাঁদ দত্তের পুত্র, ৺যাদবচন্দ্র পাইনের পুত্র গোপাল চন্দ্র পাইন।

নীলমণি দত্তের গলি

৺রামনারায়ণ দত্তের পুত্র শ্রীনাথ দত্ত, ৺হলধর মল্লিকের পুত্র ক্ষেত্রমোহন মল্লিক, কানাইলাল শীল, নিলমণি দত্ত, গোষ্টবিহারী দে, ৺সাধুচরণ মল্লিকের পুত্র উমাচরণ মল্লিক, ৺লোকনাথ শীলের পুত্র কুঞ্জবিহারী শীল।

মালঙ্গা, দুর্গাচরণ পিতুড়ীর গলি

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দত্ত, ৺সাধুচরণ সেনের পুত্র আনন্দলাল সেন, ৺ক্ষেত্রমোহন মল্লিকের পুত্র বিহারীলাল মল্লিক, নকুরচন্দ্র সেন, ৺রাজনারায়ণ সেনের পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র সেন, ৺রাজকিশোর দের পুত্র কালীদাস দে, ৺হরি-মোহন সেনেরপুত্র ষষ্ঠীচরণ সেন, ৺কালীনাথ দের পুত্র বলাইচন্দ্র দে।

হিদারাম বাঁড়ুজ্যের লেন

৺মধুসূদন দত্তের পৌত্র ক্ষেত্রমোহন দত্ত, ৺পিতাম্বর দের পুত্র কালীচরণ দে, ৺মধুসূদন ধরের পুত্র দীননাথ ধর, গৌরমোহন বড়াল, নিলমণি দে, তুলসীদাস দে, ৺বৈষ্ণবচরণ দের পুত্র জনার্দ্দন দে, ৺নকুরচন্দ্র মল্লিকের পুত্র গোপাল-চন্দ্র মল্লিক, দ্বারিকানাথ মল্লিক, গোষ্টবিহারী ধর, ৺শ্যামচাঁদ দত্তের পুত্র বেণীমাধব দত্ত, ৺গুরুপ্রসাদ শীলের পুত্র রাজ-কিশোর শীল, ৺কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের পুত্র নকুরচন্দ্র দত্ত, ঠাকুর দাস দাস, ৺বিশ্বম্ভর বড়ালের পুত্র ক্ষেত্রমোহন বড়াল, পুলিন কুমার বড়াল, ৺নিলমণি সেনের পুত্র রাজকৃষ্ণ সেন, শিবচন্দ্র দত্ত, ৺সাধুচরণ শীলের পুত্র শিবচন্দ্র শীল, নবীনচন্দ্র সেন, ৺দয়ালচাঁদ মল্লিকের পুত্র নন্দলাল মল্লিক, দীননাথ দের পুত্র নিলমণি দে, নিত্যানন্দ দত্ত, বলাইচাঁদ রায়।

বিশ্বনাথ মতীলালের গলি

শ্রীযুক্ত ব্রজলাল দে, ৺গোলক দের পুত্র কৃষ্ণমোহন দে, রঘুনাথ দের পুত্র জগমোহন দে, তারাচাঁদ দের পুত্র ভোলানাথ দে, ক্ষেত্রমোহন দে, শ্রীনাথ দে, নন্দলাল ধর, গঙ্গাগোবিন্দ মল্লিক, ৺মাধবচন্দ্র মল্লিকের পুত্র কিশোরীমোহন মল্লিক, ৺হরেকৃষ্ণ ধরের পুত্র ক্ষেত্রমোহন ধর, দামোদর পাইন, ৺শম্ভুচন্দ্র ধরের পুত্র শ্রীধর ধর।

কেঁচ কেঁচে পুকুর

৺গোপালচন্দ্র দত্তের পুত্র ফকিরচন্দ্র দত্ত, বেচারাম দে।

অক্রুর দত্তের গলি

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পাল, রাজনারায়ণ পাল।

পঞ্চানন-তলা গলি

৺রামচাঁদ দের পুত্র কানাইলাল দে, ৺মাধবচন্দ্র দত্তের পুত্র বৈষ্ণবচরণ দত্ত, বিশ্বম্ভর দত্ত, ৺গঙ্গানারায়ণ বড়ালের পুত্র তিনকড়ি বড়াল, তুলসীদাস বড়াল, ফকিরচাঁদ শীল, ৺স্বরূপ শীলের পুত্র কালীচরণ শীল, শ্রীনাথ শীল, নিত্যানন্দ শীল, ৺নিলমণি শীলের পুত্র কানাইলাল শীল, ৺মাধব দত্তের পুত্র শ্রীনাথ দত্ত, তুলসীদাস রায়, তুলসীদাস পাল, কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, নিশিনাথ দত্ত।

জেলে পাড়া

৺নিমাইচরণ শীলের পুত্র নারায়ণচন্দ্র শীল, রাজনারায়ণ সেন, ৺মধুসূদন মল্লিকের পুত্র জগমোহন মল্লিক, ৺সনাতন শীলের পুত্র রাজিবলোচন শীল, ৺শিবচন্দ্র শীলের পুত্র বলাইচন্দ্র শীল, গোবিন্দচন্দ্র ধর, বিহারীলাল দে।

হলধর বর্দ্ধনের গলি

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, ৺দীননাথ রায়ের পুত্র বলাইচাঁদ রায়, ৺গোপালচন্দ্র বর্দ্ধনের ভ্রাতা রামচাঁদ বর্দ্ধন, মাধবচন্দ্র সেন, ৺সনাতন দত্তের পুত্র নকুর-চন্দ্র দত্ত।

কালীদাস দত্তের গলি

৺বলরাম মল্লিকের পুত্র বলভচরণ মল্লিক, ৺গোবিন্দ সেনের পুত্র কৃষ্ণলাল সেন।

নেড়াগির্জ্জা ও নেবুতলা

শ্রীযুক্ত বীরচাঁদ ধর, বারেন্দ্রনাথ মল্লিক।

পদ্মপুকুর

শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত, নৃসিংহচন্দ্র দাস, ৺হলধর দের পুত্র নিলমণি দে, ৺রাজনারায়ণ ধরের পুত্র শিবচন্দ্র ধর, নিলকমল দত্ত, ৺রামচাঁদ দের পুত্র কানাইচাঁদ দে।

বাবুরামশীলের গলি,

৺রামধন দত্তের পুত্র চুণীলাল দত্ত, রাখালদাস দত্ত, উদয়-চাঁদ দত্ত, জহরলাল দত্ত, ৺প্রেমচাঁদ পালের পুত্র নন্দলাল পাল।

সেকরাপাড়া গলি

শ্রীযুক্ত মতীলাল মল্লিক, শ্রীনাথ বড়াল, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীকৃষ্ণ সেন, বলাইচাঁদ সেন, কানাইলাল সেন, নিতাইচাঁদ পাইন।

গৌর দের গলি

৺দীননাথ দের পুত্র আশুতোষ দে, ৺সনাতন দের পুত্র দীননাথ দে, মাণিকলাল দত্ত, মধুসূদন দে, দীননাথ দে, ৺নিমাইচরণ শীলের পুত্র নিলমণি শীল।

মদন দত্তের গলি

শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ৺নকুরচন্দ্র পালের পুত্র, হরনাথ ধর।

চৈতন্য সেনের গলি

৺অটলবিহারী দের পুত্র লালবিহারী দে।

বৌবাজার

শ্রীযুক্ত যদুনাথ শীল।

ফকিরচাঁদ দের গলি

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দে।

গুড়ি য়াড় মার আড়া

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন নন্দী, ৺বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিকের পুত্র জগদ্বল্লভ মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

জাতীয় সংবাদ

শোক সংবাদ

বিগত ২১শে বৈশাখ শনিবার নদীয়া কুমারখালী নিবাসী ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং দীর্ঘকাল প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া গত ২১ ধরিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গল বিধান এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

শ্রীপাট পানিহাটিতে দণ্ড মহোৎসব

শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট পানিহাটিতে (২৪ পরগণা) গঙ্গা তীরে পবিত্র বটবৃক্ষরাজ-মূলে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব উপলক্ষে স্মরণ মহোৎসব অতি আশ্চর্য্য ভাবে ৪০০ বৎসর যাবৎ সমাধা হইয়া আসিতেছে। শ্রীবৈষ্ণবের নিকট এ সংবাদ নূতন নহে। আগামী ৫ই আষাঢ় ১৩৩৬ বুধবার (১৯এ জুন) সেই তিথি। উক্ত দিবসে দণ্ড মহোৎসব উপলক্ষে স্মরণ মহোৎসব হইবে। ঐ দিনে উৎসব ক্ষেত্রে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় সদলে উপস্থিত হইয়া কালোপযোগী মধুর গৌর-লীলা কীর্ত্তন করিবেন। ভক্তমণ্ডলীর নিকট করজোড়ে নিবেদন তাঁহারা সকলে কৃপা করিয়া উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ গুণগানে ভুবন ভরাইয়া দিউন।

দূরস্থিত ভক্তমণ্ডলীর রাত্রিবাসের জন্য স্থানের ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য সংবাদের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। শ্রীনটবর দত্ত, সহ-সম্পাদক, শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির পানিহাটি পোঃ ২৪ পরগণা অথবা কলিকাতা কার্য্যালয়, গ্রন্থমন্দির, ৭, দুর্গা পিতুড়ি লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—

ই, বি, রেলের শিয়ালদহ (কলিকাতা) হইতে সোদপুর (ভাড়া মধ্যম শ্রেণী যাতায়াত ।৵১৫) তথা হইতে মহোৎসব-তলা ১ মাইল মাত্র। ই, আই রেলের কোন্নগর ষ্টেশন হইতে গঙ্গাতীর এক মাইল মাত্র; গঙ্গার পূর্ব্বপারে মহোৎসবতলা।

সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্যাচার

১। সুবর্ণবণিক্‌গণ জল আচরণীয় না হইয়া বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণ করিলে কি মান্য এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন?

২। সুবর্ণবণিক্‌গণ আপনাদিগকে জল আচরণীয় করিয়া লইতে না পারিলে উপস্থিত যেরূপ আছেন সেরূপ থাকিলে ক্ষতি কি?

৩। সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণ করিবার পূর্ব্বে গুরুমন্ত্র ও পরে বিবাহ হওয়া আবশ্যক কিনা এবং বৈশ্যের চিহ্ন অর্থাৎ মস্তকে শিখা ও গলায় তুলসী মালা ধারণা করা বিধেয় কি না?

৪। সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণ করিতে হইলে কুলগুরু এবং কুল-পুরোহিত মহাশয়দিগের মত লওয়া আবশ্যক কি না?

৫। সুবর্ণবণিক্ জাতীয় কুলগুরু এবং কুল পুরোহিত মহাশয়দিগকে একত্র আহ্বান করিয়া উপবীত ধারণের মত লওয়া আবশ্যক কি না?

৬। সুবর্ণবণিক্‌গণের বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণ করা সম্বন্ধে সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত লওয়া উচিত কিনা?

৭। সুবর্ণবণিক্‌গণ জাতীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে সাধারণ ব্রাহ্মণগণের সহিত চল করিয়া লইবার ব্যবস্থা করাইয়া পরে নিজেদের উপবীত ধারণ করিয়া বৈশ্য হইতে চেষ্টা করা উচিত কি না?

৮। সুবর্ণবণিক্‌গণ জলাচরণীয় না হইয়া উপবীত ধারণ করিলে যে সকল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির নিকট হেয় হইয়া আছেন তাহা দূরীভূত হইবে কিনা এবং যে

ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণবণিক্গণের দান গ্রহণ ও বাটিতে সেবা করেন না তাঁহারা তাহা স্বেচ্ছায় করিবেন কি না ?

৯। রাজকীয় সেন্সাস রিপোর্টে রাজা আমাদিগকে বৈশ্য শ্রেণী ভুক্ত করিবেন কি না ?

১০। রাজা বল্লাল সেন সুবর্ণবণিক্ জাতিকে বৈশ্য হইতে শূদ্র করিয়া দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আজ সুবর্ণ-বণিক্গণ বৈশ্যত্বের আচার ব্যবহারের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, অতএব বৈশ্য হইতে হইলে অগ্রে বৈশ্যের আচার ব্যবহার পালন করা কর্ত্তব্য তাহার পর বৈশ্য হইতে চেষ্টা করা।

১১। সুবর্ণবণিক্ জাতির মধ্যে যে উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় ছিলেন, তাঁহার হস্তে ভগবান ভোজন করিয়াছিলেন। সুতরাং সুবর্ণবণিক্ জাতি অন্যান্য বাঙ্গালী জাতির নিকট হেয় নহে ইহা ধ্রুব সত্য, অতএব সুবর্ণবণিক্ জাতি জল আচরণীয় কেননা হইতে পারিবে, প্রত্যেক সুবর্ণবণিক্ জাতিকে জল আচরণীয় হইতে চেষ্টা করিয়া জাতীয় পরিচয় দেওয়া উচিত কি না ?

উপরোক্ত প্রস্তাব কয়েকটি জ্ঞানীব্যক্তি মাত্রকেই বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি এবং তাঁহাদিগের মতামত জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র
অমৃত-ফুড কার্য্যালয়,
৩১৯নং অপার চিৎপুর রোড, বটতলা কলিকাতা

কানাইলাল ধর অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ে

পুরস্কার বিতরণ

বিগত ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ৪৯।১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটস্থ স্বর্গীয় কানাইলাল ধরের অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের একদাশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু, সি আই ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া, স্বহস্তে বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। পারিতোষিকের দ্রব্যগুলি অতি মনোহর এবং মূল্যবান ছিল। সভাস্থলে বালিকাগণ যে সকল সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিয়াছিল, তন্মধ্যে "মাতৃ-ভক্তি" এবং "লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বচসা" অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী আশালতা গুপ্তা, Calcutta Girls' Scholarship Examinationএ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ১৫৲ বৃত্তিলাভ করিয়াছে; ঐ বালিকাই পুনশ্চ "বঙ্গীয় নারী শিক্ষা পরিষদের" কেন্দ্র পরীক্ষায় ২০০ বালিকার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। এই বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র ধর মহোদয় অকাতরে এবং সানন্দ-চিত্তে প্রচুর অর্থদান করিতেছেন। আমরা এই বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৬ সাল | ৮ম সংখ্যা

কারবারের কথা

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

আমাদের দেশে একটা কথা আছে—

বাণিজ্যে লক্ষীর বাস,
তার অর্দ্ধ করি চাষ।
সেবা করি পাই সিকি,
আর সব ফাঁকিফুঁকি॥

কথাটা খুবই সত্য। হিসাব করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য বা কারবার করিতে পারিলে মানুষের মোটামুটি অন্নবস্ত্রের কোন কষ্টই থাকে না। উহাতে কিছু না কিছু লাভ হইবেই হইবে। দুই এক ক্ষেত্রে বিবেচনার দোষে যদি ক্ষতিই হয়, তাহা হইলে তাহা বিশেষ মারাত্মক হইতে পারে না। তবে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কারবার চালাইতে না পারিলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আমাদের দেশে অনেকে যে কারবার করিয়া ফেল হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ তাহাদের বিবেচনার অভাব। যাহার বিবেচনা বুদ্ধি আছে সে কখনই কারবার করিয়া ফেল হয় না—হইতে পারে না। অন্ততঃ ছোট ছোট কারবারে তাহার ফেল হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। কেন তাহা আমি অন্য এই প্রবন্ধে বিবৃত করিব।

কারবার বলিতে কি বুঝায় সর্ব্বাগ্রে তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। কারবার বলিতে পণ্যের উৎপাদন ও বিকিকিনি দুইটি কাজই বুঝায়। মনে করুন যে ব্যক্তি গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করে, তুলা হইতে কাপড় প্রস্তুত করে, ধাতু হইতে তৈজসপত্র প্রস্তুত করে সে ব্যক্তি যেমন কারবারী, যে ব্যক্তি দোকান করিয়া সমাজের ব্যবহার্য্য পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে, সে ব্যক্তিও সেইরূপ কারবারী নামে অভিহিত। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কার্য্য দোকানদারী বলিয়া অভিহিত। দোকানদার পণ্য ক্রয় করিয়া তাহা তাহার খরিদ্দারদিগের নিকট বিক্রয় করে।

অনেক স্থলে এই দোকানদারদিগকে লোক সাধারণতঃ কারবারী লোক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই দোকানদারী কার্য্যটি নিতান্ত সহজ নহে। আমাদের দেশের অনেকে এই দোকানদারী কাজটা নিতান্ত সহজ এবং ছোট কাজ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। উহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেরাণীগিরী অপেক্ষা ইহা কঠিন ও সম্মানজনক ত বটেই, এমন কি ওকালতি, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী প্রভৃতি অপেক্ষা ইহা বিশেষ সহজ এবং অল্প সম্মানজনক নহে। অনেক কেরাণী ব্যবসাদারদিগেরই সেবা করেন, সুতরাং কেরাণীর কাজ কখনই ব্যবসাদারের কাজ হইতে সহজ হইতে পারে না। কারণ তাঁহাদের কাজটা ব্যবসাদারীরই অঙ্গ বা অংশ। অংশ কখনও পূর্ণ অপেক্ষা বড় হইতে পারে না। ওকালতি, ডাক্তারী, ব্যারিষ্টারী প্রভৃতিও ব্যবসায় বা কারবার। সুতরাং তাহাদের মধ্যেও ছোট বড় ভাগ করা ঠিক নহে। আমরা যে দোকানদারী কাজটাকে ছোট মনে করি, ইহা আমাদের দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কারণ একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। দোকানদার স্বাধীন, কেরাণী পরাধীন; এ হিসাবেও দোকানদারদিগের একটা ন্যায্য সম্মান প্রাপ্য আছে। কারণ স্বাধীনতার সম্মান সকল সম্মান অপেক্ষা বড়। জমিদার অপেক্ষা দোকানদারের সম্মান অধিক হওয়া উচিত। কারণ জমিদারীর পরিচালনা অপেক্ষা দোকান ও কারবার পরিচালনায় অধিক বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন।

দোকানদারী করিতে হইলে চরিত্র-বলের বিশেষ প্রয়োজন। চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনই ভাল দোকানদার হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে চরিত্র বলিতে যে কেবল ইন্দ্রিয়-সংযমই বুঝায়, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যনিষ্ঠা, বিলাসবিমুখতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার, কার্য্যকুশলতা, কর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সমস্তই চরিত্র-বলের পরিচায়ক। ইহার একটির অভাব হইলেই সর্ব্বনাশ,—সে লোক ঠিক আদর্শ দোকানদার হইতে পারে না। আজকাল অনেক দোকানদার সমাজে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না বলিয়া দুঃখ করেন; অনেক দোকানদারের সন্তান দোকানদারী অতি হেয় কাজ বলিয়া পৈত্রিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বীয় ত্রুটি কতটা তাহা তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন না। অবশ্য সমাজে তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের ন্যায্য সম্মান প্রাপ্ত হয়েন তাহার জন্য যেরূপ সকলেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তেমনই তাঁহারাও যাহাতে তাঁহাদের বৃত্তির অনুরূপ যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন, সে দিকেও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। যোগ্যতাহীনের সম্মানলাভের প্রয়াস একেবারেই নিরর্থক ও হাস্যাস্পদ। আমরা যে দিন দিন কত যোগ্যতাহীন হইয়া পড়িতেছি, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার আমি বারাকপুরে যাইতেছিলাম। পথে যাইতে যাইতে একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি সদাশয়, মিষ্টভাষী এবং সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তাহার সহিত আমার প্রতীচ্য এবং প্রাচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তিনি কথায় কথায় বলেন যে "আপনাদের দেশের সভ্যতা এক সময়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল স্বীকার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে আপনারাই আপনাদের সভ্যতার অবমাননা করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি আপনাদের দেশের অনেক দোকানদারের পুত্র পৈত্রিক দোকান ছাড়িয়া য়ুরোপীয়দিগের দোকানে কেরাণীগিরি করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। তাহারা যে সকল সওদাগরের নিকট কেরাণীগিরি করিয়া থাকে সে সকল সওদাগর দোকানদার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের সভ্যতা যদি অপেক্ষাকৃত অধিকতর উৎকৃষ্ট না হইবে তাহা হইলে আপনাদের দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায় ও দোকান ছাড়িয়া আমাদের দোকানে কাজ করিবে কেন?" বলা বাহুল্য এই লইয়া তাঁহার সহিত আমার অনেক তর্ক হইয়াছিল। আমি তখন এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমি চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে সেই সৈনিক পুরুষ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। আমরা মুখে যতই আমাদিগকে সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিচয় দেই না কেন, কার্য্যতঃ আমরা য়ুরোপীয়দিগের এতই অনুকরণপ্রিয় হইয়াছি যে আমরা আর আমাদের কিছুই ভাল দেখি না। আমরা কার্য্যতঃ

য়ুরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদেরই নিকট আমাদের আত্মসম্মান বিকাইয়া দিয়া থাকি। নতুবা আমরা স্বাধীনভাবে ব্যবসায় না করিয়া বিদেশী ব্যবসায়ীর বিপণিতে দাসত্ব করিতে যাইব কেন ?

বিদেশী দোকানদারদিগের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ভাল, তাহাদের কাজকর্ম্ম করিবার পদ্ধতি ভাল একথা আমরা কোন মতেই অস্বীকার করি না। আমাদের এক সময়ে এই বিষয়ে অনেক ভাল ব্যবস্থা ছিল। এখন যখন আমরা সেই প্রাচীন ব্যবস্থার ঠিক অনুসরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তখন আমাদের দেশ কাল পাত্র অনুসারে প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারি। য়ুরোপীয়দিগের আদর্শও ত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা হইতেও আমরা কতক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারি। কোন কাজই চিরকাল একই পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে পারা যায় না। কালের গতি অনুসারে যেমন সমাজের ও সামাজিকদিগের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তেমনই তাহার সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য কারবারেও পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। বাহ্য অবস্থার সহিত ব্যবসায়ের অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে কখনই কারবার চালান যাইতে পারে না। ব্যবসায়ীদিগের একথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাহি।

আমি বহু ব্যবসায়ী এবং দোকানদারদিগের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহারা লোককে জিনিষ ধারে বেচিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দোকান তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে ইহা সত্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশের বহু ভদ্র লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়াতে তাঁহাদের নৈতিক বুদ্ধিও হীন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক দ্রব্য খরিদ করিয়া তাহার মূল্য দেওয়া অনেক সময় অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই তাঁহারা অধিক জিনিষ ধারে পাইলে আর তাহার মূল্য দিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় অধিক লাভের লোভে ধারে জিনিষ বিক্রয় করিলে পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা অপেক্ষা অতি অল্প লাভে নগদ মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, বিশ্বস্ততাই ব্যবসাদারীতে সাফল্য লাভের প্রধান সম্বল। যে ব্যক্তি বিশ্বাসী বলিয়া সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সময়ে অসময়ে অল্প সুদে টাকা পাওয়া কঠিন নহে। আমার পরিচিত একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বিশ্বাসী বলিয়া সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য কারবার চালাইতে তাহাকে কখনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। এক সময় তিনি কোন একজন মহাজনকে কিছু টাকা ফেরৎ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার একটি পুত্র অত্যন্ত সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। যে দিন টাকা দিবার দিন যে দিন পুত্রটির আসন্ন মৃত্যু লক্ষণ প্রকটিত হইতে থাকে। বাড়ীর সকলে কাঁদিয়াই আকুল। উমাচরণ দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রটি মরিয়া গেলে তাঁহার পক্ষে মহাজনের বাড়ীতে টাকা দিতে যাওয়া কঠিন হইবে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সেই মহাজনের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। মহাজন তাঁহার সেই আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার বাড়ীর দিকেই দ্রুত গতিতে আসিতেছিলেন। পথে উমাচরণকে তিনি উন্মত্তবৎ ছুটিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উমাচরণ ছেলে কেমন ?" উমাচরণ তাড়াতাড়ি সজল নয়নে উত্তর করিল, "ঠাকুর আপনার টাকাগুলি গণিয়া লউন। ছেলেকে লইয়া যদি অপরাহ্নে শ্মশানে যাইতে হয়, তাহা হইলে আপনার টাকা দিতে আসিতে পারিব না। সেই জন্য আমি তাড়াতাড়ি টাকাগুলি দিতে যাইতেছিলাম।" মহাজন কহিল,—"উমাচরণ তুমি ক্ষেপিয়াছ ? এ সময় এত তাড়াতাড়ি টাকা আনিবার কি দরকার ছিল। না হয় কালই কি পরশ্ব টাকা দিতে।" উমাচরণ কহিল "ঠাকুর আর ৬ দিন পরে তোমার মেয়ের বিয়ে। বামনের মেয়ের বিয়ে যে কি দায় তাহা আমি জানি ; ইহার পর আমার কি দশা ঘটে তাহা কে জানে ? তাই বলি ঠাকুর তোমার টাকা

তুমি লও। আমি বাড়ী চলিলাম।” এই ব্যবসায়ীর নাম উমাচরণ দত্ত। মহাজনটি একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর যাইয়া তাহার স্ত্রীর হাতে টাকা দিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে উমাচরণের পশ্চাতে পশ্চাতে উমাচরণের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। আমি স্বয়ং এই ব্যাপার দেখিয়াছি ও এই কথাগুলি শুনিয়াছি। এই ব্যক্তি অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল বলিয়া লোক ইহার নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিত; অন্য লোক যে সময়ে সম্পত্তি বন্ধক দিয়া শতকরা মাসিক ১ টাকা হারে সুদ দিয়া ও টাকা পাইত না, উমাচরণ তখন বিনা বন্ধকে বিনা লেখাপড়ায়, বিনা সাক্ষীতে শতকরা মাসিক বার আনা সুদে, অনেক ক্ষেত্রে আট আনা সুদেও টাকা পাইত। উমাচরণ কখনও আবশ্যকের অতিরিক্ত এক পয়সাও অধিক কর্জ্জ করিত না। স্বয়ং যৎদূর পারিত স্বহস্তে কাজ করিত; এবং অতি সরলভাবে দিনপাত করিত। কখনও নিতান্ত আবশ্যকের অতিরিক্ত সংসার খরচ বাবদ একটি পয়সাও ব্যয় করিত না। শেষ অবস্থায় উমাচরণ কয়েক সহস্র টাকার সংস্থান করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সে কখনই তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিতে দেয় নাই। শেষ কালে উমাচরণ কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া জলকষ্ট বহুল তিনটি গ্রামে ৩টি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং কয়েক বার দুর্গোৎসব করিয়াছিল। উমাচরণের চরিত্রবল অসাধারণ ছিল। মৃত্যুকালে উমাচরণ তাহার পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিল “আমি সাড়ে ১২ টাকা পুঁজি লইয়া কারবার আরম্ভ করি। এখন তোমার হাতে ২৫ হাজার টাকা দিয়া আমি চলিলাম। ইহার অর্দ্ধেক টাকা ব্যবসায়ে খাটাইয়া আমার মত করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। কারবার অধিক বাড়াইওনা; এবং ফাটকাওয়ালার মত অতিলোভ করিও না। বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কর্ম্মচারী লইও না। বাবুগিরি করিলে বা পরিশ্রমে কাতর হইলে আর কারবার রক্ষা করিতে পারিবে না। শেষকালে বড় কষ্টে পড়িবে। অর্দ্ধেক টাকা তোমার স্ত্রীর নামে রাখিয়া গেলাম। ঐ টাকা কোন মতে কারবারে টানিয়া আনিও না।”

যাঁহারা দোকানদারী করেন, তাহাদের পক্ষে উমাচরণের এই উপদেশ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত, অনেক দোকানদার অসংযম, বিলাসিতা এবং শ্রমবিমুখতার জন্যই কারবার নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহারা যদি সাধুতার ও অধ্যবসায়ের সহিত কারবার চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না, এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সে ক্ষতি মারাত্মক হয় না। কারকারবার করিতে যাইলে সকলকেই দুই একবার কিছু না কিছু পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেই হয়। ন সংশয়মানারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি। লাভ লোকসানের অনিশ্চয়তার মধ্যে না যাইতে চাহিলে কখনই ব্যবসা করা হয় না। কিন্তু অনিশ্চয়তার ভয়ে ব্যবসা ত্যাগ করিলে নিজের ও জাতির দুর্গতি সংঘটন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

আমরা দেখিতেছি যে আমাদের সমাজের অন্য লোকের কথা সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে ব্যবসায়ী জাতিরাও অত্যন্ত নিশ্চিন্ততাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। মাস যাইলে একটা বাঁধা টাকা পাওয়া লোক অধিক পছন্দ করে। আমি অনেক বড় ব্যবসায়ীকে বলিতে শুনিয়াছি,—“মহাশয় আপনারা অনায়াসেই এই কাজ করিতে পারেন, আপনাদের মাস যাইলেই টাকা। আর আমরা ব্যবসাদার। আমাদের সম্বৎসরে কি লাভ হবে তার ঠিকানা নাই। এখন কিন্তু আমাদের খরচটা নিশ্চিত আছে।” অথচ একথা সত্য যে, যে ব্যবসায়ী কোন একজন সংবাদপত্র লেখককে এই কথা বলিতেছিলেন, তিনি সেই সংবাদপত্রলেখককে এক হাটে কিনিতে ও আর এক হাটে বেচিতে পারেন। অথচ বিদ্যা বুদ্ধিতে তিনি সেই সংবাদপত্রসেবী অপেক্ষা অনেক হীন। ইহার কারণ ব্যবসায়ে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া কয়েক সহস্র টাকা সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে উক্ত সংবাদপত্র লেখকের একশত টাকারও সংস্থান নাই। আসল কথা ঝুঁকি ঘাড়ে না লইলে কখনই ব্যবসায় উন্নতি লাভ করা সম্ভবে না। ইংরাজীতে no risk no gain কথাটি ঠিক ঐ ভাবেরই সূচনা করে। বাঙ্গালী যত দিন ঝুঁকি ঘাড়ে করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইতে পারিতেছে, তত দিন ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহারা কখনই উন্নতি লাভে সমর্থ হইতে পারিতেছে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গালীর মূলধনের অভাবই তাহাদের ব্যবসা-ক্ষেত্রে পরাজিত হইবার কারণ। একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক বাঙ্গালীর ছেলের পুঁজি প্রায় কিছুই নাই একথা সত্য। কিন্তু অতি সামান্য পুঁজি লইয়া কারবার আরম্ভ করিয়াও যে লোক বড় মানুষ হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমার একজন পরিচিত লোক আছেন। তিনি কিছু দিন চাকুরী না পাইয়া যখন চাকুরীর সন্ধানে হতাশ হইয়া পড়িলেন, তখন ব্যবসায় করিতে আত্মনিয়োগ করেন। জনৈক আত্মীয়ের নিকট হইতে বিনা সুদে ৫টি মাত্র টাকা লইয়া তিনি সামান্য একটু তামাকের দোকান করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি একটি দোকানে এক বেলা আহার করিতেন এবং বৈকালে ১ পয়সার ছাতু ও দুই পয়সার দধি মাত্র খাইতেন। তাঁহার এই আহারের ব্যয় তিনি দোকানের আয় হইতে লইতেন না। ক্রমশঃ তাঁহার দোকানের পুঁজি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। দোকানও ক্রমে বড় হইতে থাকিল। কয়েক বৎসর পরে তিনি দোকানের আয় হইতে তিনটি কন্যার বিবাহ দেন এবং প্রত্যেক কন্যার বিবাহে দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার দোকানে একবার চুরী হইয়া কয়েক শত টাকা ক্ষতি হয়। এখন আর তিনি অপরাহ্নে ছাতু খাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন না। এখন তাঁহার দোকানে বেশ লাভ হয়। তামাকের কাজ ভিন্ন তিনি আরও অনেক কাজ করিতেছেন। তবে তিনি বড় একটা কর্ম্মচারী রাখিয়া কাজ করেন না। সকল কাজই প্রায় নিজ হাতে করিয়া থাকেন। এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার কার্য্যের সহায় হইয়াছে। ইনি এখন গ্রামের মধ্যে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। অথচ যখন ইনি ৫ টাকা লইয়া তামাকের দোকান আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার সমপাঠী ও সমবয়স্ক অনেক লোক মাসিক ৬০।৭০ টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন। তাঁহারা তখন ইঁহাকে অনেক উপহাস করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু আর্থিক অবস্থায় এই ব্যক্তি অনেককে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আদর্শ বিভ্রাটও বাঙ্গালী জাতিকে অনেকটা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে। শিক্ষা-বিভ্রাটই এই আদর্শ-বিভ্রাটের মূল। আমাদের যুবকরা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াই ম্যাজিনী, গ্যারিবল্ডী, কোসিয়াস্কো হইবার জন্য চেষ্টা পায়; অন্ততঃ সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন বা রাসবিহারী ঘোষ হইবার জন্য চেষ্টা করে। কৃষ্ণপান্তি, দুর্গাচরণ লাহা, রামচন্দ্র কোঁচ প্রভৃতির আদর্শ তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে না। ইহা একটা বড় বিষম দোষে পরিণত হইয়াছে। যাহাদের আদর্শ অত্যন্ত নিম্ন তাহারা অন্ততঃ কোন হৌসের মুৎসুদ্দী বা বড় বাবুকেই তাহাদের জীবনের আদর্শ করিয়া লয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের। ব্যবসায়ী জাতির সন্তানদিগকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদিগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কর্ত্তব্য। একটা কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে কেরাণী এবং মুটে মজুরে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

প্রাণি-জীবনের ক্রমবিকাশ

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে' এই যে জীব-জীবনের বিকাশ-লীলা চল্‌ছে, ইহার ব্যষ্টি ও সমষ্টির মূলমন্ত্র কি?—বৃদ্ধি! বৃদ্ধি দ্বারা আমরা জীবনকে ধর্‌তে পারি, যেমন করে' উত্তাপ দিয়ে আগুনকে চিন্‌তে পারি। জীবনের মস্ত বড় মানদণ্ড হচ্ছে—বিশ্ব-ব্যাপকতা ও প্রয়োজনাতিরিক্ততা। জীবন যখন দেহের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি চায়, তখন তার চাই রসদ—চাই দানা-পানি। দানা-পানির মূলধন দিয়েই জীবনের সৃষ্টি হয়, দানা-পানির জন্যেই জীবন-যুদ্ধ সুরু হয় এবং ওরই উপর তার জয়-পরাজয় নির্ভর করে।

প্রকৃতি জীবনহীন শূন্যতাকে আন্তরিক ঘৃণা করেন। তাই জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে তাঁর অমোঘ সৃষ্টির বীজ ছড়িয়ে জীবনের প্রাচুর্যে ভরে' দিয়েছেন—আত্মপ্রসাদের জন্যে। গভীরতম সমুদ্র-তলে, উষ্ণ প্রস্রবণ-জলে, চির তুষারময় পার্বত্য-গুহায়, দশ হাত মাটির নীচেও জীব-জীবনের অভাব নেই। আর এই সৃষ্টির মধ্যে আছে তাঁর উদ্দাম অতিরিক্ততা, সামঞ্জস্যের মধ্যে বিপুলতর বৈচিত্র্য। পৃথিবীতে এমন মাছ আছে, যারা স্বচ্ছন্দে গাছে চড়্‌তে পারে; এমন মাকড়সা আছে—যারা জলের তলায় বসে' স্বপ্ন-সুন্দরীর প্রেমের মতো সূক্ষ্ম কোমল জাল বুন্‌তে পারে।

দৈর্ঘ্যে চার ও প্রস্থে তিন ইঞ্চি এক টুকরা বাগানের মাটির মধ্যে দারুইন্ সাহেব কুড়ি রকমের ফুলের গাছ জন্মাতে দেখেছিলেন; আবার ঐ জমির মাটিটুকু অণুবীক্ষ্য যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে' যদি দেখা হ'ত, তাহলে' দেখা যেত—তার মধ্যে কত জাতীয় অযুত-কোটি ক্ষুদ্র জীবাণু নীড় বেঁধেছে। পুকুরের এক গজ বর্গক্ষেত্রে জলের মধ্যে সাতশ' কোটি 'ডায়াটোম্' শ্রেণীর ঘ্রাণবিক্ জীব আপনাদের বাস-ভূমি রচনা করে' আছে। হিমালয়ের একটা হিমানী-সরিৎ কেবল এক জাতীয় পক্ষহীন ক্ষুদ্র কীটাণুই পালন করে প্রায় পাঁচ কোটি। এক বাল্‌তি জলের মধ্যেই কম্‌সে-কম পঞ্চাশ লক্ষ প্রস্ফুরক জীবাণু বিচরণ করতে পারে। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে কুরু-পাণ্ডবের যত সৈন্য যুদ্ধার্থ সমবেত হয়েছিল, তার কোটি কোটি গুণ অধিক সংখ্যক বীজাণু-পরিপূর্ণ জলের বুকে আঁচড় কাট্‌তে কাট্‌তে একটা ষ্টীমার বা জাহাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিচরণ কর্‌তে পারে।

জীবন হ'তেই জীবনের সৃজন; কিন্তু জীবন বড় বেপরোয়া বেহিসাবী অপব্যয়ী জনক। বংশ-সৃষ্টি-বিষয়ে হাতীরাই সব চয়ে দুর্বল; কিন্তু দারুইন হিসাব করে' দেখেছিলেন যে, মূলে এক জোড়া গজ থেকে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ নধর হস্তী-বংশধর গজাতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া সমগ্র জগতকে জানিয়ে দিয়েছে, এক জোড়া খরগস্ অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে কয়েক বৎসর পরে কোটি পিণ্ডদানের অধিকারী তৈয়ার্ করতে পারে। মাছের বংশবৃদ্ধি তো রূপকথার মতো। ইলিস মাছ গুলোর বংশবৃদ্ধি বিষয়ে বদ্‌নাম থাকলেও, প্রত্যেকটি ফি বৎসরে হাজার চল্লিশেক ডিম্ উৎপাদন করে। রোহিত মৎস্য ডিম্ পাড়ে বৎসরান্তে ছয় সাত লক্ষ। বিলাতী কড্ মাছ ষাট লক্ষ; চিংড়ি মাছ যান্ সকলের উপরে—প্রতি তিন মাস অন্তর আটবার ডিম্ব প্রসব করে' বারো মাসে বংশাবলীর সৃষ্টি করেন মাত্র ৪৫০,০০,০০,০০০ কোটি!

কাঁক্‌ড়াকে ঠিক্ মাছের পর্যায়ে আনা যায় না, কূর্মের দলে ফেলাই সঙ্গত। এঁরা যে-হারে বংশ বৃদ্ধি করেন, তাতে করে' মনে হয়—আমাদের দেশের বন্ধ্যা নারীগণ যদি একবার মাত্র কাঁক্‌ড়ার পাদোদক সশ্রদ্ধায় পান করেন, তা'হলে অবিশ্রান্ত গণ্ডা গণ্ডা সন্ততির জন্মদান করতে পারেন। যদি মাত্র এক জোড়া কাঁক্‌ড়াকে সমুদ্রের জলে ছেড়ে দিয়ে যীশু খৃষ্টের কথামৃতের সেই "Increase and

multiply"য়ের মতো বলা হ'ত—"প্রজা বৃদ্ধিং কুরুস্ব," এবং তাদের অভয় দেওয়া হ'ত যে, সমুদ্রের তামাম্ জানোয়াররা তাদের সঙ্গে অহিংস-অসহযোগ কর্‌বে, তাহলে' বছর কয়েক বাদে দেখা যেত—রাবণের ক্ষীরোদ-সমুদ্রের পরিবর্ত্তে কর্কট-সমুদ্র স্বজনের দিব্য আভাস দেখা দিয়েছে ; অর্থাৎ ঐ কর্কট-দম্পতী দয়া করে' মাত্র—৬৬র পরে তেত্রিশটি শূন্য বসালে যে অকথ্য সংখ্যাটি হয়, ঠিক ততগুলি বংশ-দুলালের ষষ্ঠীপূজা সমাপন করেছেন। এদের খোলাগুলো একত্র করে' তালগোল্ পাকিয়ে রাখলে আট্‌টা পৃথিবীর সমান হ'ত। ভেবে দেখুন—কি কাণ্ড! ভাগ্যিস্ জলে-স্থলে কাঁকড়ার এত শত্রু ছিল নইলে হয়েছিল আর কি ?

এতেই তাজ্জব ব্যাপার শেষ হয় নি—আরো আছে। এক একটা কাঁকড়া তো বছরে মাত্র ছয় কোটি ডিম পাড়ে। কিন্তু চাঁদা মাছ পাড়ে—বছরে কুড়ি কোটি। 'প্যারামেসিয়াম্' নামক এক ক্ষুদ্র জল-কীট আছে ; ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতাত্ত্বিক্ প্রফেসর উড্রুফ্ ল্যাবরেটরীর মধ্যে প্যারামেসিয়ামের চাষ করে' এদের জীবন-নাট্য কয়েক বৎসর ধরে' অধ্যয়ন কর্‌ছেন। তিনি বল্‌ছেন যে, একটা প্যারামেসিয়াম্ পোকা অবাধে মনের আনন্দে বংশ বৃদ্ধি কর্‌তে পেলে এত 'নাতির নাতি'র জন্ম দিতে পারে যে, তাদের সকলের পক্ষে বৃদ্ধ প্রপিতামহের মানসে স্বর্গে বাতি জ্বালাবার মতো ঠাঁই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপর ৯০০০ পুরুষ পরে এতগুলি প্যারামেসিয়ামের জন্ম হবে যে, তাদের জায়গা আর পৃথিবীতে ত কুলাবেই না,—নক্ষত্র, ধূমকেতু ও নীহারিকার মধ্যস্থ স্থানসমূহ ধার করেও তাদের স্বচ্ছন্দে বসবাসের কিনারা করা দুরূহ হয়ে' উঠ্‌বে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্তে মহাশূন্যে সূর্য্যকে ঘিরে কয়েক তাল প্যারামেসিয়াম্ পোকাই শুধু ঝুল্‌তে থাকবে।

জীবনটা চলে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বলেই আমরা এখনো কোটি কোটি হাতীর পায়ের তলায় পড়ে গুঁড়িয়ে যাইনি, কিংবা প্যারামেসিয়াম্ পোকার সর্বগ্রাসী বংশ বৃদ্ধিতে দম্ আট্‌কে মরে যাইনি কিংবা ভবঘুরেদিগকে কল্‌কাতা থেকে কালিফর্ণিয়া পর্য্যন্ত কাঁকড়া-খোলার আস্তরণ মাড়িয়ে পথ চল্‌তে হয়নি। জীবনটা গতিময়, জীবনটা জ্যোতির্ময়, জীবনটা যুদ্ধময়। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অযুত অযুত যুযুৎসুর মধ্যে বেঁচেছিল ক'জন? নিখিল-ভুবনের এই প্রাকৃতিক কুরুক্ষেত্রে যুগ-যুগান্ত পূর্বে সমরানল জ্বলেছে, তা' এখনো নির্বাপিত হয়নি ; রাবণের চিতার মতো অহরহ জ্বল্‌ছে। নিঠুরা প্রকৃতি কাউকে পতি সাজিয়ে চিতায় উঠাচ্ছেন, কাউকে সতী সাজিয়ে সহমরণে পাঠাচ্ছেন্। আবার কাউকে দর্শকরূপে আগুণের বাইরে অক্ষত অনাহত অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিচ্ছেন্। জীবন-যুদ্ধে কেউ হার্‌ছে, কেউ জিতছে, কেউ প্রাণ দিচ্ছে, কেউ ঠ্যাং খোঁড়া করে' হাঁসপাতালে শুচ্ছে।

দেহ-বলে, মনোবলে যে দুনিয়ার অজস্র বাধা সরিয়ে আপনার চলার পথ তৈরী করে' নিতে পারে, প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে দরকার মতো আপনাকে খাপ্ খাওয়াতে পারে, আবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে' সন্ধির প্রস্তাবকে উপেক্ষা করতে পারে,—সেই বাঁচার অধিকারী। একেই বলে—Survival of the fittest, যোগ্যতমের উদ্বর্তন। এই খানেই দারুঈন জৈবিক ক্রম-বিকাশের চাবী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের এই স্তরে এসেই তিনি সিদ্ধান্ত করতে পেরেছিলেন যে, প্রকৃতির চেয়ে বড় বিধান-দাত্রী আর কেউ নেই ; তিনি একাধারে জীবন-পঞ্জিকার গণক, ব্যবস্থাপক, সংশোধক ও অনুমোদক। একেই বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন।

জীবনের যেখানে একটু সাড়া জেগে আছে, সেখানে একই শ্রেণীর বস্তুর মধ্যেই ঠিক্ অনন্যরূপতার দেখা পাই না কেন? কথায় বলে বটে—একরূপ তদনুরূপ রূপেরই জন্ম দেয়? কিন্তু তাই কি সত্যি? উদ্ভিদ রাজ্যে, প্রাণী রাজ্যে এক জাতি ও এক বংশের ধারায় সকল সময় কি ঠিক অবিকল রূপ-গুণসম্পন্ন তরুণ উদ্ভিদ বা প্রাণী উৎপন্ন হয়?—হয় না। একত্বের ভিতর বহুরূপত্বের অভিব্যঞ্জনা প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় লীলা-লাস্য। একটা কলাই বা সীমের শুঁটির মধ্যে সকল দানাগুলি সব সময় দেখ্‌তে এক রকমের হয় না। এক দলের গিনিপিগের ছানারা কখনো নিখুঁত-ভাবে এক আকৃতির হয় না। এক গাছের আমের চেহারায়ও কিছু গরমিল্ থাকে। এক বাপ মায়ের সন্তান-

সন্ততির গঠনের মধ্যে তারতম্য আছে ; এমন কি যমজ সন্তানের মধ্যেও আকার প্রকারের কিছু-না-কিছু পার্থক্য আছে। তারতম্য না হ'লে জীব-জীবনের ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয় না ; অসামঞ্জস্যই দুনিয়ার নিয়ম। জীব-জগতের জাতি, শ্রেণী, গণ, গোত্র, পরিবারের মধ্যে যেমন কম-বেশী পার্থক্য গড়ে' উঠে, তেমনি পারিপার্শ্বিক অবস্থারও কম-বেশী পরিবর্তন হয়।

তারপর, পূর্বেই বলেছি, প্রকৃতির বড় দরোয়াজ্ হাত। এক এক সংসারে গৃহিণী থাকেন, তাঁরা হাজার বকাবকি করলেও আবশ্যকের অতিরিক্ত আহার্য সর্বদা প্রস্তুত করেন ; যে ছেলেটি এক মুঠো ভাত চায়, তার পাতে দুই মুঠো ঢেলে দেন্ অকাতরে। প্রকৃতি মা-টিও আমাদের তেম্‌নি একান্ত মুক্তহস্তা অন্নপূর্ণা। চারিদিকে আহার্যও যেমন সাজিয়ে রেখেছেন প্রচুর, অন্নের কাঙালীরও সমাবেশ কচ্ছেন সেইরূপ সুপ্রচুর। ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, লক্ষ্মী-ছাড়ার পল্টনগুলো খাদ্যদ্রব্যের চারপাশে দাঁড়িয়ে আপন আপন কোলে ঝোল্ টান্‌বার প্রয়াসে পরস্পর কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি কচ্ছে। এই জীবন-আহবে, যারা ক্ষুদ্র—যারা দুর্বল, তারা নিয়তই অপেক্ষাকৃত বলশালীদের বরোদরে প্রবেশ কচ্ছে ; যে শক্তিমান্, সে বিজিত ক্ষুদ্রের রক্ত তিলক কপালে পরে' প্রকৃতির দেওয়ানি-আম্ থেকে, জগতে টিঁকে থাকার সনন্দ লাভ কচ্ছে!

প্রকৃতি দুষ্টু ছেলেকে বড় ভালবাসেন। কিন্তু একেবারে ঘোরতর হিংসুটেকে শাসন কর্তে ছাড়েন্ না। জগতের অখণ্ড কল্যাণের কালকেতু স্বরূপ যে দুরন্ত ছেলে তাঁর সংসারের আঁতুড়-ঘরে রক্ত চক্ষু মেলে মাথা খাড়া করে, তাঁকে তিনি নুন্ টিপে মেরে ফেলেন্। কখনো বা লাগাম আল্‌গা করে' তাকে নিয়ে খেলা করেন, বঁড়্‌শীতে মাছ বিঁধে শিকারী যেমন করে' ছিপের সুতো ছেড়ে দিয়ে মাছকে খেলায়। যখন বড় অসহ্য হয়, তখন রুদ্র মূর্ত্তি ধরে' তাকে দমন করার চেষ্টা করেন ; তাতে ফলোদয় না হলে' একেবারে ধ্বংস করে' তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে' দেন্। যে জীবের মধ্যে সদ্‌গুণ ও বদ্‌গুণ প্রায় সমভাবে বিদ্যমান, যে শুধু পরকে ধ্বংস করার চেয়ে আপনাকে ও আপনার বংশধরকে বাঁচাবার জন্যে আপন চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে, সময় বিশেষে যে প্রকৃতির দাসও হ'তে পারে—প্রভুও হ'তে পারে, শ্রাবণের ধারার মতো প্রকৃতির আশীর্বাদ তারই মাথায় ঝরে' পড়ে। প্রকৃতি তাকেই বাঁচিয়ে রাখেন্ এবং তাঁর উৎসবময় খেলাঘরে এই জীবন্ত পুতুলগুলোকেই শ্রেষ্ঠ ঠাঁই দেন।

জীব বিশেষে কোনো কোনো আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন পূর্বচিন্তিতভাবে (premeditated) সাধিত হয় ; অণ্ডের মধ্যে বা জীবাঙ্কুরের মধ্যে তার বৈচিত্র্য-সাধক উপাধিগুলি আগের থেকেই ওতপ্রোত থাকে। পরিবর্তনের কোনো কোনো গুণ নেমে আসতে পারে পিতা-মাতা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বা পূর্বপুরুষ থেকে। দেখা গেছে,—যে কোনো কারণে হোক্, পূর্বপুরুষের যে গুণ অস্ফুট বা অর্ধোস্ফুট ছিল, বংশধরের মধ্যে এসে তা' শতদলের মতো বিকশিত হয়ে' উঠ্‌ল। কতক পরিবর্তন আবার জন্মের পর অর্জিত হয়—বাইরের আবেষ্টনীর প্রভাবে। তা' ছাড়া "দৈবাৎ বৈষম্য" বলে' একটা জিনিস্ আছে, যাকে কোনো বৈজ্ঞানিক আইনের কবলে ধরা ছোঁওয়া যায় না। এই তিন রকম উপায়ে প্রকৃতি দেবী তাঁর নির্বাচন ক্রিয়া পরিচালন করেন্ ; এই ভাবেই তাঁর সৃষ্টির একত্বের ভিতর বহুত্বের রস-সঞ্চার করেন্। জীব শ্রেণীর মধ্যে বংশ পরম্পরায় কতকগুলো দৈহিক বৈলক্ষণ্য খুব দ্রুত, কতক গুলো অতি ধীরে ধীরে সংসাধিত হয়। বেশীর ভাগ পরিবর্ত-বিবর্তন একটানে পুরুষানুক্রমে চলে—অতি ক্ষীণ পদে সন্তর্পণে নবোঢ়ার মতো। কতকগুলো পরিবর্তন আবার কয়েক পুরুষের মধ্যে স্থগিত থাকে, অর্থাৎ বংশ-ধারার মাঝের খানিকটা অংশ ডিঙ্গিয়ে যায়। দারুঈন তাঁর গবেষণা পুস্তকে এই সব পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করে গেছেন্। জীব-রাজ্যে যত ক্রম-পরিবর্তনের লীলাচাঞ্চল্য তিনি দেখতে পেলেন, তত তিনি ক্রম বিবর্তনবাদের প্রতি আকৃষ্ট ও দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে' পড়্‌লেন্। চিত্ত-বিত্ত-জীবন-যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে 'চরাচরমিদং সর্বং' যে নিত্য পরিবর্তনশীল, ব্রহ্মাণ্ডের রঙ্গমঞ্চে প্রকৃতি রূপসী ত্রিমূর্তিকে আপন অন্তরাসনে অভিষিক্ত করে' নিঃশব্দ চরণপাতে শত ভঙ্গিমায়

অবিরাম নৃত্য করছেন,—এই সত্য বাণী যখন অচলায়তনের প্রাচীর টপ্‌কে ভিতরে পড়্‌লো, তখন লোকে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে' গেল।

দারুইন যে ঠিক ক্রম-বিবর্তনবাদ জিনিষটা আবিষ্কার করে' জোর গলায় প্রচার করেছিলেন, তা' বলা যায় না; তবে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের গভীর ও অভিনব গবেষণার ফল যখন একটার পর একটা করে' সাজিয়ে জন-সমাজের চোখের সামনে ধরে' দিয়ে বল্লেন্—'দয়া করে' বলুন দেখি, এটা দাঁড়াল কি জিনিস্?' তখন সবাই সমস্বরে বলে উঠ্‌ল্—'এটা যে দেখছি ক্রম-বিকাশ-বাদের মতো একটা কিছু!' দারুইন্ ও এব্রাহাম্ লিঙ্কন—উভয়েরই এক সালে এক তারিখে জন্ম (১৮০৯ খৃষ্ট শতক, ১২ই ফেব্রুয়ারী)। অধুনা কালের জীব-বৈজ্ঞানিক মিঃ লাল্ বলেন, লিঙ্কন যেমন অলীক্ ভৌতিক দাসত্ব থেকে মানুষের দেহকে মুক্ত করেছিলেন, দারুইন তেমনি বংশ-পরম্পরাগত অন্ধ বিশ্বাস থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করেছিলেন্। চরিত্রের উচ্চতায়, উদার মানসিকতায়, সত্য প্রতিষ্ঠার সাহসে—উভয়েই সমান ওজনের ছিলেন।

"পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থেকে জীব আপন দৈহিক ও মানসিক সংশ্লেষণে যা কিছু অর্জন করেছে অথবা যে সকল নূতন অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, ঐ সকল অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের সংস্কার, তদুৎপন্ন নূতন বংশ ধারায় সঞ্চারিত ও তৎ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হয়"—ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ল্যামার্ক্ সাহেব এই কথা বলেছিলেন্ কিঞ্চিদধিক একশ' বৎসর পূর্বে। এই চিরন্তন সত্যকে লোকদৃষ্টিতে প্রতিভাত করে' তোলার অপরাধে, নর তাঁকে উপহাস করেছিল—একঘরে করেছিল, নারায়ণ তাঁকে অন্ধ করেছিলেন—দারিদ্র্যের শীর্ণ কোলে তার অন্তিম নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়েছিলেন। জীবতত্ব বা Biology বলে' কথাটা প্রথম রচনা করে' যান্ তিনিই। এখন জীবতত্ত্বের অনেক নূতন তথ্যই ল্যামার্ক রচিত মহা-কেন্দ্র ঘিরে দানা বেঁধেছে। প্রতিকূল-মতবাদী কত জাব-বৈজ্ঞানিকই না 'বংশানুক্রমে অর্জিত চরিত্রের মধ্য দিয়া ক্রম বিকাশ'-(Evolution through the Inheritence of acquired Characters) নীতির গাত্রে অনেক ছোরা-ছুরি-ভল্ল-তীর চালিয়েছেন; কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই মতবাদ নন্দপুরের চন্দ্রের মতো বেড়েই উঠেছে!

ক্রম-বিকাশের কার্য-প্রণালীর ধারা কোনো একটা মোটা আইন্ দিয়ে বুঝানো যায় না। স্থুল কথায় এটা বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, যে-প্রাণী উদ্বর্তনের যোগ্য নয়, সে পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে মুছে যায়; এবং সৃষ্টির মধ্যে বৈষম্য যদি না থাকৃত, তাহলে ক্রমবিকাশ অচল হয়ে' পড়্‌ত। আকার, অভ্যাস ও গুণের বিভিন্নরূপ বৈলক্ষণ্য না থাকৃলে নির্বাচনেরও প্রয়োজন থাকৃত না—কি রাষ্ট্রিক্ ক্ষেত্রে, কি প্রাকৃতিক রাজ্যে। এই বৈলক্ষণ্যের মধ্যে সাধারণ কতকগুলি গুণ বেছে নিয়ে, দারুইন তার জাতির পাঁতি তৈরী করেছিলেন; তারপর জাতির সৃষ্টি (origin of species) কি পদ্ধতিতে সম্ভব—তা' সমাধান্ কর্তে লেগে গিয়েছিলেন। মানুষ একটা জাত, বানর একটা জাত, মাছ একটা জাত, মকর একটা জাত। এক কথায়, এই আন্তর্জাতিক বিভিন্নতা উৎপন্ন হয়েছে আবেষ্টনী, বংশানুক্রম, পিতা-মাতার ব্যক্তিগত অভ্যাসের পরিবর্তনের দ্বারা। নিঃসঙ্গ জীবন যাপন ও আন্তর্গণিক্ সন্তানোৎপাদন-ক্রিয়া ক্রম-বিকাশের বৈচিত্র্য-লীলাকে স্তব্ধ করে' দেয়। অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন যে, নিভৃত গার্হস্থ্য-গোহালের একটা গরুর গর্ভোৎপন্ন বক্‌না ও এঁড়ে বড় হয়ে' উপায়ান্তর না দেখে যদি পরস্পর সম্মিলিত হয়, তাহ'লে তাদের সঞ্জাত সন্তান কখনো বলিষ্ঠ ও উন্নত হয় না। এই ধারা যদি ২।৪ পুরুষ পর্যন্ত চালানো যায়, তাহলে' দেখা যাবে যে, রূপে-গুণে সমভাবাপন্ন হলেও বংশধরগণ ক্ষয়ের পথে পদবিক্ষেপ্ করেছে।

পূর্বে অনেকবার উল্লেখ করেছি যে, নিম্নতন প্রাণী-জগতে যৌন পার্থক্য কিছু নেই এবং স্ত্রী-পুরুষের ঘনতম সম্মেলনে কখনো বংশবিস্তার হয় না। অন্তত একাণু-কোষাত্মক আত্মজ প্রাণীর মধ্যে যৌন-সম্মিলন বলে' কোনো ব্যাপার দেখা যায় না। তবে বিলক্ষণ অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে যে, কোনো কোনো আদ্যজ প্রাণীর একটি অপরটির সহিত অত্যল্প কালের জন্য সংযুক্ত হয়;

তখন এদের দেখ্‌লে একটি প্রাণী বলেই মনে হয় (conjugation)। এই সময় পরস্পরের দেহের প্রাণপঙ্ক ও কোষাণু-কেন্দ্র সম্পূর্ণ অদল-বদল হয়, যেমন দুই বাড়ীর দুই বধূ এক জায়গায় পরস্পরের ভাতের থালা জড়ো করে' এনে বলেন—"আমার ভাত-তরকারী তুই খা, তোর ভাত-তরকারী আমি খাই, দু'জনের একটু মুখ-বদলাই হোক।" এই অপরূপ দ্বন্দ্ব-সমাসের ফলে উভয়ের যে পুনর্গঠন হয়, তাকে বৈজ্ঞানিকরা 'নবযৌবন-লাভ-পদ্ধতি' (rejuvenation process) বলেন। খানিক পরে আবার দু'জনের সন্ধিবিচ্ছেদ হয়; তারপর প্রত্যেকে পূর্বোল্লেখিত রূপ আত্ম-বিভাগ দ্বারা নব নব সন্ততির জন্মদান করে। কোনো কোনো শ্রেণীর আত্মজ প্রাণী অংশত সংযুক্ত হয়; তারপর পরস্পর বিভিন্ন হয়ে' নব উৎসাহে বংশবৃদ্ধি করে। আবার কতকগুলি নিম্ন জাতির মধ্যে একটা প্রাণী আর একটা প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করে' আপনাকে হারিয়ে ফেলে,—তার পৃথক সত্তা আর থাকে না; সেই যে বলরাম দাস বলেছেন—"হরি হরি, অব দুঁহু শ্যামর গোরি", সেই রকম আর কি? তারপর উভয়ে একাত্ম হয়ে' আপনাদেরকে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিভক্ত করে' সংজনন করে।

এ পর্যন্ত আমরা দেখ্‌ছি, জনন-ক্রিয়ায় দু'জনের শ্রম-বিভাগ করা নেই—স্বতন্ত্র জননেন্দ্রিয় নেই। কিন্তু ক্রম-বিকাশের পথ ধরে' দুই এক পা এগিয়ে গেলেই দেখ্‌তে পাব—কেমন করে' যৌন-সম্মিলনের ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি ধীরে ধীরে উদ্গত হতে' সুরু করেছে।

'ভল্‌ভক্স' নামক এক উচ্চশ্রেণীর আত্মজ প্রাণী আছে। গোড়াতে সূক্ষ্ম-সুতোর মতো লম্বা একটা প্রাণপঙ্ক থাকে, সেইটিকে আশ্রয় করে' এক একটি ভল্‌ভক্স-এর গোলাকৃত কোষাণু পরস্পর সন্নিবদ্ধ হয়ে' একটা উপনিবেশ গঠন করে' তুলে। দৃশ্যত এই উপনিবেশটি বহু-কোষাণু-সমন্বিত একটা অখণ্ড সত্তা বলে মনে হয়। যখন ইহা পূর্ণ-পরিপুষ্ট হয়ে' উঠে, তখন এর মধ্যেকার কতকগুলি কোষাণু অতিরিক্ত খাদ্য-ভারে অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের হয়—বিবাহের ভোজের পর ফলাহারী ব্রাহ্মণদের পেটের যে অবস্থা হয় আর কি! এখন এই 'বড় মানুষ' কোষাণুগুলি উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে, যূথভ্রষ্ট ক্রথনক হয়ে' প'ড়েন এবং আপনাদেরকে লুপ্তাত্ম ও বিশ্লিষ্ট করে' অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর কোষাণুর জন্ম দেন। এই নবজাত কোষাণুগুলি আবার একটি নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পূর্ব পদ্ধতিক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিন্তু কোনো কোনো ভলভক্স-সেবিত উপনিবেশে অবস্থা-বিশেষে কতকগুলি কোষাণু বিচ্ছিন্নাত্ম হয়ে' এক গাদা লম্বা লম্বা ক্ষুদ্রতর কোষাণুর সৃষ্টি করে, তাদের এক প্রান্ত চাবুকের অগ্রভাগের মতো দেখ্‌তে। এই লম্বাটে ধরণের 'সবুজের দল' আপন গাঁয়ের ওই ডাগর গোলাকার কোষাণুগুলির নিকটবর্তী হয়ে' আনন্দে যেন পুচ্ছ তুলে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। তারপর অবশ্য প্রথমত দুইভাগে, ক্রমশ দুই হ'তে চার, চার হ'তে আট ভাগে বিভক্ত হয়ে' তাদের বংশধারা বিস্তার লাভ করে। যে-সকল কোষাণু এইরূপ পারস্পরিক সম্মিলন থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা আর বৃদ্ধি পায় না, কিছু পরে ক্রমশঃ শুকিয়ে নির্জীব হয়ে' যায়।

ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক মৃত্যু বলে' জিনিসটার প্রথম সাক্ষাৎ পেলুম এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভলভক্সের সংস্পর্শে এসে। এ একটা মনে রাখ্‌বার মতো নূতন তথ্য। এর আগে মৃত্যু বলে' কোনো জিনিস স্পষ্টরূপে উদ্ভব লাভ করেনি; তবে আপন সত্তাকে স্বসৃষ্ট দুইটি সত্তার মধ্যে 'হারিয়ে ফেলা' বলে একটা ব্যাপার ছিল। আর একটা নূতন তথ্য এই যে, ভলভক্স উপনিবেশের লম্বাটে চেহারার সূক্ষ্মতর প্রাণীগুলো উচ্চতর জীবের শুক্রকীটের (sperma) মতো এবং অপর পক্ষীয় বৃহত্তর গোলাকৃতি চেহারার প্রাণীগুলো প্রায় স্ত্রী-অণ্ডাণুর (ova) মতো দেখ্‌তে; কার্যতও তারা স্ত্রী-পুরুষের মতো ব্যবহার করে।

তারপর বহু কোষাণুযুক্ত ক্ষুদ্রতম পশ্চাদজ প্রাণী-জগতে (Metazoa) স্ত্রী ও পুরুষ বলে' দুটো শ্রেণীর আভাস পাওয়া যায়। এরা এত ছোট যে, অণুবীক্ষ্য যন্ত্রের সাহায্য না নিলে দেখার যো নেই। তবে এই স্তরে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ বলে' কোন ঘটনার প্রয়োজন হয় না। শুক্র-কীটাণু পুরুষের দেহ-বিচ্যুত হয়ে' পড়ে, স্ত্রী-অণ্ডাণু স্ত্রী-

প্রাণীর দেহ-বিচ্যুত হয়ে' পড়ে; ঘটনাক্রমে যদি এই দুই জাতীয় বীজের একত্র মিশ্রণ হয়, তাতেই "কুমার-সম্ভব"-কাব্য রচিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, এত নিম্ন স্তরেও আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এক-একটি স্ত্রী-অণ্ডাণুর পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ শুক্রকীটাণু ধাবমান্ হয়। প্রতিযোগিতায় যে শুক্রকীটাণু ঐ অণ্ডাণুর সঙ্গে সর্বপ্রথম মিলিত হ'তে পারে, সেই আপন জন্মসার্থক করে' নূতন জীবাঙ্কুরের জন্ম দেয়। বাকীগুলো হতাশ-প্রেমিক হয়ে' বিশীর্ণ দেহে কাল-কবলিত হয়।

আর একটু উচ্চ স্তরে এসে যৌন-স্বতন্ত্রতা আর একটু প্রকট হয়ে' উঠে। কিন্তু একে ত প্রাণীগুলোই খুব ছোট, তার উপর তাদের যৌন-সুলভ আকারের বিভিন্নতা অত্যন্ত অল্প; কাযেই সহজে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করা যার তার কর্ম নয়। পতঙ্গের স্তরে স্ত্রী ও পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট চিহ্নের উদ্গম, ও সঙ্গম-ক্রিয়া দেখ্‌তে পাই। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কীট-পতঙ্গের রাজ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর আকার বড় হয়। খেচর, উভচর ও সরীসৃপদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ প্রায় এক আকার ও আয়তনের হয়; কিন্তু উচ্চ স্তন্যপায়ীর মধ্যে এসে যেন এই ব্যবস্থার ক্রম-পরিবর্তন হ'তে সুরু করেছে—নারী ক্রমে 'অবলা' রূপ পরিগ্রহ কচ্ছেন। পুরুষ-গরিলার চেয়ে মেয়ে-গরিলা আকারেও কিছু ছোট, দেখ্‌তেও অপেক্ষাকৃত সুন্দর।

যাক্, এখন কল্পনা করুন্ দেখি,—পউনে চার হাত লম্বা এক মণ ত্রিশ সের ওজনের আমাদেরই মতো একটা মানুষের মিলন সংঘটন হয়েছে ৪৪ হাত লম্বা, ২৭০০ মণ ওজনের একটি রূপসীর সঙ্গে। ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বা রাক্ষসীর দৈহিক পার্থক্য কত ছিল—তা পুরাণকারেরা মওতাতের অজুহাতে লিখতে ভুলে গিয়েছেন, কিন্তু এতদূর বাড়াবাড়ি ছিল না—এটা আমরা নিরাপদে ধরে' নিতে পারি। কিন্তু একটা স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে উপর্যুক্ত অতিকায় মানবীটির দৈর্ঘ-প্রস্থতা-ওজনের যত গুণ পার্থক্য, ঠিক তত গুণ পার্থক্য থাকে—এক বিশেষ শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রী-মাকড়সার মধ্যে।

কোনো কোনো লম্বকীট জাতির স্ত্রী হয় পুরুষের চেয়ে বেশী নয় একশ' গুণ বড়ো। বড়লোকের মোসাহেবের মতো, এদের পুরুষগুলো স্ত্রীজীবের উদর-সংসারে অণ্ডাণু প্রবাহ (oviduct) মধ্যে বাস করে, সেইখান থেকেই তার দানা-পাণির যোগাড় করে এবং সময় বিশেষে তৎসৃষ্ট অণ্ডাণুগুলিতে নিশ্চিন্ত আলস্যে শুক্র-নিষেক করে। পুরুষরা থিয়েটারের প্রম্পটারের মতো কখনো আর রঙ্গ-মঞ্চের পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আসে না, নেপথ্যেই তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে' ইহ-লীলা সাঙ্গ করে। যতদিন স্ত্রী-জীবের জীবন, ততদিন তাদেরও জীবন; বিধবা বা বিপত্নীক্ হবার আশঙ্কা কারো নেই। এদের উভলিঙ্গ (Hermaphrodite) বলা হয়। কেঁচো উভলিঙ্গত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভিন্ন দুই জাতি-সুলভ জননেন্দ্রিয় অণ্ডজ খেচর জাতির মধ্যে এসে অধিকতর স্ফূর্তিলাভ করে। কিন্তু আয়তনে এক হলেও বাহ্য আকার-প্রকার দেখে সঙ্গীকুলের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করা বেশী কষ্টসাধ্য নয়। তবে কতকগুলি পাখী আছে, যথা—কাক, চিল, মাছরাঙা, তোতাপাখী প্রভৃতি, তাদের বাহ্য আকৃতি দেখে স্ত্রী-পুরুষ বাছবার যো নেই। স্তন্যপায়ীর মধ্যেও কতকগুলো জানোয়ার আছে; যথা—ইঁদুর, খরগোস্, বাদুড়, কাঠবিড়ালী, শিয়াল্ প্রভৃতি, তাদের অতি সামান্যই যৌনস্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। যাহোক্, এই সকল উচ্চ প্রাণীরাজ্যে স্ত্রী-পুরুষের আয়তন, গঠন-বৈচিত্র ও যৌন-প্রকৃতি অনেকটা একরূপ।

যৌন-ভাব বিকাশের এই হ'ল মোটামুটি ইতিহাস। আমরা আগামী সংখ্যায়, যৌন-স্বাতন্ত্র্য ও জীবসৃষ্টি প্রাণী-জীবনের মৌলিক ধর্ম কি না—এই প্রশ্নের আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

রাঢ়দেশে সুবর্ণবণিকের বসতি বিস্তার

শ্রীশিবচন্দ্র শীল দেবশ্রেষ্ঠী

গোবর্দ্ধন মিশ্র ১৪১৪ শাকে সুবর্ণবনিকের কুলপুস্তকে লিখিয়াছেন,—

বণিক্‌দের অগ্রণী, বৈশ্য-বংশ, অযোধ্যা নিবাসী, ধনী, ধৈর্য্যবান, ধীর ও মহাখ্যাতিবন্ত (শিবানন্দ) ধর, (বারাণসী) চন্দ্র, (শঙ্কর) নাথ, (নরহরি) বড়াল, (কর্ণ) দাস (বারিক), ইঁহারা সুশান্ত ও মহাকুল পঞ্চগৌড়ে যান বলিয়া পুরাকালে গৌড় রাজ্যে বণিক্‌দের প্রকাশ হইয়াছিল।

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমকেশরী, পাখীর খাঁচা গড়িবার নিমিত্ত, সুবর্ণের প্রয়োজন হওয়ায়, ধনপতি দত্তকে গৌড় নগরে পাঠাইয়া দেন। ঐ সাধু ধনপতি, সুবর্ণ কিনিবার নিমিত্ত নগরে প্রবেশ করিলেন এবং এক সুবর্ণবণিক্‌কে দেখিয়া সোণা কিনিব বলিলেন। বণিক্, তাঁহার কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে মহাভাগ! আসুন, আমি আপনাকে কাঞ্চন দিব। এই কথা বলিয়া, পা ধুইবার জল বসিবার আসন ও পান, আদর করিয়া দিলেন। ধনপতি দত্ত, এই সব দেখিয়া বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনার নিবাস কোথায়? কি নাম? ও জাতি কুল কি? আমায় বলুন। এ কথা শুনিয়া বণিক্ বিনয়ের সহিত বলিলেন, আমার নিবাস অযোধ্যা নগরে, আমার নাম শ্রীকর্ণ বারিক। জাতি সুবর্ণবণিক্, খ্যাতি দাস। এ কথা শুনিয়া সাধু ধনপতি, তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক আপন পরিচয় দিলেন। তাহাতে জানা গেল উভয়েই অর্থাৎ দুইজনেই বণিক্। অনন্তর দত্ত, সেখানে বাস করিলেন, পাঁচজনের সঙ্গে মিত্রতা হইল, আর মহা আনন্দের সহিত এক বৎসর কাটিয়া গেল। তখন ধনপতি দত্ত বলিলেন—হে মহামতি বন্ধো! হে মহাভাগ! দক্ষিণস্থ উজ্জয়িনী পুরে যদি যান ত বলুন। সে কথা শুনিয়া বণিক্, তুষ্ট হইয়া বলিলেন—আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাইব, যাত্রার ভাল দিন স্থির করুন। অনন্তর গৌড়ের রাজা যাত্রার অনুমতি দিলেন। অনন্তর বণিক্, বান্ধবদের সহিত, সকলে আনন্দের সহিত জাহ্নবী জলে নৌকায় আরোহণ করিয়া অনেক দিনের পরে উজ্জয়িনী পুরীতে গমন করিয়া, নানা দ্রব্যের ভেট লইয়া, রাজার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। বণিক্‌গণ, ধনপতির সহিত রাজাকে প্রণাম করিলেন। তখন রাজা, বণিক্‌দের পরিচয় শুনিয়া, তাঁহাদিগকে এই প্রসাদ দিলেন—পাঁচ ঘোড়া, পাঁচ হাতী, রত্নমালা অলঙ্কার। এই রাজা, বণিক্‌দের সম্মান করিয়া নগর মধ্যে তাঁদেরকে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর রাজা বিক্রমকেশরী, অযোধ্যায় দূত পাঠাইলেন। সেখানকার ষোড়শ বণিক্, বন্ধুদের ও পরিবারদের সহিত উজ্জয়িনী পুরে আগমন করিলেন। বণিকেরা সানন্দে বন্ধুদের সহিত পাঁচ বৎসর কাল উজ্জয়িনীতে বাস করেন তৎপরে বাণিজ্যের নিমিত্ত নানাদেশে যান।

গোবর্দ্ধন মিশ্র আরও বলেন,—

বৈশ্যাঃ পঞ্চদশ বিশিষ্টসকলা শ্চন্দেন সম্মেলিতা।

তে সর্ব্বে বণিজোঃ ভবন্তি বিদিতা ভূপালসংস্থাপিতাঃ॥

অর্থ—১৫ জন বৈশ্য, যাঁহারা সকলেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন, তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় রোক্ষিতাগিরি জয়পতিচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে রাজা বিক্রম-কেশরী কর্ত্তৃক উজ্জয়িনী নগরীতে সংস্থাপিত হইয়া গৌড়-মণ্ডলে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

বখতিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নদীয়া দখলের পরে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে, মুসলমানদের সহিত শেষ যুদ্ধে, গজনবী গাজির সৈন্যদের অস্ত্রাঘাতে উজ্জয়িনীর শেষ রাজা, রাঢ় দেশের গৌরব রবি বীরবর বিক্রমকেশরীর পতন হয়। ইনি উজানি-মঙ্গলকোটের রাজা চন্দ্রসেনের বংশে জন্মিয়াছিলেন।

প্রেমের বাঁধন

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(১)

বিনয় শান্তবালার জার্ম্মাণ ভাষার গৃহ শিক্ষকরূপে প্রথম দিন তাহার পাঠাগারে প্রবেশ করিতেই বিনয়ের প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি শান্তবালার প্রাণে যেন কি একটা অজানা ভাবের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল। চশমার মধ্য হইতে শান্ত নয়ন-যুগলের মধুর দৃষ্টি যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দু'মিনিট অপলকে মাষ্টার মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া রহিল। অতঃপর স্বপ্নোত্থিতের মত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মাষ্টারমহাশয়কে প্রণাম করিয়া বসিতে অনুরোধ করিল।

পাঠ আরম্ভ হইল; কিন্তু শান্তবালার সেদিকে আদৌ মনোযোগ ছিল না। সে কেবলি বিনয়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়াছিল; বিনয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; সে নিজের কর্ত্তব্য ষোল আনা শেষ করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু শান্তবালার মন জার্ম্মাণ ভাষার শ্রুতিকঠোর উচ্চারণ না শুনিয়া শুনিতেছিল, ঐ কঠোরতার মধ্য দিয়া বিকশিত বিনয়ের শ্রুতিমধুর কণ্ঠধ্বনি—কানে বাজিতেছিল সে কণ্ঠ শান্তবালার গভীর নিশীথে এস্রাজের মধুর স্বর-লহরীর মত, চন্দ্রালোকে যমুনাপুলিনে গোপীচিত্তহারী ভগবান্ কৃষ্ণের মধুর মুরলী-রবের মত, নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নে চাতক-কণ্ঠ-নিঃসৃত 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' ধ্বনির মত, হৃদয়-হারী, মর্ম্মস্পর্শী, মনভুলানো!

নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে বিনয় সেই দিনের মত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ছাত্রীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল; কিন্তু শান্তবালার যেন মাষ্টার মহাশয়কে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল না;—তাহার মনে হইতেছিল—ভগবান্ কি বিচারশক্তি-হীন, মাত্র একটি ঘণ্টা এত সহজে শেষ হইয়া গেল, ইহাকে কি আরও দীর্ঘ করা যাইত না? নতুবা সে আরও কিছুক্ষণ মাষ্টার মহাশয়ের সাহচর্য্য লাভ করিয়া ধন্য হইত; আরো কিছুক্ষণ মাষ্টার মহাশয়ের মধুস্রাবী অমৃতনিঃস্যন্দী বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া পুলকে মুগ্ধ হইত; শিহরিয়া উঠিত তাহার সমস্ত অঙ্গ বৈশাখের শান্ত মলয়ের প্রথম হিল্লোলে বৃন্তচ্যুত বকুলের মত, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত মন একটা অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিত ধ্যান-লোকের অচিন্তিত অপ্রত্যাশিত, অননুভাবিত চিন্তা-তরঙ্গের কোমল পরশে! সে কি সুখ, কি আনন্দ!

অষ্টাদশবর্ষীয়া শান্তবালার দেহের উপর দিয়া যৌবনের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে; মাঝে মাঝে জীবনকুঞ্জে যেন একটা প্রাণের সাথীর জন্য আকুল বেদনা জাগিয়া উঠে, শরতের শেফালীকুঞ্জের ঘনীভূত সুরভির মাঝখানে, বর্ষার শ্যামল জলদমালার বিরাট্ বিপুল লীলাচাঞ্চল্য নিরীক্ষণ করিয়া, বসন্তের পরিমলবাহী সমীরণের কোমল স্পর্শে। কিন্তু কি যে চাই, কেন চাই,—সে চাওয়ার আকার কি, প্রকার কি,—কিছুই যে ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না।

কিন্তু আজ বিনয়ের মধ্যে যেন সে পাইয়াছে, তাহার প্রাণের সমস্ত চাওয়ার একটি পরিসমাপ্তি, ব্যগ্র ব্যাকুল মর্ম্মজ্বালার সুশীতল চন্দন প্রলেপ, অর্থহীন সমস্যার একটা গভীর মীমাংসা।

কেন এমন হয়? যাহাকে হয়ত, এ জীবনে কথনো দেখি নাই, কোন আলাপ পরিচয় কোন দিন হয় নাই; এমন একটা অপরিচিত লোককে দেখিয়াই হঠাৎ ভালবাসার বন্যা বহিয়া যায় কেন? প্রেমের কুঞ্জে বাসনার মুকুল ফুটিয়া উঠে কেন? একটি মুহূর্ত্তের দৃষ্টি বিনিময়, সমগ্র অন্তরের উপর এমন একটা ছাপ রাখিয়া যায়, যাহাকে হয়তঃ এ জীবনে মুছিয়া ফেলার কোন সম্ভাবনা থাকেনা; মনে হয় ঐ একটি লোক না হইলে যেন জীবন ব্যর্থতার ধূলি-মুষ্টির মধ্যে লীন হইয়া যাইবে, নৈরাশ্যের অতল অন্ধকূপে ডুবিয়া থাকিবে, শূন্যতার উপকূলে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিবে!

কেন এমন নয়? কে বলিবে কেন হয়?—হয়তঃ এ জন্ম জন্মান্তরের স্মৃতির উদ্বোধন!

(২)

অনুরাগ ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল; শান্তবালা মাষ্টার মহাশয়ের আগমন পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে রেলপথযাত্রীর ট্রেণ আগমন প্রতীক্ষার মত; যখন অদূরে রাস্তার মোড়ে গ্যাসালোকে মাষ্টার মহাশয়কে দেখা যায়, শান্তবালা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নীচে নামিয়া যায় এবং ফটকের নিকট হইতে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে। আবার পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তেও একথা ওকথা সেকথা বলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের গমনে বিলম্ব ঘটাইয়া দেয়।

১৭ই বৈশাখ শুক্রবার শান্তবালার জন্ম দিন। ঐ দিন পূর্ব্বেই শান্তবালা মাষ্টার মহাশয়কে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আজ সে মনের সাধে নিজের প্রসাধন শেষ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে অনেক সহপাঠী শান্তবালার জন্মোৎসবে যোগদান করিয়াছে। আজ শান্তবালার আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিতেছে হৃদয় উপচিত করিয়া, আজ অন্যান্য অভ্যাগতের অপেক্ষা কি প্রকারে সে মাষ্টার মহাশয়কে সুখী করিবে তাহাই তাহার বিশেষ চেষ্টা। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল; তবু মাষ্টার মহাশয়ের দেখা নাই। শান্তবালা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। একে একে সহপাঠীরা আনন্দোল্লাসে গৃহ মুখরিত করিয়া, সুমিষ্ট ভোজ্য দ্রব্যে উদর পূর্ণ করিয়া নিশাবসানে তারকারমত গৃহে চলিয়া গেল; কিন্তু তবু মাষ্টার মহাশয় আসিল না। শান্তবালা বিশেষ ক্ষুন্ন হইল। মাষ্টার মহাশয় কেন আসিলেন না এই চিন্তায় তাহার মন বড়ই চিন্তাযুক্ত হইল। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া শান্তবালা হারমোনিয়ামের নিকট গিয়া বসিল এবং গাহিতে লাগিল—

এস হে—এস হে—এস হে—দেবতা
শূন্য হৃদয়-মন ভরিয়া।
দুঃখ-গ্লানি-পাপ-তাপ-শোক
স্নিগ্ধ পরশ-রসে হরিয়া।
জাগে তারকা নিশীথ গগনে;
কত কাল র'ব জাগি স্বপন মগনে?
এস এস শান্ত সৌম্য কান্ত
প্রেম সুধারাশি ক্ষরিয়া।
মেঘ লোক হ'তে এস বৃষ্টির ধারা,
নিঝ´র সম ভেদি পাষাণ-কারা;
রাখি এ বুকে মম, এস প্রিয়তম
যুগ-যুগান্তর ধরিয়া।

অশ্রুসজল চক্ষু ক্রমশঃ ঝাপসা হইয়া উঠিল, গীত শেষ করিয়া শান্তবালা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল তাহার হৃদয়-দেবতা অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

শান্তবালা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বিনয়কে বসিতে বলিয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিনয় উত্তর করিল—"আজ ত জানি পড়্‌বে না, তাই দেরী করেই এলুম।"

"আমি ভাবলুম বুঝি এলেন না। সত্যি আজ আপনি না এলে আমার ভারী দুঃখ হত"।

"কেন?"

শান্তবালা কোন উত্তর করিল না। নীরবে একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ পঞ্জর চূর্ণ করিয়া নৈশ বাতাসের গায়ে মিলাইয়া গেল।

গভীর রাত্রে যখন বিনয় বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন শান্তবালা একখণ্ড কাগজ বিনয়ের হাতের মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "বাড়ী গিয়ে পড়্‌বেন।" বিনয় চলিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া বিনয় কাগজখণ্ড খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

মাষ্টার মহাশয়,

আজ আমার জন্মদিনে আপনাকে একটা প্রাণের কথা জানাব; আশাকরি নিজগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। যে দিন আপনি শান্ত সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে দূর গগন-বিহারী শুক্র তারকার মত আমার পাঠ-কক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেদিন থেকে, আমি আত্মহারা হয়ে গেছি—আমার আমিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে কোন সীমাহীন নভোনীলিমায় মেঘলোকের পরপারে। যতক্ষণ আপনি থাকেন, ততক্ষণ আমার নিকট স্বর্গও তুচ্ছ বলে মনে হয়; কিন্তু যেই আপনি চলে যান, শূন্যায়মান হয়ে উঠে বিশ্ব সংসার, নৈশচন্দ্রালোকে

অনন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুর্য্যরাশি যেন কার অদর্শনে শ্রীহীন হয়ে ভেসে উঠে আমার চোখের সামনে; কল-কোলাহল-মুখরিত এ বিশাল গৃহ যেন শ্মশানের ধুলি-মুষ্টির মধ্যে নিত্য বিরাজিত ভীষণ স্তব্ধতার ভাব ধারণ করে! বিনিদ্র রজনী প্রভাতের বিহগকাকলীর মধুর সম্ভাষণে, পূর্ব্বাশার দিক্ চক্রবালে ফুল্ল কুসুমভূষা পরিহিত উষার লোহিতরাগে মিলিয়ে যায়! সারাদিন আপনার আসাপথ চেয়ে রেলপথের যাত্রীর মত কোনমতে কাটিয়ে দি। আপনি আমার সুখশান্তি সব হরণ করে' নিয়েছেন; এখন এ দাসীকে পায়ে স্থান দিয়ে এ ব্যর্থ জীবনকে সফলতার উপকূলে নিয়ে যাবেন কি?—অবশ্য আমি ধর্ম্মমত বিবাহের কথাই বলেছি জানবেন। ইতি

সেবিকা

শান্ত

পত্রখানা পড়িতে পড়িতে বিনয়ের হৃদয়বীণায় যেন কি একটা মধুর রাগিণী বাজিয়া উঠিল কোন জন্মজন্মান্তরের বিস্মৃত ঝঙ্কার! কিন্তু পরক্ষণেই নানা কথা ভাবিয়া আবার একটু বিমর্ষ হইল। সুখদুখের, আশা ও নৈরাশ্যের, আনন্দ ও বিষাদের দুইটি ছবি পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়া সেরাত্রে বিনয়কে অক্ষিপল্লব মুদ্রিত করিতে দিল না। উত্তপ্তমস্তিষ্ক বিনয় প্রভাতের কনকরশ্মির নবীন উদ্বোধন গানের সঙ্গে প্রাইভেট টিউশন করিতে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

পরদিন গ্যাসালোকের উজ্জ্বলতায় মাষ্টার মহাশয়ের সৌম্যমূর্ত্তি অদূরবর্ত্তী রাস্তার মোড়ে দেখা গেল, কিন্তু শান্তবালা আজ যেন নীচে নামিয়া যাইতে পারিল না, তাহার পদদ্বয়কে কে যেন সবলে বাঁধিয়া রাখিল পাঠকক্ষের অভ্যন্তরে, একটা লজ্জার অরুণ রাগ তাহার রক্তাভ গণ্ডদ্বয়কে আরো রাঙ্গা করিয়া দিল।

অন্য দিন বিনয় গম্ভীরভাবে পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করে; কিন্তু আজ যে শান্তবালার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হইতেই শান্তবালার নয়ন কোণে একটা হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল পুলকিত করিয়া তাহার দেহবল্লী যেমন বসন্তের প্রথম আবাহনে নব মুকুলিত বল্লরীর উপর দিয়া বহিয়া যায় সান্ধ্য সমীরণ। সে ধীরে ধীরে মুখ নত করিয়া ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং যেন কত অন্যমনস্ক এইভাবে হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল।

বিনয় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া শান্তবালার খুব কাছে সরিয়া বসিয়া বলিল—"কি সব পাগলামো কচ্ছ?

শান্তবালা মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল—"পাগলামো কি দেখ্‌লেন?"

"এই যে কাল যা লিখেছ?"

"সত্যি কথা লিখ্‌লেই বুঝি পাগলামো হয়?"

"বুঝ্‌লাম সত্যি, কিন্তু তা কি সম্ভব?"

"অসম্ভব কিসে দেখ্‌লেন?"

"আমার ত অনেক দিক্ থেকেই অসম্ভব বলে মনে হয়।"

"কি রকম?"

"প্রথমতঃ তুমি ধনীর কন্যা; আর আমি দরিদ্র শিক্ষক।"

"তাতে কি হয়েছে?" স্বামীর গৌরবেই নারীর গৌরব; পিতার ধন ঐশ্বর্য্য ত নারীর নারীত্বের বিকাশক নয়।"

"তুমি বিলাসের কোলে লালিতা পালিতা। দরিদ্র স্বামীর ঘরে তোমার মন বস্‌বে কেন? বিশেষতঃ অনেক কষ্ট হয়তঃ দরিদ্র গৃহে তোমাকে সহ্য কর্‌তে হবে।"

"হ'লই বা; আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন মেয়েরা যাকে ভালবাসে তার জন্য, তার সুখের জন্য সব কষ্ট অবহেলায় সহ্য করতে পারে। তাই ত টাইটনিক জাহাজ ডুববার সময় অনেক নারী স্বামীর সঙ্গে বা প্রিয়জনের সঙ্গে সলিল-সমাধি বরণ করেছিল। সেজন্য আপনি কোন চিন্তা কর্‌বেন না; আপনি যদি কষ্ট সহ্য করতে পারেন, আমি কেন পারব না? দেখ্‌বেন বরং আমার দ্বারা আপনার হয়তঃ কষ্টের লাঘবই হবে"।

বিনয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "সীতার মত বনবাসে যেতে পারবে ত।"

"সে এখন মুখে বলে কি করব? কাজে দেখ্‌তে পাবেন।"

"তারপর তোমার বাবা-মা এ শুনে কি বলবেন ?

"আমি তাঁদের মত নিয়ে আপনাকে লিখেচি। আমার মতেই তাঁদের মত।"

"আচ্ছা; এ বিষয়ে তুমি ভাল করে ভেবে দেখেছ ত?"

"কি ভাব্‌ব?"

"দেখ, এত ছেলে খেলা নয়; এ একটি জীবন-মরণের সমস্যা, কাজেই আগে পিছে, ভাল করে ভেবে দেখে কাজ করাই উচিত। মনে কর, আজ যে অনুরাগ আমার প্রতি তোমার হয়েছে, কোন কারণে যদি তা না থাকে, তখন ত তুমি এ বিয়ের জন্য অনুতাপ কর্ব্বে? কিম্বা মনে কর যদি আমার কোন কার্য্য তোমার পীড়াদায়ক হয়, তখনও ত আর কোনও উপায় থাক্‌বেনা। কারণ আমি মানুষ,—দোষেগুণে গঠিত; হয়তঃ আমার মধ্যে দোষের ভাগই বেশী, এখন সেই দোষগুলাকে ঢেকে দেবার মত মনোবৃত্তি যদি তোমার এখন না থাকে, তখন যে তুমি বিশেষ দুঃখ পাবে?"

"সে সব আমি খুব ভাল করে দেখেচি—আপনার মধ্যে কোন দোষ থাকতেই পারে না।"

"ঐখানেই তোমার মস্ত ভুল হচ্ছে। প্রেমের প্রথম অনুরাগ অন্ধ; সে কিছুই দেখেনা; কিন্তু পরে ঐ অনুরাগ যেন বিরাগে পরিণত না হয়।"

শান্তবালা বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর করিল না।

বিনয় বলিল,—"আরো দেখ, তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ।"

"আমরা ত জাতিভেদ মানিনা মাষ্টার মহাশয়।"

অবশ্য জাতিভেদ আমিও মানিনা; আর আমার ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যার কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে জাতিভেদ না মানার জন্য; তা হ'লেও সে বিষয়ে তোমার মতামত জানা প্রয়োজন বলেই জিজ্ঞাসা করলুম। তারপর দেখ, তোমরা ব্রাহ্ম, আমি হিন্দু।"

"সেটাকি খুব বড় বাধা?"

"তা বাধা বৈকি! কারণ তোমাদের বিয়েতে বলতে হবে—'আমি হিন্দু নই; আমি ত তা বলতে পার্ব্বনা। কারণ আমি হিন্দু—যত দিন বাঁচব হিন্দুই থাকব।"

এইবার শান্তবালা একটু গম্ভীর হইয়া গেল এবং নীরবে কি যেন ভাবিতে লাগিল। দূর আম্র বৃক্ষের উপর দিয়া একটি তারকার ক্ষীণ জ্যোতি তাহার চোখে আসিয়া লাগিল যেন কোন চির পরিচিত বন্ধুর মুখচ্ছবির মত।

বিনয় পুনরায় মৃদু কণ্ঠে বলিল—"আর হিন্দু আইনে অসবর্ণ বিবাহ অসিদ্ধ।"

শান্তবালা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, "মাষ্টার মহাশয় আইনটাই কি বড়? মানুষের হৃদয়টা কি কিছুই নয়?"

"তুমিত জান Heraclitus বলেছেন "Human laws are the emanation of the Divine—" কাজেই আইনকে ত অমান্য করলে চলবে না। ঐ আইনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জগতের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ সক্রেটিস হ্যামলক পান করে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।"

"বেশ তাই হবে, ডাঃ গৌরের বিলের মতে আমাদের বিবাহ হবে, তাতে ত আর আপনার কোন আপত্তি থাক্‌বে না। এই বলিয়া শান্তবালা বিনয়ের চরণ তলে ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিল এবং বলিল—"আজ হইতে আপনি আমার স্বামী।"

বিনয় শান্তবালাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—"এখন হইতে আমি তোমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করলাম।"

উভয়ের এই মিলন মঙ্গল মুহূর্ত্তের উপর দূর আকাশের নীল বক্ষচারী স্নিগ্ধ চন্দ্রকরলেখা মঙ্গলাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিল।

পরদিন ডাঃ গৌরের বিলের মতে বিনয় ও শান্তবালার বিবাহ আইন মতে বিবাহিতের তালিকা ভুক্ত হইয়া গেল।

অফিস গৃহ হইতে উভয়ে বাহির হইয়া মটরে উঠিতে যাইবে এমন সময় একটা কাক কা—কা করিতে করিতে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

(৪)

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিনয় ও শান্তবালা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে নিজের ক্ষুদ্র গৃহস্থালী সাজাইয়া গুছাইয়া অবস্থান করিতেছে; সংসারের আয়-বৃদ্ধির জন্য শান্তবালাও ক্রাইষ্ট চার্চ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে। বিনয় পূর্ব্বের মত

রাণী ভবানী স্কুলে মাষ্টারী করে এবং তৎপরে জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষার গৃহ-শিক্ষকতা করে। ছুটির দিনে বা অবসর সময়ে উভয়ে গড়ের মাঠে বা ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যায়, কিম্বা বায়স্কোপ দেখিয়া আমোদ উপভোগ করে; পূজার ছুটিতে প্রায়ই মধুপুর, শিমুলতলা বা অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ গমন করে। দেখিয়া মনে হয় বাস্তবিক উভয়ে খুব সুখে আছে। কিন্তু এত সুখ বুঝি ভগবানের সহ্য হইল না!

বিদ্যালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া শান্তবালা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া গৃহে ফিরিতেছিল অপরাহ্নে; এমন সময় দেখিল বিনয় ও অন্য একটি তরুণী মোটরযোগে চলিয়াছে। শান্তবালাকে দেখিয়া বিনয় হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল ও তৎপরে মোটর অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিনয়কে অন্য একটি তরুণীর সঙ্গে মোটরে যাইতে দেখিয়া শান্তবালার প্রাণে যেন কি একটা সন্দেহের তুষানল জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল, তাহার স্বামী নিশ্চয় ঐ তরুণীর প্রতি আসক্ত; বিশেষতঃ বিনয়ের শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে অন্য যে কেহ যে তাহাকে শান্তবালার মতই ভাল বাসিতে পারে, এ ধারণা যেন তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। আর বিনয় নিশ্চয় ঐ তরুণীকে তাহার ভালবাসার প্রতিদান দিতেছে। নতুবা তাহাকে লইয়া ঐ তরুণী মোটরে ভ্রমণে বাহির হয় কেন?

এমনি করিয়াই মানুষের মনোরাজ্যে বিদ্বেষের দাব-দহন জ্বলিয়া উঠে; এমনি করিয়াই মানুষের সুখ-শান্তি অশান্তির গভীর জলে ডুবিয়া যায়, পড়িয়া থাকে মাত্র দুর্জ্জয় অভিমানের ক্ষীণ রেখা!

সেদিন বিনয়ের বাড়ী ফিরিতে রাত হইয়া গেল নানা অনিবার্য্য কারণে, কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া দেখিল শান্তবালা মেঝেয় লুটাইয়া কাঁদিতেছে। বিনয় তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"কি হয়েছে শান্তু? কাঁদছ কেন?"

শান্তবালা হাত সরাইয়া দিয়া রুক্ষস্বরে উত্তর দিল—"যাও বিরক্ত করোনা আমাকে। যেখানে এতক্ষণ ছিলে সেখানে যাও।"

"তুমি কি বলচ শান্ত?" বলিয়া বিনয় শান্তবালার মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল।

"যা বলছি তা ঠিকই বলচি।" বলিয়া রাগে ফুলিতে ফুলিতে শান্তবালা বিনয়ের কোল হইতে মাথা নামাইয়া লইল এবং ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিনয় মৃদু প্রশান্ত কণ্ঠে বলিল—"পাগলামো কচ্ছ কেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া শান্তবালা জিজ্ঞাসা করিল —"এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"কেন? যেখানে রোজ থাকি, সেখানে।"

"আর ন্যাকামো করতে হবে না। আমি জানি বুঝি কত ভাল, ভেতরে ভেতরে এত!"

বিনয় বিস্মিত হইয়া বলিল—"তুমি কি বলচ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

শান্তবালা রুক্ষস্বরে বলিল—"তা পার্‌বে কেন? রোজ বুঝি ঐ মেয়েটার কাছেই থাক না?"

"ও যে আমার ছাত্রী।"

"আমার মত ছাত্রী বুঝি?"

"তা কেন হবে?"

"নৈলে তার সঙ্গে তুমি মোটরে করে যাও কেন?"

"ওর বাবা বললে, হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর বাড়ী থেকে কতকগুলো জিনিষ কিন্‌বে, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।"

তারপর নিভৃতে প্রেমচর্চ্চা করে রাত্রি দশটায় বাড়ী আসা হচ্ছে?—তা, বেশ করেছ; আমাকে অপমানটা না করলেই কি হ'ত না?"

"কি অপমান করলুম তোমাকে?"

"কেন? তোমাদের প্রেমের ব্যাপারকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান? উঃ কি হৃদয়হীন তোমরা পুরুষ! যাও, তুমি তাকে নিয়েই সুখে বাস কর, আমি আর তোমাদের প্রেমের মাঝে এসে বাধা দোব না। আর গোপন রাখ্‌বার দরকার হবে না, তাকেই এখানে এনে রাখ, আর দু'জনে সুখে বাস কর।" বলিয়া উঠিয়া শান্তবালা শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাক্স খুলিয়া কিছু টাকা লইয়া নৈশান্ধকারে বাহির হইয়া গেল। বিনয় হতবুদ্ধির মত নীরবে দাঁড়াইয়া

রহিল—নারীর এ ব্যবহার, এ চঞ্চলতা, এ মিথ্যা সন্দেহ তাহাকে নিপীড়ন করিতেছিল; সে শান্তবালাকে বাধা দিবার কোন চেষ্টাই করিতে পারিল না!

(৫)

স্বামীর নিষ্ঠুরতার অভিযোগে শান্তবালা বিবাহভঙ্গের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, বিনয় অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া এ মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিল, অভিমানিনী নারী ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর মত কেবল গর্জ্জন করিয়াই চলিয়াছিল; কোন ফল হয় নাই! আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিনয় অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বিচারক বিনয়ের কথা বিশ্বাস না করিয়া বিবাহ ভঙ্গের আদেশ জারী করিয়াছেন। বিনয় পুনরায় হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল; কিন্তু সেখানেও নিম্ন আদালতের আদেশ বাহাল রহিল।

হাইকোর্টের আদেশ জারি হইবার পর বিনয় যখন বিচারকের কক্ষ হইতে বাহির হইতেছিল, দেখিল দ্বারের পাশে শান্তবালা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বিনয় শান্তকণ্ঠে বলিল—"যাক্, তোমার ইচ্ছাই ভগবান্ পূর্ণ করলেন; প্রার্থনা করি ভগবান্ তোমাকে সুখী করুন, তবে যদি কখনো, কোন দিন, এ হতভাগ্যের দ্বারা তোমার কোন উপকার হবে বলে মনে কর, সেদিন সেটুকু নিতে যেন কুণ্ঠা বোধ করো না। তুমি আমাকে যাই মনে কর ভগবান্ জানেন—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া গেল।

এইবার—যখন বিবাহ ভঙ্গ হইয়া গেল, চির বিরহের যবনিকা নিপতিত হইল বিনয় ও শান্তবালার জীবন-রঙ্গমঞ্চে, তখন—শান্তবালার নারীহৃদয় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল আপনার অন্তর মধ্যে। এইবার মনে হইল শান্তবালার যেন আজ সে এই বিশ্বসংসারে একা—সমগ্র বসুন্ধরার বিপুল বক্ষে যেন আজ আর তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই—কি করিয়া বসিল সে অভিমানের বশে? উঃ কি কুমতি হইল তাহার!

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে, শান্তবালা পিতৃগৃহে যায় নাই, এক গৃহস্থ পরিবারে একখানা ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার অন্তর যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই বিনয়ের বিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। দীর্ঘ তিন বৎসরের কথা একে একে সান্ধ্য তারকার মত স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—কৈ কোন-দিন ত বিনয় তাহাকে একটিও কটুবাণী বলে নাই, এই দীর্ঘ তিন বৎসরের জীবন কি শান্তিময়, কি অনাবিল, কি পবিত্র! তারপর মনে পড়িল শান্তবালার মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য অশ্রুসজল চক্ষে কাতর অনুনয়! কি মর্ম্মস্পর্শী সে ব্যাকুলতা, কিন্তু কি দুর্জ্জয় অভিমান তাহার উপেক্ষা ভরে যে বিনয়ের সঙ্গে কথাই বলে নাই! বিবাহ ভঙ্গের পরও বিদায়কালীন বিনয়ের কথা মনে পড়িল—'আমি নির্দ্দোষ।' তবে কি সেদিন সে মোটরে যাইবার সময় তাহাকে দেখিয়াই আহ্লাদিত হইয়াছিল? কৈ? নতুবা এই দীর্ঘ তিন মাসের মধ্যে সে ত তরুণীকে বিবাহ করিয়া নূতন গৃহস্থালী পত্তন করিতে পারিত অবাধে—সেই বিবাহের পূর্ব্বের জীবনই সে যাপন করিতেছে!

চিন্তার দাবদহন-জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠিল। শান্ত-বালার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শান্তবালা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ এদিকে ওদিকে সেদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন অস্তগামী সূর্য্যের লোহিতাভা গঙ্গার অপর তটস্থিত শ্যাম বৃক্ষাবলীর উন্নত শীর্ষে দিনান্তের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিয়া পড়িতেছিল, তখন শান্তবালা ইডেন গার্ডেনে বৌদ্ধ প্যাগোডার নিকটে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করিতে পারিল না—দেখিল বিনয় উদাস নয়নে দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। দুফোঁটা অশ্রু উজ্জ্বল গণ্ডস্থলে অস্তগামী সূর্য্যকিরণে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। ঐখানেই উভয়ে আসিয়া কতদিন সময় কাটাইত!

আর শান্তবালা স্থির থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া বিনয়ের পদতলে লুটিয়া পড়িল। বিনয় প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শান্তবালাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া পাশে বসাইল।

শান্তবালা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি; আমাকে ক্ষমা করবে ?"

"ক্ষমা ত অনেক দিন করেছি; তুমিই রাগ করেছ; আমি ত করিনি।"

"তবে চল" বলিয়া শান্তবালা বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। অবিলম্বে ট্যাক্সিযোগে উভয়ে তাহাদের চিরপরিচিত বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাদিগকে দেখিয়া ঐ বাড়ীর বাড়ীওয়ালার নবম বর্ষীয়া কন্যা ছবি আসিয়া বলিল—"বিনুদা, তুমি আবার বৌদিকে নিয়ে এসেছ? বৌদি ভারি দুষ্টু; তোমাকে ফেলে বাপের বাড়ী গেছ্‌ল। তুমি বৌদির সঙ্গে কথা বল না।"

শান্তবালা ছুটিয়া গিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল—"চুপ কর মুখপুড়ী।"

শান্তবালা দেখিল, সবই পূর্ব্বের মত রহিয়াছে, সে যেখানে যাহা রাখিয়াছিল, সবই তেমনি রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া শান্তবালা বলিল—"সবই যে আগের মতই সাজান রয়েছে দেখ্‌ছি।"

বিনয় উত্তর করিল—"তা নৈলে যে তুমি এসে রাগ করতে।"

"আমি এসে রাগ কর্‌তুম কি রকম ?

বিনয় শান্তবালার প্রফুল্লকমলসদৃশ রক্তাভ কপোলের উপর নিপতিত চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ সরাইয়া দিয়া বলিল—"জান্‌তাম একদিন তুমি ফিরে আস্‌বে স্বস্থানে, যেদিন ভেঙ্গে যাবে তোমার ভুল ধারণা, যেদিন তোমার অভিমান চূর্ণ হয়ে যাবে নারীত্বের পূর্ণ প্রকাশে; কারণ আমাদের বিয়ের বাঁধনই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আদালতের কঠোর আদেশে; কিন্তু অটুট ছিল অন্তরে অন্তরে ফল্গুর জলধারার মত চির শাশ্বত—প্রেমের বাঁধন।"

সুবর্ণবণিক্-তত্ত্ব

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক

বৈশ্য সমাজ

আর্য্য জাতির মধ্যে বৈদিক যুগে বর্ণের ইতর বিশেষ ছিল না, সকলেই দ্বিজ বা আর্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। তখন আর্য্য প্রজাসাধারণ 'অর্য্য' বা 'বিশ্‌' নামে অভিহিত হইতেন। আর্য্যগণের মধ্যে কোন বর্ণ-বিভাগ হইবার পূর্ব্বে জীবন-ধারণোপযোগী কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্যোৎপাদন ও গোপালন যাঁহাদের বৃত্তি ছিল তাঁহারা 'বিশ্‌' বা 'বৈশ্য', আর যাঁহারা তপস্যা ও যাগ যজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্যে নিরত ছিলেন তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইতেন; তখন 'ব্রাহ্মণ' ও 'বিশ্‌' এই দুই সম্প্রদায়ের সহযোগে আর্য্যসমাজ পরিচালিত হইত।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ হইতে জানিতে পারা যায়—গো, অন্নাদি বৈশ্যের সহজাত অর্থাৎ আর্য্য জাতির মধ্যে যাঁহারা গোরক্ষা ও অন্নাদি আহার্য্যের সংস্থান করিয়া দিতেন তাঁহারাই বৈশ্য নামে আখ্যাত। বেদে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে প্রজা সাধারণের ভূমিকর্ষণ, গোরক্ষা ও অন্নসংগ্রহ উপজীবিকা ছিল, যাহারা রাজকর দিত এবং জগতী ছন্দঃবিশিষ্ট ঋক্ মন্ত্রই যাহাদের সাবিত্রী ও আর্য্যত্বের নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল বৈদিকযুগে তাহারাই 'অর্য্য' বা 'বিশ্‌' নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ঋক্ সংহিতায় যাঁহাদিগকে 'পণিক্‌' বা 'পণি' বলে তাঁহারা সেই বৈদিক যুগে গোধনজীবী, বাণিজ্যপ্রিয়, অর্থসংগ্রহে নিপুণ, সুদখোর, দধিদুগ্ধঘৃত ব্যবসায়ী এবং মাংস ও সোমরস প্রিয় যাজ্ঞিকগণের ঘোর বিরোধী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড' পাঠে জানা যায় যে, প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে গান্ধার হইতে মগধ পর্য্যন্ত

উত্তর ভারতে 'পণি' নামে এক মহাপরাক্রান্ত বণিক্ জাতি শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। পণিগণের সহিত যাজ্ঞিক্গণের গোধন লইয়া বহুযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে কখন বা পণিগণ আর কখন বা যাজ্ঞিক্গণ জয়লাভ করিতেন। গভীর নিশায় পণিগণ নিদ্রিত হইলে ঋত্বিক্গণ গোধন হরণ করিয়া আনিতেন। বেদে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, ঋত্বিক্গণের সহিত পণিগণের এই বিবাদ ক্রমশঃ মহাসংঘর্ষে পরিণত হইয়াছিল। পণিগণ আর যাজ্ঞিকগণের সহিত সমকক্ষ হইতে না পারায় কেহ কেহ যাজ্ঞিকগণের বশ্যতা স্বীকার করেন, আর কেহ কেহ বা দূরদেশে পলায়নান্তর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আর্য্য সমাজে ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি হওয়ায় পণিগণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

মহাবলশালী পণিপতিগণ গবাশ্বজীবী, সুদখোর, কৃপণ ও বাণিজ্যপ্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বাণিজ্য উপলক্ষে ধনলাভের জন্য তাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিতেন। অল্প মূল্যের দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া বেশী দাম লইতেন, টাকাকড়ি ধার দিতেন ও যথেষ্ট সুদ আদায় করিতেন। পণি-বিরোধী ঋষিগণ থাকিলেও ইঁহাদের পক্ষপাতী ঋষির অভাব ছিল না। পণিপক্ষাবলম্বী ঋষিগণের মধ্যে কেতু, শংযুবার্হস্পত্য প্রভৃতি কয়েকজন ঋষির নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কেতু ঋষি পণিগণের বাণিজ্য প্রসারেরর জন্য অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন—"হে অগ্নি, প্রচুর ধন দাও, তাহার সঙ্গে যেন বহু সংখ্যক গাভী ও অশ্ব থাকে, আকাশকে বৃষ্টি জলে অভিষিক্ত কর, পণির বাণিজ্য প্রসার কর," পণি-পতি বৃবু ঋত্বিক্ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন। শংযুবার্হস্পত্য বৃবুর নিকট সহস্র সংখ্যক ধেনু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। মনুসংহিতা ও নীতি মঞ্জরীতেও পণিপতি বৃবুর বদান্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্য্যগণের মধ্যে প্রাধান্য ও তাঁহাদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদোক্ত চারিবর্ণের মধ্যে 'আর্য্য ত্রৈবর্ণিক' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ আর্য্য এবং শূদ্র অনার্য্য বা দস্যু। মগাদগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। 'যগ্ম' গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় চারিবর্ণ যথা—১ আচার্য্য, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ কুটুম্বিন ও ৪ প্রকৃতি-কর্ম্মন্। এখানে 'কুটুম্বিন' শব্দে বৈশ্যকে বুঝায়, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত জাতকের ২য় খণ্ডে এই কুটুম্বিন জাতিকে গৃহপতি বা বৈশ্য স্থানীয় ধরা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যেই যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণের অধিকার ছিল। বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে বিভিন্ন যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল, এক বর্ণ অন্য বর্ণের গ্রাহ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহাকে সেই বর্ণের সমাজে মিশিতে হইত এবং তাঁহার বংশধরগণ সেই বর্ণ বলিয়া পরিচিত হইতেন। এই নিয়ম দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ মধ্যে বর্ণগত আভিজাত্য ছিল না। এ কালে বৃত্তিই বর্ণবাচী ছিল। বর্ণানুসারে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইলেও বৃত্তির তারতম্য হেতু বর্ণের তারতম্য হইত না। আর্য্য প্রজাগণ যখন যে বৃত্তি অবলম্বন করিতেন তখন সেই বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট বর্ণ বলিয়া অভিহিত হইতেন। আর্য্য সমাজে বেদাধ্যয়ন, যজন, যাজন প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ব্রাহ্মণ-বর্ণবাচী, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্য স্থাপন প্রভৃতি বৃত্তি ক্ষত্রিয়-বর্ণবাচী এবং কৃষি, গোপালন, বাণিজ্যাদি বৃত্তি বৈশ্য-বর্ণবাচী ছিল। শুক্ল যজুঃ সংহিতায় তক্ষা বা শিল্পি, রক্ষকার বা সূত্রধার, কুলাল বা কুম্ভকার, কর্ম্মার বা কামার, নিষাদ বা মাংসাশী গিরিচর, পুঞ্জিষ্ঠ বা পাখমারা, শ্বল্য বা কুক্কুর পালক, মৃগয়ু বা ব্যাধ ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ থাকিলেও এইগুলি তখন জন-সমাজে কর্ম্মবাচী ছিল, জাতিবাচী নহে। স্মৃতি সংহিতার প্রচার কালে নানা জাতির উৎপত্তির বিবরণ জানা গেলেও সে সময়ে সমাজ বন্ধনের কঠোরতা ছিল না। এ সময়ও একবর্ণ গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণান্তর গ্রহণ করিতে পারিতেন, মনুর মতে উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র-কন্যায় যে সন্তান জন্মে সেই নিকৃষ্ট সন্তানও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। মনু ১০।৬৪-৬৫। পুরাণেও বেদ-স্মৃতি-বচনের সমর্থক অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কত ক্ষত্রিয় রাজবংশ বৈশ্যত্ব এবং কত বৈশ্য কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজা

নোদিষ্টের পুত্র নাভাগ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত মতে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ"। ভাগবত ৯।২।২৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে নাভাগ বৈশ্য-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। আবার হরি-বংশে লিখিত আছে—নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ"। হরিবংশ ১১ অঃ। মৎস্য পুরাণ হইতে জানা যায় যে, ভলন্দ, বন্দ্য ও সঙ্কৃতি এই তিন জন বৈশ্য বেদের মন্ত্র প্রকাশ করেন।

ভগবান মনুর মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ শূদ্র একজাতি এতদ্ভিন্ন পঞ্চম জাতি নাই। এই চতুবর্ণের মধ্যে স্ব স্ব বর্ণান্তর্গত অক্ষতযোনি পত্নীতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয় তাহারা সেই সেই বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয়। আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অনুলোম ক্রমে যে যে সন্তান উৎপন্ন করে তাহাদের জাতি ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিবর্ণের ভার্য্যা গৃহীত হইত। ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান বৈশ্য বা অম্বষ্ঠ এবং শূদ্রা পত্নী গর্ভজাত সন্তান পারসব বা নিষাদ জাতি হয়। ক্ষত্রিয়ের তিন বর্ণের ভার্য্যার মধ্যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান উগ্র শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত। বৈশ্যের দুই বর্ণের ভার্য্যার মধ্যে দুইটিতেই আত্ম সদৃশ বৈশ্য বর্ণ জন্মিয়া থাকে। আর শূদ্র এক শূদ্র জাতি ভিন্ন অন্য জাতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং শূদ্র পুত্র শূদ্রই হইয়া থাকে। (অনুশাসন পর্ব্ব ও বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্র)। অতএব জানা যাইতেছে যে প্রথমে অর্য্য সাধারণ প্রজা গুণ ও কর্ম্মানুসারে বৈশ্যবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইলেও পরে অপরাপর যৌন সম্বন্ধ হেতু বৈশ্য সমাজের পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। যথা, ব্রাহ্মণ সংস্রবে বৈশ্য কন্যার বৈশ্য এবং বৈশ্য সংস্রবে বৈশ্য ও শূদ্র কন্যার উভয়তই বৈশ্য জাতি দেখা দিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন যজ্ঞভাগ গ্রহণ দোষেও কত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শ্রেণী মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া উত্তর পুরুষে বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—পশুপালন, দান, যাগযজ্ঞ ও অধ্যয়ন (বেদাধ্যয়ন) এই কয়টি বৈশ্যের ধর্ম্ম আর জলে স্থলে বাণিজ্য, কুসীদ বা তেজারতি ও কৃষি এইগুলি বৈশ্যের উপজীবিকা।

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথঞ্চ কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥" মনু ১।৯০

কিন্তু আপদ্‌কালে বৈশ্য স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে পাদধাবনাদি এবং উচ্ছিষ্ট অপমার্জ্জনাদি নীচ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক অন্য শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কিন্তু আপদ্ মুক্ত হইলে শূদ্র-বৃত্তি ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈশ্যেরও দশবিধ সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। যেমন ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বাচক সেইরূপ বৈশ্যের ধনবাচক নামকরণ হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে যেরূপ শর্ম্মণ ও বর্ম্মণ নাম রাখা হয় সেইরূপ বৈশ্যের নামের শেষে বর্দ্ধনাদি নাম থাকে। কুল্লুকভট্ট মনুর টীকায় যম স্মৃতি ও বিষ্ণু পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন যে বৈশ্যের ভূতি, দত্ত বা গুপ্ত উপাধি হইবে। সাধারণতঃ বৈশ্যের গর্ভকাল হইতে গণনা করিয়া ১২শ বর্ষে উপনয়ন হইবে। কিন্তু ধনকামী বৈশ্যের গর্ভ-অষ্টমে উপনয়ন কর্ত্তব্য। গর্ভ হইতে চতুর্বিংশতি বৎসর বয়সে বৈশ্যের চূড়াকরণ হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্য সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট হইলে সাধু সমাজে নিন্দিত হন। বৈশ্য জাতির পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ এই ত্রিবিধ বিবাহ উক্ত হইয়াছে। ভগবান মনুর মতে শাস্ত্র বিধানে নয় কিন্তু যথাশক্তি কন্যা ও তাঁহার জাতিকে টাকা দিয়া কন্যা গ্রহণকে আসুর বিবাহ, বর ও কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ মিলনকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ, আর নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানে বিহ্বলা বা উন্মত্তা স্ত্রীলোককে গোপনে গমন করাই পৈশাচ বিবাহ। এই তিন প্রকার বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহ নিতান্ত জঘন্য ও পাপজনক। বৈশ্যের অশৌচ পঞ্চদশ দিন। বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে যে গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধাদি প্রেতকার্য্য পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই বৈশ্যের পক্ষে বেদমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈশ্যগণেরও তিনটি আশ্রম যথা, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বাণপ্রস্থ। ধর্ম্মশাস্ত্রকার হারীত বলেন

"বৈশ্য নিজ প্রধান ধর্ম্ম গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য ব্যতীত যথাশক্তি দান করিবে, দম্ভ, মোহ, হিংসা ও পরদারবিহীন, দান্ত ও স্বদারনিরত হইবে। ধনব্যয় করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞকালে যাজকদিগকে ভোজন করাইবে। দেহপাত পর্য্যন্ত ধর্ম্মাচরণে কালক্ষেপ ও নিরালস্য হইয়া সর্ব্বদা যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান করিবে। পিতৃকার্য্যপরায়ণ ও ভগবান্ নরসিংহ দেবের পূজায় রত হইবে। যে বৈশ্য এইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিবে সে অন্তে স্বর্গ লাভ করিবে সন্দেহ নাই"।

মনুসংহিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, বৈশ্যগণ নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহের ব্যবসা করিতেন, সর্ব্বপ্রকার রস (গুড়, দাড়িম, আমলকী, কিরাত তিক্তাদি), সিদ্ধান্ন (তণ্ডুলাদি), তিল, পাষাণ, লবণ, নানাবিধ পশু, সর্ব্বপ্রকার তাঁতের কাপড়, রক্ত বস্ত্র, শনের কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্র, অজিন বা মেষ লোম নির্ম্মিত অরক্ত বস্ত্র, ফল, মূল, ঔষধি, জল, লৌহ, বিষ, সোমরস, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, তৈল, গুড়, কুশ, কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য, মদ্য, মাক্ষিক, মধু, মোম, শস্ত্র, আসব, সকলপ্রকার বন্য পশু, দংষ্ট্রী বা শুকরাদি, পক্ষী, সকল প্রকার একসফ (অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভাদি), নীল, লাক্ষা ইত্যাদি। মনু আরও বলিয়াছেন যে, পশুরক্ষা ব্যতীত নানা প্রকার মণি, মুক্তা, প্রবাল, লৌহকর্ম্ম, তন্তু নির্ম্মিত দ্রব্য, নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য ও বিভিন্ন রস দ্রব্য (লৌহাদি) এই সকলের ভাল মন্দ বিচারে অভিজ্ঞতা লাভ বৈশ্যের কর্ত্তব্য। মাধবাচার্য্য মনুর টীকায় 'লৌহ' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"লৌহস্য সুবর্ণ-রজতাদেরর্ঘ-পরিজ্ঞান-ক্রিয়াদিকং তৎ কর্ম্মেতি ব্যাখ্যেয়ং'। অর্থাৎ লৌহ অর্থে সুবর্ণ রজতাদির মূল্য জানা ও ক্রয়-বিক্রয়কে লৌহ কর্ম্ম বলে। কোথায় কিরূপ বীজ বোনা উচিত, ক্ষেত্রের দোষ গুণ, নানা প্রকার মাপ ও ওজন বিষয়ে বৈশ্য অভিজ্ঞ হইবেন। বিক্রেয় বস্তু ও অজিন প্রভৃতির ভাল মন্দ জ্ঞান, নানা দেশের দোষগুণ, বাণিজ্য পণ্যাদির লাভালাভ এবং নানা জাতীয় গো মহিষাদির বৃদ্ধির উপায় জানা বৈশ্যের একান্ত আবশ্যক। গো মেষ মহিষাদি পালকের দেশাচারভেদে বেতন, নানাদেশীয় মানুষের ভাষা; কোথায় কোন দ্রব্য রাখিতে হয় এবং কিরূপ ক্রয়-বিক্রয় সুবিধাজনক তাহাতে অভিজ্ঞ হওয়া চাই। ধর্ম্মানুসারে বাণিজ্য-দ্রব্যাদির বৃদ্ধি বিষয়ে চেষ্টা ও সর্ব্বভূতে অন্নদানে যত্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্রমশঃ

উপবীত আন্দোলন

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ বি এ এ

উপবীত গ্রহণের 'হিড়িকে' যে দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছে তাহার ফলে সুবর্ণবণিকের একটি প্রতিষ্ঠান উঠিয়া গেল, যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা আমাদের জাতীয় উন্নতির অন্যতম প্রথম ও প্রধান সোপান মনে করিয়া-ছিলাম। পরিকল্পনায় আমরা মনে করিতাম যে, সুবর্ণ-বণিক্ শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র বাসস্থান বুঝি বা জেলা স্কুলের প্রাঙ্গণে হিন্দু ও মুসলমান বোর্ডিংএর ন্যায় অপর একটি বোর্ডিংরূপে শোভা পাইবে। তখন মনে মনে বেশ একটু আপত্তির ভাব উঠিয়াছিল, দু' একবার বলি বলি করিয়াও কথাটা প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। অবশেষে যখন ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সুবর্ণবণিক্ সাধারণের প্রদত্ত অপ্রচুর অর্থের সাহায্যে এবং অক্লান্ত কর্ম্মী কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে শিক্ষার্থি-সদন স্থাপিত হইল তখন উহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা দেখিয়া বাস্তবিকই মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। মফস্বলবাসী দরিদ্র স্বজাতীয় শিক্ষার্থিগণ বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনকেন্দ্র কলিকাতায় থাকিয়া

জাতীয় উন্নতির আশা বুকে লইয়া বাণীর আরাধনায় রত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের অনেকেই আশাহত হইলেন দেখিয়া আমাদেরও অনুশোচনার সীমা নাই।

যে উপবীত গ্রহণ লইয়া আজ সুবর্ণবণিকের মহা মিলনের অন্তরায় সংঘটিত হইল তাহা বৈশ্যাচার গ্রহণরূপে "বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনীর" প্রথম অধিবেশন হইতে আলোচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তখন কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই যে, এই প্রস্তাব কালে বিকৃত হইয়া উপবীত গ্রহণ পর্য্যায়ে এই মহা মিলনের ধ্বংস সাধন করিবে। বৈশ্যাচার গ্রহণ ও উপবীত গ্রহণ দুইটি স্বতন্ত্র বিষয়। সুবর্ণবণিক্ জাতি বৈশ্যাচার ভ্রষ্ট হয় নাই। বৈশ্য-জনোচিত আচার বা সদাচার বর্ণাশ্রমী হিন্দু সুবর্ণবণিক্-গণকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল। অপর কোন বর্ণাশ্রমী হিন্দু হইতে সুবর্ণবণিক্ জাতি সদাচারে ন্যূন নহে, একথা তাঁহারাই জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছেন, যাঁহারা এই জাতির জনগণের সহিত বেশী মেলামেশা করিয়াছেন অথবা যাঁহারা এই জাতির ব্যক্তি বিশেষের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। আর্য্য-সদাচারভ্রষ্ট জন-সংস্রবে বসবাস হেতু কোনও কোনও স্থানে সুবর্ণবণিক্ জাতির মধ্যে সদাচারের অভাব পরিলক্ষিত হয় না এমন কথা আমি বলিতেছি না, যদিও ইহাদের সংখ্যা নিতান্তই সামান্য এবং উপেক্ষনীয়। ঐ সকল স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণকে শিক্ষায় দীক্ষায় সদাচারে পশ্চাৎপদ দেখিয়া এবং হিন্দু সমাজের সমসাময়িক বিবেচনায় হীনাবস্থায় থাকিতে দেখিয়া কতিপয় মহাপ্রাণ সুবর্ণবণিক্ "বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনী"র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, সেই সম্মিলনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতে বসিয়াছে।

বর্ণাশ্রমী হিন্দু সুবর্ণবণিক্ বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত দশকর্ম্ম সামান্য ইতর-বিশেষের সহিত পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাঁহারা অপরাপর বর্ণাশ্রমী হিন্দুর ন্যায় দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ। এ বিষয়ে আমি কোথায়ও কাহাকেও সুবর্ণ-বণিকের নিন্দা করিতে শুনি নাই। বরং কোনও কোনও ব্যক্তিকে এমন অভিমত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি যে শুদ্ধাচারে সুবর্ণবণিক্ অনেক বর্ণাশ্রমীকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহা সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের গৌরবময় নিদর্শন। পণ্ডিত শ্রীযুত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় রাজসাহীর সম্মিলন-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সুবর্ণ-বণিক্‌গণের উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা নাই, উত্তরীয় তাঁহাদিগের উপবীতের কার্য্য করে। জানিনা কিসের প্রলোভনে তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া আজ সুবর্ণবণিকের উপবীত গ্রহণের ঋত্বিক পদে ব্রতী হইয়াছেন।

পূজা-অর্চ্চনা কালে অথবা আহ্নিকের সময়ে যজ্ঞসূত্র অঙ্গুষ্ঠে জড়াইয়া মন্ত্রোচ্চারণে বা গায়ত্রী জপে উপবীতের সার্থকতা নহে। উপবীতের সার্থকতা ব্রহ্মজ্ঞানে। যজ্ঞসূত্র গ্রহণ মাত্রেই কেহ ব্রাহ্মণ হইত না বা দ্বিজত্ব পাইত না। তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। গুরুগৃহে বাস করিয়া কঠোর পরিশ্রম সহকারে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা লাভ করিয়া—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া—সমাবর্ত্তনান্তে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। সমাবর্ত্তনের পরে মানবক ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ পদবাচ্য হইতেন। যজ্ঞান্তে গলদেশে সূত্র ধারণ করিলেই মানবকের সংস্কার সাধন হয় না, সংস্কার সাধন হয় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে—শিক্ষায়। যজ্ঞসূত্র গলদেশে ধারণ করিলেই যদি ব্রাহ্মণ হইত—দ্বিজ হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে বাসের ও সমাবর্ত্তনের ব্যবস্থা থাকিত না।

আজকাল ব্রহ্মচর্য্যের আভিধানিক অর্থ হইয়াছে মৈথুনাভাব বা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। কোনও কোনও কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়রা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে কি না স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। হায় ব্রহ্মচর্য্য তোমার পরিণতি দেখিয়া দুঃখ হয়! আছেন কি কেহ বাঙ্গালা দেশে এমন পণ্ডিত যিনি ব্র হ্ম চ র্য্য এই চারিটি অক্ষরে যে স্বর ও ব্যঞ্জনের সমাবেশ আছে তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন প্রতিপন্ন করিতে পারেন? ব্রহ্মকে জানা মানব-জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য, ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে মানব সুখ দুঃখের অতীত এক পরম রমণীয় ভাব প্রাপ্ত হয়,

যাহা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব, এইখানেই মানব জীবনের সার্থকতা। ব্রহ্মকে জানিবার যে প্রকৃত আচরণ তাহাই ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত, সে ব্রহ্মচর্য্যের গূঢ়ার্থ হইতেছে শিক্ষা। যজ্ঞসূত্র শিক্ষার বা শিক্ষিতের চিহ্নস্বরূপ। উপবীত, গুরু গৃহে উপনীতের বা আনীতের চিহ্ন মাত্র। মৈথুনাভাব বা স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জন ব্রহ্মচর্য্যের বা শিক্ষার অন্তরায় স্বরূপ অপর বহুবিধ নিষেধের অন্যতম এই মাত্র। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় রাজসাহীর সভাক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিতেন না। কোনও কার্য্যক্ষেত্রে সভাসমিতিতে অথবা যজ্ঞকালে উপবীত ধারণ করিতেন। ইহা হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে উপবীত শিক্ষিতের চিহ্ন ছিল।

বঙ্গে এখন আর সে শিক্ষা নাই। বেদাধ্যায়ী গুরু নাই, গুরুগৃহে বাস নাই, সমাবর্ত্তন নাই, সুতরাং দ্বিজও নাই। অতএব দ্বিজত্বের ভান করিয়া উপবীত গ্রহণেরও কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। জাতি হিসাবে যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের উপবীত গ্রহণের একটা সার্থকতা আছে। সুবর্ণবণিকের উপবীত গ্রহণের কি সার্থকতা তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে অসমর্থ। যে সকল সুবর্ণবণিক্ উপবীত গ্রহণের দ্বারায় ব্রাহ্মণাদি অপর বর্ণের সমকক্ষতার অথবা তাঁহাদের সহিত সম পর্য্যায়ে পানাহারের আশা করেন তাঁহাদের বুদ্ধিকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে; উপবীত গ্রহণের দ্বারা সুবর্ণবণিকের কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক কোনই উপকার হইবে না; বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহারা অধিকতর উপহাসের পাত্র হইবেন। উপবীত গ্রহণের দ্বারা তাঁহারা কিছুতেই ব্রাহ্মণাদি অপর বর্ণের নিকট কিছুমাত্র অধিকতর মর্য্যাদা পাইবেন না। তাঁহাদের সহিত আহার বিহারে স্থান পাইবেন না। যে শিক্ষার দ্বারা—যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তদানিন্তন যুগের মানবক দ্বিজ হইতেন ঠিক সেই শিক্ষা এখন না থাকিলেও যুগোপযোগী শিক্ষা বর্ত্তমান আছে, যে শিক্ষার প্রভাবে বর্ত্তমান যুগের মানবক বরেণ্য—বর্ত্তমান জন সমাজে মান্য গণ্য—হইয়া থাকেন। আমরা এতাবৎ দেখিয়া আসিতেছি যে, একমাত্র সেই শিক্ষার পথে সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণাদি অপর বর্ণের সম আচরণ ও আহারে বিহারে সমত্ব লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে, সভাসমিতিতে, বার লাইব্রেরীতে, উদ্যান ও সান্ধ্য সম্মিলনে, প্রীতি ভোজনে শিক্ষিত ব্রাহ্মণাদির সহিত শিক্ষিত সুবর্ণবণিকের আহারে বিহারে কিছুমাত্র তারতম্য দেখি নাই। পরন্তু শিক্ষিত জনের বান্ধবতা ক্ষেত্রে সামাজিক কাজকর্ম্মেও এবম্প্রকার মিলামিশার নিদর্শন আমাদের জানা আছে।

উপবীত গ্রহণের দ্বারা কালস্রোতকে যাঁহারা বৈদিক যুগে ফিরাইয়া লইতে চাহেন, বর্ত্তমানকে অতীতে পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন তাঁহারা নিতান্তই কৃপার পাত্র। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল হইতে পারে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ভাল কাজ মন্দ ফল প্রসব করে। কাল-স্রোত একবার অতীত হইলে আর ফেরে না, রেবতকের কবি ব্যাসদেব ও লোকোত্তর-চরিত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে গাহিয়াছেন :—

ব্যাস। মানিলাম বাসুদেব। কিন্তু, বৎস, বল
কালের অনন্ত বক্ষ হইতে মুছিয়া
ফেলিবে দুইটি যুগ? নিবে ফিরাইয়া
উত্তর কুরুতে আর্য্যজাতি পুনর্ব্বার?
প্রকৃতির গতি-স্রোত নিবে ফিরাইয়া
আদিম নির্ঝরে পুনঃ? করিবে প্রচার
আবার বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক সমাজ?

কৃষ্ণ। না, প্রভো, উদ্দেশ্য তাহা নহে কদাচন
এ দাসের। প্রকৃতির ফিরাইবে গতি
নহে সাধ্য মানবের, নহে বিধাতার।
সৃষ্টিরাজ্য নীতিরাজ্য। জানি ভগবান্,
যথা ওই ক্ষুদ্র ফুল অঙ্কুরিয়া ফুটে,
ফুটিয়া শুকায় বৃন্তে, শুকাইয়া ঝরে,
তথা মানবের আছে শৈশব, কৈশোর,
যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, তেমতি জাতির
মানবের সমাজের, শৈশব, কৈশোর,
যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, আছে নির্ব্বিশেষ।

* * * * * *
* * * *। মানব হৃদয়

হইয়া পিপাসাতুর চাহে বুঝিবারে
সুদর্শন নীতিচক্র, নিয়ন্তা তাহার,
মহান্ বিজ্ঞান বিশ্ব! আর্য্য সমাজের,
শৈশবের সত্যযুগ! ত্রেতা কৈশোরের
হয়েছে অতীত দেব; এবে উপস্থিত
যৌবনের যুগান্তর। অভিনেতা তার—
ব্যাস দেব, কৃষ্ণ, পার্থ, কাটিয়া সঙ্কট,
—বলের যৌবন পার্থ, মহর্ষি জ্ঞানের,—
আর্য্যের জাতীয় তরী নিব ভাসাইয়া
শান্তির বৈকুণ্ঠে সুখে; আছে প্রসারিত
সম্মুখে কর্ম্মের পথ, শিরে নারায়ণ।

* * * * * *

উন্নতির পথ ছায়া-পথের মতন,
—প্রীতিময়, সুখময়, পবিত্রতাময়,—
রহিয়াছে প্রসারিত, সেই পথে প্রভো,
জাতীয় জীবন-তরী নিব ভাসাইয়া।

জনৈক অজ্ঞাতনাম্নী কবির একটি ক্ষুদ্র কবিতায় পাঠ করিয়াছিলাম :—

যুগ ধর্ম্ম নীতিধর্ম্ম দেশধর্ম্ম মানি
বিবেক মহান দণ্ডে মন্ত্র যদি সদা
কর্ম্মতর, শান্তিসুখ, লভিবে নিশ্চয়।

হুগলি ঘুটিয়াবাজার নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ স্বর্গগত মহাপ্রাণ রায় নগেন্দ্রনাথ ধর বাহাদুর উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিমত দুইখানি পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন সকলের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশিত হইল :—

ঘুটিয়াবাজার ১০ই ফাল্গুন ১৩৩৪

কল্যানবরেষু!

* * * উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে আমার মত কি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি ইহার পক্ষপাতী নহি। সামাজিক গুরুতর দোষগুলি যদি আমরা বর্জ্জন করিতে পারি তাহা হইলেই আমরা অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইব। অন্য বিষয়ে আমাদের সমাজগত দোষগুলি অপসারিত না করিয়া পৈতা গ্রহণ করা আমার একেবারেই ভাল লাগে না। গুণবতী স্ত্রীলোকের অলঙ্কার পরিধান শোভনীয় হয় গুণহীনার নহে। আমাদের সমাজে বিবাহে পণ-গ্রহণ পদ্ধতি প্রভৃতি দূষণীয় প্রথাগুলির উচ্ছেদের চেষ্টা ব্যতিরেকে পৈতা লইয়া আমরা লোক সমাজে কোন বিশেষত্ব লাভ করিব না। * *

আশীর্ব্বাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর

(২)

কল্যানবরেষু!

* * * উপবীত গ্রহণ লইয়া তো কলিকাতায় খুব গোলোযোগ চলিতেছে শুনিতেছি। চুঁচুড়ায়ও কিছু আছে। এই গোলোযোগ লইয়া আমার মনে হয় একটা সামাজিক চাঞ্চল্য ও অসন্তোষ উঠিয়াছে। নিদেন একটা অনাবশ্যক চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়াছে, যে জন্য অন্য আবশ্যকীয় সামাজিক উন্নতিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে সাধারণের মনো-নিবেশ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতেছে। কিন্তু অনেকে, বিশেষ কলিকাতায়, পৈতা গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণগণ পৈতার বিরোধী তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবারও প্রস্তাব শুনিতেছি। এ সকল ব্যাপার সুবিধাজনক মনে হয় না। ইহাতে আমাদের সমাজে বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা বোধ হইতেছে।

আশীর্ব্বাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর

হুগলি ৬।৮।২৮

মহাপ্রাণ যে আশঙ্কার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার ছাত্রাবাসে বসিয়া চট্টগনিবাসী শ্রীযুত রসিকলাল হাজারি মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে তিনিও ঠিক ঐ আশঙ্কার কথাই বলিয়াছিলেন।

কালস্রোত সভ্য জগতকে যে পথে যেথানে লইয়া যাইতেছে আমাদিগকেও অপর সকলের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সেই পথে সকলের সমকক্ষ হইয়া সেইখানে যাইতে হইবে। নতুবা জাতীয় ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রীতিময়, সুখময়, পবিত্রতাময় উন্নতির পথ ছায়াপথের মতন সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, জাতীয় জীবনতরী সেইপথে ভাসাইয়া লইতে হইবে! সে পথ কর্ম্মবহুল, বৈদিক কর্ম্ম নহে—যুগধর্ম্মোপযোগী কর্ম্ম। যে যুগে উপবীতের কোনই উপ-যোগিতা নাই, সেরূপ উপবীত গ্রহণ উপলক্ষে আত্মকলহ কদাচ সমীচীন নহে।

পোর্ট সান্‌লাইট্

শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি এল্

উদ্বোধন

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে Sir William Herketh Lever ইংলণ্ডের Warrington নামক স্থানে সান্‌লাইট্ সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে এই কারখানার কার্য্য খুব সামান্য ভাবে আরম্ভ হয়,— সপ্তাহে মাত্র ২০ টন সাবান প্রস্তুত হইত। পরে যখন ক্রমশঃ সাবানের চাহিদা দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তখন ৯০,২৭০ ও ৪৫০ টন পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

নূতন স্থান নির্ব্বাচন

ক্রমশঃ কার্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান কারখানা অপর্য্যাপ্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল; এবং কারখানা বৃদ্ধির বা স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে লিভারপুলের অনতিদূরে Brom Borough Pool এর ধারে Chesire উপনদীর সন্নিকটে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠা। এই কারখানা-সহরই 'পোর্ট সান্‌লাইট্' নামে অভিহিত।

জমির পরিমাণ

প্রথমে ৫৬ একর জমি বন্দোবস্ত লইয়া গ্রাম্য সহরের পরিকল্পনায় ২৪ একর জমিতে অফিস ও কারখানা ও ৩২ একর জমিতে গ্রাম্য বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই ব্যবসা যৌথ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়; ঐ সময়ে ৮৬ একর জমি কোম্পানীর অধিকারে ছিল। ১৯০২ সনে উহা ২৩০ একরে উঠে এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৪৬২ একর জমি কোম্পানীর অধিকারভুক্ত। ইহার মধ্যে ২৩৯ একরে কারখানা এবং ২২৩ একরে গ্রাম্য সহর প্রতিষ্ঠিত।

দ্রব্য-প্রস্তুতের পরিমাণ

প্রথমে প্রতি সপ্তাহে ২০ টন সাবান প্রস্তুত হইত; তৎপরে ক্রমশঃ কাট্‌তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এখন প্রতি সপ্তাহে ৪০০০ টন সাবান প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তৈলের কল ও গ্লিসারিণ ফ্যাক্টরীতে সাবান প্রস্তুতের জন্য তৈল ও গ্লিসারিন প্রস্তুত হয়।

কার্য্যের বিস্তার

এই কোম্পানীর মূলধন ৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড; তন্মধ্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদায়ী মূলধন ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড, ইহার কর্ম্মচারী সংখ্যা ৬০০০। পোর্ট সান্‌লাইটে হেড্ অফিস ও লণ্ডন, লিভারপুল, ম্যানচেষ্টার, নিউক্যাস্‌ল্, বার্ম্মিংহাম, অষ্ট্রীয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, সুইট্‌সার-ল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিলণ্ড, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্, দক্ষিণ আফ্রিকা ও জাপান প্রভৃতিতে শাখা কার্য্যালয় আছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল বাগান, পোর্ট সান্‌লাইট, সিড্‌নি, ডুর্বন, ল্যাগোজ ও পোবোতে তৈল প্রস্তুতের কারখানা এবং বেলজিয়ান্ কঙ্গোতে তালীবন বর্ত্তমান।

গ্রামের দৃশ্য

২২৩ একর জমিতে ৮৩৩ খানা গৃহ, ৮ খানা দোকান, বিশ্রামাগার, পাঠাগার, যাদুঘর, হাসপাতাল, উদ্যান, শব্জীবাগান ও ৫ মাইলের উপর রাস্তা বর্ত্তমান। এই উদ্যান সহরকে ঠিক সহর নামে অভিহিত করা চলে না। সহরের সুখ-সুবিধার সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের একত্র সম্মিলনই এই উদ্যান সহরের বিশেষত্ব; কিন্তু এইখানে যাহারা কোম্পানীর কর্ম্মচারী নয়, তাহাদের স্থান হইতে পারে না, যেহেতু যে সমস্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সমস্তই কোম্পানীর সম্পত্তি;

কোম্পানী কর্ম্মচারী ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ঐ বাসগৃহ ভাড়া দেয় না। ৪০ ফিট চওড়া ডায়মণ্ড নামক বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত সুদৃশ্য রাজপথ ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে।

গৃহের প্রকার-ভেদ

এই স্থানে দুই প্রকারের বাসগৃহ দেখা যায়;—(১) কটেজ টাইপ, (২) পার্লার টাইপ।

(১) কটেজ টাইপ বাসগৃহের সম্মুখেই বৃক্ষাবলী পরিশোভিত উদ্যান; উহাতে রাস্তা হইতে গৃহের অভ্যন্তর ভাগ আবৃত থাকে। অথচ উদ্যান সংরক্ষণের জন্য সাপ্তাহিক খরচ মাত্র ৩ পেন্স। এই গৃহে উপর তলায় ৩টি শয়ন ঘর, নিম্নতলে ভাঁড়ার ঘর, স্নানাগার, রান্নাঘর প্রভৃতি আছে। ভাড়া প্রতি সপ্তাহে ৫ শিঃ ৩ পেন্স।

(২) পার্লার টাইপ বাসগৃহও ঠিক কটেজ টাইপের মত, তবে উহাতে উপর তলায় একখানা অতিরিক্ত শয়নঘর থাকে এবং নিম্নতলে বৈঠকখানা থাকে। ভাড়া প্রতি সপ্তাহে ৭ শি ৬ পেন্স মাত্র।

এতদ্ভিন্ন বাসগৃহের সন্নিহিত খোলা জমি নামমাত্র বার্ষিক খাজনায় কর্ম্মচারিগণকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। অনেকে তাহাতে শব্জী বাগান করিয়া আহারের ব্যয় সংক্ষেপে সমর্থ হইয়া থাকে।

বাসগৃহের ভাড়া এত কম করিয়া কোম্পানী কর্ম্মচারিগণকে কোম্পানীর ঐশ্বর্য্যের অংশভাগী করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মচারী স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেদিকেই কোম্পানীর বিশেষ লক্ষ্য।

সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠান

কর্ম্মচারিগণের বালক-বালিকাগণের শিক্ষার্থ এখানে ২টি বিদ্যালয় আছে, একটি বালকদের ও অপরটি বালিকাদের। এতদ্ভিন্ন, টেনিস্ লন্, বোলিংগ্রীন্, রাইফেল রেঞ্জ, ফুটবলের মাঠ, পুস্তকাগার, ব্যায়াম-শালা, পাবলিক হল, শিল্প-বিদ্যালয়, প্রভৃতি জন সাধারণের হিতের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৮০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে Hulme হল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার একাংশে চিত্র-শালা ও যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত। এই যাদুঘরে অনেক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। এইখানে দুইটি সঙ্গীত বিদ্যালয় জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত বিস্তারে সহায়তা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের আয়োজনও হইয়া থাকে।

জনসংখ্যা

বর্ত্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ৪০০০ এর উপর। গৃহের সুবন্দোবস্তের জন্য জনসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। এই স্থানে জন্মসংখ্যা শতকরা ৮·৩৯ এবং মৃত্যুসংখ্যা ৯·৭।

স্বাস্থ্য

এই স্থানের জল-বায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। এই স্থানের ছেলে-মেয়েরা লিভারপুলের ছেলেমেয়েদের চেয়ে লম্বা ও বলিষ্ঠ এবং ওজনে ভারী।

ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে

ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে Suggestive Bureau প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে কোন কর্ম্মচারী কার্য্য-সৌকর্য্য বিষয়ে কিম্বা কর্ম্মচারীদের অবস্থা বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ তাহার বক্তব্য কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে পারে। দুর্ঘটনা নিবারণের জন্যও একটি সমিতি আছে। যাহাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহার বিষয়ে এই সমিতি বিশের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফ্যাক্টরীর মধ্যে রমণীগণের স্নানাগার এবং পুরুষ ও রমণীগণের জন্য পৃথক ভোজনাগার আছে, মাত্র খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুত করণে যে ব্যয় লাগে, তাহাই মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এক পয়সাও লাভ গ্রহণ করা হয় না। গরম শাকশব্জী, মাংস এবং পুডিংএর মধ্যাহ্ন ভোজন মাত্র তিন পেন্স ব্যয়ে পাওয়া যায়।

কর্ম্মচারীদের শিক্ষা

নূতন কর্ম্মচারীগণকে শিক্ষা দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ নৈশ

বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। শিক্ষানবীশগণকে কার্য্যকরী শিক্ষায় প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। অনেক সময় কর্ম্মচারিগণকে শিক্ষার্থ বিদেশে ভ্রমণে লইয়া যাওয়া হয়—যেমন, ১৯০৫ সালে বেলজিয়াম শিল্প-প্রদর্শনীতে, এবং লণ্ডন প্যারিশ ও ব্রুসেলস্ প্রদর্শনীতে শিক্ষানবীস কর্ম্মচারিগণকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই ভ্রমণের সমস্ত ব্যয় কোম্পানী বহন করিয়াছিল।

বার্দ্ধক্যের সংস্থান

১৫—২৫ বৎসর কার্য্য করিলেই কোন কর্ম্মচারীর কার্য্যকাল সুদীর্ঘ বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। এই কার্য্যকালের পরিমাণের উপর কর্ম্মচারীগণকে প্রশংসাপত্র, ঘড়ী ও পদক প্রভৃতি পারিতোষিক দেওয়া হয়। ৬৫ বৎসর বয়সে পুরুষ ও ৬০ বৎসর বয়সে নারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য। ঐ সময় কর্ম্মচারীগণকে বৃত্তি বা পেন্সন দিবার নিয়ম আছে। ১৯০৯ সালে Co-partnership Trust প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই বিধান দ্বারা ঐশ্বর্য্য-বিভাগ-নীতি উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহন করিয়াছে। ৫ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর কোম্পানীর যে কোন কর্ম্মচারী অংশীদার রূপে গণ্য হয় এবং তাহার বার্ষিক উপার্জ্জনের শতকরা ১০ টাকা লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয়। তাহারা এই অংশ পত্র হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারে না। যখন কোন কর্ম্মচারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে, তখন এই Co-partner certificate, preferential certificate এ পরিবর্ত্তিত করা হয়। Preferential certificateএ শতকরা ৫৲ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা বা অপ্রাপ্তবয়স্ক অনাথ বালকবালিকা ঐ preferential certificate পাইয়া থাকে। কিন্তু বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করে, তবে সে ঐ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

ফা হিয়ানের ভারত-ভ্রমণ

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল, সাহিত্যরত্ন কবিভূষণ

আমরা যে বহু প্রাচীন সভ্য জাতি এবং এককালে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিলাম, এ কথা যতই গর্ব্ব করিয়া বলি না কেন, জগতের সমসাময়িক প্রাচীন অপরাপর সভ্যজাতি আমাদিগকে কিরূপ চক্ষে দর্শন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাইলে আমরা ঐ গুলিকে অধিক মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিব। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীন কালে ভারতবাসীগণ ধারাবাহিকরূপে ইতিহাস প্রণয়নে বিমুখ ছিলেন। এই কারণে আমাদিগকে অন্য জাতির ইতিহাস হইতে অনেকস্থলে ভারতের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে হয়। গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে; ভারত ভ্রমনকারী চীনদেশবাসী ফা হিয়ান্, সুঙ্গ্উন্, ও হুয়েন সাঙ্গের ভারত বর্ণনা হইতে; এবং তুর্কীস্থান নিবাসী আল্‌বেরুণী বা আবু কাইহানের বর্ণিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা ভারতের তৎকালীন অনেক বিষয় অবগত হই। ইহাদিগের মধ্যে ফা হিয়ান্, হুয়েন সাঙ্ ও আল্‌বেরুণীর বর্ণনা বিস্তৃত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা সংক্ষেপ বলিয়া, এবং সুঙ্গ্ উন ঠিক্ নিয়মিত রূপে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন নাই বলিয়া, আমি তাঁহাদিগের বর্ণনা ত্যাগ করিলাম।

বৌদ্ধযুগের শেষভাগে অর্থাৎ চতুর্থ খৃষ্টাব্দে ফা হিয়ান ভারতে তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে আসিয়াছিলেন। তখন উদ্যান-রাজ্যে ভারত সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত রাজ্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ উদ্যানরাজ্য বর্ত্তমান কাবুল প্রদেশ। আধুনিক আফগানিস্থান তখন ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। ফা হিয়ান লিখিয়াছেন যে উদ্যান-রাজ্যবাসিগণ মধ্য ভারতের ভাষা ব্যবহার করিত, এবং আহার-বিহার ও

সাজসজ্জায় তাহারা মধ্য ভারতবাসিগণের অনুকরণ করিত। ঐ দেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইতেছিল, এবং তথায় ৫০০ সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। তিনি স্বাদ, গান্ধার, তক্ষশিলা ভ্রমণান্তর পেশোয়ারে আসিয়াছিলেন। এই পেশোয়ারে বা পুরুষপুরে তিনি একটি বৃহৎ বৌদ্ধ মঠের বর্ণনা করেন, তাহা আকারে ও গঠনে তখন অত্যন্ত মনোহর ছিল। সম্ভবতঃ দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে পেশোয়ারের সন্নিকটে মহেন্‌জোদারো নামক স্থানে যে বিহারের ধ্বংসস্তূপ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উদ্ধার করিতেছেন, উহা বোধ হয় ফা হিয়ান বর্ণিত এই মনোহর মঠ।

নগরহার রাজ্য (জেলালাবাদ) পরিভ্রমণান্তর সিন্ধুনদী পার হইয়া ফা হিয়ান যমুনাতীরবর্ত্তী মথুরারাজ্যে পদার্পণ করিলেন। যমুনার উভয় তীরে তখন ২০টি সঙ্ঘারামে প্রায় ৩০০০ ভিক্ষু বা শ্রমণ বাস করিতেন। আধুনিক কালে মথুরাবাসী পাণ্ডাগণ যে হিন্দু নরনারীগণকে কংশের কারাগার ও রাজপুরীর ধ্বংসস্তূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, উহা এই বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপ মাত্র। তখন মথুরারাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। ফা হিয়ান লিখিয়াছেন "মরুভূমির পরপারে ভারতবর্ষের পশ্চিম রাজ্য অবস্থিত। ঐ সকল রাজ্যের রাজন্যবর্গ অর্থাৎ রাজপুত রাণাগণ গোঁড়া বৌদ্ধ। ঐ রাজ্যের দক্ষিণে মধ্য দেশ। মধ্যদেশের জলবাতাস উষ্ণ; তুষারপাত তথায় হয় না। মধ্যদেশের প্রজাগণ সুখে বাস করে; প্রতি উপায়ক্ষম ব্যক্তিকে কর দিতে হয় না; কিম্বা তাহাদিগের উপর রাজপুরুষদিগের কোন উৎপীড়ন নাই। যাহারা রাজার ভূমি আবাদ করে, তাহারাই রাজ সরকারে লভ্যাংশের কিঞ্চিৎ আদায় দেয়। কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই রাজা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। দোষী ব্যক্তিকে রাজা শারীরিক শাস্তি দেন না। অপরাধের তারতম্যানুসারে কঠিন বা লঘু জরীমানা করিয়াই রাজা অপরাধীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বারবার রাজদ্রোহিতার অপরাধ করিলেও রাজা অপরাধীর দক্ষিণ বাহু কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি দেন। রাজার অঙ্গরক্ষী ভৃত্যগণ নির্দ্ধারিত বেতন পাইয়া থাকে। ঐ দেশবাসী কেহ প্রাণীহিংসা করে না; কেহ মদ্যপান করে না; চণ্ডাল ব্যতীত কেহ পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহার করে না। কেহ শূকর বা কুক্কুট পালন বা বিক্রয় করে না। হাটের মধ্যে মদের দোকান নাই। কেনা-বেচায় কড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চণ্ডালেরাই কেবল জীবহত্যা বা মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে। বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দিন হইতে মধ্যদেশের রাজাগণ বিহার নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবসেবার্থে কৃষিক্ষেত্র, উদ্যান, অট্টালিকা, ষণ্ড প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। দলিলপত্র কাষ্ঠে খোদাই হইয়া এক রাজার হস্ত হইতে অন্য রাজার হস্তে যায়। কেহই তাহা নষ্ট করিবার প্রয়াস পায় না। কাজেই রাজ-কার্য্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে না। বিহারবাসী ভিক্ষুগণ ব্যবহারার্থ কক্ষ, বিছানা, মাদুর, বসন এবং আহার্য্য দ্রব্য পাইয়া থাকে। সমস্ত মঠেই ঐরূপ বন্দোবস্ত আছে।"

সংকাশ্যরাজ্য ভ্রমণ করিয়া ফা হিয়ান কান্যকুব্জে আসিয়াছিলেন। ঐ সময় গুপ্ত রাজারা কান্যকুব্জ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ নগরীতে মাত্র দুইটি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। তৎপরে শচীরাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া তিনি কৌশল রাজপুরী শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন। বুদ্ধের মহিমা-লিপ্তা শ্রাবস্তী তখন ধ্বংস-পথের পথিক। ঐ নগরীতে ফাহিয়ান্ মাত্র দুই শত ঘর গৃহস্থকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। যে জেত বনে ভগবান তথাগত ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, ঐ বনভূমি তখনো রমণীয় সৌন্দর্য্য শোভা হারায় নাই। ঐ স্থানের সুন্দর বিহার মধ্যে নির্ম্মল সরসী, বন্য কুসুমস্তবকে শোভিত কুঞ্জ-কানন দেখিয়া ফা হিয়ান্ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিহারবাসী ভিক্ষুগণ যখন শুনিলেন যে ফা হিয়ান্ এবং তাঁহার একমাত্র অনুচর চীনদেশ হইতে তীর্থ-ভ্রমণে ভারতে পদব্রজে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিস্মিত হইয়া কহিলেন "কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীর এক সীমা হইতে মানুষ যে ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে আর এক সীমায় আসে পূর্ব্বে আমরা তাহা জানিতাম না।"

গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তুর সেই পূর্ব্ব শোভা তখন আর ছিল না। ফা হিয়ান্ উহা দর্শন করিয়া লিখিলেন "এই নগরে রাজা কিংবা প্রজা কিছুই নাই। ইহা মরুভূমি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ভিক্ষুগণ এই স্থানে

আসিয়া সমবেত হয়েন; এবং মাত্র দশঘর গৃহস্থ এখন এই গ্রামে বাস করে।”

যে কুশীনগরে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন, উহাও ধ্বংস হইয়াছিল। তৎপরে ফা হিয়ান বৈশালী নগরীতে পদার্পণ করেন। এই বৈশালী লিচ্ছবী রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে বুদ্ধদেব অম্বপালীর আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় মহাসভা এই নগরে হইয়াছিল। তৎ সম্বন্ধে ফা হিয়ান লিখিলেন “বুদ্ধের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির শত বৎসর পরে বৈশালীবাসী কতিপয় ভিক্ষু বিনয়-বর্ণিত দশটি নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা বলিলেন যে বুদ্ধদেব ঐরূপ করিতে বলিয়াছেন। সেই কারণে সপ্তশত ভিক্ষু এবং অর্হৎ একত্রিত হইয়া এক সভা করিয়া বিনয়পিটককে নূতন করিয়া সঙ্কলন করেন।”

গঙ্গা পার হইয়া তৎপরে ফা হিয়ান পাটলীপুত্রে আসিলেন। এই নগরী অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া অশোক কর্ত্তৃক মগধের রাজধানীতে পরিণত হয়। ফাহিয়ান্ উহার বর্ণনা করিলেন “নগরীর মধ্যস্থানে রাজ হর্ম্ম্য অবস্থিত। ঐ হর্ম্ম্যের নির্ম্মাণকালে প্রস্তরখণ্ড তুলিবার জন্য বোধ হয় অশোক রাজা দৈত্যগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাচীর, দ্বার, এবং শিল্পকার্য্য মানবের অসাধ্য। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে।” সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও ধ্বংসস্তূপ উদ্ধার করিয়া যাহা পাইয়াছেন তাহাতেই বিস্ময় উৎপন্ন করে। খনন কার্য্য এখনো চলিতেছে। অশোকস্তম্ভের সন্নিকটেই একটি সুন্দর সঙ্ঘারামে প্রায় ৭০০ ভিক্ষু বাস করিত। বিখ্যাত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত মঞ্জুর্ষি, ঐ বৌদ্ধ সঙ্ঘারামেই বাস করিতেন; এবং শ্রমণগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মোৎসব সম্বন্ধে ফাহিয়ান্ লিখিলেন “প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের অষ্টমী তিথিতে দেবমূর্ত্তিগুলির শোভাযাত্রা হইত। এই উৎসবের জন্য চারিটি চক্রের উপর বাঁশের রথ নির্ম্মিত হইত। ঐ রথ উচ্চে প্রায় ২২ ফুট। উহা দেখিতে ঠিক্ একটি মন্দিরের মত। রথের চূড়াটি কারুকার্য্যসমন্বিত রেশমী বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। বংশ-নির্ম্মিত পাঁচটি মাচা উপর্য্যুপরি স্থাপিত করিয়া মধ্যে একটি বংশ খণ্ডকে দণ্ডস্বরূপ স্থাপিত করা হইত। রথের চারিটি কোণে চারিটি কুলঙ্গীর মধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পরিচর্য্যার্থে বোধিসত্ত্বকে দাঁড় করান হইত। এইরূপে পরে পরে কুড়িটি রথ টানা হইত; এবং এই ধর্ম্মোৎসবে বহুল জনসঙ্ঘ যোগদান করিত। মূর্ত্তিগুলিকে ফুল ও ধূপ অর্পণ করিয়া দেশবাসিগণ নানাবিধ খেলাধূলা ও গীত বাদ্য করিত। ব্রহ্মচারিগণ এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইতেন। রথগুলি তৎপরে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিত। নরনারীবৃন্দ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া উৎসব-সাগরে নিমজ্জিত হইত। মগধের চারিপার্শ্বস্থিত দেশ হইতে স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে পাটলীপুত্রে আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিত।” পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আধুনিক শ্রীক্ষেত্রের রথ যাত্রা এই বৌদ্ধযুগের রথ যাত্রার সংস্করণ কি না। বৌদ্ধযুগের শেষভাগে যে প্রতিমা-উপাসনা-প্রথা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, আমরা তাহা ফা হিয়ানের বর্ণনা হইতে পাইতেছি। আমরা ঐ বর্ণনা হইতে পাটলীপুত্রের আর একটা বিষয় অবগত হইয়া থাকি ফা হিয়ান্ লিখিতেছেন, —“পাটলীপুত্রের ধনী সম্প্রদায় নগর মধ্যে ঔষধালয় স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ স্থানে নগরীর গরীব রোগিগণ গমন করিয়া থাকে। ঐ সকল ঔষধালয়ে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। ভিষক্‌গণ রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রোগ উপশম হইলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে।”

ফা হিয়ান্ তৎপরে রাজগৃহে যাইলেন। নূতন রাজগৃহ অজাতশত্রু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি নূতন এবং পুরাতন দুই রাজগৃহই দর্শন করিলেন। তিনি লিখিলেন,— “রাজ গৃহের উত্তরভাগে ছোতি নামক এক পর্ব্বতের গহ্বর আছে। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ঐ গহ্বরে ৫০০ অর্হৎ একত্রিত হইয়া সংগৃহীত ধর্ম্মপুস্তকগুলির সঙ্কলন করিয়াছিলেন।”

গয়াধামে আসিয়া ফা হিয়ান্ উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিলেন না। বুদ্ধ গয়ায় বোধিদ্রুম দর্শন করিয়া তিনি কাশীধামে আসিলেন। সারনাথে যে মৃগোদ্যানে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মপ্রচার করেন, ফা হিয়ান্ তাহা দর্শন করিলেন।

তথায় তখন দুইটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইতেছিল। তৎপরে তিনি কৌশাম্বীতে গমন করেন।

কাশী হইতে ফা হিয়ান্ পুনরায় পাটলীপুত্রে গমন করেন। এখনও বিনয়পিটক সংগ্রহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। লোকে তখন জনশ্রুতি অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিত, পুস্তকাদির বড় ধার ধারিত না। তিনি পাটলীপুত্রের এক সঙ্ঘারাম হইতে একখণ্ড বিনয়পিটক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

গঙ্গার দক্ষিণ কুল ভ্রমণ করিয়া ফা হিয়ান্ চম্পা নগরীতে আসিলেন। চম্পা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। উহা ভাগলপুরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। তৎপরে তিনি সমুদ্রতীরে অবস্থিত তাম্রলিপ্তি নগরে পৌছিলেন। ঐ দেশে ২৪টি সঙ্ঘারাম ছিল। একটি সঙ্ঘারামে দুই বৎসরকাল বাস করিয়া তিনি চীনভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকগুলির অনুবাদ করিলেন এবং নানাবিধ চিত্র আঁকিলেন। তৎপরে একখানি বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া ফা হিয়ান্ সিংহল যাত্রা করেন। ১৫ দিন উত্তীর্ণ হইলে ঐ জাহাজ "সিংহের দেশে" পৌছিল। তিনি লিখিলেন "সিংহলে পূর্ব্বে কোন অধিবাসী ছিল না। বণিক্‌গণ দলে দলে আসিয়া ঐ দেশে বাস করায় ক্রমে একটি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে বৌদ্ধগণ আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। সিংহলের জলবায়ু উৎকৃষ্ট; প্রচুর শস্য জন্মে; রাজধানীর উত্তরে একটি জয়-স্তম্ভ আছে, উহা ৪৭৯ ফুট উচ্চ। ঐ স্তম্ভের পার্শ্বে একটি সঙ্ঘারামে ৫০০০ ভিক্ষু বাস করেন।"

বহু বৎসর ভারতে বাস করায় তাঁহার জন্মভূমি দর্শনের ইচ্ছা হৃদয় মধ্যে প্রবল হইল। এমন সময় একজন চীন-বাসী বণিক্ সিংহলের বুদ্ধদেবের চরণে যখন একটি চীন-দেশে নির্ম্মিত তালবৃন্ত বা পাখা অর্পণ করিলেন, তখন ফা হিয়ানের হৃদয়ে দেশস্মৃতি প্রবলবেগে জাগরূক হইল। তিনি দেশের জন্য কাঁদিলেন, এবং তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া একখানি বৃহৎ বাণিজ্যতরীতে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ জাহাজে ২০০ যাত্রী ছিল। সমুদ্রে ঝড় উঠিল। জাহাজ ফুটা হইল। মাল পত্র অধিকাংশই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। ফা হিয়ান্‌ও তাঁহার তৈজসপত্রাদি জলমধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার ভয় হইল, পাছে বণিক্‌গণ তাঁহার সংগৃহীত ধর্ম্মপুস্তক ও মূর্ত্তিগুলি জলে নিক্ষেপ করে। ত্রয়োদশ দিন অবিশ্রান্ত বহিয়া ঝড় থামিল। একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া উহা মেরামত করা হইল। তৎপরে আবার সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ হইল। ফা হিয়ান লিখিলেন "এই সমুদ্রে অনেক জলদস্যু আছে। তাহারা হঠাৎ জাহাজ আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করে। অসীম সমুদ্রে পূর্ব্ব পশ্চিম নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করিয়া জাহাজ চালাইতে হয়। ঝড় থামিয়া আকাশ পরিষ্কার হইলে, আমরা দিক্‌নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।" ৯০ দিন পরে তাঁহারা "জি-পো-টি" (যাভা) নামক দ্বীপে পৌছিলেন। তিনি যাভা সম্বন্ধে লিখিলেন "এই দেশে অনেক নাস্তিক এবং অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন।"

যাভায় পাঁচ মাস যাপন করিয়া ফা হিয়ান্ আর একটি বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিলেন। উহাতেও ২০০ যাত্রী ছিল এবং ৫০ দিনের রসদ সংগৃহীত ছিল। চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার একমাস পরে আবার ভীষণ ঝড় উঠিল। তখন সমুদ্রযাত্রী ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—"চীনবাসী এই শ্রমণটি আমাদের সঙ্গী হইয়াছে বলিয়া আমাদের অদৃষ্টে এই বিপদ বারবার আসিতেছে। আইস, আমরা ইহাকে একটি দ্বীপে রাখিয়া যাই। একজনার জন্য আমরা এতগুলি লোক কেন মরিব?" কিন্তু ফা হিয়ানের মুরুব্বি পোতাধ্যক্ষ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করায় যে যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন, এবং তাঁহার সহিত বাঁচিয়া গেল তাঁহার ভারত-ভ্রমণ বর্ণনা। ৮২ দিন অবিশ্রাম জাহাজ চালাইয়া তাহারা চীনরাজ্যের দক্ষিণ উপকূলে পৌছিল। বৌদ্ধযুগে ভারত ও চীনে যেরূপে বাণিজ্যতরী যাতায়াত করিত, ইহা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। ভারতের বাণিজ্যতরী বিপদ-সঙ্কুল সমুদ্রপথে ২০০।৩০০ আরোহী ও মালপত্র লইয়া প্রায় ২০০ দিন ধরিয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়া তবে চীনদেশে পৌছিত। পথে জলদস্যুর উৎপাত। ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের বাণিজ্যার্থ এইরূপ ক্লেশ-সহিষ্ণুতা দেখিয়া আজ আমাদিগের গাত্র শিহরিয়া উঠে।

আজকাল আমরা বাষ্পীয় পোতে ১৫ দিনে চীন পৌঁছিয়া থাকি! জলদস্যুর উৎপাত নাই, তথাপি ভারতবাসী বাণিজ্যবিমুখ! বিলাসিতায় গা ভাসাইয়া দিয়াছি! এখন কম্পাস ও তারহীন তড়িতের সাহায্যে জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্রযাত্রা করে, কিন্তু ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জাহাজের পথ নির্ণয় করিতে হইত সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের গতি দেখিয়া! ফা হিয়ানের বর্ণনায় আমরা জানিতে পারি যে ব্রাহ্মণগণও জাহাজে চাপিয়া সুমাত্রা, যব ও চীনে ব্যবসা করিতে যাইতেন। যবদ্বেশে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগে সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হইল; ভারত অধঃপতনের প্রথম সোপানে নামিল! শঙ্খমুনি তাঁহার সংহিতায় আদেশ করিলেন,—

"ম্লেচ্ছদেশে তথা রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ বিশেষতঃ।
ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ প্রাজ্ঞো ম্লেচ্ছদেশে ন চ ব্রজেৎ॥"

গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দ্বিপ্রহরে সূর্য্যরশ্মির প্রবেশ পথ অবরোধ করিয়া বহির্জগতের সকল সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জ্ঞানদর্পী ভারত যে একচোট নিদ্রা দিলেন, চারি পাঁচ শত বৎসর পরে হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিলেন,—ঘরে সিঁদ দিয়া তুরস্ক দেশের এক দস্যু তাঁহার গুপ্তধনের সন্ধানে আসিয়া উহা হরণ করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে হৃত হইল ভারতের রত্নমুকুট!

ফা হিয়ান্ প্রায় দশ বৎসর কাল ভারতে যাপন করিয়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। তিনি দেশবাসিগণের সহিত মিশিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই, উহা যে জগতের চক্ষে একটি মূল্যবান্ সামগ্রী, বিশেষতঃ ভারতের পক্ষে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

*

পঞ্চপুষ্প

আমেরিকার সম্পদ্

সমগ্র পৃথিবীতে যত পাথুরিয়া কয়লা আছে আমেরিকায় ঐ কয়লার পরিমাণ সম্ভবতঃ তাহার অর্দ্ধেক হইবে। পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ কেরোসিন তৈল সাধারণত আমেরিকায় জন্মে, আকরিক লৌহের শতকরা ৪৫ ভাগ, পৃথিবীর তাম্রের শতকরা ৭০ ভাগ, পৃথিবীর বার্ষিক কর্ত্তিত বাহাদুরী কাঠের শতকরা ৬৫ ভাগ আমেরিকার এবং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা, গম, ভুট্টা, এবং আলু আমেরিকায় অধিক পরিমাণ জন্মে।

রাসায়নিক দ্রব্যসকল দেশ মধ্যে প্রস্তুত না হইলে কোনও দেশেই এই শ্রমশিল্পোন্নতিরযুগে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। ইহার রাসায়নিক শ্রমশিল্প দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তজ্জন্যে নিয়োজিত মূলধনের অংশের অধিক ভাগ গ্যাস্ প্রস্তুত করণে ব্যয় হয়। দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ মূলধন আকরিক তৈল রিফাইন্ (ব্যবহার যোগ্য) করণে ব্যয় হয়।

অন্যান্য ব্যবসায়িগণ অপেক্ষা রাসায়নিক শিল্পিগণের উপরেই আমেরিকার ভাবী সৌভাগ্য নির্ভর করে। ঔষধের জন্য, সেলুলয়েড্ প্রস্তুত করণ জন্য, এবং অন্যান্য শ্রমশিল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ কর্পূরের আবশ্যক। তজ্জন্য তার্পিণ তৈল হইতে সংশ্লেষণ প্রণালী (synthetic) ক্রমে কর্পূর প্রস্তুত করণের উপায় উদ্ভাবন জন্য আমেরিকার রসায়ন-বিজ্ঞানবিদ্গণ মনোনিবেশ করিয়াছেন।

রসায়ন বিজ্ঞানবিদ্গণ, এঞ্জিনিয়ারগণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম্মে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণকে অদূর ভবিষ্যতে দুইটি প্রধান বিষয়ে,—খাদ্য ও দাহ্য পদার্থ (fuel)

উদ্ভাবনে শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। জ্বালানী দ্রব্য ভিন্ন শ্রম-শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না, খাদ্যাভাবে লোক বাঁচিতে পারে না। এ কারণ আমেরিকাবাসীদের অর্দ্ধেক চেষ্টারও অধিক কেবল খাদ্য এবং শ্রম-শিল্পের আবশ্যকীয় শক্তি (energy) উৎপাদনে নিয়োজিত। দ্রব্যের মূল্য তাহার উৎপাদন প্রণালীর কার্য্যকারিতার উপর নির্ভর করে এবং তদ্ভিন্ন অন্য প্রয়োজনীয় যাহা কিছু মনুষ্য ব্যবহার কি ব্যয় করে তাহাদের মূল্য খাদ্য ও জ্বালানী দ্রব্যের মূল্যের উপর নির্ভর করে।

প্রতিনিয়তই রসায়নশিল্পী খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি ও গুণের উৎকর্ষতা সাধন করিতেছেন। অধিকাংশ আমেরিকাবাসীই যে কোনও আকারে দুগ্ধ ব্যবহার করে। দোহনের এক কি দুইদিন মধ্যে দুগ্ধ না খাইলে তাহা নষ্ট হয়। তজ্জন্য রসায়ন-শিল্পী এখন দক্ষিণ আমেরিকা এবং পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় অন্য দেশ সকলে যেখানে বহু-সংখ্যক গাভী আছে, তথায় যাইয়া দুগ্ধ বিশ্লেষণ করতঃ তাহার উপাদান সকল পৃথক পৃথক ভাবে ঘনীভূত করিয়া তথা হইতে দেশে প্রেরণ করার পর, সেই সকল উপাদান একত্র সংযোগ করিয়া দুগ্ধ পুনরুদ্ভব করেন। এই প্রকার দুগ্ধ পান করিতে মূল দুগ্ধবৎ স্বাদযুক্ত এবং বীজাণুশূন্য হওয়ায় তাহাপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ্। এইরূপে দুগ্ধকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহার উপাদান সকলকে পৃথক পৃথক রূপে বাক্সজাত করত সহস্র সহস্র মাইল দূরে চালান দিয়া তথায় সেই সকল উপাদান একত্র মিশ্রিত করত অল্প ব্যয়ে পুনঃ মূল দুগ্ধে পরিণত করা যাইতে পারে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে দৈনিক ১০৮৭৫০০ মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। মাখন না উঠাইয়া ইহার শতকরা ৪৩ ভাগ ব্যবহার করা হয়। অবশিষ্ট দুগ্ধের অল্প পরিমাণ জ্বাল দিয়া ক্ষীর করত টিন পাত্রে সংরক্ষিত হয়, কি পনিরে পরিণত করা হয় কিম্বা একাংশ দ্বারা আইসক্রিম (ice cream) প্রস্তুত হয়। উৎপন্ন দুগ্ধের সমষ্টির শতকরা ৩৭ ভাগের মাখন উঠান হয়। ঐ মাখন তোলা দুগ্ধ গৃহ-পালিত পশু-পক্ষিগণকে খাইতে দেওয়া কিম্বা ফেলিয়া দেওয়া হইত। রাসায়নিকগণ এই মাখন তোলা দুগ্ধ মধ্যে ভিটামিন্ নামক এক রাসায়নিক পদার্থ যোগ করিয়া তাহা পুষ্টিকর দুগ্ধে পরিণত করার চেষ্টায় আছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে অনেক দ্রব্য অকর্ম্মণ্য বোধে লোকে আবর্জ্জনা-স্বরূপ ফেলিয়া নষ্ট করে এবং সেইগুলি নষ্ট না করিয়া মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করার শত শত উপায়ের ইহা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত।

ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭০ ভাগ জলমগ্ন। আমেরিকার নিকটস্থ সমুদ্র-দ্বীপবাসী লোক সংখ্যা, ভূভাগবাসী লোক সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। এ দ্বীপবাসীগণ সমুদ্রজাত পদার্থ সকল হইতে খাদ্য, চর্ম্ম, তৈল, হাড়, ভূমির সার ও মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার কৃষকদের গো, অশ্ব, মেষ, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণ, ও কৃষি ব্যতীত অন্য কার্য্যে ভূমি ব্যবহার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার হওয়ায় পশু-চারণের জন্য পতিত ভূমির পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। এই জমি-কমতি সুমেরু বৃত্ত-মধ্যস্থ আলাস্কা প্রদেশের বরফাবৃত অকর্ম্মণ্য ৬ লক্ষ ৫ হাজার বিঘার কেবল বলগা হরিণ বা রেইন্ ডিয়ার (reindeer) চরণের স্থান ব্যতীত সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য ভূমিদ্বারা পূরণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। এই রেইন ডিয়ারসকল হইতে খাদ্য এবং বস্ত্র সংগ্রহ হওয়ায় এবং তাহারা ভার বহন ও যানটানা কার্য্যে পটু বিধায় তাহারা গৃহ-পালিত উত্তম পশু। অন্যান্য গৃহ পালিত পশুগণ যেমন তাহার খাদ্য ও আশ্রয়স্থানের জন্য মনুষ্যের উপর নির্ভর করে, এই রেইন ডিয়ারসকল তদ্রূপ নয়; ইহারা স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়ায় তজ্জন্য মনুষ্যের মুখাপেক্ষী হয় না। প্রায় ২০ বৎসরের অধিককাল হইল সাইবেরিয়ার (Siberia) বেরিং ষ্ট্রেট (Bering Strait) পার করিয়া আলাস্কা প্রদেশে ১২৮০টি রেইনডিয়ার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা এখন বহু সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। সঞ্জীবনী

পদব্রজে বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক

শ্রীযুক্ত এ মুখার্জ্জি পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির

হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণসহ আইস্‌ল্যাণ্ড মৎস্য ধরিবার ক্ষেত্রে গমন করিয়া মৎস্য ধৃতকরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ইংলিশম্যান

সবাক্ চলচ্চিত্রে চ্যালিয়া পিল

৪০,০০০ পাউণ্ড পারিশ্রমিক

আমেরিকার এক ফিল্ম্ কোম্পানী ইটালির অভিনেতা চ্যালিয়া পিলকে ২ খানা ছবিতে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য ৪০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে। কোম্পানী তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোন সময়ে প্রয়োজন, সে সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে বলিলে, তিনি বলিয়াছেন যে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গান করিতে বা অভিনয় করিতে পারিবেন না এবং তিনি নিজের ইচ্ছামত সহযোগী অভিনেতা বাছিয়া লইবেন; দৃশ্যাবলী ও পোষাক পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন তাঁহার মতেই করিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে তিনিই ঐ কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন।

ইংলিশম্যান

গ্রেট বৃটেনের কোটিপতি

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস

গত বর্ষে গ্রেট বৃটেনের ১৪৭ জন কোটিপতির নাম জানা গিয়াছিল। তৎপরে আরও ৯ জন কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেক মহিলাও আছেন। নূতন কোটিপতিগণের অধিকাংশ কৃত্রিম রেশম ব্যবসায়ে নিজেদের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। লিষ্টার সহরে ৮ জন কোটিপতি আছেন যাহাদের নাম জনসাধারণ জানে না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ৪ জন প্রসিদ্ধ কোটিপতি বর্ত্তমান—সার সেমুয়েল হোর ও সার ফিলিপ স্যাসুন, সেক্রেটারী ও আণ্ডার সেক্রেটারী আকাশ বিভাগ; মিঃ এস্‌লি ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রী; ডিউক্ অব সাদারল্যাণ্ড হাউস অব লর্ডসে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি। ডিউক্ অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, পোর্টল্যাণ্ড, নর্থাম্বার্ল্যাণ্ড, আর্লস্ ডার্বি এবং মার্কুইস্ অব বিউট্ লর্ড উপাধিধারীর মধ্যে প্রসিদ্ধ কোটিপতি। পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্যে মিঃ সেমুয়েল, মেজর কোর্টোল্ড, কর্ণেল গ্রেটন, ও মিঃ গ্রেন্‌ফেল কোটিপতি হিসাবে প্রসিদ্ধ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কে কি ব্যবসায়ে কোটিপতি হইয়াছেন :—

লর্ড রথচাইল্ড—ব্যাঙ্কিং; লর্ড কাইল্‌সেণ্ট, লর্ড ইন্সকেপ এবং সার জন লারম্যান—জাহাজের ব্যবসা; লর্ড ডেওয়ার এবং লর্ড উলেভিংটন—হুইস্কি; লর্ড ইভিয়া, গায়নেস্ ষ্টাউট, কর্ণেল গ্রেটন্—বাস্ বিয়ার; লর্ড গ্ল্যানটেনার—তুলা; লর্ড বার্ণষ্টেড—তৈল; লর্ড ভেষ্টি—জমান মাংস; সার জর্জ্জ উইল্‌স, মিঃ বার্ণহার্ড ব্যারণ—তামাক; লর্ড ম্যালবেট—রাসায়নিক দ্রব্য; আরও অনেকে বহুবিধ ব্যবসায়ে কোটি-পতি হইয়াছেন। ১৯০৬ সালে মাত্র ১৯ জন লোক ছিল যাহাদের আয় ৫০,০০০ পাউণ্ডের অধিক; কিন্তু আজ সেস্থলে কোটিপতির সংখ্যা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

ইংলিশম্যান

বৃটেনের যুদ্ধের পেন্সন

হাউস অব কমন্সে যুদ্ধের পেন্সন সম্বন্ধে তর্কবিতর্কে পেন্সন মন্ত্রী মেজর ট্রায়ন বলেন যে এই পেন্সনের দ্বারা প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১০ লক্ষ পরিবার সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই বৎসরের শেষে যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মোট ৯১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড যুদ্ধের পেন্সন ব্যয় রূপে ব্যয়িত হইবে। তৎপরে তিনি ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর যুদ্ধের পেন্সন খরচের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ফ্রান্স ৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ও জার্ম্মাণী ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে আগামী দশ বৎসরে যুদ্ধের পেন্সন ব্যয় বাবৎ বৎসরে ৪৫,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর কারখানায় অগ্নিকাণ্ড

বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর মিরিয়াম কারখানায় আগুন লাগিয়া বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি প্রজ্জ্বলনের কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। ম্যানেজার

সাক্ষ্য দান কালে বলিয়াছেন যে, বহু কারণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে ;—যেমন ছাদের ছিদ্রের সঙ্গে নিমজ্জন দণ্ডের সংঘর্ষ, বিদ্যুৎ চমকান, কিম্বা প্রজ্জ্বলিত আলোক লইয়া প্রবেশ প্রভৃতি বহু কারণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। খুব সম্ভবতঃ নিমজ্জন দণ্ডের সংঘর্ষই এই বিপদ্‌পাতের কারণ; কারণ নিমজ্জন দণ্ডের নিকটে একজন প্রহরীকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

গ্রেট বৃটেনে পার্ল্যামেণ্ট নির্ব্বাচন

পার্ল্যামেণ্ট নির্ব্বাচনে ৬১৫ জন সদস্যের পদের জন্য ১৭২৯ জন প্রার্থী রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ভোট দাতার সংখ্যা ২৮,০০০,০০০ জন; ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৭,০০০,০০০ জন ছিল। সভ্যপদের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। বক্তৃতা, রেডিও ব্রডকাষ্টিং প্রভৃতি দ্বারা জনগণের মধ্যে মতবাদ প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় ১০০টি কেন্দ্র হইতে ২ জন করিয়া পদ প্রার্থী দণ্ডায়মান হইয়াছে; অথচ ঐ সমস্ত কেন্দ্রে নূতন ভোটদাতার সংখ্যা ৬,০০০,০০০ তন্মধ্যে রমণীর সংখ্যা ৫,০০০,০০০ জন, বর্ত্তমানে ভোটদাতার সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় দলপতিগণের সর্ব্বসাধারণের সংস্রবে আসা সম্ভবপর হইতেছে না; তবুও জনমতকে স্ব স্ব দলে আনয়ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

উড্ডীয়মান হোটেল

রাজকীয় খপোত R ১০১ শীঘ্রই উড্ডীয়মান হোটেল রূপে ১০০ যাত্রী লইয়া আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে যাত্রা করিবে। এই আকাশযান ৭২৪ ফিট লম্বা; এই বিমানের ভোজন কক্ষে ৫০ জন লোক স্বচ্ছন্দে বসিয়া আহার কার্য্য সমাধা করিতে পারে। ৬০ ফিট দীর্ঘ ও ৩২ ফিট প্রশস্ত বিশ্রামাগার বর্ত্তমান, এই কক্ষের প্রত্যেক দিকে ৭ ফিট চওড়া উচ্চ বারান্দা আছে। এতদ্ভিন্ন এই উড্ডীয়মান হোটেলে শয়নস্থান, রান্নাঘর, আরোহণী প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত আছে। ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে গমন করিয়া ইহা না থামিয়া ৪০০০ মাইল অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। ১০০ জন যাত্রী, ১০ টন ডাকের দ্রব্যাদি ও পরিচালক প্রভৃতি এই আকাশযান বহন করিবে। অনেকের মতে এইরূপ বিলাস-ভ্রমণ পৃথিবীর অন্য কোথাও সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু বাতাসের প্রবলতম বাধা অতিক্রমেও ইহার শক্তি অসাধারণ।

আকাশমার্গে চা পান

বেঙ্গল এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী প্রতি শনি, রবি ও সোমবার দমদম এরোড্রোম হইতে যাত্রীগণকে আকাশমার্গে কলিকাতার উপরিভাগে ভ্রমণ করাইতেছে। এক সঙ্গে ২।৩ জন যাত্রী লওয়া হয়। ভাড়া ৩৫৲ টাকা মাত্র; তৎসঙ্গে চা ও সামান্য জলযোগের ব্যবস্থাও আছে।

পৃথিবীর উচ্চতম বাড়ী

আমেরিকার চিকাগো সহরে ৭৫ তলা আকাশস্পর্শী বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। এই বাড়ীর শীর্ষদেশে ১২৫ ফিট উচ্চ গম্বুজ থাকিবে। এই বাড়ীর দৈর্ঘ্য ১০২২ ফিট। ইহা প্যারিসের ইফেল টাওয়ার অপেক্ষা ৩৮ ফিট উচ্চ, এ পর্য্যন্ত নিউ ইয়র্কে যত বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, কোন বাড়ীই ৮৩৬ ফিটের অধিক উচ্চ হয় নাই। বর্ত্তমান বাড়ী ৩,৫০০,০০০ বর্গ ফিট ভূমির উপর অবস্থিত হইবে এবং লৌহ স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে, যাহার মধ্য দিয়া Illinois রেল কোম্পানী সহরের বাহিরে বৈদ্যুতিক রেল চালাইবে। এই বাড়ীর নিম্নতলে মোটর গ্যারেজ হইবে ও তাহাতে ১০০০ মোটর গাড়ী রাখা চলিবে। দ্বিতলে একটি ব্যাঙ্ক ও একটি বৃহৎ হল থাকিবে; ঐ হলে ৪০,০০০ লোক একসঙ্গে বসিতে পারিবে।

থিয়েটারের নূতন ছাদ

বর্ত্তমানে গ্রেটবৃটেনে থিয়েটার গৃহের ছাদ এইরূপভাবে নির্ম্মিত যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাদ খুলিয়া ফেলিয়া গৃহকে নীল আকাশের তলে উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত বাতাসের প্রবাহ গৃহে প্রবিষ্ট করান যায়; আবার প্রয়োজন হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ছাদ টানিয়া দিয়া গৃহকে

বৃষ্টি-বা তুষারপাত হইতে রক্ষা করা হয়। কলিকাতা এম্পায়ার থিয়েটারে ঐ প্রকার ছাদের ব্যবস্থা করিবার জন্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। তাহাতে বিশেষ সুবিধা এই যে, দর্শকের নিশ্বাসে রুদ্ধ কক্ষের বাতাস দূষিত হইবে না; মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হওয়ায় শীতল বায়ু প্রবাহের দ্বারা কক্ষকে শীতল করিবারও প্রয়োজন নাই। ঐ ছাদ অনেকটা ল্যাণ্ডোলেট্ মটরের হুডের মত; ইচ্ছানুসারে গুটান ও খাটান চলে।

দিল্লীতে সেক্রেটেরিট গৃহে কিন্তু নূতন উপায়ে কক্ষ শীতল করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া সূক্ষ্ম শীতল জলকণাপূর্ণ কৃত্রিম কুয়াসার মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া শীতল করা হয়। পরে গৃহের ছাদ হইতে পার্শ্ববর্তী রন্ধ্রপথে ঐ বায়ু কক্ষে কক্ষে প্রেরিত হয়; তাহাতেই কক্ষ শীতল হয়; আর বৈদ্যুতিক পাথার প্রয়োজন হয় না। ঐ উপায়ে বাতাসকে উষ্ণ করিয়া কক্ষকে গরম করিবার ব্যবস্থাও চলিতেছে। বিদ্যুতের উদ্ভাবনে ভারতীয় 'নলিনী-দলতালবৃন্তম্' বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। এবার বুঝি বৈজ্ঞানিকের প্রতিভাবলে বৈদ্যুতিক পাথারও অন্ন উঠে!

পৃথিবীর আধুনিকতম জাহাজ

মানবের বিলাস-বাসনা নীল সিন্ধুর অসীম বক্ষে, বিশাল আকাশ পথে বিলাস দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিতেছে। ক্লাইড্ নদীর তীরে Trans-Atlantic লাইনের জন্ত Empress of Britain এবং Empress of Japan নামক দুইখানা জাহাজ নির্ম্মিত হইতেছে। এই দুইখানা জাহাজে স্থলে বিলাসী মানবের যাহা প্রয়োজন ও কাম্য অন্তহীন নীলবারিধির বিশাল বক্ষেও তাহাই পাওয়া যাইবে। এই জাহাজে আরোহীদের জন্ত পার্ব্বত্য উদ্যান, টেনিস্ কোর্ট, বিলিয়ার্ড রুম, বলরুম, ব্যায়ামশালা, প্রশস্ত বিশ্রামাগার, মর্ম্মরখচিত স্নানাগার ও সাঁতার খেলিবার পুষ্করিণী সমস্তই থাকিবে। প্রত্যেক কেবিনের পাশেই বাথরুম থাকিবে, সুসজ্জিত ভোজনশালা লণ্ডন বা নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ হোটেলের খাদ্য পরিবেশন করিয়া যাত্রীবর্গকে পরিতুষ্ট করিবে। এতদ্ভিন্ন প্রেমিক প্রেমিকার নিভৃত আলাপের জন্ত কুঞ্জকানন, লতাবিতান, তালীকুঞ্জ সমস্তই সরবরাহ করা হইবে। অধিকন্তু যদি কাহারো কোন জিনিষ কিনিবার দরকার হয় তজ্জন্ত, অলঙ্কার ও মণিরত্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিলাস দ্রব্যের দোকান দর্শকের নেত্র-পথে উন্মুক্ত হইবে। বর্ত্তমানে আটলান্টিক লাইনের Cunadar Aquitania জাহাজে দোকানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

মেঘলোকে সাতদিন

Fort Worth নামক আকাশযান ৭দিন শূন্যমার্গে মেঘলোকে অবস্থান করিয়াছিল। পূর্ব্বে আমেরিকার রাজকীয় আকাশযান ১৫০ ঘণ্টা শূন্যপথে অবস্থান করে। এবারে তাহা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দিবসে দুইবার অন্য আকাশযান খাদ্য, পেট্রোল, সংবাদপত্র প্রভৃতি দিয়া আসিত।

গ্রেট্‌বৃটেনে ছাপাখানাওয়ালার পৌষ মাস

পার্ল্যামেণ্ট নির্ব্বাচন উপলক্ষে ছাপাখানাওয়ালাদের এক লাভের মরসুম উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড ও ক্ষুদ্র পুস্তিকার দ্বারা প্রত্যেক সভ্যপদ-প্রার্থী ভোটদাতাগণকে স্বপক্ষে টানিবার জন্য সচেষ্ট। ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপিয়া ছাপাখানাওয়ালারা বেশ দুপয়সা রোজগার করিতেছে। এ পর্য্যন্ত ২০০,০০০ পাউণ্ড প্লাকার্ডে ব্যয়িত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই স্বপক্ষের কার্য্যতালিকা-সমন্বিত পুস্তিকা প্রত্যেক ভোটদাতার নিকট পাঠাইতেছে। ভোটদাতা ২৭,০০০,০০০; সুতরাং ৭৮,০০০,০০০, পুস্তিকা প্রভৃতি প্রত্যেকে পাইবে; কাজেই ছাপার খরচের বহর সহজেই অনুমেয়। এই নির্ব্বাচনে মোট ২,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান; তন্মধ্যে ন্যূনকল্পে ৫০০,০০০ পাউণ্ড ছাপাখানার খরচ। লিবারেল পার্টি গত দুই মাস ধরিয়া প্রত্যহ ৭,০০০,০০০ পুস্তিকা বিতরণ করিয়াছে। এবং নির্ব্বাচন সপ্তাহে প্রত্যহ ২২,০০০,০০০ পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রত্যেক দলেই আছে। এই সমস্ত খরচ সভ্যপদ-প্রার্থিগণ বহন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান তুরস্ক রমণী

ছয় বৎসর পূর্ব্বে তুরস্কে অনবগুণ্ঠিতা রমণী দেখা যাইত না। বড়ঘরের স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যাইতে পরদা-বেষ্টিত যানে করিয়া চলাফেরা করিত। কিন্তু মুস্তাফা কামালপাশার সংস্কার-ফলে আজ তুর্কী রমণী অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় হাটে, বাজারে, রাস্তায়, ট্রামে, রেলে, থিয়েটার-বায়স্কোপে গমনাগমন করিতেছে, অনেক রমণী স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেছে, ব্যাঙ্কে ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী অফিসে অনেক রমণী কাজ করিতেছে। বহু-বিবাহ-প্রথা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং সুইট্‌সারল্যাণ্ডের আইনের অনুকরণে বিবাহ-বিচ্ছেদ-আইনও সংস্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেকে অবরোধপ্রথা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক,—অনেক রমণী পূর্ব্বের অবগুণ্ঠিত জীবনই ভালবাসে। কিন্তু কালে তাঁহারাও এই স্বাধীনতার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অবগুণ্ঠন উন্মোচনের পরও নারীরা মস্তকের চতুর্দ্দিকে রেসমী বস্ত্র জড়াইত। স্তাম্বুলের এক নৃত্যে নর্ত্তকীদের মস্তক হইতে ঐ রেসমীবস্ত্র কামালপাশা স্বহস্তে উন্মোচিত করিয়া দেন। তাহাতে বিশেষ সুফল দেখা গিয়াছিল। রমণীরা স্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ছাড়াও বিদেশে শিক্ষার্থ গমন করিতেছে; বর্ত্তমানে তিনজন তুর্কী রমণী ইংলণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু কৃষক রমণীগণের অবস্থা এখনও তেমন উন্নত হয় নাই, তাহারা এখনো মাঠে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এবং স্বামীর আজ্ঞা অবনত মস্তকে পালন করিতে বাধ্য।

কাফ্রিস্থানে বৈজ্ঞানিক অভিযান

আফগানিস্থানের সংলগ্ন সীমান্তপ্রদেশে কাফ্রিস্থান অবস্থিত। ঐ স্থানে আজও পৃথিবীর আদিমকালের মানব-মানবী তাহাদের আদিমকালের প্রকৃতি ও জীবনধারণের উপায় অবলম্বনে পৃথিবীবক্ষে বিচরণ করিতেছে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ কাফ্রিস্থানে এক বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরণ করিতেছেন। ভারতীয় জুলজিক্যাল সার্ভের পশু-তত্ত্ববিৎ ডাঃ বি এল্ চপ্‌রা ও মানবতত্ত্ববিৎ ডাঃ বি এস্ গুহ এই অভিযানের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত। নরওয়েবাসী Dr. Miegensterene-ও এই সঙ্গে থাকিবেন। ডাঃ চপ্‌রা ১৬০০০ ফিট উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে স্তন্যপায়ী জন্তু, পক্ষী ও পশুর নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং ডাঃ গুহ ইন্দোএরিয়ান্ কাফ্রিজাতির আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি লক্ষ্য করিবেন। এই অভিযানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সমস্তই সঙ্গে যাইবে। কাফ্রিদের নৃত্যের ছবি তুলিবার জন্য বায়স্কোপের যন্ত্রও সঙ্গে লওয়া হইবে। অভিযান-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কলিকাতা হইতে দরগাই যাইবেন, তথা হইতে ১৫০ মাইল পার্ব্বত্য গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া ১১০০ ফিট উচ্চ পথে যাইতে হইবে। এই পথ প্রায়ই চির তুষারে আচ্ছন্ন থাকে। দরগাই হইতে ইংরেজ সৈন্য এই অভিযানের রক্ষীরূপে গমন করিবে।

ভবিষ্যতে আকাশযান-পরিচালনা

আকাশযান-চালক নিজের ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা যন্ত্রের মধ্যে আকাশযানকে অভীষ্টপথে লইয়া যায়; কিন্তু বর্ত্তমানে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশে বিমানের নূতন বিস্ময়ের সূচনা মানবের কল্পনা-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে ভূতলে অবস্থিতি করিয়া বেতারের সাহায্যে চালকহীন আকাশযান পরিচালনা সম্ভব হইবে। প্রকাণ্ড ধাতু-নির্ম্মিত উড্ডীয়মান মৎস্য বিশাল শরীরের চতুর্দ্দিকে দেবরাজ ইন্দ্রের মত বহুসংখ্যক কাচ-নির্ম্মিত চক্ষু মেলিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইবে, আর যাহা ঐ মৎস্য দেখিবে, তাহা বেতারের সাহায্যে সহস্র মাইল দূরে ভূতলে অবস্থিত চালকের কক্ষে প্রতিফলিত হইবে ও চালক তদনুসারে ঐ আকাশযানকে সর্ব্বদিকে পরিচালিত করিবে। চালকের আদেশ, আকাশযান অবনত মস্তকে পালন করিবে, যেমন চালক যানের কল-ঘরে বসিয়া থাকিলে করিত। তাহা হইলে আর চালকের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বিশেষজ্ঞেরা আশা করেন, ভবিষ্যতে যুদ্ধও মানবহীন যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। মৃত্যুগর্ভ যন্ত্রসমূহ বিশাল গর্জ্জনে বসুধার বিপুল শান্তি ভঙ্গ করিয়া জলে, স্থলে ও শূন্যপথে ছুটিয়া যাইবে।

আকাশপথে দার্জ্জিলিং

কলিকাতা হইতে ছয় ঘণ্টায় আকাশপথে দার্জ্জিলিং যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী বাড়ী হইতে মোটর যোগে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া দমদম এরোড্রোমে পাঠাইয়া দেয়। তথা হইতে আকাশযানে দার্জ্জিলিং ছয় ঘণ্টায় পৌছাইয়া দেওয়া হয়। ভাড়া সিঙ্গেল—১১০৲ টাকা; যাতায়াত—২০০৲ টাকা। প্রত্যহ ৫-৩০ মিনিটের সময় দমদম হইতে আকাশযান ছাড়ে।

রেলওয়ে পাবলিসিটি

ভারতের রেলওয়ে বোর্ড ভ্রমণকারীদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। ই বি ও ই আই রেলওয়ে কম ভাড়ায় বহু স্থান বেড়াইবার সুবিধা করিয়া, ভাড়া হ্রাস করিয়া, তীর্থ স্থানাদির চিত্র স্থানে স্থানে মুদ্রিত করিয়া যাত্রী সংগ্রহের ও রেল কর্ত্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি কাঙ্গরা উপত্যকায় গ্রীষ্মাবাস প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং গ্রীষ্মকালে ঐ স্থানে যাত্রীগণের ভ্রমণের সুবিধা করিবার জন্য মিঃ ডসনকে প্রেরণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে যাহাতে বিদেশীয় পর্য্যটকগণ ভারতীয় রেলপথে ভ্রমণে আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। মিঃ পেটারসন্, লণ্ডনে তাঁহার প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া কানাডা ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে গমন করিয়াছেন। তথায় তিনি সমগ্র ভারতের রেলপথের সময়-তালিকা বিতরণ করিতেছেন; এতদ্ভিন্ন, সিনেমা, সংবাদপত্র, চিত্র বিতরণ, পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে পর্য্যটকগণকে ভারত-ভ্রমণে প্রলুব্ধ করিবার আয়োজন হইয়াছে।

মঙ্গলগ্রহে অভিযান

ওকল্যাণ্ড সিটির বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক ৩৪ বৎসর বয়স্ক মিঃ হার্ট মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার জন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন। তিনি বলেন এই যন্ত্র সাহায্যে পাঁচ মিনিটে মঙ্গলগ্রহে পৌছিয়া ফিরিয়া আসা চলিবে। তাঁহার এই যন্ত্র দেখিতে অনেকটা লাটিমের মত; তবে ইহার সূক্ষ্মাংশ উপরদিকে থাকিবে এবং তাহাতে মোটরের মত কল থাকিবে। কিন্তু তিনি তৈল বা পেট্রোল ব্যবহার করিবেন না। বিশ্বব্যাপী ব্যোমবক্ষ হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া আলোকের বেগে (মিনিটে ১৮০,০০০ হাজার মাইল) ৫ মিনিটে মঙ্গলগ্রহে উপস্থিত হইয়া তথাকার অধিবাসীর সহিত মোলাকাৎ করিয়া দোস্তি পাতাইবেন। তবে বায়ুহীন মঙ্গলগ্রহে বিচরণের জন্য অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ও অক্সিজেনের মুখোস প্রয়োজন হইতে পারে।

ভারতে তামাকের চাষ

ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে তামাকের চাষ হয় এবং এক কোটি পাউণ্ড শুষ্ক পাতা তোলা হইয়া থাকে। এই পাতা পৃথিবীর উৎপন্ন তামাকের শতকরা ২০ ভাগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যে উৎপন্নাংশের শতকরা ৯০ অংশ, কিন্তু তথাপি তামাকের ব্যবসায়ে ভারত বিশেষ পশ্চাৎপদ; এমন কি বিদেশ হইতে গত বৎসর ৩২ লক্ষ টাকার তামাক (পাতা) এবং ২৪০ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানি করা হইয়াছিল।

ইহার কারণ ভারতীয় তামাকের পাতা কৃষ্ণবর্ণ ও গন্ধ অত্যন্ত উগ্র; কাজেই পাইপের তামাকের জন্যও বিদেশে যে ভারতীয় তামাক রপ্তানী হইত, তাহাও কমিয়া আসিতেছে। ১৯২৫-২৬ সনে ৪৩০ লক্ষ পাউণ্ড, ২৬-২৭ সনে ২৯০ লক্ষ ও ২৭-২৮ সনে মাত্র ২৮০ লক্ষ পাউণ্ড পাতা রপ্তানি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে পুষা গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভার্জ্জিনিয়া তামাকের চাষের ব্যবস্থা চলিতেছে। সার দেওয়া, যাহাতে পাতায় পোকা না লাগে তাহার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিষ্পন্ন করা হইতেছে। গত বৎসরে উৎপন্ন ভার্জ্জিনিয়া তামাকের পাতা লণ্ডনের তামাক-বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; তাহাতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই পাতা সর্ব্বাংশে আমেরিকার পাতার সমতুল্য। কাজেই যদি ভারতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভার্জ্জিনিয়া তামাকের চাষ করা হয়, তবে বিদেশ হইতে যে টাকার তামাক আমদানি

হয় ; তাহা দেশে থাকিয়া যাইবে এবং রপ্তানী দ্বারা কিছু লাভ করাও চলিবে।

৫,৯০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে গ্যারেজ নির্ম্মাণ

রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ব্রিটিশ আর্কিটেক্‌ট্ সমিতির গ্যারেজ নির্ম্মাণের প্ল্যান প্রতিযোগিতায় মিঃ থমাস্ স্পেন্সার ৩৫০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্ল্যান অনুযায়ী গ্যারেজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ৫,৯০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। এই গ্যারেজ গৃহে ৭৫০ খানা গাড়ী রাখা চলিবে। এক মুহূর্ত্তের আজ্ঞায় সমস্ত গাড়ী যাহাতে বাহির হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রবেশ পথ ও নির্গমন পথ দুইটি রাস্তায় অবস্থিত; তাহাতে লোক চলাচল বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। মধ্য ভাগের একটি কক্ষ সমস্ত তলার সহিত টেলিফোনে সংযুক্ত করা হইবে, যাহাতে চুরি হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। সমস্ত গৃহ ছয়টি তলায় বিভক্ত; চালকের বিশ্রামাগার, স্নানাগার, চিঠিপত্র লেখার ঘর প্রভৃতিও বর্ত্তমান। লিফ্‌ট্ সাহায্যে গাড়ী নিম্নতল হইতে উচ্চ তলায় মেরামতের জন্য তোলা হইবে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-গবেষণা

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কৃষি-কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর যোধপুরের মহারাজা সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মহারাজা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার জন্য দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাহাতে কয়েকটি ছাত্রকে বৃত্তি দিবার ও লর্ড আরউইনের নামানুসারে অধ্যাপকের পদের নাম-করণের ব্যবস্থা ছিল। ভারতীয় কৃষি-বিষয়ক রাজকীয় কমিশন মহারাজার দানের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তৎপরে যোধপুরের মহারাণী ও অন্যান্য সর্দ্দারগণের নিকট হইতে আরও দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হওয়ায় এই কৃষি কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনোৎসব উপলক্ষে ভাইসচ্যান্সলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভাগসমূহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী যন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত থাকায় এবং সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্ত্তমান থাকায়, কৃষি-কলেজে গবেষণার বিশেষ সুবিধা হইবে।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী (Asiatic Society of Bengal) এর বার্ষিক অধিবেশনে ডাঃ ইউ, এন, মুখার্জ্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে তিনি এই সভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও উন্নতিসাধকদিগের কথা সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন ও গবেষণার পথ যে সুপ্রসারিত হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়িতরূপে স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং ইহা দ্বারা দেশের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যে সকল জ্ঞানানুরাগী ইংরেজ অক্লান্ত পরিশ্রমে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য রত্নভাণ্ডার হইতে দুর্ল্লভ রত্নরাজি আহরণ করার মানসে এই কীর্ত্তিসৌধ সংস্থাপন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন এদেশবাসী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারূপে স্যার উইলিয়ম জোন্সের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় এদেশে তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তিনি অতি সদাশয়, মধুর প্রকৃতি, মহনীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাবধারার প্রতি তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি নানা বিষয়ে ও নানা ভাষায় পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, ১৩টি ভাষাতে তাঁহার পূর্ণ অধিকার ছিল, এবং ২৮টি ভাষা তিনি ভালরূপে জানিতেন। এদেশে আসিয়া যে সকল ইংরেজ আশ্চর্য্য অভিনিবেশ ও ধৈর্য্য সহকারে সংস্কৃতের চর্চ্চা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের আদি পুরুষ। তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসার সহিত সংস্কৃত শিক্ষার প্রভাবে যে সকল মহামূল্য গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন তাহা ভারতবর্ষীয় ভাষা-সমূহ, সাহিত্য এবং দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করার এক নূতন দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

মূলে অপরাপর যে সকল ইংরেজ পণ্ডিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগণের নাম উল্লেখ্য—বঙ্গের প্রধান বিচারপতি চেম্বার, কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ হাইড, পলিটিকেল রেসিডেন্ট এণ্ডারসন, গবর্ণর জেনারেল সোর, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পার্শি ভাষার প্রথম অধ্যাপক গ্লাড্উইন, উইলকিন্স্ (ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান), বোম্বের গবর্ণর ডাঙ্কেন, লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্ট ব্রিষ্টো, বঙ্গীয় সার্ভে বিভাগের ব্যারো, সুপ্রিম কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পরে মাদ্রাজের গবর্ণর বার্লো। সোসাইটির প্রথম পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে ছিলেন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং তাৎকালিক ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সদস্যগণ। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এবং সুপ্রিম কাউন্সিলের সভ্যগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হন। ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ গঠিত হওয়ার পুর্ব্বে বাঙ্গালায় এই এসিয়াটিক সোসাইটি যথেষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিল। বঙ্গদেশে "কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসান" গঠিত হইলে, উহার প্রথম সভাপতি হেরিংটন এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী হন এবং ইনিই পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন। এই সময়ে বেইলি, উইলসন এবং প্রিন্‌সেপ সোসাইটির সদস্য ছিলেন।

সোসাইটির পূর্ব্বকালীয় প্রেসিডেন্টদিগের ভিতরে কোলব্রুকের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিন্টো ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ইনি তাহাতে একজন স্বাক্ষরকারী ছিলেন। ইনি লীলাবতীর গ্রন্থের এবং বীজগণিতের ও সংস্কৃত পাটিগণিত ও পরিমিতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহার সহিত ভারতবর্ষে, আরব দেশে ও ইটালীতে বীজগণিত ও পাটিগণিত প্রচলনের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছিল। ইহাতে হিন্দু ও আরবীয় সাহিত্যে লেখকের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা পাঠ করিলে প্রাচ্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ভিতর যে পরস্পর সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহার পরিশুদ্ধ বোধ জন্মে। আমেরিকার অ্যাণ্ডেস পর্ব্বতশ্রেণী হইতে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা যে অধিক এই তথ্য সর্ব্বপ্রথম তিনি নিজের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করেন; তাঁহার মতই পরবর্ত্তী কালে পণ্ডিতগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষের দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে সমুদয় মূল্যবান রচনা রাখিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য এদেশের লোক বংশপরম্পরা তাঁহার নাম স্মরণ করিবে। তিনি প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত ও এসিয়ার অপরাপর ভাষার হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সোসাইটির আর এক সদস্য প্রিন্সেপ একজন অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখক, রসায়নবিৎ পণ্ডিত এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার পদার্থ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ প্রাচ্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য তিনি যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা তুলনাহীন। তিনি সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণমালার আবিষ্কারক রূপে। তিনিই সোসাইটির "জর্ণেলের" উদ্‌ভাবয়িতা ও সম্পাদক ছিলেন। ইহাতে বহু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার লিখিত এক শতের অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গবেষণায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের হিন্দুযুগের, বৌদ্ধযুগের ও মুসলমান যুগের অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া গিয়াছে। তিনি ৪১ বৎসর বয়সেই পরলোক প্রাপ্ত হন। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নিকটে "প্রিন্সেপ ঘাট" নামে যে অতি সুন্দর একটি ঘাট রহিয়াছে তাহা লোকের নিকট আজও তাঁহার স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে।

সোসাইটির আর একজন স্বনাম প্রসিদ্ধ সভ্য ডাক্তার উইলসন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসা বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি "মেঘদূতে"র একখানি অতি চমৎকার অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহাতেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি আরও অনেক পুস্তক রচনা করেন; ইহার মধ্যে "হিন্দুদিগের নাট্যগ্রন্থ"

এবং "সংস্কৃত ইংরেজী অভিধান" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সাময়িক পত্রে এবং এসিয়াটিক, মেডিক্যেল ও ফিজিকেল সোসাইটিতে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ পুরাণ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়াও অবিশ্রান্তরূপে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন করিয়া বহু উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক সপ্তাহ মধ্যে তিনি ঋক্‌বেদের চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ এবং ম্যাক্সমুলারের বৈদিক সাহিত্যের সমালোচনা শেষ করেন। যাঁহাদের প্রতিভায় ও পরিশ্রমে প্রাচীন হিন্দু জাতির ইতিহাস ও সভ্যতা শিক্ষিত জগতের গোচরীভূত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার উইলসনের নাম অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বলিতে হইবে।

আমরা বৈদেশিক পণ্ডিতগণের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এসিয়াটিক সোসাইটির কথা বলিতে হইলে প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল সোসাইটির সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। যুবক অবস্থায় তিনি সহকারী সম্পাদক ও লাইব্রেরীয়ানরূপে সোসাটিতে প্রবেশ করিয়া ক্রমে অসামান্য শক্তি প্রভাবে তিনি ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি সোসাইটিতে প্রবেশ করিয়া নিজে যেমন তাঁহার অদম্য জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার মহাসুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন ও অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া তিনি ইউরোপের বুধমণ্ডলীর নিকটে বিশেষ পরিচিত ও যশস্বী ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির শতবর্ষের গবেষণা ও জ্ঞান চর্চ্চার ইতিহাস লিখিবার সময় উপস্থিত হইলে, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের উপর এই ভার অর্পণ করা হয়। তিনি সহর্ষে এই কার্য্য গ্রহণ করেন এবং অতি প্রশংসনীয়রূপে ইহা সম্পাদন করেন। বলিতে আনন্দ হয়, লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির শত বর্ষের ইতিহাস যে রচিত হইয়াছে তাহা ডাক্তার মিত্রের উক্ত পুস্তকখানাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই লেখা হইয়াছে।

আধুনিক কালে যাঁহারা সোসাইটির সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্রতিভা-ভাস্কর স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পনের বার সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চারি বার ইহার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক বৎসর সোসাইটির সকল কমিটীতেই সদস্য ছিলেন। তিনি ৩৮ বৎসর কাল সোসাইটির সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। শিক্ষা-সমাচার

গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় ছাত্র

লণ্ডন শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্ট

১৯২৭-২৮ সনে লণ্ডনের শিক্ষা বিভাগের কার্য্য কিরূপ চলিয়াছে তৎসম্বন্ধে হাই কমিশনারের সেক্রেটারী ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে এদেশবাসীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। আজকাল ভারতবর্ষীয় যুবকগণ অধ্যয়ন পরিচালনার্থ বহুসংখ্যায় বিলাতে যাইতেছে যে, তথায় অনেকেরই নানা কারণে শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। এ সম্বন্ধে এদেশের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইতি পূর্ব্বেই ইউরোপে ও ইংলণ্ডে যাইয়া তথায় ভারতীয় ছাত্রদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তদ্দেশে ছেলে পাঠাইবার পূর্ব্বে এদেশীয় পিতামাতা ও অভিভাবকদিগকে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সম্প্রতি লণ্ডন শিক্ষা বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতেও উক্ত বিষয়ে এদেশের অভিভাবক ও পিতামাতাদিগের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে। উক্ত রিপোর্ট হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, যে সকল ভারতীয় ছাত্র এখন গ্রেট ব্রিটেনে অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদের সংখ্যা আঠার শতের কম হইবে না। দুঃখের বিষয়, কত ছাত্র এদেশ হইতে গ্রেট ব্রিটেনে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইয়া এখন অধ্যয়ন করিতেছে তাহার সঠিক বিবরণ লেখক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

রিপোর্টে উক্ত হইয়াছে, গত চারি বৎসরে ইয়োরোপে অধ্যয়নকারী ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া

গিয়াছে। হাই কমিশনারের নেতৃত্বাধীন শিক্ষা বিভাগ হইতে ইহাদের জন্য যত প্রকার সুবিধা করিয়া দিবার দেওয়া হইয়াছে। হাই কমিশনার স্যার অতুল চাটার্জ্জি এই মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতীয় ছাত্রেরা এখন আর গ্রেট ব্রিটেনের কেবল কয়েকটি মাত্র শিক্ষা-কেন্দ্রে জড় হইয়া থাকে না, পরন্তু গ্রেট ব্রিটেনের নানা স্থানে যত প্রধান প্রধান ব্যবসা ও শিক্ষার মন্দির আছে তাহার সকল স্থলেই এখন ইহাদিগকে পাওয়া যায়। ছাত্রদের শিক্ষার বিষয় এবং পরিধিও ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রই ইংলণ্ডে যাইয়া আইন শিক্ষায় নিযুক্ত হইত, আইনশিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন পর্য্যন্তও না কমিয়া থাকিলেও ভবিষ্যতে কমিবে বলিয়াই আশা করা যায়, কারণ ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রাপ্ত আইন ব্যবসায়ীরা এখন ভারতবর্ষের আদালতে একই প্রকার মর্য্যাদা ও ক্ষমতা উপভোগ করে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার দিকে ভারতীয় ছাত্রদের ঝোঁক যথেষ্ট দেখা যাইতেছে। গ্রেট্ ব্রিটেনের বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০ এর অধিক ভারতীয় ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় ব্যাপৃত আছে বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধার অভাব ভারতবর্ষে এখনও রহিয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের ব্রিটিশ কারখানায় যাইয়া ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করিতে নানা প্রকারে বেগ পাইতে হয়, কারণ কারখানার মালিকেরা অনেক সময়েই জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী গোপনীয় বলিয়া তাহা ভারতীয় ছাত্রদিগকে শিখাইতে চাহে না। ভারতীয় ছাত্রেরা অধিকাংশই স্বচ্ছল অবস্থার নয়; ইহারা ব্যবসা শিক্ষার জন্য কারখানার মালিকদিগকে দক্ষিণা দেওয়াটা বড় ক্লেশকর বোধ করে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ইলেট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী যে সকল ছাত্র বড় বড় কারখানায় প্রবেশ করিবার পথ পায় না তাহারা ক্ষুদ্রতর কারখানায় যাহাতে কাজ শিক্ষা করিতে পারে, হাই কমিশনার মহোদয় তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় অভিভাবক ও পিতামাতাকে গ্রেট ব্রিটেনে ছেলে পাঠান সম্বন্ধে রিপোর্টলেখক বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। অনেকেই উপযুক্তরূপ চিন্তা ও অনুসন্ধান না করিয়া অথবা প্রস্তুত না হইয়া ছেলে পাঠাইয়া থাকেন, ইহার ফল অনেক সময়েই বড় শোচনীয় হয়। রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে,—"হাই কমিশনারের কর্ত্তৃত্বাধীন শিক্ষা বিভাগকে অনেক সময়েই এইরূপ ছাত্র সকলের গুরুতর পীড়ায় বিব্রত হইতে হয়, যাহাদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইলে বিলাতে যাওয়ার অনুমতি লাভই ঘটিত না। অনেক সময়ে এমন সকল যুবককে সাহায্য করিতে হয় যাহারা নিঃস্ব অবস্থায় নিপতিত অথবা কোন ভোজনালয়ে বা আমোদ-প্রমোদের স্থানে কার্য্য করিয়া অনিশ্চিত ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে; আবার অনেক ভারতবর্ষীয় যুবককে ঘৃণিত নৈতিক অধঃপতন অথবা কুসঙ্গীদের ছল-চাতুরী হইতে উদ্ধার করিতে হয়।" রিপোর্টলেখক এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বারম্বার সতর্কীকরণ সত্ত্বেও অনেক ছাত্রই এখনও উপযুক্তরূপ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ-সংস্থান ও নৈতিক বল ছাড়াই দীর্ঘকালের জন্য এত দূরবর্ত্তী দেশে (গ্রেট ব্রিটেনে) চলিয়া যায়। বিদেশে যাইয়া ভারতীয় যুবকেরা নানাপ্রকার প্রলোভনে পড়ে, এবং অনেক সময়ে অভিভাবকদের দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত টাকার অসদ্ব্যবহার করে। আমরাও বলি, অভিভাবকেরা ধীর স্থির ভাবে নানা দিক্ চিন্তা করিয়া ইয়োরোপে ছেলে পাঠাইবেন। দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলেন, ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগের জন্য বৎসর ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়, তাহা ছাত্রেরা দেশে থাকিলে বাঁচিয়া যাইতে পারে, এবং সেই টাকাতে বিভিন্ন বিষয়ের উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভার্থ এই ভারতবর্ষেই প্রতিবৎসর এক একটি করিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহা একটা অনুপেক্ষনীয় গভীর আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষা-সমাচার

ইংরেজের চিত্র-ভবনের দ্বারে

লণ্ডন চিত্রশালার জন্মকথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিত্র-সংগ্রাহক জন জুলিয়াস্ অ্যাঙ্গারষ্টীন **১৮২৩ খৃষ্টাব্দে** ৮৮ বৎসর বয়সে ইহলীলা **সম্বরণ করেন।** **সার জর্জ্জ** বোমাণ্ট তখন ভাবিলেন যে, **চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ** উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্যোগে, **১৮২৪ সনের ২৩শে মার্চ্চ** প্রধান মন্ত্রী লর্ড **লিভারপুল অ্যাঙ্গারষ্টীনের সমুদয়** চিত্র ক্রয় করিলেন। পার্ল্যামেণ্ট **এই উদ্দেশ্যে ৫৭,০০০** পাউণ্ড বা ৮,৫৫,০০০৲ টাকা দেন। **চিত্রশালার নাম** হইল "বৃটিশ ন্যাশনাল গ্যালারি অব্ পিক্‌চারস্" **বা** ইংরেজের জাতীয় চিত্র-ভবন। পেল মেলে অ্যাঙ্গারষ্টীন গৃহে ৩৮ খানা চিত্র লইয়া এই চিত্রভবনের **দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়।** আর আজ ট্রাফালগার স্কোয়ারে **সুন্দর ও সুসজ্জিত গৃহে ৪,০০০** চিত্র রহিয়াছে। অ্যাঙ্গারষ্টীনের **কয়েকটি** বিখ্যাত ছবির নাম দেওয়া যাইতেছে :— **ভিনাস ও অ্যাডোনিস্,** রুবেন্‌স্, স্যাবাইন্‌স্ হরণ, রোম্‌ব্র্যাণ্ডের রাখালদের পূজা। উপরে সার জর্জ্জ বোমাণ্টের **নাম করা হইয়াছে।** তিনি চিত্রভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াই **ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার** নিজের সংগৃহীত বহু ছবিও দান করিয়াছিলেন।

ইহার পর ২০ বৎসরের মধ্যে এই চিত্রশালার বিশেষ **কিছু উন্নতি হয় নাই।** শুধু ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাষ্টিরা টিশিয়ান **অঙ্কিত সবিশেষ প্রসিদ্ধ** "ব্যাকাস্ ও আরিয়াদনের ছবি **কিনিয়াছিলেন। ১৮৩৮** সনে এই চিত্রভবনকে ট্রাফল্‌গার **স্কোয়ারে স্থানান্তরিত করা হয়** ও ১৮৪৪ সনের মধ্যে কতকগুলি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ ও তৎপর

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস্ ঈষ্টলেক ন্যাশনাল গ্যালারির **অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার** পর হইতে ইহার চিত্র সংখ্যা দ্রুতবেগে **বৃদ্ধি পাইতে থাকে।** তিনি ইতালিয়ান্ চিত্রকরদের চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। তাঁহার পরিশ্রমের ফলে **১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের** মধ্যে **২৮টি** নামজাদা ছবি কিনা হয় মাত্র **৭,০৩৫** পাউণ্ডে বা ১,০৫,৫২৫৲ টাকায়। কয়েকটির নাম "সান্ রোমানের পলায়ন", "ম্যাডোনা", "হেলেন হরণ", বটিচেলির "**ম্যাজির** পূজা"। এক্ষণে প্রত্যেকটি ছবির দাম **৭,০৩৫** পাউণ্ডের উপর। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জে এম্ ডব্লিউ টার্ণার নামক বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর মৃত্যুকালে তাঁহার **শতাধিক তৈলচিত্র** ও প্রায় দুই হাজার জল-চিত্র দান করিয়া যান। **তাঁহার** সর্ত্ত ছিল যে তাঁহার অঙ্কিত "ডিডো **কার্থেজ** নির্ম্মাণ করিতেছেন" ও "কুয়াশার ভিতর দিয়া সূর্য্যোদয় হইতেছে" ছবি দুই খানা চিরকাল ক্লডের **শ্রেষ্ঠ** ছবি দুখানির পাশে ঝুলাইয়া রাখা হইবে। **ঈষ্টলেক** এই ছবিগুলির যথোচিত ব্যবস্থা করেন।

ওলন্দাজ চিত্রকরদের পালা

ঈষ্টলেক ছিলেন ইতালিয়ান্ চিত্রের ভক্ত। তাঁহার পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ সার উইলিয়াম বক্সাল ওলন্দাজ রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি **৭৫,০০০** পাউণ্ড বা ১১,২৫,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া **প্রধান** মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে দিয়া "পীল সংগ্রহ" ক্রয় **করান।** এইরূপে **৭৮টি** ছবি সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি অতি **সুন্দর প্রাকৃতিক** দৃশ্যের চিত্রও আছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রয়্যাল একাডেমি ন্যাশানাল গ্যালারির **পূর্ব্ব প্রান্তে** যুক্ত ছিল। গ্যালারির ছবি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ স্থানের অসঙ্কুলান হইতে লাগিল। **সুতরাং** ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল একাডেমি বার্লিংটন হাউসে উঠিয়া গেল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আরও একটি বিভাগ যোগ করা হয়। ১৯১১ সনে পশ্চিম দিকে **৫টি নূতন** গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই বর্ণনা হইতে চিত্রভবনের **প্রসারটা কল্পনা** করা **সম্ভব** হইবে।

মূল্যবান্ ও প্রাচীন ছবি

বস্বালের পর সার ফ্রেডারিক বার্টনের নজর থাকে দামী দামী ছবি কিনিবার দিকে। তিনি ডিউক অব্ মার্ল্‌বরোর নিকট হইতে ৮৭,৫০০ পাউণ্ডে বা ১৩,১২,৫০০৲ টাকায় র‍্যাফেলের "ম্যাডোনা" ও ভ্যান ডাইকের "প্রথম চার্লস" ক্রয় করেন। তারপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি ৫৫,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া লংফোর্ড ক্যাস্‌ল হইতে তিনটি সুপ্রসিদ্ধ চিত্র ক্রয় করিয়া বিলাতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বার্টন ২০ বৎসরে অসংখ্য নূতন ও ভাল ছবি জোগাড় করেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী অধ্যক্ষের নাম সার এড্‌ওয়ার্ড পয়েণ্টার। ইনি প্রাচীন ছবি কিনিতে ভালবাসিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আঁকা ছবি তাঁহার সময়ে ক্রয় করা হইয়াছিল। জন্তু-জানোয়ারের ছবিও তিনি সংগ্রহ করেন।

সার চার্লস হলরয়ড অল্পদিন ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার সময়ে ১৯০৩ সনে ন্যাশনাল আর্টস্ কলেকশন ফাণ্ডের সৃষ্টি হয়, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে দান গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল।

ফরাসী চিত্রের মোহ

ইহার পর ডিরেক্টার সার চার্লস হোম্‌সের আমলে যখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সময়েও তিনি প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাল ভাল ফরাসী চিত্র কিনিবার জন্য প্ররোচিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংরেজের ন্যাশনাল গ্যালারি গৌরবের বস্তু। ইহার চিত্তাকর্ষণ-ক্ষমতা ও শিক্ষা-প্রদান-শক্তি অতুলনীয়। ভিন্ন ভিন্ন চিত্র-পদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করিবার পক্ষে লণ্ডনের এই সংগ্রহশালার মত স্থান জগতে বিরল। ইংরেজদের নিজেদের আঁকা সমস্ত বিখ্যাত ছবি এই গ্যালারিতে পারম্পর্য্য ক্রমে সাজান রহিয়াছে।

বড় বড় লোকের ছবি

ন্যাশানাল গ্যালারির সম্মুখে সেণ্ট মার্টিন প্লেসে ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারি বা ইংরেজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদের চিত্র ভবন রহিয়াছে। বৃটিশ ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চিত্র রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই চিত্রশালা স্থাপিত হয়। এখানে রাজা রাজড়াদের ছবি আছেই, তাহা ছাড়া ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ও কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ইত্যাদিও আছেন। কেহ কেহ নিজের ছবিও আঁকিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতেও এই চিত্রশালার চিত্রসমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এক বৃহৎ প্রদর্শনী বসে। সেই প্রদর্শনী হইতেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মার্লবরো হাউসে কারু-শিল্প-কলার মিউজিয়ামের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল "যে সব শিল্প বা বৃত্তি অলঙ্করণ বা সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির সহায়ক সেগুলির মডেল তৈরী বা উন্নতির সাহায্য করা"। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শিপশ্যাঙ্কস্ সংগ্রহাবলী পাওয়ার ফলে ইহা দক্ষিণ কেনসিংটনে লইয়া আসা হয় ও তাহার পর বহু বৎসর ধরিয়া কেন্‌সিংটন মিউজিয়াম নামে পরিচিত হইতে থাকে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নির্দ্দেশ অনুসারে বর্ত্তমান প্রশস্ত ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ও ইহার নাম ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম রাখা হয়।

এই মিউজিয়ামে নিম্নলিখিত আটটি বিভাগ আছে :— (১) চিত্রাঙ্কন, (২) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, (৩) খোদাই, (৪) কাঠের কাজ, (৫) আস্‌বাব, (৬) জোন্‌স সংগ্রহাবলি (৭) ওয়ালেস্ সংগ্রহাবলি, (৮) পিরিয়ড রুম্‌স্ (Period Rooms)।

ভিন্ন ভিন্ন ভাগের নামগুলি হইতেই বুঝা যাইবে যে সমগ্র মিউজিয়ামটিকে কিরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজান হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিভাগের ইতিহাস লইয়া গবেষণা করিতে চায় সে এখানে সেই বিভাগের প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। সুকুমার কলা বা শিল্পের ইতিহাস আয়ত্ত করিবার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের এই স্থানকে তীর্থস্বরূপ বিবেচনা

করা উচিত। জোন্‌স্ কলেকশন বা জোন্‌স্ কর্তৃক সংগৃহীত চিত্রাবলী মিউজিয়ামের ভিতরে একটা ছোট খাট মিউজিয়াম বিশেষ—৫টা কুঠ্‌রী ইহার জন্য লাগিয়াছে; ফরাসী দেশীয় আসবাব্ ইত্যাদিতে পূর্ণ করা হইয়াছে। ওয়ালেস সংগ্রহাবলিও ফরাসী শিল্পে পরিপূর্ণ ও জোন্‌স্ সংগ্রহাবলির তুল্যমূল্য। পিরিয়ড্ রুম গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রচলিত কলা ও কারু-শিল্পের নিদর্শনসমূহ রক্ষিত হইয়াছে। এক হিসাবে ইহাকে কাঠের কাজ বিভাগের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

মিলব্যাঙ্কের টেট্ গ্যালারি

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সার হেন্‌রি টেট্ এই গ্যালারি নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৯০ হাজার পাউণ্ড ও ৬৫টি ইংরেজ অঙ্কিত চিত্র দান করেন। তাহা হইতেই এই গ্যালারির উৎপত্তি হয়। ইহা সাধারণতঃ "বৃটিশ জাতীয় কলা ভবন" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা মিলব্যাঙ্কে অবস্থিত।

এখানে পুরাতন ছবিও আছে। আগেই বলা হইয়াছে যে ট্রাফালগার স্কোয়ারে ইংরেজদের অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রাবলী শোভা পাইতেছে। এখানেও কিছু কিছু আছে। রেনল্ডস্, গেইন্‌স্‌বরো, রম্‌নে, হপ্‌নার, লরেন্স, রিচার্ড উইলসন, ক্রোম, কটম্যান, কনষ্ট্যাব্‌ল, টার্ণার প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকরগণের চিত্র উভয় স্থানেই দেখা যাইবে। কিন্তু কবি-চিত্রকর উইলিয়াম ব্লেকের ও রূপক চিত্রকর জর্জ্জ ফ্রেডারিক ওয়াটসের ও আলফ্রেড্ ষ্টেভেন্‌সের অঙ্কিত ছবি শুধু এখানেই পাওয়া যাইবে। ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন, হলম্যান হাণ্ট, রসেটি, সার জন মিলেইস্, বার্ণ জোন্‌স, লর্ড লাইটন, আল্‌মা টাডেমা, ব্রিটন রিভিয়েরে, হুইস্‌লার প্রভৃতির ছবি আজকাল লোকের কাছে আদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু জীবিতকালে ইঁহাদের কেহ কেহ জনসাধারণের নিকট উপেক্ষিত ছিলেন। সেই জন্য টেট গ্যালারিতে চিত্র মনোনয়নের জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। আধুনিক চিত্রকরদের অঙ্কিত ভাল ছবি প্রায় সবই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কালে কোন্‌টা টিকিবে কেহ বলিতে পারে না। যেটা স্থায়ী হইবে না সেটাকে পরে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বিদেশী চিত্রের সংগ্রহাবলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মিল্‌ব্যাঙ্কে আধুনিক বৃটিশ চিত্রাবলীর কাছে আধুনিক বিদেশী চিত্রাবলি সাজাইবার জন্য কতকগুলি গৃহ কাজে লাগান হইয়াছে।

ইংরেজের সৌন্দর্য্য-পিপাসা

ইংরেজকে আমরা শুধু বণিকের জাতি বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইংরেজের সৌন্দর্য্য-পিপাসা কত প্রবল তাহা এখানে আসিলে প্রতি পদে বুঝা যায়। নিজের বাড়ী ঘর সুন্দর ও সুসজ্জিত রাখিবার প্রয়াস ত আছেই। তাহা ছাড়া সৌন্দর্য্যের সকল রকম উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভূমিকে সাজাইবার ইচ্ছাও ইহাদের অত্যন্ত প্রবল। ফুল ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে ও ফুলগাছ সযত্নে পালন করিয়া থাকে। তারপর, এই চিত্রশালাগুলি সৌন্দর্য্যের আকর বিশেষ। এগুলি চোখের ও মনের অসীম তৃপ্তিদায়ক ত বটেই, শিক্ষাদায়কও বটে।

আরও একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। লণ্ডনের প্রত্যেক চিত্রশালার পশ্চাতে বহু বৎসরের পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় রহিয়াছে। রুচি কতখানি উন্নত হইলে মানুষ কোন প্রকার আর্থিক লাভের আশা না করিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠানে টাকা খরচ করিতে পারে, তাহা আমাদের দেশের প্রত্যেক মার্জ্জিত-রুচি ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। লণ্ডনের চিত্রশালাগুলি লণ্ডনের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু এই গৌরবের সহিত জড়িত হইয়াছে ইংরেজে আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবার ও উদ্বুদ্ধ হইবার ক্ষমতা। এইটুকু শিক্ষা লাভ করিবার জন্যও একবার লণ্ডনে আসা আবশ্যক।

মোসাফের্

জাতীয় সংবাদ

শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশন

বিগত ২৭শে এপ্রিল শনিবার বেলা ৬৷৷ ঘটিকার সময় অ্যালবার্ট হলে শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের দশম বার্ষিক অধিবেশন-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, রায় শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপদ দত্ত বি এল্, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কনকচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দত্ত বি এল্, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ বি এল্, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জীবনভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। খ্যাতনামা অ্যাটর্ণি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটবরচন্দ্র দত্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক রচনা প্রতিযোগিতার ও ব্যায়াম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পদক ও শীল্ড্ এবং অন্যান্য পারিতোষিক বিতরিত হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইন্‌ষ্টিটিউটের উপযোগিতা এবং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় সভ্যগণকে যথাযথ উপদেশাদি প্রদান করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীযুক্ত ননীচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক ব্যঙ্গাভিনয়, শ্রীযুক্ত রতিবিলাস মিত্র কর্ত্তৃক কৌতুকাভিনয়, শ্রীযুক্ত শিবচরণ দত্ত কর্ত্তৃক সরদ বাদন এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। অর্ফিক্ মিউজিক্ ক্লাবের সভ্যগণ ঐক্যতান বাদনের দ্বারা সভাস্থ ভদ্রমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

শোক সংবাদ

আমরা আন্তরিক দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শান্তিপুর সুবর্ণবণিক্ সমাজের শ্রীযুক্ত মনমোহন দে মহাশয় গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ১০ ঘটিকায় ৫১ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি উৎসাহী, স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শরীর নীরোগ ছিল; মৃত্যুকালে প্রায় এক মাস যাবৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সরল অন্তঃকরণ, দয়ালুচিত্ত ও নির্ব্বিবাদ ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইতেন। তাঁহার ন্যায় দেব ও দ্বিজে প্রগাঢ় ভক্তি খুব কম সংখ্যক লোকেরই দেখা যায়। তিনি ধনবান হইলেও দরিদ্রবেশে থাকিতে ও দরিদ্র ব্যক্তির সহিত মিশিতে কখনও দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব-সুলভ অমায়িকতায় ও মহানুভবতায় তিনি জনসমাজে চিরপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন কর্ম্মকুশল জননায়কের মৃত্যুতে শান্তিপুর সুবর্ণবণিক্ সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর দিবস অর্থাৎ ১১ই জ্যৈষ্ঠ শান্তিপুর সোনাপটীর প্রত্যেক দোকানদার মৃত মহাত্মার আত্মার শান্তি কামনার জন্য তাঁহাদের দোকান বন্ধ রাখিয়াছিলেন। আমরা "মনমোহন" বাবুর স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ

গত ১৭ই বৈশাখ বিক্রমপুর তাজপুর গ্রাম নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন দত্তের পুত্র শ্রীমান্ সত্যকিশোর দত্তের সহিত ঢাকা চৌধুরীবাজার নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রেণীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহে বরপক্ষ কন্যা

পক্ষ হইতে পণ গ্রহণ করেন নাই এবং শোভাযাত্রা প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বর সর্ব্বথা বর্জ্জন করা হইয়াছে। বিক্রমপুরবাসী কতিপয় যুবকের চেষ্টায় ও উৎসাহে উক্ত বিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

'সুবর্ণবণিক্গণের বৈশ্যাচারে'র উত্তর

৩১৯ নং আপার চিৎপুর রোড, বটতলা কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সুবর্ণবণিক্ সমাচারে' সুবর্ণবণিক্গণের বৈশ্যাচার সম্বন্ধে একাদশটী প্রশ্ন করিয়াছেন, তদুত্তরে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। সুবর্ণবণিক্গণ জল আচরণীয় হইবার পূর্ব্বে উপবীত ধারণ পূর্ব্বক বৈশ্য সাজিলে হিন্দু সমাজে মান্য ও উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন কি না এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বৈশ্য জাতি হইতে পতিত হওয়ায় পুনরায় বৈশ্যাচার গ্রহণার্থ উপবীত ধারণ করিলেও বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের একদিনে জলাচরণীয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ জাতি বিষয়ে সমাজে উন্নয়ন বা অবনয়ন রাজশক্তির তদভাবে জনমতের সাহায্য সাপেক্ষ। রাজশক্তি দ্বারা বৈশ্য সুবর্ণবণিকের অধঃপতন সাধিত হইয়াছিল, আবার যদি কখন উহার উচ্চ জাতিতে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে সে কেবল রাজ-শক্তি বা জনমতের সাহায্যে। জাতি ও ধর্ম্মে বর্ত্তমান রাজ-শক্তি নিরপেক্ষ, সুতরাং এ দিক্ হইতে প্রতিকার হইবার আশা নাই। জনমত এখনও ততটা উদার নয় যে, প্রস্তাব করিবা মাত্র সুফল ফলিতে পারে, তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন সুবর্ণবণিক্গণের জলাচরণীয় হইবার দাবী অগ্রাহ্য থাকিবে না।

২। সুবর্ণবণিক্গণ আপনাদিগকে জলাচরণীয় করিয়া লইতে না পারিলে উপস্থিত যেরূপ আছেন সেইরূপ না থাকিয়া গত্যন্তর নাই। হাজার পৈতা পর, টিকি রাখ, তুলসী মালা ধারণ কর ভবি তাহাতে ভুলিবার নহে।

৩। কোন সুবর্ণবণিক্ যদি বৈশ্যধর্ম্ম পালনার্থ বৈশ্যোচিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করেন তবে তিনি শাস্ত্র সম্মত পদ্ধতির অনুসরণ অবশ্যই করিবেন, অন্যথায় নিন্দার্হ হইবেন।

৪। সুবর্ণবণিক্গণের বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণ করিতে হইলে কুলগুরু ও কুলপুরোহিত মহাশয়দিগের মত লওয়া আবশ্যক নিশ্চয়; কিন্তু তাঁহাদের অনুকুল মত দুষ্প্রাপ্য নহে। প্রথমতঃ কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, শেষ পর্য্যন্ত যে তাঁহাদের সে আপত্তি টিকিবে না তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। কারণ শিষ্য ও যজমানের মতের বিরোধী হওয়া একালের গুরু ও পুরোহিতের বাঞ্ছনীয় নহে।

৫। সুবর্ণবণিক্ জাতির কুলগুরু এবং কুলপুরোহিত মহাশয়দিগকে একত্র আহ্বান করিয়া উপবীত ধারণের মত লওয়াও আবশ্যক, কিন্তু তাহাতেও যে সুবর্ণবণিকের বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকিবে এরূপ বোধ হয় না।

৬। সুবর্ণবণিক্গণের বৈশ্য হইয়া উপবীত ধারণ করা সম্বন্ধে সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত গ্রহণ করা যদি উচিত বিবেচনা করা হয়, তবেই গোলে পড়িতে হয়। কারণ এখনও আমাদের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের হস্তে সমাজ রক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বর্ত্তমান কালোপযোগী উদার নীতি অবলম্বন করিলেও অধিকাংশ পণ্ডিত রক্ষণশীল-দলভুক্ত, তাঁহারা পূর্ব্বতন প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিতে কিছুতেই রাজী হইবেন না। সুতরাং সুবর্ণবণিকের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত গ্রহণান্তর উপবীত ধারণ সুদূরপরাহত।

৭। সুবর্ণবণিক্গণ জাতীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে সাধারণ ব্রাহ্মণগণের সহিত চল করিয়া লইবার ব্যবস্থা করাইয়া পরে নিজেদের উপবীত ধারণ করিয়া বৈশ্য হইতে চেষ্টা করা উচিত কিনা এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ পতিত জাতির যাজক ব্রাহ্মণও পতিত। পতিত জাতি যদি কখনও উচ্চ জাতির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় তবে উহার যাজক ব্রাহ্মণও আপনা হইতেই চল হইতে পারিবেন, সেজন্য পূর্ব্বাহ্নে কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে না।

৮। সুবর্ণবণিক্গণ জলাচরণীয় না হইয়া উপবীত ধারণ

করিলে যে সকল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির নিকট তাঁহারা হেয়, তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা সম্ভব নয় বরং তাঁহাদিগের নিকট ঠাট্টা বিদ্রূপভাগী হইবেন। সুবর্ণবণিক্‌গণ জলাচরণীয় হইতে পারিলে সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ সুবর্ণবণিকের দান ও সেবা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। কিন্তু জলাচরণীয় করিবে কে? সুবর্ণবণিকের বৈশ্যোচিত উপবীত ও আচার ব্যবহার কখনও উহাদের সমাজে জলাচরণীয় করিতে সক্ষম হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান কালে একমাত্র জনমত সুবর্ণবণিক্‌জাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়া দিতে পারে, কিন্তু ঐ জনমত নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিনায়ক বর্ত্তমান কালে কেহই নাই। তবে একেবারে হতাশ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ভগবানের কৃপায় হিন্দু সমাজে জাত্যভিমানের উন্নত শির ক্রমশঃ ভূতলশায়ী হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সত্বর এমন একদিন আসিবে যখন সুবর্ণবণিক্ কেন, বঙ্গের সমস্ত পতিত জাতি বিশাল হিন্দু সমাজে সমাদরে গৃহীত হইবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না, সে দিনের অপেক্ষায় সকলকে বসিয়া থাকিতে হইবে।

৯। যদি হিন্দু সমাজ সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তবে রাজকীয় সেন্‌সাস রিপোর্টে রাজা উহাকে বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন।

১০। রাজা বল্লাল সেন সুবর্ণবণিক্ জাতিকে বৈশ্য হইতে শূদ্রে পরিণত করিবার পর আজ প্রায় ৮০০ বৎসর যাবৎ এই জাতীয় বণিক্‌গণ নানা নিগ্রহের ভিতর দিয়া গমন করিয়াও স্ব স্ব বৈশ্যত্বের আচার ব্যবহারের একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়েন নাই। এখনও অধিকাংশ সুবর্ণ-বণিক্ দোকানী, পসারী, ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী ও কুসীদজীবী থাকিয়া বৈশ্যত্বের পরিচয় দিতেছেন। অল্প সংখ্যক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী সুবর্ণবণিক্ যে চাকুরীজীবি হইয়া অধুনা বৈশ্যাচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন তাহা কেবল যুগ-মাহাত্ম্যে; এই জীবিকা-সঙ্কটের দিনে কেবল সুবর্ণবণিক্ কেন, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে বর্ণ ও জাতিগত আচার ব্যবহারের অভাব দেখা যায়। বৈদিক যুগে যে উদ্দেশ্যে চতুর্বর্ণ গঠিত হইয়া তাহাদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল তাহা যে সব যুগে চলিতে পারে না ইহার সাক্ষ্য ইতিহাস প্রদান করে। অতএব সুবর্ণবণিক্ বর্ত্তমান কালে বৈদিক যুগের খাঁটি বৈশ্য সাজিলে যে হিন্দু সমাজে আদৃত বা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন, সে আশা দুরাশা মাত্র।

১১। সুবর্ণবণিক্ শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের হস্তের অন্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া সুবর্ণ-বণিক্ জাতি অন্যান্য বাঙ্গালী জাতির নিকট হেয় নয় ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও সুবর্ণবণিকের জলাচরণীয় হইবার পক্ষে এই সার্টিফিকেট যথেষ্ট নয়। যদি তাই হইত তবে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সুবর্ণবণিকের সে সৌভাগ্যের উদয় হইত। এখনও বহুজনপূর্ণ নগর হইতে সুদূর নির্জ্জন পল্লী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আজ সুবর্ণবণিক্ অনাদৃত। আমার কোন এক উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বন্ধু আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণকালে বলিয়াছিলেন—"তোমরা নাকি পোদ্দারের জাতি আমাদের দেশে পোদ্দারের জাতির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি না, তবে ভাই, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আমার কোন আপত্তি নাই।" সুবর্ণবণিক্‌কে জলাচরণীয় হইতে হইলে শাস্ত্রীয় তর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক বৃথা বাক্ বিতণ্ডায় কালক্ষেপ না করিয়া অন্য জাতির সহিত সৌহার্দ্দ রাখিয়া চলা উচিত। ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন বা নাই করুন তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়া নিমন্ত্রণাদি দ্বারা তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। প্রার্থনা সব সময় অপূর্ণ থাকে না। কখন না কখন এমন সময় ঘটে অপ্রত্যাশিত রূপে প্রার্থনা পূর্ণ হয়। কাল প্রভাবে সুবর্ণবণিক্ জলাচরণীয় হইবার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। অচিরে আশা ফলবতী হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক
কাঁথি, মেদিনীপুর

সমালোচনা

শ্রীসুধাকান্ত দে এম্, এ, বি এল্

জন্মশাসন*

১। ম্যালথাসের কীর্ত্তি

"জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।" এই তত্ত্বে ভক্তিবাদ কতটা প্রচারিত হইয়াছে, জানি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা কাপুরুষের মত কথা।

প্রথমতঃ, জীবের সঙ্গে আহারের সম্বন্ধটা যে ঘনিষ্ঠ, তা মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই বুঝিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে জীবন-সংগ্রাম ডাল-ভাত-কাপড়-চোপড়-কোঠাবাড়ী-গাড়ী-জুড়ি ইত্যাদির জন্য সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয়। এই সংগ্রাম অহরহ চলিতেছে। কিন্তু সংগ্রাম কেন? এ প্রশ্ন আমাদের মনে উঠা স্বাভাবিক। ম্যালথাসের মনেও উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রশ্নটাকে ধামাচাপা না দিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে উহার সমাধানের পথ খুঁজিয়াছিলেন। ফলে তাঁর কাছে এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল যে, মানুষের উৎপাদন ও আহরণ শক্তি তার প্রজনন শক্তির চেয়ে অনেক খাট। অর্থাৎ খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের ভাবনা মানুষের চিত্তকে যতই আকুল করুক্ না, সে কল্যকার ভাবনা না ভাবিয়া স্বচ্ছন্দ মনে বেশ তাড়াতাড়ি বংশ-বিস্তার করিতে পারে। ব্যাপারটা কি রকম ভয়ানক একবার বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। পৃথিবীর বহু কোটি লোক অত্যন্ত দীনহীন জীবন যাপন করিতেছে (এখানে বঞ্চিত-বঞ্চক ও সোশিয়ালিজ্‌মের কথা উঠাইবার দরকার নাই)। অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকা এখনই দুষ্কর। অন্ততঃ কষ্টকর ত বটেই। ধরণীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এই অবস্থা যে আরও শোচনীয় হইবে, তা বুঝিবার জন্য অঙ্ক কষিবার প্রয়োজন হইবে কি?

ম্যাল্‌থাস্ একটা ভয় দেখাইয়াই থামিয়া যান নাই। তিনি কতকগুলি দৈবী দাওয়াইয়ের কথা বলিয়াছেন; যথা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, যুদ্ধ ইত্যাদি। তাঁর মতে এগুলির প্রত্যেকটির ফলে যে লোকক্ষয় হয়, তা নৈসর্গিক নিয়মের বলে হয়। কিন্তু পাদ্রী ম্যালথাস্ নৈসর্গিক ছাড়িয়া অনৈসর্গিক ব্যবস্থার পাঁতি দিতেও ভয় পান নাই। তিনি বলিয়াছেন জীবন-যাত্রার প্রণালী উন্নত কর, সংযমে অভ্যস্ত হও, সন্তান-জন্ম পরিমিত কর। তিনি জন্ম-সংযম কথাটা উচ্চারণ করেন নাই। কিন্তু কাণের কাছ দিয়া গিয়াছেন। পাদ্রী ম্যালথাস্‌কে তাঁর সাহস ও দূর-দৃষ্টির জন্য একবার কুর্ণিস্ করিতেই হইবে।

২। অ্যারিষ্টটল হইতে মার্শ্যাল ও বিংশ শতাব্দী

অ্যারিষ্টটল হইতে মার্শ্যাল পর্য্যন্ত অর্থশাস্ত্রীরা ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে বলিয়াছেন। শুধু বাঁচিয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু ভাল করিয়া বাঁচিয়া থাকার অর্থটা কি?

একটী অর্থ এই যে, জীব ও আহারের সম্পর্কটা এমন ভাবে রাখা যেন তাহাতে অধিকাংশ জীবের পুষ্টি ও কল্যাণ হয়। ধর আহার=১০০। জীব যদি ১০০ বা ততোঽধিক হয় ত প্রত্যেক জীবের কপালে আহার জুটিবে ১ বা তার চেয়েও কম। অন্য দিকে জীব ১০০ হইতে যত কমিয়া যাইবে ততই তার আহার বাড়িবে। এখানে আহারটা অবশ্য ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতেছি। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় সব কিছুকেই আহার বলিতেছি।

মনে হইতে পারে আহারের উপরই জোর দেওয়া হইতেছে। তা নয়। জোরটা জীবের উপর। জীবের উৎকর্ষই লক্ষ্য। সেইজন্য আহার ক্রমাগত বাড়াইবার চেষ্টা ত করিতে হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে জীবের পরিমাণ কমাইতে হইবে, তাহাদিগকে উচ্চতর জীবন-যাপন-প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে।

আমাদের দেশে গরুর পূজা করি। কিন্তু গাইগুলি কঙ্কালসার—দুধ যৎসামান্য। বিলাতে গরু খায় অথচ গাই-গুলি হৃষ্টপুষ্ট ও দুধ দেয় আধ মণ পর্য্যন্ত। ইহার অর্থ কি?

* জন্ম শাসন—শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত; ২৬ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শুধু অন্ধ পূজা বা ভক্তি দ্বারা বংশের উন্নতি হয় না। বংশোন্নতিও একটা বৈজ্ঞানিক তত্ব বা বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। একটা ভাল ঘোড়া বা গরু পাইবার জন্য বহুদিক্ দিয়া চেষ্টা করিতে হয়। তার খাদ্য, পানীয়, প্রজনন ইত্যাদি সুনির্ব্বাচিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে হয়। অথচ আশ্চর্য্য, মানুষকে যদি সেইরূপ করিতে বলা যায় তবে ঘোরতর আপত্তি উঠিবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট মানুষ আপনা হইতে গজায় না, এটা বোঝা উচিত।

৩। বংশ-বিদ্যার ও জন্ম-সংযম

যে বিদ্যাকে ভিত্তি করিয়া বংশোন্নতি হইতে পারে তার নাম সৌজাত্য বা সুপ্রজনন। ইহার ভিতর জন্ম-সংযম একটি দফা বটে। কারণ জন্মসংযমের দ্বারা আহার ও জীবের অনুপাতটা ঠিক রাখা যায়।

সুতরাং আজিকার দিনে জন্ম-সংযম সম্বন্ধে যে কেহ আলোচনা করিবেন তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু কথাটা একটু বেশী বলা হইল। বলা উচিত ছিল, যে কেহ বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিবেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক দুয়ের ভিতর ভেদ-রেখা টানা সহজ নহে। অনেক অবৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতে বৈজ্ঞানিক আলোচনা জন্মগ্রহণ করে। বিশেষতঃ এইরূপ বিদ্যার চর্চা আমাদের দেশে নূতন হইতেছে বলিয়া সর্ব্বত্র নিছক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রত্যাশা করা সম্ভবপর নহে। তবে প্রচেষ্টাটা যদি সত্য-নির্দ্ধারণ হয়, তবে তাহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। জন্ম-সংযম সম্বন্ধে আমাদের চোখে যতগুলি বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "জন্মশাসন" নামক পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করি। ইহার সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ তথ্য-সংগ্রহ ও তত্ত্ব-বিচারের যে আগ্রহ রহিয়াছে তাহা সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই অনুকরণীয়। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে ও যত্নে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপ বিষয় লইয়া আলোচনা করা যে নিরাপদ্ নহে, রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইবার ও বন্ধুবান্ধবের নিকট নিন্দিত ও উপহাসিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সে জ্ঞান তাঁর ছিল। তথাপি সত্য বলিয়া যা বুঝিয়াছেন তা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইজন্য, তাঁকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

গ্রন্থখানা আগাগোড়া পড়িয়া দেখিলে একটা বিষয় অত্যন্ত সহজে ধরা পড়িবে। তাহা হইতেছে, গ্রন্থকারের ঐকান্তিক দেশপ্রীতি। দেশ ত কতকটা মাটি মাত্র নয়, দেশের মানুষগুলিকে লইয়াই দেশ। এই দেশের নরনারীর, বিশেষতঃ যুবকযুবতীদের, জীবনসংগ্রামে হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁর প্রাণ কাঁদিয়াছে। কিসে দেশের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা উপযুক্ত অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ও আমাদের চেয়েও উচ্চ স্তর হইতে তাদের জীবন আরম্ভ করিতে পারে, সেই ধ্যান তাঁর অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। সত্য বটে, বিষয়-সৌকর্য্যার্থ তাঁকে অনেক অপ্রীতিকর কথাও (অসত্য নয়) বলিতে হইয়াছে, এবং তাঁর মতামতের সহিত আমরা সর্ব্বত্র সায় দিতে পারি নাই, তথাপি এই পুস্তকখানিকে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ অথচ কার্য্যকরী বলিয়া মনে করি। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি—অবশ্য যাদের জন্য লিখিত তাদের মধ্যে।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে শ্রীরঘুনাথ শীল, বি এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৩৬ সাল | ১০ম সংখ্যা

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম্ এ, বি এল্

অভাবের ক্রমবিকাশ

আমাদের অভাবের সংখ্যা বাড়ানো ভাল না মন্দ? কেহ বলেন, অল্পে সন্তুষ্ট থাক; অভাবকে যত কম রাখ ততই ভাল। অন্যে বলেন, সভ্যতা মানেই অভাব-বৃদ্ধি। এই অভাবকে পুরাইতে না পারিলে মনুষ্য জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রথমতঃ দেখা দরকার সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অভাব বাড়িয়াছে কি না। সমুদয় ইতর প্রাণীর সহিত মনুষ্য সমাজের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে, আমাদের অভাব পরিমাণে অনেক বেশী। কোন ইতর প্রাণীকে বস্ত্রের কথা ভাবিতে হয় না। আশ্রয় স্থানও কাহারও কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক। অধিকাংশ শক্তি আহার অন্বেষণে ব্যয়িত হয়। আহার-স্থান ও আহার-প্রণালীর দ্বারা জীবন যাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়-স্থান তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। মানুষকে একই কালে এই তিন দিকে আপনার শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে হয়। মনুষ্য-সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতরেও এ বিষয়ে পার্থক্য দেখা যাইবে। অসভ্য সমাজের খাদ্য, বস্ত্র বা আশ্রয়-স্থানের সহিত সভ্য সমাজের ঐ সব জিনিষের তুলনা করা চলে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অভাবের ক্রমাগত রূপান্তর ঘটিতেছে। জীবজগতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রূপান্তর লক্ষিত হইবে, কিন্তু এই রূপান্তরও বিবর্ত্তনকে কম প্রভাবান্বিত করিতেছে না।

অভাবের এই রূপান্তরটা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। পরিমাণ বাড়িতেছে না কমিতেছে? কোন্ কোন্ অভাব কিরূপ আকার লাভ করিতেছে? অভাব উৎকর্ষ লাভ করিতেছে না নিকৃষ্ট হইতেছে? ইত্যাকার প্রশ্নসমূহের উত্তর যথাযথরূপে পাওয়া চাই।

সভ্য সমাজে অভাব পরিমাণে ঢের বাড়িয়াছে। ইহা

অস্বীকার করিবার কোন উপায়ই নাই। ৫০।১০০।২০০ বৎসর আগে মানুষ যে সব অভাবের কথা জানিত না, এমন কি কল্পনা করিতে পারিত না, আজ সে সব প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে মিটানো হইতেছে। আকাশ-জাহাজে উড়া, ঘরে বিজলির বাতি জ্বালানো, বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি ব্যাপার আজিকার নরনারীর পক্ষে ডাল-ভাতের সামিল। এগুলিকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের জীবন-যাত্রার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই-রূপ বহু স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়াও সহজে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু অভাবের পরিমাণ বাড়িয়াছে বলিলে কিছুই বলা হইল না। অভাবের ক্রমাগত উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। মানুষ প্রথমে চেষ্টা করে অভাবটা মিটাইতে, তারপর চেষ্টা হয় কিসে সেই অভাব ভাল করিয়া মিটিতে পারে। ভাল করিয়া মিটানোর অর্থ মানুষের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ, উত্তরো-ত্তর শ্রী ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি সাধন। অত্যাবশ্যক যা তার বেলা সৌন্দর্য্য বা অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়া চলে না। কিন্তু অত্যাবশ্যকের পর যা মানব আপনার কাজে খাটায় তার জন্য তার সৌন্দর্য্য ইত্যাদি বৃত্তির চর্চ্চার যথেষ্ট অবসর থাকে।

সংযম ও স্বাচ্ছন্দ্য

পূর্ব্বপুরুষদের তুলনায় আমরা অনেক ভাল খাই, ভাল পরি ও ভাল ঘরে থাকি, ভবিষ্যতে এই সব দিকে আরও উন্নতি করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু কথা এই যে, এইরূপভাবে ক্রমাগত অভাবের মাত্রা ও উৎকর্ষ বাড়াইয়া চলিলে তার শেষ কোথায়? যেখানে পাখা না চালাইয়া, বিজলীর বাতি না জ্বালাইয়া, গ্রামোফোন না বাজাইয়া বা বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ না করিয়া চলে, শুধু চলে নয়, ভাল করিয়া চলে, সেখানে কি দরকার ঐ সব উপদ্রব সৃষ্টি করিবার? একেই ত মানুষের কামনার শেষ নাই —'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব'— তার উপর কেন আরও ইন্ধন যোগাও?

সংযমের অর্থ আমাদের সকল প্রকার অভাবকে চাপিয়া যাওয়া নয়। কিন্তু প্রয়োজন মিটাইবার একটা সীমা আছে ত। সেই সীমাকে ছাড়াইয়া না যাইবার উপদেশই সংযম দেয়। স্বাচ্ছন্দ্য ও সংযমের মাঝখানে কোথায় সীমারেখা টানিতে হইবে? কোন রেখা টানা যায় কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে।

স্বাচ্ছন্দ্য চাই। হাজারো মুখে দারিদ্র্যের গুণ পরিকীর্ত্তিত হইলেও দারিদ্র্য যে গুণরাশিনাশী তাহা মানিতেই হইবে। দারিদ্র্য পৃথিবীতে বহু অশান্তি, পাপ ও দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে, দারিদ্র্যকে দূর করা মানব-কল্যাণকামীর ব্রত না হইয়া পারে না। কিন্তু অত্যধিক স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধিকার-প্রমত্ততাও কি মানবকে তুল্যরূপ অসুখী করিয়া তুলে নাই? ইয়োরামেরিকার স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রাধিক্য বহু লোককে সর্ব্ব-নাশের পথে লইয়া যায় নাই কি?

স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা নির্ণয়

আপনার অভাব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম কেহ করিতে পারে না। মানবের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত একটা বিশেষত্ব এই যে, নির্দ্দিষ্ট কোন লক্ষ্যের অভিমুখে জ্ঞানতঃ সে আপনাকে চালনা করিতে পারে। সত্য বটে, প্রকৃতি ও প্রকৃতির আবেষ্টনী, জলবায়ু, খাদ্য ইত্যাদি মনুষ্য সমাজের বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপকে সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট রূপকে মানব আপনার বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতা রাখে। সেইজন্য সমাজের ও ব্যক্তির দারিদ্র্য দূর করা ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা করিতে হইবে। ভগবান্ বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করিয়া এখানে আপনার পথ আপনি বাহির করা শ্রেয়ঃ।

আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ভুঁইফোড় জিনিষ নহে। আমাদের শরীররূপ বনিয়াদের উপরই আত্মিক উৎকর্ষ দাঁড় করাইতে হইবে। তা যদি হয় তবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকে ছোট করিয়া দেখিবার কোন হেতু নাই। বস্তুতঃ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত মানুষ ভাল করিয়া জীবনধারণ করিতে ও আপনার শক্তি অন্যান্য দিকে নিয়োগ করিতে পারে না। তারপর স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রাধিক্য যদি ঘটে তাহাতেও শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। প্রকৃতির উপর জয়লাভ করা ও আধিপত্য করা মানুষের শক্তির ও গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে যে সমস্যার উদয় হয়, মনুষ্যের শক্তি বাড়ে বলিয়া সেই সমস্যার সমাধান তার পক্ষে সহজ হইয়া যায়।

পুরস্কার

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি এল্, কবিশেখর

(১)

বাংলা মায়ের বণিক্ ছেলে
তোমায় আজি নমস্কার !
সমাজ সেবার বিনিময়ে
পেলে ঘৃণা তিরস্কার !
সাত সমুদ্র মথন করে'
রত্ন আনি জাহাজ ভরে'
পরিয়ে ছিলে বঙ্গ মায়ের
অঙ্গে সোনার অলঙ্কার !
তাই সমাজে ভাগ্যে তোমার
তিরস্কারই পুরস্কার ।

(২)

বৈশ্য তুমি বিশ্ববাসীর
স্তন্য দিলে আস্যে তুলে,
নিরন্নেরে অন্ন দিলে
নিজের দুখ ও দৈন্য ভুলে ;
ভারতমাতার মাথার মণি
তার যে পরশ পাথর তুমি ;
তোমারে তাই সমাজ দিল
ব্যথার মণি-কণ্ঠ-হার ।
যে জন দিল স্তন্য-সুধা
তারেই ঘৃণা পুরস্কার !

(৩)

চম্পা, জাভা, চীন, জাপানে
ঢেউএর বুকে ছুটল তরী,
'সপ্তডিঙ্গা মধুকর'—আর
'চাঁদসদাগর' বক্ষে ধরি ;
ধ্রুবতারা সামনে জ্বলে,
ঝঞ্ঝা শত বক্ষতলে,
কে জানে সে কূল পাবে কি
পাবে মরণ—অন্ধকার !
ফিরল দেশে,—কিসের আশে ?—
পেতে ঘৃণা পুরস্কার !

(৪)

সভ্যতারই স্বর্ণ-সেতু
দিগ্বিজয়ী পুণ্য বীর,
রত্ন সাথে আনলে শত
পূর্ণ কুম্ভ তীর্থ-নীর ।
আনলে চারু-শিল্প লুটে,
সপ্ত ডিঙ্গার কক্ষপুটে,
দিলে বঙ্গ-মায়ের পায়ে
স্বর্ণ-ঝাপি অর্ঘ্য-ভার,
বিনিময়ে সমাজ দিল
তোমায় ঘৃণা পুরস্কার !

গণেশ পোদ্দার

শ্রীসত্যনারায়ণ পাল

(১)

অনেকদিন আগেকার কথা। এখনকার মত তখন চতুর্দ্দিকে রেল ও ষ্টীমার হয় নাই, কাজেই পথ ঘাট বড়ই দুর্গম ছিল। কোন দূর স্থানে যাইতে হইলে, বিশেষতঃ যে সমস্ত জায়গায় ডাকাতের ভয় সেখানে লোকে দলবদ্ধ হইয়া খুব সাবধানে যাইত, আর নিতান্ত প্রয়োজন না থাকিলে লোকে ওই সব রাস্তা দিয়া চলিত না।

সেই সময়ে রামজীবনপুরের হেটোরা রাঙ্গামাটির উপর দিয়া ও ভিকুদাসের ডাঙ্গা ভাঙ্গিয়া হাঁটাপথে তারকেশ্বরে আসিত, সেখান হইতে রেলযোগে হাবড়ায় আসিয়া হাট করিয়া যাইত। জাহানাবাদের পাশ দিয়া আর একটি পথ আছে, কিন্তু যে পথ দিয়াই আসুক না কেন সকলকেই ভিকুদাসের ডাঙ্গার উপর দিয়া আসিতে হইবে, এ ছাড়া তারকেশ্বরে আসিবার অন্য পথ নাই।

এই পথটি তখন খুব সোজা হইলেও আদৌ নিরাপদ ছিল না, অনেক 'ঠেঙ্গারে', নরঘাতক দস্যু ছদ্মবেশে এই পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। এরূপ জনশ্রুতি—ঐদেশের যত বদমাশ মুসলমান এই দলভুক্ত, পথিকদিগের সহিত মিশিয়া এরূপ বন্ধুত্ব ভাব দেখাইত যে পথিকেরা ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিত না ইহারা দস্যু; কোনক্রমে একবার ঐ ভয়ানক ডাঙ্গার মধ্যে আনিতে পারিলে পথিকেরা সংখ্যায় বেশী হইলেও দস্যুরা গ্রাহ্য করিত না। জোর করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া লোহার গুল বাঁধান লাঠির আঘাতে সকলকে হত্যা করিয়া বিল ও জলার ধারে ফেলিয়া দিত। এইরূপে কত নরকপাল সে জলার ধারে দেখা যাইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

রাঙ্গামাটি ও জাহানাবাদের রাস্তাতেও ডাকাতের ভয় ছিল, কিন্তু ভিকুদাসের ডাঙ্গার নাম শুনিলে সেই সময়ে পথিকের বুক কাঁপিয়া উঠিত। সুবিস্তীর্ণ ডাঙ্গার মাঝে একটি মাত্র পুকুর; তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা জলপানের জন্য ঐ পুকুরে নামিলে দস্যুরা চাবিজালে সকলকে আবদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিত; এখনও আশপাশের বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায় পুকুরে নাকি লাখো মাথা আছে!

ওই পুকুরের সামনেই একটি চটি; লোকে বলিত ঐ চটিই ডাকাতদের শিকার ধরিবার ফাঁদ, এবং চটিরক্ষক নাকি দস্যুদের গুপ্তচর। যাহারা এ পথে সচরাচর চলিত না তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ জলযোগের ও বিশ্রামের জন্য চটিতে আশ্রয় লইলে প্রাণ লইয়া আর তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইত না।

কিন্তু অবস্থাভিজ্ঞ হেটোরা এই পথের সমস্তই জানিত। যাহাতে বেলা থাকিতে থাকিতে ডাঙ্গা পার হইয়া যাইতে পারে, সেইজন্য রামজীবনপুর হইতে সন্ধ্যার পরই বাহির হইয়া পড়িত, রাঙ্গামাটি পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সকাল হইত এবং প্রকাশ্য দিবালোকেও হেটোরা সদলে খুব ভয়ে ভয়ে ও সাবধানে ডাঙ্গাটুকু পার হইত। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এমন কি পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইলেও তাহারা চটির ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইত না। সেই সময়ে ঐ অঞ্চলে পুলিশের তত প্রাদুর্ভাব ছিল না, তাই দস্যুরা সর্ব্ব সময়ে ভিকুদাসের ডাঙ্গায় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে নির্ব্বিঘ্নে ডাকাতি করিত।

গণেশ পোদ্দার রামজীবনপুরের একজন বড় হেটো। দেশে তাঁহার নামডাক খুব, এ ছাড়া হাবড়ার হাটে তাঁহার মস্ত কারবার। অপর হেটোরা হাটে, প্রত্যেকে এক মোট করিয়া কাপড় আনিত, কিন্তু পোদ্দারের একলারই প্রতি হাটে বিশ মোটের কম কাপড় আসিত না।

সে বার এক হাটে পোদ্দারের কাপড় খুব অল্প বিক্রয় হইল, তাই বাকী অত মোট কাপড় ফিরাইয়া লইয়া গিয়া আবার হাটের দিন লইয়া আসা কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ ভাবিয়া পোদ্দার সে হাট রহিয়া গেলেন, অপর হেটোরা চলিয়া গেল।

পরের হাটে দৈবক্রমে রামজীবনপুরের কোন হেটোই আসিল না, কাজে কাজেই এই হাটে তাঁহার সমুদয় কাপড় চড়া দরে বিক্রয় হইয়া গেল। বেশ মোটা দু'পয়সা লাভ হইলেও তাঁহার বাড়ী যাওয়া হইবে না ভাবিয়া পোদ্দার মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন,—আবার পুরা সাত দিন থাকিতে হইবে। প্রায় তিন সপ্তাহ গৃহ ছাড়া, বাড়ীতে যে খুবই ভাবিবে তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু উপায় ত নাই, এরূপ ভয়ঙ্কর পথ দিয়া একলা যাওয়া কোন অংশেই যুক্তি সঙ্গত নয়; তবে?—

গণেশ পোদ্দার ভাবিয়া চিন্তিয়া কুল-কিনারা পাইলেন না, একবার ভাবিলেন থাকিয়াই যাই, আবার মনে হইল উত্তরের ব্যাপারিদের এ হপ্তায় টাকা দিবার কথা আছে, যদি যাওয়া না হয় তাহা হইলে ত টাকা পাওয়া যাইবে না, সুতরাং এই কিস্তিতে মহাজনের টাকা শোধ না দিলে ত মাল পাওয়া দুষ্কর। উপায়? কিন্তু একলা ভিকুদাসের ডাঙ্গার উপর দিয়া এত টাকা লইয়া যাওয়াও ত নিরাপদ্ নয়, টাকা ত যাইবেই, এ ছাড়া জীবনের আশঙ্কাও আছে, তাহা হইলে উপায় কি? এদিকে বাড়ীতে অভিভাবক বলিতে কেহ নাই, দুইটি নাবালক শিশু ও স্ত্রী—কি করা যায়?

অনেক ভাবিয়া পোদ্দার শেষে যাওয়াই স্থির করিলেন। এই হাটে তাঁহার নগদ সাত শত টাকা বিক্রয় হইয়াছিল। টাকা গুলিকে সাতটি গেঁজের ভিতর রাখিয়া গেঁজের মুখ দড়ি দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিলেন। তারপর গেঁজেগুলিকে কোমরে মজবুত করিয়া জড়াইয়া গামছাখানি ভাঁজ করিয়া কোমরের চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে বাঁধিলেন যাহাতে কেহ না জানিতে পারে কোমরে টাকা আছে। তারপর চাদর-খানিকে গায়ে জড়াইয়া পোদ্দার অতি প্রত্যুষে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলেন।

সেই সময়ে তারকেশ্বরের ভাড়া ছিল চৌদ্দ পয়সা মাত্র, আজকালকার মত এত ষ্টেশনও ছিল না আর লোকের তত ভিড়ও হইত না। একখানি তারকেশ্বরের টিকিট কিনিয়া পোদ্দার রেলে উঠিলেন, সাতটার সময় ট্রেণ ছাড়িল এবং বেলা দশটার মধ্যেই গাড়ী তারকেশ্বরে উপস্থিত হইল।

পোদ্দার একবার মনে করিলেন, তারকেশ্বরে স্নানাহার করিয়া যাই, কিন্তু বিলম্বের ভয়ে সাহস করিলেন না। তারকেশ্বরে নামিয়া আর কোন স্থানে না দাঁড়াইয়া বা কোন সঙ্গীর অপেক্ষা না করিয়া তিনি একাকী গো ঘাটের রাস্তা ধরিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন।

(২)

মাতলা পর্য্যন্ত দুই একজন ষ্টেশনগামী লোকের গতায়াত ছিল, তারপর মাঠের রাস্তা পড়িতেই "কাকস্য পরিবেদনা" —রাস্তায় জনমানব নাই; যতদূর দৃষ্টি যায়, চারিধারে অনুর্ব্বর ক্ষেত্র বুকে লইয়া দিগন্তজোড়া মাঠখানি ধূ ধূ করিতেছে। গাছ নাই, পালা নাই, জলাশয় নাই, কোন আশ্রয় নাই খালি মাঠ, আবার মাঠের পর মাঠ, মাঠের যেন শেষ নাই!

পূর্ণ চার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত ছুটিয়া পোদ্দার অবশেষে ডাঙ্গায় আসিয়া পড়িলেন। মাঠের রাস্তা তবু সমতল ছিল, ডাঙ্গার সমুদয় পথ অসমতল, কোন স্থানে ঘোর তাম্রবর্ণ পাথরের স্তূপ জমিয়া জমিয়া ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া আছে, কোন স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন; লাল কঙ্করময় উত্তপ্ত বালুকা-পূর্ণ সঙ্কীর্ণ পা-দণ্ডীর পথ নদীর মত আঁকিয়া বাঁকিয়া, দূর-দিগন্তের কোলে মিশিয়া গিয়াছে।

তখন মধ্যাহ্ন, সূর্য্যের প্রখর কিরণে ডাঙ্গার বালুকাময় রাস্তা তাতিয়া আগুণ হইয়া উঠিয়াছে, কার সাধ্য উহার উপর দিয়া নগ্ন পদে চলে। পথশ্রমে, রৌদ্রে ও তৃষ্ণায় পোদ্দার শীঘ্রই অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ভিকুদাসের ডাঙ্গার মধ্যস্থলে যে পুকুরটি আছে, তাহা ছাড়া চার ক্রোশের ভিতর আর কোন জলাশয় নাই। কিন্তু এখান হইতে পুকুরটি খুব কমের পক্ষেও পাকা দুই ক্রোশের ধাক্কা, অতদূর রাস্তা যাইতে না পারিলে ত জল পাওয়া যাইবে না। পোদ্দারের হঠাৎ মনে পড়িল, এক ক্রোশ দক্ষিণে একটি ঝরণা আছে, কিন্তু সেও ত খুব নিকট নয়, আবার এখান হইতে এক ক্রোশ রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়।

এই স্থান হইতে পাকা এক ক্রোশ রাস্তা ঠেলিয়া ঝরণার জল পান করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া

এই রাস্তা ধরিতে গেলে এক ঘণ্টার কম কিছুতেই হইবে না, অথচ এদিকে এক ঘণ্টা পিছাইয়া পড়িতে হইবে ; কিন্তু তৃষ্ণা চাপিয়া মানুষ কতক্ষণ থাকিতে পারে, গলা জিব যে শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাইতেছে, পোদ্দার বাধ্য হইয়া অবশেষে ঝরণার রাস্তা ধরিলেন।

ঝরণার জলে মুখ হাত ধুইয়া অঞ্জলী অঞ্জলী জল পান করিলেন, সমস্ত শরীর শীতল হইল ও তাঁহার দেহে যেন শক্তি ফিরিয়া আসিল। রৌদ্রের তাপে পুড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ তামার মত হইয়া গিয়াছিল, তাই চাদরখানিকে জলে ভিজাইয়া গায়ে জড়াইতে সর্ব্বাঙ্গ স্নিগ্ধ ও দহনের জ্বালার অনেকখানি উপশম হইল।

দ্রুতপদে ডাঙ্গার রাস্তা ধরিয়া পোদ্দার যেই কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন কে যেন "বাবা গো গেলুম" বলিয়া পিছন হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ; সেই আর্ত্তনাদে উন্মুক্ত প্রান্তর ভূমির বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার নির্ভীক হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হইল, আর অগ্রসর না হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—আবার শোনা গেল—"উঃ গেলুম—বাবা গো" !

তাই ত! পোদ্দার একবার ভাবিলেন চলিয়া যাই ; আবার চিন্তা করিয়া দেখিলেন—দেখা খুবই দরকার। শব্দের অনুসরণ করিয়া খানিক দূর আসিয়া দেখিতে পাইলেন—জলার ধারে হস্তপদ বদ্ধ একজন গৌরবর্ণ উলঙ্গ পুরুষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে ; রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়া গিয়াছে, বোধ হইল কেহ কোন গুরু পদার্থ দিয়া লোকটির মুখে ও মস্তকে দারুণ আঘাত করিয়াছে, তাই রক্তস্রাবে ও আঘাতের যন্ত্রণায় মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে।

গণেশ পোদ্দার এক লম্ফে লোকটির নিকট যাইয়া অগ্রেই তাহার হস্ত ও পদের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। আর্দ্র চাদর নিংড়াইয়া দুই তিন অঞ্জলী জল চোখে ও মুখে ঝাপটা দিতেই লোকটির জ্ঞান হইল ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—'জল'।

ঝরনায় না যাইলে জল পাইবার উপায় নাই, পাত্র থাকিলে কোন ভাবনাই ছিল না, চাদর নিংড়ান জলে কি তৃষ্ণা যায়? পোদ্দার অনন্যোপায় হইয়া লোকটীকে বুকে করিয়া ঝরণায় উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে লোকটিকে ঝরণার ধারে শোয়াইয়া অঞ্জলী অঞ্জলী করিয়া ঝরণার জল লোকটির মুখে ঢালিয়া দিলেন, ইচ্ছামত জলপান করিয়া লোকটি কিছু সুস্থ হইল ; চাদর ছিঁড়িয়া লোকটির মাথা ও কপালের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের উপর বাঁধিয়া দিতেই রক্তস্রাব প্রায় বন্ধ হইল। রৌদ্রে চাদরখানি তখনই শুকাইয়া গিয়াছিল ; লোকটির কোমরে চাদরটি জড়াইয়া দিতেই সে ব্যক্তি অশ্রুকণ্ঠে বলিল—"কে আপনি নররূপী দেবতা, এই নির্জ্জন দস্যুসঙ্কুল ভীষণ ডাঙ্গার মধ্যে আমার প্রাণরক্ষা করবার জন্যে এসেছেন, আপনি কখনই মানুষ নন, আপনিই আমার বিপদ্‌হারী গোলোকপতি মধুসূদন।" এই বলিয়া হেঁট হইয়া পোদ্দারের পায়ের ধূলা লইবার জন্য হাত বাড়াইলে পোদ্দার তাহার হাতখানি ধরিয়া সস্নেহে কহিলেন—"ওকি! ওকি হচ্ছে—পায়ে কি হাত দিতে আছে? আমার কতটুকু শক্তি যে তোমার প্রাণ রক্ষা করি, ভগবান্‌কে ডাক, তিনিই তোমায় রক্ষা করেছেন, আমি উপলক্ষ্য বই ত নয়—এখন যেতে পারবে ত?"

"ষ্টেশনের রাস্তাটি কোন দিকে দেখিয়ে দিলে আস্তে আস্তে খুব যেতে পারবো, আর দেখুন এ রাস্তা দিয়ে কোন ক্রমেই একলা যাবেন না, বড় ভীষণ রাস্তা—ডাকাতের হাতে প'ড়ে আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে, যথা সর্ব্বস্ব নিয়েও ছাড়ে নি, লাঠি মেরে জখম করে দিয়েছে, আমার গুরুবল বল্‌তে হবে তাই এই যাত্রায় আপনার দয়ায় প্রাণ পেয়েছি।"

"রাখে কৃষ্ণ মারে কে, আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" আমার অদৃষ্টে যদি অপঘাত মৃত্যু থাকে কিছুতেই রোধ করতে পারবো না।"

গেঁজে হইতে একটি টাকা লইয়া পোদ্দার লোকটির হাতে দিয়া বলিলেন "এতেই তোমার রেলভাড়া ও খাই-খরচ হয়ে যাবে—আর আমি দাঁড়াতে পার্ব্ব না—অনেক দূর যেতে হবে আমাকে" বলিয়া তিনি লোকটিকে ষ্টেশনের রাস্তা দেখাইয়া দিলেন।

যাইবার সময় লোকটি পোদ্দারের নাম ধাম সমস্ত জানিয়া

লইল এবং শীঘ্রই তাঁহার সহিত দেখা করিবে বলিয়া লোকটি ডাঙ্গার পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পোদ্দার ঝড়ের মত উড়িয়া চলিলেন। লাল কঙ্করময় রাস্তা, রৌদ্রে জ্বলিয়া পুড়িয়া প্রত্যেক বালুকণা ও মৃত্তিকা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, জলাভাবে মরুভূমির মত দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া ধূ ধূ করিতেছে; পোদ্দার ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গতির বেগ আরও বাড়াইয়া দিলেন। পূর্ণ দুই ঘণ্টা অবিশ্রান্ত ছুটিয়া অবশেষে ডাঙ্গার মধ্য রাস্তায় উপস্থিত হইলেন, আর একটু অগ্রসর হইলেই চটি।

দূর হইতে পোদ্দার দেখিতে পাইলেন দুইজন খর্ব্বকায় বলিষ্ঠ মুসলমান তাঁহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে, হাতে তড়পা, মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল ও মালকোচা বাঁধা কাপড় পরা; শ্মশ্রুগুম্ফবহুল কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডলে নিষ্ঠুরতার কালিমা পড়িয়া আরও ভীষণ দেখাইতেছে।

পোদ্দার মন্দগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন একেবারে থামিলেন না, বুকের ভিতর গুর গুর করিতে লাগিল, পলাইবার উপায় নাই, চীৎকার করা নিষ্ফল, মনে মনে মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

মুসলমান দুইজন দস্যু; পোদ্দারকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে দেখিয়া একজন চড়া গলায় হাঁকিল—"কে যায়?"

পোদ্দার হটিবার লোক ছিলেন না, তিনিও সমান গলায় উত্তর দিলেন—"বন্ধু।"

অগ্রগামী দস্যু পোদ্দারের আপাদ মস্তক দেখিতে দেখিতে বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে কহিল—"অসময়ের বন্ধু যে গো।"

দস্যুর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া পোদ্দার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—"অসময়ের বন্ধু ভায়া, সময়ে অনেক বন্ধু মেলে।"

ডাকাত দুইটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সামনেই চটি, চটিওয়ালা দোকানে একলা বসিয়া আছে। ছোট ছোট চার পাঁচটি ধামায় চিড়ে, খই, মুড়ি ও মুড়কী সাজানো, ভাঙ্গা নাগরীতে খানিকটা গুড়, একপাশে দা-কাটা তামাক খানিকটা রোদে পুড়িয়া শক্ত ঝামার মত পুড়িয়া রহিয়াছে, চটিতে আর কোন লোক নাই।

পোদ্দার অন্ত কোন কথার উত্থাপন না করিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধু! চটিতে ভাত মিলবে?

"খুব, খুব।"

চটিতে ভাতের কোন বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া পোদ্দারের বুঝিতে বাকী রহিল না, দস্যুদের সব ফাঁকা কথা। ইতিমধ্যে চটিওয়ালা তামাক সাজিয়া কলাপাতা সমেত কলিকাটি পোদ্দারের হাতে দিল। পোদ্দার চার পাঁচটি টান দিয়াই—ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

"পুকুরের জল ভাল বন্ধু?"

চটিওয়ালা একগাল হাসিয়া কহিল—"চারক্রোশের ভিতর এর মত ভাল জল আর কোথাও নেই, কর্ত্তা, এই জলই আমরা খাই।"

"তা হলে একটু তেল দাও দেখি ভোঁ করে একটা ডুব দিয়ে নি।"

শুধু হাত, সঙ্গে কোন মোট নাই। সরষের তৈল লইয়া খানিকটা এক নিশ্বাসে নাকের ভিতর টানিয়া লইলেন, বাকীটুকু মাথায় ঘসিতে ঘসিতে পুকুরে নামিয়া পড়িলেন।

এক সঙ্গে দশ বারোটি ডুব দিয়া পোদ্দার কোমরে জড়ান—গামছাখানি খুলিয়া গা ঘসিতে লাগিলেন তারপর আরও কয়েকটি ডুব দিয়া পুকুর হইতে উঠিয়া আসিতেই দস্যুরা দেখিল—কোমরে জড়ান টাকার গেঁজেগুলি জলে ভিজিয়া কাপড়ের মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দস্যুদের মুখে পৈশাচিক হাসি দেখিয়া পোদ্দার নিজের ভুল ধরিয়া ফেলিলেন, তাঁহার নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্ত ডাকাতরা যে অনায়াসে টাকার সন্ধান পাইয়া গেল এই আপশোষে মুষড়াইয়া গেলেন। অনুশোচনা আসিল স্নান না করিলে ত এত দূর ভাবনায় পড়িতে হইত না শুধু মাথাটি ধুইলে কোন হাঙ্গামা ছিল না। স্বেচ্ছায় নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই দেখাইয়া দিয়াছেন ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পোদ্দার নীরবে চটিতে আসিলেন। টাকা দেখিয়া ব্যাঘ্রের লোলুপ দৃষ্টির মত দস্যুদের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খুব খাতির করিয়া তাহারা পোদ্দারকে চটির মধ্যে লইয়া গিয়া বসিবার আসন দিল এবং জলযোগের জন্ত সেরখানেক চিড়ে, তদুপযুক্ত গুড়, মুড়ি ও মুড়কী সেই সঙ্গে এক ঘটি জল ও একটি পাত্র দিয়া গেল। অংশ লোভে চটিওয়ালা পোদ্দারকে গুরুর আদর করিল।

থালায় চিড়ে মুড়ি ও মুড়কীগুলিকে জল দিয়া ভিজাইয়া পোদ্দার ভিতরে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তখন উড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে ও ভাবনায় পোদ্দার অস্থির হইয়া পড়িলেন। গামছার মধ্যে ভিজান চিড়ে ও গুড় লইয়া পোদ্দার পলায়নের রাস্তা দেখিতে লাগিলেন। ডাকাতরা তখন বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছে। চটির দরমার বেড়া, বাঁশের খুঁটির গায়ে দড়ি দিয়া বাঁধা, দস্যুরা যখন গল্প গুজবে ও উচ্চহাস্যে মগ্ন, পোদ্দার ওই সুযোগে বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তারপর এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া যখন দেখিলেন দস্যুরা কেহই জানিতে পারে নাই, তখন ঝড়ের মত ছুটিয়া চলিলেন, পলকের মধ্যে ডাঙ্গা পার হইয়া গেলেন।

(৩)

দস্যুরা স্বপ্নেও ভাবে নাই পোদ্দার এইরূপ ভাবে তাহাদের চোখে ধুলা দিয়া পলাইবেন। তাহারা তামাকই খাইতেছিল এবং পোদ্দারের গেঁজের টাকা তিন অংশ করিলে প্রত্যেকের কত হইবে তাহাই কল্পনা করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে একজন ডাকাত চটির দরজার দিকে মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বন্ধু খাওয়া হল ?"

কোন উত্তর নাই।

দস্যু উচ্চহাস্যে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে ফাঁসীর খাওয়া হচ্ছে না কি ?"

ইহাতেও যখন কোন উত্তর আসিল না, তখন দস্যুটি চটির মধ্যে গিয়া দেখে, কেউ নাই বেড়ার খানিকটা কেবল ফাঁক।

মাথা চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আবদুল, পাখী উড়ে গেছে রে।"

হাতের হুঁকো ফেলিয়া আবদুল এক লাফে চটির দরজায় আসিয়া বলিল—"পালিয়েছে ? উঃ সুমুন্দি ভারী ধড়িবাজ ত ? চোখে ধুলো দিয়ে পালাল রে ?"

চটিওয়ালা বড় বড় চোখ ঘুরাইয়া বলিল—

"তিন তিন জন লোকের সামনে দিয়ে চলে গেল কেউ টের পেলে না"।

চটিওয়ালাকে এক ধমক দিয়া আবদুল মুখ খিঁচাইয়া বলিল—"বসে বসে তামাক খানা রে শালা আরও খানিকক্ষণ ধ'রে—তোর দরমার বেড়া ফাঁক ক'রে পালিয়ে গেল সে দিকে খেয়াল আছে কি ? শালার গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল, টাকার ঠিক নেই, হিসেব কচ্ছে ওর ভাগে কত হয়, ঠিক হয়েছে শালা।"

চটিওয়ালা মুখ চুণ করিয়া রহিল।

মজিদ গর্জ্জন করিয়া বলিল—"যে ক'রে হক তাকে ধ'রতেই হবে, আবদুল, অত টাকার মায়া ছাড়া যায় না, সুমুন্দি যতদূরই যাক তারাজুলীর বাঁধ পেরোতে দিচ্ছি না, ওই খানেই নিকেশ কর্ব্ব।"

ঝড়ের বেগে দস্যুদ্বয় ছুটিতে লাগিল।

গণেশ পোদ্দার পরিমাণ-হাতের পাকা সাড়ে চারহাত খাড়াই, সাধারণে যেরূপ পা ফেলিয়া চলে, পোদ্দার তাহাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যবধানে পা ফেলেন। ছুটিলে ত কথাই নাই; সুতরাং খর্ব্বকায় দস্যুরা তাঁহার সহিত ছুটিয়া যে নাগাল পাইবে না বরং পিছাইয়া পড়িয়া পরাজিত হইবে—ইহা নিঃসন্দেহ—খুবই নিশ্চিত।

পোদ্দার ততক্ষণ তারাজুলী নদীর বাঁধের কাছ বরাবর আসিয়া পড়িয়াছেন, গামছায় চিঁড়ে ও গুড় একগ্রাস করিয়া মুখে দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছেন। দস্যুদ্বয় প্রাণপণে ছুটিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

অত্যধিক ছুটিয়া ডাকাত দুইটি শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। হাঁটু হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত খসিয়া যাইতেছে, আর দম নাই, ছুটিবে কি করিয়া, মজিদ আর দাঁড়াইতে পারিল না বসিয়া পড়িল। মজিদকে বসিতে দেখিয়া আবদুল রাগে অন্ধ হইয়া বলিল—

"ওঠ্ শালা ওঠ্ একটু হেঁটেই হুঁ হুঁ করে পড়লো। ইঃ শালার রকম দেখে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

মজিদ হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"একটু দম নিতে দে, তারপর আবার ছুটবো।"

আবদুল যে ক্লান্ত হয় নাই, এ কথা বলাই যায় না, সেও যথেষ্ট ক্লান্ত হইয়াছিল, তবে পোদ্দারের কোমরে বাঁধা টাকার গেঁজেগুলি তখনও তাহার চ'খের উপর দপ দপ করিতেছে। টাকার লোভে আবদুল পথশ্রমের সহস্র কষ্ট

উপেক্ষা করিয়া, আশা জমাইতেছিল। সে কি এক-আধ টাকা। টাকার কাঁড়ি যে! এতদূর আসিয়া শেষে হাত ছাড়া হইয়া যাইবে? না না—তা হইতেই পারে না।

আবদুল ঝাঁকি মারিয়া বলিল—"এ শালাকে নিয়ে ত মহা মুস্কিলে প'ড়েছি, বলি উঠ্‌বি, না হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো?"

"আঃ তুই যে অস্থির হয়ে পড়্‌লি, থাম না একটু দম নি, অত ভাবছিস কেন? অতদূর যেতে হবেনা, বাঁধে সর্দ্দার আছে জানিস্?"

"এ সুমুন্দিকে কি বলি বল দেখি? বলি ওরে শালা, সর্দ্দার ধর্‌লে তুই কিছু পাবি, না আমি পাব? কেমন ফাঁকতালে অতগুলো টাকা পাওয়া যাচ্ছিল—উঃ!"

মজিদ তবু উঠে না দেখিয়া আবদুল রাগে অন্ধ হইয়া তাহার হাত ধরিয়া একপ্রকার টানিয়া লইয়া ছুটিল।

ততক্ষণে গণেশ পোদ্দার তারাজুলী নদীর বাঁধের নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন কেহই নাই; মনে ভরসা হইল আর কোন ভয় নাই, সামনেই করঞ্জী গ্রাম দেখা যাইতেছে। ততক্ষণ গামছায় বাঁধা চিড়েগুলি সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নদীর জলে নামিয়া মুখ হাত ধুইয়া জলপান করিলেন। গামছাখানি নদীর জলে কাচিয়া মুখ মুছিতে যাইবেন—সম্মুখের বটগাছের ডালগুলি নড়িয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে কে যেন গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল। পোদ্দার সভয়ে দেখিলেন—দস্যু সর্দ্দার করিম সেখ তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেঘের মত গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে—"কিরে জল খাওয়া হ'ল? কোথা যাবি বল দেখি?"

সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেরূপ ভয়ে বিব্রত হইয়া পড়ে দস্যুপতি করিম সেখকে সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া গণেশ পোদ্দারের অন্তঃকরণ সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল। তবু যথাসাধ্য ভীত ভাবটিকে সংযত রাখিয়া তাড়াতাড়ি সেলাম করিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন—"সেখজি বাড়ীতে মেয়েটার বড় অসুখ, খবর পেয়ে মাতলা থেকে ছুটে আসছি বাবা, আমার বাড়ী হচ্ছে ঐ—"

"কি নিয়ে যাচ্ছিস্ দেখি।"

পোদ্দার দেখিলেন এইবার তিনি সত্যই বাঘের মুখে পড়িয়াছেন; ইহার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি আগেই জানিতেন সর্দ্দার যেমন জোয়ান তেমনি সাহসী; কৌশলে পলায়ন ভিন্ন নিস্তার নাই, তাই কাঁদ কাঁদ স্বরে জবাব দিলেন—"কিছুই নিয়ে যাইনি সেখজি, দেখতে পাচ্ছেন না সঙ্গে একটা মোট ব'লতে নেই, তিনটে টাকা ট্যাঁকে গুঁজে ছুটে আসছি তার মধ্যে গণ্ডা কয়েক পয়সা খরচ হয়েছে বাকী খুচরো ছুটো টাকা ও রেজ্‌কি কাছে আছে।"

"তোর কোমরের ওখানটা অত উঁচু কেন বল দেখি, গেঁজের মত কি জড়ান রয়েছে দেখি?"

সর্দ্দারকে কোমর অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গণেশ পোদ্দার সভয়ে দুই তিন পা পিছাইয়া আসিলেন, পরে হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"দোহাই সর্দ্দার, কোমরে হাত দেবেন না, বাবা তারকনাথের ফুল ও রোলা নিয়ে যাচ্ছি মেয়েটার"—

বলিতে বলিতে সর্দ্দারের অলক্ষ্যে এক মুষ্টি নদীর বালি কখন যে তুলিয়া লইয়াছেন সর্দ্দার মোটেই জানিতে পারে নাই। অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সর্দ্দার আবার যেই অগ্রসর হইল, পোদ্দার মুঠোশুদ্ধ বালি সজোরে সর্দ্দারের চোখের ভিতর ছুড়িয়া দিলেন। সর্দ্দার "ইয়া আল্লা" বলিয়া চোখে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

পোদ্দার আর দাঁড়াইলেন না, এক লাফে নদীর কিনারার উপর উঠিয়া দেখিতে পাইলেন দুইজন লোক সেই পথে উর্দ্ধমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। গামছাখানিকে শক্ত করিয়া কোমরে বাঁধিয়া পোদ্দার করঞ্জী গ্রামের গা ঘেঁসিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিলেন।

আগন্তুক দুইজন আবদুল ও মজিদ। মনে অনেক আশা করিয়া আসিতেছিল সর্দ্দারের নিকট হইতে যা হ'ক কিছু ভাগ লইবেই কিন্তু নদীর ধারে সর্দ্দারকে চ'খে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দস্যুদ্বয়ের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল।

সর্দ্দারের মুখে শুনিল রামজীবনপুরের গণেশ পোদ্দার চোখে বালি ছুড়িয়া মারিয়া তাহাকে একেবারে জখম করিয়া গিয়াছে, আবদুল ক্রোধে কঠিন শপথ করিয়া বলিল

এর প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া সে কখনই বাড়ী ফিরিবে না।

নদী হইতে অঞ্জলী অঞ্জলী করিয়া জল লইয়া আবদুল সর্দ্দারের চোখে দিতে লাগিল। সে কি যন্ত্রণা, সর্দ্দার চোখ খুলিতেই পারে না, খুলিতে চেষ্টা করিলেই চোখ কর্ কর্ করিয়া ওঠে, আবার অনেকক্ষণ ধরিয়া চোখ বুজিয়া থাকিলেও যন্ত্রণা। অনেক্ কষ্টে আবদুল সর্দ্দারের চোখ হইতে বালিগুলি বাহির করিয়া দিল।

সর্দ্দারের হাত ধরিয়া আবদুল তাহাকে বাড়ী পঁহুছাইয়া দিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, মজিদকে সঙ্গে লইয়া আবদুল সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে রামজীবনপুরের দিকে অগ্রসর হইল। রাত্রিতেই কার্য্য শেষ করিয়া ভোরের মুখে ফিরিয়া আসিবে এই চিন্তা করিয়া আহার পর্য্যন্ত করিল না, তীর-বেগে ছুটিয়া চলিল।

(৪)

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে গণেশ পোদ্দার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। স্ত্রী মাতঙ্গিনী কয়দিন ধরিয়া স্বামীর জন্ত হা হুতাশ করিতেছেন, এমন কি পেট ভরিয়া আহার পর্য্যন্ত করেন নাই। এরূপ অবস্থায় অসময়ে পোদ্দারকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া প্রথমে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন পরে হাপুশ নয়নে কাঁদিয়া বলিলেন—"তোমার মত কোন পুরুষ মানুষ মাগ-ছেলে ছেড়ে চুপ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, দেখাও দেখি? হাট কি কেউ করে না? এক হাট গেল, দু হাট গেল তিন হাট গেল তবু তোমার দেখা নেই, আমি মেয়ে মানুষ একা কি করি বল দেখি, ভাবনায় ছেলে দুটি শুকিয়ে গেছে, বলিহারি তোমার আক্কেলকে!"

কোমর হইতে টাকার গেঁজেগুলি খুলিয়া পোদ্দার স্ত্রীর হাতে দিয়া কহিলেন—"হেটোদের জন্ত অপেক্ষা করেই ত দেরী হয়ে গেল, এরা যে দুহাটে গেল না কার সঙ্গে আসি বল দেখি? রাস্তা কি ভালো? যমের মুখ থেকে পালিয়ে এসেছি মতি, চখের সামনে দেখলুম একজন লোককে খুন করে জলায় ফেলে রেখেছে, তোর এয়োত-বল খুব, তাই প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরেছি তা না হলে ও রাস্তা দিয়ে কেউ মাথা বাঁচিয়ে ফিরে আসে না মতি!"

মাতঙ্গিনী শুনিয়া কাঠ হইয়া রহিলেন, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"সব হেটোরা একসঙ্গে যে রাস্তায় ভয়ে ভয়ে যায় সেই রাস্তা দিয়ে তুমি একলা কি ক'রে এলে বল দেখি?"

"যে মুখখানি ক্ষণেক না দেখলে যুগ বলে জ্ঞান করি সেই মুখখানি তিন তিন সপ্তাহ দেখি নি, কি করে এসেছি, তুই কি জান্‌বি বল্? বরং ডাকাতের দশ ঘা লাঠি সহ্য করা যায়, তবু তোর বিরহ যে সহ্য ক'রতে পারি না মতি?" "ঢং আর কি কোত্থেকে কোথা, ভাবনা গেল চিন্তে গেল"—

মাতঙ্গিনীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পোদ্দার আবেগে স্ত্রীকে বুকে ধরিয়া তাঁহার গোলাপফুল্ল অধরে মিলনের প্রীতি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন; স্বামীর প্রশান্ত বক্ষে মাথা রাখিয়া সাধ্বী নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পোদ্দারের আগমনে দেশের হেটো মহলে আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল। সকলেই একবাক্যে পোদ্দারের অসীম সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আবদুল ও মজিদ্ রামজীবনপুরে আসিয়া পড়িয়াছে। গণেশ পোদ্দার দেশের নামজাদা ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার বাড়ী চিনিয়া বাহির করিতে দস্যুদের কোন কষ্ট হইল না। মজিদকে পাহারায় রাখিয়া আবদুল পোদ্দারের বাড়ীর খিড়কী দিয়া নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। স্বামী সমস্তদিন অনাহারী, সেইজন্ত পোদ্দার গৃহিণী রন্ধন কার্য্যে অন্তমনস্কা সুতরাং কখন যে আবদুল বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছে, কিছুই জানিতে পারেনাই।

উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া গরম দুধের ঘটীটি রন্ধন গৃহে রাখিতে গিয়াছেন, আবদুল এই অবকাশে এক পা এক পা করিয়া হামারের কাছে গিয়া উহার তলায় লুকাইয়া রহিল। গৃহিণী আবার যখন গৃহ মধ্যে গিয়া ভাতের হাঁড়ি রাখিয়া আসিলেন, আবদুল হামারের তলা হইতে বাহির হইয়া একেবারে ছাদের উপর উঠিয়া গেল।

পূর্ণিমার রাত্রি, চতুর্দ্দিক্ আলোকে আলোকিত। ছাদের আলিশায় মুখ বাড়াইয়া আবদুল পোদ্দারের বাড়ীতে কোথায় কি আছে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল।

গৃহিণী ছোট ছেলে দুটিকে খাওয়াইয়া উপরের ঘরে আসিলেন। বিছানা পাতা ছিল, ছেলেরা শুইয়া পড়িল; ঘরে প্রদীপ জালিয়া বাহির হইতে দরজা ভেজাইয়া দিয়া গৃহিণী আবার নীচে আসিলেন। পোদ্দার তখনও বাহিরে আছেন, বাড়ীতে আর কেহই নাই। গৃহিণী লণ্ঠনটি হাতে লইয়া খিড়কীতে খিল দেওয়া হইয়াছে কিনা দেখিয়া আসিলেন, তারপর গোয়ালে আসিয়া গরুর ডাবায় জল নাই দেখিয়া এক কলসী জল ঢালিয়া দিলেন। কর্ত্তার তখনও দেখা নাই, অগত্যা মাতঙ্গিনী রান্না ঘরে শিকল দিয়া পান সাজিতে বসিলেন। লণ্ঠনটি দাওয়ার উপর জ্বলিতেছে, আবছুল ছাদে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতে লাগিল।

অবিলম্বে দোকান বন্ধ করিয়া পোদ্দার বাড়ী ফিরিলেন। গৃহিণী শশব্যস্তে স্বামীর খাইবার স্থান পরিষ্কার করিয়া আসন পাতিয়া দিলেন, পরে জলের গেলাস ও ভাতের থালা দিয়া গেলেন।

পোদ্দার খাইতে বসিলেন বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। স্বামীকে অন্যমনস্ক দেখিয়া মাতঙ্গিনী ধীরভাবে কহিলেন,—"যত রাজ্যির ভাবনা খাবার সময়, সমস্ত দিন অনাহারে রয়েছ খেয়ে নাও।" পোদ্দার শুধু একটি হুঁ দিয়া গেলেন। থালার ভাত থালাতেই পড়িয়া রহিল।

সদানন্দ স্বামীকে বিমর্ষ দেখিয়া গৃহিণী এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবচো বল দেখি, খেয়ে নাও না।"

"বড় ভীষণ ভাবনা গিন্নি, ডাঙ্গায় কিছু করতে না পেরে ডাকাতরা বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটে এসেছে, রাস্তায় দেখলুম, ডাকাতদের মধ্যে একজন আমারই বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর একজনকে দেখতে পাই নি, সম্ভবতঃ সেও এসেছে, কোন জায়গায় নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। ব্যাপার বেশ সুবিধে ব'লে বোধ হচ্ছে না।"

"ওমা, সে কি গো? ডাকাত? বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

"আঃ——ওই জন্তই ত তোকে কোন কথা বলিনি, চুপ কর্ না অত চেঁচাস্ কেন? সদরে খিল দিইছিস্?"

"দিইছি।"

"খিড়কীতে?"

"সে সন্ধ্যার পরই দিয়ে এসেছি।"

পোদ্দার থালার ভাতগুলি নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মুখ হাত ধুইয়া পান খাইলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত পোদ্দার স্ত্রীর কথায় একেবারে বিশ্বাস না করিয়া আলোক হস্তে বাড়ীর সমুদয় অংশ, সদর, খিড়কী, গোয়াল, রান্নাঘর, হামার সমস্ত জায়গা দেখিয়া তবে তামাক খাইতে বসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া মাতঙ্গিনীর হৃদকম্প উপস্থিত হইল। স্বামীর পাতে সামান্য ভাত লইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে খাইতে বসিলেন। দাওয়ার উপর বসিয়া পোদ্দার এক মনে তামাক খাইতেছেন। রাত্রি তখন প্রায় দশটা হইবে, পূর্ণিমার চাঁদের আলোকে সমস্ত বাড়ীখানি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে, সেই আলোকে তাঁহার বাড়ীর ছাদের ছায়া উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে, পোদ্দার দেখিলেন যেন একটি ছায়া মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব ছাদের ছায়ার সহিত মিশিয়া উঠানের উপর উঁকি মারিতেছে।

কাপড় মনে করিয়া পোদ্দার প্রথমে উপেক্ষা করিলেন। তারপর উঠানের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখেন ছায়া-মূর্ত্তিটিকে একবার বেশ ভাল দেখা যাইতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে, কাপড় হইলে ত ওরূপ হইত না; পোদ্দার ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ছায়া কাপড়ের নয়, মনুষ্যমূর্ত্তির।

স্ত্রীকে কোন কথা বলিলে চীৎকার করিয়া উঠিবে ভাবিয়া পোদ্দার হুঁকাটিকে দাওয়ার গায়ে রাখিয়া নীরবে ও নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিলেন। বাড়ীতে কোন অস্ত্র ছিল না, সিঁড়ির পাশে একখানি ভাঙ্গা বঁটীর বাঁট পড়িয়াছিল, তাহাই হাতে লইয়া ছাদের দ্বারে আসিয়া দেখেন তখনও মূর্ত্তিটি আলিসায় মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে।

বাঁটখানিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া পোদ্দার পিছন হইতে মূর্ত্তির মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্ত্তিটি ছাদের উপর হেলিয়া পড়িল, আর দ্বিতীয় আঘাতের প্রয়োজন হইল না।

পোদ্দার অনেকক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,

যখন দেখিলেন মূর্ত্তিটির আর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না, একইভাবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, তখন ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া দেখেন, দস্যু আবদুল এক আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পোদ্দারের মাথা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল্। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে অস্বাভাবিক স্পন্দন ও ভয়ে আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, মাথায় হাত দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

তবু পোদ্দারের বিশ্বাস হইল না যে মানুষ এক আঘাতেই মারা যায়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আবার মৃতদেহটিকে পরীক্ষা করিলেন, যখন দেখিলেন দস্যু প্রকৃতই মরিয়া গিয়াছে তখন পোদ্দার দুই হাতে সজোরে বুক চাপিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে দস্যুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন; দুই চোখ দিয়া দর-দর ধারায় অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া আসিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"বন্ধু এই রকম ভাবে প্রাণ দেবে ব'লেই কি এখানে এসেছিলে? তুচ্ছ টাকার জন্য প্রাণ দিলে?"

পোদ্দারের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল আর, বলিতে পারিলেন না। কিন্তু রাতারাতির মধ্যে শবদেহের ব্যবস্থা কিছু করতেই হইবে দিনের বেলায় লোক জানাজানি হইয়া গেলে পুলিশের কানে উঠিতে কতক্ষণ?

পোদ্দার তরতর্ করিয়া নামিয়া আসিলেন, তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মতি, হেলে গরুটা কোন্ গোয়ালে আছে?"

এতদূর একটা ঘটনা হইয়া গেল মাতঙ্গিনী কিছুই জানেন না তাই সহজভাবেই বলিলেন—"এত রাত্রে গরু"?

"দরকার আছে?"

"এমন কি দরকার? গরু না হ'লে চ'লবে না?"

"কেন দরকার দেখে যা" বলিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া আবার ছাদে উঠিলেন দস্যুর মৃতদেহ দেখাইয়া পোদ্দার গম্ভীর ভাবে বলিলেন—এরই জন্য গরুর দরকার হয়েছে মতি? আগে শুন্‌লি নি একজন দস্যু বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অন্য দস্যুটিকে দেখতে পাই নি, এখন দেখলুম এই আমাদের অলক্ষ্যে বাড়ীর মধ্যে এসে লুকিয়ে ছিল; যাক্ অতটা ভাবিনি যে এক ঘায়েই শেষ হয়ে যাবে।"

মাতঙ্গিনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন—"ওগো, কি ক'রলে তুমি, শেষে মানুষ খুন করে ব'সলে? ওগো তুমি কি সর্ব্বনাশ করলে গো?"

"না করলে এই আমাকে খুন করে যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে রাতারাতির মধ্যে চম্পট দিত, তুই চেঁচাস নি, রাত্রের চীৎকার অনেক দূর যায়, চারদিকের লোকের এখনি ঘুম ভেঙ্গে যাবে,—সব জানাজানি হয়ে যাবে, পুলিসের কাণে উঠলে রক্ষে রাখবে না। গোয়াল থেকে গরুটাকে নিয়ে আয় ছালায় পুরে লাস্‌টাকে শ্রীনগর পার ক'রে দিয়ে আসি।"

একদিকে ছাইয়ের বোঝা অপর দিকে ছালার মধ্যে দস্যুর মৃতদেহটিকে রাখিয়া গরুর পিঠে তুলিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে কোদালটি লইতেও ভুলিলেন না। তখন নিশুতি রাত, চতুর্দ্দিক্ নীরব, নিস্তব্ধ, রাস্তায় জন-মানব নাই। কচিৎ দুই একটি নিশাবিহারী কুকুর গৃহস্থের কুটীরদ্বারে কুণ্ডলী হইয়া শুইয়া আছে এবং দূরাগত শৃগালের উচ্চধ্বনির সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

শ্রীনগরের পশ্চিমপ্রান্তে বহুদূরব্যাপী জলাভূমি। পোদ্দার গরুটীকে তাড়াইয়া একেবারে জলার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, জলার মাটি আল্‌গা, অল্প সময়ের মধ্যে এক কোমর গর্ত্ত হইয়া গেল। লাসটিকে গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পোদ্দার ছালার সমস্ত ছাই ঢালিয়া, তারপর মাটি দিয়া গর্ত্তের মুখ পূর্ণ করিয়া দিলেন, একটু চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

আর বিলম্ব না করিয়া পোদ্দার গরু লইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত রাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা নাই, তদুপরি সমস্ত দিন অতদূর রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছেন, শরীর ও মন উভয়ই অবসন্ন। পথিমধ্যে রাজার পুকুরে স্নান করিয়া পোদ্দার রাত্রি থাকিতে থাকিতে গৃহে আসিলেন।

গরুটিকে গোয়ালে রাখিয়া পোদ্দার শুইয়া পড়িলেন কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। এক আকস্মিক বিপদা-শঙ্কায় সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। বালিশে মুখ গুঁজিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

(৫)

এদিকে মজিদ সমস্ত রাত্রি আবদুলের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। প্রভাত হইল, আবদুলের দেখা নাই। মজিদ অস্থির হইয়া পড়িল, পোদ্দারের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া শীষ্ দিতে লাগিল। এই আসে, এই আসে করিয়া সমস্ত দিন গেল, রাত্রি কাটিল তবু আবদুল আসে না, তখন মজিদ বুঝিল দুর্বৃত্ত গণেশ পোদ্দার অসহায় আবদুলকে নিশ্চয়ই হত্যা করিয়াছে, জীবিত থাকিলে দুই দিন কোন মতেই সে অনাহারে গা আড়াল দিয়া থাকিতে পারিত না। যাই যাই করিয়া মজিদ সেদিন রহিয়া গেল, রাত্রিও এইভাবে কাটিল। ভোরের সময় মজিদ আবদুলের মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া আড্ডায় ফিরিয়া গেল।

মজিদের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া সর্দ্দারের দৃঢ় বিশ্বাস হইল আবদুল আর জীবিত নাই। গণেশ পোদ্দারের উপর আগে থেকেই তাহার রাগ ছিল, এই ব্যাপারে আরও ক্ষেপিয়া উঠিল।

সহরের ভিতর পোদ্দারের কোন অনিষ্ট করা অসম্ভব ভাবিয়া সর্দ্দার প্রতিশোধ লইবার জন্য জেলার হাকিমের নিকট এই মর্ম্মে দরখাস্ত দিল গণেশ পোদ্দার বাড়ীর মধ্যে তাহার আত্মীয় আবদুলকে হত্যা করিয়াছে। লাস কোথায়ও সরাইতে পারে নাই, বাড়ীর মধ্যেই আছে।

প্রাতঃকালে গণেশ পোদ্দার সবেমাত্র দোকান খুলিয়া ধুনা দিতেছেন, এক ডজন পুলিশ প্রহরী সমেত দারোগা সাহেব তাঁহার দোকানে উপস্থিত হইলেন। অপরে না জানুক পোদ্দারের অন্তঃকরণ জানে সে অপরাধী; তাই হঠাৎ পুলিশ দেখিয়া পোদ্দারের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল, কিন্তু মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য-ভাব না দেখাইয়া গণেশ পোদ্দার যথাসম্ভব সংযত চিত্তে দারোগা সাহেবকে বসিবার স্থান দিয়া নম্রভাবে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দারোগা সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন—"গণেশবাবু আপনার বাড়ীতে লাস আছে, বাড়ীর মেয়েদের স'রে যেতে বলুন আমি থানা তল্লাসী কর্ব্ব"—

গণেশ পোদ্দারের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল তবু যতদূর সম্ভব নিরীহের ন্যায় ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"আমার বাড়ীতে লাস আছে? এ কি বলছেন—হুজুর! আমি ত এর বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পার্‌ছি না, আমার বাড়ীতে লাস কি করে থাকবে?"

সিগারেট টানিতে টানিতে দারোগা সাহেব জবাব দিলেন—"পুলিশে খবর গেছে, আপনি খুন করে লাস লুকিয়ে রেখেছেন কি করে থাকবে, কোত্থেকে আসবে, খানাতল্লাসীতে সব বেরিয়ে পড়বে।"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া পোদ্দার বলিবেন—

"আমার কোন আপত্তি নাই দারোগা বাবু, আপনি স্বচ্ছন্দে আমার বাড়ী অনুসন্ধান কর্ত্তে পারেন, কিন্তু লাস পাওয়া না গেলে?"

"পাওয়া না গেলে আপনার ওপর কোন ঝুঁকি আসবে না; পুলিশের সন্দেহ ভঞ্জন হলে কোন ভয়ের কারণ নেই।"

দারোগা সাহেব পোদ্দারের সমস্ত বাড়ীখানি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও লাস পাওয়া গেল না। অলীক সংবাদ দাতার শাস্তি হওয়া উচিত কিনা ভাবিতে ভাবিতে দারোগা সাহেব দোকানে ফিরিয়া আসিলেন।

পোদ্দারের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, বিশেষ যত্ন সহকারে দারোগা ও তাঁহার সহচরদিগকে পরিতোষরূপে জলযোগ করাইয়া বিদায় দিলেন। দারোগা সাহেব রণজয়ী সৈন্যের মত প্রহরী সমেত ফিরিয়া চলিলেন।

রামজীবনপুর পার হইয়া শ্রীনগরে আসিয়াছেন, দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি, চিল ও কাক উড়িতে দেখিয়া দারোগা সাহেব আর অগ্রসর হইলেন না, দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত চিল কাক উড়ছে কেন ব'ল দেখি?"

জমাদার বলিল—"হুজুর, বোধ হয় কেউ মরা গরু বা

কুকুর ফেলে গিয়ে থাকবে, তাই অত চিল ও শকুনি উড়্‌ছে।"

কথাটী দারোগার ঠিক কাণে লাগিল না; মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"উঁহু, ওটা ত গো-ভাগাড় নয় যে ওখানে মরা গরু ফেলবে, চল দেখি, দেখা যাক্ ব্যাপার কি।"

দারোগা সাহেব পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মেঠো রাস্তা ধরিলেন।

জলার আলগা মাটি, তাই রাতারাতির মধ্যে মাটি সরাইয়া শৃগালের দল শবদেহ বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। প্রভাত হইতে না হইতে না হইতেই চিল, কাক ও শকুনির দল মরাটিকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে।

দারোগা সাহেবের বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহাই কথিত ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃতদেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য দুইজন পুলিশ প্রহরীকে ঘটনাস্থলে নিযুক্ত রাখিয়া দারোগা সাহেব পুনরায় রামজীবনপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং পোদ্দারকে তখনই ধৃত করিয়া জেলায় চালান দিলেন।

রামজীবনপুরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

(৬)

আজ গণেশ পোদ্দারের বিচারের দিন। অনেকগুলি বড় বড় উকিল আসামীর বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। গণেশ পোদ্দারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে দস্যুপতি করিম সেখ একজন উকিলের স্থানে চারজন উকিল নিযুক্ত করিয়াছে। সমস্ত দস্যুর দল মামলার শুনানী শুনিতে উপস্থিত।

এই কয় দিনে পোদ্দারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অত দম্ভ, অত তেজ, অত শক্তি সমস্তই যেন কর্পূরের মত উপিয়া গিয়াছে। পলকে পলকে শিহরিয়া উঠিতেছেন, যখনই আবদুলের কথা মনে পড়িতেছে, বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইতেছে। পোদ্দার স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এ মোকদ্দমায় তাঁহার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।

জজসাহেব আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন।

—"গণেশ যা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব সব সত্য বলবে"।

কৃতাঞ্জলীপুটে পোদ্দার উত্তর দিলেন—

—"ধর্ম্মাবতার, প্রাণ গেলেও মিথ্যা বোলবো না, সব সত্য বোলবো।"

—"ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে ব'লছ?"

—"হাঁ হুজুর ঈশ্বরের নামে শপথ করে ব'লছি।"

—"তুমি আবদুলকে খুন করেছ?"

—"হাঁ হুজুর খুন ক'রেছি তবে যদি অভয় দেন সমস্ত নিবেদন করি।"

—"বল, তোমার যা বক্তব্য আছে নির্ভয়ে বল।"

—"ধর্ম্মাবতার, আবদুল দস্যু, রাঙামাটি থেকে আমার সঙ্গ নিয়েছিল; অনেক কৌশলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, আমায় ধর্ত্তে না পেরে, বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটে আসে, সকলের অলক্ষ্যে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক'রে আমাকে খুন করবার জন্য ছাদের উপর লুকিয়ে থাকে। চাঁদের আলোয় তার ছায়া মূর্ত্তি দেখি, জখম কোরবো বলে তাকে আঘাত করি, মেরে ফেলা উদ্দেশ্য ছিল না।"

—"স্বীকার করি, আবদুল ডাকাত, কিন্তু ওকে আঘাত না করে পুলিশে সংবাদ দিলে না কেন।"

—"হুজুর, চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটে না গেলে ত পুলিশে খবর দিতে পার্ব্বো না, আর খবর দিতে গেলে আমাকেই যেতে হয়, যমের মুখে, স্ত্রী ও দুটি শিশুকে রেখে কোন ভরসায় যাই ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"আবদুল যে তোমায় খুন কর্ব্বার জন্য বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে ছিল একথা আদালত কি ক'রে বিশ্বাস কোরবে? তার যে লুট কর্ব্বার মতলব ছিল না, খুন করবার মতলব ছিল তুমি জান্‌লে কি করে? তার প্রমাণ না দেখালে তোমার কথায় কি করে বিশ্বাস করি?"

—"হুজুর যা ব'লেছি সমস্ত বর্ণে বর্ণে সত্য এর মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যা নেই। আমি ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি, আদালতের বুকে দাঁড়িয়ে, তামা, তুলসী, গঙ্গাজল নিয়েও যদি শপথ করতে বলেন, তাও বলতে পারি যা ব'লেছি সব ধ্রুব সত্য।"

হাকিম আবার নীরব হইয়া রহিলেন, জুরীদের মতামত

গ্রহণ করিবার জন্ত অন্য কক্ষে উঠিয়া গেলেন। আদালত গৃহ নীরব কেবল উপস্থিত লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাস শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যাইতেছে না।

জুরীদিগের সহিত হাকিম পুনরায় বিচার কক্ষে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"শোন গণেশ, ন্যায় দণ্ড ধরে বিচার ক'রতে গেলে হত্যাপরাধে তোমার দণ্ড অনিবার্য্য। এতে তোমার দুঃখ করবার কিছু নেই; তোমার প্রাণ দণ্ড ছাড়া অন্য কোন দণ্ড আইনে পাচ্ছি না।"

দস্যুদলের মধ্যে অস্ফুট হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। গণেশ পোদ্দার অশ্রুচক্ষে কাঠগড়ায় বসিয়া পড়িলেন আর দাঁড়াইতে পারিলেন না।

সহসা একজন হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণ পুলিশ কর্ম্মচারী বিচার গৃহে প্রবেশ করিয়া হাকিমের সম্মুখে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"হুজুর, গণেশ পোদ্দার যা ব'লেছেন সমস্ত সত্য, আমি তার সত্যতার প্রমাণ দেখাব।"

গণেশ পোদ্দারে দলস্থ ব্যক্তিরা একটু আশ্বস্ত হইলেন, সমস্ত ডাকাতের মুখে বাক্য নিঃসৃত হইল না।

যুবক জলদগম্ভীর স্বরে হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, —"ধর্ম্মাবতার, আমি একজন ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ, ভিকু-দাসের ডাঙ্গায় ডাকাতের সন্ধান নিতে ছদ্মবেশে গেছলেম, গভর্ণমেণ্টের পুরস্কার ছিল পাঁচশত টাকা, লোভ সাম্‌লাতে পারলুম না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যুবকটি করিম সেখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"চিন্তে পার সর্দ্দার?"

সর্দ্দারের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। সমগ্র দস্যুদের ভিতর চাঞ্চল্য ভাব লক্ষিত হইল।

কিন্তু তখন চতুর্দ্দিক্ বদ্ধ; কোনও দিকে পলাইবার পথ নাই, বিচার কক্ষের প্রত্যেক দ্বারে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী পাহারা দিতেছে।

যুবক উচ্চ হাস্যে কহিলেন—"তুমি বলবে চিনি না, আমি কিন্তু আজীবন ভুলবো না, এই যে মাথায় ও মুখে তোমার লোহা বাঁধান লাঠির আঘাতের চিহ্ন, অনেকদিন মনে করিয়ে রাখবে।"

পরে হাকিমের দিকে চাহিয়া যুবক বলিতে লাগিলেন— "ধর্ম্মাবতার, এরা সকলেই দস্যু, এদের পেশা রাহাজানি, খুন আর লুণ্ঠন, গণেশবাবু যা যা ব'লেছেন আদ্যোপান্ত সত্য, গণেশবাবুর দয়ায় আমার জীবন রক্ষা হয়েছে।"

জজসাহেব ডিটেকটিভ্ যুবকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তখনই দস্যুদিগকে হাজতে চালান দিয়া বিচারের দিন ফেলিয়া দিলেন। গণেশ পোদ্দার বেকসুর খালাস পাইলেন।

যুবকের অযাচিত করুণায় মুক্তিলাভ করিয়া পোদ্দার গদগদ কণ্ঠে কহিলেন—"মহৎ যুবক, এ বিপদে আপনি যদি না আস্‌তেন তাহলে আমার প্রাণদণ্ড ত হয়েছিলই! কি বল্‌ব, কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব আপনাকে, আপনিই আমার বিপদের বন্ধু, জীবনদাতা।"

যুবক আবেগভরে বলিলেন—"গণেশবাবু এ জীবন আপনিই আগে দান ক'রেছেন তা না করলে এতদিন এ দেহের অস্তিত্ব শৃগাল কুকুরের উদরে মিশিয়ে যেত, জীবন-দাতা আমি না আপনি গণেশবাবু?"

যুবকের চক্ষু বহিয়া দর দর ধারায় অশ্রুরাশি গড়াইয়া পড়িল, পোদ্দার যুবককে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ের অশ্রুস্রোতে উভয়ের বক্ষোদেশ প্লাবিত হইয়া গেল।

স্মৃতিবাসরে*

শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত

আজ স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস মল্লিকের স্মৃতি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই কথা মনে পড়িতেছে এই স্মৃতি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার যাঁহার উপর চিরদিনই অর্পিত হইত। সে আর কেহই নয়, সে আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু উমাকান্ত পাল। একদিন পরিহাসচ্ছলে এইরূপ একটি স্মৃতি সভায় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, "তুমি ত প্রতিবার প্রবন্ধ লেখ, আর আমি কবিতা পাঠ করি; কিন্তু এবার আমি কৃষ্ণ বাবুর স্মৃতি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিব, আর তুমি কবিতা লিখিবে।" তখন বুঝি নাই যে বন্ধুবর সত্য সত্যই তাঁহার সরস কাব্য শুনাইবার জন্য অন্য জগতে চলিয়া যাইবেন; আর আমি আপনাদিগকে এই নীরস গদ্যে লিখিত প্রবন্ধ শুনাইয়া বিরক্ত করিবার জন্য এখানে পড়িয়া থাকিব। যাহা হউক, আজ যে মহাত্মার স্মৃতি তর্পণ করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। যদিও আমি তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনের সহিত সম্যক্ পরিচিত নহি, এমন কি তাঁহার যৌবনের প্রথমাংশেও তাঁহার সঙ্গলাভ করি নাই, তথাপি তিনি যখন মধ্য যৌবনে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত—মধ্যাহ্ন গগনস্থ উজ্জ্বল সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় দীপ্তিতে ভাস্বর—কর্ম্মবীর বলিয়া সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ —সেই সময়ে আমি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম এবং ধন্য হইয়াছিলাম। এই সভায় তাঁহার বহু আত্মীয় ও বন্ধু উপস্থিত আছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের কথা শুনাইবেন; কিন্তু আমি কৃষ্ণবাবুকে নিজে যতটুকু দেখিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে সেইটুকু বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সার্দ্ধ দুই বৎসর কালের পরিচয়ে তাঁহার চরিত্রের যে সকল দুর্ল্লভ গুণ আমার দৃষ্টি-গোচরে আসিয়াছে তাঁহাতে তাঁহাকে একজন আদর্শ পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। তিনি যে কেবল গুণবান ছিলেন তাহা নহে, মানব মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে তাঁহার শক্তি অসাধারণ ছিল। যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। তিনি Blackwood and Blackwood Co.র আফিসে বড়বাবু ছিলেন। আফিসে তাঁহার অধীনস্থ এবং উপরিতন সকল কর্ম্মচারীই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন। লোকের দুঃখ দূর করাই তাঁহার স্বভাব ছিল এবং কতজন তাঁহার কৃপায় অন্নসংস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

পরের উপকার করিবার জন্য তিনি সততই ব্যগ্র থাকিতেন। কেহ কোন অভাব বা বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহার দুঃখমোচনে যত্নবান হইতেন এবং সাধ্যমত পরোপকারে অর্থব্যয় করিতেও মুক্তহস্ত ছিলেন। যে করাল ব্যাধি তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছে সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি পরের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা অতিশয় প্রবল ছিল এবং কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলে যতক্ষণ তাহা সুসম্পন্ন না হইত ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শান্তি থাকিত না। ছাত্র জীবনে তিনি বি এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলেও শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে কখনও তাঁহার উদ্যমের অভাব ছিল না এবং কি ইংরাজী কি বাঙ্গালা ভাষায় অনর্গল প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। আজকাল বাক্যবীরের সংখ্যাই অধিক কর্ম্মবীরের সংখ্যা খুবই অল্প;

---

*"শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউট" স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস মল্লিকের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

কিন্তু কৃষ্ণদাস কেবল বাক্যবীর ছিলেন না, তিনি যাহা মুখে বলিতেন তাহা কর্ম্মে পরিণত করিতে কখনও তাঁহার সৎ সাহসের অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। হীরক যেখানেই থাকুক না কেন, তাহার উজ্জ্বলতা যেমন সমান থাকে ও তাহার জ্যোতিতে চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণবাবু যখন যেখানে থাকিতেন, তখনই সেই স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইতেন। প্রথমে তিনি কলিকাতায় চোরবাগান ও আহিরীটোলা অঞ্চলে বাস করিতেন এবং যতদিন সেই সকল স্থানে ছিলেন ততদিন স্থানীয় যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের হৃদয়কে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত করিয়া তাহাদের সহিত এক-যোগে বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। আবার যখন তিনি বহুবাজার অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন এ স্থানের উন্নতি বিধানে কৃতসঙ্কল্প হন। সেই সময়েই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হয়, এবং যে শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের গৃহে আজ তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি সেই শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। আমাদের ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তের তিনি নিকট আত্মীয় ছিলেন। তাঁহারই সহিত পল্লীবাসী যুবকগণের উন্নতিকল্পে এই পল্লীতে একটি লাইব্রেরী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হইবার অব্যবহিত পরেই—কৃষ্ণদাস বাবু স্থানীয় যুবকগণকে একটি সভায় আহ্বান করিয়া শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের বীজ রোপণ করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই বীজই আজ পত্র-পুষ্প-সুশোভিত বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া কৃষ্ণদাসের কর্ম্মকুশলতার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি প্রথমে ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক মনোনীত হন এবং পরে ইহার সহকারী সভাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কত স্থানীয় যুবকের মতি-গতি কৃষ্ণবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া পরিবর্ত্তিত ও সৎপথে পরিচালিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যুবকেরাই জাতির আশা ও ভরসাস্থল এবং সেই জন্যই যুবকগণকে সুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি স্বয়ং তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা-দিগকে সুপথে পরিচালিত করিতেন।

আজকাল এমন অনেক নেতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অধীন ব্যক্তিবর্গের পরিশ্রমলব্ধ গৌরবেই নিজেরা গৌরবান্বিত হন, অর্থাৎ, বিপদের সম্মুখীন হইয়া প্রাণপাত করে নগণ্য ব্যক্তিগণ—আর নেতারা রোল্‌স্‌রয়্‌ গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়া খাইয়া নাম কেনেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস সেরূপ নেতা ছিলেন না; তিনি স্বয়ং সহকর্ম্মিগণের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাই আজও তিনি আমাদের হৃদয়-মন্দিরে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি প্রত্যেককে মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের সুযোগ দিতে অবহেলা করিতেন না; কোন সহকর্ম্মীকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং গৌরব লাভ করিবার চিন্তা তাঁহার নিঃস্বার্থ অন্তঃকরণে কখনও স্থান পায় নাই। আজ শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ যে সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সে শিক্ষার গুরু আর কেহই নন—স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস মল্লিকই প্রাণপণে আমাদের সে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, কৃষ্ণদাস শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র কতিপয় পুস্তক লইয়া যে ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হয়, তাহা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল। যিনি যতই ইন্‌ষ্টিটিউটের মঙ্গল চিন্তায় উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পদচারণ করিয়া রাত্রি যাপন করুন, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, কৃষ্ণবাবু বহু সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও এই ক্ষুদ্র ইন্‌ষ্টিটিউটের উন্নতি-বিধান তাঁহার জীবনের এক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, ঈদৃশ কর্ম্মবীর সম্ভবতঃ কর্ম্ম-জীবনের কোলাহলের মধ্যে ধর্ম্ম চিন্তার অবকাশ পাইতেন না। কিন্তু তাহা নহে। তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে স্বগৃহে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণে নিযুক্ত থাকিতেন ও দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগী ছিলেন ও বৈষ্ণবগণের অন্যতম প্রধান তীর্থ শ্রীপাট সপ্তগ্রামের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ও তদীয় প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-নিকেতন উক্ত তীর্থের উন্নতিকল্পে তিনি কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত থাকিতেন। আজ কৃষ্ণদাস

বাবু জীবিত থাকিলে তিনি দেখিয়া সুখী হইতেন যে, ইদানীং শিক্ষিত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। ইহা বিশেষ আশার কথা সন্দেহ নাই।

অভিনেতা হিসাবেও কৃষ্ণদাসের স্থান উর্দ্ধে ছিল। তিনি যখন প্রাণস্পর্শী অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতেন, তখন বাস্তবিকই সাধারণে বিস্মৃত হইত যে কৃষ্ণবাবু অভিনয় করিতেছেন; এবং যে ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইতেন, সকলে মনে করিত সেই ভূমিকার নায়ক প্রকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপনীত হইয়াছে।

গল্প ও প্রবন্ধ রচনাতেও কৃষ্ণবাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু গল্প ও প্রবন্ধ অনেক মাসিক পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। যখন তাঁহারই উদ্যমে "শান্তি ম্যাগাজিন্" নামক হস্ত-লিখিত মাসিক পত্রিকাখানি শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধাদি সম্ভারে পূর্ণ হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, তখন তিনি সেই পত্রিকার অন্যতম গল্প-লেখক ছিলেন।

স্বজাতি-প্রীতি কৃষ্ণদাস চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। স্বজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন ও সমাজের কুপ্রথাসমূহ দূরীকরণে তিনি সতত সচেষ্ট থাকিতেন। উচ্চ শিক্ষার আলোকে স্বজাতীয় যুবকবৃন্দের হৃদয় যাহাতে আলোকিত হয়, তজ্জন্য তিনি যত্নবান্ ছিলেন। সুখের বিষয়, আজকাল সুবর্ণবণিক্ যুবকগণ শিক্ষার মহিমা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনঃসংযোগ করিতেছেন। তাই আমরা ধনকুবের রাজা হৃষীকেশ লাহার বংশেও ডাক্তার কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত যুবক দেখিতে পাইতেছি এবং তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত যুবাকে সহরবাসীর প্রকৃত অভাব দূরীকরণে অগ্রসর হইয়া খাঁটী সরিষার তৈল প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে হৃষীকেশ অয়েল মিল স্থাপনে উদ্যোগী দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে অবস্থা এরূপ ছিল না। ধনগর্ব্বে মত্ত সুবর্ণবণিক্‌গণ শিক্ষা ও ব্যবসায়কে অবহেলা করিয়া দিন দিন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইতেছিল। তাই জাতির প্রকৃত হিতকামী কৃষ্ণদাস শিক্ষা-বিস্তার ও ব্যবসা-বিস্তারকল্পে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। তিনি সমাজের কলঙ্ক—পণপ্রথা দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কেহ যেন মনে না করেন যে, কৃষ্ণদাসের এই স্বজাতি-প্রীতি স্বার্থপরতার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। আজকাল একদল উঁচুদরের স্বদেশ-প্রেমিক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ভারতমাতার দুঃখে কাঁদিয়া আকুল; কিন্তু গৃহে জননীর গ্রাসাচ্ছাদন সরবরাহে উদাসীন; বিশ্ববাসীকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে উদ্‌গ্রীব; কিন্তু নিজের ভ্রাতাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ছল-কপটতার আশ্রয় গ্রহণেও পরাঙ্মুখ নহেন। কৃষ্ণদাস সেরূপ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন না। আবার সোণার ভারতে এমন বিশ্ব-প্রেমিকেরও অভাব নাই, যিনি কামস্কাট্‌কায় বন্যা হইলে কিংবা হনুলুলুতে দুর্ভিক্ষ হইলে, রুশিয়ায় ভূমিকম্প হইলে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চাঁদার খাতা খুলিয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেন না; কিন্তু বাংলাদেশে বন্যা হইলে, উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইলে, আসামে ভূমিকম্প হইলে উদাসীন থাকেন; নিজের পরিত্যক্ত গ্রামে কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত বা জলকষ্ট হইলে নিরুদ্বেগে কালযাপন করেন, প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগিলে কেবল নিজে নিরাপদে থাকিবার জন্যই বেহারাকে কাঁচ ভাঙ্গিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া দমকল ডাকিতে হুকুম দেন ও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। কৃষ্ণদাস সেরূপ বিশ্বপ্রেমিকও ছিলেন না। তিনি বুঝিতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্বীয় উন্নতির চেষ্টা করে, তাহা হইলেই সমগ্র জাতি উন্নত হয় এবং প্রত্যেক জাতি যদি উন্নতিশীল হয়, তবে দেশের উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারে না। তাই তিনি স্বজাতির উন্নতি বিধানে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু, তা' বলিয়া, অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না বা কাহারও উন্নতিতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলেন না। কৃষ্ণদাস-চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি যাহা ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন, তাহা সাধন করিতে কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিত না। সময়ে সময়ে হয়ত সেই কারণে বন্ধুগণের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটিত; কিন্তু কখনও

মনান্তর হয় নাই। কারণ, তাঁহার সদাহাস্য প্রফুল্ল মুখখানি দেখিলে মনের সকল আঁধার কাটিয়া যাইত।

কৃষ্ণদাস অনুপম নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখন রহস্যচ্ছলেও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কুপ্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন না। আদর্শ চরিত্র বাস্তবিকই বিরল। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে সমাজের যে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কারণ, একাধারে এরূপ গুণাবলীর সমন্বয়—সাধারণ চরিত্রে হওয়া খুবই বিরল। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুতে শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবে কিনা তাহা ঈশ্বর বলিতে পারেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কৃষ্ণদাস বহু সভা, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তথাপি সূর্য্য যেমন সকল স্থানে সমানভাবে কিরণ দেন, সেইরূপ কৃষ্ণদাসের হৃদয়ের অনেকাংশ এই ক্ষুদ্র শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউট অধিকার করিয়া ছিল। বিষুবরেখার ন্যায় এই ইন্‌ষ্টিটিউটের উপর সূর্য্যের প্রখরতম কিরণরাজি বর্ষিত হইত। কৃষ্ণদাস আমাদিগকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার পবিত্র আশীর্ব্বাদ এখনও এই ইন্‌ষ্টিটিউটের উপর বর্ষিত হইতেছে। এখনও যখনই কোন কারণে উদ্যমহীনতা ও কর্ম্ম-শৈথিল্য আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করে, কৃষ্ণদাসের ছায়াচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নব বল হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ, আপনারা সকলেই জানেন যে, মৃত ব্যক্তির প্রিয়কার্য্য সাধন করিলেই মৃত আত্মার পরিতৃপ্তি হয়। তাই আপনাদের সকলের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা কৃষ্ণবাবুর স্মৃতির প্রতীক তাঁহার প্রিয় এই শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে পরিচালিত করুন ; তাহা হইলে কৃষ্ণবাবুর স্মৃতি চির উজ্জ্বল থাকিবে। স্মরণ রাখিবেন, কৃষ্ণবাবুর সদিচ্ছা ও ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ আমাদিগকে নানা বাধা, বিপত্তি ও ঝটিকার মধ্যে পথ দেখাইবে। আমার সহকর্ম্মী যুবক বন্ধুগণ, যদি আলস্য আসিয়া তোমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, তবে কৃষ্ণদাসের ঐ উজ্জ্বল চক্ষুদুটির দিকে চাহিয়া দুর্ব্বলতা পরিহার কর—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। স্মরণ রাখিও—এ জীবন কেবল আহার, নিদ্রা ও বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়—দেশের ও দশের সেবার আনন্দ হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিও না। কৃষ্ণদাসের উপদেশ-বাণী সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া, কৃষ্ণদাসের আদর্শ তোমাদের মানস চক্ষে দেদীপ্যমান রাখিয়া তোমরা কবির সহিত সমস্বরে গাও—

> "মানব জীবন নহে সুখভোগ তরে,
> দারুণ কর্ত্তব্য আছে মাথার উপরে।
> আমি যদি মরি প্রাণে দুঃখ নাই তায়,
> কর্ত্তব্য সাধনে যেন এ জীবন যায়।"

অতীব আনন্দের বিষয়, কৃষ্ণবাবুর এই বার্ষিক স্মৃতি সভাধিবেশনের মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ কৃষ্ণদাসের প্রিয়তম তীর্থক্ষেত্র শ্রীপাট সপ্তগ্রামের দেবায়তন সংস্কার কল্পে "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" নাটকের সাহায্য-অভিনয়-লব্ধ যাবতীয় অর্থ প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণবাবুর স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের এই আন্তরিক সম্মান প্রদর্শনের বলবতী স্পৃহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় তাঁহাদের চরণে আমার মস্তক অবনত হইয়া পড়িতেছে।

সুবর্ণবণিক্-তত্ত্ব

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পল্লিবাল বেণিয়া—মারবার বা যোধপুর রাজ্যের পল্লী নগরবাসী, ইহারা জৈন ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী।

পুরবাল বেণিয়া—গুজরাটের পোর বা পুরন্দরবাসী, বর্ত্তমানে ললিতপুর, ঝান্সী, ক্যাশীপুর, আগ্রা, হামীরপুর ও বান্দা জেলায় ইঁহাদের অনেকের বাস। শ্রীমালী ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের পৌরোহিত্য করেন। ইঁহাদের যজ্ঞসূত্র নাই।

ভাটিয়া—রাজপুতানাবাসী, বিলাতি কাপড়ের ব্যবসায় ইঁহাদের একমাত্র উপজীবিকা। বোম্বাই, কলিকাতা পাঞ্জাব ও করাচী বন্দরে ইঁহাদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

মাহেশ্রী বা মাহেশ্বরী বেণিয়া—যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা, বিহার ও নাগপুর অঞ্চলে এই বণিক্‌জাতির বাস। ইঁহারা জৈন ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী কিন্তু তন্মধ্যে শেষোক্ত মতাবলম্বিগণের আধিক্য দেখা যায়। ভারতের প্রায় সকল প্রধান নগরেই ইঁহাদের বাণিজ্য-কুঠী আছে।

অগ্রহারী বেণিয়া—বারাণসী বিভাগে বাস, নিরামিষাশী ও উপবীতধারী। আরাজেলাবাসী অগ্রহারীরা শিখ ধর্ম্মাবলম্বী।

ধুনসর বেণিয়া—দিল্লী ও মীর্জ্জাপুরের মধ্যবর্ত্তী গাঙ্গেয় অন্তর্ব্বেদীতে ইঁহাদের বাস। ইঁহারা বৈষ্ণব মতাবলম্বী—অনেকে ধনশালী ভূম্যধিকারী, অবশিষ্ট কায়স্থ ও বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।

উম্মার বেণিয়া—আগ্রা, গোরখপুর, কানপুর প্রভৃতি জেলাসমূহে বাস। পিতার মৃত্যু না হইলে ইঁহারা উপবীত গ্রহণ করেন না।

রস্তোগী বেণিয়া—উত্তর অন্তর্ব্বেদী ও লক্ষ্ণৌ, ফতেপুর, ফরক্কাবাদ, মীরাট, আজমগড় প্রভৃতি যুক্ত প্রদেশের প্রধান প্রধান নগরে এই শ্রেণীর বহু বণিক্ বাস করেন। ইঁহারা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। ইঁহারাও পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন না।

কাসার বানী ও কসন্ধন বেণিয়া—যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে বাস। চাল, ডাল, ময়দা প্রভৃতি বিক্রয় করেন। ইঁহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন না। ইঁহারা রামোপাসক ও নিরামিষাশী।

লোহিয়া বেণিয়া—লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবসায়ী, কেহ কেহ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব, তবে দুই এক ঘর জৈনও দেখা যায়।

সোনিয়া বেণিয়া—স্বর্ণ বণিক্, বাঙ্গালার সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের ন্যায় ধনী নয়। স্বর্ণালঙ্কারাদি নির্ম্মাণ ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় ইঁহাদের ব্যবসা। গুজরাট হইতে আসিয়া বারাণসীতে বাস করিতেছেন।

বরসেনী ও শূরসেনী বেণিয়া—মথুরাবাসী ধনশালী বণিক্।

বরণবাল বেণিয়া—আজমগড়, গোরখপুর, মোরাদাবাদ, জৌনপুর, গাজীপুর, বেহার ও ত্রিহুত প্রভৃতি স্থানে বাস। ইঁহারা গোঁড়া হিন্দু, গৌড় ও মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের যাজকতা করেন। সকলে উপবীত ধারণ করেন না। অনেকে দোকানদার।

অযোধ্যাবাসী বেণিয়া—যুক্ত প্রদেশের নানা স্থানে ও বিহারে বাস।

জৈসবার বেণিয়া—অযোধ্যা প্রদেশের রায় বেরেলী জেলার জৈস্ পরগণায় বাস।

মহোরিয়া বেনিয়া—হামীরপুর জেলায় মহোবা নগরের অধিবাসী।

মহুরিয়া বেণিয়া—বেহার ও গঙ্গা যমুনার অন্তর্ব্বেদীবাসী বণিক্ সম্প্রদায় বিশেষ। ইঁহারা গোঁড়া হিন্দু এবং বৈশ্য বলিয়া পরিচিত। কৃষক রাখিয়া ইক্ষুর চাষ দ্বারা

চিনির একচেটিয়া কারবার করেন। ইঁহাদের তামাকু সেবন জাতিচ্যুতির সহিত নিষিদ্ধ।

বৈশ্য বেণিয়া—বিহার অঞ্চলে বাস। পিতল, কাঁসার বাসন ব্যবসায়ী। কেহ কেহ বা কৃষিকর্ম্ম করেন।

কাঠ বেণিয়া—বিহার অঞ্চলে বাস। দোকানদারী, ঋণ-দান ও কৃষি ইঁহাদের প্রধান কর্ম্ম। মৃতদেহ দাহ করেন ও ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ করেন। মৈথিল ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

রাওনিয়ার বেণিয়া—গোরখপুর, ত্রিহুত ও বিহার প্রদেশে বাস। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। কখন কখন স্বামী পরিত্যক্তা রমণীরও বিবাহ হইয়া থাকে। ইঁহারা শৈব কিন্তু লক্ষ্মীদেবীরও পূজা দিয়া থাকেন।

জমের বেণিয়া—যুক্ত প্রদেশের এতাবা জেলায় বাস। ইঁহারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন।

লোহনা বেণিয়া—ভাটিয়া জাতির অন্যতম শাখা, সিন্ধু প্রদেশে বাস।

বেরারি বেণিয়া—গুরগাঁও জেলার বেরারি নগরে বাস। ইঁহারা বস্ত্র-ব্যবসায়ী।

কান্দু বেণিয়া—সামান্য দোকানদার ও খাবার বিক্রেতা।

গুজরাটি বেণিয়া—গুজরাটে ১৬।১৭ শ্রেণীর বেণিয়া বাস করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যাজক ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব ও বল্লভাচার্য্য মতাবলম্বী বেণিয়ারা উপবীত ধারণ করেন। জৈন বেণিয়ারা উপবীত ধারণ করেন না।

দাক্ষিণাত্যের বেণিয়াজাতি—ইঁহাদের মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শেঠী বা শ্রেষ্ঠী ও লিঙ্গায়ত বণিকেরা প্রধান। নাগর্ত্ত, কোমতি প্রভৃতিও কয়েক প্রকার বেণিয়া দেখা যায়। সকলেই পণ্যজীবী। তন্মধ্যে শেঠীরা সকল শ্রেণীর প্রধান। ইঁহারা প্রভূত ধনশালী ও বাণিজ্যনিপুণ। আমিষ ও নিরামিষাশী উভয় শ্রেণীর শেঠী দেখা যায়। কেহ কেহ উপবীত ধারণ করিয়া বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা শূদ্র স্থানীয় মনে করেন। দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের দান গ্রহণ বা পৌরোহিত্য করেন না। শেঠীরা মাদ্রাজ, কৃষ্ণা, নেল্লুর, কড়াপা, কর্ণুল, মথুরা, কোয়েম্বাতোর, ব্রহ্ম, মহীশূর, কলিকাতা, বোম্বাই ও মালবার উপকূলে বাস করেন। লিঙ্গায়তগণ মহীশূরে বাস করেন ও কৃষক রাখিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া থাকেন। কোমতিরা তেলেগু দেশবাসী। ইঁহাদের আবার পাঁচ শ্রেণী—গাবুরি, কলিঙ্গ কোমতি, বেরি কোমতি, বালজী কোমতি ও সাগর কোমতি। গাবুরিরা নিরামিষাশী, আর অপর চারি শ্রেণী আমিষভোজী। কলিঙ্গ ও গাবুরিরা শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মত ও লিঙ্গায়তরা এবং অপর কোমতিগণ রামানুজ মতাবলম্বী। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের পৌরোহিত্য করেন।

উড়িষ্যার বেণিয়া—সোনার বেণিয়া ও পুটলী বেণিয়া। ইঁহারা বাঙ্গালার সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধবণিকের সমশ্রেণী। বঙ্গদেশের সুবর্ণবণিক্ ও গন্ধ বণিকের ন্যায় এখানে ইঁহাদের সামাজিক অবস্থা প্রায় অনুরূপ কিন্তু উড়িষ্যার সুবর্ণবণিক্‌গণ বাঙ্গালার সুবর্ণবণিকের ন্যায় ধনশালী নহেন।

বঙ্গের বৈশ্য—সুবর্ণবণিক্, গন্ধবণিক্, তাম্বুলী, বারুই, সাহা মহাজন (শুঁড়ি নহে), তিলি প্রভৃতি প্রকৃত বৈশ্য বংশধর। (সুবর্ণবণিকের ইতিহাস ক্রমশঃ সুবিস্তারে বর্ণিত হইবে।) গন্ধবণিক্—নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য ও মসলার ব্যবসায়ী। 'গান্ধিক কল্পবল্লী' নামক কুলগ্রন্থে হর-পার্ব্বতীর বিবাহকালে ইঁহাদের উৎপত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু এই অপরূপ উৎপত্তির কথা কোন প্রাচীন হিন্দু বা জৈন শাস্ত্রে না থাকায় কল্পিত কাহিনী বলিয়া মনে হয়। তাম্বুলী—পাণবিক্রেতা, ইঁহারা কোথাও কোথাও আপনাদিগকে তাম্বুল বণিক্ বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে যাহা উল্লেখ আছে তাহাও কল্পিত বলিয়া অনুমান হয়। তিলি, বারুই প্রভৃতি জাতি—ইঁহাদের উৎপত্তিসম্বন্ধেও কল্পিত কাহিনীর অভাব নাই।"

বিশ্বকোষকার বলেন যে, বৌদ্ধ যুগের অবসানে বঙ্গের অনেক বৈশ্য সন্তান শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইঁহাদের শিবভক্তি দেখিয়া ইঁহাদের কাহাকে কাহাকে শিবাঙ্গ-সম্ভূত বলিয়া প্রচার করেন। এই সকল কাহিনী অবলম্বনে ইঁহাদের কুলগ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

আল্‌বেরুণীর ভারতবর্ণনা

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল সাহিত্যরত্ন, কবিভূষণ

আল্‌বেরুণীর আর একটি নাম "আবু রাইহান"। তিনি ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের খাইভা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে যখন গজ্‌নীর মামুদ খাইভা জয় করেন, তখন তিনি আল্‌বেরুণীকে বন্দী করিয়া গজ্‌নীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। আল্‌বেরুণী একজন জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন। গজনীর মামুদ হিন্দুস্থান আক্রমণ করিয়া বারবার ভারতবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিলে, আল্‌বেরুণী স্বভাবতঃই বিজিত হিন্দুগণকে কৃপার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। কারণ অনেক হিন্দু পণ্ডিতের তাঁহার মত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তৎকালের হিন্দুগণের আচার-পদ্ধতির প্রশংসা ও নিন্দা তিনি সমভাবে করিয়াছেন। মামুদের ভারত-লুণ্ঠনের নিন্দা তিনি প্রকাশ্যে করিতে সাহসী হয়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "গজনীর মামুদ ভারতের সমস্ত সুখ সম্পদ্ নষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব প্রভাবে হিন্দু-জাতি ধূলিসম চূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণেই, মুসলমান অধীকৃত ভারত হইতে হিন্দুর জ্ঞানগরিমা প্রস্থান করিয়া তাঁহার অত্যাচারের বহির্দ্দেশে অর্থাৎ কাশ্মীর কাশী প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল।" পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান করার জন্য, এবং ম্লেচ্ছগণের সহিত কোন সম্বন্ধ বা সংস্পর্শ না রাখার জন্য, তিনি হিন্দুদিগের নিন্দা করিয়াছেন, যথা,—"হিন্দুরা তাহাদিগের বিদ্যা অপরকে সহজে দান করে না, এমন কি, ইহারা নিজেদের মধ্যেই সকলকে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে দেয় না, বিদেশী ত দূরের কথা। তাহারা মনে করে পৃথিবীটা যেন তাহাদের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। এই জগতে হিন্দু ভিন্ন যেন অন্য সভ্য জাতি নাই। ইহাদিগের অহঙ্কার এত অধিক যে, তুমি যদি খোরাসান্ বা পারসীসের কোন পণ্ডিতের নাম ইহাদিগের নিকট উল্লেখ কর, ইহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করিবে। হিন্দুরা যদি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর নানা জাতির সংশ্রবে আসিত, তাহা হইলে তাহাদিগের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইত, কারণ হিন্দুজাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ এত সঙ্কীর্ণমনা ছিল না।"

ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের পর ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীন বহু প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল রাজারা স্ব স্ব প্রধানত্ব বজায় রাখিবার জন্য পরস্পর বহুকালব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কাশ্মীর স্বাধীন হইল; সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণী কাশ্মীরবাসীর সহায়তা করিয়াছিল। গজনীর মামুদ কাশ্মীর জয় করিতে সক্ষম হয়েন নাই। সাহসী অনঙ্গপাল মামুদের দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইয়া কাশ্মীররাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুদেশ বিভক্ত হইয়া বহু ক্ষুদ্র মুসলমান সর্দ্দারগণের অধিকারে আসিল। গুর্জ্জরে মামুদ পত্তনের বা সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করিলেন। রাজপুতগণ চালুক্যদিগের হস্ত হইতে ঐ দেশ কাড়িয়া লইয়া তখনো তাহা নির্ব্বিবাদে শাসন করিতেছিল। মালবরাজ ভোজদেব বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পণ্ডিতপালক ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ধারা নগরী। আল্‌বেরুণী বলিলেন যে, ধারা নগরীতে রাজপুরীর দ্বারদেশে একটি জীবন্ত মনুষ্যকে মন্ত্রবলে রৌপ্যমূর্ত্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল। রৌপ্যখণ্ড তখনো দেখিতে পাওয়া যাইত। কাণ্যকুব্জ বঙ্গদেশের পালরাজগণের অধীনে আসিয়াছিল। পাল রাজাদিগের রাজধানী ছিল মুঙ্গের। কাণ্যকুব্জরাজ রাজ্যপাল মামুদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে ঐ লুণ্ঠিত নগরী পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যপাল বাড়ীনামক নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তথায় মহাপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। ঐ দুই পালরাজা

বৌদ্ধ ছিলেন। আল্‌বেরুণী বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম তখন ভারত হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

আল্‌বেরুণী মথুরানগরীর উল্লেখকালীন বলিলেন যে, এই নগরী বাসুদেবের জন্য বিখ্যাত। প্রয়াগ সম্বন্ধে বলিলেন যে, এই স্থানে হিন্দুগণ তাহাদিগের শাস্ত্রলিখিত নানারূপ দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া থাকে। তিনি বারাণসী, পাটলীপুত্র, মুঙ্গের ও গঙ্গাসাগর প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণে ধারা ও উজ্জয়িনী; উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর, মুলতান ও লাহোর; সেতুবন্ধ এবং সিংহলের মুক্তাতট; মালদ্বীপ এবং লক্ষদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেরও উল্লেখ তাঁহার বর্ণনা মধ্যে পাওয়া যায়।

জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে আল্‌বেরুণী যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে বৈশ্যগণ শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছিল। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "বৈশ্য এবং শূদ্রে বিশেষ প্রভেদ নাই।" (নবম অধ্যায়)। আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন "বৈশ্যগণ তাহাদিগের শাস্ত্রচর্চ্চা বা বেদপাঠ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে বেদশিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রগণকে বেদপাঠ দূরের কথা, বেদের শ্লোক শুনিতে পর্য্যন্ত দেন্ না।" আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন "বেদপাঠ, যজ্ঞকার্য্য এবং পূজার্চ্চনা ব্রাহ্মণের নিজস্ব। তাঁহারা বৈশ্য ও শূদ্রগণকে উহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি কোন বৈশ্য ও শূদ্র বেদের শ্লোক উচ্চারণ করে, তবে ব্রাহ্মণগণ রাজার নিকট নালিশ করিলে, রাজা ঐ বৈশ্য বা শূদ্রের জিহ্বা কাটিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন।"* বৈশ্যজাতি সম্বন্ধে মনু যে বিধান দিয়াছিলেন, আল্‌বেরুণীর সময়ে উহা কার্য্যে পরিণত ছিল না। বৈশ্যজাতি শূদ্রত্বে পতিত হওয়ায় তখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রজাতি ভারতের অধিবাসী ছিল। ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতি বঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হইল। প্রধান রহিল কে ?—ব্রাহ্মণ! এই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মই ভারতকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। বেদপাঠে বৈশ্যসন্তানের ব্রাহ্মণের সহিত সমান অধিকার ছিল; নবম দশম খ্রীষ্টাব্দে সেই বৈশ্যসন্তানের দ্বিজত্ব রহিত করিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে শূদ্রত্বে পাতিত করিলেন! এইরূপ না করিলে ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ব্যবসা বজায় থাকে না! একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষত্রিয়গণও বৈশ্যজাতির ন্যায় শূদ্রত্বে পতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সম্পূর্ণ হইল! প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সৃজিত হইল আধুনিক কালের কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক্, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, ইত্যাদি। আল্‌বেরুণী ৮টী অন্ত্যজ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—ধোপা, মুচী, বাজীকর, ঢালী, ঝুড়িকর, নাবিক, জেলে, ব্যাধ এবং তাঁতী। হাড়ী, ডোম এবং চণ্ডালেরা সর্ব্বজাতির বাহিরে ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "হিন্দুরা অত্যন্ত অল্প বয়সে বিবাহ করে। যদি কোন বালিকার বৈধব্য ঘটে, তবে সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। বালবিধবার দুইটি পথ,—(১) হয় তাহাকে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, (২) নচেৎ তাহাকে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। শেষোক্ত পথটাই স্ত্রীলোকেরা প্রায় গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ তাঁহারা যতদিন বাঁচিয়া থাকে গঞ্জনা এবং লাঞ্ছনা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়।"† ভারত পরাধীন হইবার পূর্ব্ব হইতেই বিধবাবিবাহ রহিত হইয়াছিল, এবং

* আমাকে একদা আমার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে বল্লাল সেন ক্রোধবশতঃ সুবর্ণবণিক্ জাতিকে পতিত করিয়াছেন, কিন্তু গন্ধবণিক্, কাংস্যবণিক্ প্রভৃতি বৈশ্যজাতির পৈতা বিলুপ্ত হইল কি করিয়া?" ইহার উত্তরে আমি আল্‌বেরুণীর নজির দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে "বৈশ্যে শূদ্রে বিশেষ প্রভেদ ছিল না।" ঐ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগণ রাজশক্তির সাহায্যে সমস্ত বৈশ্য জাতির দ্বিজত্ব রহিত করেন। বল্লালসেনের রাজত্বকাল ১০৪৬—১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। আল্‌বেরুণীর ভারতবর্ণনা আনুমানিক ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত, অর্থাৎ বল্লালের ২৬ বৎসর পূর্ব্বে। সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রতি বল্লালের অত্যাচার যদি তাঁহার রাজত্বকালের মাঝামাঝি ধরা যায় তবে ঐ অত্যাচার কালের ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আল্‌বেরুণী লিখিলেন "বৈশ্যে শূদ্রে প্রভেদ নাই।"

† হিন্দু জাতির অবনতি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে। বিধানগুলি ইহার পূর্ব্ব হইতেই উপেক্ষিত হইয়াছে।

সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার অনিবার্য্য ফলে ভারতের অবনতি ঘটিল।

আল্‌বেরুণী লিখিতেছেন—"পুত্র কন্যার বিবাহ তাহাদের পিতামাতা স্থির করিয়া থাকে। পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহে পণগ্রহণ নাই, কিন্তু স্বামী বিবাহের পূর্ব্বেই ভাবী পত্নীকে তাহার স্ত্রীধন স্বরূপ অলঙ্কার উপঢৌকন দেয়। পূর্ব্বে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহার স্বজাতি কিম্বা নিম্নজাতি হইতে পত্নী গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ কন্যা ব্যতীত অন্য জাতি হইতে পত্নীগ্রহণ করে না।" * * * "হিন্দুর বৎসর চৈত্রমাস হইতে গণনা হইয়া থাকে। চান্দ্র শুক্লা একাদশীতে "হিন্দোলী চৈত্র" নামক পর্ব্ব হয়। ঐ পর্ব্বোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে দোলায় চাপাইয়া দোল দেওয়া হয়। চৈত্রী পূর্ণিমায় বসন্তোৎসব। ইহা স্ত্রীলোকদিগের পর্ব্ব। বৈশাখী তৃতীয়ায় (অক্ষয় তৃতীয়া) গৌরী তৃতীয়া নামক পর্ব্ব। ঐ পর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া গৌরী পূজা করে। গৌরীদেবীর মন্দিরে তাহারা ধূপ, ধুনা, পুষ্প, চন্দন, ও কড়ি দেয়। বৈশাখের দশমী হইতে পূর্ণিমার মধ্যে শস্যক্ষেত্রের পূজা ও তথায় ছাগবলি হয়। ঐ পূজার পরে চাষ আরম্ভ হয়। বসন্তের যে ভাগে দিবা ও রাত্রি সমান হয় ঐ দিনেও একটি পর্ব্ব হয়; ঐ পর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ প্রচুর আহার্য্য পাইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা প্রতিপদে বারুণী স্নান হয়; এবং পূর্ণিমার দিনে "রূপপঞ্চ" নামক একটি পর্ব্ব হয়। উহা স্ত্রীলোকদিগের পর্ব্ব। আষাঢ় মাসে কাঙ্গালী ভোজন হয়, এবং প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার পুরাতন তৈজষাদি বিক্রয় করিয়া নূতন খরিদ করিয়া থাকে। শ্রাবণী পূর্ণিমায় প্রত্যেক গৃহস্থকে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। অশ্বযুজ মাসে (আশ্বিনে) ইক্ষু কাটা হয়। ঐ মাসে "মহানবমী" নামক পর্ব্বে নানারূপ চিনির লাড়ু প্রস্তুত করিয়া হিন্দুরা ভগবতীর উপাসনা করে। পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং ত্রয়োবিংশ দিনে অপরাপর পর্ব্ব হইয়া থাকে। ভদ্রপদামাসে (ভাদ্রে) অনেক পর্ব্ব হয়। ভাদ্রী শুক্লা প্রতিপদে পিতৃপ্রেতপিণ্ডদান। তৃতীয়ায় স্ত্রীলোকদিগের পর্ব্ব। শুক্লা ষষ্ঠীতে কারাগারে বন্দীগণকে আহার্য্য দেওয়া হয়। অষ্টম দিনে "ধ্রুবগৃহ" নামক পর্ব্ব। ঐ সময় গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ সবল সন্তান প্রসব করিবার প্রত্যাশায় ব্রত করিয়া থাকে। একাদশীতে পার্ব্বতী ব্রত। ঐ দিন গৃহস্থেরা পুরোহিতকে নূতন পৈতা দেয়। ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষের ১৫দিন তাহারা নানা ধর্ম্মোৎসবে মগ্ন হয়।* কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদে দীপালী নামক পর্ব্ব হয়। ঐ রাত্রে প্রতি হিন্দুর গৃহে দীপাবলী প্রজ্জলিত হয়। জনশ্রুতি এই যে, ঐ দিনে ভগবতী লক্ষী বীরোচনের পুত্র বলীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। এই কারণে এই আনন্দোৎসব।† মার্গশীর্ষের (অগ্রহায়ণ মাসের) শুক্লা তৃতীয়ায় স্ত্রীলোকেরা গৌরী পূজা করে। ঐ মাসে পূর্ণিমায় তাহারা ব্রত করে। পৌষ মাসে পার্ব্বণ হয়। মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়ায় পুনরায় গৌরীপূজা। ঐ মাসে অপরাপর পর্ব্ব আছে। ফাল্গুনের শুক্লা সপ্তমীতে ব্রত ও ব্রাহ্মণভোজন প্রশস্ত। ঐ মাসের পূর্ণিমায় দোল হয়। পররাত্রে শিবরাত্রি হয়।"

আলবেরুণী লিখিতেছেন—"ভারতের নানা স্থানে প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। হিন্দুরা পর্ব্বের সময় তথায় গমন করিয়া থাকে। মুলতানের সূর্য্যমন্দিরে আদিত্যদেবতা, থানেশ্বরে, বিষ্ণু বা চক্রস্বামিন্; কাশ্মীরে সারদা, সোমনাথে শিবলিঙ্গ বিখ্যাত। মামুদ ঐ শিবলিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগ চূর্ণ করিয়া নিম্নভাগ গজনীতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সমগ্র স্বর্ণ রত্নালঙ্কার গজনীতে স্থানান্তরিত করেন। গজনীর মসজিদের দ্বারদেশে ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি বহুকাল পড়িয়া ছিল, লোকেরা মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় উহার উপর পা ঘষিয়া পরিষ্কার করিত।" প্রত্যহ কাশ্মীর হইতে কুসুমরাশি এবং প্রয়াগ হইতে গঙ্গাজল আনাইয়া যে ঠাকুরের নিত্য পূজা

---

* আল্‌বেরুণী বর্ণিত ভারতবর্ষে একাদশ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের এই যে ১৫ দিন ব্যাপী ধর্ম্মোৎসব এক্ষণে দুর্গা, গণেশ, লক্ষী ও কালীপূজায় পরিণত হইয়াছে।

† পূর্ব্বেকার চৈত্র মাসে বসন্তোৎসবের মদন দেবতার স্থান যেমন এখন শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করিয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ব্বেকার দীপোৎসবের লক্ষীর স্থান এখন কালী অধিকার করিয়াছেন।

হইত, তাহার কি পরিণাম! তীর্থযাত্রা মানসে তখন নরনারী যাইত বারাণসী, পুষ্কর, থানেশ্বর, মথুরা, কাশ্মীর এবং মুলতান।

আল্‌বেরুণী লিখিয়াছেন "যদি কোন ব্রাহ্মণ অন্য জাতির কাহাকেও হত্যা করে, তবে তাহার দণ্ড,—উপবাস, প্রার্থনা এবং কাঙ্গালী ভোজন। যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বজাতি কাহাকে হত্যা করে, তবে তাহার দণ্ড,—চিরনির্ব্বাসন। ব্রাহ্মণের মৃত্যুদণ্ড নাই। চুরি করিলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় চোরের একটি হাত বা পা কাটিয়া দেওয়া হয়। শূদ্র চোরের মৃত্যুদণ্ড হইয়া থাকে। ব্বিচারিণী পত্নীর দণ্ড,—ত্যাগ ও নির্ব্বাসন।" "পিতার মৃত্যু হইলে তাহার সন্তানগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশের অধিকারিণী হইয়া থাকে। বিধবা রমণী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী না হইয়া কেবলমাত্র খোরাক-পোষাকের অধিকারিণী হয়। মৃত ব্যক্তির পুত্র-পৌত্র না থাকিলে ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। ঋণগ্রস্ত হইয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।" "ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। বণিক্, শিল্পী এবং শ্রমজীবিগণের রাজস্ব তাহাদিগের লভ্যাংশ বিবেচনায় নির্দ্ধারিত হয়। ব্রাহ্মণগণকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হয় না।" "ব্যাসদেব বেদগুলিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—ঋক্, যজু, সামন্ ও অথর্ব্বন্। এই চারি বেদ তিনি তাঁহার চারি শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন। চারি শিষ্য,—পৈল্য, বৈশম্পায়ন, জৈমিনী, এবং সুমন্ত। মহাভারত অষ্টাদশ খণ্ডে বিভক্ত। হরিবংশ মহাভারতের খণ্ড বিশেষ। পাণিনি প্রভৃতি আটজন ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। সাংখ্য প্রভৃতি যোগশাস্ত্র আছে। স্মৃতি শাস্ত্র কুড়িখানি। পুরাণশাস্ত্র আঠারখানি। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, এবং ব্রহ্মগুপ্ত জ্যোতিসশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। আদিত্য ১২টী, যথা,—চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে আর্য্যমন্, জ্যৈষ্ঠে বিবস্বত, আষাঢ়ে অংশ, শ্রাবনে পর্জ্জন্য, ভাদ্রে বরুণ, অশ্বযুজে ইন্দ্র, কার্ত্তিকে ধাত্রী, মার্গশীর্ষে মিত্র, পৌষে পুষণ্, মাঘে ভগ, ফাল্গুনে স্বত্রী। হিন্দুর ১২ মাসের নামোৎপত্তি ১২টী নক্ষত্র হইতে, যথা—চিত্রা হইতে চৈত্র, বিশাখা হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে আষাঢ়, শ্রবণা হইতে শ্রাবণ, পূর্ব্বভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, অশ্বিনী হইতে আশ্বিন, কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক, মৃগশিরা হইতে মার্গশীর্ষ, পুষ্যা হইতে পৌষ, মঘা হইতে মাঘ, পূর্ব্ব-ফল্গুনী হইতে ফাল্গুন। সৌর জগতের ১২টী চিহ্ন প্রথমতঃ গ্রীকৃগণ আসিরিয়ান্ জাতির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল; হিন্দুরা গ্রীক্‌দিগের নিকট হইতে শিখিয়াছে।"

আল্‌বেরুণী বলিতেছেন "ব্রহ্মগুপ্ত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। ঐ কারণে সমস্ত দ্রব্য স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীতেই পতিত হয়। যেমন জলের স্বাভাবিক নিয়ম নিম্নগামী হওয়া, অগ্নির স্বাভাবিক নিয়ম দগ্ধ করা, বাতাসের স্বাভাবিক নিয়ম বহমান হওয়া, তদ্রূপ পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম—সকল জিনিষকে আকর্ষণ করা।" "আর্য্যভট্ট আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে; কিন্তু আমাদের মনে হয় যেন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রাদি ঘুরিতেছে। হিন্দু জ্যোতিষীগণ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী গোলাকার; উহার পরিধি ৪৮০০ যোজন।" (৩১ অধ্যায়)।* জ্ঞান বুদ্ধিতে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত্ব আল্‌বেরুণী স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দু পণ্ডিত যতই জ্ঞানী হউন্ না কেন, অন্ধ-সংস্কারের গণ্ডী ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে তাঁহারা

* ব্রহ্মগুপ্ত ৬২৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার রচিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের নাম "ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত"। আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "আর্য্যভট্ট"। উহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত,—(১) গীতিকাপাদ। (২) গণিতপাদ। (৩) কালক্রিয়াপাদ। (৪) গোলপাদ। বরাহমিহির ৫০৫ খৃষ্টাব্দে অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয়ের নাম, "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" এবং "বৃহৎ সংহিতা"।

পারেন না। কথাটা বোধ হয় ঠিক্, কারণ খৃষ্টের জন্মের সময় হিন্দুদিগের নিকট ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত জানা ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তকগুলিতে, কালিদাসের কবিতায় এবং বরাহ-মিহিরের জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাইয়া থাকি। তথাপি মৎস্য পুরাণের সেই সপ্তসিন্ধু ও সপ্তদ্বীপের কথা আমরা ভুলিতে পারি না! আলবেরুণী ভারতের প্রদেশগুলি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—"কুরু, পঞ্চাল, কাশী, কোশল প্রভৃতি মধ্যদেশ। মগধ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি পূর্ব্বদেশ। পাণ্ড্য, কেরল, চোল, মহারাষ্ট্র, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, অন্ধ্র, নাসিক, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দক্ষিণ দেশ। ভোজ, মালব, হূণ* প্রভৃতি পশ্চিম দেশ। পহ্লব †, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, শক প্রভৃতি উত্তরদেশ।" (২৯ অধ্যায়)।

হিন্দুর গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে আলবেরুণী লিখিতেছেন—"আমি অনেক জাতির গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে জানি যে, তাহারা হাজারের উর্দ্ধে সংখ্যা গণনা করিতে অক্ষম কিন্তু হিন্দুরা পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত গণনায় সক্ষম।" ভারতের তৎকালীন প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন,—"কাশ্মীরে এবং কাশীতে যে ভাষা প্রচলিত তাহার নাম সিদ্ধমাতৃক। মালবে নাগর ভাষা প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভাষাও চলিত আছে, যথা—অর্দ্ধনাগরী, মাড়োয়ারী, সিন্ধুত, কর্ণাত, অন্ধ্রি, দ্রাবিড়ী, গৌড়ী ‡। লিখনের জন্য ব্যবহৃত হয়—মধ্য ও উত্তর ভারতে ভূর্জ্জপত্র, অন্যান্য দেশে তালপত্র।"

আলবেরুণীর ঐ সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ অনেকটা মধ্য যুগের ইয়োরোপের মত ছিল। ঐ শতাব্দীতে ধর্ম্ম কর্ম্ম যেমন ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল, ইয়োরোপে তদ্রূপ Pope এবং ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে একচেটিয়া ছিল। যুদ্ধ বিদ্যা যেমন রাজপুত ক্ষত্রিয়দিগের একচেটিয়া ছিল, ইয়োরোপে তদ্রূপ উহা feudal baron দিগের একচেটিয়া ছিল। বিক্রমাদিত্যের পর ভারতে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আর উন্নতি হইল না, ইয়োরোপে তদ্রূপ Augustan কবিদিগের পর আর হয় নাই। যেমন প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষা ভাঙ্গিয়া ভারতে জন্মিল হিন্দি ইত্যাদি, তদ্রূপ ইয়োরোপে Latin ভাষা ভাঙ্গিয়া জন্মিল Italian, French প্রভৃতি ভাষা। কিন্তু একটি বিষয়ে উভয় দেশে ঘোর পার্থক্য ঘটিল। ইয়োরোপের feudal barongণ সাধারণ লোকের সহিত মিশিত, সাধারণ লোক-সমাজ হইতে পত্নী গ্রহণ করিত। পূর্ব্বে ভারতে ঐরূপ বিধান থাকিলেও একাদশ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যা ব্যতীত, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্যা ব্যতীত বৈশ্য বা শূদ্রকন্যা বিবাহ করিত না। এখনও করে না। ঐ সময় বর্ণ-বৈষম্য বা জাতিভেদ প্রবল আকার ধারণ করিল। এই বৈষম্য থাকায় মুসলমানগণ সুযোগ পাইয়াছিল। পার্থক্যের ফলে রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ যখন যবন হস্তে পরাজিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ শৃঙ্খলিত হইল। পার্থক্যের ফলে হিন্দুরা এক হইয়া মিলিয়া যবনাক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। পরাধীনতার পর ভারতের উজ্জ্বল গগন ভীষণ মসীময় হইল। জ্ঞান, বিদ্যাচর্চ্চা ব্যতীত কোন জাতি সজীব হয় না। বৈদিক যুগে সকল দ্বিজাতির প্রতি জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। পৌরাণিক যুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির প্রতি সেই দ্বার যে বন্ধ হইল, আর খুলিল না। তাহার ফলে ১২০০ খৃষ্টাব্দের পর আজ ৭০০ বৎসর ধরিয়া ভারতের ইতিহাস একরূপ শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

---

* হূণেরা তখন রাজপুতনার অধিবাসী ছিল।

† পারশিকগণ।

‡ এই "গৌড়ী ভাষা" হইতে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি।

তৃষ্ণা

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"কি বল্‌ছ ?"

"কৈ আমি ত কিছু বলিনি"।

"আমি তা বল্‌ছি না ; আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে কি বল্‌ছ ?"

"তুমি কি যেতে পার্‌বে ?"

"কেন পার্‌ব-না ?"

"আমি যে বিশ্বাস কর্‌তে পারছিনা তৃষ্ণা !"

"এত দেখেও তোমার বিশ্বেস হচ্ছে না ? তবে—" বলিতে বলিতে তৃষ্ণা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শীলভদ্র বাহ্য কাঠিন্যের আবরণে তৃষ্ণার অন্তর পরীক্ষা করিতেছিল। তৃষ্ণার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল "কেঁদনা তৃষ্ণা, আমি তোমাকে নিয়ে যাব, তবে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত নারীবিহারে তোমায় থাকৃতে হবে।"

তৃষ্ণার অশ্রুসিক্ত মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল যেমন বর্ষাস্নাত ধরণীর মুখে সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ আসিয়া পড়ে আনন্দোজ্জ্বল প্রভায়, যেমন রজনীর তিমিরাবগুণ্ঠনের উপর উষার রক্তিম আলোকরেখা হাসিয়া উঠে পূর্ব্বাশার দিক্‌ চক্রবালে। তৃষ্ণা বলিল—"তুমি কোথায় থাক্‌বে ?"

"তা' ত বল্‌তে পারি না।"

"সে কি !"

"সত্যি তৃষ্ণা আমার যে কি হবে, কোথায় যাব, কি কর্ব্ব, সে সব কিছুই বল্‌তে পারি না। দূর স্বপ্নলোকের ছবির মত আজ আবার জীবনের পথে একে একে স্মৃতির বন্যায় ভেসে আস্‌ছে অতীত জীবনের ঘটনাবলী ; অতীত আলোকের রশ্মি ভবিষ্যতে প্রসারিত করে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনা—কি আমার ভবিষ্যৎ ! কি আমার কর্ম্মফলের রূপান্তর ! প্রাণের মাঝে এক অনন্ত মহা সমুদ্র গর্জ্জন করে ছুটে চলেছে, বাসনার তরঙ্গমালা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে হৃদয়ের প্রান্ত হতে প্রান্তান্তর বিপ্লাবিত কর্‌ছে, সরে যাচ্ছে দূরে দূরে সংযমের তটরেখা দিগন্তের চক্রবালে সূর্য্যবিম্বের মত ; বল্‌বার উপায় নেই, ভাব্‌বার উপায় নেই ;—কোন দিকে পথ দেখ্‌তে পাচ্ছি না, শুধু একটি অফুরন্ত তরঙ্গ-কল্লোল দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে শূন্য-মণ্ডলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছে !—কিছু নেই—কিছু নেই, শুধু একটা অনন্তব্যাপ্তি—একটা অন্তহীন শ্রান্তির হাহাকার !"

তৃষ্ণা বলিল—"কোন চিন্তা নেই ; আমি দিনরাত তোমার সেবা করব ; দূর ঝরণা থেকে কলসী করে জল নিয়ে এসে তোমার পিপাসা দূর কর্ব্ব ; শুষ্ক বৃক্ষপত্র কুড়িয়ে তোমার রাত্রির শীত নিবারণের সহায়তা কর্ব্ব ; বন্য ফল-মূল সংগ্রহ করে তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় করে দোব ; তুমি শ্রম-ক্লান্ত শরীরে আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোবে, আর আমি তোমার নিদ্রিত মুখচ্ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত কর্ব্ব, নীরবে, অনলসে, একান্তে ; মাঝে মাঝে দূর নীলাকাশের চন্দ্রকরলেখা দীপ্ত ধরণীর পাণ্ডুর মুখে সৌভাগ্যের স্বর্ণতুলি বুলিয়ে দেবে, আর আমি তোমার মুখে দেখব একটা শান্তির অপূর্ব্ব মাধুরী, সমগ্র জগতের মিলিত সৌন্দর্য্য, নিখিল ভুবনের রূপরাশি ; সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে—সার্থক আমার জীবন, সার্থক আমার নারী-দেহ তোমার সাহচর্য্যের অধিকারী !"

বাধা দিয়া শীলভদ্র বলিল—"না তৃষ্ণা, তা নয় ; তুমি দেখ্‌বে এক অনন্ত সৌন্দর্য্য বিশ্ব ভুবনের ঘরে ঘরে ব্যক্ত হয়ে আছে, ভূতলে, গগনে, পবনে, নদীতীরে, বনমাঝে, তরুশিরে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের শান্ত-সমাহিত মূর্ত্তি—"

ব্যগ্র কণ্ঠে তৃষ্ণা বলিল—"সে আমাকে দিয়ে হবে না। অনেক চেষ্টা করে দেখেছি ; পারিনি। আমার স্নায়ু-

মণ্ডলীকে কে যেন জোরে চেপে ধরে মনের মধ্যে তোমার ছবি এঁকে দেয়—দূরে পড়ে থাকে ভগবান্ বুদ্ধদেব! কি কর্ব্ব বল? আমার কোন ক্ষমতা নেই!"

"কিন্তু নারীবিহারে অন্ত চিন্তা করা নিষিদ্ধ।"

"আমি ত বাইরে লোক দেখিয়ে চিন্তা কর্ব না—আমার অন্তরে অন্তরে সে চিন্তা-প্রবাহ ছুটে যাবে। সেখানে তোমাকে দেখ্‌তে পাব?"

"না।"

"তবে আমি সেখানে থাক্‌ব না।"

"দেখ তৃষ্ণা, আমি মানুষ, ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ; আমাকে ভালবেসে জীবনকে পঙ্কিলপল্বলে নিমজ্জিত করা কি তোমার উচিত? যাঁর ভালবাসার অন্ত নেই, সীমা নেই, বিচার-বিবেচনা নেই, উৎসমুখে জলধারার মত অবিশ্রান্ত মানবের কল্যাণে নিরত তাঁকে ভালবাস্‌লেই যে তোমার জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে—সার্থকতার উপকূলে উপনীত হবে তুমি, বর্ত্তমানের কঠোরতা ভুলে গিয়ে, অতীতের কলঙ্ক-কালিমা মুছে ফেলে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভবিষ্যতে জীবনের সমুজ্জ্বল গৌরবময় ছবি—সে কি মহান্, কি পবিত্র, কি লোভনীয়!"

তৃষ্ণা চুপ করিয়া রহিল, একখণ্ড শুভ্র মেঘ আকাশের প্রান্ত বাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অলসমন্থর পদে কোন অজ্ঞানালোকের উদ্দেশে মুগ্ধ ধরণীর দিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। ভাবিতে লাগিল কেন ঐ মেঘখণ্ড আকাশের উপর দিয়া ছুটিয়া যায়? কেন মানুষ ঐ মেঘের মত শূন্য পথে বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না? আর কি আছে ঐ মেঘলোকের ওপারে নীলশূন্যের অন্তরালে—কি রহস্যময় এ জগৎ-প্রপঞ্চ!

এমন সময় পাচক, পরিচারক ও পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ করিল। তৃষ্ণা তাহাদিগকে বলিল—"কাল থেকে তোমরা অন্যস্থানে চাক্‌রীর সন্ধান করো; আমি অন্যত্র যাচ্ছি; হয়ত আর ফিরব না; যদি কোন দিন কোন অশুভ মুহূর্ত্তে ফিরি, আর তোমাদের পাই, তখন আবার হয়ত দেখা হবে।"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে পরিচারিকা বলিল—"মা, কে আর তোমার মত আমাদের আদর-যত্ন কর্‌বে, আমাদের সুখেদুখে দেখ্‌বে। কেন চলে যাচ্ছ মা?"

"কেন যাচ্ছি তা' বল্‌তে পার্ব্ব না। আমার কি ক্ষমতা তোমাদের আদর-যত্ন করি; বরং অনেক সময় কটুবাক্যে তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, তোমরা আমার সে অপরাধ ক্ষমা করো।"

কাঠের সিন্দুক খুলিয়া একছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া পরিচারিকার হাতে দিয়া বলিল, "এ তোমার মেয়ে নন্দাকে দিও।" আর কিছু টাকা হাতে দিয়া বলিল—"এই নাও তোমার ৬ মাসের পাওনা। আর এই ১০০ টাকা মেয়ের বিয়েতে খরচ করো।"

পাচক ও পরিচারককেও বহু অর্থ দিয়া তৃষ্ণা তাহাদের নিকট বিদায় লইল। অশ্রুসিক্ত মুখে দুঃখিত অন্তরে সকলে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

গভীর নিশীথে পাটলীপুত্রবাসী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে গা ঢালিয়া দিয়াছে। রাজপথের স্তিমিত আলোক মৃদুবায়ুর নিশ্বাসে কম্পমান—বৃক্ষশীর্ষের উপরিভাগে কৃষ্ণা সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্রকরলেখা স্পন্দিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ নিশাবিহারী পথিক উচ্চকণ্ঠে গান গাহিয়া চলিয়াছে। শীলভদ্র ও তৃষ্ণা উভয়েই জাগ্রত। শীলভদ্র নীরবে নৈশ প্রকৃতির শান্তগম্ভীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া। এমন সময় তৃষ্ণা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—"আমি প্রস্তুত।"

আজ তৃষ্ণার সৌন্দর্য্য যেন স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে প্রসাধন-পরিবর্দ্ধিত রূপ রঙ্গভূমির পাদ-প্রদীপের সমুজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ দর্শকের চিত্ত হরণ করিত, এ সে রূপ নহে; যে সৌন্দর্য্য ধনীর উদ্যান-বাটিকায় সযত্নপুষ্ট স্থলপদ্মে পরিদৃশ্যমান, এ তাহা নহে; যে রূপ বনরাজিনীলা তটভূমিপরিশোভিতা মধ্যাহ্নের সৌরকরোদ্ভাসিতা চঞ্চলা তরঙ্গিণী বিকসিত করে, এ সে রূপ নহে,—এ রূপ বাসন্তী প্রভাতে দ্বিরেফমালা-পরিচুম্বিত অগণ্য কুমুদ-কহ্লারের মধ্যে বিকসিত শতদলদলের মত; গভীর রজনীর স্তব্ধতার মধ্যভাগে চন্দ্র-কিরণ-বিহসিত স্রোতস্বতীর চঞ্চল তরঙ্গমালার মত; অযত্নসম্ভূত বন্য

যুথিকার মত। গৈরিক কৌষেয় বসনে গৌর বপু আবৃত; পৃষ্ঠদেশে কুঞ্চিত-কেশরাশি বিলম্বিত; যেন ধূসরকুন্তলা যোগিনী বালা সন্ধ্যা অস্তাচলের হৈমশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া পুরোভাগে অসীম তিমিরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

শীলভদ্র তৃষ্ণার দিকে তাকাইয়া বলিল,—"তৃষ্ণা, আজ তোমার জীবনের উদ্বোধন। চেয়ে দেখ, পশ্চাতে নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকার তোমার অতীত জীবন, আর সম্মুখে—উদীয়মান সূর্য্যের কনকরশ্মি—অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎ!"

এই বলিয়া তৃষ্ণার হাত ধরিয়া শীলভদ্র দ্বিতীয় বার পাটলীপুত্র পরিত্যাগ করিল—যেন বৈরাগ্য ও শান্তি বিশ্বজগতের কোলাহলের ভিতর দিয়া অনন্ত মহানির্ব্বাণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন ব্রহ্ম ও মায়া হাত ধরাধরি করিয়া বিশ্বজগতের রচনায় অগ্রসর হইয়াছে; যেন সন্তোষ ও সিদ্ধি মানব মনের চাঞ্চল্য তিরোহিত করিয়া অব্যক্ত মুক্তির পথ দেখাইতেছে; যেন পুরুষ ও প্রকৃতি শাশ্বত প্রেমের আলিঙ্গনে এক হইয়া অমর লোকের অপূর্ব্ব মাধুরী শুষ্কতপ্ত ধরণীর মলিনতার মধ্যে ছড়াইয়া চলিয়াছে—সে দৃশ্য কি অপূর্ব্ব—কি পবিত্র!

ক্রমশঃ

স্বর্গীয় অমৃতলাল দে

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(৫)

"নিউজ অফ্ দি ওয়ার্ল্ড" পত্রের প্রথম বর্ষের প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ, আলোচনা ও দেশবিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে যে প্রবন্ধ ও আলোচনাসমূহ উল্লেখযোগ্য, তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

1881		Page
5th January—	Famine Commission.	9
	Local Regiments in India.	10
	The Land Agitation in Ireland.	10
	The Opening of the Rajputana Railway.	21
	The proposed Trade Conference.	21
12th January—	Indian Reports and Indian Reporting.	25
	The Queen's Speech.	28,29,45
	Education in Bengal.	29
	The Cat and Dog show	37
19th January—	The Tramways.	49
	Indian Municipalities.	63
26th January—	The Afgan Wars.	90
2nd February—	Dharm Sabha at the Senate House.	100

এই ধর্ম্মসভার বিবরণের একটি বঙ্গানুবাদ প্রয়োজনীয় বোধে আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি—

"কলিকাতায় সম্প্রতি আমরা এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে দৃশ্য আর কিছুই নহে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-ভবনে পণ্ডিতগণের এক বিরাট্ সভা। সভার উদ্দেশ্য কয়েকটি শাস্ত্রীয় সমস্যার মীমাংসা। সভায় ন্যূনাধিক পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রায় তিন শত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। পণ্ডিতগণ মেঝেতে না বসিয়া সকলেই চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিলেন। * *

* * কলিকাতার হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণের প্রধান প্রধান প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—মাননীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই ই, মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, সঙ্গীতাচার্য্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই ই, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, বাবু চারুচন্দ্র মল্লিক, কাণপুরবাসী মুন্সী বঙ্কবিহারী বাজপেয়ী, কাণপুরবাসী মুন্সী জামনারায়ণ তেওয়ারী, রায় বদ্রিদাস মুকিম বাহাদুর, শেঠ নহরমল, শেঠ হংসরাজ, লালা চূড়ামল প্রভৃতি। পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), পণ্ডিত সুব্রহ্ম শাস্ত্রী (বারাণসী), পণ্ডিত রামধন তর্কপঞ্চানন (যশোহর), পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি (বহরমপুর), পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন (ভট্টপল্লী), পণ্ডিত তারকনাথ তর্করত্ন (বর্দ্ধমান), পণ্ডিত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন (গুপ্তিপাড়া), পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি (কলিকাতা) এবং পণ্ডিত উমাকান্ত ন্যায়রত্ন (জনাই)।

দুঃখের বিষয়, দুইজন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অসুস্থতার জন্য এই সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এই সভার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মথুরানিবাসী শেট নারায়ণ দাসের উদ্যোগে এই সভা আহূত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সভা উদ্বোধন করিবার সময়ে, তিনি মুখবন্ধ-স্বরূপ এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, বেদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের অভিমত অবগত হইবার জন্য এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাম সুব্রহ্মণ্য ওরফে রামসুব্বা শাস্ত্রী জানাইলেন যে, পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাতে দাক্ষিণাত্যের ও অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী বিরক্তিপ্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি বঙ্গদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিমত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

সভায় যে সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, আমরা নিম্নে উহা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিলাম—

প্রথম প্রশ্ন। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বা বেদের মন্ত্রভাগ সংহিতাভাগের মত গ্রহণীয়, প্রামাণিক ও অখণ্ডনীয় কিনা ?

উত্তর। হাঁ, গ্রহণীয়, প্রামাণিক ও অখণ্ডনীয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা, দুর্গাপূজা, শ্রাদ্ধক্রিয়া, জাতক্রিয়া, তীর্থদর্শন শাস্ত্রানুমোদিত কিনা ?

উত্তর। হাঁ, শাস্ত্রানুমোদিত।

তৃতীয় প্রশ্ন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ এর প্রতিপাদ্য দেবতা কে ? অগ্নি, না ঈশ্বর ?

উত্তর। অগ্নি।

চতুর্থ প্রশ্ন। যজ্ঞ করা হয় কেন ? বায়ু ও জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য অথবা স্বর্গলাভের জন্য ?

উত্তর। স্বর্গলাভের জন্য।

সভায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই আলোচনা হইয়াছিল। প্রশ্নকর্ত্তা পণ্ডিত রামসুব্বা শাস্ত্রী তাঁহার প্রশ্নসমূহ উপস্থিত করিয়া সংক্ষেপে সংস্কৃতভাষায় উহাদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্রস্বরূপ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। উত্তর দিবার সময়ে তিনি নজীরও দেখাইয়া দেন। তিনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অক্লান্ত পরিশ্রমে সভার কার্য্য খুবই সফল হইয়াছিল। মথুরাবাসী শেঠ নারায়ণ দাস দেশের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতবর্গকে একত্র সমবেত করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।"

1881	Page
2nd February—Indian Antiquities	111

1881 Page

14th February—The Failure of Nicholls & Co. 124

Position and Prospect of Indian Tea Companies. 127

Indian Manufactures. 127

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় হাটখোলার (কলিকাতা) মহাজনদিগের গদী হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৬ বৎসরের বিভিন্ন প্রকার চাউলের দরের তালিকা দিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য বিধায় এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

	উৎকৃষ্ট বালাম প্রতিমণ	মোটা বালাম প্রতিমণ	খাড়ি প্রতিমণ	দেশী প্রতিমণ
১৮৬৫	২৷০	২৲	১৸০	×
১৮৬৬	৪৷৷০	৩৸৴০	×	×
১৮৬৭	৩৸০	৩৲	২৸৵০	×
১৮৬৮	২৷৷০	২৲	২৷০	×
১৮৬৯	২৷৷০	২৲	২৷০	×
১৮৭০	২৷০	১৸০	২৲	×
১৮৭১	২৲	১৷৷০	১৸০	×
১৮৭২	২৲	১৷৷০	১৸০	×
১৮৭৩	২৲	১৷৷০	১৸০	×
১৮৭৪	৩৸০	২৷৷০	২৸০	২৷৷৶০
১৮৭৫	৩৲	২৲	২৷০	২৷৷০
১৮৭৬	৩৷০	২৷০	২৷৷০	২৸০
১৮৭৭	৪৷৷০	৩৲	৩৷৷০	৩৸০
১৮৭৮	৪৷৴০	২৸০	×	৩৶১০
১৮৭৯	৩৴০	২৷৷৶১০	২৷৷৵১৫	২৸০
১৮৮০	২৷০	১৸৵০	১৸৵০	২৲

1881 Page

14th February—The Employments of the Natives of India in their own country. 136

21st February—The Russian Advance in Central Asia. 141

1881 Page

The Report of the Rent-law Commission. 142

The Secret correspondence at Cabul. 142

The Threatened Abolition of the Indian Council. 143

The Vernacular Press Act. 145

28th February—Railways and Natives. 162

Physical Training. 163

Ruin of India. 165

7th March— The University Moderators. 182

The British Indian Association on the coming Budget. 187

The History of Penny Postage. 190

The Salt Revenue. 195

14th March— The Natives and their future Prospects. 204

21st March— Indian Affairs in Parliament. 221

The Factories Bill. 226

28th March— The Cotton Duties. 243

Forest conservancy in India. 243

4th April— The Coal Question. 262

11th April— The Future of India. 281

18th April— State Economy. 302

The Industrial Arts of India. 305

16th May— The Employment of

1881		Page
	Natives in the Public Service.	383
	The Englishman and the Bengalee.	384
23rd May—	The Rubber Industry.	405
11th June—	Pauperism still more to be dreaded.	441
	The Clothes of the Period.	444
25th June—	The Purchase of Government Stores.	482
2nd July—	The Land in England.	501
	The Salt Monopoly.	502
	The Central Provinces Land Revenue Act.	502
9th July—	The Proposed Abolition of the Opium Monopoly.	523
	The Age for Matrimony.	525
	The Lecture on India.	526
16th July—	England's Financial Relations with India.	542
	The Farmers of India.	544
	The Opium Revenue.	546
23rd July—	The Silver Conference.	561
	India at the Melbourne Exhibition.	563
	A whole town electrically lighted.	563
	Recent Investigations of Parsee Antiquity.	564
30th July—	Progress and Condition of India in 1878-79.	583
	The New Exchange.	583

1881		Page
13th August—	Archæology in the Nizam's Dominions.	627
20th August—	The Revised Pensions.	644
	Manufactures and Mines.	646
27th August—	The Abkari System.	667
3rd September—	Council Bills.	682
	The Industrial Development of India	683
	Indian Finance in Parliament.	683
10th September—	Railway Extension in Assam.	704
	The Crisis in Egypt.	706
17th September—	The Indian Budget.	723
	Agriculture in India and the United States.	723
26th September—	Our Commercial Difficulties with France.	742
10th October—	The New Financial Resolution.	762
	The Royal Indian Engineering College.	763
	Telephones in Calcutta	765.
17th October—	The Only Complete University in India.	783
	Postage on Newspapers.	784
	Exhibition of Native Industrial Art at Simla.	784
24th October—	The Chronic Insolvency of India.	801
	The Extension of Local Self-Government.	803, 825

1881		Page
	The Currency Office.	803
31st October—	Revision of Settlements.	822
	Local Manufacture.	825
7th November—	The Anti-Opium Agitation.	843
	Responsibility of the Bank of England.	843
14th November—	European Education.	863
	The Beer Supply to Government.	866
21st November—	Land League.	881
	Making Gold.	887
28th November—	India and the London University.	903
	Savings Banks and Post Office Deposits.	905
	A Locomotive News-paper.	906
	High Salaries of Indian Civilians.	907
	The Salt-tax.	907
5th December—	The Adulteration of Food.	922
12th December—	The Threatened Income-tax.	941
	Longivity in Europe	943
	The Indian Import Duties. (Deputation to Lord Harrington.)	945
19th December—	Post Office Savings Banks in India.	963

এই তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রে কিরূপ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইত। এই সকল প্রবন্ধে যে চিন্তা-শীলতা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তৎকালের পক্ষে খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। এখনকার দিনে সংবাদপত্র পরিচালনার পদ্ধতি সুসংস্কৃত, সমুন্নত ও সুমার্জ্জিত বটে, কিন্তু তখনকার দিনেও ইংরেজী সংবাদপত্র-পরিচালনে শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্পাদকের যোগ্যতা বড় সামান্য ছিল না। নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লডে তখনকার যুগের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং জগতের বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় পরিপাটী-রূপেই আলোচিত হইত এবং সে আলোচনার পদ্ধতিও সুন্দর ছিল। 'ভারতের ভবিষ্যৎ', 'তুলা ও তুলাজাত সামগ্রীর উপর শুল্ক,' 'পার্লামেণ্টে ভারতীয় সমস্যা,' 'বিবাহের বয়স,' 'ভারতের আরণ্য-সম্পদ্,' 'ভারতের পুরাতত্ত্ব,' 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ভবনে ধর্ম্মসভা,' 'দুর্ভিক্ষ কমিশন,' 'বঙ্গে শিক্ষা,' 'ট্রামওয়ে', 'রেলওয়েতে ভারতবাসী,' 'ভারতের শাসনকার্য্যে ভারতবাসীর নিয়োগ,' মিউনি-সিপ্যালিটী,' 'মধ্য এসিয়ায় রুশ,' 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন,' 'রাজ্যের অর্থ-সমস্যা,' 'রবার-শিল্প,' 'আবকারী-নীতি,' 'সংবাদপত্রের ডাকমাশুল,' 'অহিফেন-ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন,' 'ইউরোপে দীর্ঘজীবন' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও আলোচনা যে কিরূপ শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞাতব্য তথ্যপরিপূর্ণ, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া না বলিলেও চলে। সুতরাং ইংরেজী সংবাদপত্র-পরিচালনে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ও যোগ্যতা যে বহুকাল পূর্ব্বেই সুপ্রকট হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺কৃষ্ণদাস পাল, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৺শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়, ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষী বাঙ্গালী সম্পাদক-গণের ইংরেজী সংবাদপত্র-সম্পাদনে ও প্রবন্ধ-রচনার অসামান্য সাফল্যের বিষয় আজ দেশপ্রসিদ্ধ। কিন্তু "নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লড"-সম্পাদক স্বর্গীয় অমৃতলাল দে মহাশয় ইংরেজী সংবাদপত্র-সম্পাদন ও ইংরেজী প্রবন্ধ-রচনায় যে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি।

ক্রমশঃ

হেন্‌রী ফোর্ড

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

যে সমস্ত মহামানব জগতের কল্যাণের জন্য, মানবের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যত্নশীল, প্রকৃতির কর্ম্মশালায় তাঁহাদের জীবন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গঠিত হয়। দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, দারিদ্র্য,—এ সমস্ত সেই সমুদয় অতিমানব-মণ্ডলীর নিত্য সহচররূপে বিচরণ করে। আবার এমনও দেখা যায়, কাহাকেও কাহাকেও প্রকৃতির কঠোর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া চঞ্চলা কমলা আপনার বুকে টানিয়া ল'ন। ঐশ্বর্য্য-সম্পদে তাহার শূন্যঘর পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যশো-দুন্দুভির গভীর নিনাদে তাহার নাম দিকে দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হেন্‌রী ফোর্ড মা লক্ষ্মীর এইরূপই একজন প্রিয় সন্তান, 'আলালের ঘরের দুলাল।' আজ যদিও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীরূপে জগৎ-বক্ষে সম্মানিত, পৃথিবীর ধনিক-মহলে তাঁহার নাম প্রাতঃ-স্মরণীয়রূপে গণ্য, কিন্তু তাঁহার বাল্যজীবন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে অতিবাহিত হয় নাই। পল্লী মাতার শ্যামলাঞ্চলের নিবিড় ছায়ায় সামান্য কৃষক কুটিরে প্রভাত তপনের স্বর্ণরশ্মি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল; ক্ষীণা তটিনীর কলগান বিহগের মধুর কাকলীর সমবায়ে তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রতি-ধ্বনিত হইত দূরাগত বসন্তের সমীরোচ্ছ্বাসে, তরুলতার মর্ম্মর রবের সঙ্গে; সান্ধ্য তারার মৃদু কিরণে মুক্ত প্রাঙ্গণে মাতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া ঐ শিশুই একদিন শ্রুতিসুখকর গল্প শুনিতে শুনিতে নিদ্রার বুকে ঢলিয়া পড়িত।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই হেন্‌রী ফোর্ড আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের মিসিগান প্রদেশের ডেট্রয়েট্ নামক পল্লীগ্রামে এক সামান্য কৃষক-কুটিরে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য আমেরিকার কৃষক ও ভারতীয় কৃষক এক জাতীয় নহে; উভয়কে এক গোত্রের অন্তর্গত করিলে ভুল হইবে। কারণ ভারতীয় কৃষকের জমিজমা অতি সামান্য, গৃহপালিত পশু নাই বলিলেও চলে; দুঃখ দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তিরূপে ভারতীয় কৃষক দুর্ব্বহ জীবন-ভার কোনমতে টানিয়া লইয়া যায়; কিন্তু আমেরিকার কৃষকের মহর্ষি বশিষ্ঠের মত বিরাট্ পশুপাল থাকে, দিগন্তব্যাপী শস্যক্ষেত্র গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া দেয়, বিশেষ কোন অভাবের তাড়না সহ্য করিতে হয় না। কাজেই যদিও সামান্য কৃষক আমেরিকার কোটিপতির তুলনায় কিছুই নহে, তথাপি আমেরিকার কৃষক যে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, তাহা ভারতীয় কৃষক কল্পনায়ও আনিতে পারে কিনা সন্দেহ। যাহা হউক হেন্‌রী ফোর্ডের পিতা এইরূপই একজন কৃষক ছিলেন। এই কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে কৃষক পরিবারের অঙ্গরূপে হেন্‌রী ফোর্ড শুক্লপক্ষের শশিকলার মত দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিলেন জনক-জননীর সোহাগ-ভালবাসার মধ্য দিয়া।

বালকের কল্পনা

বালক-হৃদয় স্বভাবতই কল্পনাপ্রবণ। বালকের চিত্ত যেরূপ অত্যদ্ভুত কাহিনীর দ্বারা সহজে বিগলিত হয়, অন্য বয়সে সেরূপ হওয়া খুবই দুরূহ। তাই আজও বালক-বালিকার চিত্তরঞ্জনকারীরূপে ঠাকুরমার রূপকথা বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে প্রচলিত। আরব্য রজনীর দৈত্যের কাহিনী বালকের চিত্তপটে রমণীয় ইন্দ্রজাল রচনা করে। হেন্‌রী ফোর্ডও ঐ কল্পনার বশীভূত ছিলেন। তাঁহার মনে পাতাল-পুরীর সুপ্ত রাজকন্যার চিত্র জাগিয়া উঠিত না, কিম্বা নীল সওয়াররূপে সাত সমুদ্রের পর পারে রাক্ষসপুরীতেও তিনি ছুটিতেন না! দিগন্তচুম্বিত শ্যামল শস্যক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় শোভা তাঁহার মানস-নয়নে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নপুরী ফুটাইয়া তুলিত—সে স্বপ্নলোকে তিনি দেখিতেন—মানুষের জীবনে এমন একদিন আসিবে যেদিন মানবের অর্দ্ধেক কষ্ট কমিয়া যাইবে; যে কাজ আজ ১০টি পশু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সম্পন্ন করিতেছে, তাহাই পলকে, সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে

'আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপে'র মত সম্পন্ন হইবে বিনা কষ্টে, মাথার ঘাম পায়ে না ফেলিয়া। বালকের মনে জাগিয়া উঠিত—নিষ্ঠুর ঈশ্বর আদমকে উপলক্ষ্য করিয়া মানবের ললাটে যে কঠোর অভিশাপ দাগিয়া দিয়াছিল যে, "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইবে"—এই অভিশাপ বাণী মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কৃষি-ক্ষেত্রে অশ্ব লাঙ্গল টানে, প্রতিদিন কৃষিক্ষেত্র দেখিতে হয়, দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিতে হয়—এই সমস্ত বিরক্তিকর কার্য্য যাহাতে না করিতে হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে তাঁহার মন উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিত। তিনি ভাবিতেন —একটি লৌহ-নির্ম্মিত অশ্ব চক্রের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ২০টি অশ্বের কাজ করিবে। তাহাকে চালাইবার জন্য লোকের প্রয়োজন হইবে না। চন্দ্র-সূর্য্য যেমন অদৃশ্য হস্তের অজানা ইঙ্গিতে নিয়মিত-ভাবে প্রত্যহ আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর, এই অশ্বও সেইরূপ নিজের কাজ করিয়া যাইবে। কাহারও পরিচালনার অপেক্ষা করিবে না। সেরূপ শস্য পৃথক করিবার জন্যও পশুর বা মানবের সহায়তা প্রয়োজনীয়রূপে অনুভূত হইবে না। কেবল মাত্র যন্ত্রের শক্তিতে সমস্তই আপনাআপনি চলিতে থাকিবে। তারপর দুইবেলা দুগ্ধ দোহনের প্রয়োজন নাই ; গরু যেমন ঘাস খাইয়া দুগ্ধ প্রদান করে, তেমনি যন্ত্রবলে কাঁচা ঘাস, খড় ও গাঁজর হইতে কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে এবং কল টিপিলেই শুভ্র ক্ষীরধারা প্রবাহিত হইয়া মানবের তপ্ত তৃষিত কণ্ঠ শীতল করিবে। একটি বিষয় বালক ফোর্ডের মনে বিশেষরূপে বাজিত ;—তিনি যখন দেখিতেন ক্লান্ত কৃষককুল পশুপাল সমভিব্যাহারে দূর শস্যক্ষেত্র হইতে অলসমন্থর পদে অস্তগামী সূর্য্য-কিরণে অনুরঞ্জিত দেহে সুদূর বাসগৃহের পানে চলিয়াছে, তখন তাঁহার মনে হইত কি করিলে এই কৃষককুলের কষ্ট দূরীভূত করা যায়, আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্যের মত উহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে গৃহে পৌছাইয়া দেওয়া চলে, যাহাতে আর তাহাদিগকে কষ্ট করিয়া ক্লান্ত দেহে হাটিতে না হয়,—তবে জীবন কি সুখেরই হয়! যদি এমন একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হয়, যাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুপথ অতিক্রম করা যায়, তবে কতই সুখের হয়। এইরূপ কল্পনা তাঁহার মানস রঙ্গমঞ্চে নিয়ত আবির্ভূত হইত। আর তিনি ঐ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে ধ্যান-নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া থাকিতেন ; ভুলিয়া যাইতেন জাগতিক কর্ম্মকোলাহল, বিশ্ব-সংসারের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ; কিরূপে ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মানবের দুঃখ দূর করিবেন, এই চিন্তাই তাহার মনোমধ্যে একাগ্রতার ধারা প্রবাহিত করিত। ঐ একাগ্র সাধনার বলেই আজ তিনি জগতের অদ্বিতীয় ধনশালী। পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়—"যথাভিলষিতধ্যানাদ্বা" অর্থাৎ অভিলষিত বা ঈপ্সিত বস্তুর ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাইতে পারে। ফোর্ডের এই গভীর চিন্তাকেও কি ধ্যান নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না? এইরূপ গভীর ধ্যানই মানবকে সিদ্ধির পথে লইয়া যায়। আর বাল্যকাল হইতেই ফোর্ড এই ধ্যানের সাধনায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

বালকের খেলা

ইংলণ্ডের অন্ধ মহাকবি মিল্টন বলিয়াছেন—

"Childhood shows the man
As morning shows the day." অর্থাৎ

প্রাতঃকাল দেখিয়া দিবস কি ভাবে অতিবাহিত হইবে, তাহা যেমন অনায়াসে বোঝা যায়, সেইরূপ বাল্যকাল দেখিলেই মানবের পরিণত জীবন কিরূপ হইবে তাহা বোঝা যায়।

বাস্তবিকই ঐ উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। বালকের খেলাধূলা লক্ষ্য করিলেই সে পরিণত বয়স কিরূপে কাটাইবে তাহা বোধগম্য হয়। বুদ্ধদেবের বাল্যকাল হইতে বৈরাগ্যের ভাব দেখা যাইত। ভক্তবীর চৈতন্যদেব বাল্যকাল হইতেই হরিনাম ভালবাসিতেন। সেইরূপ হেনরী ফোর্ডও বাল্যকাল হইতেই যন্ত্র লইয়া খেলা করিতে ভাল-বাসিতেন। একবার একটি ঘড়ী দেখিয়া তিনি উহার সমস্ত অংশ খুলিয়াছিলেন এবং পুনরায় তাহা যথাযথরূপে সংযোজন করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার জনকজননী বিস্মিত হন। যন্ত্র পরীক্ষায় কৌতূহল দেখিয়া তাঁহার মা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "ছেলে আমার born mechanic"।

এঞ্জিন দর্শনে

সংস্কৃত ভাষায় আছে—

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অর্থাৎ যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ। যে যে বিষয় ভাবে, সে সেই বিষয়ে তদনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। পুরুষকারের প্রবল আকর্ষণে দৈব স্বভাবতঃ অনুকূল হয়। একদা ১২ বৎসর বয়সে ফোর্ড তাঁহার পিতার সঙ্গে ডেট্রয়েট হইতে দূরবর্ত্তী সহরে যাইতেছিলেন। পথে এক জায়গায় অশ্বদিগকে আহার দানের জন্য গাড়ী থামিল। ফোর্ড দেখিলেন অদূরে একটা এঞ্জিন রহিয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও এঞ্জিন দেখেন নাই। তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, উহা রাস্তা মেরামতের এঞ্জিন। ফোর্ড তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া এঞ্জিন চালকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং এঞ্জিনের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এঞ্জিন চালক বিশেষ ভাল মানুষ ছিল, সে সমস্ত অংশ ফোর্ডকে ভাল করিয়া দেখাইল এবং বালকের প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

এই সময় হইতে ফোর্ডের মনে এইরূপ একটা এঞ্জিন প্রস্তুতের চিন্তা উদিত হয়, যাহা দ্বারা অল্প সময়ে দূরত্বের হ্রাস করা সম্ভবপর।

বিদ্যালয় ত্যাগ

সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষায় ফোর্ডের তেমন মনোযোগ ছিল না। তিনি দিনরাত যন্ত্র লইয়া মসগুল হইয়া থাকিতেন; অনেক সময় আহার নিদ্রার কথাও ভুলিয়া যাইতেন। কাজেই ১৭ বৎসর বয়সে তাঁহাকে তথাকথিত মা সরস্বতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। হয়ত মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলে মা লক্ষ্মী অভিমানই করিতেন! কে বলিবে?

এপ্রেন্টিস ফোর্ড

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া হেনরী ফোর্ড এক ইঞ্জিনিয়ারের কারখানায় অবৈতনিক শিক্ষানবিস বা এপ্রেন্টিসরূপে প্রবেশ লাভ করেন। এই শিক্ষানবিসের অবস্থায় তিনবৎসর অতিবাহিত হইবার পর তিনি যন্ত্রনির্ম্মাতার পদ লাভ করেন। বোধ হয় এই শিক্ষানবিসের জীবনের অভিজ্ঞতাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে তাঁহার ফ্যাক্টরীতে অবৈতনিক শিক্ষানবিসের পদ রহিত করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

যন্ত্রনির্ম্মাতা ফোর্ড

এই সময় ফোর্ড ঘড়ি মেরামতের কার্য্য শিক্ষা করেন। দিনে কারখানার কাজ করিয়া সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে লোকের ঘড়ী মেরামতের কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময় খুব সস্তায় ঘড়ী বিক্রয় করিবার ইচ্ছা তাহার মনোমধ্যে উদিত হয়; তিনি ভাবিলেন—যদি ১ শিঃ ৩ পেন্স দামে এক একটি ঘড়ী বিক্রয় করা যায়, তবে অল্পদিনের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হওয়া কষ্টকর নহে, কিন্তু পরে বিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি এই কার্য্যের কতকগুলি অন্তরায় উপলব্ধি করেন—তিনি হিসাব করিয়া দেখেন যে যদি পৃথিবীর প্রত্যেক লোক একটি করিয়া ঘড়ী ক্রয় করে, তথাপি পরিমাণে তাঁহার আয় খুব বেশী হইবে না। এই জন্য তিনি এই সঙ্কল্প পরিহার করেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা যে নিতান্ত অমূলক নহে, অল্প দামে ঘড়ী বিক্রয় করিয়াও যে লাভবান্ হওয়া সম্ভব, পরবর্ত্তীকালে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ঘড়ী বিক্রেতা এন্জারসোল ওয়াচ কোম্পানী তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে।

অতঃপর তিনি ওয়েষ্টিং হাউস্ কোম্পানীতে এঞ্জিন মেরামতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কারখানায় কার্য্যকালে হেন্‌রী ফোর্ড রাস্তা মেরামতের এঞ্জিন প্রস্তুত করেন। এই কারখানায় একটি পেট্রোল পরিচালিত অটো এঞ্জিন তিনি মেরামত করেন। ইহাতে অটো এঞ্জিনের অংশসমূহ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হয়, ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নিজে একটি অটো এঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন। ইহা কার্য্যোপযোগী হইলেও জনসাধারণ ইহাতে তাঁহাকে উপহাস করে। কিন্তু সাধক কখনো স্তুতি-নিন্দায় বিচলিত হন না, নীরবে স্বীয় কর্ত্তব্য-

পথে অগ্রসর হন, ফোর্ডও তেমনি অপরের উপহাসে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ফোর্ডের বিবাহিত জীবন

এই সময় ফোর্ড সহরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে ফিরিয়া আছেন। এই সময় এক গ্রাম্য বালিকার সরল ও মধুর দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহার পিতাও এই বিবাহে সম্মতি দান করেন এবং ফোর্ডকে ৪০ একর বনজমি প্রদান করেন। ফোর্ডের বিবাহের পর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩১ ফিট পরিমিত একটি গৃহে বিবাহিত জীবনের আরম্ভ। এইখানে তিনি একটি ছোট অয়েল এঞ্জিন ক্রয় করিয়া কাঠ কাটাইয়া তাহা বিক্রয়োপযোগী করিয়া কাটিবার ব্যবস্থা করেন। যদিও এই সময় তাঁহার ভবিষ্যৎ বিশেষ সমুজ্জ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, তথনি তাঁহাদের জীবন বেশ সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন; উভয়ই মনে করিতেন তাঁহাদের জীবনে এমন একদিন আসিবে, যখন ঐশ্বর্য্যের মহতী লীলা তাহাদের উভয়কে সুখস্বপ্নে বিভোর করিয়া তুলিবে। এইখানে শ্যামল পল্লীদৃশ্যের মধ্যে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ফোর্ড এঞ্জিন সম্বন্ধীয় পুস্তকপাঠে অতিবাহিত করিতেন।

নূতন কার্য্য

কিন্তু এই সময়ে ফোর্ড ডেট্রয়েট বৈদ্যুতিক কারখানায় প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। এই সময় তাঁহার জীবনের এক সমস্যা উপস্থিত হয়—তিনি সম্মুখে দুইটি পথ দেখিতে পান;—একটি শান্তিময় পল্লী-জীবন, অন্যটি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া। উভয়ের মধ্যে কোনটি মনোনীত করিবেন—ইহা লইয়া কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগতঃ ভাবনাসমুদ্রে ডুবিয়া ছিলেন, কিন্তু উচ্চাবিলাষী কথনো শান্তিময় পল্লীজীবনে বাঁধাধরা কাজের মধ্যে আত্মহারা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। নবজীবনের বৈচিত্র্য, উন্মাদনাময় উত্তেজনা, বিশ্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা তাহাকে উত্তপ্ত ধূপের মত ছুটাইয়া লইয়া যায়। কে বলিবে তাহার পরিণাম কি?

সৌভাগ্যের পথে

ফোর্ড বৈদ্যুতিক কারখানায় ইঞ্জিনিয়ারের পদ গ্রহণ করিয়া ডেট্রয়েট সহরে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন, অবসর সময়ে অটো এঞ্জিনের অনুকরণে নিজে একখানা গাড়ী প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেন। একান্ত সাধনায় সিদ্ধি অনিবার্য্য; অবশেষে ফোর্ডের অদৃষ্টদেবী প্রসন্না হইলেন। সে তাঁহার জীবনের এক স্মরণীয় দিন—যে দিন তিনি স্বহস্ত-নির্ম্মিত যান রাজপথে চালাইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করেন। আজ হয়ত ফোর্ড ঐশ্বর্য্য-সম্পদে বহু-গুণে উর্দ্ধে অবস্থিত—কিন্তু তুলনা করিলে দেখা যাইবে বর্ত্তমানে ঐশ্বর্য্য-পরিবৃত জীবনের দিন অপেক্ষা যেদিন অখ্যাতনামা এঞ্জিনিয়াররূপে নিজের জীবনব্যাপী সাধনার অমৃতময় ফল একাগ্রতা-কল্পলতিকার পাদমূলে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন সেদিনের মূল্য অনেক বেশী। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম অটো এঞ্জিনযুক্ত ফোর্ডমটর জনসাধারণের গোচরীভূত হয়। ইহাতে এত শব্দ হইত যে, পথিকগণ ভীত হইত, অশ্বগণ ভয়ে বিপথে বিচরণ করিত, অনেক সময় ঐ মটর দেখিবার জন্য রাস্তায় এত লোক জমা হইত যে, গাড়ী ইত্যাদি অতিক্রম করিবার জন্য পুলিসের সহায়তায় জনতাকে সংযত করিতে হইত। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট আমেরিকায় সর্ব্বপ্রথম লাইসেন্সের প্রবর্ত্তন করেন এবং বিস্ময়ের বিষয় যে, যিনি পরবর্ত্তী কালে লক্ষ লক্ষ লোকের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার উপাদান যোগাইবেন, তাঁহাকেই আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সর্ব্বপ্রথম মটর লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়! অদৃষ্টের পরিহাস বটে!

ফোর্ড-মটরের ক্রমবিকাশ

দুই বৎসরে হাজার মাইল পথ বেড়াইয়া ফোর্ড তাঁহার প্রথম নির্ম্মিত কদাকার মটর ৪০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা নূতন মটর নির্ম্মাণে নিয়োজিত করেন। কিন্তু

এই সময়ে এডিসন কোম্পানী তাঁহাকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক হন, যদি তিনি তাঁহার অটোমোবিল নির্ম্মাণ ত্যাগ করেন। এইবার বাস্তবিকই তাঁহার নিকট এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। হয় কর্ম্মত্যাগ—নতুবা জীবনের উদ্দেশ্য ত্যাগ। যে সাধনার কল্পনায় বাল্যকাল পর্য্যবসিত, যৌবন যাহার জন্য নিয়োজিত, সে সাধনা যখন সিদ্ধির অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহা ত্যাগ করা সাধকের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মটর ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার তৎকালীন মনোভাব তাঁহার স্বরচিত জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"I had to choose between my job and my motor car. I chose the motor car·········and went into the motor car business."

এই সময়ে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় মটরকার নির্ম্মাণ করেন। ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হাল্‌কা ছিল।

কার্য্যত্যাগ করায় তাঁহার আয় কমিয়া গেল, কিন্তু পতিপত্নী সানন্দে হাস্যমুখে দুঃখকে বরণ করিয়া লইলেন। এডিসন কোম্পানীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টরূপে জীবন অতিবাহিত করিলে আজ ফোর্ডের নাম জগতে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

কয়েকজন ধনী লোক মিলিয়া একটি মটর কারখানা স্থাপন করেন এবং ফোর্ড ঐ কারখানায় প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পদে বৃত হন। কিন্তু এই সময় অংশীদারগণের সঙ্গে তাঁহার মতানৈক্য উপস্থিত হয়। অংশীদারেরা চাহিতেন কম জিনিষে বেশী লাভ, ফোর্ড চাহিতেন বেশী জিনিষে কম লাভ, সুতরাং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করেন এবং নিজে ব্যবসা আরম্ভ করিতে মনস্থ করেন।

লোক মটর রেস্ দেখিতে ভালবাসিত। যে গাড়ী রেসে জয়লাভ করিত, লোক সেই গাড়ীরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িত। সুতরাং, ফোর্ড ও ঐরূপ দুইটি রেস্ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতঃ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠেন।

আর্থিক কষ্ট

কিন্তু লোক তাঁহার মটর নির্ম্মাণ-ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াও কোম্পানী গঠনে সাহায্য করিতে রাজী হইল না। পরিশেষে অনেক কষ্টে ৬০০০ পাউণ্ড মূলধন সংগ্রহ করিয়া তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ফোর্ড মটর কোম্পানী গঠন করেন। এই কোম্পানীর এক চতুর্থাংশ মূলধন তাঁহার ছিল এবং তিনিই এই কোম্পানীর একমাত্র ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট, কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহাকে আদেশ করিবার কেহই ছিল না। প্রথমে ২৫ খানা গাড়ী প্রস্তুত করা হয়।

কর্ম্ম-প্রণালী

প্রথম বৎসরে ১৭০৮ খানা গাড়ী নির্ম্মিত হয়। উহা মডেল A রূপে পরিচিত। দ্বিতীয় বৎসরে অংশীদারগণের মতানুসারে অন্য দুই প্রকার মডেল তৈয়ারী হয়। কিন্তু তাহাতে প্রস্তুতের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং মাত্র ১৬৯৫ খানা গাড়ী বিক্রয় হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফোর্ড কোম্পানীর শতকরা ৫১ ভাগ নিজে কিনিয়া লন এবং ১৩ বছর পরে ফোর্ডের পুত্র বাকী অংশ সমস্ত ১৫০০০,০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করেন। ২০ পাউণ্ড মূল্যের অংশ প্রত্যেকটি ২৫০০০ পাউণ্ড দরে ক্রয় করিতে হইয়াছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ফোর্ড পপুলার মডেল নির্ম্মাণ করিয়া উহার মূল্য ১২০ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত করেন। ঐ বৎসরেই ৮৪২৩ খানা গাড়ী বিক্রয় হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৬ দিনে ৩১১ খানা গাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং ঐ বৎসর জুন মাসে ১ দিনে ১০০খানা গাড়ী নির্ম্মাণ করা হয়।

এই সময়ে গাড়ী হাল্কা করা হয় এবং ঐ চেষ্টার ফলে মডেল T বাজারে বাহির করা হয়। এই গাড়ীর ওজন মাত্র ১২০০ পাউণ্ড।

ফ্যাক্টরীর উন্নতি

পাঁচ বৎসরের মধ্যে সামান্য কাঠের কারখানা হইতে বিশাল ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠে এবং উহা প্রায় আড়াই একর

স্থান ব্যাপ্ত হয়। কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৩০০ হইতে ২০০০ হাজারে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে লাভের পরিমাণ আশাতীতরূপে বাড়িয়া যায়।

বিক্রীত গাড়ীর সংখ্যা

মডেল T অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। প্রথম বৎসরে ১০৬০৭ খানা গাড়ী বিক্রয় হয়। সেই সময় হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক কোটি ৫০ লক্ষ গাড়ী পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রয় করা হইয়াছিল।

এই সময় ফোর্ড প্রচার করেন যে, খরিদ্দারের পছন্দমত যে কোন রঙে গাড়ী রঞ্জিত করা হইবে। এতদিন কেবল কাল রঙে রঞ্জিত করা হইত।

দৈবসুযোগ

মডেল T বাজারে বাহির করিবার পূর্ব্বে ফোর্ড যাহাতে গাড়ীর ভার কমাইয়া উহাকে শক্ত ও মজবুত করা যায়, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না। কারণ এমন লৌহ খুঁজিয়া পান নাই, যাহাতে ভার কমে, অথচ গাড়ী শক্ত হয়। কিন্তু দৈবক্রমে তিনি ঐ জিনিষ লাভ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পামবীচ নামক স্থানে এক মটর রেস্ প্রতিযোগিতায় একখানি ফরাসী গাড়ী ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ হইয়া যায়, ঐ গাড়ী পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া ফোর্ড একটি ক্ষুদ্র চাবি (valve) কুড়াইয়া পান। উহা অত্যন্ত হাল্কা এবং ভয়ানক শক্ত ছিল। তিনি এই রকম জিনিসই খুঁজিতেছিলেন। উহা লইয়া তিনি তাঁহার সহকারীকে উহা কিরূপ লৌহ তাহা পরীক্ষা করিতে বলেন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে উহাতে ভেনেডিয়াম (vanadium) আছে—উহা একপ্রকার ফরাসী লৌহ কিন্তু ঐ ভেনেডিয়াম লৌহ আমেরিকায় প্রস্তুত হয় না। উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে লোক প্রেরণ্ করেন এবং পরে আমেরিকায় ঐ লৌহ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করেন।

কর্ম্মকৌশলের বৃদ্ধি

১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের কল্পিত জনরব যে কোম্পানী দেওলিয়া হইবে—উপেক্ষা করিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরী ৩২ একর জমিতে গড়িয়া উঠে। কর্ম্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে গাড়ীর সংখ্যা ৬০০০ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৩৫০০০ হাজারে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডেও ফোর্ড তাঁহার গাড়ী প্রচলন করেন। বিগত ইয়োরোপীয় মহাসমরে ফোর্ডগাড়ী প্রত্যেক সীমান্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু ৪৪০৬ ফিট উচ্চ বেননেভিস্ পর্ব্বতের শিখরদেশে গাড়ী চালাইবার পর, সমগ্র ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড ফোর্ড গাড়ীর জয়গানে মুখরিত হয় এবং এক বৎসরে ঐ দেশে ১৪০০০ গাড়ী বিক্রীত হয়। অতঃপর ফোর্ড ম্যানচেষ্টারে কারখানা স্থাপন করেন। বর্ত্তমানে বৃটিশ ফোর্ড ঐ কারখানায় নির্ম্মিত হইতেছে।

ব্যবসা-সঙ্কট

উত্থান-পতন মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। বাধা-বিঘ্ন উন্নতি-পথের সোপান মাত্র। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া দিগন্তবিস্তৃত অন্তহীন নীলাম্বুধির লহরীমালা দর্শনে মনকে ভাব-রসে আপ্লুত করিতে হইলে যেমন ৭০০ সিড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়, তেমনি জীবনে—যে কোন বিভাগেই হউক কেন—উন্নতি করিতে হইলেই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে ; উত্থান-পতনে ভীত না হইয়া ছুটিয়া চলিতে হইবে। কণ্টক তরুর তীব্র আঘাতে গাত্র হইতে শোণিত-ধারা নিঃসৃত হইবে—সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে দুঃখ, সে কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া জীবনের পথে যদি ক্রমাগত চলিতে পারা যায়, অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত, তবেই একদিন ঐশ্বর্য্যের মহীয়সী মন্দির-ছায়া দূর পশ্চিম গগনে সৌরকরস্পর্শে হাসিয়া উঠিবে। যে জীবনে উত্থান-পতন নাই, বিঘ্ন-বাধার অতিক্রমণে আনন্দ নাই, বিশাল প্রান্তরের মত এলায়িত দেহে যাহা কাল-সাগরের তীর দিয়া অগ্রসর হয়, সে জীবনে শান্তি থাকিতে পারে ; কিন্তু সে জীবনে কর্ম্মীর আনন্দ নাই, রণজয়ের উন্মাদনা নাই, হৃদয়ের আকুল উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস নাই—সে জীবন অসম্পূর্ণ ; পূর্ণ নহে।

ফোর্ডও উন্নতির উচ্চশিখরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে,

জগতের বিশাল বক্ষে যশোমন্দিরের ভিত্তি সুপ্রোথিত করিবার পূর্ব্বে, এমন এক সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার মত শান্ত স্থির কর্ম্মযোগীকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে উক্ত ফোর্ড কোম্পানীর সমস্ত অংশ পুত্রের দ্বারা ক্রয় করাইবার জন্য ফোর্ড ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড ধার করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র তাহার অর্দ্ধেক পরিশোধ করা হইছিল। অবশিষ্ট ৭০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় ফোর্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ বাজারে এক জনরব তুলিয়া দেয় যে, এই বার ফোর্ড কোম্পানী দেওলিয়া হইবে। হেন্‌রী ফোর্ড স্বয়ং টাকা ধার করিবার জন্য ইতস্ততঃ ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ছুটাছুটি করিতেছেন; এইবার ফোর্ডের ভয়ানক টাকার টানাটানি পড়িয়াছে।

কিন্তু এইরূপ জনরবে কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে, কারণ যদি কোম্পানী উঠিয়া যায়, তবে গাড়ীর প্রয়োজনীয় অংশ আলাহিদাভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে না, এই জন্য কেহই গাড়ী কিনিতে চাহে না।

ফোর্ডের কার্য্যকরী ক্ষমতা ও উপস্থিত বুদ্ধি

ইতিপূর্ব্বে বিক্রয়াধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে ফোর্ড গাড়ী প্রস্তুতের এক নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কার্য্য সাধনের উপায় অবলম্বন করেন। প্রথমে প্রত্যেক অংশ লোক উঠিয়া গিয়া গাড়ীতে সংযোজিত করিত। কিন্তু ফোর্ড দেখিলেন এইরূপে কাজের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে; উঠিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহা যদি কোন রকমে কমান যায়, তবে অনেক বেশী কাজ করা যাইতে পারে। এই নিমিত্ত তিনি 'moving assembly line' প্রথা সৃষ্টি করেন। ইহাতে মটর খানাকে একটি ঘূর্ণ্যমান প্লাটফরমের উপর স্থাপিত করা হয়; উহা ঘুড়িয়া প্রত্যেক লোকের নিকট দিয়া যায় এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব অংশ উহাতে সংযোজিত করে। মাত্র প্রত্যেক লোক দ্বিতীয় ইঞ্জিন তাহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যাহাতে তাহার অংশ সংযোজন করিতে পারে, সে সময় দেওয়া হয়, পূর্ব্বে একখানা গাড়ী প্রস্তুত করিতে ৯ ঘণ্টা লাগিত এই ব্যবস্থায় ৫ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একখানা গাড়ী প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুতরাং সমান সংখ্যক কর্ম্মচারী দ্বিগুণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইল। এই কারণে ফোর্ড কারখানায় গাড়ীর মূল্য না বাড়াইয়াও কর্ম্মচারীর বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে।

এই উপায়ে গাড়ীর প্রস্তুতি-সংখ্যা এক বৎসরে ২৪৮,০০০ হইতে ৩০৮,০০০তে উঠে এবং দাম কমাইয়া ১০০ পাউণ্ড করা হয়। যদিও প্রথম হইতে সস্তায় গাড়ী নির্ম্মাণ ফোর্ডের প্রধান কৃতিত্ব, তথাপি যেভাবে তিনি দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল না হইলে বহুল নহে। বিশেষতঃ যখন কোম্পানীর সঙ্কটকাল উপস্থিত, প্রতি পদে ভীষণ প্রতি-যোগিতা ও শত্রুর অমূলক জনরব কোম্পানীর অনিষ্ট সাধনে তৎপর, তখন যে ভাবে, যে কর্ম্ম-প্রণালী অনুসরণ করিয়া তিনি স্বীয়পদ-মর্য্যাদা বজায় রাখেন, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে, কর্ম্মবীরের মহতী প্রচেষ্টায় নির্জ্জীব প্রাণেও উৎসাহের সঞ্চার হয়।

সঙ্কটে উদ্ধার

পূর্ব্বোল্লিখিত জনরবের প্রতিকূলে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ফোর্ড বদ্ধপরিকর হইলেন। একটি কাণাকড়িও তিনি ধার করিতে চাহিতেন না। অথচ ১৯২১ সনের ১লা এপ্রিলের মধ্যে তাহাকে ধার শোধ করিতে হইবে ৭০০০,০০০ পাউণ্ড ও কর্ম্মচারীর বক্‌সিস্ ইত্যাদিতে আরও ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে; মোট ১২০০০,০০০ পাউণ্ড চাই। কিন্তু কি উপায়ে এত টাকা সংগ্রহ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। তিনি কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই বিষয়ে ফরাসী মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ মহা পুরুষ যেমন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া অবিলম্বে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, এক মিনিটও বৃথা অতিবাহিত করিতেন না, ফোর্ডও তেমনি বিলম্ব করিবার পাত্র নহেন। তিনি দেখিলেন যে সমস্ত গাড়ীর অর্ডার তাঁহার নিকট জমা আছে, যদি তিনি সেই সমস্ত গাড়ী অবিলম্বে সরবরাহ করেন, তবে

অনেক নগদ টাকা হাতে আসে ; কিন্তু এত অল্প সময়ে কিরূপে অত গাড়ী নির্ম্মাণ সম্ভবপর ?—এই অসম্ভব সম্ভব করাই মহামতি ফোর্ডের কৃতিত্ব—ব্যবসা-জগতে স্থায়ী প্রতিপত্তি লাভের মূল উৎস।

ফোর্ড প্রথমতঃ খরচ কমাইলেন, অতিরিক্ত টেলিফোন পর্য্যন্ত বিযুক্ত করিলেন ; অফিসের কর্ম্মচারী অনেক কমাইয়া দিলেন এবং ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীকে কারখানায় নিযুক্ত করিলেন। তারপর দিবারাত্র অবিরাম কাজ চলিতে লাগিল এবং এইরূপে এক বৎসরে পূর্ব্বোল্লিখিত সংখ্যক গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এমন সময় আবার এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। রেল কোম্পানী গাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে ও কাঁচা মাল আনিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। ফোর্ড দেখিলেন গাড়ী যদি রেলওয়ে সাইডিংএ পড়িয়া থাকে, তবে তাঁহার টাকা আসিবে না। সুতরাং এইবার তিনি যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার মত কর্ম্মবীরেরই উপযুক্ত। তিনি অবিলম্বে ডেট্রয়েট্, টলেডো এবং আয়রনটন রেলপথ কিনিয়া লইলেন। তাহাতে তাঁহার কাঁচা মাল আমদানীর বিলম্বও কমিয়া গেল এবং গাড়ীও সরবরাহ করা অল্প সময়ে সম্ভব হইল।

ইহাতে আরও একটী সুবিধা এই হইল যে, কাঁচা মালের জন্য বেশী টাকা আটকাইয়া রাখিতে না হওয়ায় ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড বাঁচিয়া গেল। ১লা জানুয়ারী ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয় এবং ১লা এপ্রিল মধ্যে ১৭,০০০,০০০ পাউণ্ড জমা হইয়া যায়।

এইরূপে তিনি আর্থিক সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অদ্বিতীয় ব্যবসায়ীরূপে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে বৎসরে ২০ লক্ষ গাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। লোকে ভাবিয়াছিল এই সংখ্যার বেশী বোধ হয় আর গাড়ী নির্ম্মিত হইবে না। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নূতন ফোর্ড গাড়ীর প্রস্তুতি-সংখ্যা পুরাতনকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

রেলপথ ক্রয়ই ফোর্ডের ব্যবসা-বুদ্ধির বিশেষত্ব। যখন সমস্ত ব্যবসা-জীবন ঘনান্ধকারে বিলীন হইবার উপক্রম, তখন সমস্ত রেলপথ ক্রয় অসীম সাহসের পরিচায়ক। এইরূপ সাহস একমাত্র ফরাসী মহাবীর নেপোলিয়ানের চরিত্রেই দৃষ্ট হইত। সাধারণ ব্যবসায়ী মাত্র রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইত, কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়ীর মত কাজ করিলে আজ ফোর্ডের নাম বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া থাকিত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ফোর্ড অতিরিক্ত ৫ কোটি পাউণ্ড কর্ম্মচারীর বেতন বাবৎ ব্যয় করেন। বৎসরে মোট প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড কর্ম্মচারীর বেতন দিতে হয়।

বর্ত্তমান ফোর্ড কোম্পানী মাত্র একজনের সম্পত্তি। এইরূপে ফোর্ড সামান্য কৃষক বালক হইতে আজ পৃথিবীর অদ্বিতীয় ধনকুবেরে পরিণত হইয়াছেন।

ফোর্ড ফ্যাক্টরীর বিশেষত্ব

ফোর্ড ফ্যাক্টরীতে যত অধিক বেতন দেওয়া হয়, তত অধিক বেতন পৃথিবীর অন্য কোন কারখানায় দেওয়া হয় না। যে কোন সাধারণ লোক, যে একটি স্ক্রু কষিতে সক্ষম তাহাকেই দৈনিক ৬ ডলার বেতন দেওয়া হয়। ঝাড়ুদারও দৈনিক এক পাউণ্ড বেতন পায়।

এখানে বিশেষজ্ঞ দেখিয়া লোক লওয়া হয় না। লোক পূর্ব্বে কোন কাজ করিয়াছে কিনা তাহাও দেখিবার আবশ্যকতা নাই। এমন কি পূর্ব্বে সে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে কিনা তাহার সন্ধান লওয়াও অনাবশ্যক মনে হয়। এই সম্বন্ধে ফোর্ডের স্বরচিত জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"We do not care in the least a man's antecedents—we do not hire a man's history, we hire the man. If he has been in jail, that is no reason to say that he will be in jail again. I think, on the contrary, he is, if given a chance, very likely to make a special effort to keep out of jail. Our employment office does not bar a man for anything he has previously done—he is equally acceptable whether he has been in Sing Song or at

Harvard and we do not even inquire from which place he has graduated. All that he needs is the desire to work."

ফোর্ড কারখানায় ব্যক্তিগতভাবে সকলেই কাজের জন্য দায়ী। যাহার যে কাজ সে তাহাই নীরবে করিয়া যায়। কোনরূপ ঝগড়া বিবাদ বা আধিপত্য লাভের সুবিধা এই ফ্যাক্টরীতে নাই। কারণ এখানে পদ-মর্য্যাদা নাই। মাত্র একজন জেনারেল ম্যানেজার ফ্যাক্টরীর সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারীরূপে বর্ত্তমান; যে কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যে কোন প্রকার অভিযোগ জানাইতে পারে। যদি কেহ কোন নূতন প্রণালী কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ উদ্ভাবন করিতে পারে, তবে সে তাহা ম্যানেজারকে জানাইতে পারে এবং ম্যানেজারও সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য।

ফোর্ড মনে করেন পদ-মর্য্যাদা কার্য্যের পক্ষে ক্ষতিকর; সুতরাং তাঁহার ফ্যাক্টরীতে স্ব স্ব পদে সকলেই সমান। ম্যানেজারে ও সামান্য কারিগরে পদ-মর্য্যাদা হিসাবে কোন তফাৎ নাই।

কর্ম্মদক্ষতা দেখাইতে পারিলে উন্নতি অনিবার্য্য। কার্য্যকাল মাত্র ৮ ঘণ্টা।

উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া ফোর্ড আজ ব্যবসা জগতে একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে পরিগণিত। একজন লোকের জীবনে এত অধিক অর্থ উপায় পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। অবিরাম কর্ম্মই তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াই তিনি আজ জগতে বরেণ্য হইয়াছেন।

(১০)

লণ্ডনের মিউজিয়াম

বৃটিশ মিউজিয়াম

লণ্ডন মিউজিয়ামের কথা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে বৃটিশ মিউজিয়াম সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

বৃটিশ মিউজিয়ামের নাম জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহা ব্লুম্‌সবেরিতে অবস্থিত।

সেকাল ও একাল

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মিউজিয়াম যখন স্থাপিত হয়, তখন ইহার বর্ত্তমান বিশালত্ব কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সরকার অনিচ্ছার সহিত অর্থ সাহায্য করিতেন, আর জনসাধারণও তেমন কিছু ইহার মর্য্যাদা বুঝিত না। এক সময়ে পার্ল্যামেণ্টে মিউজিয়ামে টাকা দানের বিপক্ষে বলিতে গিয়া উইলিয়াম কবেট বলিয়াছিলেন, "এত বড় পৃথিবীতে বৃটিশ মিউজিয়ামের কোন্ সার্থকতাটা আছে?" তখন বালকবালিকাদের ঢুকিতে দেওয়া হইত না, বয়স্কদের টিকিটের জন্য আবেদন করিতে হইত। সময় সময় কয়েক সপ্তাহ অতীত না হইলে টিকিট পাওয়া যাইত না। এক সঙ্গে পাচ জন পাঁচ জন করিয়া দুই দলে মাত্র দশজনকে ঢুকিতে দেওয়া হইত। আর নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে মাত্র এক ঘণ্টা লোকেরা থাকিতে পাইত—মুদ্রিত পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। প্রবেশের দিন ও সময় সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম ছিল, আর ভীড় হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পুলিশ ও ফৌজ প্রভৃতি মোতায়েন থাকিত।

কিন্তু আজিকার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বিত হয়। পার্ল্যামেণ্ট এখন যথেষ্ট অর্থ সাহায্য

করে না বটে, কিন্তু বেসরকারী দান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গোড়ার তিনটি বিভাগের স্থানে এখন বারোটি বা তাহার চেয়েও বেশী বিভাগ রহিয়াছে। চল্লিশটির অধিক সচিত্র গাইড্-বুক্ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সকলের জন্য, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য বিনা পয়সায় গাইড্ বক্তৃতা করা হয়। ফটোগ্রাফ ও পোষ্টকার্ডে তোলা ছবি দ্বারা মিউজিয়ামের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে এবং কখনো কখনো এইরূপ প্রদর্শনীতে বাইব্‌ল, সেক্‌স্‌পিয়ার, অঙ্কন ও চীনা দেওয়াল-ছবি দেখান হয়। একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা চলিতেছে। তাহাতে আধুনিক সংগৃহীত বিষয়াবলীর পরিচয় থাকে। বৃটিশ মিউজিয়াম আজ জনগণের শিক্ষার এক বড় কেন্দ্র, অল্পবুদ্ধি লোকেরাও এখানে অনেক বিষয় শিখিবার অবকাশ পায়। প্রতি বৎসর ১২½ লক্ষ লোক মিউজিয়াম দেখিতে আসে, তন্মধ্যে রবিবার দর্শকের সংখ্যা ৮০ হইতে ৯০ হাজার। দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগে যাহারা আসে তাহাদের অবশ্য ধরা হয় নাই; এই বিভাগে ১৮৮১-৮৫ সনে ভূতত্ত্ব, খনিতত্ত্ব, ও জন্তু সম্পর্কীয় বিষয়গুলি সরান হইয়াছিল।

মিউজিয়ামের সংগ্রহ-বৈচিত্র্য

বৃটিশ মিউজিয়াম বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠতা ও আয়তন একদিনে লাভ করে নাই। ইহার গৃহটি ১৮২৩-৪৭ খৃষ্টাব্দে পুনর্নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পড়িবার ঘরটি (Reading Room) তৈরী হয়। একবার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ও তারপর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই ভবনের সংস্কার হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ৮০টিরও বেশী প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক, ম্যাপ, মুদ্রা, অঙ্কন ব্যতীত সংগৃহীত বিষয়সমূহ আদিম ও অর্দ্ধ সভ্য জাতিসমূহের জীবনধারা ও রীতিনীতি প্রদর্শন করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত হইয়াছে : যেমন, প্রস্তর, Bronze ও লৌহ যুগ প্রাচীন মিশর, বেবিলন ও নিনেভে, প্রাচীন গ্রীস ও রোম, ফিনিশিয়া, এট্রুস্কান, সেমাইট, হিটাইট, ভারতীয় ধর্ম্ম-সুদূর প্রাচী ও সুদূর প্রতীচী প্রত্নবিভাগ, মুদ্রা, মেড্যাল, চার্টার, অটোগ্রাফ, শীল, ইত্যাদি। প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন ও বিভিন্ন ধরণের সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র, রত্ন ও অলঙ্কার এবং বালকবালিকাদের বিভিন্ন যুগের ক্রীড়া সামগ্রী বৃটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহাবলীর অন্তর্গত।

যে বিভাগে মিশর সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি রহিয়াছে সেখানে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭,০০০ অব্দের এক পুরাতন 'মমি' রক্ষিত হইতেছে। Book of Dead নামক প্রাচীন মিশরের ধর্ম্মপুস্তকের পাণ্ডুলিপিও আছে। ইহা ৬,০০০ বৎসরের পুরাতন এবং ইহাতে আত্মার পাতাল ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছিল।

বৃটিশ মিউজিয়ামের দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহের মাত্র উল্লেখ করাও সহজ নহে। এখানে শুধু অল্প কয়েকটি বিষয়ের নামোল্লেখ করা হইতেছে। প্রাচীন নিনেভের দ্বারদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষাঁড় ও সিংহের মূর্ত্তি স্থাপিত থাকিত। ইহাদের মাথা মানুষের মত ও দুইদিকে পাখা আছে। ২১০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব বেবিলনের রাজা হামুরাবেরি সময়ের এইরূপ মূর্ত্তি এখানে রাখা হইয়াছে। ইটের তৈরী ট্যাবলেটের উপর আসিরীয় শিল্পিগণ সৃষ্টি ও জলপ্লাবনের গল্প খোদিয়া রাখিয়াছে দেখা যাইবে। মোয়াব নামক স্থানের পাথরের উপর সেমাইট ও হিটাইটদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে—সেখানে মিশরের সহিত ইস্রেলের সংঘর্ষের কথাও আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলগিন ৭০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে অত্যুৎকৃষ্ট ফিডিয়ান স্থাপত্য ক্রয় করিয়া অর্দ্ধমূল্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন। স্থাপত্য শিল্পের এগুলি চমৎকার নিদর্শন। মিউজিয়ামে অন্যান্য গ্রীক ও গ্রীক্-রোমান শিল্পের প্রচুর উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে। মসোলিয়াম গৃহে মসোলাস ও তাহার স্ত্রীর মূর্ত্তি রথোপরি স্থাপিত অবস্থায় দেখা যাইবে। প্রাচীন সম্রাট্ ও দেবগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাথা আঁকিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সেতুর নিকট হেড্রিয়ানের মাথা পাওয়া যায়। তাহা এই মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। গ্রীক্, রোমান্ ও এট্রুস্কান স্বর্ণালঙ্কার, খোদিত মূল্যবান্ প্রস্তরাদি, মুদ্রা ও মেড্যাল (ইহার ভিতর বেবিলনের

আছে), বিগত মহাযুদ্ধের মেড্যালসমূহ, পোর্টল্যাণ্ড ফুলদানী ইত্যাদি বহু বিচিত্র দ্রব্যের সমাবেশে মিউজিয়াম পূর্ণ হইয়াছে।

প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ

বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ (Natural History Department) এক বিশেষ চিত্তাকর্ষক বস্তু। রোমান্ স্থাপত্যের আদর্শে এই ভবনটি ১৮৭৩-৮০ সনের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। কতপ্রকারের জন্তু ও কীটপতঙ্গ আছে, তাহাদের গঠন কি প্রকার, অভ্যাস কি, ধাতুগত ও অন্যবিধ পরিবর্ত্তন কিরূপ হইয়া থাকে, এই সব জীবজন্তুর সহিত মানুষদের সম্বন্ধ কি প্রকার, উদ্ভিদ্ ও শেওলা কত রকম হয়, পাখী ও মাছের শ্রেণী বিভাগ ও বিশেষত্ব—ইত্যাদি বিষয় ভাল করিয়া জানিতে হইলে এখানে আসিতে হইবে। রোগের বীজাণু-বাহক পতঙ্গ মশা মাছি ইত্যাদির মূর্ত্তি মোমে বহুগুণ বড় করিয়া তৈরী করা হইয়াছে। এইখানে ২½ লক্ষ বিভিন্ন জাতীয় পতঙ্গের ৩৫ লক্ষ নমুনা সংগ্রহ করিয়া রাখা আছে। অতিকায় হাতী, অতিকায় কুমীর প্রভৃতি যে সব জন্তু এখন লোপ পাইয়াছে সেগুলিরও কঙ্কাল ইত্যাদি খুঁজিয়া এখানে আনিয়া স্থাপন করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার মানব জাতির কঙ্কাল, মাথার খুলি, মডেল ও ফটোগ্রাফ ইত্যাদি এইখানে দেখা যাইবে। উদ্ভিদ্, খনিজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের উপকরণও আছে। ডক্টর জি টি প্রায়র কর্ত্তৃক প্রণীত একটি ছোট গাইড্ পুস্তকে অনেক বিষয় বিশদ্‌ভাবে বুঝান হইয়াছে। আর ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড দ্বারাও অনেক তথ্য লাভ করা যায়। ১৯২৪ সনে দর্শকের সংখ্যা ছিল ৫,২২,০০০, তন্মধ্যে ৮৫,০০০ জন রবিবারে আসিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক মিউজিয়াম

এই মিউজিয়াম ১৯০৯ সন পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামের অংশ বিশেষ ছিল। ১৯২৭ সনে ইহার জন্য নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা শেষ হয়। বিজ্ঞানের ক্রম-বিবর্ত্তন এই স্থানে আসিলে যেরূপ বুঝা যায় আর কোথাও সেরূপ নহে। ষ্টীম ও বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ স্পষ্টরূপে এখানে উপলব্ধি হয়। শব্দ, আলোক ও তাপকে মানুষের অভাব মোচনের ও আনন্দদানের কাজে কিরূপে লাগান হইয়া থাকে তাহা মডেল ইত্যাদির সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। আকাশ-জাহাজ, রেডিও, টেলিগ্রাফ, সকল-প্রকার যন্ত্রপাতি, সমুদ্রবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গৃহ নির্ম্মাণ, অঙ্কন, রসায়ন এবং আরও অনেক বিষয়ের এখানে সমাবেশ হইয়াছে। প্রথম তৈরী বাইসাইকেল, ১৮৩০ সনের মেল গাড়ী (ঘোড়ার), ১৮৩৮ সনের ব্রহাম, সিডান চেয়ার ইত্যাদি দর্শনীয় দ্রব্যে মিউজিয়ামের গৌরব বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিদিন এখানে প্রায় গড়ে ২,০০০ দর্শক আসিয়া থাকে।

ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম

এই মিউজিয়াম সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন যে ইহার নিম্নলিখিত আটটি বিভাগ আছে:—বাস্তুশিল্প ও স্থাপত্য; সেরামিক, গ্লাস ও এনামেল; খোদাই, চিত্রণ ও ডিজাইন; লাইব্রেরী ও পুস্তক প্রণয়ন; ধাতুর কাজ; চিত্রাঙ্কণ; বয়ন শিক্ষা; কাঠের কাজ, আসবাব ও চামড়ার কাজ। সিটি অব্ লণ্ডনের লিভারি কোম্পানী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিকট হইতে ধার লইয়া মাঝে মাঝে নানাদ্রব্যের প্রদর্শনী খোলা হয়।

এই মিউজিয়াম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার বর্ত্তমান বৃহৎ অট্টালিকাটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহা ১৫৫টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্রব্যাদির বিবরণ দিয়া অসংখ্য পুস্তিকা, গাইড্ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামের নিম্নলিখিত সংগ্রহাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত শিপশ্যাঙ্ক চিত্রসমূহ; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া অফিস্ হইতে পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পত্তি প্রাচ্য চিত্রাবলী আনয়ন; ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জোন্‌স প্রদত্ত ফরাসী আসবাব; ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পেটেন্ট মিউজিয়াম যোগ, এবং ডাইস্ ও ফষ্টার প্রদত্ত পুস্তক, ছবি ও ছাপ ইত্যাদি। এই মিউজিয়াম অতঃপর শ্লটারের রিনাই-

সেন্স ও প্রাচ্য চিত্রাবলী দ্বারা বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হয়। যে সকল মূল শিল্পদ্রব্য পাওয়া যায় নাই, সেগুলির নকল এখানে রক্ষিত হইতেছে। বাদ্যযন্ত্রাদি, এলিজাবেথ হইতে ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত পোষাকের পরিবর্তন, স্বর্ণকার ও রৌপ্যকারের কারুকার্য্য, গ্লাস, পোর্সেলিন, মেজোলিকা, কাপড়ের উপর কারুকার্য্য, দরজা, জানালা প্রভৃতি সকল বিষয়ই এখানে দেখা যাইবে। হাতীর দাঁতে অঙ্কিত পঞ্চম শতাব্দীর "খৃষ্টের ৬টি মিরাকল" (অলৌকিক কার্য্য) পঞ্চদশ শতাব্দীর যীশু ও তাঁহার মাতা, হাতীর দাঁতের বাইজ্যান্টাইন প্যানেলের উপর অঙ্কিত শেষ বিচার, ভারতবর্ষ, সিংহল, তিব্বত ও প্রাচ্যের চিত্রাবলী ভারতীয় বিভাগে রহিয়াছে।

ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে আর একটি চিত্তাকর্ষক জিনিষ হইতেছে ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট। ডোমিনিয়ান ও উপনিবেশসমূহ হইতে নানা দ্রষ্টব্য পদার্থ আনিয়া এখানে সাজাইয়া রাখা হয়। ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট্ রোডের পশ্চিম গ্যালারিতে ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম রহিয়াছে। ইহা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ক্রষ্টাল প্রাসাদ হইতে সরাইয়া এখানে আনীত হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নূতন নৌ-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। প্রিন্স কন্‌সর্ট রোডে রয়াল কলেজ অব্ মিউজিকে বহু পুরাতন বাদ্যযন্ত্র রক্ষিত হইতেছে। হার্টফোর্ড হাউসে অবস্থিত ওয়ালেস্ চিত্রাবলীর কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে অস্ত্রশস্ত্র, এনামেল, হাতীর দাঁতের কাজ, দুষ্প্রাপ্য পোর্সেলিন খুব ভাল মেজোলিকা, চমৎকার সোণা ও রূপার কাজ, স্থাপত্য, ঘড়ি, কারুকার্য্যখচিত আসবাব, মেডাল ও বৃটিশ ও ফরাসী রাজকীয় স্মারক দ্রব্যাদি দেখা যাইবে।

ভূতত্ত্বের মিউজিয়াম

জেরমীন ষ্ট্রীট ও পিকাডেলির মধ্যে ব্যবহারিক ভূতত্ত্ব মিউজিয়াম রহিয়াছে। ইহা বাস্তবিক পক্ষে খনিজদ্রব্য ও খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রয়োগ বিষয়ক হইলেও নানাপ্রকার অপূর্ব্ব রত্ন, লণ্ডন ও টেম্‌স্ উপত্যকার অত্যাশ্চর্য্য মডেল ও বৃটেনের বিভিন্ন জন্তু ও উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষও এখানে আছে। ইহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

রয়েল ইউনাইটেড্ সারভিস্ মিউজিয়াম

এই মিউজিয়াম হোয়াইট্ হলে অবস্থিত। এখানে ট্রাফালগার ও ওয়াটারলু যুদ্ধের মডেল ও নূতন ও পুরাতন যুদ্ধ জাহাজের মডেল ব্যতীত বিগত মহাযুদ্ধের অনেক স্মারক দ্রব্য রহিয়াছে। এখানে ড্রেকের নক্সের ডিবা ও বেড়াইবার ছড়ি, ক্রমওয়েলের তরোয়াল, ব্লেকের সিন্ধুক, উলফ, ওয়েলিংটন, নেলসন, নেপোলিয়ান, সার জন মুর, উল্‌সলি, কিচেনার, সার জন ফ্র্যাঙ্কলিন ও ক্যাপ্টেন স্কটের কোন না কোন দ্রব্য এবং রাজ্ঞী এলিজাবেথের পেটিকোটও স্থান পাইয়াছে।

সোন্ ও সার্জন্‌স্ মিউজিয়াম

লিন্‌কন'স ইন্ ফিল্ডসে সোন ও সার্জন্‌স্ নামে দুইটি মিউজিয়াম আছে। সার জন সোন একজন বিখ্যাত স্থপতি ছিলেন। সোন মিউজিয়ামের সংগ্রহাবলী তাঁহারই দান। এই মিউজিয়ামকে প্যারিসের লুভারের এক ছোট সংস্করণরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ব্রঞ্জ, স্থাপত্য, মার্ব্বেল, মূল্যবান্ প্রস্তর, ঘড়ি, ফুলদানী, মডেল ও আসবাব এখানে আছে।

নিকটেই রয়েল কলেজ অব্ সায়েন্‌স্ অবস্থিত। ইহা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেরি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রতিষ্ঠা কালে সংগ্রহের সংখ্যা ছিল ১৬,৫৫২, এক্ষণে ৭০,০০০ উপরে উঠিয়াছে। প্রদর্শনী দুই ভাগে বিভক্ত—শরীরমূলক ও ব্যাধিমূলক। সকল জাতের মানুষের মাথার খুলি আছে ৫,০০০ (ইহার মধ্যে রবার্ট ব্রুস্ ও ইউজিন অ্যারামের খুলিও আছে)। জন্তুরাজ্যের সকল রকম হাড়গোড় ইত্যাদি এখানে রাখা হইয়াছে। জোনাসন ওয়াইল্ড ক্যারোলিনা গ্রাশামি, সিসিলির বামন, আইরিশ মহাকায়, চার্লস বাইরনের কঙ্কালও দেখিতে পাওয়া যাইবে। ৪০০০ বছরের সর্ব্ব পুরাতন 'মমীও' রক্ষিত হইতেছে। আর স্পিরিটের মধ্যে ডুবাইয়া মানবদেহের সকল অংশ রাখা হইয়াছে।

রেকর্ড অফিস মিউজিয়াম

নামেই বুঝা যাইবে যে ইহা স্মরণীয় দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতির স্থান। এখানে মূল্যবান কাচের দ্রব্য, ডোম্‌সডে পুস্তক, লর্ড মন্টিএগল্‌কে লিখিত বেনামী চিঠি (ইহা হইতে gunpowder plot ধরা পড়ে), ওয়েলিংটনের ওয়াটারলু ডেস্‌প্যাচ, নেলসনের পত্রাবলী, রাজকীয় ও সাহিত্যিক ফটোগ্রাফসমূহ, শীল সংগ্রহাবলী ও আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কীয় কাগজ পত্রাদি এখানে আছে। একটি মোকদ্দমার কাগজে সেক্‌সপীয়ারের সহি রহিয়াছে। সামারসেট্‌ হাউসে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উইলের সহিত সেক্‌সপিয়ারের উইলও দেখা যাইবে। ইহা তালাচাবি বন্ধ থাকিলেও একটা নকল সকলে দেখিতে পায়। নেলসনের উইলও এখানে আছে।

গিল্ডহল মিউজিয়াম

গিল্ডহল মিউজিয়ামেও সেক্‌সপীয়ারের স্মারক দ্রব্যাদি রহিয়াছে। কিন্তু রোমান্‌, স্যাক্সন ও মধ্যযুগের লণ্ডনের যে ধ্বংসাবশেষ লণ্ডন ব্রিজ তৈরী করিতে খুঁড়িবার সময় পাওয়া গিয়াছিল তাহাও, নূতন ডাকঘর, রয়েল এক্সচেঞ্জ, মাটির তলার রেলওয়ে প্রভৃতির মডেল এই মিউজিয়ামের বিশেষত্ব। ১৯২৫ সনে এই মিউজিয়ামে সওয়া লক্ষ লোক দর্শক হিসাবে আসিয়াছিল।

গেফ্রাই মিউজিয়াম

শোরডিচের ঠিক মধ্যখানে এই মিউজিয়াম অবস্থিত ও ইহা লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। ইহাতে অনেক প্রকার পুরাতন আসবাব স্থান পাইয়াছে।

অন্যান্য মিউজিয়াম

লণ্ডন মিউজিয়ামের কথা ইতিপূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি মিউজিয়ামের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে:—ব্যাঙ্কার্‌স পরিষদের বাকিংহাম প্যালেস্‌ রোডে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পার্কেস মিউজিয়াম; ডক্‌স্‌ মিউজিয়াম; স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কৃষ্ণ বা অপরাধ সম্বন্ধীয় মিউজিয়াম; কামিং মিউজিয়াম; ইউনিভার্সিটি কলেজের মিশর তত্ত্ববিভাগ; লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের লণ্ডন হইতে ৬৫০০ ছাপ ও ছবির সংগ্রহ; বিভিন্ন হাসপাতালের সংলগ্ন মিউজিয়ামসমূহ ও নানা সভাসমিতির সংগ্রহাবলী।

এই প্রসঙ্গে চেলসীর কার্লাইল ভবন; ডাউটি ষ্ট্রীটে অবস্থিত ডিকেন্স গৃহ; চিস্‌উইকে হোফার্স ভবন; গাউ স্কোয়ারে ডক্টর জনসনের গৃহ, হ্যাম্পষ্টেডে কীট্‌সের গৃহ, কেন্‌সিংটনে লেইটন ভবন, সিটি রোডে ওয়েস্‌লি গৃহ, ফরেষ্ট হিলে জাতিতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক মিউজিয়াম, গ্রান উইচের রাজকীয় নৌ মিউজিয়াম ও উলউইচের আর্টিলারি মিউজিয়াম ইত্যাদির নাম করাও প্রয়োজন।

ঐশ্বর্য্যময় লণ্ডন

মিউজিয়ামের কথা আলোচনায় মনে হইবে যেন লণ্ডন শুধু মিউজিয়ামেই পরিপূর্ণ। একা লণ্ডনেই অসংখ্য মিউজিয়াম রহিয়াছে, গোটা ইংল্যণ্ডের ত কথাই নাই। সব মিউজিয়ামই লোক-বিখ্যাত নহে, তথাপি প্রত্যেকটির দর্শকের সংখ্যা আমাদের কলিকাতার মিউজিয়ামটির চেয়ে ঢের বেশী। ইংরেজরা প্রত্যেক মিউজিয়ামকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কি পরিমাণ অর্থ, পরিশ্রম, যত্ন ও সময় ব্যয় করিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কোন ব্যক্তি বিশেষের অনুপ্রেরণায় ও উৎসাহে হয়ত কোন কোন মিউজিয়াম জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই মিউজিয়ামকে স্থায়ী করিবার জন্য অতঃপর দরকার হইয়াছে সরকারী ও বেসরকারী অজস্র সাহায্য দান। ইংরেজ নরনারী এ বিষয়ে কার্পণ্য করে নাই।

মিউজিয়ামে সংগ্রহকার্য্য ধীরতার সহিত বিচারপূর্ব্বক করিতে হয়। সংগ্রহ-কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নয়। মিউজিয়ামের সহিত সাধারণের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠরূপে স্থাপিত না হইলে মিউজিয়ামের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। লণ্ডনে এই যোগাযোগ অব্যাহত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা বিবরণী

উন্নতিশীল জাতির কর্ম্মপ্রচেষ্টা বহুমুখে ধাবিত হয়। ইংরেজের জীবনবত্তা ইংরেজকে শুধু প্রত্যেক মিউজিয়ামের বৈচিত্র্য সাধনে প্রণোদিত করিয়াছে এমন নয়, ইংরেজকে নূতন নূতন ধরণের মিউজিয়াম সৃষ্টির কল্পনায়ও মাতাইয়াছে। সেইজন্য, মিউজিয়াম সৃষ্টি ইংল্যণ্ডে বা লণ্ডনে আজও শেষ হইয়া যায় নাই। আজও নূতন নূতন মিউজিয়ামের উদ্ভব হইতেছে।

প্রত্যেক মিউজিয়াম চিত্তাকর্ষক করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেকটিকে এক একটি শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া বিবেচনা করিলে ভুল হইবে না। লণ্ডনে আসিয়া ভারতীয় যুবকদের প্রত্যেক মিউজিয়ামের সহিত কিছু পরিচয় ঘটিলেও ইংরেজের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কিছু পরিচয় লাভের সুবিধা হইবে।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের তুলনা চলে না। আমাদের যে ২।১টি মিউজিয়াম আছে, সেগুলিকে আধুনিক করিবার চেষ্টা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া মিউজিয়ামগুলিতে আশানুরূপ দর্শকের সমাগম হয় না। পুস্তিকা, গাইড্ ইত্যাদি প্রচার করিয়া ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা করিয়া মিউজিয়ামগুলিকে সর্ব্বসাধারণের প্রিয় সামগ্রী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা উচিত।

মোসাফের্

পঞ্চপুষ্প

শিল্প-শিক্ষায় মহামান্য নিজামের দান

মহামান্য নিজাম বাহাদুর তাঁহার রাজ্যের কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধান, শিল্পসম্বন্ধীয় পরীক্ষা, গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য একটি শিল্পভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার্থ এক কোটি টাকা দান করিয়াছেন। ব্যবহারিক ও অন্যান্য শিল্পের গবেষণার্থ এবং যুবকদিগের শিল্পশিক্ষার্থ, রাজ্যের মধ্যেই হউক কিম্বা বাহিরেই হউক এই শিল্পভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য করা হইবে।

সিন্ধুদেশে কৃষি

সাকার ব্যারেজ স্কীম অনুসারে সিন্ধুদেশে জল সেচনের দ্বারা কৃষিকার্য্যে যুগান্তর আনয়নের চেষ্টা চলিতেছে এবং তজ্জন্য সক্রন্দ নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সিন্ধুদেশের জমিতে লবণ থাকায় খাল কাটিয়া জল সেচনের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধান পাঞ্জাবের

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করা হয়, এবং সঙ্গে মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তি উপযুক্ত পরিমাণে প্রদত্ত হয়, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ অসুবিধা দূরীভূত করা সম্ভব। এখন বর্ত্তমানে যে কৃষক ২।৩ বৎসরে মাত্র ২বার ফসল পায়, সে কৃষক ৫ বৎসরে ৪বার ফসল পাইবে। কিন্তু যাহাতে জমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ বৃষ্টির জল অপেক্ষা সেচের জলে কৃষি করিলে জমির উর্ব্বরাশক্তি শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য পর্য্যায়ক্রমে ফসল বদলাইতে হইবে। মিশরে যে উপায়ে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করা হয়, সে উপায় অবলম্বিত হইলে সুফল ফলিবার বিশেষ সম্ভাবনা। মিশরে গৃহপালিত পশুর খাদ্য ও অন্যান্য শস্য পর্য্যায়ক্রমে চাষ করা হয়, তাহাতে জমির উর্ব্বরাশক্তি নষ্ট হইতে পারে না; যেহেতু শস্য উৎপাদনে যে শক্তি নষ্ট হয়, পশুর খাদ্যে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগৃহীত হওয়ায়, তাহার পূরণ হয়; অধিকন্তু পশুর মলমূত্রে উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। সিন্ধুদেশেও

চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, তুলার চাষের পক্ষে ভারতের মধ্যে সিন্ধুদেশই সমধিক উপযোগী। মিশরীয় এবং আমেরিকান তুলার চাষ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় সিন্ধুদেশের তুলাকেও উপেক্ষা করা হইবে না; কারণ ঐ তুলার জল-বায়ুর প্রকোপ সহ্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ।

ইংলিশম্যান

কর্পোরেশনের কুলীমজুরদের বায়স্কোপ প্রদর্শন

গত বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের কুলিমজুরদের বায়স্কোপ দেখান হইয়াছিল কিন্তু উহা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই, কারণ কুলীমজুরেরা বিদেশী ছবি তেমন পছন্দ করে নাই। বর্ত্তমান বর্ষে দেশীয়ভাষায় শিরোনামাযুক্ত দেশীয় ছবি ও শিক্ষাবিষয়ক ছবি দেখান হইবে। তজ্জন্য ১০,০০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ঐ জন্য কর্পোরেশন ফিল্ম ভাড়া দেওয়ার ও ছবি দেখাইবার জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করিয়াছেন, ছবির ভাড়ার জন্য ৪২০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইংলিশম্যান

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় টেলিফোন

জ্যাক্ সিক্রিষ্ট নামক মালবাহী জাহাজের নিম্নতন কর্ম্মচারী পা ভাঙ্গিয়া অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুনার্ডার ভ্যালেসিয়া নামক স্থানের হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিল। তাহার জননীর জন্য উচ্চ চীৎকার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে এত বিরক্ত করিয়াছিল যে, তাঁহারা তাহার মাতার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য বেতার টেলিফোনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার মাতা ইংলণ্ডের গচপোর্ট নামক স্থানে বাস করে। মাতাপুত্রে ২০ মিনিট কাল কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ ঐ কথাবার্ত্তার পর রোগী অনেকটা উপশম বোধ করিতেছে।

বরোদায় কৃষি-ঋণ

বরোদার মহারাজা কৃষকদিগকে সুবিধাজনকভাবে ঋণ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যন্ত্রপাতি, বলদ, এঞ্জিন ক্রয় কিম্বা কূপ খননের জন্য সামান্য সুদে কৃষকগণকে টাকা ধার দেওয়া হইবে। প্রথম তিন বৎসর সুদ দিতে হইবে না। তৎপরে সুদ দিতে হইবে, যখন ঐ টাকা খাটাইয়া সে লভ্যাংশ পাইতেছে, তখন। যন্ত্রপাতির জন্য যে টাকা দেওয়া হইবে তাহা তিন বৎসরে, বলদ ক্রয়ের টাকা ছয় বৎসরের মধ্যে এবং কূপ খননের টাকা বার বৎসরে শোধ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থানুযায়ী গ্রাম্য রাজ কর্ম্মচারী কৃষকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কাহার কত জমি, তদুপযোগী বলদ আছে কি না ও কোথায় কূপ খনন সুবিধা-জনক ইত্যাদি নির্ণয় করিবে। এই কার্য্যের জন্য প্রতি বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইবে। যখন ৫ বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকা জমা হইবে, তখন তাহাকে স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া গণনা করা হইবে, এবং ঐ টাকার সুদ ও ঐ বিভাগে জমা হইবে। ওয়াঘোদিয়া তালুকে ইহার পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং লক্ষ টাকার জন্য আবেদন-পত্র পাওয়া গিয়াছে।

ক্যানাডা ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে কাঁটা-তারের বেড়া

মদ্য আমদানি-রপ্তানী বন্ধ করিবার জন্য ক্যানাডা ও যুক্ত রাজ্যের মধ্যে 'liquor wall' নামক কৃত্রিম কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া হইবে। সমগ্র সীমান্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া তিন লাইন কাঁটা তারের বেড়া দিতে ২,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। ক্যানাডার অভিমত গ্রহণ করা হইবে না। যেহেতু ক্যানাডা গবর্ণমেণ্ট মদ্য রপ্তানীকে আইন-বিরুদ্ধ বলিতে স্বীকৃত নহে। বর্ত্তমানে সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত করিবার জন্য ১০০০ জন সৈন্য আছে, তাহাতে বার্ষিক ব্যয় ১,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই বেড়া-গঠন কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষ।

চীন-নৌবাহিনীর শিক্ষায় বৃটিশ

চীন ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি দ্বারা চীন-নৌবাহিনীর কর্ম্মচারী ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিবে এবং চীন-নৌবাহিনীর গঠনের জন্য বৃটিশ এক কমিশন পাঠাইবেন। চীন গবর্ণমেণ্ট

নৌবাহিনী গঠনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ কয়েকখানা যুদ্ধজাহাজও ইংলণ্ডে প্রস্তুত হইবে।

অনাহুত অতিথি

লণ্ডনে নাচে, পার্টিতে অনাহুত অতিথির সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠে যে, তাহাতে কর্ম্মকর্ত্তা অনেক সময় বিরক্তি বোধ করেন। যাহাতে অনাহুত অতিথি নাচঘরে বা পার্টির স্থানে যাইতে না পারে তাহার জন্য সদর ফটকে নিমন্ত্রণ পত্র দেখার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সমস্ত অনাহুত অতিথি, যাঁহারা প্রকৃত নিমন্ত্রিত, তাঁহাদের সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। বিশেষতঃ তাঁহাদের মাথায় টুপি না থাকায় চেনা দুরূহ।

সমুদ্র-তলে মৎস্যের অবস্থান-নির্ণয়কারী যন্ত্র

ল্যান্‌কেশায়ারস্থ ষ্টীমলঞ্চ লাফ্‌রিন্ প্রতিধ্বনি নির্ণয়কারী (echo sounder) নামক নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্র লইয়া মৎস্যান্বেষণে গমন করিয়াছিল। উহা ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার অধ্যক্ষ কাপ্তেন হোমস্ বলেন যে, সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে বহুশত ফিট নিম্নে মৎস্যের ঝাঁক নির্ণয়ে এই যন্ত্রের উপযোগিতা অসাধারণ। এই যন্ত্র ২৪০০ ফিট পর্য্যন্ত গভীরতা নির্ণয়ে সমর্থ। কিন্তু ১৯২ ফিট পর্য্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। অবশ্য ইহাতে ঠিক মৎস্য দেখাইয়া দেয় না বটে, কিন্তু মৎস্যের অবস্থান নির্ণীত হইলে জাল ঠিক ভাবে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে, যাহাতে জাল মাছের ঝাঁকের উপর দিয়া না যায়। বাস্তবিকই এই যন্ত্রের দ্বারা মৎস্য ধরিবার একটা মস্ত অসুবিধা দূরীভূত হইল।

জাপানের জন্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাবলী

গ্রেটব্রিটেনের ২৫০০০ পাউণ্ড দান

বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ধ্বংস হইয়া যায়। বর্ত্তমানে নূতন লাইব্রেরী গঠনোপলক্ষে সার অষ্টেন্ চেম্বারলেন জাপান দূতের করেন। মোট ৬০,০০০ পুস্তক প্রদান করা হয়। ইহার মূল্য ২৫,০০০ পাউণ্ড। এই সংগ্রহাবলীর মধ্যে কতকগুলি সাধারণ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি ক্যাক্সটনের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মুদ্রণকার্য্যের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন। উইলিয়ম মরিস্ কর্ত্তৃক ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কাষ্ঠখোদিত মুদ্রণের সর্ব্বোত্তম নমুনা, সসারের Kelsnscott নামক পুস্তকখানিও এই সঙ্গে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

সার হিল্‌ডারব্র্যাণ্ড হার্মস্‌ওয়ার্থ

অক্সফোর্ডে বৃত্তি

সার হিল্‌ডার ব্র্যাণ্ড হার্মস্‌ওয়ার্থের সমস্ত সম্পত্তির মূল্য ১,৪৪৩,৮৮২ পাউণ্ড। মৃত্যুকালীন উইলে তিনি এই সম্পত্তিকে দশভাগে বিভক্ত করিয়া ৫ ভাগ তাঁহার বিধবা পত্নীকে, ৪ পুত্রকে ৪ ভাগ এবং অবশিষ্ট ১ ভাগ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্টিন কলেজে বৃত্তি প্রদানের জন্য দিয়াছেন। এই বৃত্তি কেবল মাত্র যে সমস্ত বৃটিশ প্রজা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও যাহাদের পিতা ও পিতামহ বৃটিশ প্রজা ছিল, তাহারাই পাইবে। মৃত্যুশুল্ক (death duty) বাবৎ ৪৬৫,০০০ পাউণ্ড গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবে।

আকাশযানে সর্পাঘাতের ঔষধ আনয়ন

কেণ্ট নিবাসী পার্‌সিভেল ওয়াকার যখন ঘাসের উপর বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হাতে সাপে কামড়ায়। অবিলম্বে হাতের কব্জি পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে। ডাক্তার সর্পাঘাত নিবারক ঔষধ (anti-snake-bite serum) প্রয়োগ করিতে বলেন। কিন্তু ঔষধ ইংলণ্ডে না পাওয়ায়, প্যারিশে পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটে তার করা হয় এবং আকাশযানে ঔষধ আসিয়া পড়ে। এখন ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ওয়াকার সুস্থ আছেন। আকাশ-যান না থাকিলে হয়ত ওয়াকারকে ইহজগৎ ত্যাগ করিতে হইত।

লণ্ডনের লোকসংখ্যা

কাউন্সিলের শাসনাধীন স্থানের লোক সংখ্যা প্রায় স্কটলণ্ডের সমান এবং বৃহত্তর লণ্ডনের লোকসংখ্যা প্রায় বেলজিয়ামের সমকক্ষ। নিম্নে উভয় স্থানের লোক সংখ্যার পরিমাণ প্রদত্ত হইল :—

কাউন্টি কাউন্সিল-শাসিত লণ্ডন	স্কটলণ্ড
৪,৫০২,০০০ জন	৪,৮৯৩,০০০ জন
বৃহত্তর লণ্ডন	বেলজিয়াম
৭,৮০৫,৮৭০ জন	৭,৮৭৪,৬০১ জন

ফিল্ম প্রস্তুতকারিগণকে সতর্কীকরণ

বৃটিশ বোর্ড অব্ ফিল্ম সেন্সার্স, তাঁহাদের বিগত বর্ষের রিপোর্টে অপরাধ সম্বন্ধীয় ফিল্মের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। বিগত বর্ষে ৬,৬৭৬,১৭৮ ফিট দীর্ঘ ১৯৪৭ খানা ফিল্ম ইংলণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ৮ খানা ফিল্ম প্রদর্শিত হয় নাই। ৩০৫ খানা ফিল্মে বহু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ—

বাইবেলের চরিত্র লইয়া বিদ্রূপ।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সম্বন্ধে মন্তব্য।

বৃটিশ অধিকৃত দেশসমূহে উচ্ছৃঙ্খল শাসন।

শ্বেতবর্ণ লোকদিগকে পূর্ব্বদেশে অধঃপতিত অবস্থায় প্রদর্শন।

দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর পত্নীগণের সম্বন্ধে মন্তব্য।

বালক ও রমণীগণের মত্তাবস্থা।

অশ্লীল নৃত্য।

শ্বেত ক্রীতদাসের ব্যবসা।

অপরাধীর গল্প অতিরঞ্জিত।

অপরাধের প্রণালী অনুকরণীয়।

নিম্নলিখিত কারণে ৮ খানা ফিল্ম দেখান হয় নাই—

অশ্লীলতা।

অত্যধিক নিষ্ঠুরতা।

শ্লীলতাহীন পোষাক।

গল্পে অপরাধ-জনক ঘটনার বাহুল্য, ইত্যাদি।

অপরাধ বিষয়ক ফিল্মে যাহাতে জনসাধারণের স্বার্থ অব্যাহত থাকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে এবং কোনও ফিল্মই শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিবে না। ইহার ব্যতিক্রম হইলে সে ফিল্ম দেখাইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

জাতীয় সংবাদ

শ্রীপাট সপ্তগ্রামের জন্য সাহায্য-অভিনয়

আগামী ১১ই ভাদ্র, ইং ২৬শে আগষ্ট সোমবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় শান্তি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ কর্তৃক "ঠাকুর-উদ্ধারণ" নামক নাটক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবে। এই অভিনয়-লব্ধ অর্থ শ্রীপাঠ সপ্তগ্রামের উন্নতিকল্পে প্রদান করা হইবে। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

বিধবা বিবাহ

বিগত ১৫ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া নিবাসী ৩২ বৎসর বয়স্ক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দাস মহাশয় ত্রয়োশবর্ষীয়া শ্রীমতী সুবালার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমতী সুবালা পূর্ব্ব বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে বিধবা হইয়াছিলেন।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

আসাম সুবর্ণবণিক্ ছাত্রের কৃতিত্ব

ছাত্রের নাম	কোন পরীক্ষা	বিভাগ
শ্রীসদানন্দ দাস, শিবসাগর	সাব এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন	পাসকোর্স
শ্রীঘনকান্ত দাস, ডিব্রুগড়	বি এস্ সি	কৃতিত্ব সহকারে

শ্রীললিতচন্দ্র দাস, গোলাঘাট　বি এস্ সি　বিশেষ সম্মান ২য় বিভাগ
শ্রীমতী গৌরীপ্রিয়া দাস, ডিব্রুগড় ম্যাট্রিকুলেশন্ প্রথম বিভাগ
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস　"　"

শ্রীশ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সমিতি

শ্রীপাটের ঠাকুর বাড়ীর অলঙ্কার ও তৈজসাদির জায়

অলঙ্কারের জায়

সোনার বিছাহার	৪ ছড়া
" গোটহার	১ ছড়া
" বাঁশী	২ টী
" মুকুট	১ টী
রূপার মুকুট	৩ টী
" তীর ধনুক	২ টী
" বাঁশী	২ টী
" কমণ্ডলু	১ টী
" খড়ম	৩ জোড়া
" নূপুর	৩ জোড়া
" বালা	৬ জোড়া
" খুন্তি	২ খানা
" কোমরের বোর	৩ ছড়া
" বাটী	২ টী

পিতল ও কাঁসারের দ্রব্যাদির জায়

পিতলের হাঁড়ী (বা হাণ্ডা) বড়	১২টী
" গামলা বড়	৪ টী
" ঐ মাঝারী	১ টী
" টব বা বালতি	৩ টী
" থালা বড়	৪ খানা
" ঐ	২ খানা
" ঐ	১ খানা
" জগ্	৬ টী
" ঢালা কলসী	২ টী
" চাদরের ঐ	২ টী
" হাঁড়ী বড়	৫ টী
পিতলের হাঁড়ী ছোট	১ টী
" ঘটী বড়	১ টী
" বাঁটলো	১ টী
" চুমকী ঘটী	৪ টী
" চাদরের ঘটী	৬ টী
" গেলাস	১ টী
" পানের বাটা	১ জোড়া
" রেকাবী ছোট	১ খানা
" বাটী (বড় ১+ছোট ২)	৩ টী
" চামচে	১ খানা
" কমণ্ডলু	১ টী
" গেলাসের ঢাকনা	২টী
" বড় হাতা	১টী
" ঝাড় আরতি প্রদীপ	১টী
" কর্পূর " "	১টী
" কাঁসর	১ খানা
তামার কোসা	১টী
" ভাঙ্গা ঘন্টা	১টী
পাথরের থালা ছোট বড়	৫ খানা
" " বড়	১ খানা
" ঘটী	১টী
এলিউমিনিয়ম জগ	৪টী
" ঘটী	১টী
গ্যালভানাইজ ড্রাম বড় ও ছোট মোট	৬টী
" বাথ টব	১টী
" বালতী বড়	৬টী
" ঐ ছোট	২৪ টী

লোহার দ্রব্যাদির জায়

লোহার কড়া	৪ খানা
" তৈ	৫ খানা
" ছাণ্ডা	১৩ খানা
" হাতা	৭ খানা
" ডাবু	৪ খানা
" খুন্তি	৭ খানা

লোহার বঁটী (ছোট বড়)	১৪ খানা
এ্যাসিটেলিন্ গ্যাস দেওয়াল গিরি	৬ টী
„ ষ্টাণ্ড	৬ টী
হ্যারিক্যান	৫ টী
লাম্প ১৪ লাইট	১ টী
„ ৪০ লাইট্	১ টী
কাষ্ঠের বারকোষ	৪ খানা

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত সহঃ সম্পাদক

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি ও বেঙ্গল কোঅপারেটিভ প্রভিডেন্ট ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা কিরূপে জনসাধারণ সামান্য সুদে টাকা ধার লইয়া কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতে পারে এবং কিরূপে দেশীয় ব্যাঙ্কের মূলধন সুবিধাজনকভাবে খাটান যাইতে পারে ও প্রসার বৃদ্ধি করা যায় তাহার তথ্য-সংগ্রহের জন্য বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় ভারত সরকার কর্তৃক তাহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

বিগত ৪ঠা আগষ্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেডের প্রথম অধিবেশন হয়। সমবায় সমিতির সদস্যগণ ইহার সাহায্যে ৫০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বীমা করিতে পারিবেন। আশা করা যাইতেছে যে, মজুর, কিষাণ, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে সকল লোক প্রিমিয়ামের উচ্চহারের জন্য বীমা করিতে পারে না। তাহারা ইহার সাহায্যে সন্তান-সন্ততির জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারিবে। জাপানে এইরূপ প্রতিষ্ঠান ৮।১০ বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার প্রিমিয়াম আয় এক্ষণে বাৎসরিক ২০ কোটি টাকার উপর হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত সুবর্ণবণিক্ সমাচার সম্পাদক মহোদয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত সংবাদটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আসামের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আসাম বণিক্-সমিতির সদস্য নওগং নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস বি এল্ মহোদয়কে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

এতৎ প্রসঙ্গে বক্তব্য যে, বঙ্গদেশীয় সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ের মুকুটমণি মাননীয় রাজা হৃষীকেশ লাহা বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় আসাম বণিক্-সভার পক্ষ হইতে আমি গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা যেন তিনি আমাদের জাতিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করিয়া দেশমাতৃকার কল্যাণ সাধনের উপযোগী করেন। ইতি

সেনাপতি ভিলা,
লাবান, সিলং
১৭ই আগষ্ট ১৯২৯ সাল

বিনীত
শ্রীসোণাধর দাস
আসাম বণিক্ সভার সভাপতি

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেসে, শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সুবর্ণবণিক সমাচার

১৩শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল | ১১শ সংখ্যা

ধনকুবের রকেফেলার

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

প্রকৃতির খেলা-ঘরে অবিরাম অবিশ্রান্ত যে লীলা-প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে কোন্ মানবের ভাগ্য যে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। আজ যে নিঃস্ব দরিদ্র, হয়ত একমুষ্টি উদরান্নের জন্য লালায়িত, কাল হয়ত প্রকৃতির লীলা-বিলাসে সে ধনৈশ্বর্য্যে জগতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠে, ভাগ্যচক্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনে মানবজীবনের এক অংশ অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়—মনে হয় উভয়ে পৃথক মানব—একের সঙ্গে অন্যের কোন কালে কোন-সম্পর্ক ছিল না! পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, আজ যে সামান্য মেষ-পালক, কাল সে বৃহৎ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্—দিগ্বিজয়ী বীর। কিন্তু এই বৈষম্যের মাঝখানে, প্রকৃতির আপাতপ্রতীয়মান উদ্দাম ধূলিখেলার মধ্যে শৃঙ্খলা বর্ত্তমান; লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে দরিদ্র বালক প্রকৃতির অনুকম্পাবলে পর্ণকুটীর হইতে রাজপ্রাসাদোপম অট্টালিকার অধীশ্বর হইল, তাহার বাল্যজীবন হইতে প্রকৃতি তাহাকে এমন কতকগুলি গুণ বিমণ্ডিত করিয়া তোলে, যাহাতে তাহার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। যদি সে সমস্ত গুণ না থাকিত, তবে সে লোক কিছুতেই জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। সুতরাং আমরা যে মনে করি, লোকটা হঠাৎ বড়-লোক হইল, বাস্তবিক তাহা নহে; লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, প্রকৃতই সে উন্নত হইবার উপযুক্ত; প্রকৃতি অনুপযুক্তের উপর কৃপা বর্ষণ করে না, সুতরাং দরিদ্রের পর্ণকুটিরের শীতল ছায়ায় জন্ম হইলেও রাজ-

প্রাসাদের মহত্ত্ব বীজের অভ্যন্তরে সুপ্ত বৃক্ষের মত সে লোকের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ; অনুকূল অবস্থাবলে সে মহত্ত্বের স্ফূরণ হয় মাত্র—নূতন কিছুই উৎপন্ন হয় না।

জন্ম ও বাল্যজীবন

পৃথিবীর বর্ত্তমান দ্বিতীয় ধনকুবের জন্ ডি রকেফেলার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিউইয়র্ক ষ্টেটের অন্তর্গত রিচফোর্ড নামক কৃষক পল্লীর দরিদ্রতম পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ধরিত্রীর শ্যামল শোভা নিরীক্ষণ করেন। বোধ হয় বর্ত্তমান জগতের কোন ধনশালী ব্যক্তিই রকেফেলারের মত এরূপ দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই—যে গৃহে তিনি ভূমিষ্ঠ হন, তাহা জীর্ণ, তাহার ছাদ শত ছিদ্রপূর্ণ—ভিতরে শয়ন করিয়া অনায়াসে নৈশাকাশে ছায়াপথের তারকামালা নয়নগোচর হইত! দৈনন্দিন জীবনে অভাব এত বেশী ছিল যে, কিরূপে দুইবেলা অন্ন সংস্থান হইবে, তাহাই তাঁহার পিতামাতা ভাবিয়া পাইতেন না। হেন্‌রী ফোর্ড ধনী পরিবারে না হইলেও নেহাৎ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই ; সময়ে সময়ে অর্থের টানাটানি ভোগ করিলেও রকেফেলারের মত দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে পিষ্ট হ'ন নাই। কে জানিত একদিন এই দরিদ্র বালকই পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় ধনকুবের হইয়া দাঁড়াইবে ?

মনে হয়, দারিদ্র্যের মধ্যেও প্রকৃতির একটা বিশেষ শিক্ষা বর্ত্তমান ; যদি রকেফেলার ঐরূপ কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে ভবিষ্যতে তিনি যে অদ্বিতীয় দানবীররূপে জগতে পরিচিত হইয়াছেন, তাহা হইতেন কিনা সন্দেহ। দীনদরিদ্রের জন্য যে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, আর মুক্তহস্তে সেই দরিদ্রের দুঃখ দূরীকরণে সচেষ্ট হন, তাহার মূল উৎস ঐ বাল্যজীবনের দরিদ্রতা। বাস্তবিক ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইলে, রকেফেলার-চরিত্রের ঐ দয়াগুণ, ঐ দানশীলতা বিকাশ লাভ করিত কিনা কে বলিবে? সুতরাং সংসারে কিছুকেই একেবারে মন্দ বলা চলে না—প্রত্যেক জিনিষের ভাল ও মন্দ দুটি দিক্ বর্ত্তমান।

মজুর-বালক রকেফেলার

ক্ষেতের কাজ করিবার মত বড় হইতেই রকেফেলারকে কৃষকের মজুররূপে জীবন আরম্ভ করিতে হয়। আমেরিকার দরিদ্র কৃষক বালকেরা শীতকালে স্কুলে পড়ে এবং গ্রীষ্মকালে মাঠে কাজ করে। রকেফেলার প্রাতে ৪—৩০ মিনিটের সময় ক্ষেতের কাজে লাগিতেন এবং যখন সন্ধ্যার অন্ধকার বিশ্ব-চরাচরের উপর কৃষ্ণাবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া সূর্য্যের মহীয়সী ছবি লুপ্ত করিত, তখন তিনি গৃহে ফিরিতেন। যিনি একদিন কোটি কোটি টাকার মালিকরূপে পরিণত বয়সে জগতের যশোরাশি আহরণ করিবেন, যাঁহার বিপুল কারবারে কত লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইবে, কত চাকর-চাকরাণী যাঁহার হুকুমে পরিচালিত হইবে, নিয়তির কঠোর অনুশাসনে তাঁহাকেই পরের ক্ষেতে মজুরী খাটিয়া ১৫ ঘণ্টা পরিশ্রমের বিনিময়ে মাত্র ২৫ সেণ্ট উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল!

নির্ব্বোধ রকেফেলার

রকেফেলার কিছু ধীর এবং বোকা রকমের ছিলেন ; বাস্তবিক তিনি বোকা ছিলেন না, কিন্তু যে ধীরতা এবং কোন বিষয় বুঝিবার জন্য প্রতীক্ষা তাঁহাকে পরবর্ত্তী জীবনে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে তুলিয়াছিল, তাহাই তাঁহার প্রথম-জীবনে দোষরূপে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিবেশী কৃষকেরা যদিও রকেফেলার পরিবারের দারিদ্র্যে সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিল, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে বালক 'জেনী' ধীর এবং নির্ব্বোধ, তখন তাহারা এই পরিবারের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ হইল—কিন্তু প্রতিবেশীরা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই যে, তাহাদের হতাশাকে হতাশ করিয়া এই নির্ব্বোধ বালকের প্রতিভার জ্যোতিঃ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে—ব্যবসাবুদ্ধির প্রভাবে এই নির্ব্বোধ বালক রিচ্‌ফোর্ড পল্লীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

তিনি কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ কাজ ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, ইহাতে তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা বিরক্ত হইত, কিন্তু রকেফেলার বলিয়াছেন—

"In this way, I was able to study the best way of doing it." অর্থাৎ এই উপায়ে তিনি কার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রকৃষ্ট উপায় খুঁজিয়া লইতেন, কিন্তু—

"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে ক্ষুর-ধার।" কৃষকেরা তাঁহার এ উৎকৃষ্ট কর্ম্মপ্রণালীর মর্য্যাদা বুঝিত না; তাহারা তাঁহাকে অলস বলিয়া তিরস্কার করিত! যিনি পরবর্ত্তী জীবনে ত্রিশবৎসর ক্রমাগত একদিনও বিশ্রাম না করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন, যাঁহার পরিশ্রম-ক্ষমতা দেখিয়া অন্যান্য সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকেই জীবনের প্রারম্ভে 'অলস' অপবাদ মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে। কর্ম্মভোগ বটে! সুতরাং অন্যান্য বালকেরা অল্প সময়ে বেশী কাজ করিত বলিয়া, তাহাদের কাজ রকেফেলারের কাজের মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও তাহারাই কার্য্যদক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল!

বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা

রকেফেলার বাল্যকাল হইতে কাজ ভাল বাসিতেন, কিন্তু মাঠের কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না, নীরবে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া তিনি কাজ করিয়া যাইতেন। পরবর্ত্তী-কালে যখন মা লক্ষ্মীর অনুকম্পায় ভাদ্রের ভরানদীর মত তাঁহার গৃহ ঐশ্বর্য্য-সম্পদে ভরিয়া উঠিতে লাগিল, তখন তিনি বাল্যজীবনের মাঠের কাজের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়ছিলেন—"It taught me patience." অর্থাৎ ঐ গ্রীষ্মকালীন মাঠের কাজে আমি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছিলাম।

বাসস্থান পরিবর্ত্তন ও নূতন কাজ

কিছুদিন পরে তাঁহার পিতামাতা রিচফোর্ড ত্যাগ করিয়া ক্লীভল্যাণ্ডে উঠিয়া যান, এই স্থানে আসিয়া তিনি পিতামাতাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছায় কোন কাজের সন্ধান করিতে লাগিলেন, অনেক চেষ্টার পর Hewitt & Tuttle কোম্পানীর অফিসে বেহারার কাজ গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বেতন হইল সপ্তাহে দুই হইতে তিন ডলার।

এই বেহারার কাজে তাহার মজুরের অপেক্ষা আয় বেশী হইল এবং নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণের গভীর স্তরে সুপ্ত ছিল, তাহা ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতে লাগিল, ব্যবসাকার্য্যের ধারা কিরূপ-ভাবে চলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন এবং লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে তাঁহার মানসযবনিকার উপর কল্পনার আলোক-সম্পাতে ভবিষ্যৎজীবনের রঙ্গিন ছবি ফুটিয়া উঠিল যে, জগতের বুকে তাঁহাকে আসন প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, তখন তিনি চারিদিকে নজর রাখিতে লাগিলেন, যাহাতে এমন কোন কিছুর মতলব তিনি পান, যাহা তাঁহাকে সৌভাগ্যের স্বর্ণভূমিতে পৌঁছাইয়া দিবে।

জীবনের বিশেষ শিক্ষা

এই সময়, ভবিষ্য জীবনের যে বিপুল সৌভাগ্য তাঁহার জন্য বাসরশয্যা রচনা করিয়া মানসী বালিকার মত অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহার জন্য নিজকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম শিক্ষা—সঞ্চয় এবং ব্যয় করিতে শিক্ষা করা। রকেফেলারের মত যে, খুব কম লোকই সঞ্চয় আর ব্যয়ের কৌশল অবগত। এই সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত তুলিয়া দিলাম :—

"Every young man should take care of his money. It is a religious duty, I think, for one to get all the money he can, to keep all he can, and to give away all he can." অর্থাৎ প্রত্যেক যুবকেরই স্বীয় অর্থ সম্বন্ধে যত্নশীল হওয়া দরকার। প্রত্যেক লোকের পক্ষে যথাসাধ্য উপার্জ্জন, যথাসাধ্য সঞ্চয় এবং যথাসাধ্য দান ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উত্থিত হইয়াও রকেফেলার তাঁহার প্রথম জীবনের হিসাবের খাতাখানি নষ্ট করেন নাই—পরন্তু সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক সেণ্টের আয়-ব্যয় লিখিত রহিয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি ৫০ ডলার উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে তিনি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ফণ্ডে প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু কিছু দান করিতেন

এবং অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যেও যৎসামান্য দান করিতেন এবং কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে এই দান করার অভ্যাস ছিল বলিয়াই তিনি পরবর্ত্তী জীবনে দানবীররূপে পৃথিবীর সকলকে দানে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এক বৎসর পরে তাঁহার বেতন মাসিক ২৫ ডলার হয়। এই অবস্থায় তিনি ১০ সেণ্ট বিদেশীয় মিসনারী সোসাইটিতে এবং নিউইয়র্কের একটা মিসনে ১২ সেণ্ট করিয়া দিতেন। ইহাতে এই প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিবার জন্য বড়লোক হইবার দরকার নাই। সামান্য দরিদ্রও ইচ্ছা থাকিলে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সক্ষম, হিন্দুশাস্ত্রেও আছে আয়ের ষষ্ঠাংশ দান করা গৃহস্থের ধর্ম্ম।

উন্নতির পথে

অতঃপর রকেফেলার Williams নামক নল ব্যবসায়ীর কারখানায় বুককিপাররূপে বার্ষিক ১০০০ ডলার বেতনে নিযুক্ত হন। এই হাজার ডলার বেতন পরবর্ত্তী জীবনের পক্ষে তুচ্ছ হইলেও সামান্য কৃষক-মজুরের পক্ষে উন্নতি সন্দেহ নাই। এই খানে তাঁহার সদ্‌গুণসমূহের প্রকৃত আদর আরম্ভ হয়। তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা কর্ত্তৃক তিনি ধীর, অধ্যয়নশীল, শান্ত, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বাস্তবিক পক্ষে নিয়োগকর্ত্তা তাঁহাকে আদর্শ কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য করিতেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে রকেফেলারের পরবর্ত্তী জীবনে রুদ্ধ সৌভাগ্যের দ্বার মুক্ত হইয়া যায় এবং এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে কর্ম্মঠতা সংযুক্ত হইয়া হেন্‌রীফোর্ডের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার কণ্ঠে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ক্রোড়পতির বিজয়মাল্য দুলাইয়া দিয়াছিল।

প্রতিভার বিশেষত্ব

সাধারণ লোকও প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে বাহ্যিক আকারগত কোন পার্থক্য নাই সত্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে মানসিক পার্থক্য বহুলপরিমাণে বিদ্যমান্। যে জিনিষ হয়ত সাধারণ লোক আমলের মধ্যেই আনিবে না, প্রতিভা সেখানে সত্যের নূতন আলোক-রেখা পরিস্ফুট দেখিতে পাইবে, কাজেই প্রতিভা যেখানেই জন্মাক না কেন, সে নিজে নিজের পথ করিয়া লইবে। শোনা যায় মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়ার লণ্ডনের রাস্তায় পথ চলিবার সময় সাধারণ লোকের কথাবার্ত্তা হইতেই নাটকীয় উপাদান সংগ্রহ করিবেন। যে লজ্জাবতীলতা আমরা পল্লীগ্রামে পদদলিত করিয়া পথ চলি, তাহাই আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব্ব আবিষ্কারের মূল উপাদান। সুতরাং অলোক-সামান্য প্রতিভাশালী রকেফেলার এই সময় আমেরিকার তৈলের খনি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান লইতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই তৈলের খনির মালিক একদিন কোটিপতি হইবে এবং ভবিষ্যতে এই তৈল কোটি কোটি লোকের জীবনযাত্রার ধারা অন্যভাবে গঠিত করিবে—এমন একদিন আসিবে যেদিন এই তৈল না হইলে গৃহস্থ-কুটিরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিবে না। এই জন্য তিনি এই তৈল-খনির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

তৈলের সন্ধানে

রকেফেলার তৈল সম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তক নিভৃতে নীরবে অধ্যয়ন করিয়া তৈল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। কি প্রকারে তৈলের অবস্থান নির্ণয় করিতে হয়, কি প্রকারে তৈল উত্তোলন করিয়া জাহাজে চালান দিয়া দুনিয়ার বাজারে উপস্থাপিত করিতে হয়, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করেন। তৈলের কলের দাম কত এবং কিরূপে উহা চালাইতে হয়, এই সমস্ত বিবরণও তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই সমস্ত সংবাদ নখাগ্রে লইয়া তিনি একদিন তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা উইলিয়ম্‌সের নিকট উপস্থিত হইয়া অংশীদার রূপে এই তৈলের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন এবং ভবিষ্য ঐশ্বর্য্যের গৌরবময় চিত্র মনিবের মানস-ফলকে প্রতিবিম্বিত করিতে সমর্থ হন। এই ব্যবসায়ে খাটিবে মূলধনস্বরূপ রকেফেলারের মস্তিষ্ক এবং উইলিয়ম্‌সের টাকা। উইলিয়মস্ স্বীকৃত হওয়ায় রকেফেলারের ভবিষ্য উন্নতির পথ মুক্ত হইয়া যায়।

কর্ম্মক্ষেত্রে

তখন পেট্রোলিয়াম শিল্প তরুণ অবস্থায় অবস্থিত ছিল এবং প্রতিযোগিতা অত্যন্ত অধিক ছিল। গোপনে অনুসন্ধান করিয়া তৈলের খনি বাহির করিতে হইত, নতুবা একবার জানাজানি হইলে আর সে জমি সহজে পাওয়া যাইত না। সুতরাং রকেফেলার গোপনে খুঁড়িয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে নিকটবর্ত্তী কোন জেলায় তৈল আছে এবং কোন জেলায় নাই। তাঁহার মনে হইল অংশীদার উইলিয়ম্‌স্ তৈলের হ্রদের উপর বাস করিতেছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার বাসগৃহের অভ্যন্তরস্থ স্থান খনন করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যখন নিকটবর্ত্তী সব স্থানে তৈল পাওয়া গেল, তখন তাহার অংশীদারের গৃহেই বা পাওয়া যাইবে না কেন? এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গৃহভিত্তিতে অয়েল-ড্রিল চালাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতে এত বেগে তৈল বাহির হইল যে গৃহভিত্তি প্লাবিত করিয়া তৈল-প্রবাহ গৃহের আসবাবপত্র সব নষ্ট করিয়া ফেলিল এবং বাসগৃহ সম্পূর্ণরূপে বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল।

রকেফেলার এই আবিষ্কারে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু উইলিয়ম্‌স্ ও তাঁহার পরিবারবর্গ তত উৎসাহী ছিলেন না, তাঁহার এই উৎসাহী অংশীদার তাঁহার বাসগৃহ নষ্ট করিয়াছে—এই নৈরাশ্যের ছায়া ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্য্যের ছটাও দূর করিতে পারিল না। বিশেষতঃ নিজের ঘরে তৈল উদ্ভব যেন উইলিয়মসের মনে একটা খট্‌কা লাগাইয়া দিল। তিনি রকেফেলারকে একা এই তৈলরাজ্যে ভাগ্যান্বেষী তরুণ নেপোলিয়ানরূপে রাখিয়া সিকাগো যাত্রা করেন এবং রাস্তার নল প্রস্তুতে মনোনিবেশ করেন। কাজেই অংশীদার সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায় রকেফেলার একাই তৈল রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে বৃত হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উইলিয়াম্‌স্‌ই রকেফেলারের ভাগ্যোন্নতির মূল।

ইতিমধ্যে ওহিও এবং অন্যান্য স্থানে তৈলের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল ট্রাষ্ট গঠন করিয়া তৈল-জগতের অদ্বিতীয় অধিকারিরূপে সমস্ত পৃথিবীতে পরিচিত হন।

রকেফেলারের কর্ম্মনৈপুণ্য

যে বালক একদিন অলস এবং অকর্ম্মণ্যরূপে রিচ-ফোর্ডের কৃষক-সমাজে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই বালক পরবর্ত্তী জীবনে দৈনিক দশ ঘণ্টা করিয়া ক্রমাগতঃ ৩০ বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিল। এমন কি ১০ বৎসরের মধ্যে একবারও রকেফেলার তিন দিনের জন্যও বিশ্রাম লাভ করেন নাই। মাত্র জীবনের মধ্যে তিনি তিনবার আমেরিকার বাহিরে গিয়াছেন এবং তাহাও কার্য্যোপলক্ষে। এই বিশ্রামহীন কর্ম্মপ্রবাহ রকেফেলারের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। এরূপ পরিশ্রম খুব কম লোকে করিতে পারে, অবশ্য হেন্‌রী ফোর্ডও এইরূপ পরিশ্রম বলে জগতের প্রথম ধনীরূপে পরিচিত।

মানুষ কোন লোককে হঠাৎ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে দেখিলে মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করে—এ স্বাভাবিক, অনেক সময় তাহারা মনে করে লোকটা ভাগ্যবলে বড় হইয়াছে; কিন্তু তাহারা দেখে না যে, ভাগ্যবল অর্থে কতখানি পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অন্তর্নিহিত।

রকেফেলারের বিশ্রাম

যেবার তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্য অতিক্রম করিয়া আলাস্কা ভ্রমণে অতিবাহিত করেন, সেইবারই মাত্র ৫ সপ্তাহ প্রকৃত বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন বলা চলে। এই ভ্রমণ ঠিক ৩০ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এই ভ্রমণে তদানীন্তন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ধনী (তখনও হেন্‌রী ফোর্ড তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই) অতি সামান্য দরিদ্রের সঙ্গেও আলাপ করিতেন; এই সময় তাঁহার অতীত মজুর-জীবনের কথা স্মৃতি-ফলকে প্রতিফলিত হইত, আর তিনি যাহাদিগকে সাহায্যের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ভ্রমণকারী পথে যে যে কাজ করে, তিনিও তাহাই

করিয়াছিলেন। **বিশেষতঃ রকী পর্ব্বতের** তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গে আরোহণ **করেন। এই ভ্রমণে তিনি** গাড়ীতে, রেলে ও নৌকায় ১০ হাজার **মাইল পথ** অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঠিক ৫ সপ্তাহ পরে **কার্য্যক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া** ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর **বিশাল কারবারের কর্ম্মচারিগণের** মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা **অধিক পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন।**

আয়ের পরিমাণ

যে কৃষকবালক **১৫ ঘন্টা পরিশ্রম** করিয়া দৈনিক ২৫ সেণ্ট উপার্জ্জন **করিত, বর্ত্তমানে সেই** পরিবারের আয় প্রতি সেকেণ্ডে **৫ শিলিং, তাঁহার** সমস্ত সম্পত্তির পরিমাণ ২৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড, আর তিনি এক জীবনে ইহা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

যদি **বুক্‌কিপার রূপে কার্য্যকালে** তিনি তৈলের বিষয়ে গবেষণা **না করিতেন,** তবে আজ জগতে তাঁহার **অতুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনী কীর্ত্তিত হইত** না।

দানবীর রকেফেলার

পৃথিবীতে **রকেফেলারের মত দাতা কেহই নাই।** এত অধিক অর্থ **কেহই দান করে নাই। কলেজ, স্কুল,** ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, **বিশ্ববিদ্যালয়,** এমন কি যে কোন জনহিতকর **প্রতিষ্ঠান রকেফেলারের প্রদত্ত** অর্থে পরিপুষ্ট হইয়াছে। **সামান্য অফিসের বেহারারূপে** কাজ করিবার সময় যে দানের **স্বভাব গঠিত হইয়াছিল, তাহাই** পরবর্ত্তী জীবনে **শাখাপল্লব-বাহু বিস্তার করিয়া কোটি কোটি** লোকের **দুঃখ-দৈন্য দূরীকরণ মানসে ১৫০,০০০,০০০** পাউণ্ড দান করিতে **বাধ্য করিয়াছে। দরিদ্র** পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন **বলিয়াই, তিনি দরিদ্রের** দুঃখ বুঝিতেন।

দার্শনিক রকেফেলার

৯০ বৎসর বয়সে **রকেফেলার** ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া **নিউইয়র্কের পল্লী-অঞ্চলে** গ্রাম্য বাসগৃহে নিভৃত জীবন যাপন করিতেছেন। ৯০ বৎসর বয়সে তিনি এখন প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যে ডুবিয়া থাকিতে চাহেন। প্রান্তরের বিশালতা, বনভূমির শ্যামল সৌন্দর্য্য, নদীর কলোচ্ছ্বাস আজ তাঁহার প্রাণে অনন্তের শ্রান্তিহীন ভাবধারা প্রবাহিত করে। এই পরিণত বয়সে তিনি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে উপাদেয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা খুব কম লোকেই লিখিতে পারে।

ব্যবসা-বিষয়ে রকেফেলারের উপদেশ

তিনি দান ব্যতীত যাহাতে যুবকগণ সংসার-পথে উন্নতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য সচেষ্ট। অন্যান্য ব্যবসাদারগণ, নবীন ব্যবসায়ীকে টাকা ধার করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু রকেফেলার বলেন—"Get the confidence and trust of those people who have money and borrow." অর্থাৎ ধনীলোকের বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া টাকা ধার কর। তিনি বলেন, হাতে টাকা লইয়া লোক কোটিপতি হইবে কি রাস্তার ভিখারী হইবে, তাহা লোকের মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে,—টাকার উপর নহে।

আবার অনেকে বলেন, বেশী মূলধন না হইলে ব্যবসা চলে না, এ সম্বন্ধেও রকেফেলার তাঁহাদিগের সঙ্গে একমত নহেন, তিনি বলেন সামান্য ১০০ পাউণ্ড মূলধনে ও মস্তিষ্কের সহায়তায় যে কোন বড় ব্যবসা পত্তন করা যাইতে পারে, এবং যে কোন বুদ্ধিশালী লোকের পক্ষে ১০০ পাউণ্ড জমান বিশেষ কঠিন নহে। আর যখন জীবন সিদ্ধির অলোক-সামান্যরূপালোকে হাসিয়া উঠিবে, তখন হৃদয়ে আনন্দের অপূর্ব্ব ধারা প্রবাহিত হইবে। কারণ তখন মনে হইবে—নিজের সঞ্চিত অর্থে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

রকেফেলারের বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রধান শিক্ষা উদ্যমেই কার্য্যসিদ্ধি। তাহা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ভাষায় বলি,—

"বেগবান্ নদে কেবা রোধে ?
কে বারে উদ্যমশীল পুরুষের গতি ?"

সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরালে

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু

একাদিক্রমে বহু বৎসর পর্যবেক্ষণের পর অধ্যাপক উড্রুফ্ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এক কোষাণু সমন্বিত-জীবের প্রাণপঙ্ক (protoplasm) অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে থাকৃতে পেলে যৌন-সংযোগ ব্যতিরেকেও অনন্তকাল ধরে' বংশধর সৃষ্টি করে' যেতে পারে। অর্থাৎ এই সকল নিম্নতম শ্রেণীর নূতন নূতন জীবাণু-সৃষ্টির মূলে স্ত্রীপুরুষ-ভাবাপন্ন দুটি জীবের পরিসংযোগের আদৌ দরকার করে না। আপনারা যে উপনিষদে পেয়েছেন—"স ইমেবাত্মানং দ্বেধাপয়েৎ..." ('আপনার দেহ ধাতা কৈল দুইখান'—কবিকঙ্কণ) সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ঠাকুর আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করলেন; তারপর বহু লক্ষ বৎসর পরে ক্রমবিকাশসূত্রে একভাগ হ'ল পতি আর একভাগ পত্নী। এই কথাটুকুর একটু বৈজ্ঞানিক গোছের ভাষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ব্রহ্মা ঠাকুর জীব লীলা-পদ্মকে বিকশিত করবার জন্যে সৃষ্টি-ঊষায় আপনাকে বেবাক্ বানিয়ে ফেল্লেন—একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মজ কীটাণু। তারপর দুর্দম্য বংশ-বিস্তারের প্রেরণায় উপায়ান্তর না পেয়ে নিজেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে এক একটি স্বতন্ত্র নূতন জীবনের সূত্রপাত করে দিলেন। ওই যে পদ্য-পাঠ না কিসে ছেলেবেলায় পড়া গিয়েছিল—"বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে!" শুধু মানুষের বেলায় এই উপদেশটি কায়েম করা হয় নি; স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা তাঁর বৈচিত্র্যময় অপ্রমেয় জীবন-ধারার মধ্যে এই সত্যটিকে মূর্ত করে তুলেছেন।

মা ষষ্ঠীর অত্যধিক করুণাভিষিক্ত প্যারামেসিয়াম্ কীটাণুর কথা গত প্রবন্ধে আপনারা জানতে পেরেছেন। এরা জীবনে বিতৃষ্ণ হলেই বাণপ্রস্থ অবলম্বন করার পরিবর্তে কোষাণুকেন্দ্রকে (nucleus) সুসংস্কৃত করে নেয় এবং আপন সত্বাকে দ্বিখণ্ডিত করে' করে' শেষে সকরুণভাবে গাইতে থাকে—'আমি হারায়ে ফেলেছি আমারে... !"

সৃষ্টি-সৌধের প্রথম কয়টি সোপানে যে যৌন সম্মেলনের আদৌ প্রয়োজন নেই, তা' বহু সংখ্যক নিম্নতম প্রাণীর জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করে' জানা গিয়াছে। কীট-জগতে এসে প্ল্যানারিয়া নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্র চ্যাপ্টা আকারের কীটের জীবন-ধারা লক্ষ্য করে' দেখুন। প্রফেসর চাইল্ড এদের ঘর-সংসারের সঙ্গে অনেকদিন ধ'রে মিতালি পাতিয়ে নানা চমৎকার তথ্য টেনে বার করেছেন। প্ল্যানারিয়াদের জীবনী-শক্তির ঐশ্বর্য বেশীর ভাগ আছে মাথার দিকে, কমের ভাগ আছে ল্যাজের দিকে। একটি প্ল্যানারিয়া পোকাকে ধরে' তিন ভাগে কাটুন। কয়েকদিন বাদে দেখা যাবে—মাথার অংশটি বৃদ্ধি পেয়ে নূতন ল্যাজ তৈরী হয়েছে; ল্যাজের দিক্‌টি বৃদ্ধি পেয়ে একটি নব মুণ্ড সৃষ্টি করে' নিয়েছে; মধ্যাংশটীর যে দিকে মুণ্ড ছিল—সেই দিকে মুণ্ড, যেদিকে ল্যাজ ছিল—সেদিকে আবার তোফা ল্যাজ গজিয়ে উঠেছে। প্রফেসর চাইল্ড কিন্তু এই কর্তিত মধ্য-দেহখণ্ডকে একটু নূতন অবস্থার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, যেদিকটা ল্যাজ ছিল—সেই দিক্‌টা মুণ্ড, আর যে দিক্‌টা মুণ্ড ছিল—সেই দিক্‌টা ল্যাজ জন্মিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি, ফল একই দাঁড়িয়েছে। একটা পুরাণো কীটকে তিন টুকরো করে' তিনটি তাজা বাচ্চাকে সৃষ্টি করা যায়,—আশ্চর্য নয়? টিক্‌টিকির ল্যাজ কেটে দিলে আবার গজায় বটে, কিন্তু মাথা কেটে দিলে প্ল্যানারিয়ার মতো আর নূতন মাথা তৈরী হয় না।

প্ল্যানেরিয়াকে কৃত্রিম উপায়ে ত্রিখণ্ডিত না করে' দিলেও এরা প্রতি বৎসর শীতের প্রারম্ভে বার্ধক্যভারগ্রস্ত আপন আপন দেহকে স্বাভাবিকভাবে ত্রিখণ্ডিত করে' ফেলে। সারা শীতকাল এই তিনটি খণ্ড নির্জীব জড় অবস্থায় পড়ে' থাকে; তারপর বসন্তাগমে রিক্ত তরুলতায় যেমন করে' নব পত্র-পুষ্প-কিসলয়ের উদ্গম হয়, তেমনি করে' খণ্ডিতাঙ্গ প্লানেরিয়া থেকে নবীন জীব-শিশুর

প্রাণচাঞ্চল্য অভিব্যক্ত হয়ে' উঠে। প্ল্যানেরিয়া পোকাদের মধ্যে লিঙ্গ-বৈশিষ্ট নেই, যৌন সম্মিলনের প্রেরণা নেই, অথচ তারা প্রত্যেকে আপনার মধ্যে অমরত্বের বীজ বহন করে' চলেছে।

কৃত্রিম উপায়ে নিম্নতন কীট-পতঙ্গ, জলচর, উভচর ও খেচর শ্রেণীর অনেক প্রাণীর ডিম্বকে ফুটানো সম্ভবপর হয়েছে। আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছি যে, কোনো কোনো ক্ষুদ্র প্রাণীরাজ্যে স্ত্রীরা অণ্ডাণু নিঃসৃত করার পর পুরুষরা তার উপর এসে শুক্র নিষেক করে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যৌন সংযোগ ব্যতিরেকেই এদের গর্ভাধান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানের কারচুপিতে জননীর সাহায্য না নিয়ে শুধু ওদের ডিমগুলি ফুটানোই সাধ্যায়ত্ত হয় নি, অণ্ডাণু-গুলিকে পুরুষের শুক্র-নিষেকের মুখাপেক্ষী না করে' অন্য জিনিষের প্রভাবে শাবকোৎপাদনোযোগী করা যায়। প্রকৃতি-বৈজ্ঞানিক লোয়েব সাহেব একটা মাথার কাঁটা ফুটিয়ে ব্যাঙের ডিমকে নিষিক্ত করে' তুলেছেন। অধ্যাপক ডিলেজ ইতিপূর্বেই পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, সামুদ্রিক তারা-মাছ প্রভৃতির অণ্ডাণুগুলিকে পিতৃ-বীর্যের সহযোগ না নিয়েও অঙ্কুরিত করা চলে। স্ত্রী-মৎস্য-নিঃসৃত ডিম্বাণু-গুলিকে নানারূপ রসবৈজ্ঞানিক সামগ্রী দিয়ে নিষিক্ত করা যায়। শুধু তাই নয়, দরকার হয় তো জীবাঙ্কুরে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য স্পৃষ্ট করে' শাবকের গঠন-ধারা, জীবন বিকাশের ইতর বিশেষ করাও যেতে পারে। ডিলেজ সাহেব য়্যামোনিয়া আর ট্যানিন্‌ দিয়ে তারা মাছের ডিম্‌ অঙ্কুরিত করে' দিয়েছিলেন্‌; তদুপরি তার পঞ্চ কোণাকার দেহকে পরিবর্তিত করে' ষড়কোণাকৃতি করে' ছেড়েছেন্‌।

তারপর আরো আশ্চর্যের কথা আছে! সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জানোয়ারদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এক জাতি ও এক শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের মিলন সংঘটন হলে' তবে সম জাতীয় ও সম শ্রেণীর শাবক বা ডিম্ব উৎপন্ন হবে। কিন্তু এক গণ বা গোত্রান্তর্গত না হয়ে' যদি স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর নিকটতম বিভিন্ন গণ বা গোত্রীয় হয়, তাহলে' শঙ্কর শাবক উৎপন্ন হওয়ায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যেমন গাধা ও ঘোড়ার সম্মিলন-ফলে শঙ্কর 'খচ্চরের' উৎপত্তি; ষণ্ড ও মহিষীর যৌন সংযোগেও বর্ণশঙ্কর উৎপন্ন করা যায়। খচ্চর অনুর্ব্বর—ওদের স্ত্রী-পুরুষ সংযুক্ত হয়ে' নূতন খচ্চর উৎপাদন কর্তে পারে না, অথচ ষণ্ড-মহিষীর বর্ণশঙ্কর যারা—তারা স্ত্রী-পুরুষে মিলে সম গোত্রীয় জীবের জন্মদান কর্তে পারে। মার্শাল সাহেবের 'ফিজিওলজি অভ্‌ রিপ্রোডাক্সান্‌' নামক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, কতকগুলি নিম্নতন মেরুদণ্ডী ও বহুতর অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে অসংখ্য ক্ষেত্রে এক জাতি বা শ্রেণীর বীর্য দ্বারা অপর জাতি বা শ্রেণীর অণ্ডাণুকে নিষিক্ত করে' সফলকাম হওয়া গেছে।

বিশ্ব-প্রকৃতির খেয়াল্‌ বা মানুষের প্রজ্ঞা-শক্তির বলে শুধু উদ্ভিদ বিশেষের নয়—প্রাণী বিশেষেরও যে স্বজাতি-সুলভ আকৃতিগত বৈশিষ্ট ও জন্মজন্মার্জিত গুণাবলীর নিয়ন্ত্রণ—এমন কি বিপর্যয় সাধন করা যায়, তার প্রমাণ আমরা ভূরি ভূরি পাই। একবার একটা ঝুঁটিদার বন-কপোতী ক্রমান্বয়ে এগারোটা ডিম্‌ পেড়ে তারপর হঠাৎ একদিন কপোতের মতো আচার-ব্যবহার সুরু করে' ছিল। তার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করে' দেখা গেল যে, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে' বেচারীর ডিম্ব-কোষ দুটি (ovaries) নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তৎপরিবর্তে পুরুষোচিত যৌন-গ্রন্থিসমূহ গজিয়ে উঠেছে।

নানা কারণে জীবের জাতিসুলভ আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘট্‌তে পারে; তন্মধ্যে দু'টী প্রধান কারণ হ'ল—(ক) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও (খ) খাদ্য। গাছের পাখী আর খাঁচার পাখী, বনের বাঘ আর সার্কাসের বাঘের মধ্যে এক পুরুষেই আকৃতিগত পার্থক্য বেশী কিছু না হলেও প্রকৃতিগত পার্থক্য যে রীতিমত স্পষ্ট হয়—একথা অস্বীকার করবার স্পৃহা বোধ হয় কারো হবে না। যে বিড়াল দুধের বাটি ধোওয়া জল আর মাছের কাঁটা খেয়ে গৃহস্থের কোলের কাছে এসে সকৃতজ্ঞ আনন্দে লুটিয়ে পড়ে, সেই বিড়াল যে বনের আওতায় কিছু দিন থেকেই বনবিড়াল হয়ে' গৃহস্থকে সন্ত্রস্ত করতে কসুর করে না—এতো জানা কথা!

এইবার আহার্যের তারতম্যে কি হয় দেখা যাক্‌। কতকগুলো ব্যাঙাচিকে 'থাইমাস্‌' নামক গ্রন্থির নির্য্যাস্‌ খাইয়ে দেখ্‌তে পাওয়া গেল—সেগুলো বেশ বড় বড় ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাদের ল্যাজও খস্‌লো না—

ব্যাঙের মত আকারও হ'ল না। 'য়্যাড্রেনাল্' নামক গ্রন্থির নির্য্যাস অন্ত কতকগুলিকে কিছু দিন খাইয়ে দেখা গেল, তারা দ্রুত ব্যাঙের মত আকার লাভ করেছে বটে, কিন্তু চর্মের মেটে রঙ বদ্‌লে গিয়ে খাঁটি বিলাতী গৌর বর্ণ ধারণ করেছে। কতকগুলো মৌমাছির ডিম সংগ্রহ করে' আনা হ'ল। কিছু দিন পরে যখন সেগুলো থেকে মূক কীট ও শূক কীট (larvæ) বা'র হ'ল, তখন কতকগুলোকে কেবল 'রয়েল্ জেলী' খাওয়ানো হ'তে লাগ্‌ল; কিছু দিন পরে সবগুলোই রাণী-মক্ষিকায় পরিণত হল। বাকী সবগুলাকে শুধু ফুলের কেশর খাওয়ানো হ'তে দেখা গেল—সেগুলো সমস্ত কর্মীমক্ষিকা বা অনুর্বরা স্ত্রী-মক্ষিকারূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ক্যানারী পাখীদের কিছু দিন ক্রমাগত মিষ্টি লাল লঙ্কা খাইয়ে তাদের গায়ের রঙ লাল করে' দেওয়া হয়েছে। খাদ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনার বাইরে রেখে, শুদ্ধ প্রাণী-বীজকেই জাতিসুলভ সমগ্র গুণরাশিবাহী বলে' এখন আর বড়াই করা নিরর্থক্!

আবার, খাদ্য ও আবেষ্টনীর মহিমায় বুঁদ্ হয়ে' আমরা এ কথাটা যেন না ভুলে যাই যে, ও দুটো দিয়ে জাতিত্বের সকল বা বেশীর ভাগ বিশেষত্বকে বেবাক্ বদ্‌লে দেওয়া যায় না। একটা বাঘিনীকে গর্ভাধানের ঠিক পূর্বে বা গর্ভধারণের সময়ে যদি রান্নাঘরে পুরে ছাগ ও হরিণের মাংসের বদলে প্রত্যহ রুই মাছের মুড়ো ও দিস্তে কয়েক করে' লাল আটার রুটি খাওয়ানো যায়, তাহলে' বাঘিনী—রোগা হোক্, মোটা হোক্, বেঁটে হোক, লম্বা হোক্, খোকা হোক্, খুকী হোক্, একটা ব্যাঘ্র-শিশু প্রসব কর্‌বেই, মহিষাসুরের মতো কোনো অপরূপ জীবই তার পেট থেকে বেরুবে না। সুতরাং জীব-সৃষ্টি-ধারায় কৌলিক স্বভাব (heredity) পাবে প্রথম স্থান, তার গাড়ু-গামছা নিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—আবেষ্টনী আর খাদ্যের প্রভাব!

বৈচিত্র্য-লীলাই হচ্ছে জীবস্রষ্টার সৃজন-কলার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যেই বিশ্বনাথ নিম্নতম প্রাণীজগতের আত্মচ্ছেদ দ্বারা বংশ বিস্তারের কর্ম-কৌশলকে উপেক্ষা করে' স্ত্রী-পুরুষের কল্পনাকে রূপ দিতে সুরু কর্‌লেন। সৃষ্টির সর্ব আদিতে হয়েছে মায়ের উদ্ভব—পুষ্পরেণুর মতো মহামায়া হতে বিচ্ছুরিত একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ! মা তখন আপনাকে বিভক্ত করে' সন্তানের জন্ম দেন,—প্রকৃতপক্ষে আত্মহারা হয়ে তিনি দুই বা ততোধিক সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যান। তাতে বোধ হয় মায়ের তৃপ্তি হ'লনা, রামপ্রসাদ যেমন চিনি না হ'তে চেয়ে চিনি খেতে চেয়েছিলেন। মায়ের সত্ত্বা পৃথক রইল, তার অঙ্গ থেকে ছুটে বেরুতে লাগল নব নব জীব শিশু,—সৃষ্টির সার্থক বেদনা ও আনন্দ অঙ্কুরিত হয়ে' উঠ্‌ল যেন এইখানে। তারপর জীব-সৃষ্টির মধ্যাহ্নে প্রজাপতির মন পিতৃত্বের প্রয়োজন অনুভব কর্‌ল। ওই নব কল্পনা দানা বাঁধার সূত্রপাতে হ'ল উভলিঙ্গের সৃষ্টি। তাতে বৈচিত্র্য হয় না দেখে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক করে দেওয়া হ'ল,—কিন্তু যৌন সম্মিলনের ব্যবস্থা না রেখে কেবল অণ্ড-শুক্রের সঙ্গমই প্রচলিত হ'ল। কিন্তু তাতেও মনোমতো উদ্দেশ্য সংসাধিত হচ্ছে না বুঝে, চতুর ব্রহ্মা যৌন আকর্ষণ ও যৌন সংযোগের প্রথা প্রবর্তিত কর্‌লেন। কৌলিক স্বভাব আগে শুধু মা'র মধ্য দিয়েই সঞ্চারিত হচ্ছিল, এখন মাতা ও পিতা দু'জনেরই কৌলিক গুণ সন্তানে বর্তাতে লাগল। ফলে, সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য ও নূতনত্বের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর বিবর্তনের একটা সুন্দর সাড়া জেগে উঠ্‌ল।

এক কোষাণুময় জীবাণুকে এক বা ততোধিক খণ্ডে যদি কৃত্রিম উপায়েও বিভক্ত করা যায়, তা হ'লে সচল জীব হ'লে তার প্রত্যেক অংশটাই চল-শক্তিমান থাক্‌বে; কিন্তু খণ্ডিত অংশগুলোর মধ্যে যদি মাতৃজীবাণুর কোষাণু-কেন্দ্রের (nucleus) একটু একটু অংশ সঞ্চারিত না হয়ে থাকে, তা হ'লে সেগুলো বৃদ্ধি পাবে না। বহু কোষাণু-সমন্বিত জীবের দেহবিধানের প্রত্যেক অংশ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্বুদ অর্বুদ সজীব কোষাণু দ্বারা সৃষ্ট এবং প্রত্যেক কোষাণুরই একটি করে' কোষাণুকেন্দ্র আছে। ঐ ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রের চারপাশ দিয়েই ক্ষুদ্রতর এক বিন্দু জেলির মতো প্রাণ-পঙ্ক (protoplasm) বিরাজ কচ্ছে এবং এই প্রাণ-পঙ্ক ঘেরা ও মোড়া রয়েছে ক্ষুদ্র এক পাতলা কলাস্তরণ দ্বারা। কোষাণুকেন্দ্র জিনিসটা যে ঠিক কি চীজ এবং কোষাণু-বিধানে ঠিক এর কায কি—তা এখনো ধরা পড়ে

নি। তবে কৃপণের টাকার সিন্ধুকের মতো এই খানেই লুকায়িত রয়েচে কোষাণুর চির অক্ষয় জীবনের অমোঘ উৎস। উচ্চতর জীবের হৃৎপিণ্ড ও যৌনগ্রন্থির অস্ফুট সমাবেশ হয়েছে এই কেন্দ্রে,—কোষাণুর মস্তিষ্ক বা কেন্দ্রীয় নাড়ীতন্ত্র (central nervous system) বলে' যদি কোনো জিনিষ থাকে তো তারও মূলতত্ত্বটুকুও প্রোথিত রয়েচে এর মধ্যেই। সি-আর্চিন (Sea urchin) নামক এক প্রকার কণ্টক-চর্মময় অণ্ডাকৃতি সামুদ্রিক জীব আছে; তার একটা ডিমের একত্রিংশতি অংশ কেটে নিয়ে ছেড়ে দিলে, ঐ টুক্‌রো আস্তে আস্তে একটা পূর্ণাবয়ব সি-আর্চিনে বিগঠিত হয়ে' উঠ্‌বে—অবশ্য যদি টুক্‌রোর মধ্যে এক বিন্দু কোষাণু-কেন্দ্র লেগে থাকে। ডিমের ওই একত্রিংশতি ভাগ হ'ল অঙ্কুর-পঙ্ক (germ-plasm); প্রাণপঙ্কের ক্ষুদ্রতম যে অংশ দিয়ে একটা নূতন জীবের সৃষ্টি করা যায়, তাকেই বলে অঙ্কুর-পঙ্ক।

আপনারা জানেন, স্ত্রীজীবের অণ্ডাণু ও পুরুষজীবের শুক্র কীটাণু এত ক্ষুদ্র যে, কাউকে চর্ম চক্ষে দেখবার উপায় নেই। দুজনে যুক্ত হয়ে যখন জীবাঙ্কুরের সৃষ্টি করে, তখনো অণুবীক্ষ্য যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে তাকে মালুম করবার যো নেই। সাধারণত আণ্ডজ প্রাণীরা আপন কোষাণু দ্বিধা বিভক্ত করে' বংশবৃদ্ধি করে। প্রথমে কোষাণুকেন্দ্র ও পরে প্রাণপঙ্কের মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি একটা ফাট্ ধরে এবং ঐ বিদারের নিকটবর্তী স্থান গুটিয়ে এসে ভূমিযোজকের (isthmus) আকার ধারণ করে; তারপর ঐ যোজক ছিন্ন হয়ে' দু'টি স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত হয়। আর কোনো বালাই নেই। কিন্তু একটা নিষিক্ত অণ্ডাণু যখন জরায়ু-প্রাচীরে প্রোথিত হয়ে জীব-নির্মাণের প্রস্তাবনা করে, তখন ঐ একটি কোষাণু যে পদ্ধতিতে পরিবর্ধমান হয়, তা' অত্যন্ত জটিল ও উপর্যুক্ত প্রণালীর মতো সহজ-বোধ্য নয়, তবু দু'চার কথায় ব্যাপারটার একটু আভাস দিয়ে যাই।

নিম্ন প্রাণী-জগতে যেমন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী আকারে বড় হয় ও প্রকৃতিতেও একটু বিভিন্ন হয়, জীবের জন্মবীজের স্ত্রীও পুরুষ অপেক্ষা আকারে প্রায় চারগুণ বড় ও প্রকারে একটু আলাদা রকমের হয়। অণ্ডাণুর গতি-শক্তি নেই, প্রাণপঙ্ক যথেষ্ট, কিন্তু কোষাণুকেন্দ্র অতি সামান্যই আছে। পুংজীবের কোষাণুকেন্দ্র যথেষ্ট আছে—প্রাণপঙ্ক অত্যন্ত কম, চাবুকের মতো ওর ল্যাজটা অবশ্য আগাগোড়া প্রাণপঙ্ক (cytoplasm) দিয়েই তৈরী। ওই ল্যাজ গুটিয়ে গুটিয়ে শুক্রকীটেরা দ্রুতগতিতে চল্‌তে পারে। স্ত্রীবীজ আর পুংবীজ যখন একীভূত হ'ল, তখন একে অন্যের গুণাভাব পরিপূরণ করে' দিল; এতদিনে জীবকোষ যেন সমগ্রতা লাভ করল। শাস্ত্রে যে বলেছে—"যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্", ও সত্যটা শুধু আমাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, এই ক্ষুদ্রতম আণ্ডজ প্রাণী-রাজ্যেও সমধিক ফলপ্রসূ। এ সত্যের পরিচয় পরে আরো পাবেন।

যাক্, এইখানে আর একটা প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করব। জীব-দেহের প্রত্যেক কোষাণু-কেন্দ্রের খানিকটা অংশ বিশিষ্ট রাসায়নিক বর্ণ দ্বারা অনুরঞ্জিত এবং অতি মনোহররূপে অনুবীক্ষ্য যন্ত্রের নীচে পরিস্ফুট হয়ে' উঠে বলে' ঐ অংশটার নাম রাখা হয়েছে "বর্ণকণিকা" (chromatin)। কোষাণু বৃদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে এই বর্ণ-কণিকার মধ্যে ফাট্ ধরে' এক-একটি করে' ক্ষুদ্রতর টুক্‌রো হয়, তাদের নাম "বর্ণকণপাদ" (chromosomes)। বর্ণকণ-পাদের সংখ্যা, আয়তন ও আকৃতি প্রত্যেক জীবের শ্রেণী, গণ ও গোত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। মশার দেহ-কোষাণুর প্রত্যেকটার মধ্যে ৬টা, বড় ইন্দুরের ১২টা, নেংটি ইন্দুরের ২৪টা, মানুষের ৪৮টা বর্ণকণপাদ থাকে। এই বর্ণকণপাদ-গুলো সকল অবস্থায় জোড়া বেঁধে আছে; এই অণোরণীয়ান্ বস্তুর মধ্যেও দেখুন দাম্পত্যভাবকে বিধাতা সংগোপনে ফুটিয়ে তুলছেন! মজা হ'ল এই যে, আমাদের দেহের অন্যান্য অংশে যে সকল বিভিন্ন জাতীয় কোষাণু আছে, তাদের প্রত্যেকের ৪৮টা করে' বর্ণকণপাদ থাক্‌লেও প্রতি শুক্রকীট বা অণ্ডাণুর ২৪টা করে' মাত্র বর্ণকণপাদ থাকে। যে ক্ষণে উভয়ে যুক্ত হয়ে' জীবাঙ্কুররূপে প্রতিভাত হয়, সেই ক্ষণেই মানব-দেহের আদর্শ সংখ্যক বর্ণকণপাদ—৪৮টা পূর্ণ হয়ে' যায়।

আপনারা আমাদের পূর্বলিখিত প্রস্তাবগুলি পড়ে' থাক্‌লে

জান্‌তে পেরেছেন যে, একটি মাত্র স্ত্রী-অণ্ডাণুকে নিষিক্ত কর্‌তে পুরুষের বীর্যমধ্যস্থ কম্‌সে-কম দশ পনেরো লক্ষ শুক্রকীট ধেয়ে আসে। শুধু বসুন্ধরাই তো বীরভোগ্যা নন্, বসুধার উচ্চেতর সকল স্ত্রীজীবই বীরভোগ্যা হ'তে চায়। দ্রুতগতির প্রতিযোগিতায় যে শুক্রকীট জেতে, সেই সদর্পে গিয়ে আপনার দেহ স্ত্রীঅণ্ডাণুর কোমল কোষাণু-কেন্দ্রের মাঝে নিমজ্জিত করে' দেয়। অন্যান্য শুক্রকীটরা প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। তখন প্রকৃতি এই যুক্তাঙ্গ জীবাণুকে রক্ষা কর্‌তে তাড়াতাড়ি একটা শক্ত অথচ পাত্‌লা পর্দা তৈরী করে' জড়িয়ে দেন। হতাশ্বাসে অন্যান্য কীটাণু ফিরে যায়—মারা পড়ে।

বর্ণকণপাদের কথা বলেছি। এক ফেটি সুতায় অনেক গুলো জট্ পাকিয়ে গেলে যেমন দেখায়, বর্ণকণিকা যখন ভেঙে ভেঙে বর্ণকণপাদগুলির স্বষ্টি করে, তখন অনেকটা সেইরূপ দেখায় (Mitosis)। দারুণ গ্রীষ্মে পুকুরের তলদেশ প্রথম যখন ফাট্‌তে আরম্ভ করে, তখন শুষ্কপ্রায় কাদার উপরিতলের সঙ্গে এই বর্ণকণপাদসমূহের পরিস্থিতির তুলনা করাও চল্‌তে পারে। জীব-বৈজ্ঞানিকরা আন্দাজ কর্‌ছেন—এই বর্ণকণিকা বা বর্ণকণপাদগুলিই জীবের কৌলিক স্বভাবদায়ী বস্তু (hereditary substance) বহন করে। যখন অণ্ডাণু ও শুক্রকীট প্রত্যেক সমসংখ্যক অর্থাৎ চব্বিশটি-করে' বর্ণকণপাদ বহন করে, তখন উভয়ের মিলনে যে জীব-শিশুর জন্ম হয়, তার মধ্যে অর্ধেক পরিমাণে পিতার বংশগত গুণাকৃতি ও অর্ধেক পরিমাণে মাতার বংশগত গুণাকৃতি সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক রীতি।

যাহোক, অণ্ডাণুর দেহে আর একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দানার মতো জিনিষ আছে—তার নামে "কেন্দ্রকণপাদ" (centrosome), ঠিক কোষাণু-কেন্দ্রের বাড়ীর বাইরে সান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। যখন শুক্রকীট এসে অণ্ডাণুর মধ্যে ঢুক্‌ল, তখন সে তার ক্ষুদ্রতর কোষাণু-কেন্দ্রের মধ্যেই মাথা চালিয়ে দিল। মাথাটা অণ্ডাণুর কেন্দ্রের সঙ্গে মিশে একটা বৃহত্তর কেন্দ্রের স্বষ্টি কর্‌ল, এবং মামুলি কোষাণুগুলো দ্বিধা বিভক্ত হবার পূর্বে যেমন কোষাণুকেন্দ্রের মাঝখান্‌দিয়ে একটা ফাট্ ধরে, তেমনি নিষিক্ত অণ্ডাণুর কেন্দ্রে একটা অনুপ্রস্থ বিদার স্বষ্টি করে' দিল। শুক্রকীটের মধ্যবর্তী অংশটুকু অণ্ডাণুর ক্ষুদ্রতর কেন্দ্রকণপাদকে গ্রাস করে' নিজেই একটা কেন্দ্রকণপাদ সেজে বস্‌ল। তারপর ঐ নূতন কেন্দ্রকণপাদ দুই সংসারে বিভক্ত হয়ে' একটি গেল অণ্ডাণুর সুদূর প্রান্তে, আর একটি থাক্‌ল তার ঠিক্ বিপরীত দিকের দূরতম প্রান্তে।

গল্প অবশ্য বড় হয়ে যাচ্ছে; যাক্, সাধারণ পূজা-পার্বণের দিনে প্রতি বাড়ীতে পশারওয়ালা পুরোহিতোচ্চারিত পূজার মন্ত্রের মতো নিতান্ত সংক্ষেপেই একে সার্‌তে গেলে আরো যতটুকু বলা উচিত, ততটুকুই বলে যাচ্ছি।···তারপর নব-সমৃদ্ধ কোষাণু-কেন্দ্রের উপর দিয়ে ২৪ জোড়া বর্ণকণপাদ তাদের নূতন একান্নবর্তী পরিবারকে গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে' নেয়। এইবার নিষিক্ত অণ্ডাণু বা জীবাঙ্কুর দ্বিধা-বিভক্তি দ্বারা বর্ধনোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল।

এখন প্রত্যেকটি বর্ণকণপাদ লম্বালম্বি বিভক্ত হয়ে দুটিতে পরিণত হতে লাগল। সংসারে আগে প্রাণী ছিল ৪৮টি, এখন হ'ল ৯৬টি, কাযেই পৃথক বাড়ীর দরকার হয়ে পড়্‌ল। ৪৮ এবং ৪৮য়ের এক এক দল বর্ণকণপাদ তখন পরস্পর ভিন্ন হয়ে' দুই কেন্দ্রকণপাদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল। গোলাকার জীবাঙ্কুরটি প্রথমে ডিম্বাকার ও পরে লম্বাকার ধারণ করে; তারপর আস্তে আস্তে তার কোষাণু-কেন্দ্রগত পূর্বস্বষ্ট ফাটলটি বড় হয়ে তাকে দুটি অংশে বিশ্লিষ্ট করে' দেয়। একটি কোষাণু তখন দুটিতে পরিণত হল। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, স্বত্ব-পরিপূর্ণ সত্ত্বা—খাদ্য আর অনুকূল আবেষ্টনী ছাড়া অন্য কিছুরই অভাব নেই। জগতে এর চেয়ে আর আশ্চর্যজনক জিনিষ আর কি আছে? একটি চক্ষুর অগোচর কল্পনাতীতরূপ ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে বিরাট্ বিশ্বরূপ এমনিভাবে লুকিয়ে রয়েছে! মহারাজ যুধিষ্ঠির শুধু কূটরাষ্ট্রনীতিতে বা পাশা-খেলায় অপরিপক্ক ছিলেন—তা নয়, জীবতত্ত্বেও সুনিশ্চিত সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন; নচেৎ যমরাজের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জীবাঙ্কুরের নাম উল্লেখ করে' বল্‌তেন—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?

জাগরণ

শ্রীমতী শৈলবালা দাসী

আমি সুপ্ত ছিলাম গুপ্ত ভবনে
কে তুমি আমায় জাগালে ?
আমি লুপ্ত ছিলাম বিশ্ব মাঝারে
কে তুমি শিয়রে দাঁড়ালে ?
আমি, চেয়েছিনু শুধু গোপনে থাকিতে
মোর গোপন ব্যথাটি গোপনে রাখিতে
আজি কাহার ডাকে যে উঠিনু চকিতে
কে তুমি বল গো জাগালে ;
মোর হৃদয় কুঞ্জে মধুর সুরেতে
কি বাঁশী আজি গো বাজালে !
আমি নয়ন মেলিয়া জাগিয়া উঠিনু
কি জানি কাহার পরশে,
মোর বেদনা-জড়িত অবশ হৃদয়
মাতিল নবীন হরষে ।
মোর বিরহ-কাতর তাপিত পরাণে
আজি উদিলে কি তুমি প্রভাত কিরণে
ওই মরমে বাজনো বাঁশরীর তানে
কি জানি কি মধু বরষে,
মোর গোপন হিয়াটি কাঁদিত গোপনে
আকুল কি তব দরশে ।

ওই প্রভাত পাখীর মধুর কুজন
মেতেছে সারাটি ভুবনে,
ওই বিকচ কুসুম আকুল সুরভি
ঢেলেছে আকাশে পবনে ।
আজি প্রভাত রবির কিরণ ধরিয়া
ওই অমৃতের গানে জীবন ভরিয়া
হেথা কে এলগো ছুটে করুণা করিয়া
আমার নিভৃত ভবনে ;
মোর সরম-ভরম সকল হরিয়া
হৃদয়ে বাঁধিলে গোপনে ।
যদি এসেছ দুয়ারে হে প্রিয় আমার
করুণ আঁখিটি মেলিয়া,
আমি যাব কি ছুটিয়া ও হৃদি মাঝারে
প্রণয়-সুধায় গলিয়া ।—
আমি পূজিব কি দুটি রাতুল চরণ,
আমি ও রাঙা চরণে লব কি শরণ
আমি দিব কি সঁপিয়া জীবন-যৌবন
আমার যা কিছু বলিয়া—
আজি রঙীন আবেশে সকলি নূতন
উছলি উঠিছে জ্বলিয়া ।

সুবর্ণ-বণিক্-তত্ত্ব

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সুবর্ণবণিকের উৎপত্তি

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ডে লিখিত আছে—"খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যসমাজে বৈদিক-ধর্ম্মই বিশেষ প্রবল ছিল। তৎকালে বণিক্ সাধারণ বৈদিকধর্ম্মই পালন করিয়া চলিতেন। সমস্ত সভ্যজগতে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপনের সহিত সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানোন্নতির পথ সুগম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। * * * বৌদ্ধ ও জৈনমতের অভ্যুদয়ের সহিত অনেকেই উক্ত উভয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। প্রজা সাধারণ বা বৈশ্য সমাজ প্রধানতঃ নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ক্ষত্রিয় সমাজও তাঁহাদের অনুকূল ছিলেন, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত বৈদিক আচার্য্যগণের যথেষ্ট মতভেদ ঘটায় আর্য্যসমাজে প্রথমতঃ একটি ঘোরতর সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে জনসাধারণ ক্ষত্রিয় বর্ণকেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, নানা প্রাচীন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে সেই সময়কার জনসাধারণের মত জানিতে পারি। * * * বৈশ্যবণিক্ হইতে যে শৈব, সৌর জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল নানা জৈন, বৌদ্ধ ও শৈব গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।"

বহু প্রাচীন কাল হইতে যে উত্তর পশ্চিম ভারতে বহু বৈশ্যের বসতি ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রসার লাভ কালে যখন প্রজা সাধারণ সকলেই উক্ত উভয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন তখন ঐস্থানের বৈশ্য সমাজের অধিকাংশও এই ধর্ম্মদ্বয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্র আঢ্য নামে এক কুবেরতুল্য কাঞ্চন ব্যবসায়ী বৈশ্য বাস করিতেন, তিনি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কুশলচন্দ্র পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া কন্দর্পতুল্য তিনটি পুত্র লাভ করেন, প্রথম পুত্রের নাম সনক, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সনাতন ও তৃতীয় পুত্রের নাম সনৎ কুমার রাখিলেন। ইঁহারা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। তখন বৈশ্য বণিক্‌কুলে পৃথক পৃথক দ্রব্যের ব্যবসার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় নাই। সনক ব্যবসায়ী, সনাতন মণি ব্যবসায়ী ও সনৎ-কুমার গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ী হইলেন, এসম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন— "জাতাস্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রা

বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ।

আসীন্মণেস্তেষু সনাতনো বৈ

গন্ধাদিসত্বস্য সনৎকুমারঃ॥

তাঁহারা আরও বলেন—"পূর্ব্বস্মিন্ কালে এতেষাং সুবর্ণ বণিজামাদিপুরুষো বরেণ্যঃ সর্ব্বগুণাকরঃ সনকনামা কনক-ক্ষেত্রী এক আসীৎ।"

সুবর্ণবণিকগণ আপনাদিগকে 'কনক ক্ষেত্রী' বলিয়া অভিহিত করেন। ৺কুঞ্জলাল মল্লিক প্রণীত 'সুবর্ণবণিক্' পুস্তকে 'কনক ক্ষেত্রী' বা 'কনকক্ষত্রিয়' শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—"কনকক্ষেত্রী শব্দে কনক ব্যবসায়ী বৈশ্য জাতিকে বুঝায়, কনকো যস্য ক্ষেত্রোঽভূৎ স এব ক্ষত্রিয়ঃ। অর্থাৎ কনক যাঁহাদিগের ক্ষেত্র বা ক্ষেত (জীবিকার অবলম্বন) হইয়াছে তাঁহারাই কনকক্ষত্রিয়। কনকস্য ক্ষেত্রং বিদ্যতে যস্য স তথা, যথা কৃষকস্য ক্ষেত্রকর্ষণাদিনা ক্ষেত্রী ইতি সংজ্ঞা তথা হিরণ্যরূপক্ষেত্রব্যবহারেণ কনক-ক্ষেত্রীতি সংজ্ঞা।" শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় সুবর্ণ-বণিকের উৎপত্তি সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অতঃপর আলোচনা করা যাইবে। তিনি 'কনক ক্ষেত্রী' শব্দে কনক ক্ষেত্রপতি অর্থাৎ হৈমবত দেশস্থিত

কনকক্ষেত্র (যাহাকে বনপর্ব্বে কনখল বলে) অধিপতি এই ব্যাখ্যা করেন। সুবর্ণবণিকের 'কনকক্ষেত্র' সংজ্ঞা একের রাজ্যাধিকার-সূত্রে লব্ধ; অপেক্ষা একই জাতীয় বহু ব্যক্তির একই প্রকার দ্রব্য ব্যবসায়ে প্রাপ্ত হওয়াই অধিক সমীচীন বোধ হয়। সনক আঢ্য ও তদাশ্রিত অন্যান্য কনক ব্যবসায়ী বৈশ্য বহুকাল এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় 'কনকক্ষেত্রী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

বৈশ্য কুশলচন্দ্র আঢ্যের তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র সনক সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পরম ধার্ম্মিক এবং বৃত্তি-পরায়ণ ছিলেন। সনকের পিতৃব্য গণপৎ আঢ্য এবং অন্যান্য জ্ঞাতি-বর্গ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তিনি তাঁহাদের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ উপলক্ষে কুল পুরোহিত ও গুরু জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র নামক সারস্বত ব্রাহ্মণ, পত্নী বরাটিকা, স্বধর্ম্মানুরক্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী সৈন্য সহ নানা দেশ পরিভ্রমণান্তর অনুমান ৮৪৭ শকাব্দে বা ৯২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজা আদিশূরের শরণাপন্ন হন। আদিশূরের রাজত্বকাল নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, এমন কি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বাঙ্গালার ইতিহাসে আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে না,—এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। যাহা হউক বঙ্গাধিপতি মহামতি আদিশূর সনকের নিকট বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি উপঢৌকন প্রাপ্তে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সনককে অনুচরবর্গের সহিত তাঁহার রাজধানীর ইচ্ছামত স্থানে বসবাস করিতে আদেশ করেন। সনক আঢ্য ও তাঁহার সমভিব্যাহারী বণিকৃগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বাণিজ্যের উপযোগী একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অচিরে সনক ও তাঁহার স্বজাতীয় বণিকৃগণ স্বর্ণ-রজতাদি ব্যবসায়ে বাণিজ্যের অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করায় চীন ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দুরদেশীয় বণিকৃগণ তথায় বাণিজ্যার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ আদিশূর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল স্বর্ণ-ব্যবসায়ী বণিকৃগণকে 'সুবর্ণবণিক্' ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বাসভূমিকে 'সুবর্ণগ্রাম' এই আখ্যা প্রদান করিলেন। তদবধি সনকের বংশধরগণ ও তদীয় আত্মীয় স্বজন বংশপরম্পরা 'সুবর্ণবণিক্' বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। রাজা আদিশূর তাম্রফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত করিয়া এই স্বর্ণব্যবসায়ী বণিকৃগণকে উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

"স্বর্ণবাণিজ্যকারিত্বাদত্রাস্থিত বিশাং ময়া !
সুবর্ণবণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মানবৃদ্ধয়ে॥"

পূর্ব্ববর্ত্তী সুবর্ণবণিক্ ইতিহাসকারগণ এই ঘটনা সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় আদিশূরের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া সুবর্ণবণিক্ সমাচার ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় 'গৌড়ে সুবর্ণবণিক্' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন —"পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র এই অযোধ্যায় (বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যায়) বোধ হয় পাল রাজার অধীনস্থ রাজা হইয়া রাজত্ব করেন এবং স্বজাতীয় বণিকৃদিগকে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত 'সুবর্ণবণিক্' উপাধি প্রদান করেন। রাজা আদিশূর বণিকৃদিগকে 'সুবর্ণবণিক্' উপাধি দেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন—যাঁহার ঐতিহাসিকত্বে কেহ কেহ সন্দিহান তবে এ সময়ের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্ব্ব লেখকগণ সুবর্ণচন্দ্রের নাম জানিতেন না তাহাতেই তাঁহারা বণিকৃদিগকে সুবর্ণবণিক্ উপাধিদানের কর্ত্তৃত্ব আদিশূরের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন।" শীল মহাশয়ের এই বিবরণ সমর্থন করিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাভাব দেখা যাইতেছে। কারণ যে ঘটনা বহুকালাবধি সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা কেবল মুখের কথায় মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বাঙ্গালার ইতিহাস আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বর্ত্তমান কালের অনেক ঐতিহাসিকও আদিশূরের কার্য্যাবলী সমর্থন করেন। আর ভবিষ্যতে আদিশূর সম্বন্ধে কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন যে আবিষ্কৃত না হইবে এমনও কে বলিতে পারে ?

আদিশূরের সহিত সনক আঢ্যের নানা কারণে সদ্ভাব হয়। ঐ সময়ে দীর্ঘকাল বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল এবং তজ্জন্য এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত ক্রিয়া-কাণ্ড বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাজা আদিশূর অপুত্রক ছিলেন। তিনি পুত্র কামনা ও রাজ্যের

তাৎকালিক অমঙ্গল প্রশমনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হইয়া বাঙ্গালার সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলে আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া অযোধ্যা হইতে নবাগত হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী সনক আঢ্যের সহিত তদ্বিষয়ে পরামর্শ করেন। সনক স্বদেশের নিকটস্থ কান্যকুব্জের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। সুতরাং রাজাকে তথা হইতে কর্ম্ম-কুশল কয়েকটি ব্রাহ্মণ আনাইবার পরামর্শ দেন। এ সম্বন্ধে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘট-কারিকায় এইরূপ উল্লেখ আছে—

"পাত্রং পপ্রচ্ছ পূতং পরমসুরপদদ্বন্দ্বপদ্মার্চ্চকোঽহংসো
কাসন্তে কাশ্রপীশাঃ ক্রতুকৃতিকুশলাঃ ক্কাপি শূদ্রাঃ কুলীনাঃ।
পাত্রস্তেষামবোচৎ পরিচয়মখিলং ভূপবাক্যাদ্ দ্বিজান্তে॥
কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গা ইব কিল তপসা নৈব কেযামধীনাঃ॥

সনকের পরামর্শে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা পূর্ব্বক বঙ্গদেশে বেদের চতুষ্পাঠিকা স্থাপন করিলেন। ৺কুঞ্জলাল মল্লিক প্রণীত 'স্বর্ণবণিক্‌' পুস্তক হইতে আমরা এসংবাদ জানিতে পারি। আদিশূরের কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে নানারকম গল্প কুল-পুস্তক-সমূহে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন্ গল্প সত্য আর কোন গল্প মিথ্যা তাহা স্থির করা সুকঠিন। কুলাচার্য্যগণ ৬৫৪ হইতে ৯৯৪ শকাব্দের মধ্যে আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়নের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে স্থলে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই সে স্থলে কুলাচার্য্যগণের গালগল্পের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। অতএব সনক আঢ্য প্রমুখ স্বর্ণ-ব্যবসায়ী বণিক্‌গণই বঙ্গীয় স্বর্ণবণিক্ জাতির আদিপুরুষ।

সনক আঢ্যের বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্বে সুষেন পাইন নামক এক বণিক্ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। কোন প্রাচীন সংস্কৃত বা বাঙ্গলা গ্রন্থে এসংবাদ পাওয়া যায় না। বিখ্যাত পরিব্রাজক, নানা ভাষাভিজ্ঞ ও লেখক স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার 'সিদ্ধান্ত সমুদ্র' পুস্তকের ২য় খণ্ডে স্বর্ণবণিকের ইতিবৃত্ত লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বপ্রথমে এক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে এই সুষেন পাইন সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছিলেন। পরে লক্ষ্ণৌ নগরে প্রকাশিত এক হিন্দিভাষার উপন্যাসেও সুষেণের বিবরণ দেখিয়া ছিলেন। ক্রমে আরও অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে সুষেনের বঙ্গে আগমনের কথা সত্য। সুষেনের পুত্রের নাম কেতুমান। কেতুমানের পুত্র শ্রীদাম এবং শ্রীদামের পুত্র জয়কেতু। জয়কেতুর এক পুত্র পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ব্যবসা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র সনক আঢ্য বঙ্গদেশে আসিয়া আদিশূরের শরণাপন্ন হন। এই সনক ও তৎসমভিব্যাহারী বণিক্‌গণ হইতেই বঙ্গে স্বর্ণবণিকের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং সুষেন সর্ব্বাগ্রে বঙ্গদেশে আগমন করিলেও সনক আঢ্যের ন্যায় এদেশে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

সনক আঢ্যের সহিত যে সকল প্রধান বণিক্ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন পুরাতন কুলজীতে তাহার এইরূপ বিবরণ আছে—

"দে দত্তশ্চন্দ্র আঢ্যশ্চ শীলঃ সিংহো ধর স্তথা।
বড়ালঃ পালো নাথশ্চ মল্লিকো নন্দী বর্দ্ধনঃ।
দাসো লাহাস্তথা সেনঃ ষোড়শখ্যাতিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ দে, দত্ত, চন্দ্র, আঢ্য, শীল, সিংহ, ধর, বড়াল, পাল, মল্লিক, নন্দী, বর্দ্ধন, দাস, লাহা ও সেন এই ষোড়শ খ্যাতিধারী বণিক্‌গণ প্রধান। ধনকুবের কাঞ্চন ব্যবসায়ী কুশল আঢ্যের এক পুত্র সনক কাঞ্চন ব্যবসায়ী এবং আর একপুত্র সনৎকুমার গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া স্বর্ণ ও গন্ধবণিক্ জাতিদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। ইঁহারা এক পিতামাতার সন্তান হইলেও পরস্পর পৃথক জাতিতে পরিণত হওয়ায় বঙ্গের গন্ধবণিক্ ও স্বর্ণবণিকের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান বা পংক্তি ভোজনের প্রথা নাই। পূর্ব্বোক্ত মহাভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন—"শারীরিক সৌন্দর্য্য, মানসিক উর্ব্বরতা এবং আধ্যাত্মিক গুণে স্বর্ণবণিক্ সম্প্রদায় তুলনায় গন্ধবণিক্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। শিক্ষা, সভ্যতা, স্বভাব, চরিত্র, ধন, মান, প্রখ্যাতি, প্রভুত্ব, বদান্যতা, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতিতে স্বর্ণবণিক্ জাতি নিশ্চয় উচ্চতর স্থানে সমাবিষ্ট আছেন। (সিদ্ধান্ত সমুদ্র ২য় খণ্ড)

ক্রমশঃ

সপত্নী

শ্রীরাজেন্দ্রলাল পুরী

(১)

স্বামী অসীম স্ত্রী নির্ম্মলাকে বল্‌লেন "এতে তোমার মন্দ বই ভাল হবে না নির্ম্মল! এতে কি তুমি নিজের ভালো হবে বলে মনে করতে পার। আমাকে আর ভাবিও না। আমি আর কাকেও বিয়ে করে ঘরে তুলতে পারব না। আমার প্রাণ, মন, স্নেহ, ভালবাসা, সকলই যে তোমাতে বাঁধা আছে নির্ম্মল! আমি আর এ দত্ত প্রাণ তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে অন্যের হাতে তুলে দোব কেমন করে? বেশ ত আছি। আকাশের মুক্ত বিহঙ্গের মত কোন বাঁধন নেই আমাদের। এম্নি ভাবে জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটিয়ে দিলেই হয়। আর কেন অন্যকে ডেকে সংসারের বোঝা বাড়াই।"

"না, তা কিছুতেই হতে পারে না। তুমি আমার কথায় বিয়ে কর্ত্তে রাজি হবে না, তা জানি। কিন্তু আমার শ্বশুরের পবিত্র বংশ ত রক্ষা করতে হবে। তুমি হয়ত ভাবচো যে, আমি নতুন বৌএর সঙ্গে ভাল ভাবে থাকতে পারবো না! সেটা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি তাকে আমার নিজের ছোট বোনটীর মত করে নেবো। তখন তুমি দেখো তাকে কেমন ক'রে গড়ে তুলি।"

"আচ্ছা তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা যে আমি আবার বিয়ে করি, তখন তোমার কথাই রাখবো। কিন্তু মনে রেখো নির্ম্মল, আমি তাকে সুখী করতে পারবো না।"

"বেশ তাই হবে।"

নির্ম্মলা মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌ল "ইনি যেন আমার মত তাকেও প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে পারেন।"

(২)

অসীম বাবু মনোহর পুরের জমিদার। দেওয়ানজীর উপর জমীদারীর ভার দিয়ে, স্ত্রী নির্ম্মলার সহিত তিনি কলিকাতায় বাস করছিলেন। তাঁহাদের দিনগুলি মধুর দাম্পত্য প্রেমে বেশ সুখে কেটে যাচ্ছিল। কোন ভাবনাই তাদের ছিল না। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুপুরুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন খানা ডিগ্রীও তিনি পেয়েছিলেন। পত্নী নির্ম্মলাকে তিনি প্রাণের অফুরন্ত ভালবাসা অপরিমেয় স্নেহ দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। নির্ম্মলা দেবীও ছিল বড়লোকের মেয়ে। তাঁর গুণ ছিল অপরিমেয় এবং রূপও ছিল প্রশংসনীয়। জমিদার গৃহিণী হয়েও সে স্বহস্তে স্বামীর সকল কার্য্যই করতেন। তাহার মধ্যে অহঙ্কার কখন স্থান পায়নি। এত সুখের মধ্যেও তার দুঃখের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, কোন সন্তান-সন্ততির মুখ দেখতে পাওয়া অদৃষ্টে ঘটেনি। নারী জীবনের সকল কামনাই তাহার পূর্ণ হয়েছিল। স্বামীর অপরিসীম প্রেম, অফুরন্ত স্নেহ, প্রাণঢালা ভালবাসা এগুলির কোনটির অভাব সে একদিনও অনুভব করেনি। কিন্তু মাতৃত্ব—যেটা নারী জীবনের পূর্ণবিকাশ,—যাহা নারীগণের কাম্য,—সে সেইটা থেকেই বঞ্চিত ছিল। এইজন্য সে অনেক কাতর অনুনয়, আকুল প্রার্থনা ঈশ্বরের পায়ে ঢেলেছে, কিন্তু তার সেই কাতর ডাক ভগবান বোধহয় শুনতে পান নি।

সে ছিল প্রকৃত নারী। নারীর পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল তাতে। তাই যখন সে সন্তানের কোন সম্ভাবনাই নিজের মধ্যে দেখতে পেলেনা, তখন স্বামীকে অনুরোধ কর্‌ল আবার বিয়ে করতে। যদিও স্বপত্নী আনয়ন করা কোন নারীরই কাম্য নয়; তথাপি শ্বশুরের বংশ রক্ষার জন্য সে স্বামীকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে বাধ্য হ'ল। স্বামী অসীম প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হয়নি, কিন্তু পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে অবশেষে স্বীকৃত হ'লেন।

ইহার পর একদিন বিবাহের দিন ধার্য্য করা হ'ল। নির্ম্মলা সুশৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করবার

বন্দোবস্ত করল। কলিকাতা নিবাসী এক ধনীর কন্যার সহিত অসীম বাবুর বিবাহ হয়ে গেল। কিন্তু বিবাহের সময় অসীম বাবুর গম্ভীর মূর্ত্তি মনীষার মনে একটা খট্‌কার সৃষ্টি করল। যাহাহউক, নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হ'ল।

ফুলশয্যার রাত্রি—যাহা নবদম্পতীর প্রাণে নবীন প্রেমের সঞ্চার করে—সেই প্রেম-সম্ভাষণের রাত্রি সকল দম্পতীর স্মৃতিপটে চিরকাল আঁকা থাকে। এই মধুর রাত্রি মনীষার কাট্‌ল নির্ব্বাক্ অবস্থায়। স্বামীর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে সে কথা কহিতেও সাহস করল না।

কয়েক বৎসর অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু অসীমবাবু মনীষাকে ভাল বেসে উঠতে পারেন নি। মনীষার সুস্থ শরীর বিশুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। তার সদা প্রফুল্ল মুখ খানি এখন সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকে। সে এই বিষণ্ণতাকে ঢেকে রেখে প্রফুল্ল হতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তার বিষণ্ণ বদন আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠে। সে তার দুঃখ কাকেও জান্‌তে দেয় না; না দিলেও, নির্ম্মলার দৃষ্টি তাহা বেশ ভালরূপেই ধরে ফেলেছিল।

মনীষার যে রূপ ছিল না তাহা নয়। নবযৌবনের উচ্ছ্বাস তার শরীরকে ছাপিয়ে, কোন এক প্রাণহীন দেবতার জন্য পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছে। শুধু এ রূপ নয়, তার সমস্ত হৃদয়খানি, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ ও মমতা নিয়ে যে নিষ্ঠুর দেবতার পূজার জন্য অর্ঘ্য বহন করছিল, সে নিষ্ঠুর দেবতা তার দিকে ফিরেও চায় না। হায়রে, মনীষা! তোর ভাঙ্গা কপাল। তা না হ'লে কোন্ দেবতা তোর এই প্রাণ-ভরা পূজা নিতে অস্বীকার করবে?

তার গুণও ছিল অফুরন্ত। তার গুণে এবং নম্র ব্যবহারে বাড়ীর প্রত্যেক প্রাণীটি তার বশীভূত। সকলেই তাকে প্রীতির চক্ষে দেখে। কিন্তু সে স্বামী দেবতার প্রীতি লাভ করতে সমর্থ হয় নি। স্বামী যে মনীষাকে আদৌ ভাল বাসেন না, নির্ম্মলা তা বুঝতে পেরেছিল এবং সে তজ্জন্য অসীমকে অনুযোগ করতেও ছাড়ে নি। কিন্তু অসীম কিছুতেই মনীষাকে ভাল বাসতে পারছিল না। নির্ম্মলার কথার উত্তরে বলত যে, "আমি যে তোমার কাছ থেকে আমার প্রাণটাকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পাচ্ছি না। তাতে মনীষাকে ভালবাসবো কি করে?"

একদিন নির্ম্মলা মনীষাকে গোপনে জিজ্ঞাস করল "মণি! আমি তোর কাছ থেকে একটা কথা জানতে চাই। ঠিক উত্তর দিবি তো?"

"কি কথা দিদি, বলনা? আমি তোমার কাছে কোন কথাই লুকোই না তবে আজ এমন কি কথা আছে যে, সেটা আমি ঠিক বলবো না।"

"তা নয়! তুই সব কথাই তো আমায় বলিস, কিন্তু একটা যেন বলিস না?"

"কি কথা দিদি?" এই কথা বলে মনীষা তার ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটির দৃষ্টি নির্ম্মলার মুখের উপর নিবদ্ধ করল।

নির্ম্মলা তার সেই সরল সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে কিছুতেই অশ্রু রোধ করিতে পারল না। তার নারী-হৃদয় বেদনার সহানুভূতিতে ভরে উঠল। তার অজ্ঞাতসারে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মনীষার হাতের উপর পতিত হ'ল।

মনীষা চম্‌কে নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করল "দিদি! কাঁদছ কেন?"

নির্ম্মলা কোন প্রকারে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু কেন যে সে কাঁদছে, সে কথা ভাবতে নির্ম্মলার আরও কণ্ঠরোধ হয়ে উঠল। কণ্ঠকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে নির্ম্মলা বলল "না বোন, কাঁদচি না। আচ্ছা বল্ দেখি, উনি তোকে কেমন ভালবাসেন।"

মনীষা সত্য গোপন করে বলল "কেন, খুব ভাল-বাসেন তো। আমাকে সময় সময় কত আদর করেন।"

নির্ম্মলা মনে মনে বুঝিল মনীষা সত্য গোপন করছে। বিষাদের হাসি হেসে বলল "ঐ দেখ! ওটা কি আর সত্য বলা হোলো। আমি সব বুঝি মণি। আমার কাছে আর লুকোস্ কেন মণি? তুই বুঝি তবে আমাকে ভাল-বাসিস্ না, কেমন?"

মনীষার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। সে এরূপ সহানুভূতি এতদিন কারুর কাছ থেকে পায় নি। আজ এই সহানু-

ভূতিতে তাহার হৃদয়-সমুদ্রে জোয়ার উছ্লে উঠল। তার আয়ত চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হল।

(৫)

এই ঘটনার পর আরও কয়েক মাস অতীত হয়েছে কিন্তু অসীম কিছুতেই মনীষাকে নিজের করে নিতে পারছে না। নির্ম্মলার কত অনুরোধ, কত চক্ষুজল সবই বৃথা হয়েছে।

একদিন নির্ম্মলা স্বামীকে বল্ল "দেখ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছো। আমি জানি তুমি আমাকে ছাড়া আর অন্য কাহাকেও ভালবাসতে পারবে না; কিন্তু তাই বলে মণির দিকে একটীবার ফিরেও চাইবে না? তার জীবনটাকে ব্যর্থ হতে দেবে? তার নারী জীবনের কোন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হতে দেবে না? আমার এই অনুরোধটী তোমাকে রাখতেই হবে, তুমি আমায় যেমন ভালবাস, তেম্নি করে মণিকে ভালবাস দেখি। দেখবে তাতে আমি এর চেয়েও সুখী হই কিনা? কিন্তু মণিকে ভাল না বাসলে আমি ত মোটেই সুখী নই, অধিকন্তু মণির জীবনটাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"আমি জানি নির্ম্মল, যে, তুমি নিজের সমস্ত ত্যাগ করেও মনীষার ভাল করবে, কিন্তু আমি তা কিছুতেই পারবো না।"

নির্ম্মলা আর কোনও কথা বল্ল না। ধীরে ধীরে গৃহ হতে বেরিয়ে কার্য্যান্তরে গেল। অসীম বসে শূন্য মনে চিন্তা করতে লাগল।

* * * *

সেইদিন সন্ধ্যাকালে নির্ম্মলার মস্তক অহিফেন বিষে বালিসের উপর এলিয়ে পড়্তে দেখে মনীষা তার মস্তক নিজের কোলের উপর নিয়ে, কাঁদতে লাগ্ল। বলল, "দিদি, কল্লে কি? আমার জন্য শেষে নিজের প্রাণটাও খোয়ালে। এতেই কি আমার ভাল হবে দিদি? তোমার কাছ থেকে যে স্নেহ ও সহানুভূতি টুকু পাচ্ছিলাম তার পথও রুদ্ধ করে দেবে? না, দিদি, যেওনা। আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

নির্ম্মলা তার অবসন্ন হাতের মধ্যে মনীষার হাত নিয়ে বল্লে "বেশ করেছি বোন। আমার জন্য তুই কেন কষ্ট ভোগ করিস্। আমি তো সমস্ত জীবনটা সুখেই কাটিয়েছি। এখন যাতে তুই সুখে থাকতে পারিস্, তার একটা ব্যবস্থা আমার করতেই হবে। আমি তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করে তোকে ভালবাসতে বলবো। তিনি কিছুতেই আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে বিমুখ হবেন না।" মনীষা আর কোন কথা বল্তে পারল না। স্থূলমুক্তাসদৃশ অশ্রুবিন্দু তার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত কর্‌ল।

ডাক্তার এসে বল্ল "অতিরিক্ত অহিফেন খেয়েছে। সময় ও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। জীবনের কোন আশা নেই। দশ পনের মিনিটের মধ্যে সকলই শেষ হয়ে যাবে।"

অসীম নির্ম্মলার শয্যাপার্শ্বে বসে বল্ল "নির্ম্মল, এই কল্লে?" অসীমের বুক ঠেলে একটা কান্না বের হবার উদ্যম করতে লাগ্ল। অতিকষ্টে সেটাকে দমন করে এক দৃষ্টে নির্ম্মলার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নির্ম্মলা বল্ল "বেশ ভালই করেছি। তোমাকে অনেক অনুরোধ করেছি মণিকে ভাল বাসবার জন্য। কিন্তু বুঝলাম সে পথের প্রতিবন্ধক হচ্ছি আমি। সেই পথ পরিষ্কার করবার জন্যই আমি এই করেছি। তুমি নারীর হৃদয় বুঝতে পারো না। আমি নারী জাতি। আমি মনীষার হৃদয় তলিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছি তার প্রাণে কি অপরিসীম ভালবাসা, কি অফুরন্ত প্রেম, উন্মুখ হয়ে রয়েছে তোমার পায়ে নিবেদন করবার জন্য। তাই বলছি, আমার একটা শেষ অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।"

"কোন কথাটা তোমার রাখিনি, নির্ম্মল? আজ— তোমার এই শেষ মুহূর্ত্তে যা বলবে, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। কি অনুরোধ তোমার?"

"আমায় যেমন প্রাণঢেলে ভাল বাসতে, মণিকে তেম্নি ভালবেসে তার জীবনটা সার্থকতায় পূর্ণ করে দিও। তোমার কাছে এই আমারশেষ অনুরোধ।

মণি, চল্লুম বোন্। ভগবান করুন যেন তুই ওঁকে নিয়ে সুখী হোস্।"

স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া নির্ম্মলার শেষ নিশ্বাস অনন্ত বাতাসের গায়ে মিলাইয়া গেল।

পাটলীপুত্রে

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল, সাহিত্যরত্ন, কবিভূষণ

সে কোন অতীত যুগের এক অন্ধকারময় রজনীর নিস্তব্ধ প্রহরে তোমার বিষাণ এই স্থানে বাজিয়া উঠিয়াছিল, হে কালভৈরব? আবার এক কর্ম্মময় জীবনের অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে সে কোন দিনান্তে সন্ধ্যার রক্তিম আকাশকে মুখরিত করিয়া তোমার সেই ভেরীধ্বনি এই স্থানে হঠাৎ থামিয়াছিল, হে রুদ্রদেবতা? এই পাটলীপুত্রের প্রাকার-প্রান্তে উপবেশন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে আজ বন্যার প্রবাহ সম অতীতের কত চলচ্ছবি আমার নয়নের সম্মুখে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইতেছে! ওগো, দাঁড়াও। আমি আর একবার ভাল করিয়া দেখি। তুমি যে আমার বহুদিনের অদেখা অথচ পরিচিত ছবি! জানি না, কোন শতাব্দীতে এই মগধের স্বাধীন বাতাস আমার হৃদ্‌পিণ্ডে সর্ব্বপ্রথম শোণিত সঞ্চার করিয়াছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তথাপি আমি এই মগধের মায়া কাটাইতে পারিতেছি না কেন, হে মহাকাল? জানি না, এই মগধের কোন ধূলিকণা হইতে আমার জন্ম; তবে এটা আমার বেশ স্মরণ হয় ২৩৫৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই পাটলী গ্রামে এক ধীবরের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পাটলী তখন একটী নগণ্য গ্রাম ছিল। রাজপুরী রাজগৃহের সন্নিকটে মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহার "বেণুবন" নামক বংশ-বাটী মহামুনি শাক্যসিংহের আবাস-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহাযশ শেঠী, কাশীর বিখ্যাত বণিক্,—সারি-পুত্রের ভিক্ষুদিগের জন্য ষাটটী "বিহার" নির্ম্মাণ করিয়া "সঙ্ঘের" নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গৌতম ঋষির নামে যে জয়ডঙ্কা তখন মগধের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি এই পাটলীগ্রামের ধীবর পল্লীতেও পৌঁছিয়াছিল! ভারতের সে কি পুণ্য দিন, যে দিন গৌতম বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম এই রাজগৃহে নির্জ্জন পর্ব্বত গহ্বরে আলার ও উদ্রাক্ষের নিকট শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন।

গঙ্গার পরপারে লিচ্ছবীর রাজধানী বৈশালী নগরী। তুরানী বজ্জিয়ান্ জাতি তিব্বত ও নেপাল জয় করিয়া বৈশালীতে সগর্ব্বে বিজয় নিশান উড্ডীন্ করিয়াছিল। নিস্তব্ধ রাত্রে তাহাদিগের সমর ডঙ্কার ক্ষুধার্ত্ত নিনাদ গঙ্গার সমীর-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমাদিগের সুপ্ত পল্লীটীকে সন্ত্রস্ত করিয়া দিত। বজ্জিয়ান্‌গণ মগধ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, রাজা বিম্বিসার চতুর্দ্দোলারোহণে একবার পাটলী-গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। শোণানদীর তটভূমে তাঁহার সৈন্যাবাস স্থাপিত হইলে, অগণন দামামা ও ভেরীর নিনাদে দূরস্থিত পাটলী গ্রামও কাঁপিয়া উঠিত। আর সেই সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিত কি এক অজানা আশঙ্কায় আমার শিশু হৃদয়খানি! তখন মগধের কি গর্ব্ব করিবার দিন ছিল! মগধ তখন যশে গৌরবে ভারতের মুকুট-রত্ন! তারপর অকস্মাৎ একটা ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া দেশটাকে আলোড়িত করিল! মহারাজ বিম্বিসার সেই তাঁবুতে হত হইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু রাজ-গৃহের সিংহাসন অধিকার করিয়া নিজেকে "মগধ সম্রাট্ বিদেহীপুত্র অজাতশত্রু" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আমি তখন মাহীনদীতে মাছ ধরিতাম।

কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোধন,—মহামুনি বুদ্ধদেবের পিতা তখন কয়েক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। বুদ্ধ-পুত্র রাহুল তাঁহার পিতার "সঙ্ঘে" যোগদান করিয়াছেন। আহা! রাজপুত্র রাহুল অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সংসারের সমস্ত সাধ বিসর্জ্জন দিয়া পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। শুদ্ধোধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ভদ্রকও কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন মহানাম তথাকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব তাঁহার জন্মভূমিতে তিনবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর,—কোলীর রাজা শুপ্রবুদ্ধ, তাঁহার কন্যা যশোধরাকে চিরদিনের জন্য

পরিত্যাগ করায় বুদ্ধদেবকে সাতিশয় অপমান করিলেন। বুদ্ধদেব কোন কথা না বলিয়া একেবারে রাজগৃহে চলিয়া আসিলেন। সেই রাত্রেই ভীষণ ভূমিকম্পে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া রাজা শুপ্রবুদ্ধকে গ্রাস করিয়াছিল! আমি মাহী-নদীর তটে সবে মাত্র জাল টানিয়া মাছ তুলিয়াছি,—দেখিলাম ভগবান বুদ্ধদেব এবং তাঁহারি অনুচর মহাভিক্ষু আনন্দ আমার সম্মুখে উপস্থিত! আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ স্নেহ-কণ্ঠে কহিলেন,—"বৎস!"—আহা! কি শুনিলাম! প্রাণের মধ্যে সেই আমার প্রথম বাঁশী বাজিয়া উঠিল! আঁধার আকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয় হইল! হৃদয় তন্ত্রীতে সেই যে অঙ্গুলিস্পর্শে কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রথম সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার "রেশ" এখনও থামে নাই! প্রভু কহিলেন "বৎস! হরণ করিতেছ কেন?"

—"কি হরণ করিতেছি?"

—"যাহা তোমার নহে, তাহা লওয়া কি হরণ নহে?"

—"কি আমার নহে?"

—"এই মাছগুলির প্রাণ তোমার দেওয়া নহে, তবে তাহা লইতেছ কেন?"

লজ্জায় চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি এবার কহিলেন,—

"তোমার নাম কি?"

—"রেণুকা-পুত্র!"

—"ভাই রেণুকা-পুত্র! অহিংসা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে হিংসা করে না, তাহার প্রাণবধ দূরের কথা; যে হিংসা করে তাহারো প্রাণবধ করিতে নাই। অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করিতে হয়। কদাচ হিংসার দ্বারা অহিংসাকে জয় করিবে না!"

স্তব্ধ হইয়া লজ্জায় মাটীর দিকে মুখ নত করিয়া রহিলাম। হে মুনিসম্রাট্! আমি তোমার ভাই? ঐ পদধূলি মগধরাজ যত্নের সহিত মাথায় ধারণ করিয়া থাকেন, আজ তাহা ধারণ করিবার যোগ্য হইবে কি নরাধম রেণুকা-পুত্র? তৎক্ষণাৎ মৎস্যগুলিকে জলে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে তাঁহার "বিহারে" সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া আনন্দসহ চলিয়া গেলেন।

তাহার পর শুনিলাম ভিক্ষুণী শ্রীমতীর মৃত্যুর পর তাঁহার অধর-নিঃসৃত উপদেশ-ধারা। দেখিলাম, চালিয্যারণ্যে বিখ্যাত দস্যু অঙ্গুলিমালের শ্রামণ সজ্জা। একে একে দেখিলাম,—শাক্যরাজ—ভদ্দের সন্ন্যাস গ্রহণ; মগধমহিষী ক্ষেমার ও বুদ্ধপত্নী যশোধরার পট্টাম্বর পরিধান পূর্ব্বক সঙ্ঘাশ্রয় গ্রহণ; প্রাচীনা গৌতম বিমাতা প্রজাবতী গৌতমীর অশ্রুপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র; বিশ্বাসঘাতক দেবদত্তের স্বয়ং বুদ্ধ হইবার সাধ এবং বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র! কোলী, শাক্য ও ভঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মগধ পর্য্যন্ত বিশাল ভূমিখণ্ড এক সঙ্গে, যেন কি এক মন্ত্রের মোহে, বুদ্ধ-দেবের চরণতলে নমিত হইল!

আশী বৎসর বয়সে প্রভু সেই যে রাজগৃহ ত্যাগ করিলেন, আর ফিরিলেন না। রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভগবান অমিতাভ প্রথম দর্শন দিয়াছিলেন অম্বলঠিকা নগরে; তৎপরে নালন্দায়; তারপর কোটীগ্রামে; তারপর নাদিকপুরে; শেষ আতিথ্য লইলেন বৈশালীর আম্রবিক্রেত্রী অম্বপালীর গৃহে। আমি সঙ্গে ছিলাম। সেই লিচ্ছবীর দেশে কিছুকাল যাপন করিয়া প্রভু আমাকে ও আনন্দকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিলেন,—বেলুভ নগর, ছাপান ছেটী, কুটাগার। কুটাগারে বর্ষাবাস যাপন করিয়া প্রভু চলিলেন,—ভাণ্ডগ্রাম, হস্তীগ্রাম, অম্বগ্রাম, জম্বুগ্রাম, ভোগনগর, পাবা। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনপ্রদীপ কি উজ্জ্বল রশ্মি প্রকাশ করিয়াছিল! ঐ সকল স্থানে তিনি যে সকল সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বিদেহ, কাশী, কোশল রাজ্যও তাঁহার চরণতলে মাথা লুটাইয়া দিল! পাবায় স্বর্ণকায় চন্দ্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভক্তিভরে শূকরমাংস আহার করিতে দিলে, প্রভু ভক্তের ভক্তির দানকে অসম্মান করিতে পারিলেন না। আহারের দুই দিন পরে তাঁহার রক্ত আমাশয় ব্যারাম হইল। আমরা প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম। ভীষণ ব্যাধিযন্ত্রণায় তাঁহার মুখ হইতে একটীবারও যন্ত্রণাসূচক শব্দ শুনিলাম না! কি সহগুণ! পাবা হইতে আমরা তাঁহাকে বহন

করিয়া কুশীনগরে আনিলাম। কে জানিত, ঐ কুশীনগরেই তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে? কিন্তু, তাঁহার ত নির্ব্বাণ নাই! তিনি যে বলিয়াছিলেন "আবার আসিব"! আমি তাঁহারি প্রতীক্ষায় এই আড়াই হাজার বৎসর মগধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসিয়া আছি! তাঁহার চরণস্পর্শে পূত মগধের অণু-পরমাণুর মধ্যে আজিও তাঁহার অঙ্গসৌরভের ঘ্রাণ লইতেছি! তথাগত! বুদ্ধ! অমিতাভ! তোমার সেই উজ্জ্বল দেবদুর্লভ কান্তিপূর্ণ কলেবর কোথায়? মনে পড়ে সেই রাত্রির কথা! তাঁহার দেহত্যাগের সময় আমি ও আনন্দ ভিন্ন আর কেহ প্রাচীন শিষ্য জীবিত ছিল না। তাঁহার নির্ব্বাণের পর আমরা তাঁহার দেহখানি স্কন্ধে উঠাইয়া কি ভীষণ নৃত্য করিয়াছিলাম! সেই তাণ্ডবনৃত্যে যোগ দিয়াছিল কুশীনগরের পাঁচশত মল্ল! নির্জ্জন নৈশ-গগনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল মরণের কি ভয়াকুল অট্টহাস; এবং তাহারি প্রত্যুত্তরে আমাদের উপহাস।

তারপর আজ পর্য্যন্ত আমিও শত সহস্রবার দেহত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু কি আকর্ষণে জানি না, আমাকে এই মগধেই বারবার আসিতে হইয়াছে! কে যেন আমার শ্রুতিমূলে বারবার কহিতেছে,—"ঐ গৃধ্রকূট, অমিতাভ ঐ স্থানেই আবার দর্শন দিবেন"!

মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধদেবকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। উদ্ধতস্বভাব অজাতশত্রুর সে ভক্তি ছিল না। তিনি প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য একটীবার আসিলেন না। কিসে রাজ্য বৃদ্ধি হয়, কিসে লিচ্ছবীদিগকে পরাস্ত করিতে পারা যায়, রাজা সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত!

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজগৃহের উপত্যকার ঊর্দ্ধভাগে সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে গৃধ্রকূটগহ্বরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া মহাযোগী উত্তরদিকে চাহিয়াছিলেন। আমি ও আনন্দ তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম। এমন সময় অজাতশত্রুর মন্ত্রী ভাষ্যকার শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করণান্তর বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মগধরাজ জানিতে ইচ্ছা করেন যে তিনি লিচ্ছবী-দিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন কি না?" গৌতম-ঋষি জীবনে কখন রাজার মুখাপেক্ষী ছিলেন না, স্পষ্ট কহিলেন,—"যতদিন পর্য্যন্ত এই লিচ্ছবীজাতি তাহাদিগের প্রাচীন ধর্ম্মাচার পালন করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কেহ তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে না।" এই উত্তরে ভাষ্যকার অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধদেব উত্তরা-কাশ-প্রান্তে চাহিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরাও নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ! অগণন ফুলরাশি তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া নত হইল! বহুক্ষণ পরে মুনি-সম্রাট্ আমাকে দেখাইয়া কহিলেন,—"দেখ, রেণুকাপুত্র! ঐ সুদূর উত্তরে যে স্থানে তোমার জন্মস্থান পাটলী গ্রাম অবস্থিত,—যে স্থানে অজাতশত্রুর মন্ত্রীদ্বয়, ভাষ্যকার ও সুনিধ্যা, দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে,—ঐ দেখ, এই সন্ধ্যার আকাশ-প্রান্তে একটি উজ্জ্বল মুকুটাকার কিরণমণ্ডল আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল! ভবিষ্যতে ঐ গ্রাম পাটলীপুত্র নাম ধারণ করিয়া সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া পরিগণিত হইবে।" দেবতা আমার! তোমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল!

এই সেই পাটলীপুত্র,—চন্দ্রগুপ্তের, অশোকবর্দ্ধনের সাধের পাটলীপুত্র! লম্বে ৯ ক্রোশ ও প্রস্থে ৪ ক্রোশ বিস্তৃত এই মহানগরী পরিখা-প্রাচীর-গড়-তোরণ-হর্ম্ম্য-দুর্গ প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ঐ প্রাসাদ স্তূপের সংলগ্ন একটি নির্জ্জন ঘরে কৌটিল্য বাস করিতেন। ঐ যে একটি পুষ্করিণীর চিহ্ন আজিও দেখা যাইতেছে, উহারি তটদেশে একটি বিহারে পণ্ডিত মঞ্জুঘি বাস করিতেন। আমি তাঁহাকে পথে ঘাটে বাহির হইতে খুব অল্পই দেখিতাম।* নগরোপকণ্ঠে পরিখার পার্শ্বেই যবন রাজদূত মেগাস্থিনিস্ বাস করিতেন। প্রৌঢ় গ্রীক্ রাজদূতের মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়াছিল। তিনি বহুকাল এ দেশে বাস করায় একজন ভারতবাসীর মধ্যে

* এই স্থানে একটি উদ্যান ছিল। দেখিতাম বিখ্যাত জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট সমস্ত রাত্রি গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতেন।

গণ্য হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে একটি অট্টালিকায় বাস করিতেন চন্দ্রগুপ্তের যবনী রাণী হেলেনা। এই স্থানে ছিল রাজপ্রাসাদ, ঐ স্থানে ছিল দুর্গ। ঐ স্থানটার নাম ছিল "দূত পল্লী"; পারশিক, চৈনিক, রোমক, চাল্ডিয়া, মেসিডোনিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের দূতগণ ঐ স্থানে বাস করিতেন। ঐ সকল দূতেরা দোলায় চড়িয়া রাজ-দরবারে দেখা করিতে যাইতেন। চীন পরিব্রাজক "ফা হিয়ান্" যখন ভ্রমণাশায় মগধে আসিয়াছিলেন। তখন ঐ স্থানে সঙ্ঘারামে দুই বৎসর যাপন করেন। একবার মনে পড়ে যখন বাঁশের কুড়িখানি রথ সাজাইয়া, রথের উপর বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, নাগরিকগণ তাহা পথে টানিতেছিল,—সঙ্ঘরামের ৭০০ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী নাচিতে ও গাহিতেছিল,—তখন রসিক চূড়ামণি "ফাহিয়ান্" তাঁহার বৃহৎ পাজামা গুটাইয়া নগ্নপদে বৃহৎ টিকি উড়াইয়া কর্ত্তাল হস্তে রথাগ্রে নাচিতেছিল; তাহা দেখিয়া দেশের লোক হাসিয়া আকুল। রাজা বালাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার চীন ভাল, কি ভারত ভাল ?" রসিকচূড়ামণি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন "ভারতের হর্ষ, চীনে লাগে স্পর্শ !" বালাদিত্য হাসিলেন। আমার তখন দশম জন্মান্তর। আমি নালন্দায় এক তন্তুবায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তখন তাঁত বুনিতাম। আমি চিরদিন এই মগধের ধূলির তলায় গুমরি গুমরি কাঁদিতেছি; সব দেখিয়াছি, সব জানি; আমার আর মরণ নাই! "হুয়েন্থসঙ" যখন আসিতেছিল, তখন মগধের ভাঙ্গা বাসর। রাজগৃহের সে মহিমা বহু পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছিল। পাটলীপুত্রও অস্তমিত; নালন্দার বিদ্যালয়েরও ভগ্ন দশা, মহাজ্ঞানী বুদ্ধঘোষ ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। মগধ তখন বিদেশী শক রাজাদিগের অধীনে। সে সব কথা আর একদিন বলিব। তাঁহারা যেই দুই এক পাতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাই পড়িয়া তোমরা বিস্মিত হইতেছ। আমি ত্রিকালজ্ঞ, আমার কথা বিশ্বাস করিবে না? আমি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মগধের ধূলিকণায় বুক পাতিয়া রাখিয়াছি! আমি দেখিয়াছি-কত রণঝঙ্কার, কত বসন্তোৎসব, কত ধর্ম্মোৎসব, কত থেরীগাথা! আমার সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা থেরীমণি মণিমালিকা আজ কোথায়? মগধের সেই নবীন অভ্যুদয়ের দিনে, গঙ্গার নির্জ্জন উপবনে, জীবনের প্রথম বসন্তে, চারি চক্ষে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ স্ফুরিত হইয়া সারা দেহখানিকে রোমাঞ্চিত করিয়াছিল, সে প্রবাহ আর জন্ম-জন্মান্তরেও পাইলাম না!—কিন্তু সে সব কথা বলিব না। গোপন কথা গোপনেই রহুক্। নীরঞ্জনাতীরে সরলা বিভ্রমহীনা রূপসী সুজাতাকে আমি দেখিয়াছিলাম। বোধিদ্রুম তলে যখন বুদ্ধদেব একদিন যোগাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারি পদ প্রান্তে বসিয়া ভক্তিমতী রমণীর নয়ন-প্রান্ত হইতে ঝর ঝর অশ্রু ঝরিতেছিল। সে ত অশ্রু নহে,—মুক্তাধারা,—শুভ্র তুহিন-ধারা! বিম্বিসার-পত্নী, রাণী ক্ষেমঙ্করী, যেদিন বধূ সুলেখা ও সহচরী রমাকে সঙ্গে লইয়া মণি-খচিত শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক বেলুবনে আসিয়া ভগবান তথাগতের পাদপদ্মে পরমান্ন অর্পণ করিয়াছিলেন, আমি সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলাম। কালিদাস সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিলে হয়ত মগধ যুবতীর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মূর্চ্ছা যাইতেন! ছাই মালব! তথাকার যুবতীরা কি মাগধী যুবতীর রূপের কাছে লাগে? সুলেখার যৌবনশ্রী বাস্তবিকই অতুলনীয় ছিল! তেমন তপ্ত কাঞ্চনসম রূপ সরোবরের ঢল ঢল মদিরাময় নয়ন-পদ্ম দুইটির তুলনা এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! মাগধী সুন্দরীগণের—

হাতে ছিল লীলা-কমল, মাথায় ছিল সীঁথি।
উজল করি অভিসারে যেত কানন-বীথি॥
চিকণ কেশে শোভা দিত কুন্দ ফুলের থর।
লোধ্র রেণু চূর্ণ মুখে মাখিত সুন্দর॥
কেশবন্ধ মুক্তা সাথে শোভে কুরুবকে।
শিরীষ ফুলের স্নিগ্ধ মালা দুলিত অলকে॥
সীমন্তে কদম্ব ফুল, নীবিবন্ধ বাসে।
গুঞ্জরিয়া নূপুরগুলি উঠ্‌তো কলহাসে॥
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব নীপের মালা।
ধুপের ধোঁয়া স্নানের শেষে কেশে দিত বালা॥
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকৃতো সাজে।
আল্‌তা-পরা চরণ দুটি ঘুর্‌তো ঘরের কাজে॥

কুঙ্কুমেরি পত্র-লেখায় বক্ষ রৈত ঢাকা।
আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংস-মিথুন আঁকা॥
ভূর্জ্জপত্রে ধাতুরসে লিখ্‌তো প্রেমের লেখা।
আষাঢ় মাসে হবেই হবে স্বামীর সাথে দেখা॥
কাঁকনগুলি বাজ্‌তো হাতে নাচাইতে সারী।
গৃহ-ভিতে বস্‌তো এসে ময়ূর সারি সারি॥
পদ্মনিধি শঙ্খ আঁকা প্রতি ঘরের দ্বারে।
অশোক বকুল কুরুবক প্রাঙ্গণ মাঝারে॥
স্বামী যদি বিদেশ যেতো, পূজার ফুলগুলি।
গুণ্‌তে দিন, প্রতি দিনে একটি রাখতো তুলি'॥
এতই তাদের রূপের শক্তি, পায়ের পরশ দিয়ে।
অশোক গাছে ফুল ফুটোত দিত মগধবাসী প্রিয়ে॥
বকুল যদি না দিত ফুল, রাঙ্গা ঠোঁটের চুমে।
এক দণ্ডে ভাঙ্গিয়ে দিত গাছের গাঢ় ঘুমে॥

যাক্ ও কথা। আসল কথা বলি।—

একদিন ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার প্রিয় শিষ্য উপালীর সহিত বৈশালী যাইতেছিলেন। খেয়া ঘাটের পার্শ্বেই আমার কুটির। ঘাটে তখন নৌকা ছিল না। নৌকার অপেক্ষায় প্রভু আমার কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন। আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পদতলে বসিলে আমার পত্নী আসিয়া ভিক্ষুণী হইবার সাধ জানাইল। প্রভু তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। হে আমার ভগ্ন কুটিরের পূর্ণ চন্দ্র! তুমি সে দিন যে প্রেমের জলে আমার ঘরে বান ডাকিয়েছিলে, তার বেগ এই আড়াই হাজার বৎসরেও সামলাইতে পারিলাম না!

প্রভু গল্পচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,—"দেখ, রেণুকাপুত্র! একদা কাশীধামে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রচুর অর্থ, সুবৃহৎ হর্ম্ম্য, অগণিত সৈন্য-সামন্ত ছিল। ঐ সময় কোশল রাজ্যে দিঘীতি নামে একটি ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রচুর অর্থ ছিল না, বৃহৎ হর্ম্ম্য ছিল না, এবং অধিক সৈন্য ছিল না।

"পরাক্রমী রাজারা প্রায়ই দুর্ব্বল রাজার রাজ্য অপহরণ করিয়া থাকে। ব্রহ্মদত্ত তাহাই করিলেন। দিঘীতি হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া সস্ত্রীক পলাইয়া কাশীধামেই এক কুম্ভকারের গৃহে লুকাইয়া রহিলেন। তথায় তাঁহার পত্নী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল দীঘাভূ।

"এই সংবাদ কালক্রমে রাজা ব্রহ্মদত্তের শ্রবণমূলে পৌছিলে, দিঘীতি ও তাঁহার পত্নীকে ধরিয়া আনিয়া নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিবার জন্য ব্রহ্মদত্ত আদেশ প্রদান করিলেন। দীঘাভূ তখন কাশীর বাহিরে ছিল। সংবাদ পাইয়াই বধ্যভূমিতে তাহার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ছুটিল। হতভাগ্য দিঘীতি তাঁহার সন্তানকে দেখিয়াই বলিলেন "বাবা, দীঘাভূ; ঈর্ষার দ্বারা ঈর্ষার প্রতিশোধ লইবে না। প্রেমের দ্বারা ঈর্ষাকে জয় করিবে। ইহার পর দীঘাভূ বন-মধ্যে গিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল। পরদিন নগরে ফিরিয়া আসিয়া সে রাজার হস্তীশালায় মাহুতের অধীনে একটি চাকুরী গ্রহণ করিল।

"অতি প্রত্যুষে সুপ্ত নগরবাসী জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই দীঘাভূ একটি বাঁশি বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। মনোহর সঙ্গীত নিদ্রিত রাজপুরীর কক্ষগুলির মধ্যে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল। রাজা নিদ্রা হইতে জাগিয়া বংশীবাদকের সংবাদ লইলেন। বালক দীঘাভূ রাজ সন্নিধানে আনীত হইলে, রাজা তাহাকে নিজের অঙ্গসেবকরূপে পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

"একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত শিকারে বহির্গত হইলে, দীঘাভূকে সারথী হইয়া রথ চালাইতে কহিলেন। দীঘাভূর হৃদয় মধ্যে তুঁষের আগুণ জলিতেছিল; সে ইচ্ছা করিয়াই সৈন্য হইতে ছিন্ন করিয়া রাজাকে এক নির্জ্জন বনমধ্যে আনিল। রাজা পরিশ্রান্ত হইতেই নামিয়া ভূমিতে শুইয়া দীঘাভূর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন দীঘাভূ চিন্তা করিতে লাগিল "এই রাজা ব্রহ্মদত্ত আমার পিতা ও মাতাকে বধ করিয়া আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। সে আমাকে ভিখারী করিয়াছে। প্রতিশোধের এই উপযুক্ত সময়।" সে তাহার কৃপাণ কোষমুক্ত করিল। কিন্তু তখনি তাহার পিতার অন্তিম কথাগুলি তাহার শ্রবণমূলে বাজিয়া উঠিল,—"বাবা, দীঘাভূ! ঈর্ষার দ্বারা ঈর্ষার প্রতিশোধ লইবে না; প্রেমের দ্বারা ঈর্ষাকে জয় করিবে।" দীঘাভূ তৎক্ষণাৎ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বসিয়া রহিল।

"এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া রাজা সভয়ে জাগিয়া উঠিয়া বসিলে, দীঘাভু তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। রাজা প্রাণভয়ে কাঁদিয়া কহিলেন "দীঘাভু! দোহাই তোমার, আমাকে বধ করিও না।" দীঘাভু উত্তর দিল "মহারাজ! ভয় নাই। দীঘাভু তাহার পিতৃআজ্ঞা কখনো লঙ্ঘন করিবে না।"

"ব্রহ্মদত্ত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া তখনি দীঘাভুকে তাহার রাজ্য অর্থ সৈন্য সমস্তই ফিরাইয়া দিলেন। এবং সেই সঙ্গে নিজ কন্যাকে দীঘাভুর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে নিজ জামাতার পদে বরণ করিলেন।

"হে রেণুকাপুত্র! রাজারা দিবারাত্র সম্পদের প্রলোভনে বাস করিয়াও যদি প্রেমের দ্বারা বশীভূত হয়, তবে সাধারণ লোকে হইবে না কেন? হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করিতে হইলে পৃথিবী নররক্তে সিক্ত হয়; প্রেমের জয়ে রক্তস্রোত নাই।"

নৌকা আসিল, প্রভু চলিয়া গেলেন। দেবতা আমার! কি অমৃতময় কথা শুনাইলে? আমি মৎস্যজীবী ছিলাম, হিংসা করিয়া আসিয়াছি, আমার কি গতি নাই? আমার কি নির্ব্বাণ নাই? বোধ হয় নাই, নতুবা এই পাটলীগ্রামের পরিখা-প্রান্তে ধুলার মাঝে আমি আজ পর্য্যন্ত গুমরি গুমরি কাঁদিয়া মরি কেন? কত আসিল, কত গেল; কালের বন্যায় কত তৃণরাশি উঠিল, ভাসিল, ছিঁড়িল, ডুবিল, ছুটিয়া চলিয়া গেল! আমার কি মুক্তি নাই? নির্ব্বাণ নাই? প্রভু গো, এস; নির্ব্বাণের পথ দেখাইয়া দাও!

সপ্তগ্রাম

শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত

বঙ্গদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলি বিকৃত নামে বা অন্য নামে পরিচিত হওয়ায় বঙ্গের অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে এবং পাইতেছে। বৈদেশিক রেলওয়ে কোম্পানীও অনেক সময়ে অজ্ঞানতা-বশতঃ প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ স্থানের নাম সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের কথায় ভুলিয়া ষ্টেশনের নূতন নূতন নাম করণ করিয়া থাকেন।

সপ্তগ্রাম বঙ্গের প্রয়াগ তীর্থ, রাঢ়-বঙ্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌরবময় রাজধানী ও বন্দর এবং শ্রীবৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। রাজধানীর আয়তন ছয় ক্রোশব্যাপী ছিল। পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম বলিতে ত্রিবেণী, বংশবাটি, দেবানন্দপুর, শিবপুর, কৃষ্ণপুর, শঙ্খনগর, বাসুদেবপুর এই সাতটি গ্রামের সমষ্টিকে বুঝাইত। সপ্তগ্রামের পূর্ব্ব দিয়া পূত সলিলা ভাগীরথী এবং উত্তর ও পশ্চিম দিয়া পুণ্যতোয়া সরস্বতী প্রবাহিত হইত। বাণিজ্য-পোত সকল উভয় নদী দিয়া পশ্চিমের নানা দেশে গমনাগমন করিত। ত্রিবেণী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম-স্থল। সরস্বতীর অতি ক্ষীণ রেখা এখনও বর্ত্তমান। প্রাচীনকালে সপ্তগ্রাম বঙ্গের প্রধান এবং প্রথম বন্দর ছিল। হিন্দু এবং মুসলমান রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান কলিকাতার ন্যায় উচ্চশ্রেণীর রাজধানী ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকালেও সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত ছিল। কালের প্রবাহে সপ্তগ্রামের আর সে ঐশ্বর্য্য নাই, এক্ষণে জঙ্গলকীর্ণ পরিত্যক্ত শ্মশান ভূমিতে পরিণত।

Asiatic Researches vol. V, p. 278 পাঠে জানা যায় সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম) প্রাচীন রোমানদের নিকট গ্যাঞ্জেস রিজিয়া (Ganges Regia) নামে পরিচিত ছিল।

রাজা মানসিংহের সময়ে রাজস্বের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশ তিনটি সরকারে বিভক্ত ছিল যথা সপ্তগ্রাম, সুলেমানাবাদ ও মাদারণ।

Catalogue of Coins in the Indian Mu-

seum 1907 by Nelson Wright vol. II, p. 53 এবং Rodgers's List of Coins in the Lahore Museum p. 89 পাঠে জানা যায়—

সপ্তগ্রামের শাসন কর্ত্তা ইজুদ্দিনমাহিয়া আজিমল মুলকের শাসনকালে ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক Joao de Barros প্রায় ৪১৫ বৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কৃত ম্যাপে সপ্তগ্রামকে "সাতিগা" (Satiga) নামে বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন।

রামুশিও (Ramusio) লিখিয়া গিয়াছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও অর্থাৎ সপ্তগ্রাম হইতে বন্দরাদি স্থানান্তরিত হইবার পরেও সপ্তগ্রামে দশ সহস্র বাসগৃহ বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে সপ্তগ্রামে সাতশত খিলি-পানের দোকান ছিল।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, প্রভৃতি বঙ্গীয় প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্যের বিষয় বর্ণিত আছে যথা—

"তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বোলয়ে সপ্তগ্রাম॥
রাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুলোম।
দুইদিন সাধু তথা করিলা বিশ্রাম॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখমোক্ষ নানা ধন পায়॥" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

সপ্তগ্রামে বাবা নিত্যানন্দ প্রভুর অপরূপ লীলাকাহিনী—

"সপ্তগ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ সহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামের সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাই চাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
সপ্তঋষির তপস্থায় স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ধারাত্রয়॥
সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে॥" (ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ঘরণী শ্রীজাহ্নবী মাতা একদা শ্রীউদ্ধারণের শ্রীপাট ভূমিতে গমন করিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য উদ্ধারণের জন্য আকুল ভাবে ক্রন্দন করিয়া ছিলেন।

"ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে।
উদ্ধারণ দত্তের বাটিতে স্থিতি কৈল॥
উদ্ধারণ দত্তের চরিত্র সোঙরিয়া।
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া॥" (ভক্তিরত্নাকর)

ঠাকুর নরোত্তম একদা এই স্থানে আসিয়াছিলেন—

"সপ্তগ্রাম দেখি প্রণময়ে দূর হইতে"। (ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট প্রাচীনকাল হইতে এখনও বর্ত্তমান। শ্রীপাঠে প্রায় ৪১৫ বৎসর পূর্ব্বের সেই মাধবীলতা অদ্যাপিও সতেজে বিদ্যমান যাহা ১৪৩৮ শকের চৈত্রমাসের কোন একদিন শ্রীদত্তঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে পাকের দাইলের কাঠী সঞ্চালিত করা মাত্র শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া মনোমুগ্ধ-কর মাধবীলতা পুষ্পরাজী সমাকীর্ণ হইয়া পরিশোভিত হইয়াছিল। এই শ্রীপাট বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম গ্রামের মধ্যে সরস্বতীর নিকট অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে কিছু দূরে কৃষ্ণপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য বাঙ্গালার ত্যাগী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট। শ্রীপাটে শ্রীশ্রীরাধারমণ এবং শ্রীশ্রীনিতাইগৌর মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন, শ্রীল দাস গোস্বামী সে প্রস্তরে বসিয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতেন সে প্রস্তরখানি অতি যত্নে রক্ষিত এবং পূজিত হইতেছে। ইহার দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল দূরে ভেদুয়া গ্রামে শ্রীল ঝড়ুঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীপাটে শ্রীল ঝড়ুঠাকুরের পূজিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদন গোপাল বিরাজিত আছেন।

শ্রীপাটে শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কর্ত্তৃক পূজিত ষড়ভুজ মহাপ্রভুর বিগ্রহ, তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর মূর্ত্তি ও দত্ত ঠাকুরের ধাতুময়ী মূর্ত্তি পূজিত হন।

বঙ্গের ঐশ্বর্য্যশালী শ্রেষ্ঠ নগর সেই সপ্তগ্রাম আজ কোথায়? বন্দরাদি স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রাম যদিও শ্রীহীন তথাপি শ্রীশ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপাট, প্রাচীন জুম্মা মসজিদের ভগ্নাংশ (যাহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে

লর্ড কার্জ্জন ব্যবস্থা করিয়া প্রস্তর ফলকে ইতিবৃত্ত খোদিত করিয়া লাগাইয়া গিয়াছেন), রাজধানীর বন্দরের দুর্গের ভগ্নাংশ সপ্তগ্রামের অতীত গৌরবের স্মৃতিরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই পুণ্যভূমির শ্রীপাটগুলীতে প্রতি বৎসর সহস্র ভক্তমণ্ডলী তাঁহাদের ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করিতে আসিয়া থাকেন।

বিদেশীয় পর্য্যটক এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের জন সাধারণ যাঁহারা মাত্র ইতিহাস পাঠেই সপ্তগ্রামের গৌরব-কাহিনী অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই জানেন না যে ঐ প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিপূর্ণ স্থানটি কোথায়; কারণ সপ্তগ্রামের ন্যায় প্রাচীন গৌরবপূর্ণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের রেল ষ্টেশনের নাম ত্রিশবিঘা হইতে পারে ইহা স্বপ্নের অতীত।

রেল কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই ত্রিশবিঘা রেল ষ্টেশনের নাম বদলাইয়া সপ্তগ্রাম রাখেন তবে জনসাধারণের নানা প্রকার সুবিধা হইবে এবং অতি সহজেই জনসাধারণ সপ্তগ্রামের অবস্থিতি নিরূপণ করিতে পারিবেন তাহা বলা বাহুল্য। রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ত্রিশবিঘা নাম বদলাইয়া সপ্তগ্রাম নাম রাখিতে অনুরোধ করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে বলিয়াই মনে হয়। সেজন্য জনসাধারণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

ইহাও বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে যে যদি রেল কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ত্রিশবিঘা রেল ষ্টেশনের নাম বদলাইয়া সপ্তগ্রাম রাখেন তবে নিকট এবং দূরস্থান হইতে বহু পর্য্যটক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ এবং দর্শকগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌরবময় প্রাচীন স্থান দর্শন করিতে আসিবেন।

সপ্তগ্রাম—হুগলী জেলা মধ্যে অবস্থিত। ইহার রেল ষ্টেশন ত্রিশবিঘা (ই, আই, আর) হইতে সপ্তগ্রামের দর্শনীয় স্থানসমূহ আধ মাইল পশ্চিমে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের (Grand Trunk Road) ধারে অবস্থিত। হাওড়া হইতে সপ্তগ্রাম ২৭ মাইল।

তৃষ্ণা

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৫)

"পথ চল্‌তে কষ্ট হচ্ছে?"

"কৈ না!"

"তবে, পেছিয়ে পড়ছ কেন?"

তৃষ্ণা কোন উত্তর দিল না। দূরে শ্যামল বৃক্ষরাজির ঘন পল্লবের দিকে তাকাইয়া দ্রুতবেগে পথ চলিতে চেষ্টা করিল। মানুষ অনেক সময় মানসিক বলে অসাধ্যসাধনে সক্ষম, সন্দেহ নাই; কিন্তু শরীরকে বাদ দিয়া মানসিক শক্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। চলিতেছে তৃষ্ণা মানশিক শক্তির তীব্র উদ্দীপনায়—কিন্তু শরীর যে আর চলিতে চাহে না! পরিশ্রম-কাতর ক্লিষ্ট দেহ যেন এলাইয়া পড়িতেছে প্রতি পদক্ষেপে,—যেন বৃক্ষমূলে একটু শয়ন করিতে পারিলেই তাহার শরীরের গ্লানি দূর হয়; আবার নবীন তেজ, নবীন উৎসাহ জাগিয়া উঠে হৃদয়ের শিরা-উপশিরায়।

শীলভদ্র তাহা উপলব্ধি করিয়া বলিল,—"তৃষ্ণা, তুমি মুখে যাই বল, তোমার শরীর আর চল্‌তে পার্‌ছে না—তা আমি বুঝেছি। ঐ দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে;

ঐ খানে গিয়েই আজ বিশ্রাম কর্ব্ব। আর যাবনা। এই পথটুকু তুমি আমার হাতের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চল।"

শীলভদ্রের অনুজ্ঞাক্রমে তৃষ্ণা শীলভদ্রের হাত ধরিয়া ও কখনও কখনও শীলভদ্রের হস্তে ও অংসে ভর দিয়া চলিতে লাগিল। এই স্পর্শে উভয়ের প্রাণের মধ্যে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল! জন্মজন্মান্তরের সুখ-স্মৃতি যেন বর্ষা-সমাগমে সুপ্ত বীজের অঙ্কুরের মত জাগিয়া উঠিল—এ স্পর্শ ই যেন উভয়ে কতদিন ধরিয়া হৃদয়ের গোপন গুহায় কামনা করিয়া আসিয়াছে—শীলভদ্রের হস্তে নির্ভরশীলা তৃষ্ণা—ভুলিয়া যাইতে লাগিল ক্রমশঃ তাহার নিজের সত্ত্বা; মনে হইতে লাগিল তাহার ভগবান্ যেমন জীবজগতের একমাত্র আশ্রয়-স্থল সম্পদে বিপদে, সীমাহারা দেশ ও কালের ব্যাপ্তির মধ্যে, শীলভদ্রও তেমনি এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে তাহার একমাত্র আশ্রয়।

পথ চলিতে চলিতে তৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল—"পাপ-পুণ্যের স্বরূপ কি?"

শীলভদ্র উত্তর করিল—"দেখ সাধারণতঃ যাকে আমরা পাপপুণ্য বলে থাকি তা' নির্ভর করে মানবের সংস্কারের উপর, আচার-ব্যবহারের উপর, সমাজগত পার্থক্যের উপর। যা হয়ত তোমার সংস্কার অনুসারে পাপ, হয়ত তা পৃথিবীর অপর পারে অবস্থিত অন্য সমাজের লোকের নিকট পুণ্য, কাজেই পৃথিবীর সমস্ত লোকের জন্য সাধারণ কোন পাপপুণ্য নির্দ্দেশ করা চলে না। তবে আমার মনে হয়, যে কাজ ভয়, শঙ্কা, সঙ্কোচ নিয়ে আসে, তাই পাপ, আর যা হৃদয়কে প্রফুল্ল করে রবিকরস্পর্শে শতদলের মত তাই পুণ্য।"

"মানবীয় প্রেমের কি কোন মূল্য নেই?"

"কোন মূল্য নেই, তা কি করে বলি? কারণ বাস্তবিক যদি মানবীয় প্রেমের কোন মূল্য না থাক্‌ত, তবে সংসারে তার উদ্ভবই হ'ত না। অবশ্য ভগবান্ বুদ্ধদেব মানবীয় প্রেমের দিক্‌টা একরূপ চাপা দিয়েই গেছেন—তিনি দেখেছেন জগতের বৈষম্য-কোলাহলের অভ্যন্তরে এক বিরাট্ দুঃখ-প্রবাহ—ক্ষণভঙ্গবাদের সত্যই তাঁর নিকট খুব বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল; আর তিনি সেই পথেই নির্ব্বাণের দিক্ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, মানবীয় প্রেমকে তুচ্ছ করা চলে না।"

"তবে কেন তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? আমার এ অনন্ত হৃদয়ভরা প্রেমরাশি—এ কি শুধু নিরর্থক?"

"ভুল বুঝেছ তৃষ্ণা; মানবীয় প্রেম গৃহস্থের জন্য; তা নৈলে যে সংসারধর্ম্ম লুপ্ত হয়ে যাবে; কিন্তু সন্ন্যাসীর, ভিক্ষুর পথ স্বতন্ত্র—তাদের জীবন হবে এক অনন্ত অফুরন্ত ধ্যানের প্রবাহ, সীমাহারা নীলাম্বুধির মত হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবে সমগ্র সত্ত্বার অবিরাম প্রবাহ-লীলা! ক্ষুদ্র তার হৃদয় পূর্ণ কর্ত্তে পার্ব্বে কেন?—সেই জন্যই ত ভগবান্ বুদ্ধদেব গোপার প্রেম পরিহার করে জগৎকে শিখিয়ে গেলেন—খণ্ড প্রেমে ডুবে থাক্‌লে অখণ্ড প্রেম মিলবে না; হ'তে পারে খণ্ডপ্রেম একটা সোপান, কিন্তু একটা সোপান নিয়েই যদি জীবন কেটে যায়, তবে, অম্বরস্পর্শী অট্টালিকার তুঙ্গ-শীর্ষে আরোহণ ত সম্ভব হবে না। বুঝলে?"

"তোমার এ যুক্তি সমীচীন বলে মনে হচ্ছে না, কারণ অখণ্ড যদি খণ্ডকে বাদই দিলে, খণ্ড বা অংশ যদি পূর্ণের বাইরেই রইল, তবে তোমার অখণ্ড হ'ল কি করে? তিনিও ত একটা বৃহত্তর খণ্ড মাত্র!"

"ঐ বুঝতে পারলে না। অখণ্ড খণ্ডকে বাদ দেবে কেন? খণ্ডকে নিজের বৃহত্তর পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। যেমন কমলালেবুর প্রত্যেকটি কোষ স্বতন্ত্র; কিন্তু কোষগুলিকে যদি বাদই দিলে, তবে কমলালেবুর কমলা-লেবুত্বই ত নষ্ট হয়ে গেল; ঐ বৃহত্তর বেষ্টনীর মধ্যে থেকে কমলালেবু যেমন করে কোষগুলিকে স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তি বলে একত্র গ্রথিত করে রেখেছে, অখণ্ড তেমনি খণ্ডকে অন্তর্নিহিত করেই অখণ্ড, বাদ দিয়ে অখণ্ড নয়। এই জীবজগত নিয়েই যে তার লীলা-প্রবাহ বয়ে চলেছে অনন্ত দেশকালের বিপুল বিস্তৃতির মাঝখানে, নৈলে কে তাঁকে খুঁজবে? পাহাড়ের উপরে উঠতে গেলে প্রত্যেক ধাপটি যেমন স্বীয় স্থানে উপযোগী, সেই ধাপটিকে বাদ দিলে যেমন রোহণীর সার্থকতা নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি এ জগৎ-প্রপঞ্চের ক্ষুদ্র বালুকা-কণা থেকে আরম্ভ করে অগণিত

সৌরমণ্ডল পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধের বোধিসত্ত্বের অন্তর্নিহিত—কেউ বাদ যাবে না।”

“তাহলে আমার এ ক্ষুদ্র খণ্ড ভালবাসা কি তার পায়ে গিয়ে পৌঁছাবে?”

শীলভদ্র কোন উত্তর করিল না। দূরে গ্রামপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চলিতে লাগিল! তৃষ্ণার প্রশ্নে তাহার মনে একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল, একটা সংশয়ের তমোজাল মানস জগতে আধিপত্যলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল,—মানুষের ভালবাসার মধ্য দিয়াই কি ভগবানে উপনীত হওয়া যায় না? অস্ফুটস্বরে ‘গুরুদেব’ বলিয়া শীলভদ্র তৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাইল। স্বেদবিন্দুবিজড়িত ম্লান মুখচ্ছবি সন্ধ্যা সমাগমে বৃষ্টিধারা-সিক্ত স্থলকমলিনীর মত প্রতীয়মান হইল। তাহা দেখিয়া শীলভদ্রের মনে হইল কি গভীর বিশ্বাস তৃষ্ণার! কি একাগ্র নির্ভরতা; সত্যই ত তৃষ্ণাকে ভালবাসিয়া, তৃষ্ণার মুখচ্ছবি বিশ্ব-বিশালের প্রত্যেক বস্তুতে নিরীক্ষণ করিয়া, কি ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে লাভ করা যায় না?—কে বলিয়া দিবে সত্য কি? কে দেখাইয়া দিবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কোন পথে মুক্তি অনায়াস লভ্য, নির্ব্বাণ করামলকবৎ মুষ্টিগত? যুগ-যুগান্তর কাল-চক্রের অবিরাম ঘূর্ণনে অতীতের কুক্ষিগত হইয়া অদৃশ্য হইবে, কিন্তু মানব মনের এ হাহাকার, এ শাশ্বতী তৃষ্ণা বুঝি কোন দিন মিটিবে না! শুধু খণ্ডের ক্ষুদ্র বেষ্টনী এ তৃষ্ণার খণ্ড বারিধারা যোগাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে, আর যে উদ্দাম বাসনার তীব্র লালসা মানবের বুকের মাঝে প্রজ্বলিত চিতার মত লোল রসনা বিস্তার করিয়া হুঙ্কারে দশ দিশি প্রকম্পিত করিতেছে, সে কেবল পড়িয়া থাকিবে তাহারই অন্তর্নিহিত জ্বালার তীব্র বেদনায় জ্বলিতে জ্বলিতে, অনাহূত অতিথির মত, সঙ্গীহারা পথিকের মত, অমানিশার অন্ধকারময় ছায়ার মত; মানব মনের এ দাবানল কে নির্ব্বাপিত করিবে? কে বলিয়া দিবে কোন গুপ্ত সাগরের অনন্ত জলরাশি বিশ্বের সুষমা-বিনষ্টকারী এ দাহ, এ উত্তপ্ত যৌন গলিত ধাতুনিস্রাব শান্তির অমিয় জলে সিক্ত করিয়া দিবে? একদিকে কঠোরতার মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি—নির্ব্বাণের গরীয়সী আলোকমালা; অপর দিকে স্নিগ্ধতার কমনীয়তার উজ্জ্বল নিদর্শন—আসক্তির মহীয়সী বন্ধন-ছায়া! এই দুই বৈষম্যের মাঝখানে, এই পরস্পর বিরোধী ভাব-সমষ্টির মধ্যস্থলে এমন কি কিছুই নাই যাহাতে এ বিশাল জল-প্রপাতের উপর সেতুবন্ধ রচনা করিতে পারে, বৈষম্য তিরোহিত করিয়া সাম্যের সমুজ্জ্বল ছবি ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়? কে বলিবে?

গ্রামপ্রান্তে উপস্থিত হইতেই উভয়কে দেখিয়া গ্রামবাসী নরনারী ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সকলে বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে উভয়কে দেখিতে লাগিল। একটি বৃদ্ধা তৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিল—“তোমার এ কচি বয়সে কি ভিক্ষুণী হওয়া সাজে? কোলে একটি ছেলে হলেই তোমাকে মানাত ভাল।”

তৃষ্ণা কোন উত্তর করিল না, শীলভদ্র বলিল,—“আজ রাতটা আমরা এ গ্রামে থাক্‌ব; এখানে কি কোন সন্ন্যাসীর মঠ আছে?”

একজন প্রৌঢ় উত্তর করিল—“না, এখানে মঠ নেই, তবে আপনারা যদি আজ আমার পর্ণকুটিরে রাত্রি বাস করেন, তবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে কর্‌ব।”

শীলভদ্র সম্মত হইলে, সেই প্রৌঢ় লোকটি উভয়কে পথ দেখাইয়া গ্রাম-পথে অগ্রসর হইল।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল। শীলভদ্র কোন কিছু না বলিয়া দূরে চন্দ্রালোকোজ্জ্বল নিশীথিনীর নিবিড়তায় ধ্যানপথে কোন অজানা লোকের গুপ্ত রহস্যের সন্ধানে ফিরিতেছিল। অদূরে ধূলি-শয্যায় তৃষ্ণা নিদ্রিতা; মুখে আসিয়া পড়িয়াছে জ্যোৎস্নার শুভ্র রশ্মি। তাহা দেখিয়া শীলভদ্র ভাবিল, মানব জীবনের কি পরিবর্ত্তন! হয়ত যে তৃষ্ণা সুকোমল শয্যায়ও বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছে, আজ ধূলি-শয্যায় সে তৃষ্ণা কি সুখে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মুখে কোন ক্লান্তির চিহ্ন নাই, উদ্বেগের ছায়া নাই;—কি শান্ত মুখচ্ছবি!

মানব জীবনের মধ্যে ভগবানের কি লীলাই প্রকটিত!—কত জীবনের মধ্য দিয়া, কত মানস জগতের ভিতর দিয়া এ লীলা-বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিতেছে—পলে পলে। কিন্তু

কি এ লীলা রহস্য ? কোন যুগযুগান্তরে চলিয়া পড়িবে রহস্যের স্তিমির-সিন্ধু-জলে এ জাগতিক সৃষ্টি! কে বলিবে?

সৃষ্টির অসীম রহস্যের কলা-কৌশল কি ভাবে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বালুকাকণাটির পর্য্যন্ত গতি-পথ নির্ণয় করিয়া দেয়, কি মহান্ কৌশলে স্তরে স্তরে বিশ্বজগতের বস্তুরাজি সজ্জিত —কি অভিনব জ্ঞান-প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে মানব মনের মধ্য দিয়া—কি অপূর্ব্ব ক্রম-বিকাশ!

শীলভদ্রের জীবন-পথে একটা নবীন ভাবের বন্যা ছুটিয়া চলিয়াছে। ভিক্ষু শীলভদ্র সে বন্যার গতিবেগ রোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহার জীবনব্যাপী সংযম-বাঁধ ধসিয়া খসিয়া পড়িতেছে—প্রতি পলকে তাহার মনে হইতেছে দূর হয়ে যাক সাধনার কঠোরতা, সংযমের শুচিশুভ্র বন্ধন,—তৃপ্ত হোক তাহার অতৃপ্ত তৃষিত আত্মা তৃষ্ণার লোভনীয় প্রেম-বারিরাশি পান করিয়া, ভুলিয়া যাক্ নির্ব্বাণের শাশ্বতী অনির্ব্বচনীয় মাধুরী তৃষ্ণার লোক বিমোহন সৌন্দর্য্য-পারাবারে অনন্ত কালের তরে, লুপ্ত হোক সৌর-করোজ্জ্বল ধরণীর শ্যামায়মান সুষমার অপূর্ব্ব বিকাশে ললিত চেষ্টা-রাগের পার্থিব মূর্ত্তি কোন মহা প্রলয়ের বিরাট্ প্লাবনের ভৈরব কল্লোলে—আর তার মাঝে জাগিয়া যাক প্রভাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ জগতের বুকে যেমন করিয়া জাগিয়া থাকে অত্যুজ্জ্বল শুক্রতারা অন্তহারা নীলিমার মাঝখানে ঠিক তেমনিভাবে তৃষ্ণা ও শীলভদ্র, যেমন জাগিয়া থাকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইবার প্রাক্‌কালে শান্ত নদী-তীরে চক্রবাক্ চক্রবাকী নিবিড় মিলনের আলিঙ্গনে, তৃষ্ণা ও শীলভদ্র ঠিক সেইরূপ মিলনে এক হইয়া যাক্; যেমন জাগিয়া উঠে সৃষ্টির প্রথম বিকাশের পূর্ব্ব রাগে পুরুষের সান্নিধ্যে সাংখ্যের পরা প্রকৃতি অনন্ত সুপ্ত কার্য্যকরী শক্তির বিরাট্ স্পন্দনে পুরুষের মুক্তি কামনায়, ঠিক তেমনি জাগিয়া উঠুক শীলভদ্রের সাহচর্য্যে তৃষ্ণার প্রেম-পুলকিত অন্তর মাঝে বিপুল ভাব-মন্দাকিনী উচ্ছল তরঙ্গ-ভঙ্গে, আর তাহারই অণুকণা ছড়াইয়া পড়ুক নৈশাকাশের অনন্ত ব্যাপ্তির মাঝে, লোধ্র কুসুমের পরাগদলে, বনস্পতির শাখা-বাহু-পল্লবের শ্যামলিমায়, জ্যোতির্লতার ললিত অঙ্গ-রাগে। চিন্তার অন্তহীন আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া শীলভদ্র বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিল।

প্রভাতের বিহগ-কাকলীর সাদর আহ্বানে, বিস্তৃত বনস্থলীর মধ্য দিয়া তৃষ্ণা ও শীলভদ্র ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত নারীবিহারের দিকে যাত্রা করিল। মধ্যাহ্নের দিক্‌দাহকারী প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে উভয়ে এক নির্ঝরিণীর তীরে বিশ্রাম করিয়াছিল। শীলভদ্র বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়াছিল; তাহাতেই উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল। এবার প্রকৃতই তৃষ্ণার পক্ষে কৃচ্ছ্র তার আরম্ভ হইল।

নারী বিহারের কর্ত্রী ভিক্ষুণী সুমনা শীলভদ্র ও তৃষ্ণাকে নারী-বিহারের দ্বারদেশে উপনীত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সুমনা শীলভদ্রের গুরু-ভগ্নি,—রাধাগুপ্তের শিষ্যা, এবং নারীদের ভিতরে সমধিক উন্নতিশীলা বলিয়া জীব-জগতে পরিচিতা। সুমনা বাল-ব্রহ্মচারিণী; কুমারী অবস্থাতেই রাধাগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সাধনায় নিযুক্তা; বর্ত্তমানে সুমনার শিক্ষায় নারী বিহার একটা আদর্শ ভজনাগারে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তবে এ বিহারের নিয়মাবলী অত্যন্ত কঠোর—এখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই; কেবল গুরু রাধাগুপ্ত যে কোন সময়ে প্রবেশ করিতে পারেন। যদি কখনো কোন ভিক্ষু পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া আশ্রয় চায়, তবে তাহাকে বহির্দ্দেশস্থিত অতিথিশালায় আশ্রয় দেওয়া হয় এবং সুমনা নিজে তাহার আহার্য্য প্রদান করিয়া থাকে। অন্য কোন ভিক্ষুণীকে কোন পুরুষের সঙ্গে—হোক্ সে ভিক্ষু—আলাপ পর্য্যন্ত করিতে দেওয়া হয় না।

সুমনা অগ্রবর্ত্তী হইয়া ফটকের দ্বারদেশে সমাগত শীলভদ্রকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। শীলভদ্রকে সুমনা দেখে নাই, কিন্তু রাধাগুপ্তের নিকট শীলভদ্রের সাধনার কথা শুনিয়াছে এবং সেই জন্য মনে মনে সুমনার শীলভদ্রের উপর একটা শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখা দিয়াছিল। শীলভদ্র স্বীয় পরিচয় প্রদান করিতেই সুমনা শীলভদ্রের চরণে লুটাইয়া পড়িল। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল—"আজ আমার মহা সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন হল। গুরুদেবের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি—আপনার সাধনায়

কঠোরতার উল্লেখ করে গুরুদেব আমাদের কত উপদেশ দিতেন। বিশেষতঃ মারের কঠোর প্রলোভন পরাজিত করে, আপনি ভগবান্ বোধিসত্ত্বের বিশেষ কৃপা অর্জ্জন করেছেন। আসুন ভিতরে।"

শীলভদ্র ও তৃষ্ণা সুমনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যদিয়া বহিঃ প্রকোষ্ঠে উপনীত হইল। উভয়কে বসিবার আসন দিয়া সুমনা জিজ্ঞাসা করিল—"এ কে ?"

শীলভদ্র উত্তর করিল—"নর্ত্তকী তৃষ্ণা, ভগবান্ বোধিসত্ত্বের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে বলে পাটলীপুত্র থেকে আমার সঙ্গে এসেছে। কাজেই একে তোমাদের কাছে রেখে অষ্টমার্গের পথ দেখিয়ে দিয়ে ধ্যানে নিযুক্ত কর। আর দেখো, তুমি নিজে এর একটু তত্ত্বাবধান করবে। মন বড়ই চঞ্চল; বিশেষতঃ এতদিন বিলাস-বৈভবের মাঝখানে, ঐশ্বর্য্যের উন্নত শিখরে জীবন কাটিয়ে এসেছে, কাজেই সহজে হয়ত মন স্থির করতে সমর্থ হবে না; কিন্তু তাই বলে যেন হাল ছেড়ে দিও না। যেমন করে পার, যত দিনে হোক, যেন ভগবান্ বোধিসত্ত্বের উপর এর চিত্ত সমাহিত হয়, এ চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে। সংসারের পঙ্কিল আবর্ত্তের মাঝখান থেকে তুলে এনেছি, এখন তাকে মুক্তির পথ দেখাবার ভার তোমার উপর রইল।"

সুমনা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং তৃষ্ণাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। তৃষ্ণা উঠিল না। নীরবে চিত্রিত দীপশিখার মত, কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত, অচল স্থাণুর মত বসিয়া রহিল। গণ্ড বহিয়া অবিরাম অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল। সুমনা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শীলভদ্রের দিকে তাকাইল।

তৃষ্ণার মনে হইল—কি কুক্ষণে, অশুভ লগ্নে সে নর্ত্তকী-রূপে রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল—তাই আজ তাহার হৃদয়-দেবতাও তাহাকে নর্ত্তকী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল! ধিক্ তাহার জীবনে, ধিক্ তাহার প্রাণধারণে! কি করিলে এ কলঙ্ক মুছিয়া ফেলা যায়? একবার মনে হইল—যাক্, যখন জীবন নৈরাশ্যের সিন্ধুজলে ভাসিয়া চলিয়াছে, সিদ্ধি করতলগত হইয়াও যখন শ্রীবৎসের পোড়া শৈল মাছের মত কঠোর স্পর্শে দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছে, তখন সে প্রাণপণে ভগবানের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে—ভিক্ষুণীদের মত বিশ্ব-রহস্যের অন্তরালে অবস্থিত ভগবান্ বোধিসত্ত্বের অপার করুণা উপলব্ধি করিবে হৃদয়ের শিরা-উপশিরায়, দেহের প্রত্যেক রক্ত বিন্দুতে। আবার পরক্ষণে শীলভদ্রের দিকে তাকাইতেই তাহার সুপ্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিল—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তিমতী রাক্ষসী লোলরসনা বিস্তার করিয়া সম্মুখে আবির্ভূত হইল!—আর তৃষ্ণা নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ভাববন্যা নয়নপথে বহিয়া চলিল।"

শীলভদ্র তৃষ্ণার মাথায় হাত দিয়া বলিল—"যাও তৃষ্ণা, আজ হ'তে তোমার নবজীবনের উন্মেষ। বিহার কর্ত্রীর আদেশমত চলবে। তোমার যা কিছু অভাব-অভিযোগ এঁকে খুলে বলবে। ধ্যানমার্গের রীতিনীতি ইনিই তোমাকে দেখিয়ে দেবেন। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ভগবান্ বোধিসত্ত্বের অপার কৃপাগুণে নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হও।"

তৃষ্ণা শীলভদ্রের আদেশ অবহেলা করিল না। উঠিয়া সুমনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কিন্তু নিশীথান্ধকারে সঞ্চারিণী দীপশিখা চলিয়া গেলে পথিপার্শ্ববর্ত্তী গৃহাবলী যেমন তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তৃষ্ণা চলিয়া যাইতে শীলভদ্রের অন্তরও তেমনি মসীআস্তরণে আস্তৃত হইয়া গেল। এই কয়েকদিন তৃষ্ণার সাহচর্য্যে যে আনন্দ, যে প্রফুল্লতা শীলভদ্র অনুভব করিয়াছে, সব যেন মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল—একটা ঘন কালিমার বিষাদময়ী ছায়া জীবচরাচরে ছড়াইয়া পড়িল।

পরদিন যখন শীলভদ্র নারীবিহার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন তৃষ্ণা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"আমাকে নিয়ে চল তোমার সঙ্গে। এখানে আমার মন টিকৃচে না।"

শীলভদ্র উত্তর করিল—"তা হয় না তৃষ্ণা, এখন নূতন পথ বলে একটু কষ্ট হচ্ছে, পরে সব ভুলে যাবে—কোন ভয় নেই।"

শীলভদ্রের পদতলে প্রণাম করিয়া তৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াই-তেই শীলভদ্র তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। তারপর করুণ নেত্রে তৃষ্ণার অশ্রুসজল ম্লান

মুখচ্ছবির দিকে তাকাইয়া নারীবিহার ত্যাগ করিল। তৃষ্ণা একদৃষ্টে শীলভদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল। অশ্রুজলে তাহার রক্তাভ কপোল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

(১৬)

তৃষ্ণার মহানিষ্ক্রামণের তিন দিন পরে দেবদত্ত তৃষ্ণার বাড়ী উপস্থিত হইল। জানিত দেবদত্ত তৃষ্ণা চলিয়া যাইবে, ফেলিয়া রাখিয়া জীর্ণ বস্ত্রের মত ধন জন সুখৈশ্বর্য্য, হৃদয়ের উদ্দাম আবেগে, নিরুদ্ধগতি তটিনীর বাঁধ-ভাঙ্গা জল-স্রোতের মত, কাবেরীর বিপুল জল-প্রপাতের মত; জানিত দেবদত্ত তৃষ্ণার হৃদয়ে কোন রেখা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহার ভালবাসা, তাহার প্রেম-মণ্ডিত ঐশ্বর্য্যের দান। তথাপি যদি কোন কারণে, কোন দৈব ঘটনার অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ তৃষ্ণার পাটলীপুত্র ত্যাগ না হইয়া থাকে, যদি তৃষ্ণা অবস্থানই করিয়া থাকে তাহা দেখিবার জন্য দেবদত্তের এ আগমন।

দেবদত্ত দেখিল ফটকের দ্বার মুক্ত; দ্বারবানহীন শূন্য কক্ষ মুক্ত বাতাসের লীলাস্থলে পরিণত। একটা স্তব্ধতা যেন জনহীন শ্মশানের ধূলিমুষ্টির মত বিরাজিত; কক্ষে কক্ষে মৌন নীরবতা দেবদত্তের হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যার আকাশে রবিকর-লেখার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন একটি করিয়া নক্ষত্র ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, আজ দেবদত্তের মানস-যবনিকার উপর চিন্তার আলোক-সম্পাতে তৃষ্ণার অদর্শনে স্মৃতির চিত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রবাসী যদি গৃহে ফিরিয়া দেখে স্ত্রী মৃতা, তবে তাহার মনে যেমন শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে, ঠিক তেমনি দেবদত্তের মনের কোণে তুষানল জ্বলিয়া উঠিল।

নব যৌবনের প্রথম প্রভাতে রূপসী নর্ত্তকী তৃষ্ণার সঙ্গে তাহার পরিচয়; যখন সমগ্র হৃদয় নারীর রূপে বিশ্ব সৌন্দর্য্য অনুভব করে; যখন কুসুমপুঞ্জের অপরূপ লাবণ্য ধারা, চন্দ্রালোকের দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুর্য্য, অনন্ত সিন্ধুর গভীরতা, তটিনীর কলোচ্ছ্বাস মূর্ত্ত হইয়া উঠে একটা নারীর অঙ্গে অঙ্গে; নারীর স্পর্শ যখন পৃথিবীর বাস্তব পদার্থের আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া একটি কমনীয় স্বচ্ছ রূপজাল বিস্তার করে, স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের মত, সেই যৌবনে দেখিল দেবদত্ত তৃষ্ণার মধ্যে বিশ্ব-সুষমার একত্র সম্মিলন, নর্ত্তন-ভঙ্গে অপরূপ মাধুরী, কণ্ঠস্বরে স্বর্গীয় ধ্বনি—যার তুলনা নাই, উপমা নাই, সমজাতীয় কিছুই নাই; মুগ্ধ, আত্মহারা হইল দেবদত্ত, বিলাইয়া দিল আপনাকে তৃষ্ণার চরণতলে।

ফুটিয়া উঠিল মানস তরুর অঙ্গে অঙ্গে শাখায় শাখায় সিদ্ধির অরূপ কুসুম। ধন্য হইল তাহার জীবন লাভ করিয়া তৃষ্ণার স্পর্শ। কিন্তু, দেখিল, বুঝিল দেবদত্ত,—যে ভাল-বাসা নারীর প্রাণের পরতে পরতে পুরুষের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখে, পুরুষের সুখের জন্য, তৃপ্তির জন্য অনলে ঝম্প প্রদানেও কুণ্ঠিত নয়; যে ভালবাসায় আপনাকে বিলাইয়া দিয়াই নারী সুখী,—সে ভালবাসা যেন দেবদত্ত তৃষ্ণার মধ্যে পাইল না। তৃষ্ণা যেন উদাসিনী—যেন তাহার দেহের ভোগবিলাসের সঙ্গে মনের কোন যোগ নাই; যেন সে ভূতাবিষ্টের মত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিলেও, মনের উপর কিছুরই দাগ পড়িতেছে না,—প্রস্তরখণ্ডে জলরেখার মত দেবদত্তের ভালবাসা, আদর, সোহাগ, মান, অভিমান পলকে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। সন্তানবতী জননী যেমন পুত্রের দিকে মন রাখিয়া গৃহকার্য্য সম্পন্ন করে, তৃষ্ণাও তেমনি যেন কোন অলক্ষ্য-লক্ষ্যে মনোনিবেশ করিয়া এতদিন জীবন অতিবাহিত করিয়াছে।

মনে পড়িতে লাগিল দেবদত্তের কোন দূর অতীতের কথা,—ঐ স্থানে তৃষ্ণা বিস্ফারিত নয়নে পথপানে তাকাইয়া ছিল, দেবদত্ত পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া তৃষ্ণার চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিল; পরে হাত ছাড়াইয়া তৃষ্ণা তাহার আয়ত নয়নের করুণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টি দেবদত্তের মুখের উপর ন্যস্ত করিল; হাসিল না, পরিহাস করিল না, মাত্র ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে তাকাইয়া রহিল! সেই দিন বুঝিয়াছিল দেবদত্ত যেন তৃষ্ণার প্রাণের কোথায় কি একটা মহীয়সী বেদনা অন্তঃ সলিলা ফল্গুর মত নীরবে বহিয়া চলিয়াছে, আর তাহার জ্বালায় উন্মনা হইয়া সে জীবনের দিন কাটাইতেছে।

তারপর, ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে, চপল হাস্য-কোলাহলের ভিতরে, লক্ষ লক্ষ দর্শকের প্রশংসমান নয়নের পুরোভাগে পাদ-প্রদীপের অত্যুজ্জ্বল আলোকের দীপ্ত আভায় উজ্জ্বলিত

নৃত্যের মধ্যে যেন কখন সে উন্মনা হইয়া পড়িত, হয়ত হঠাৎ তাল ভঙ্গ হইত, কিন্তু দর্শকগণ তাহা ধরিতে পারিত না—সে বেসুরা কণ্ঠধ্বনি, ভগ্নতাল নূপুর শিঞ্জন দেবদত্তের কর্ণে ধ্বনিত হইত যেন তৃষ্ণার বুকফাটা মর্ম্মভেদী হাহাকারের মত! যেন বলিত সে হাহাকারে মৌন ভাষায়—"ওগো তোমরা দেখছ আমার মাঝে এ রূপের ছায়া, কিন্তু দেখে যাও আমার এ শ্মশানসদৃশ মরু-হৃদয়—এক বিন্দু স্নেহের কাঙ্গাল, একবিন্দু প্রেমের কাঙ্গাল, যেমন উষর মরু প্রান্তর ব্যাকুল আগ্রহে সীমাহীন নভোনীলিমার দিকে তাকাইয়া বলে—ওগো দাও এ পোড়া বুকে একফোঁটা জল! তোমরা সবাই দেখিতে আইস আমার এ রূপ, এ নৃত্য-চপল চরণ-ভঙ্গী; শুনিয়া যাও—আমার কণ্ঠস্বর, লোভনীয়, মনোরম; কিন্তু এ বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যভাগে প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ লোকারণ্যের অভ্যন্তরে এমন কি কেহই নাই, যে বুঝিবে আমার মর্ম্মব্যথা, মুছাইয়া দিবে আমার তপ্ত অশ্রু, প্রশমিত করিবে যত দীর্ণ হৃদয়ের জ্বালা চন্দন-প্রলেপে?—কৈ? এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কাহাকেও ত পাইলাম না—যে বুঝিবে আমার মনের ভাব, যেমন বসন্তের পুলক শিহরণে কুসুমপুঞ্জের মর্ম্মব্যথা অনুভব করিয়া ডাকিয়া উঠে কোকিল কম্পিত করিয়া তৃণবীথি, চঞ্চল করিয়া নবোঢ়া গৃহস্থ বধূর সুপ্ত প্রেমরাশি, ভাঙ্গিয়া দিয়া সুখনিদ্রা মধ্যাহ্নের পাদপ ছায়ায় সুপ্ত রাখাল বালকের, জাগাইয়া দিয়া গূঢ় ব্যথা বিরহি-বিরহিনীর হৃদয়ে হৃদয়ে; এমন কি কেহই নাই—আমার মর্ম্মব্যথা, এ প্রতপ্ত অনলধারা হৃদয়ের স্তরে অনুভব করিয়া তাহার প্রশমনের ব্যবস্থা করে!"

এইরূপে দেবদত্ত প্রত্যেক স্থানে, অলিন্দে, বাতায়নে, উদ্যানে, বাপীতটে, দূর্ব্বাদল-খচিত প্রাঙ্গণ-তলে,—সর্ব্বত্রই যেন তৃষ্ণার মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। দেবদত্তের মনে হইতে লাগিল ঐ বুঝি তৃষ্ণা অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় শয্যার উপরে বর্ত্তমান; ঐ বুঝি স্নানাগার হইতে সিক্ত বস্ত্রে এলায়িত কেশে শীকর-বিন্দু লিপ্ত করিয়া বহির্গত হইতেছে মূর্ত্তিমতী দেবী প্রতিমার মত, যেমন ধ্যান-সমাহিত নেত্র সৃষ্টিকর্ত্তার নয়ন-সম্মুখে সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে তমোরাশি বিদূরিত করিয়া অলোকরূপ-জালে হাসিয়া উঠিয়াছিল দিব্যপ্রভা-বিলসিনী উৎফুল্লা গৈরিকবসনা ঊষা।

আবার পরক্ষণে বাস্তব জগতের শূন্যতা আসিয়া দেবদত্তের হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে, দুঃখাবেগে হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে, বঙ্গ-পল্লীতে দশমী দিবসে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া গৃহী যেমন শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ দর্শনে দুঃখ অনুভব করে—একটা শূন্যতার বিরাট্ ছায়া তাহার হৃদয়কে অভিভূত করে।

মায়ামুগ্ধ শ্রবণমূলে দেবদত্তের যেন ধ্বনিত হইতেছে—ঐ কক্ষান্তরে তৃষ্ণা পরিচারিকাকে কি আদেশ করিতেছে—কি মধুর সে কণ্ঠস্বর! অমনি ছুটিয়া দেবদত্ত সেই কক্ষে উপনীত হইতেছে কিন্তু একটা নৈরাশ্য, একটা ব্যর্থতা তাহাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বিদ্রূপ করিয়া সরিয়া পড়িতেছে।

বাপীতটে উপনীত হইয়া শীলভদ্রের মনে পড়িল—এক শরতের সন্ধ্যায় মর্ম্মর-মণ্ডিত সোপান-চত্বরে উপবিষ্টা তৃষ্ণার কোলে মাথা রাখিয়া দেবদত্ত শয়ন করিয়াছিল, আর তৃষ্ণা কোমল করে তাহার মস্তকের কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছিল—শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তৃষ্ণার গৌর বপুতে;—আজ কোথায় সে দিন—কত সুন্দর—কত সুদূর! আজ ত তেমনি করিয়া তৃষ্ণাকে সে পাইবে না, তেমনি করিয়া তৃষ্ণার কমনীয় অঙ্কে শীর্ষদেশ রাখিয়া শয়ন করিবে না! কি হইল আজ তাহার জীবন-নাট্যে! এ কি প্রহেলিকা! এ কি মায়া-প্রপঞ্চ! সুখ-নাটিকার অভিনয়ে উত্তোলিত যবনিকা মধ্যপথে নিপতিত হইল—ঘনাইয়া আসিল ললাটে এক মসীময় ছায়া—ঘন অন্ধকার!

কি হইবে? তৃষ্ণাকে ছাড়িয়া তৃষ্ণার বিহনে দেবদত্ত কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? জননী যেমন পুত্রের মৃত্যুতে ব্যাকুল হইয়া পুত্রবিহনে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে তাহা চিন্তা করিয়া কাঁদিয়া উঠে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে, দেবদত্তও তেমনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর ক্রন্দনধ্বনি অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া কত যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত শোক-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিয়া তুলিল!

ভগবানের অচিন্ত্যনীয় বিধানে কাল সমস্তই হরণ করিয়া লইয়া যায়; কাল-প্রভাবে ধন-জন-জীবন-যৌবন সবই সাগরের বুকে উত্থিত তরঙ্গের মত লীন হইয়া যায়; কিন্তু কাল যে শুধু ভাল জিনিষই লইয়া যায়, তাহা নহে, মন্দও হরণ করে; পুত্রহারা জননী পুত্রশোক কালে বিস্মৃত হয়; কালের শান্ত ছবি আবার তাহাকে নব সন্তানের জন্মদাত্রী রূপে জগতের বুকে বসাইয়া দেয়। স্বামীহারা রমণী আবার বুক বাঁধিয়া গৃহকর্ম্ম করিয়া যায়। রোগ শোক কালই বিলয় করিতে সমর্থ। কিন্তু যাহার শোক কালের প্রভাবে ক্ষীণ না হইয়া বাড়িয়া উঠে, তাহার দেহ বেশী দিন স্থায়ী হয় না; মৃত্যুরূপে কাল তাহাকে চির শান্তিময়ের চরণতলে উপস্থাপিত করে।

দেবদত্ত আর সেই উদ্যান-বাটিকায় রহিল না। ধীরে ধীরে বাটি ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া অশ্বযানে আরোহণ করিল। স্বীয় বাসগৃহে আসিয়া দেবদত্তের মনে একটা নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। দেবদত্ত ভাবিতে লাগিল—কি করিবে? দেবদত্ত সম্মুখে তিনটি পথ দেখিতে পাইল—প্রথমতঃ বিবাহ করা কিম্বা অন্য কোন নারীর সাহচর্য্যে তৃষ্ণাকে ভুলিতে চেষ্টা করা; দ্বিতীয়তঃ ভগবান বোধিসত্ত্বের ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া; তৃতীয়তঃ তৃষ্ণার স্মৃতি লইয়া জীবন অতিবাহিত করা।

দেবদত্ত প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিল না—অথচ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মানুষ চঞ্চলতার মধ্যে, অনিশ্চয়তার ভিতরে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। ঘটিকাযন্ত্রের দোলকের মত দুল্যমান অবস্থায় থাকা বড়ই কষ্টকর। কাজেই মানুষ একটি দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে ব্যস্ত হয়।

প্রথম পথ দেবদত্ত সমীচীন মনে করিল না; দ্বিতীয় পথেও তেমন মানসিক সহানুভূতি মিলিল না। তৃতীয় পথের কথা মনে করিতেই তৃষ্ণার বিদায়কালীন কথাগুলি দেবদত্তের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিল। উপবিষ্ট দেবদত্ত লাফাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"পেয়েছি পেয়েছি।"

* * * * *

দীর্ঘ তিনমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে দেবদত্তের উপর দিয়া একটি পরিবর্ত্তনের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। আজ আর দেবদত্ত বেশ্যাসক্ত নহে; আজ সে পবিত্র, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। আগুন যেমন স্বর্ণের মালিন্য-কালিমা ভস্মীভূত করিয়া, তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া তোলে তেমনি তৃষ্ণার সাহচর্য্য দেবদত্তের জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

মানুষের জীবনে কখন কি মুহূর্ত্তে যে কাহার কোন বাক্যে কি ফল প্রসব করে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কাহার ভোগ কতদূর, কোনখানে কাহার জীবন ত্যাগের পথে অগ্রসর হইবে, তাহা কেহই জানে না। একটা অনুমান করিতে পারে মাত্র। কে জানিত নর্ত্তকী তৃষ্ণা দেবদত্তকে হীন স্বভাব হইতে দেব-প্রকৃতিতে পরিণত করিবে?

বাস্তবিক মনে হয় ভালবাসা যেখানে, যেভাবে উৎপন্ন হউক না কেন, তাহা মানুষের মানস রাজ্যে একটি অভিনব যুগের প্রবর্ত্তন করে। যাহাকেই হউক, যদি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা যায়, তবে মুক্তিরাজ্য অনায়াস-লভ্য। নদী যেমন বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া, বিভিন্ন গ্রামজনপদ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মহাসাগরের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, ভালবাসাও তেমনি যদিও কামজ বা রূপজ মোহে উৎপন্ন হয়, তবু পরিশেষে বিশ্বের কারণ মহামহানের চরণ তলে উপনীত হয়।

কাজেই যেদিন দেবদত্ত বিপুল অর্থ ব্যয়ে তৃষ্ণার বাস গৃহে "তৃষ্ণা-ভবন" প্রতিষ্ঠা করিয়া দরিদ্রের জন্য বিরাট্ অন্নসত্র খুলিয়া দিল, সেদিন পাটলীপুত্রবাসী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিয়াছিল—এ কিরূপে সম্ভব হইল, বেশ্যাসক্ত দুরাচারীর এ সুমতি কিরূপে জন্মিল, ভূতের মুখে রামনাম উচ্চারিত হইল কেমন করিয়া! আবার যখন কুশীনগর ও কপিলাবস্তুর পথে, রাজগৃহের রাস্তায় কূপ খনন করাইতে প্রবৃত্ত হইল, দুঃখিতের দুঃখ দূরীকরণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল দেবদত্ত মানুষ নহে—শাপভ্রষ্ট দেবতা।

কিন্তু দেবদত্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল—তাহার এ কর্ম্ম-প্রেরণার মূল উৎস—তৃষ্ণা।

(১৭)

তুষার-মরুর অপরূপ শুভ্রতার মাঝখানে আজ শীলভদ্র কিছুতেই চিত্ত-সংযম করিতে সমর্থ হইতেছে না। মন শ্যামলিমার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে শীলভদ্রের জীবনে এমন দিন গিয়াছে, যখন তুষার-প্রোথিত দেহ কিছুই অনুভব করে নাই; অন্তরের নির্ব্বিকল্প গভীর সমাধি ভগবান বোধিসত্ত্বের রূপামৃত পান করিয়া জড়দেহকে সজীব রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার একি হইল? কৈ? সে ত আর পূর্ব্বের মত বোধিসত্ত্বের ধ্যানে আত্মহারা হইতে সমর্থ হইতেছে না। যখন বোধিসত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিবার জন্য বহির্জগৎ হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া কেন্দ্রীভূত করে, অমনি সেখানে বোধিসত্ত্বের পরিবর্ত্তে, তৃষ্ণার বিদায়কালীন মলিন মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠে; যখন দূর দিগন্তরালে, যেখানে অপরূপ শুভ্রতার সঙ্গে নীলাকাশের ঘন নীলিমা মিশিয়া গিয়াছে দেবাধিদেব মহাদেবের কণ্ঠের মত, ত্রাটকের সাহায্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সেখানে চিত্তবৃত্তিকে একীভূত করিবার প্রয়াসে তাকাইয়া থাকে, অমনি দেখে লুলিতকুন্তলা করুণনয়না অশ্রুমুখী তৃষ্ণা তাহারই মুখের পানে অনিমেষে তাকাইয়া রহিয়াছে; অন্তরে বাহিরে বিশ্বজগতে, দূর গগনচারী বিহগদলের মধুর কূজনে, ঘনকৃষ্ণ জলদজালের দিগন্তব্যাপী বক্ষে তড়িল্লতার চকিত স্ফুরণে, প্রভাত সূর্য্যের অনুরাগরঞ্জিত রক্তরাগে, গোধূলির ম্লানিমায় চন্দ্রালোক-প্রতিভাসিত তুষার-মরুর লোক বিমোহন সুন্দর ছবির মধ্যভাগে—সর্ব্বত্রই যেন শীলভদ্র তৃষ্ণাকে দেখিতে লাগিল। যতই তৃষ্ণার চিন্তা পরিহার করিবার চেষ্টা করে, অমনি তৃষ্ণার ছবি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে মানসরাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইতে থাকে; আর শীলভদ্র পরাজিত সেনাপতির মত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে তৃষ্ণা যেন শীলভদ্রের অণুতে পরমাণুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। আহারে বিহারে; ধ্যানে তপস্যায় —সকল কাজে, বাক্যে মনে—তৃষ্ণাই শীলভদ্রের সাধনার বস্তু হইয়া উঠিল; শীলভদ্র যেন দেখিল, অনুভব করিল, প্রাণের গভীর স্তরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে—তৃষ্ণাই যে তাহার একমাত্র সিদ্ধি। যেন সে জন্মাজন্মান্তর তৃষ্ণাকেই চাহিয়া আসিয়াছে, তৃষ্ণাকেই কামনা করিয়া আসিয়াছে কত দেশে কালে জনপদে, যুগযুগান্তর ধরিয়া!

শীলভদ্র স্মৃতির তাড়নায় অস্থির হইয়া আত্মসংযমে নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া তুষার-মরুর সাধনক্ষেত্র ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মনে হইল শীলভদ্রের যে করিয়া হউক, তৃষ্ণাকে ভুলিতেই হইবে—ডুবাইয়া দিতে হইবে মনপ্রাণ, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বোধিসত্ত্বের করুণাসিন্ধু-জলে, নির্ব্বাণের অমৃত-প্রবাহে; আবার—আবার সেই পাটলীপুত্র গমনের পূর্ব্বের শীলভদ্র হইতে হইবে।

মানুষ সঙ্কল্প করে, কল্পনা করে, সিদ্ধির আশায় অনুপ্রাণিত হয়, কিন্তু জানে না যে তাহার সঙ্কল্প, তাহার কামনা, তাহার আশা পূর্ণ হওয়া তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না। শত চেষ্টাতেও মানব একটি বালুকাকণাকে স্থানভ্রষ্ট করিতে অক্ষম, অন্য কার্য্য সিদ্ধির কথা দূরে থাকুক! এক অচিন্তনীয় মহাশক্তির লীলাই মানবের—মানবের কেন বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। সে অদৃশ্য শক্তির লীলায় যখন যাহার সিদ্ধির কাল সমুদিত হয়, তখনই সে সিদ্ধি লাভ করিয়া ধন্য হয়; হাসিয়া উঠে তাহার জীবন ঐশ্বর্য্যের মহতী লীলায়, সফলতার কুসুমপুঞ্জে, পূর্ণতার পুণ্যবারি নিষেকে। আবার যাহার উপর মহাশক্তির লীলা বিরূপ—শুষ্ক হইয়া যায় তাহার জীবনের সরস উদ্যান ফল-ফুল-বিভূষিত, লুপ্ত হইয়া যায় বারিরাশি পিপাসিতের নয়ন সম্মুখে—সবই সে মহাশক্তির খেলা!

ক্রমশঃ

চীন ও ভারত

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ-সম্মিলনীতে সার পি সি রায় বলিয়াছেন যে, চীনের উন্নতির প্রধান কারণ জাতিভেদ বিহীনতা ও অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, কিন্তু ভারত বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের প্রবল নিষ্পেষণে পিষ্ট হইতেছে। বিগত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া জাতিভেদের বৈষম্য না থাকায় চীনে যে একতা সম্ভবপর হইয়াছে, ভারতে বিভিন্ন জাতির সমবায়ে সে একতা আকাশকুসুম মাত্র। বিশেষতঃ কন্‌ফিউসিয়াসের শিক্ষায় সম্প্রদায়িক বিরোধ চীনে নাই; কিন্তু এই ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের এত শাখা-প্রশাখা বর্ত্তমান যে, তাহাদের একত্র মিলন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। চীনে ছাত্রেরা বহু সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছে, এই সমিতিসমূহের ব্যয়-ভার ছাত্রেরা নিজে বহন করে এবং নিজেরাই শিক্ষকের কার্য্য করে, ছুটির সময় ছাত্রেরা চীনের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া দেশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নতিমূলক ভাবধারার প্রসার করে; কিন্তু বাঙ্গালায় ছাত্রেরা খেলিয়া কিম্বা গল্প করিয়া ছুটির দিন কাটায়।

ইংলিশম্যান

ভারতে উন্মাদ রোগের প্রকোপ

রাঁচি মেণ্ট্যাল হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার পেচিকো বলেন যে, ভারতে মানসিক রোগগ্রস্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। মানসিক রোগগ্রস্তের দ্বারা যাহাতে সন্তানোৎপত্তি না হয়, তাহার জন্য পৃথিবীময় আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ এ বিষয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না। ১৯২১ সনের স্পেশ্যাল রিপোর্টে প্রকাশ, সমগ্র ভারতে ৮৮৩০৫জন উন্মাদ রোগী এবং ১৮৯৬৪৪জন কালা ও বোবা। কিন্তু কার্শিয়ংএ অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ভারতে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার কোন প্রতিষ্ঠান নাই, কিম্বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের জন্য কোন আইনও ভারতে প্রচলিত নাই। ডাঃ পেচিকো বলেন, এই ব্যাধিগ্রস্তের মধ্যে শতকরা ৫০জন পিতামাতা হইতে এই ব্যাধি লাভ করে। তিনি বলেন যে দুইজন মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের সন্তান কখনও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমেরিকার দুইটি পরিবার এইরূপ বিকৃত মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্তানের জন্ম দেওয়ায় গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের জন্য বার্ষিক ২৫০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হয়। বৃটেনেও মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু ভারতের মত নহে। বর্ত্তমানে এই রোগ নিবারণ করিতে হইলে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের দ্বারা সন্তানোৎপাদন বন্ধ করিতে হইবে ও তদুদ্দেশ্যে আইন পাশ করিতে হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিশেষতঃ যাহারা গুরুতর অপরাধী তাহারা যেন বিবাহ না করে। তাহা হইলে ভারতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা কমিয়া যাইবে।

ম্যালেরিয়া কমিশন

লিগ্ অব্ নেশান কর্ত্তৃক গঠিত ম্যালেরিয়া কমিশন ভারতে ম্যালেরিয়ার বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য রাওল-পিণ্ডি নামক জাহাজে বম্বে পৌছিয়াছেন। আমষ্টার্ডাম্ নিবাসী অধ্যাপক স্কোফ্‌লার এই কমিশনের পরিচালক। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া জুগোশ্লেভিয়া, গ্রীস এবং রুষদেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতারিত করিবার উপায় নির্ণয়ার্থ এই কমিশন গঠিত হইয়াছিল। ছয়জন বিশেষজ্ঞ এই কমিশনের সদস্য। কমিশন কানপুর পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ ও অন্যান্য ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থান দর্শন করিবেন। তৎপরে লীগ্ অব্ নেশানের নিকট রিপোর্ট দাখিল করা হইবে।

কলিকাতায় ক্রীড়াক্ষেত্র-নির্ম্মাণ

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি সার্ আর এন্ মুখার্জ্জি কলিকাতায় একটি ক্রীড়াক্ষেত্র (stadium) প্রস্তুতের জন্য বলিয়াছেন যাহাতে ২৬,০০০ হাজার লোকের স্থান হইবে। এই ক্রীড়াক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে ৫,৫০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। তিনি বলেন যে, কলিকাতার মত ক্রীড়াপ্রিয় স্থানে, যেখানে ফুটবল ম্যাচ দেখিবার জন্য এত লোকের সমাগম হয় যে স্থান সংকুলন হয় না,—সেখানে এই টাকা অনায়াসে তোলা যাইতে পারে। তদুদ্দেশ্যে টাউন হলে বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরকে সভাপতি করিয়া এক সাধারণ সভা আহুত হউক। তাহা হইলে অতি সহজে প্রয়োজনীয় টাকা তোলা যাইবে।

ইংলিশম্যান

দরিদ্রের জীবন-বীমা

বঙ্গদেশে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী আছে, কি দেশীয়, কি বৈদেশিক, কোন কোম্পানীই ১০০০ টাকার কমে বীমা গ্রহণ করে না। কাজেই যাহারা দিন মজুরী করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কিম্বা অত্যন্ত দরিদ্র, তাহারা বীমা করিয়া সন্তান-সন্ততির জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারে না। বর্ত্তমানে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের সে অভাব দূরীভূত হইল। এইরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে এই প্রথম। বাঙ্গালার বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বীমার প্রসারই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই সমিতির সেন্ট্রাল বোর্ডের প্রথম সভায় ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইহা অনেক স্থান হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমিতিতে ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত বীমা করা হইবে। পলিসি কখনো বাজেয়াপ্ত হইবে না এবং যাহাতে অকর্ম্মণ্য পলিশিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, [illegible] ডাক্তারের পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। ইহাতে যাহারা ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বীমা করিতে সমর্থ হইত না, তাহারাও বীমা করিতে পারিবে। তবে যাহাতে মুমুর্ষু লোক বীমা না করে, তাহার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম করা হইয়াছে :—

প্রথম বৎসরে মৃত্যু হইলে যে প্রিমিয়াম দেওয়া হইয়াছে, তাহা ও প্রিমিয়ামের অর্দ্ধেক অতিরিক্ত দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় বৎসরে—প্রদত্ত প্রিমিয়ামের দ্বিগুণ।

৩য় বৎসরে—যাহা বীমা করা হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক।

৪র্থ বৎসরে—পলিসির পুরা টাকা প্রদত্ত হইবে।

এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কো-অপারেটিভ সমিতির ৬ লক্ষ সভ্য উপকৃত হইবে। কিন্তু যদি অন্ততঃ অর্দ্ধেক সভ্যও জীবন বীমা করে, তবে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আদায় প্রায় বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা হইবে।

ইংল্যাণ্ডের প্রুডেন্সিয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী এবং জাপানের পোষ্টেল লাইফ ইন্সিওরেন্স স্কীমের উন্নতি লক্ষ্য করিলে এই প্রতিষ্ঠানও যে সাফল্য-বিমণ্ডিত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। ইংল্যাণ্ডীয় প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ প্রিমিয়াম আদায় হয় সাপ্তাহিক ২—৪ পেন্স আদায় হইতে। সেইরূপ জাপানেও পোষ্ট্যাল ইন্সিওরেন্স স্কীমে ৫০ টাকা হইতে ৬৭৫ টাকা পর্য্যন্ত বীমা করা যায় এবং মাসিক প্রিমিয়াম দশ পয়সা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয়, কিন্তু ১৯২৭ সনের প্রিমিয়াম আদায় ১৮ কোটি টাকা।

সেন্ট্র্যাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমান সমিতির এজেন্টের কার্য্য করিবে এবং গ্রাম্য কো-অপারেটিভ সমিতির অবৈতনিক সম্পাদকগণ এবং সেন্ট্র্যাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

ইংলিশম্যান

পররাষ্ট্র অফিসের কর্ম্মচারী প্রিন্সজর্জ্জ

প্রিন্স জর্জ্জ পররাষ্ট্র অফিসে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রথম দিন মটর যোগে বাকিংহাম

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাজ করেন, তাঁহার সহকর্ম্মিগণের সহিত পরিচয়ই ঐ দিনের কাজ। ত্রিতলে তাঁহার জন্য অফিস-গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাজ্যসমূহের ও লিগ্ অব্ নেশান ঘটিত কার্য্য তাঁহার হস্তে থাকিবে। কার্য্যকাল বেলা ১১টা হইতে ৬টা। বেলা ১টার সময় তিনি লাঞ্চ ভোজনের জন্য রাজ-প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন।

শিক্ষক ও শিক্ষা

বালকগণকে পুরুষ-শিক্ষক শিক্ষা দিবে কি স্ত্রী-শিক্ষক শিক্ষা দিবে এই বিষয়ে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, স্ত্রী-শিক্ষকই ভাল। কিন্তু সুবিখ্যাত গ্রন্থকার অ্যান্টনী লুডোভিসি বলেন—যদি বালকগণকে শুধু পুস্তকের শিক্ষা দিতে হয়, তবে গ্রামোফোনই উৎকৃষ্ট শিক্ষক। আর যদি মানবীয় সদ্‌গুণে হৃদয় পূর্ণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রী-শিক্ষকের দ্বারা সে শিক্ষা হইতে পারে না, কারণ বালকগণ স্বভাবতঃ অনুকরণ-প্রিয়; স্ত্রী-শিক্ষকের নিকট পুরুষোচিত শৌর্য্যবীর্য্যের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যান্টও ঐভাবে অনুকরণ প্রিয়তার বিষয়ে বলিয়াছেন। সুতরাং যে সমস্ত বালক ভবিষ্যকে পঁয়সিয়া, এজিন কোর্ট প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধকারীদের বংশধররূপে জগতে পরিচিত হইবে, তাহাদিগকে পুরুষোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে পুরুষ-শিক্ষক নিযুক্ত করা দরকার।

কল ও কলমে প্রতিযোগিতা

বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কসমূহে লেজার পোষ্টিং, যোগকরণ এবং তালিকা প্রস্তুতের জন্য কল ব্যবহৃত হইতেছে। এখন কলে ও কলমে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। মিড্‌ল্যাণ্ড এবং ওয়েষ্ট. মিনিষ্টার ব্যাঙ্কে অনেক কর্ম্মচারী কমান হইয়াছে এবং যাহাদের পেন্সনের সময় হইয়াছে, তাহাদের স্থানে নূতন লোক লওয়া হইতেছে না। যদিও প্রথমে কল কিনিতে অনেক টাকা লাগে, কিন্তু পরে কলে কার্য্যকারী বালিকাদিগকে কম বেতন দিতে হওয়ায়, তাহা পোষাইয়া যায়।

কর্ম্মবীর প্রধান মন্ত্রী

স্পেনের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল প্রাইমে ডে রিভেরা দিবসের মধ্যে ১৬ ঘণ্টা রাজকীয় কার্য্যে অতিবাহিত করেন। সাধারণ মানব জীবনের আমোদপ্রমোদ তাঁহার নিকট অজ্ঞাত। তিনি প্রাতে শয্যায় থাকিতে থাকিতে প্রায় ম্যাড্রিডের সমস্ত সংবাদ-পত্র পাঠ করেন ও চা পান করেন। বেলা ১০টার সময় রাজার সহিত দেখা করিতে যান, কিম্বা রাজা যদি ম্যাড্রিডে না থাকেন, তবে নিজের অফিসে গিয়া কার্য্যে যোগ দেন এবং বেলা ৩টা পর্য্যন্ত একটানা জল-স্রোতের মত কাজ করিয়া যান। তৎপরে 'লাঞ্চ' ভক্ষণ করেন —উহা অতি সামান্য—মাত্র ডিম্ব, ছোট এক বাটী কাফি, মিনারেল ওয়াটার ও সামান্য শাকশব্জী। তৎপরে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কাজ করেন। তাঁহার জীবন আড়ম্বরহীন ও সরল। সামান্যভাবে সজ্জিত একটি কক্ষে তিনি বাস করেন। মাত্র কখনো কখনো অপরাহ্নে রেস্ দেখিতে যান এবং রবিবার প্রাতকালে এক ঘণ্টা অতিরিক্ত নিদ্রা যান, তৎপরে সমস্তক্ষণ কাজের চিন্তায় ব্যস্ত।

ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তন

ইংলণ্ডের দক্ষিণ বিভাগীয় কাউন্টিসমূহ দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যেখানে পূর্ব্বে নিসর্গের নীরব স্তব্ধতা বিরাজ করিত, আজ সেখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিরাট্ কারখানা মাথা তুলিয়া অম্বরদেশ আক্রমণে উদ্যত। পূর্ব্বের সে গ্রাম্য সৌন্দর্য্য আজ আর মিলিবে না। অতি অল্প দিনের মধ্যে গ্রাম্য সহরসমূহ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ওয়েম্লি, গ্রীণফোর্ড, হেইস্ প্রভৃতি স্থান ফ্যাক্টরীতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে! পোর্টস্‌মাউথের রাস্তায় এখন কোন স্থান নাই যাহা কোন না কোন শিল্পদ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া না উঠিয়াছে। ক্রকল্যাণ্ড, ওয়েব্রিজ, কব্‌হাম প্রভৃতি তাহাদের নূতনশিল্প ফ্যাক্টরীতে পূর্ণ।

বেকারের সংখ্যা হ্রাস

পূর্ব্বোক্ত কাউন্টিসমূহে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে

বেকারের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বে শত শত নরনারী বেকার বসিয়া থাকিত, আজ সেখানে খুব কম লোককেই কর্ম্মহীন অবস্থায় দেখা যাইবে। বিশেষতঃ শিল্প-ফ্যাক্টরীসমূহ উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে স্থান পরিবর্ত্তন করার ফলে দক্ষিণ দিকের লোকদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ দিক্ অধিক স্বাস্থ্যকর। বর্ত্তমান নূতন শিল্পকেন্দ্রসমূহে বেকার সমস্যা অজ্ঞাত। লণ্ডনে শতকরা ৫ জন, অক্সফোর্ডে শতকরা ২ জন এবং অন্য কেন্দ্রে মাত্র শতকরা একজন লোক বেকার। কিন্তু বর্ত্তমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ যে আরব্য রজনীর দৈত্যের মত কদাকার, তাহা নহে। এই সমস্ত ফ্যাক্টরী প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যের সহিত এমন সামঞ্জস্য রাখিয়া নির্ম্মিত যে, তাহাতে সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ অধিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—এক একটি ফ্যাক্টরী যেন প্রতিভাশালী চিত্রকরের হাতের অঙ্কিত নিপুণ শিল্পকলার নিদর্শন।

পৃথিবীজয়ী দাবা খেলোয়ার

শ্রীযুক্ত সুলতান খাঁ গ্রেটবৃটেনে অনুষ্ঠিত দাবা খেলা প্রতিযোগিতায় সমাগত সমস্ত খেলোয়ারকে হারাইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়ারের বিজয়মাল্য লাভ করিয়াছেন।

আপার যমুনা ভ্যালি বৈদ্যুতিক সরবরাহ কোম্পানী

দশ লক্ষ টাকা মূলধনে এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ইঞ্জিনিয়ার সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার একজন ডিরেক্টর। এই কোম্পানী গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিয়া নিম্নলিখিত সহরসমূহে সরবরাহ করিবে। বাঘপেট, বর্‌হুত, চরতাওয়াল, চাপ্রোলী, দেশবন্দ, পরিদনগর, গঙ্গো, পারমুক্তেশ্বর, গাজিয়াবাদ, ওলাস্থি, হাপুর, জোনসাথ, কিরাণা, কান্ধলা, খাকরা, খাটৌলী, মঙ্গলোর, মাবাণা মিরাণপুর, পরিচ্ছটগুকি, পিলখাবা, পুরগাজি, পামপুর, সরধনা, শাম্‌লি, থানাভবন—এই ২৬টি সহরে রাস্তায়, লোকের বাড়ীতে, কলকারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইবে। এই ২৬টি সহরের লোক সংখ্যা ২৩১,০০০ জন; মোট ৬০০০ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই কোম্পানী কার্য্য করিবে। কোম্পানী নিম্নলিখিত দরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবে :—

(ক) আলো, পাখা ও অন্যান্য গার্হস্থ্য কাজের জন্য ।/৬ পাই প্রতি ইউনিট।

(খ) কল-কারখানা ও কৃষিকার্য্যের জন্য প্রতি ইউনিট ।০ আনা।

কোম্পানীর মূলধন দশ লক্ষ টাকা প্রতি অংশ দশ টাকা হিসাবে একলক্ষ অংশে বিভক্ত। কোম্পানী আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে ৫ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনের উপর শতকরা দশ টাকা লাভ থাকিবে। ৬ ও ৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ কোম্পানীর আফিসে সমস্ত বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

বাইবেলের বিক্রয়াধিক্য

পৃথিবীর মধ্যে বাইবেলের মত এত অধিক সংখ্যক অন্য কোন পুস্তক বিক্রীত হয় নাই। চৌরঙ্গী বাইবেল হাউসে কলিকাতা ও বৈদেশিক বাইবেল সোসাইটির ১২৫তম জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ ৮০০শত বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুদিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে হোমার ২০টি ভাষায়, সেক্‌স্‌পিয়ার ৪০টি ও পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্ ১২০টি ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১১,৩৯৯,৫৪০ খণ্ড বাইবেল বিক্রীত হইয়াছে ও ৪১৭৬৪০ পাউণ্ড লাভ হইয়াছে। মোট সংখ্যার মধ্যে, ১০২১,০০০ খণ্ড সম্পূর্ণ বাইবেল ও ১২২১০০০ খণ্ড নিউ টেষ্টেমেন্ট। গত বর্ষে ভারতবর্ষ, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে ১০ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হয়। মাত্র কলিকাতা বাইবেল হাউস হইতে ৫০টি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত বাইবেলের ২৫০,০০০ খণ্ড বাঙ্গালা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় বিক্রীত হইয়াছে। কান্দাহার ও কাবুলের মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে এবং রাজপুতানার পুষ্কর তীর্থের পাণ্ডাদের ভিতরেও বাইবেল প্রবেশ করিয়াছে।

আকাশ-যান রেসে বৃটেনের শ্রেষ্ঠত্ব

সোলেন্টে যে আকাশ-যান রেস-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে,

তাহাতে বৃটেনের আকাশ-যান-পরিচালক ওয়াগ্‌হরণ ঘণ্টায় ৩২৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতা দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ দর্শক প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল এবং পৃথিবীর জনসঙ্ঘ উৎসুক হৃদয়ে তারের বা বেতারের সংবাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করায় আকাশ-যান-পরিচালনায় বৃটেন যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ অপেক্ষা কম নহে তাহাই প্রমাণিত হইল। দুইখানি ইটালিয়ান দ্রুতগামী আকাশ-যান অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই বৎসর ইটালি প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পিছে পড়িয়া রহিল তথাপি ইটালিয়ান পরিচালক ডাল মোলিন ঘণ্টায় ২৮৪ মাইল হিসাবে গমন করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বৃটেন এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করায় Schneider Trophy আরও দুই বৎসর রাখিতে সক্ষম হইবে।

লণ্ডন-ভারতীয় আকাশ-ডাকে দুর্ঘটনা

বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভারতীয় ডাকবাহী আকাশ যান লণ্ডন হইতে ভারতে আসিবার পথে জাস্কের সন্নিকটে অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। তিন জন লোক নিহত এবং ২ জন দগ্ধ হইয়াছে। ডাক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে জাস্কের সন্নিকটে অবতরণ করিবার সময় অন্ধকার হওয়ায় নামিবার উইংএর সম্মুখভাগে অবস্থিত আলোক হইতে উইংএ আগুণ ধরিয়া যায় এবং পরে সমস্ত আকাশ যান বৈশ্বানরের উদর-গর্ভে প্রবেশ করে। এই দুর্ঘটনায় দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য নিপতিত হইবে—(১) অবতরণ স্থান বৈদ্যুতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত করা; (২) সম্পূর্ণরূপে ধাতু নির্ম্মিত না হইলে কোন আকাশযানকেই বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে দেওয়া হইবে না। যদি এই দুইটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তবে বলা যাইতে পারে—অমঙ্গলেও ভগবানের মঙ্গল-হস্ত পরিদৃশ্যমান।

কলিকাতায় টিউব রেলওয়ে

হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেসন দ্বয়ের মধ্যে যে টিউব রেলওয়ের প্রস্তাব চলিতেছে, তাহার স্থান নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যের ভার মেসার্স স্কট্ এণ্ড্ ম্যাক্সবি লিমিটেডের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই কোম্পানী বহুস্থানে খনন কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে; বিশেষতঃ বালী, তান্‌জান্, রাম গঙ্গা ও ঘাড়া পুলের এবং ঢাকা-আরিচা রেলপথের খনন কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় ভারতীয় কার্য্যে সবিশেষ অভিজ্ঞ। এই কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ নক্স বলেন যে, কলিকাতা গঙ্গানদীর বদ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা সাধারণতঃ স্তরে স্তরে, কাদা, বালি, বন্য কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতির দ্বারা গঠিত। সুতরাং কোনস্থান দিয়া রেলপথের সুড়ঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে ও নিরাপদে লইয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন স্থান খনন করিয়া দেখা হইতেছে। ড্যালহাউসী স্কোয়ারে, শিয়ালদহে, ও কলেজ ষ্ট্রীট এবং বৌবাজারের সংযোগ স্থলে খনন করিয়া দেখা হইয়াছে। কিন্তু হুগলী নদীতে খননকার্য্য বড়ই বিপজ্জনক, কারণ, জলের চাপ অত্যন্ত অধিক এবং স্রোত বিশেষ প্রবল। যাহা হউক অচিরে এই খনন-কার্য্যও আরব্ধ হইবে এবং খুব সম্ভবতঃ হাওড়া পুলের নিকট খনন করিয়া দেখা হইবে, কারণ, নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া খনন করিলে স্রোতের বেগে স্থান-ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভব এবং তাহাতে খননের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ১০০ ফিট পর্য্যন্ত খনন করিয়া মৃত্তিকার নমুনা বায়ু-হীন কাচপাত্রে বন্ধ করিয়া বিলাতে মেসার্স মিট্রুজ্ এণ্ড্ পার্টনার্স কোম্পানীর নিকট পাঠান হইতেছে।

বহুমুল্য চিত্র-শিল্প

লণ্ডনের ন্যাসনাল আর্ট গ্যালারীর ট্রাষ্টিগণ সুবিখ্যাত Wilton Diptych ও Titian চিত্রদ্বয় যথাক্রমে ৯০,০০০ পাউণ্ড ও ১২২,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে ক্রয় করিয়াছেন। এই চিত্রদ্বয়ের দ্বারা চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটা মহৎ লাভ সংসাধিত হইল সন্দেহ নাই। Diptych চিত্র ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে একজন অজ্ঞাত নামা চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত; উহা আর্ল অব পেমব্রোকের নিকট হইতে ৯০,০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করা হইয়াছে। Titian চিত্র ডিউক অব্ কাম্বারল্যাণ্ডের

নিকট হইতে ১২২,০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করা হইল। গবর্ণমেণ্ট ১০৬,০০০ পাউণ্ড দান করিবেন এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এই-চিত্র শিল্প ক্রয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

কুয়াশার মধ্যে দর্শন

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বন্ধ হিলে অবস্থিত সুইস্ কটেজ নামক বাড়ীতে হঠাৎ তীব্র আলোক জ্বলিয়া উঠিত এবং সহসা নিবিয়া যাইত। লোকে ইহাকে ভৌতিক আলোক মনে করিত। সম্প্রতি ইহার রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সুইস কটেজ সুবিখ্যাত television আবিষ্কর্ত্তা মিঃ রাইয়ার্ডের বাসস্থান। তিনি কুয়াসায় মধ্য দিয়া যাহাতে বহুদূরস্থ বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, ঐরূপ একটি যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় ঐ সমস্ত আলোক দ্বারা পরীক্ষা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পরীক্ষার ফল স্বরূপ noctovision নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজ ঘন কুয়াসার মধ্যেও স্বীয় গন্তব্য পথ দেখিতে পাইবে এবং কুয়াসায় পথহারা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অনেক নাবিক ঐ যন্ত্র দেখিয়া বলিয়াছেন যে, উহা সমুদ্রে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে এবং যুদ্ধকালে ইংরেজের জাহাজ কুয়াসার মধ্য দিয়া শত্রুর জাহাজকে দেখিতে পাইবে, পক্ষান্তরে noctovison না থাকায় শত্রু বৃটিশ জাহাজকে দেখিতে পাইবে না।

সর্দ্দার বিল

শ্রীযুক্ত হরিবিলাস সর্দ্দার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুর বিবাহ বিল নামক যে বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র একটা বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিবাহ বিলের মতে ১৪ বৎসরের পূর্ব্বে বালিকার ও ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে বালকের বিবাহ দেওয়া আইনবিরুদ্ধ। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা এই বিলের বিপক্ষে এবং স্বরাজ্য দল ইহার স্বপক্ষে আছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বলেন যে, যদিও তাঁহার মতে বালিকার বিবাহ-বয়স ১৮ হওয়া উচিত, তথাপি অন্ততঃ ১৪ বৎসর বিলে পাস হওয়া দরকার, নতুবা বৈদেশিক জাতির নিকট ভারতের মুখ থাকিবে না।

জাতীয় সংবাদ

হুগলি ঘুটিয়াবাজার সুবর্ণবণিক্-সমিতি

গত ১৬ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় হুগলী ঘুঁটিয়াবাজার শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জীউ ঠাকুরের শ্রীমন্দিরে একটি জাতীয় সভা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় অনেক ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় স্বজাতিবর্গ যোগদান করেন এবং উপস্থিত সকলের অভিমত অনুযায়ী বহুদিনের সুপ্ত "হুগলী ঘুঁটিয়াবাজার সুবর্ণবণিক্-সমিতি" পুনর্গঠন করা হয়। এই সভাপতি, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বড়াল—সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস মল্লিক বি এল,—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গোকুলকৃষ্ণ শীল—সহঃ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র শীল—কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ধর,—হিসাব পরিদর্শক, এবং ২১ জন বিশেষ সভ্য ও কয়েকজন চাঁদা আদায়কারী মনোনীত করা হয়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা যেন তিনি এই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সমিতিকে চিরকাল জীবিত রাখেন, এবং এই সমিতির সকল কার্য্যে সর্ব্বদা সহায়তা করিয়া আমাদের স্বজাতিবৃন্দের মঙ্গল সাধন করেন।

লণ্ডনের লাইব্রেরী

লাইব্রেরী আন্দোলনের বর্ত্তমান রূপ

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ লাইব্রেরী বিষয়ে জার্ম্মাণ ও ফরাসীর বহু পশ্চাতে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে এদিকে ইংরেজের দৃষ্টি পড়ে। তারপর প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ৫০টি বড় লাইব্রেরী ছিল, পড়িবার জন্য পয়সা লাগিত না। সহরের চারিপাশেও অনেকগুলি ছিল। পক্ষান্তরে, ঐ সময়ে ১৮৮৪ সনের ফ্রী লাইব্রেরী অ্যাক্টের সুযোগ লইয়া লণ্ডনের মাত্র দুইটি স্থানে লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ মিউজিয়ামে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৪,৩৫,০০০; তখন প্যারিসের বিব্লেওথেক্ ন্যাশিওনালের পুস্তকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ!

এক্ষণে লণ্ডনে ১৪০টি পাবলিক্ লাইব্রেরী রহিয়াছে। বৃটিশ মিউজিয়ামে ৪০ লক্ষের উপর মুদ্রিত পুস্তক দেখা যাইবে। পুস্তকের তাকগুলি সারি সারি সাজাইয়া রাখিলে ৫০ মাইল দীর্ঘ হইবে। গিল্ডহল লাইব্রেরীতে ১,৩১,৫০০ পুস্তক আছে। ইহার সহিত যদি বিভিন্ন মিউজিয়াম, গবর্ণমেণ্ট আফিস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজ, ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান, বিদ্যা-আয়তন এবং ক্লাব ও ইন্‌ষ্টিটিউটের কেতাব-সমূহ যোগ করা যায় তবে মোট পুস্তকের পরিমাণ ১ কোটি ২ লক্ষের উপর হইবে। সার্কুলেটিং লাইব্রেরীর বই যোগ করিলে এই সংখ্যা আরও বেশী দাঁড়াইবে। লাইব্রেরী যাহাতে সার্থক হয়, লোকেরা পুস্তকাদি লইয়া বহুল পরিমাণে পাঠ করে সেজন্য অনেক চেষ্টা হইয়া থাকে, সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানও আছে।

বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর উৎপত্তি

লণ্ডনের প্রত্যেক লাইব্রেরীর উৎপত্তি ও বিকাশ লইয়া আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে। রয়্যাল লাইব্রেরী সপ্তম হেনরীর সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম হেনরীর রাজত্ব সময়ে যখন বহু মূল্যবান্ পুস্তক মুদীর দোকানে বিক্রয় করিয়া বা অন্য প্রকারে নষ্ট করা হইতে-ছিল তখন রাজার পুরাতত্ত্ববিদ্ জন লেলাণ্ডের চেষ্টা ও যত্নে অনেক পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি রক্ষা পায়। কতকগুলি রয়্যাল লাইব্রেরীতে ও অন্য কতকগুলি রাজার অন্য এক পুরাতত্ত্ববিদ্ সার রবার্ট কটনের গৃহে আছে।

প্রথম জেম্‌সের পুত্র হেন্‌রী অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। এই সময়ে সার রবার্ট কটনের লাইব্রেরীও জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়। ফলে অনেক মূল্যবান্ অ্যাংলো-স্যাক্‌সন দলিল, রাজকীয় কাগজপত্র ও বাইবেলের পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি দেশের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। মোট গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৯৫৮। তন্মধ্যে ১৭৩১ সনের আগুনে ১২৪টা ধ্বংস হয় ও ৯৮টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সার হ্যান্‌স্ শ্লোন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৫০,০০০ গ্রন্থ ও ৪,১০০ খণ্ড পাণ্ডুলিপি (প্রধানতঃ ওষধি ও প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক), অক্সফোর্ডের প্রথম আর্ল ও তাঁহার পুত্র এড্‌ওয়ার্ড কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৭,৬৩৯টি ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি ও ১৪,৩৩৬টি দলিল-দস্তাবেজ লাইব্রেরীতে স্থান পায়। এগুলি কিনিবার জন্য লটারি করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল। সেই টাকায় মণ্টেগু হাউস্ নামক বাড়ীটিও কেনা হয়। এখানে বৃটিশ মিউজিয়ামের গোড়াপত্তন হইয়াছিল; ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবার পর রাজকীয় লাইব্রেরীর ১২,০০০ পুস্তক দ্বিতীয় জর্জ্জ ইহাতে দান করেন।

আজ বৃটিশ মিউজিয়ামের এইরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যে সাত সমুদ্রের পারের লোকেরা এখানে পড়াশুনা ও গবেষণা করিতে আসে। কিন্তু ইহার বর্ত্তমান আকার লাভ করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। পূর্ব্বে পড়িবার ঘরে (reading room) একটা টেবিলের চারিদিকে ২০টি

চেয়ার সাজান থাকিত। অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া এখানে প্রতিদিন ৬ জনের বেশী লোক পড়িতে আসে নাই। তারপর ক্রয় ও দানের ফলে অনেক পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক গ্রন্থ প্রকাশককে কয়েকখানি মুদ্রিত গ্রন্থ দান করিতে হয়। তন্মধ্যে বৃটিশ মিউজিয়াম একটি পাইয়া থাকে। এইরূপে মিউজিয়ামের অনেক পুস্তক হস্তগত হইয়াছে। জর্জ টোমাসন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ঘরোয়া যুদ্ধ (civil war) সম্বন্ধীয় ২,০০০ খণ্ড বই, তৃতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ডে ক্রীত ৬৫,২৫০ খানা পুস্তক ও ১৫,০০০ খানা পুস্তিকা (tract) (রাজার লাইব্রেরী নামে পরিচিত), গ্রন্থ ও সংবাদ পত্রের সংগ্রহ, ক্রোকার (Croker) সংগ্রহাবলী এবং ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধীয় ৩,৪২০ খানা গ্রন্থ এখানে আছে।

বৃটিশ মিউজিয়ামের ইতিহাসে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা এই: পৃথিবীর মধ্যে খুব বড় একজন লাইব্রেরীয়ান্ পানিট্‌জির (Panizzi) ইতালী হইতে পলাইয়া আসা; তাঁহার দ্বারা বর্ত্তমান রিডিং রুমের পরিকল্পনা ও স্মার্ক (Smirke) কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মাণ; দুই খণ্ড ক্যাটালগের হাজার খণ্ড ক্যাটালগে পরিণতি; পানিট্‌জির পরবর্ত্তী গ্রন্থাধ্যক্ষগণের উদ্যম; প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ স্থানান্তরে প্রেরণ।

পড়িবার ঘরে reference বই এখন আছে প্রায় ৮০,০০০, আর নীচের তলায় তাকের উপরে ২০,০০০ বই পাওয়া যাইবে।

কত লোক পড়িতে আসে?

বৃটিশ মিউজিয়ামের বর্ত্তমান "পড়িবার ঘর"টি খুলিবার (১৮৭৫) ৬ মাসের মধ্যে এখানকার পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়া প্রতিদিন ৪০০ হইয়াছিল, ১৯১৪ সনে প্রতিদিন ৭০০ জনের বেশী আসিয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে এখানে যাহারা আসে তাহারা সাধারণতঃ গবেষণার জন্য পড়াশুনা করিতে আসে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে এইরূপ কত লোক এখানে আসিয়াছে ও তাহাদের সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে:

	১৯১৮ সন	১৯২৪ সন
পড়িবার ঘর	১,১৪,৫৪৩	১,৭১,০৭০
খবরের কাগজের ঘর	১০,৮৯০	১৪,৫২২
সঙ্গীত পুস্তকের ঘর	১৮৮	৬২৪
পাণ্ডুলিপি বিভাগ	৪৬২১	৮,৭৪০
প্রাচ্য সম্বন্ধীয় মুদ্রিত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি	৮২৬	৪,৩০৫
খোদিত ফলক হইতে গৃহীত প্রতিলিপির ঘর	৭৭৭	৮,৯৪৪

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ক্যাটালগে মোট ৩,৮৪,৭১৯ খানা গ্রন্থ যোগ হইয়াছিল। পড়িবার ঘরে বসিবার জায়গা আছে ৪৫৮ জনের। আগে নারীদের জন্য আলাদা জায়গা ছিল। কিন্তু এক্ষণে মেয়ে পুরুষ একত্র বসিয়া পড়ে।

গিল্ডহল লাইব্রেরী

এই লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতে হইলে টিকিটের দরকার হয় না, আর উর্দ্ধতম বয়স ১৮, ২১ নয়। রিচার্ড হুইটিংটনের সম্পত্তির অছিগণ ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে এই লাইব্রেরী স্থাপন করেন। ধর্ম্মযাজকদের পড়িবার জন্য ইহার উদ্ভব। একবার ১৫৪৯ সনে এই লাইব্রেরীর অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ নষ্ট হয়। তাহার পর আর একবার অনেক বই পুড়িয়া যায়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীটি নূতন করিয়া গঠিত হয়। ইহার বর্ত্তমান সুন্দর বাড়ীটি ১৮৭৪ সনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই লাইব্রেরীতে লণ্ডন, সাউথওয়ার্ক মিড্‌লসেক্সের ইতিহাস ও অবস্থান সম্পর্কীয় অনেক মূল্যবান্ পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, খোদিত ফলকের প্রতিলিপি, দলিল ইত্যাদি আছে। প্রথম উইলিয়াম কর্ত্তৃক প্রদত্ত লণ্ডনের প্রথম "অধিকার পত্র", পুরাতন নগর-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ পত্রাবলী ও এইরূপ আরও অনেক মূল্যবান্ জিনিষ এই লাইব্রেরীতে রাখা হইতেছে।

গিল্ডহলে লণ্ডন বিষয়ক গ্রন্থ আছে ২৫,০০০। তাহা ছাড়া ৮২৮টা পুস্তকে লণ্ডনের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ও আলোচনা আছে। লাইব্রেরীর মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ১,৩১,৫০০র উপর, পুস্তিকা ২০,১০০, পাণ্ডুলিপি

১৪,৬৬৭ এবং ম্যাপ ও প্রতিলিপি ৬,১০৬। ১৯২৫ সনে লাইব্রেরীতে ৫০,২৬১ জন ও খবরের কাগজের ঘরে ৩,০২,৭৭৬ জন লোক পড়িতে আসিয়াছিল। বসিবার জায়গা আছে ১০০ জনের।

লণ্ডন সম্বন্ধে গ্রন্থশালা

শুধু লণ্ডনের ইতিহাস ও ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনার পুস্তকাবলী নিম্নলিখিত গ্রন্থশালাগুলির বিশেষত্ব : (১) বিসপ্‌সগেট ইন্‌ষ্টিটিউট্—এখানে বাণিজ্য সংক্রান্ত অনেক ভাল বই আছে, ও ২৫,০০০ পুস্তকে পূর্ণ এক reference লাইব্রেরী আছে। (২) ধনবিজ্ঞানের জর্জ হাউয়েল লাইব্রেরী-পুস্তকের সংখ্যা ৮,০০০। (৩) ক্রিপ্‌লগেট্ ইন্‌ষ্টিটিউট্—অঙ্কন, বই বাঁধা, আস্‌বাব, রঞ্জিত কাচ, মৃৎপাত্র বিষয়ে এখানে ৫০,০০০ পুস্তক আছে। (৪) সেণ্ট ব্রাইড্‌স্ ফাউণ্ডেশন ইন্‌ষ্টিটিউট্—ইহার ব্লিডস ও রীড সংগ্রহাবলীতে সাংবাদিক ও মুদ্রাকরদের প্রয়োজনীয় ১৮,০০০ গ্রন্থ রহিয়াছে।

বিষয় বিশেষের লাইব্রেরী

লণ্ডনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লাইব্রেরীও দেখা যাইবে। এইরূপ লাইব্রেরীর সংখ্যা অনেক। কয়েকটির নাম নীচে করা যাইতেছে :—

বিষয়ের নাম	লাইব্রেরীর নাম
লণ্ডন	ব্যাটার্‌সী
চাম্‌ড়া ট্যানিং, স্থাপত্য ও সুকুমার শিল্প	বারমণ্ডসী
লণ্ডন, সেক্‌সপীয়ার, রাস্কিন, স্যর রিচার্ড বার্টনের গ্রন্থাবলী, সঙ্গীত	ক্যাম্বারওয়েল
স্থানীয় প্রতিলিপি	চেল্‌সী
ধাতুর কাজ, চস্‌মার ব্যবসা, ঘড়ি তৈরী ও মেরামত, পোষাক ও অলঙ্কার	ফিন্‌স্‌বারি
আধুনিক বিজ্ঞান	গ্রীন্‌উইচ
হেনরী মর্লি লাইব্রেরী ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পুস্তকাবলী	হাম্পষ্টেড্
বিজ্ঞান, কলা ও সঙ্গীত	ইস্‌লিংটন
সার রিচার্ড বার্টনের লাইব্রেরীর অধিকাংশ পুস্তক (ভ্রমণ ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে), লণ্ডনের ভৌগোলিক সংস্থান ও শিল্প ও শিল্পী	কেন্‌সিংটন
এঞ্জিনিয়ারিং ও জাহাজ নির্ম্মাণ	পপ্‌লার
আস্‌বাব ও অন্যান্য ঐরূপ ব্যবসা	শোরডিচ্
স্থানীয় ইতিহাস, সেক্‌সপীয়ার ও দান্তে	সাউথওয়ার্ক
স্থানীয় ইতিহাস	ষ্টেপ্‌নী
লণ্ডন, সুকুমার কলা ও সঙ্গীত	ওয়েষ্টমিনষ্টার
জোসেফ্ এড্‌ওয়ার্ডসের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক লাইব্রেরী, কেণ্ট সম্বন্ধীয় সাহিত্য, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, উদ্যান রচনা, কৃষি ও প্রাকৃতিক ইতিহাস	উলউইচ্

গির্জায় লাইব্রেরী

লণ্ডনের কোন কোন গির্জার সংলগ্ন লাইব্রেরী রহিয়াছে। সেণ্ট পল ক্যাথেড্রাল গির্জার লাইব্রেরী পড়িবার পক্ষে এক উৎকৃষ্ট স্থান। লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ডে এই লাইব্রেরীর তিনটি মাত্র মূল্যবান্ পুস্তক রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার ১টি ল্যাম্বেথে ও ১টি এবার্ডিনে আছে। ল্যাম্বেথ প্রাসাদে ৩০,০০০ মুদ্রিত পুস্তক ও ১৪,০০০ পাণ্ডুলিপি আছে—এখানে কেণ্টের ভৌগোলিক সংস্থান বিষয়ক অনেক ভাল বই আছে। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার চাপ্টার লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যা ১৫,০০০—ধর্ম্ম এবং সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পুস্তকই বেশী। ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার অ্যাবির দলিল গৃহে ১,০০,০০০ মূল্যবান্ দলিল ইত্যাদি রক্ষিত হইতেছে। সিঁও কলেজে ১,১০,০০০ গ্রন্থ আছে। চার্চ হাউস্ লাইব্রেরী ধর্ম্মসঙ্গীত গ্রন্থে পূর্ণ। রিচার্ড ব্যাক্সটারের পত্রাবলী ও গ্রন্থাবলী ডক্টর উইলিয়ামের লাইব্রেরীতে রহিয়াছে। ব্যাপ্টিষ্ট, কন্‌গ্রিগেশনালিষ্ট ওয়েস-লিয়ান, সোসাইটি অব্ ফ্রেণ্ডস্, অরেটরি, সোসাইটি অব্ জেসাস, ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লাইব্রেরী, ইহুদিদের কলেজ লাইব্রেরী ও এইরূপ আরও গ্রন্থাগার লণ্ডনে দেখা যায়।

ব্যবহারাজীবদের জন্য লাইব্রেরী

আইনব্যবসায়ীদের জন্যও লণ্ডনে লাইব্রেরীর অভাব

নাই। লিঙ্কন্‌স্ ইন্ লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহা ১৪৯৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনার টেম্পল লাইব্রেরীতে পেটিট পাণ্ডুলিপি ও অপরাধ ও কারাগার বিষয়ক ক্রফোর্ড সংগ্রহাবলী রহিয়াছে। গ্রেস্ ইন্ লাইব্রেরী, মিড্‌ল টেম্পল লাইব্রেরী, প্রবেট্ কোর্ট লাইব্রেরী, বার লাইব্রেরী ও ল সোসাইটির (এখানের বেসরকারী পার্ল্যামেণ্ট সভ্যগণ কর্ত্তৃক যে সকল আইন পাশ হয় তাহার অনেকগুলি ও সাম্রাজ্যের ও অন্যান্য স্থানের রাষ্ট্রীয় নিয়মাবলী সংগৃহীত আছে), নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত লাইব্রেরীতে ২,৮০,০০০ গ্রন্থ রহিয়াছে। ওল্ড বেইলির ব্ল্যাক লাইব্রেরী ব্যবহারাজীবগণের নিকট পরিচিত।

চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাগার

লণ্ডনে অনেকগুলি চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাগার আছে। তন্মধ্যে রয়েল সোসাইটি অব্ মেডিসিন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার গ্রন্থের সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি। রয়্যাল কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্‌স্ এবং বৃটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনও বিশেষ বিখ্যাত। বহু হাসপাতালের সহিত এক একটি লাইব্রেরী সংলগ্ন রহিয়াছে।

বিদ্বৎ-সমিতিসমূহের লাইব্রেরী

লণ্ডনের প্রত্যেক বিদ্বৎ-সমিতির একটি করিয়া লাইব্রেরী আছে। রয়্যাল সোসাইটির লাইব্রেরী পৃথিবীর সকল স্থানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে। ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারস্ নামক প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীটি অতি সুন্দর। রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন ও লণ্ডন ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রত্যেকের গ্রন্থ সংখ্যা দুই লক্ষ।

ক্লাবগুলির সহিতও কখন কখন লাইব্রেরী চালান হইয়া থাকে। এথেনিয়াম ক্লাবের লাইব্রেরীতে এক লক্ষের উপর বহি আছে। ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকের লাইব্রেরীগুলির মধ্যে লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌স প্রথম, দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে ফক্সওয়েল সংগ্রহাবলী দ্বিতীয়, আর ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাব তৃতীয়। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে তিন লক্ষের উপর গ্রন্থ আছে।

উভয় পার্ল্যামেণ্ট ভবনে ব্যবহারের জন্য গ্রন্থের সংখ্যা ১ লক্ষের উপর। গবর্ণমেণ্ট অফিসগুলির ভিতর ইণ্ডিয়া অফিসে ভারতীয় সাহিত্যের সুবৃহৎ সমাবেশ আছে। নৌ-বিভাগ, যুদ্ধ-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ, সাম্রাজ্য বিভাগ, আন্তর বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল, পেটেণ্ট অফিস্, কলেজ অব আর্ম্মস্, ট্রিনিটি হাউস্, গ্রীণউইচ্ বীক্ষণাগার, কিউতে অবস্থিত রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন্‌স্, ইম্পিরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট্, রয়্যাল কলোনিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট্ ও রেকর্ড অফিস্ লাইব্রেরীসমূহও সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

কলা, শিল্প, নাট্য, বিজ্ঞান

ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে ৫ লক্ষের উপর প্রতিলিপি, অঙ্কন ও ফটোগ্রাফ সম্পর্কীয় পুস্তক রহিয়াছে। এখানে প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য নাটকের সংগ্রহাবলী, ডাইস্ (Dyce) লাইব্রেরী, ডিকেন্‌সিয়ার (Dikensia), ফর্ষ্টার (Forster) সংগ্রহাবলী, লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির কতকগুলি নোট্ বইও দেখা যাইবে। ন্যাশনাল গ্যালারির ইষ্টলেক লাইব্রেরীতে কলা ও কলাবিদ্‌গণের সম্বন্ধে ১০,০০০র উপর গ্রন্থ আছে (রেনল্ড ও অন্যান্য বিখ্যাত ইংরেজ শিল্পীর নোটবই রক্ষিত হইতেছে)। গেফ্রাই মিউজিয়ামে স্থপতি আলফ্রেড্ ষ্টেভেন্‌সের লাইব্রেরী বিরাজ করিতেছে।

সার রবার্ট উইট্ ও তাঁহার পত্নী চিত্র ও অঙ্কণের অনেক প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া এক লাইব্রেরী তৈরী করিয়াছিলেন। লণ্ডনের নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া এখনও কোন লাইব্রেরী গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ডালউইচ্ কলেজের পুস্তক ও দলিলের সংগ্রহ এ বিষয়ে সম্যক্ উপাদান যোগাইবে। গানের একাডেমি ও স্কুলগুলিতেও উৎকৃষ্ট সঙ্গীত পুস্তক সংগ্রহীত রহিয়াছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় লাইব্রেরীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। সাউথ কেন্‌সিংটনের বিজ্ঞান মিউজিয়াম সংলগ্ন লাইব্রেরীতে ১,৬০,০০০ গ্রন্থ আছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি লাইব্রেরী। ...

ষ্ট্রীটের কলেজে দেড় লক্ষ গ্রন্থ আছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে কিংস কলেজে স্কিট ও ফার্ণিভাল মেমোরিয়্যাল লাইব্রেরী বিখ্যাত। দক্ষিণ কেন্‌সিংটনের লাইব্রেরীতে রেজিষ্টীকৃত প্রতিদিনের পাঠকের সংখ্যা ২,৬০০। অধ্যাপক ফক্সওয়েল আর্থিক চিন্তার ইতিহাস, সোশিয়েলিজম্‌, মজুর গতিবিধি, মুদ্রা, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার গ্রন্থ সংখ্যা ৪০,০০০। অধ্যাপক ফক্সওয়েল এই লাইব্রেরীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "জেভন্‌সের সঙ্গে একদিন বিকাল বেলা হ্যাম্পষ্টেডে যাইবার সময় তাঁহার অনুরোধে গ্রেট পোর্টল্যাণ্ড ষ্ট্রীটে ৬ পেন্স ব্যয়ে এই গ্রন্থটি (ডক্টর লাউনারের রচিত "রেলওয়ের অর্থনীতি", ১৮৫০) ক্রয় করি। দাম খুব সস্তা ও বহিটি খুব মূল্যবান্‌ (অঙ্ক দিয়া আর্থিকতত্ত্বের আলোচনার প্রেরণা তিনি ইহা হইতেই লাভ করেন) বলিয়া কিনিতে উৎসাহ দেন। এই ক্রয় হইতেই আমার আর্থিক সাহিত্য সংগ্রহের আগ্রহ জন্মে" (১৮৭৫) ও এই লাইব্রেরীর উদ্ভব ঘটে।

ঈষ্ট লণ্ডন কলেজে সীডনি লী মেমোরিয়্যাল লাইব্রেরী। ইহাতে সেক্‌সপিয়ার সম্বন্ধে অনেক ভাল গ্রন্থ আছে। সেণ্ট পল ও ওয়েষ্টমিনষ্টার স্কুলদ্বয়ের লাইব্রেরী, টয়েনবী হল, বার্কেনবেক, পলিটেক্‌নিক ইন্‌ষ্টিটিউট সমূহ, মজুরদের ক্লাব ও ইন্‌ষ্টিটিউট ইউনিয়ান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের লাইব্রেরীগুলাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ বিষয়ে লাইব্রেরী

হাসপাতাল সমূহের রেড ক্রস্‌ লাইব্রেরী ও অন্ধদের (পাঠক সংখ্যা ১০,০০০) জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরী দেখিবার বস্তু। লণ্ডন লাইব্রেরীর সভ্য সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার, ১৯২৫ সনে গ্রাহকদের নিকট দেড় লক্ষ গ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল। এই লাইব্রেরীর কল্পনা কার্লাইলের। খুব অল্প চাঁদায় এখান হইতে যত মূল্যবান্‌ ঐতিহাসিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তক ধার পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নয়। ১৯২৬ সনে এইচ্‌ বি আরভিংএর বিধবা পত্নী স্বামীর 'অপরাধ বিষয়ক' লাইব্রেরীর ৪০০ খানা পুস্তক ইহাতে দান করেন।

লণ্ডনে সার্কুলেটিং বা ভ্রাম্যমান্‌ লাইব্রেরী বেশ ভালভাবে চলে। "মুদী" (Mudi)র লাইব্রেরীতে ২৪ লক্ষ খণ্ড গ্রন্থ এক হাত হইতে অন্য হাতে ঘুরিতেছে। স্মিথ অ্যাণ্ড সন ও বুট্‌স্‌ সার্কুলেটিং লাইব্রেরী এই দুইটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে লণ্ডনের আর এক প্রকার লাইব্রেরীর কথা উল্লেখযোগ্য। এগুলি পূর্ব্বে ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি ছিল, পরে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়। জন বার্ণস্‌ এইরূপ একটি লাইব্রেরী দান করেন। ইহাতে সমাজ-তত্ত্ব ঘটিত পুস্তকাবলী ত আছেই, তাহা ছাড়া লণ্ডনের ভৌগোলিক সংস্থান ও সুকুমার সাহিত্য বিষয়ক বইও আছে। লণ্ডনের ডেভিড্‌ কপারফীল্ড লাইব্রেরী বিশেষভাবে ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

লাইব্রেরীর দেশে

লণ্ডন লাইব্রেরীর দেশ। উপরের অসম্পূর্ণ বিবরণী হইতে লণ্ডনে লাইব্রেরীর সংখ্যা, লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িবার জন্য লোকের উৎসাহ, কত লোক লাইব্রেরীর বহি লইয়া ঘাঁটাঘাটি করে, লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ও পড়িবার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে। লণ্ডন তথা ইংল্যাণ্ডে স্কুল ও কলেজের অপ্রাচুর্য্য নাই। এখানে শতকরা ৯৮ জনের বেশী নরনারী লিখিতে পড়িতে সক্ষম। কিন্তু শুধু স্কুলকলেজে গিয়াই ইহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া যায় না। লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, সিনেমা ইত্যাদির সাহায্যে তাহারা এই বিশাল পৃথিবীর নানা বিষয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। শুধু পাঠ্য পুস্তকের সংকীর্ণ জ্ঞানে তৃপ্ত থাকিতে পারে না বলিয়াই লণ্ডনের নরনারী দলে দলে দেশভ্রমণে বাহির হয়, মিউজিয়াম ও লাইব্রেরীতে নিত্য আসিয়া পড়াশোনা করে। ইংরেজের জ্ঞান-পিপাসা আমাদের সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

আমাদের দেশে বসিয়া ইংল্যাণ্ড বা লণ্ডনের অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপলব্ধি করান দুরূহ। দেশের শতকরা ৮।১০ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে সক্ষম। তারপর অন্নের চিন্তায় আমাদের অধিকাংশের সময় ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয়তঃ লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ইত্যাদি সুন্দরভাবে

চালানও টাকার কথা। সেই টাকা আমাদের যথেষ্ট নাই বলিয়া লাইব্রেরী আন্দোলন তাড়াতাড়ি প্রসার লাভ করিতে পারিবে না। তবে বাঙ্গালীদের জ্ঞানলাভের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। সেইজন্ত বঙ্গদেশে লেখাপড়ার চর্চা হইতেছে ও কয়েকটি লাইব্রেরী চলিতেছে। উপরের বর্ণনা হইতে লণ্ডনের লাইব্রেরী গুলির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা করিলে বুঝা যাইবে আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

মোসাফের

প্রেরিত পত্র*

(১)

শ্রীযুক্ত "সুবর্ণবণিক্ সমাচার" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

ভবৎ-সম্পাদিত পত্রে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র মহাশয় "উপবীত আন্দোলন" প্রবন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার নামোল্লেখ করিয়া একটা কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন, দেখিতেছি। তাঁহার কথা এই—"পণ্ডিত শ্রীযুত বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় রাজসাহী সম্মিলন ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সুবর্ণবণিক্‌গণের উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা নাই, উত্তরীয় তাঁহাদের উপবীতের কার্য্য করে। জানিনা কিসের প্রলোভনে তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া আজ সুবর্ণবণিকের উপবীত গ্রহণের ঋত্বিক্‌পদে ব্রতী হইয়াছেন।"

বাঁকুড়া সুবর্ণবণিক্ সম্মিলনে আমিই প্রথমে সুবর্ণবণিক্ গণের ১৫ দিবস অশৌচ-গ্রহণ প্রস্তাব উত্থাপন করি, এই প্রস্তাব পরবর্ত্তী কয়েকটি সম্মিলনে, বিশেষ করিয়া রাজসাহী সম্মিলনে আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলাম—পঞ্চদশ দিবস অশৌচ-গ্রহণ-সম্পর্কে সুবর্ণবণিক্‌গণের উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। এই মতই সমাচারের ১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই মত অনুসারে আমি অনুপনীত সুবর্ণবণিক্‌গণের পঞ্চদশ দিবসে মৃতাশৌচ ব্যাপারে বরাবর শ্রাদ্ধাদি কার্য্যও করিয়া আসিতেছি। সুতরাং চন্দ্র মহাশয় অভদ্রোচিত ভাবে আমার মতের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার পূর্ব্বমতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহার দ্বারা কখনও এরূপ বুঝায় না যে, আমি সুবর্ণবণিক্‌গণের পূর্ণাঙ্গ বৈশ্যাচার গ্রহণের পোষকতা করি নাই। পূর্ণাঙ্গ বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে হইলে শুধু পঞ্চদশ দিবস অশৌচ প্রতিপালন করিলে চলিবে না; উপবীত গ্রহণ করা চাই। পরবর্ত্তী এক সম্মিলনে পূর্ণাঙ্গ বৈশ্যাচার গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে আমিও তাহার সমর্থন করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত "বৈশ্যাচার পদ্ধতি" পুস্তিকায় ছাপাইয়া দিয়াছি। এই কারণে কর্ত্তব্য বোধেই সুবর্ণবণিক্‌গণের উপবীত আন্দোলনে ঋত্বিকপদে ব্রতী হইয়াছি। উভয় স্থলেই আমার মত ও কার্য্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

চন্দ্র মহাশয় বোধ হয় কল্পনা করিতে পারেন না যে, প্রলোভন ব্যতীত পৃথিবীতে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভবপর। তজ্জন্য তিনি আমার প্রতি "প্রলোভনের" কুৎসিৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীহরি তাঁহার ঈদৃশ মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দিউন! আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম।

শেষ কথা—সুবর্ণবণিক্‌গণের ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের সহিত সোপবীত পূর্ণাঙ্গ বৈশ্যাচারের কোন বিরোধাভাস

* মতামতের জন্ম সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকর দায়ী নহেন।

নাই। সম্পাদক মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি যথাযথ প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

চুঁচুড়া
২২।৮।২৯

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়

(২)

মান্যবর "সুবর্ণবণিক্ সমাচার" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়,

এতৎসহ প্রেরিত আমার এ ক্ষুদ্র মন্তব্যটি আপনার পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি

বিনীত
৪ঠা ভাদ্র ১৩৩৬ সাল　　শ্রীশ্যামসুন্দর মল্লিক

আজকাল কলিকাতাবাসী সপ্তগ্রামী সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে স্বজাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রণকালে সুপারি দেওয়া প্রথা লইয়া একটা বড়ই গণ্ডগোল চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সমস্যার এখনও কোনরূপ মীমাংসা হইল না ও মীমাংসা করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা হইতেছে বলিয়াও বোধ হইতেছে না; বরং যাহাতে আরো গোলযোগ বাধে ও একটা দলাদলির সৃষ্টি হয় তাহার বেশ চেষ্টা চলিতেছে। আমরা একেই ত স্ব স্ব প্রধান হইয়াছি, তারপর যদি এরূপ ভাবে প্রচলিত সামাজিক নিয়ম ভাঙ্গাভাঙ্গি লইয়া দলাদলির সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যে টুকু একতার বন্ধন ও সামাজিক সুখস্বচ্ছন্দতা এখনও আছে তাহাও লোপ পাইবে। আজ কোথায় নিজেদের ও সমাজের উন্নতির পথ অনুসন্ধান করিব, কি করিলে নিজেদের মধ্যে একতা আসে তাহার চেষ্টা করিব, কি করিলে নিজেদের নষ্ট গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হই, কি করিলে নিজেরা উন্নত হই ও দেশের মধ্যে একটা উন্নত জাতি হইয়া দাঁড়াই তাহার চেষ্টা করিব, তাহা না করিয়া, ছোটখাট সামাজিক ব্যাপার লইয়া অযথা আন্দোলনে মত্ত থাকিয়া নিজেদের মধ্যে যেটুকু একতার বন্ধন ও সদ্ভাব বিদ্যমান আছে তাহাও নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যাঁহারা নিজেদের প্রাধান্য প্রকাশ করিবার জন্য দলপতিরূপে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া এ বিষয়টা মীমাংসা করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন সম্পূর্ণ উদাসীন, কেহ কেহ বা নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ মত জাহির করিবার ও বজায় রাখিবার জন্য বিশেষরূপে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কোথায় তাঁহারা এ বিষয়ের সত্যানুসন্ধানে চেষ্টিত হইবেন, তাহা না হইয়া এ বিষয়ে একদম অন্ধ থাকিয়া স্ব স্ব মত, জেদ ও প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য propaganda চালাইতেছেন। উঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আত্মীয় কুটুম্ব নিমন্ত্রণকালে তাঁহাদের খেয়াল ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাহাকেও বা চলিত প্রথানুসারে সুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ করিতেছেন এবং কাহাকেও বা সুপারি না দিয়া কেবলমাত্র পত্র দিয়াই নিমন্ত্রণ কার্য্য সমাধা করিতেছেন; আবার কেহ কেহ নিমন্ত্রণ গ্রহণকালে সুপারি অগ্রাহ্য করিয়া ফেরৎ দিতেছেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "আমরা ত সুপারি তুলিয়া দিয়াছি, আমরা কাহাকেও সুপারি দিব না ও কাহারও নিকট হইতে সুপারি লইব না।" আবার কেহ কেহ সুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ কালে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি সম্ভাষ করিয়াছেন কি? যদি সম্ভাষ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে কেবলমাত্র সুপারি অগ্রাহ্য, সুপারি দিলে পুরা সম্ভাষ করিতে হইবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হয়, তাঁহারা এই ব্যাপারটায় এরূপভাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া সর্ব্ব প্রথমে এই আন্দোলনটিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া সেই ভদ্রলোকটির সুপারি না দিয়া নিমন্ত্রণ করায় কার্য্যটাকে support করিবার জন্যই যেন গত ৯ই মাঘ তারিখে দলবদ্ধ হইয়া নিজেদের মধ্যে একটা সভা (যাহাকে দলপতির সভা বলা হইয়াছে) আহ্বান করিয়া নিজেদের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা বাজে ওজোর দেখাইয়া পুরা মাত্রায় সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু পরে, যেন দয়া পরবশ হইয়া, নিজ নিজ দলস্থ বণিক্‌গণকে একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত ও গৃহীত প্রস্তাবগুলি পরবর্ত্তী সভার জন্য মুলতুবী রাখিলেন বলিয়া এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা যে গত ফাল্গুন মাসের ভিতর এ বিষয়টি মীমাংসা করিয়া নিষ্পত্তি করিবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কি হইল? কয়জনেই বা তাঁহাদের দলস্থ বণিক্‌গণকে এ বিষয়টি মীমাংসা করিবার জন্য নিয়মিতরূপে সভার অধিবেশন করিয়াছেন? তাঁহারা এরূপভাবে propaganda চালাইয়া জোর করিয়া স্ব স্ব মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবেন কিম্বা স্বজাতি, আত্মীয় কুটুম্ব-দিগকে আহ্বান করিয়া ও উহা যথাযথভাবে মীমাংসা করিয়া majorityর মতানুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবেন? আমার মনে হয় এতদিনের মধ্যেও যখন কোন উদ্যোগও হইল না তখন তাঁহারা এরূপভাবে জোর করিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব মত বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন।

এখন স্বজাতি ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ যে, তাঁহারা এ বিষয়টীকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার ভাবিয়া আর যেন উদাসীন না থাকেন ও দলাদলির প্রশ্রয় না দিয়া, যাহাতে শীঘ্রই এ ব্যাপারটীর একটা শেষ মীমাংসা হয় তাহার চেষ্টায় বদ্ধ পরিকর হউন।

অবশেষে আমার বক্তব্য যে, বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে নিমন্ত্রণে সুপারি দেওয়া বিধির স্বপক্ষে বোধ হয় শতকরা ৯৯ জন ও বিপক্ষে শতকরা ১ জন। এই গোলযোগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি যত কার্য্য হইয়াছে ও হইতেছে তাহার প্রায় সবগুলিতেই আত্মীয়-কুটুম্বগণকে প্রচলিত প্রথানুযায়ী সুপারি দিয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে ও হইতেছে। এমন কি উক্ত দলপতি প্রতিনিধিগণের মধ্যে ও প্রায় সকলেই বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সুপারি দিয়া স্বশ্রেণীর আত্মীয় কুটুম্বগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জনমত নিমন্ত্রণে সুপারি দেওয়ার সপক্ষে সুতরাং উহা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বজায় রাখায় দোষ কি?

উক্ত দলপতি প্রতিনিধিরা যাঁহারা সুপারীটা সন্তাষের অংশ মাত্র বলিয়া প্রচার করিতে চান, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কিম্বা স্বশ্রেণীর কোন ভ্রাতা অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষভাবে "সুপারিটা যে সন্তাষের অংশ" বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে বড়ই ধাবিত হইব। কারণ আমার মতে সুপারিটা সন্তাষের অংশ নয় এবং সন্তাষ নিমন্ত্রণের একটা অধিকন্তু ব্যাপার। নিমন্ত্রণকালে সন্তাষ বিতরণ করা বা না করা নিমন্ত্রণকারীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

শ্রীশ্যামসুন্দর মল্লিক

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে, শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবর্ণবণিক সমাচার

২৩শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৩৬ সাল | ১২শ সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে কয়েকদিন

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, বার-এট্-ল

সে আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমরা তিনজন প্রবাসী বাঙ্গালী জার্ম্মাণী দেখবার জন্য প্যারিস হ'তে যাত্রা করি। নূতন দেশ ও নূতন লোক দেখবার প্রবল ইচ্ছা প্রাণে এক গভীর আনন্দ ও উৎসাহ জাগিয়ে তুলছিল, এবং একেবারে অপরিচিত কোনও বিদেশে যেতে স্বভাবতঃ যে একটা ভয় ও ভাবনা মনে এসে উপস্থিত হয় তার জেরটা আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকাতে অনেকটা লাঘব হচ্ছিল। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই মনে একটা বল ও সাহস এসে উপস্থিত হয়। তারপর এক্ষেত্রে আমাদের আর একটা মস্ত অসুবিধা ছিল, তাহা ভাষার। আমাদের তিন জনের মধ্যে আমি ও আর একজন ত জার্ম্মাণ ভাষায় একেবারেই অনভিজ্ঞ, তবে তৃতীয় ভদ্রলোকটী জার্ম্মাণ ভাষা অল্প জান্‌লেও তাহা পুস্তকগত, তিনি বল্‌তে পারতেন না, কিন্তু একটী ভাষা পুস্তকে পড়ে বোঝা ও কথাবার্ত্তা বুঝা বা বলা অনেক তফাৎ। সুতরাং ভাষা না জানার অসুবিধাটী মস্ত ছিল, কিন্তু তিনজন একসঙ্গে থাকাতে সে অসুবিধার ভারটীও অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে পড়েছিল। যাই হোক্, একদিকে এইরূপ নানা ভাবনার দুঃখ ও অপর দিকে নূতন দেশ দেখার প্রবল আনন্দ, এই মিশ্রিত ভাব হৃদয়ে নিয়ে আমরা আজ বিদেশ-যাত্রী।

সকাল প্রায় ৮॥০ সময় ট্রেণ। আমরা প্রাতঃ কার্য্য সমাপন করে মালপত্র নিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে হাজির। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, মালপত্র গাড়ীতে তুলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসা গেল। গাড়ীতে বিশেষ ভিড় ছিল না। বিদেশে ভাষা না জানার যে কি অসুবিধা তাহা মানুষকে পদে পদেই বোধ করতে হয়। একটী ট্রেণ আছে যাহা প্যারিস থেকে

বার্লিনে একেবারেই যায়, কোথাও বদ্‌লি করতে হয় না, কিন্তু আমরা ভুল করে সে ট্রেনটীতে না চড়ে আর একখানি ট্রেণে উঠে বসে আছি। এ ট্রেণখানিতে গেলে দুইবার যে গাড়ী বদল করতে হবে ও সময়ও অনেক বেশী লাগবে তা কে জান্‌তো? যদি ভাষা একটু ভাল জানা থাকতো তাহ'লে আর এ ভুলটী হোত না, কারণ ষ্টেসনে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নেওয়া যেতো। আমরা মনে করেছি আমরা ঠিক ট্রেণেই উঠেছি। যাক্, তার আর উপায় ছিল না, ঠিক সময়ে আমাদের ট্রেণ ছেড়ে দিয়ে হু হু করে চল্‌তে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সহরের সীমানা অতিক্রম করলাম। চতুর্দ্দিকেই ছোট ছোট গ্রামগুলি নয়নপথে পড়তে লাগলো। গ্রামগুলি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং এর চারিদিকেই চাষবাস। সহরের কৃত্রিমতা ও কোলাহল পরিত্যাগ করে গ্রামের এই স্বাভাবিকতা, নিস্তব্ধতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতর এসে পড়ে মনটা স্বতঃই হাল্কা ও এক উদাসভাবে পূর্ণ হয়ে পড়ছিল। সহর ছেড়ে গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভিতর গিয়ে পড়লে সকলেরই বোধ হয় এইরূপ মনের ভাব হয়ে থাকে।

উৎসুকনয়নে চতুর্দ্দিকে এই গ্রামগুলির সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম ও এর ভিতর এই নূতন দেশের নূতন জাতির ও পরিচয় হ'তে লাগলো, এবং আমাদের দেশের তুলনায় এরা যে কত উন্নত তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যেতে লাগলো। এইরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সময় কেটে যেতে লাগলো। প্রায় বিকালের দিকে আমরা ক্রমে বেলজিয়ামের সীমানার নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগলাম। এতক্ষণ গত মহাযুদ্ধের কোনও চিহ্নই দৃষ্টিপথে পড়ে নি; কিন্তু এখানে উহার ধ্বংসাবশেষের অনেক চিহ্নই চোখে পড়তে লাগলো। গ্রামগুলি ও সহরগুলি কিরূপভাবে যুদ্ধের গোলাগুলিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তারই চিহ্ন চতুর্দ্দিকে সুস্পষ্ট। প্রাণে একদিন খুব উৎসাহ ও আনন্দ হচ্ছিল। আমরা ভারতবর্ষে থাকৃতে এই মহাযুদ্ধের বিষয় কতই না কাগজে পড়েছিলাম ও লোকমুখে শুনেছিলাম, আর আজ তারই চিহ্ন স্বচক্ষে দেখছি। মনে হচ্ছিল পরম কৌতুহল। দেখ্‌তে লাগলাম বাড়ীঘরগুলি ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়ে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। স্থানে স্থানে গোলা পড়ে বড় বড় গর্ত্ত হয়ে গেছে, আর গাছপালাগুলো গোলার আগুণে পুড়ে কাঠের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক কথায়, নিজ চক্ষে না দেখলে তার পুরা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ধ্বংসের পূরা ভীষণ মূর্ত্তি দেখলাম না, কারণ সন্ধির পর এই সকল স্থানে অনেক নূতন ঘরবাড়ী তৈয়ার হয়ে গেছে ও হচ্ছে। যাক্, তবু যা দেখলাম তাতেই অনেকটা আঁচ পাওয়া গেল, আর এই ভীষণতার দৃশ্যে মনে যে এক গভীর দুঃখ ও বেদনার ভাব জেগে উঠছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। এই মহাযুদ্ধে ফরাসীদেশের ঐ সব স্থানের লোকেরা কিরূপভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল ও কি কি ব্যাপার ঘটেছিল তার বিষয় আমরা অনেক জান্‌তে পারতাম, কিন্তু ভাষায় দখল না থাকায় গাড়ীতে যে সব ঐ দেশবাসী লোক ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আর এসব বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলা সম্ভব হোলনা, আর তাঁদেরও ঐ বিষয় বলবার ইচ্ছা থাক্‌লেও তাহা মনেই রয়ে গেল।

এইরূপ উৎসুকনয়নে ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা ক্রমে ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে বেলজিয়ম রাজ্যে এসে পড়লাম। ভাবলাম এখানে আরও বেশী যুদ্ধের বিভীষিকার চিহ্ন দেখতে পাব, কারণ বেলজিয়ামই গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর হাতে বেশী রকম বিধ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের একরূপ নিরাশ হ'তে হোল। আমরা উৎসুক হয়ে চারিদিকেই দেখতে লাগলাম কিন্তু যেখান দিয়ে আমাদের ট্রেণ যাচ্ছিল তার চারিদিকে কোথাও কিছু দেখা গেল না। অবশ্য আমাদের গাড়ীতে কয়েক জন বেলজিয়মবাসী লোক ছিলেন, এবং আমাদের খুব ইচ্ছাও হচ্ছিল যে তাঁদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু ভাষার দখল না থাকায় কোনও আলাপাদি কর্‌তে পারা গেল না, যদিও তাঁদের ইচ্ছা ছিল আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন। ইউরোপ মহাদেশের লোকদের সাধারণতঃ এই স্বভাব যে, তাঁরা বিদেশী লোক দেখলে আলাপ করতে বড়ই উৎসুক। কিন্তু ইংরাজেরা এ বিষয়ে উহাদের উন্টা। এইজন্য এঁরা ইংরাজদের বড়ই নিন্দা করেন।

অল্পক্ষণ পরে আমাদের ট্রেণ একটি বড় ষ্টেশনে এসে থাম্‌লো। সে ষ্টেসনটীর নাম আমার মনে পড়ছে না। শুনা গেল যে সে ট্রেনটী আর অধিকদুর অগ্রসর হ'বে না, তবে কিছুক্ষণ পরে আর একটী ট্রেণ ওখান হতে ছেড়ে জার্ম্মাণীর কোলোন (Cologne) অবধি যাবে এবং সেখানে আবার গাড়ী বদল করে বার্লিনে যেতে হ'বে। অবশ্য উপায় ছিল না, সেইখানেই আমরা মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। আবার ট্রেণখানি ছাড়বার দেরী থাকাতে অনেকেই ষ্টেশনে যে refreshment room ছিল তাতেই আহারাদি করতে গেলো। তখন বিকাল, সন্ধ্যা হ'বার বেশী দেরী ছিল না, সুতরাং আমরাও ভাবলাম যে এই সুযোগে কিছু আহারাদি করে নিশ্চিন্ত হওয়া যাক, কারণ জানা ছিল না যে কোথায় ও কখন আবার ট্রেণ বদল করতে হ'বে ও আর কিছু খাবার সুবিধা হবে কি না। সুতরাং আমরা তিনজনেও সেই refreshment room এতে প্রবেশ করলাম। Refreshment roomটী বেশ বড় ও সুসজ্জিত। দেখলাম এখানে খাওয়া দাওয়া ফরাসী ধরণেরই এবং ফরাসী মুদ্রাও এখানে চলে। কাজেই সে বিষয়ে আমাদের আর কিছু অসুবিধায় পড়তে হোল না। আহারাদি শেষ করে আমরা প্লাটফরমে এসে ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি ট্রেণ এসে হাজির হোল, শুনলাম এইখানি কোলোনে যাবে। গত্যন্তর না থাকায় আমরা মালপত্র নিয়ে তিনজনে সেই ট্রেণে উঠে বসলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ ছেড়ে দিল। কিছুদুর অগ্রসর হবার পরই বড় বড় পাহাড় নয়নপথে পড়তে লাগলো। ট্রেণখানি এই সব পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যেতে লাগল, আর আমরাও বেলজিয়ামের সৌন্দর্য্য দেখে নয়ন তৃপ্ত করতে লাগলাম। প্রাণে ভারি আনন্দ হচ্ছিল। বেলজিঁয়ামটি বেশ শিল্পপ্রধান (industrial) দেশ বলেই বোধ হ'ল। দেখলাম এইসব পাহাড়গুলির একটি হতে আর একটিতে বড় বড় লোহার পোষ্ট পোঁতা ও তার উপর দিয়ে মোটা মোটা তার গেছে। এই সব তার দিয়ে ছোট ছোট লোহার গাড়ী সব মালপত্র নিয়ে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করে। এইরূপে এক জায়গা হ'তে আর এক জায়গায় মালপত্র সহজেই চালান করা হয়, এবং ইহা সাধারণতঃ ফ্যাক্টরীর কাজে লাগে। এই সব গাড়ীগুলি ইলেকট্রিকে চলে। এ বিষয়ে বেলজিয়ামরা জার্ম্মাণদের অনুকরণ করেছে এবং ওদের প্রভাবও এদের উপর যথেষ্ট পড়েছে। ওপর হ'তে যা দেখলাম তাতে ত গত মহাযুদ্ধের জন্য বেলজিয়ামের বিশেষ কিছু দুরবস্থা হয়েছে বলে মনে হোল না, এবং যতদূর দৃষ্টি গেল তাতে যুদ্ধের কোনও চিহ্ন ত দেখা গেল না। এই সব পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যা ক্রমে ঘনিয়ে আসছিল, সুতরাং প্রাণে স্বভাবতঃই এক অতি সুন্দর ভাব জেগে উঠছিল। আমরা ভারতবাসী, পাহাড় ও সন্ধ্যার যোগটা আমাদের আছে এক অতি মনোরম ব্যাপার! এতে আমাদের মনকে স্বতঃই ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। তাই ক্ষণকালের জন্যও মনটা এক ভীতি (awe) ও ভক্তির (reverence) ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো ও সেই অজানা দেবতার পায়ে মাথা নত করে দিল।

রজনীর অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে ধরাকে অদৃশ্য করে ফেল্‌তে লাগলো। ধরা অন্ধকারে একেবারে মুখ লুকোবার পুর্ব্বেই আমরা বেলজিয়াম অতিক্রম করে জার্ম্মাণ রাজ্যে এসে পড়লাম। উদ্‌গ্রীব হয়ে এই নূতন দেশের চারিদিক্ দেখতে লাগলাম। আমাদের ট্রেণ হু হু করে গ্রাম ও নগর অতিক্রম করে যেতে লাগলো। দেখ্‌লাম চতুর্দ্দিকেই কলকারখানার সৃষ্টি। এগুলি দেখে মনে ধারণা হোল জার্ম্মাণী কোন দিকে ও কি ভাবে উন্নতি করেছে। জার্ম্মাণী যে তার মালপত্র দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ, শুধু ভারতবর্ষ কেন সমগ্র পৃথিবীকে যে ছেয়ে ফেলেছিল এই সব কলকারখানা দেখে তাহা সম্ভবপর ও সত্য বলে বেশ ধারণা হোল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিবিড় অন্ধকার চারিদিক্ ঘিরে ফেল্‌লো, আর এই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূরে এই সব কলকারখানার আলোকমালা কেবল দেখা যেতে লাগলো। আমরা চুপচাপ গাড়ীতে বসে এই সব কলকারখানার সৃষ্টি দেখতে দেখতে যেতে লাগলাম। জার্ম্মাণীর বিষয় অনেক জানবার ইচ্ছা থাকলেও ত আর উপায় ছিল না, কারণ ভাষা জানা নেই, যাঁরা গাড়ীতে আছেন তাঁদের ত আর জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই,

কাজেই মনের কৌতুহল মনেই রয়ে গেল। এইভাবে যেতে যেতে মাঝে আমাদের ট্রেণটা একটি ষ্টেশনে এসে থামলো। ষ্টেসনটি বেশ বড়। আমাদের একজন বল্লেন যে এই ষ্টেসনে নেমে কিছু খাবার জিনিষ কিনে নেওয়া যাক্। তিনি নেমে কিছু ফল ও রুটি প্রভৃতি কিনে আন্‌লেন। জিনিষগুলির দাম শুনে ত আমার বড়ই আনন্দ হোল, কারণ ইংলণ্ডে যে সব দাম দিয়ে আমরা ঐসব জিনিষ কিন্‌তাম তার তুলনায় ইহা খুব কম। বড় আনন্দ হোল যে জার্ম্মাণীতে খুব সস্তায় দিন চালান যাবে। জার্ম্মাণীতে খরচপত্র যে খুব কম এইখান থেকেই তার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। গাড়ী ছেড়ে দিল, আর আমরাও অল্পক্ষণের মধ্যে এই সস্তার ফলমূল শেষ করে ফেল্লাম, জানিনা রাত্রে আর কোথাও কিছু আহার জুটবে কি না।

রাত্রি প্রায় ৯।১০টার সময় আমাদের ট্রেণ কোলোন ষ্টেসনে এসে উপস্থিত হোল। বার্লিন যেতে এই ষ্টেসনে আবার ট্রেণ বদল করতে হবে। কাজেই আমরা মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। ষ্টেসনটী বেশ বড় ও তথায় বহু লোকের সমাগম। এই ষ্টেসনে অনেক ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য প্রভৃতিও দেখলাম। এরা জার্ম্মাণীর রাইন প্রদেশ অধিকার করে বসে আছে। জার্ম্মাণেরা প্রায় নির্ব্বাক্ হ'য়ে চলাফেরা করছে। পরাধীনতা ও পরবিধ্বস্ততার একটি কালিমা যেন এদের মুখে ফুটে উঠেছে! এদের আর্থিক অবস্থাও মোটেই ভাল বলে মনে হোল না। এখানকার ট্রেণে চতুর্থ শ্রেণী অবধি আছে, এবং এদের অধিকাংশই এই চতুর্থ শ্রেণীর যাত্রী। কোলোনটি একটি বড় জংশন। আমরা ষ্টেশনে নেমে ত একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কারণ জানা ছিল না কখন ও কোথা থেকে বার্লিনের ট্রেণ ছাড়বে। এইবার ভাষা না জানায় যে কি অসুবিধা তাহা বেশ অনুভব করা যেতে লাগল। যাই হোক্, আমাদের যে বন্ধুটি জার্ম্মাণ ভাষা কিছু পড়তে জান্‌তেন তিনিই অতি কষ্টে ষ্টেশনের লোকদের জিজ্ঞাসা করে ট্রেণ ঠিক করলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত হ'লাম ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই ট্রেণটি ষ্টেসনে এসে থাম্‌লো, আমরা আর অপেক্ষা না করে তাতে উঠে পড়লাম। কোলোন সহরটি দেখবার খুব ইচ্ছা থাক্‌লেও উপায় ছিল না, কারণ সহর দেখতে গেলে ওখানকার ব্রিটিশ কমাণ্ডারের আবার অনুমতি চাই সে অনেক হাঙ্গামা ও সময় সাপেক্ষ; তারপর আর একটা অসুবিধা ছিল রাত্রি বলে। কাজেই কোলোন দেখার আশা সেইখানেই পরিত্যাগ করতে হল।

কোলোন সহরটি রাইন নদীর উপরেই। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের ট্রেণ ছেড়ে দিল। রাইন নদীটি বেশ বড়, এর উপর দিয়ে ব্রিজ আছে। আমাদের ট্রেণখানি ওই ব্রিজের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে লাগলো। ব্রিজের উপর থেকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। নদীর দুইধারেই সহরের রাস্তাঘাটের আলোকমালা অন্ধকারের ভিতর জ্বলছে, আর চারিদিক্ প্রায় নিস্তব্ধ। অন্ধকার রাত্রির এই নিস্তব্ধতা মনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাব জাগিয়ে তুল্‌ছিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রাণটা এক গভীর আনন্দে নৃত্য করছিল। অন্ধকারের ভিতর আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, কাজেই রাইন প্রদেশের সৌন্দর্য্য দেখা আর ভাগ্যে ঘটে উঠল না। মহাযুদ্ধের সময় এই রাইন প্রদেশের বিষয় কতই না কাগজে পড়েছি ও শুনেছি, আর আজ সেইখানে এসে তাহা দেখা আর ঘট্‌লো না, এইজন্য মনে বড় দুঃখ হোল। ট্রেণখানি আস্তে আস্তে ব্রিজ পার হয়ে অন্ধকার ভেদ করে হু হু করে ছুটতে লাগল। আমরা কোলোন থেকে কিছু খাবার ও ২।৪টি লেমনেড পথে খাবার জন্য কিনে নিয়েছিলাম। ভাবলাম এইবার সেগুলির সৎকার করা যাক্, কারণ সমস্ত রাত্রিটা অনাহারে কাটান ঠিক নয়। সেইসব খাবারগুলি বাহির করে আমরা খেতে লাগ্‌লাম। আমাদের গাড়ীতে অনেকগুলি compartment ছিল এবং আমাদের compartmentএতে কয়েকজন জার্ম্মাণও ছিলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই ভদ্রলোক পয়সাওয়ালাও হ'বেন, কারণ তা না হ'লে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবার ক্ষমতা হোত না। এখানকার গাড়ীগুলিতে এক compartment থেকে আর একটীতে যেতে গাড়ীর ভিতর দিকেই রাস্তা আছে। আমাদের বিদেশী দেখে আরও ২।১ জন জার্ম্মাণ ভদ্রলোক সেই

রাস্তাটি দিয়ে এসে আমাদের compartmentএর সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগলেন। তাঁদের খুব ইচ্ছা হচ্ছিল যে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না। আমাদের আহারাদি শেষ হ'লে যখন সেই লেমনেডের বোতল খুলতে পারছিলাম না তখন সেই সুযোগ পেয়ে তাঁদের একজন তাড়াতাড়ি এসেই পকেট হ'তে একটি ছুরি বের করে আমাদের দিলেন। আমরা তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম এবং খুব ইচ্ছাও হচ্ছিল যে আলাপ করি কিন্তু ভাষা না জানায় উপায় ছিল না। সেই ভদ্রলোকেরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, অবশেষে নিরাশ হ'য়ে চলে গেলেন। আমরা রাত্রিটা বসে ও গল্প করেই কাটাতে লাগলাম। পথে যেতে দেখতে লাগলাম চারিদিকেই আবার কলকারখানার সৃষ্টি ও দূরে এই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর তারই আলোকমালা জ্বল্‌ছে। আমরা বলাবলি করতে লাগলাম যে জার্ম্মাণরা এদিকে এত কান্না গাইছে যে আমাদের reparation দেবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু এইসব কলকারখানা যেরূপ দিনরাত চল্‌ছে তা দেখলে কি কাহারও বিশ্বাস হ'বে যে ওদের অবস্থা বাস্তবিকই খারাপ? এতে ত ওদের সমৃদ্ধিশালী বলেই বোধ হওয়া উচিত এবং বাস্তবিকপক্ষেও তখন জার্ম্মাণীর ব্যবসা খুব জোরে চলছিল, চারিদিকেই জার্ম্মাণীর মালপত্রের এত কদর হয়েছিল যে উহারা তার যোগান দিয়ে উঠতে পারছিল না। অবশ্য বাহির হ'তে দেখলে সাধারণ লোকের মনে ঐরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নয় কিন্তু এর ভিতর অনেক জিনিষ আছে যাহা আমাদের বুঝা কঠিন, কাজেই এর মীমাংসা আমারা আর কি করব? এই সব আলোচনা করতে করতে রাত্রি কেটে যেতে লাগল। ক্রমে রাত্রি কেটে গিয়ে সূর্য্যদেবের আগমনে চতুর্দ্দিকের আঁধার কেটে গিয়ে আলোক দেখা দিতে লাগল। সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে বসেই কেটেছে, একটু ঝিমানি ছাড়া ত আর ঘুম হয়নি, কাজেই প্রভাতের এই দৃশ্য আর নয়নপথ এড়াতে পারলো না। দৃশ্যটি বড়ই ভাল লাগল। প্রভাত সব স্থানেই সুন্দর ও মনোরম, তাই প্রভাতের সমাগমে প্রাণ ভক্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রভাতের স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য্য রাত্রি জাগরণের অবসাদ কাটিয়ে দিয়ে মনকে এক নূতন ও সতেজভাবে পূর্ণ করে তুলল। উদ্‌গ্রীব হয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলাম, দেখলাম চতুর্দ্দিকেই খুব চাষ-বাসের সৃষ্টি, আর ফসলও বেশ উৎপন্ন হয়েছে। দেখে মনে হোল আমরা যে শুনেছিলাম যে জার্ম্মাণীতে খুব চাষবাস হয় তাহা সত্য। জার্ম্মাণ চাষারা মাঠেঘাটে কাজ করছিল।

সূর্য্যদেব ক্রমে ক্রমে গগনে উঠে পড়লেন, আর তাঁর রশ্মিজালে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রৌদ্রের এই শোভাটি বড় সুন্দর লাগছিল। বেলা প্রায় ৮৷৯টার সময় আমরা বার্লিনে এসে পৌঁছালাম। ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই দেখা গেল যে ২৷৩ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঐ ট্রেণেতেই আসার কথা ছিল বলে তাঁকে আন্‌তে ষ্টেসনে এসেছেন। তাঁদের দেখে ত আমাদের বড় আনন্দ ও ভরসা হোল। সুদূর বিদেশে স্বদেশবাসীর মুখ দেখলে যে কি আনন্দ হয় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন। আমরা ত তাঁদের ধরে বসলাম যে আমাদের একটা বন্দোবস্ত না করে দিলে আমরা ছাড়ব না। তাঁরাও তাতে আনন্দের সহিত রাজী হলেন, আর ভদ্রলোকটি সেই ট্রেণে না আসাতে আমাদের সব ঠিকঠাক করে দেবার বেশ সুবিধাও তাঁদের হয়ে গেল। তাঁদের কথামত আমরা মালপত্রগুলি ষ্টেশনের cloak-roomএতে রেখে কাছেই একটা রেষ্টোরাঁতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম কিছু প্রাতরাশ করা গেল। ইংলণ্ডে যেরূপ চার প্রচলন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি জায়গায় কাফির সেইরূপ প্রচলন। আমরা কিছু রুটি, মাখন ও কাফি ভক্ষণ করিলাম। এই হচ্ছে জার্ম্মাণীর প্রাতরাশ (breakfast) এবং এ বিষয়ে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে অনেক তফাৎ। সাধারণতঃ ইংলণ্ডের প্রাতরাশ একটু গুরু রকমের হয়, কিন্তু জার্ম্মাণীর কিছু লঘু রকমের। এই জন্য ইংলণ্ডে মধ্যাহ্ন ভোজনটি (luncheon) একটু দেরীতে হয় ও এত গুরু হয় না, কিন্তু জার্ম্মাণিতে মধ্যাহ্ন ভোজনটি একটু সকাল সকাল ও কিছু গুরুরকমের হয়। সে ভদ্রলোকেরা আমাদের সঙ্গে থাকাতে ভাষার জন্য যে অসুবিধা তা আর আমাদের কিছুই বোধ

কর্‌তে হোল না, তাঁরাই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে সব বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই ২।৩টি ভদ্রলোকের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি অনেকদিন বার্লিনে বাস করছেন ও ওখানে অধ্যাপনা করেন। আমরা আহারাদি সমাপন করে ট্রামে উঠে তাঁরই বাসাভিমুখে চললাম, কারণ তাঁর উপরই আমাদের সব বন্দোবস্তের ভার পড়লো। উৎসুক নয়নে ট্রাম হ'তে চারিদিক দেখ্‌তে লাগলাম। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও বড় এবং দুই দিকেই বড় বড় বাড়ী ও দোকানপাট। আমাদিগকে বিদেশী ও কৃষ্ণবর্ণ দেখে জার্ম্মাণরা খুবই অবাক্ হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ছিল, কিন্তু আমরা তাহা গ্রাহ্য না করে ক্রমে তাঁর বাসায় এসে উপস্থিত হ'লাম। তাঁর বাসাটি একটি বাড়ীর একটি flat। সেই ভদ্রলোকের গৃহকর্ত্রীটি বেশ ভদ্র ও শিক্ষিতা এবং ইংরাজি ভাষাতেও কিছু দক্ষা। তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হোল। তখন বেলা হয়েছিল, তিনি আর বেশী অপেক্ষা না করে আমাদের স্নানাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে আহারাদির জোগাড় করতে গেলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ প্রভৃতিতে শরীরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, স্নানাদি করে ও তৎপর কিছু আহারাদি করে সেই অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হোল। সেই গৃহকর্ত্রী ও ভদ্রলোকটির যত্নেও মনে বড় শান্তি ও আনন্দ লাভ করা গেল।

এখন বাড়ীর সন্ধানে বেরুতে হ'বে। আমার এক বিশেষ বন্ধু কিছুদিন পূর্ব্বে বার্লিনে এসেছিলেন জান্‌তাম এবং মনে হ'তে লাগলো যে এই সময় তার একবার দেখা গেলে বড়ই ভাল হয়, কিন্তু তাঁর ঠিকানা জানা না থাকায় সে আশা পূর্ণ হ'বার আর আশা দেখছিলাম না। যাই হোক্, তাঁর নাম করে সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আগেই বলেছি যে সে ভদ্রলোকটি বার্লিনে অনেকদিন যাবৎ আছেন এবং অনেক ভারতবাসীরই সন্ধান রাখেন, তাঁকে আমার বন্ধুটির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতেই বললেন যে হাঁ, তিনি জানেন, তিনি তাঁর পাশের বাড়ীতেই এক বোর্ডিং হাউসে থাকেন। এই কথা শুনে ত আমার অত্যন্ত আনন্দ হোল এবং তখনই তাঁকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমার বন্ধুটি তখন বাসাতেই ছিলেন, কাজেই দেখা হয়ে গেল। তিনিও আমাকে দেখে ভারি খুসী এবং তখনই আমার জন্য সেই বাসাতেই যে একটি ঘর খালি ছিল তাহা বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমার অপর দুই সহযাত্রীর একজন একটি হোটেলে উঠ্‌লেন ও আর একজন অপর একটি বোর্ডিং হাউসে বন্দোবস্ত করে নিলেন। আমি যে বাসাটি ঠিক করলাম সেখানে আমার বন্ধু ছাড়া আর একজন ভারতবাসী ছিলেন, তিনি পাঞ্জাব দেশীয়। এ বাসাটিও একটি flat ও বেশ সুন্দর। আমাদের গৃহকর্ত্রীটি বুড়ি, একলাই সেই বাড়ীতে থাকেন, কাজেই সেখানে কোনওরূপ গোলমাল বা অসুবিধা ছিল না, আমরাই যেন বাড়ীর মালিক। বৃদ্ধাটি শিক্ষিতা ও বেশ সম্ভ্রান্ত, তাঁর স্বামী কাইজরের শাসনকালে একজন বেশ বড় সৈনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। কাইজারের নিজ হাতে সহি করা একখানি ফটোগ্রাফ তাঁর ঘরে রয়েছে দেখালেন। স্বামীর মৃত্যুতে ও জার্ম্মাণির মুদ্রার মূল্য অত্যন্ত কমে যাওয়ায় তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে, সেই জন্য এইরূপ ঘর ভাড়া দিতে বাধ্য হন। এক কালে তাঁর অবস্থা যে বেশ ভাল ছিল তাহা তাঁর বৈঠকখানাটি দেখেই বেশ বুঝতে পারা গেল, কারণ তাহা সুন্দর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। এখন আমরাই তার ভোগদখলকারী। ইচ্ছা হোত এই ঘরটি খুব ভোগ করি, কিন্তু বাড়ীতে থাক্‌বার সুযোগ দিনরাতের ভিতর খুব কম সময়ই ঘটে উঠ্‌তো বলে তা আর ভাগ্যে হোত না। আর এমন সুন্দর ঘরে থাকা প্রভৃতির খরচও খুব কম। তখন জার্ম্মাণির মুদ্রার যা মূল্য ছিল তাতে ঘর ভাড়া ও প্রাতরাশ (breakfast) নিয়ে রোজ আট আনারও কম দিতে হোত। তারপর আমাদের প্রাতরাশ যা ছিল (অর্থাৎ সাদা রুটি, ডিম, মাখন, ইত্যাদি) তা তখন ওখানকার বড়লোকদের খাদ্য। এত সস্তায় পৃথিবীর আর কোথাও হোত বলে আমার জানা নেই। এত সস্তা বলে মনে আরও আনন্দ হোল। বিদেশে গেলেই সাধারণতঃ খরচ অনেক বেশী হ'য়ে যায়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তখনকার ঘর ভাড়া প্রভৃতির যা rate ছিল তা জার্ম্মাণদের পক্ষে

অবশ্য খুবই অধিক, কিন্তু আমাদের পক্ষে খুবই সস্তা, এই জন্য গৃহকর্ত্রী প্রায় প্রত্যহই বলতেন যে তোমাদের বড় সস্তায় হচ্ছে, দর বাড়াও, এবং কিছু কিছু বাড়িয়ে নিতেও ছাড়তেন না। ইঁনি জার্ম্মাণ ইহুদী, কাজেই অর্থের প্রলোভনটা এর একটু বেশী মাত্রায় থাকাটা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু এইরূপ দর বাড়িয়ে নিলেও আমাদের কিছুই গায়ে লাগাতো না, যেমন সস্তায় সেইরূপ সস্তাতেই হোত, কারণ তখন প্রায় প্রত্যহই জার্ম্মাণ মুদ্রার (মার্কের) দাম বাজারে কম্‌ছে। শুনেছি তখন যে সব ভারতীয় ছাত্রেরা জার্ম্মাণিতে অধ্যয়ন করত তাদের মাসিক খরচ ২৫/৩০ টাকার অধিক লাগত না। এত সস্তায় আমাদের ভারতবর্ষেও চলে না। সেই জন্য তখন অনেক ভারতীয় ছাত্র জার্ম্মাণিতে গিয়ে পড়েছিল।

বাসা ঠিক করে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এবার বার্লিন সহর দেখবার সুযোগ হ'ল। বার্লিন সহরটী বেশ সুন্দর। দেখলে মনে হয় সহরটি বেশী পুরাতন নয়, এবং বাস্তবিক পক্ষেও তাই। সহরটীর অনেক জিনিষ দেখে মনে হোল যেন জার্ম্মাণরা ফরাসীদের কাছ থেকে তার প্ল্যানটি নিয়েছে। রাস্তাঘাটগুলিও বেশ তবে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সুরক্ষিত নয়। সহরের ভিতর দিয়ে একটী খাল গেছে এবং এই খাল দিয়ে দেখ্‌লাম ছোট ছোট ষ্টিমার মাল পত্র নিয়ে যাতায়াত করছে। এই সব দেখ্‌লে মনে হয় যে জার্ম্মাণীর বাস্তবিকই এক সময়ে খুব সমৃদ্ধি হয়েছিল, কিন্তু আজ সে সমৃদ্ধি কোথায়? যুদ্ধে বাস্তবিকই এদের মহাক্ষতি করেছে। আমরা নূতন ত সেদেশে গেছি, কিন্তু আমাদের চোখে এই বোধ হ'ল যে চারিদিকেই যেন তার চিহ্ন তখনও ফুটে রয়েছে। বাড়ীঘরগুলিও বেশ বড় বড় এবং তার অধিকাংশগুলিতে lift ও telephoneএর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু এখন তা অকর্ম্মণ্য, কারণ তাহা চালাবার জায়গা কোথায়? আর লোকেদের অবস্থার ত কথাই নেই, তাদের কষ্ট দেখে আমাদেরই অত্যন্ত কষ্ট ও দয়া হোত। গত মহাযুদ্ধে এদের বাস্তবিকই বড় দুর্দ্দশা হয়েছে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্তদের। কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পরিবারের ভিতর থাকলেই এর বেশ জ্ঞান হয়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন দুর্দ্দশা যে তারা ভাল ময়দার রুটী, ডিম, মাখন, মাংস প্রভৃতি অতি সামান্যই খেতে পায়, এগুলি তখন ওখানকার পয়সাওয়ালা লোকদের আহার। অবশ্য আমাদের ন্যায় গরম দেশ হ'লে ওসব জিনিষ খেতে না পেলেও বিশেষ এসে যেতো না, কিন্তু ঐরূপ শীত প্রধান দেশে ঐরূপ পুষ্টিকর খাদ্য না খেলে লোকের বাঁচা দায়। তাই দেখ্‌তাম যে অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে ও ক্ষয়রোগ তাদের গ্রাস করবার জন্য যেন মুখ ব্যাদান করে রয়েছে। আমার এক বন্ধু যে বোর্ডিং হাউসটীতে থাকত সে বাড়ীর গৃহকর্ত্রীর একটী ছোট ছেলে ছিল—৭।৮ বছরের হ'বে। একদিন গিয়ে তাকে দেখে বাস্তবিকই বড় কষ্ট হোল। সে ছেলেটীর রংও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর শুনলাম যে তার consumptionও নাকি হয়েছে। সে বেচারার খাবার লোভও খুব। আমার বন্ধুটী তার ঘরে কোথাও খাবার জিনিষ এনে রাখলে সে একবার তা দেখতে পেলে তা না নিয়ে আর সেখান থেকে নড়বে না; কিন্তু তার স্বাস্থ্যের যেরূপ অবস্থা তাতে তাকে ঐসব জিনিষ দেওয়াও নিরাপদ ছিল না, কাজেই মহামুস্কিল। এ দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয়বিদারক। এরূপ দৃশ্য মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরেই দেখা যেতো। এই সব দেখে মনে হোত যে আমরা যে শুনেছিলাম যে জার্ম্মাণী খাদ্যের অভাবে যুদ্ধে হেরে গেল তা বাস্তবিকই সত্য। আর তাদের পোষাকের অবস্থাও তদনুরূপ। যখন ভাল খেতে পারনা তখন আর ভাল পোষাক পাবে কোথা থেকে? দেখ্‌তাম অধিকাংশ মেয়ে ছেলের পায়ে মোজা নেই এবং পোষাকের অবস্থাও জীর্ণ। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকাল ছিল, কিন্তু শীতকালেও ওদের বিশেষ জোটে বলে মনে হয় না। আমরা ইংলণ্ড বা ফ্রান্সে এরূপ দৃশ্য দেখি নি। এই সব দুর্দ্দশার জেরটা পূর্ব্বেই বলেছি যে, মধ্যবিত্তদের উপরই পূর্ণ জোরে পড়েছে। সব দেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা কষ্টকর, বিশেষতঃ দেশে যখন কোনও বিপদ উপস্থিত হয়। একদিকে জার্ম্মাণীর মুদ্রার দাম বাজারে প্রত্যহই কমে যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্রের দামও বাড়ছে, কিন্তু তদনুসারে লোকদের মাহিনা ত আর বাড়ছে না, কাজেই দুর্দ্দশা না হয়ে আর

যায় কোথায়? এ বিষয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরিয়াদের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। তারা ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে ও আফিস, কলেজ প্রভৃতিতে চাকুরী করে, মনে করলেই ত আর ধর্ম্মঘট করতে পারে না, কারণ আত্মসম্মানের জ্ঞান বড় বেশী! এদের কিরূপ অবস্থা তার এক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ওখানকার ইউনিভার্সিটির একজন খুব বড় প্রফেসরের মাহিনা হয়ত মাসে ৩০০০।৪০০০ মার্ক। এতে তখন আমাদের টাকায় হয়ত ৫০।৬০ টাকার অধিক হোত না। কাজেই এতে তাঁর পরিবারবর্গের কিরূপে কুলান হয়? অথচ উপায় নেই, চাকুরী ছাড়তে পারেন না এবং অন্য উপায়ও নেই। তাই দেখ্তাম যে দুপুরের আহারের সময় এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই (যথা, ছাত্র, মাষ্টার, আফিস প্রভৃতির কেরাণী) শুকনা রুটী চিবোচ্ছে, তাতে মাখন অথবা মাংসের লেশও হয়ত নেই। আবার যে রুটী তাও আবার অতি নিকৃষ্ট আটার তৈরী, এবং প্রায় কাল বললেও চলে। ওদের সপ্তাহে হয়ত একদিন মাংস ভাগ্যে জোটে। কিন্তু এ বিষয়ে শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল ছিল। তারা কেবলই ধর্ম্মঘট করে করে মাহিনা বাড়িয়ে নিত, কাজেই তাদের আর এতটা দুর্দ্দশা হ'বার কিছু ছিল না। এ বিষয়ে আর অধিক লেখ্বার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশের অবস্থাও এখন ঠিক ঐরূপ। ভদ্রলোকের ছেলেরা খেতে পায় না, কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা তাদের চেয়ে অনেক ভাল!

বার্লিন সহরটী বড় হলেও লণ্ডনের তুলনায় অনেক ছোট; এখানকার ট্রাম, বাস, প্রভৃতি ও তার যাত্রীর সংখ্যাও লণ্ডনের ঐ সকলের তুলনায় অনেক কম। বার্লিন সহরটী ঘুরতে সাধারণতঃ ওখানকার overbridge ট্রেণই লোকে ব্যবহার করে থাকে। এ রেলগুলি রাস্তার উপর ব্রিজ দিয়ে গেছে। ষ্টেসনগুলি রাস্তার উপরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্তে হয়। বার্লিনে অবশ্য ট্রাম, মাটীর নীচ দিয়ে (underground) রেলওয়ে, প্রভৃতিও আছে, কিন্তু এই রেলগুলিতেই বেশী ভিড়, এবং বার্লিনের এক প্রান্ত হ'তে আর একপ্রান্তে যেতে এই রেলেই সুবিধা। বার্লিনে এই বন্দোবস্তটি নূতন। মাটীর নীচ দিয়ে যে রেলওয়েটী আছে সেটী বিশেষ বড় নয়। আমরাও সাধারণতঃ ঐ overbridge রেলেই যাতায়াত করতাম। এই ট্রেণে আবার সাপ্তাহিক টিকিট পাওয়া যেতো, তাতে ১ সপ্তাহকাল যতবার ইচ্ছা যাতায়াত করা যেতো। এইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি সাপ্তাহিক টিকিট কিনতে আমাদের মাত্র ৩।৪ আনা পড়ত। ট্রাম, underground রেল প্রভৃতিতেও ভাড়া ঐরূপ কম লাগত। নূতন দেশে গেলেই ঘুরাঘুরি করতে অনেক খরচ হয়ে যায় কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বড় সুবিধা ছিল কাজেই আর কিছু গায়ে লাগত না। এক জায়গা হ'তে আর এক জায়গায় যেতে ট্রেণের ভাড়াও খুব সস্তা ছিল, ৭।৮ আনায় ১০০ মাইলের উপর তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়া যেত। ট্যাক্সি ও গাড়ী ভাড়াও খুব সস্তা ছিল যদিও এরা বিদেশীদের কাছ থেকে অনেক বেশী ভাড়া আদায় করে নিত। এরূপ সস্তায় ঘুরাফেরা আমাদের দেশেও হয় না, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ত কথাই নেই।

কেবল যে কলকজাদির ভাড়া কম ছিল তা নয় হোটেল প্রভৃতিতে খাওয়াদাওয়া ও আমোদ প্রমোদের খরচও খুব কম ছিল। বার্লিনে অনেক বড় ও ভাল হোটেল ও রেষ্টোরাঁ আছে। এখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভাল। এ সকল স্থানে এলে জার্ম্মাণদের যে দুর্দ্দশার কথা উপরে বলেছি তার ধারণা হওয়া কঠিন, অপর পক্ষে উহাদের অবস্থা ভাল বলেই বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। বার্লিনের একটি রাস্তা আছে যেখানে যত ভাল ভাল ও বড় রেষ্টোরাঁ ও হোটেলের আড্ডা। এ রাস্তাটির নাম Unter den Linden। এখানকার একটি রেষ্টোরাঁতে একদিন আহার করতে গিয়ে দেখলাম যে, খাওয়াদাওয়া বেশী ভাল, ব্যাণ্ডের বন্দোবস্ত আছে ও লোকজনের সমাগমও খুব। এ সব স্থানে সাধারণতঃ বিদেশীদের ও ধনী জার্ম্মাণদের আড্ডা। জার্ম্মাণীতে যাঁরা ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিক তাঁরা খুব ধনী, কাজেই এসব জায়গায় তাঁরাই সাধারণতঃ আসেন ও থাকেন। দেখলাম এরূপ fashionable রেষ্টোরাঁতেও আমাদের আহার করতে এক এক জনের ১৲ টাকার ভিতরেই হয়ে গেল। আমাদের কাছে খুব সস্তা বলেই মনে হোল। জার্ম্মাণীর রেষ্টোরাঁগুলিতে

আমাদের একটি অসুবিধা আছে। জার্ম্মাণীতে বিয়ার খুব তৈয়ার হয় এবং এখানকার লোকেরা জলের পরিবর্ত্তে এই বিয়ার খায় ও মদও খায় যাদের একটু পয়সা আছে। এই সব রেস্তোরাঁতে খেতে গিয়ে জল চাহিলে জল কিছুতেই দিতে চায় না, এবং এতে waiterরা দূরে গিয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের চেয়ে থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা মদ খাইনা বলে তারা অবাক্ হয়, এবং জল সহজে দিতে চায় না এইজন্য যে, আমরা মদ খেলে তাদের দু'পয়সা লাভ হয়, কিন্তু জল খেলে ত আর হয় না! এতে আমাদের বড় অসুবিধায় পড়তে হোত। ফ্রান্সেও মদ খাওয়ার ঘটা এইরূপ। বার্লিনে আর একটি জিনিষেরও সৃষ্টি খুব, তা হচ্ছে cabaret। জার্ম্মাণীর এই cabaretগুলি এক নূতন ধরণের—ইহা রেস্তোরাঁ ও যাকে variety show বলে তাহা একত্রে। এখানে যাঁরা বিলাতী থিয়েটারে যান্ তাঁরা variety show কাকে বলে জানেন। এই cabaret গুলিতে variety show দেখান হয় ও তার সঙ্গে খাবারও বন্দোবস্ত আছে। লোকেরা যখন খেতে থাকে তখন এই সব variety show দেখান হয়। এখানে যাঁরা খানা খাবেন না তাঁদের অন্ততঃ কিছু মদ বা কফি খেতে হ'বে এইরূপই নিয়ম। এখানে আবার দর্শকবৃন্দদের নাচও হয়। এখানকার এইসব ব্যাপার আমাদের জানা ছিল না, আমাদের ধারণা ছিল এখানে কেবল variety showই দেখান হয়। কাজেই আমরা একদিন টিকিট কিনে বাহিরের একটি রেস্তোরাঁতে খেয়ে গিয়ে হাজির হয়েছি। কিছুক্ষণ পরে waiter এসে অর্ডার চাচ্ছে। আমরা ত বললাম আমরা খেয়ে এসেছি, কিছু খাবনা। তখন সে মদের কার্ড দিয়ে অর্ডার চাহিল। আমরা বললাম যে আমরা মদ খাই না, অন্য কিছু পানীয় থাক্‌লে খেতে পারি। সে উত্তরে বল্‌ল যে কাফি আছে, কিন্তু তাতেও মদ দেওয়া, কারণ এখানে মদ খাওয়াই রীতি ও নিয়ম। আমরা ত বড় মুস্কিলে পড়্‌লাম ও অপ্রস্তুতও হ'লাম, কারণ অনেকেই আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিল। তখন গত্যন্তর না থাকায় আমি তাকে বললাম যে আমরা এসব জানতাম না।

তাহলে আমাদের এই স্থান ছাড়তে হ'বে তাতে সে বলল যে না, তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করতে হ'বে না, সেরূপ কিছু নিয়ম নেই, তবে তোমরা মদ খেলে আমরা দুপয়সা পেয়ে থাকি, সেটা থেকে বঞ্চিত হলে আমাদেরই লোকসান। আমরা তখন পকেট থেকে কিছু পয়সা বাহির করে তাকে এমনই দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে দিলাম, তাতে সেও খুসী হ'য়ে চলে গেল। আমাদেরও একটি নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হোল। তারপর আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে variety show দেখ্‌লাম এবং বেশ ভালও লাগল। দেখলাম এখানেও অনেক লোকের সমাগম। এখানেও ঐ বিদেশী ও ধনীদের আড্ডা।

বার্লিনে অনেকগুলি সিনেমা, থিয়েটার ও অপেরা হাউস আছে। এগুলিতেও লোকজন বেশ। অপেরা আর্টের একটি বড় জিনিষ, এবং এখানে যা দেখলাম তা বেশ লাগল। বার্লিনে আর একটি আমোদ প্রমোদের বড় জায়গা হচ্ছে পার্ক। এরূপ পার্ক দুইটি আছে, তার মধ্যে বড়টি হচ্ছে Luna Park এবং এইখানেই বহু লোকের সমাগম হয়। এই পার্কে ঢুক্‌তে হ'লে টিকিট কিন্‌তে হয়। এর ভিতর আবার নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা আছে, যথা—Alpine railway, laughing gallery, ইত্যাদি, এবং এর প্রত্যেকটিতে আবার ঢুক্‌তে হ'লে আলাদা জায়গা দিয়ে টিকিট করতে হয়। কলিকাতায় বড় দিনের সময় যে carnivalগুলি হয় তাতে গেলে এর একটু আঁচ পাওয়া যায়। Luna Parkটি বেশ সুন্দর, বিকালে ঢুকে দুপুর রাত্র অবধি বেশ আমোদ প্রমোদ করা যায়। এখানে bandএর ব্যবস্থা আছে, বড় বড় রেস্তোরাঁ আছে এবং সপ্তাহে ২।১ দিন আবার রাত্রে নানা রকম বাজী দেখান হয়ে থাকে। এ বাজীগুলি (fireworks) খুব সুন্দর, জার্ম্মাণরা এ বিষয়ে বেশ সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ রকেটের কথা যে অত শুনতে পাওয়া যেতো সেই সব রকেট অনেক দেখলাম, এগুলি বাস্তবিকই সুন্দর। এখানে আর একটি জিনিষ আছে যাহা দেখবার মত। একজন লোক খুব উঁচু শূন্যে একটা তারের উপর

খুব উঁচু tower হ'তে search-light ফেলা হয়। এটি বাস্তবিকই একটি নূতন জিনিষ। এরূপ ব্যাপার দেখলাম কেবল বার্লিনেই আছে। এই পার্ক থেকে অনেকের বেশ রোজগার হয়। এখানে বিদেশীরা অনেকে যায়, তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জার্ম্মাণরাও যায়, কারণ ইউরোপীয় জাতি আমোদপ্রিয়, অবস্থা খারাপ হ'লেও যে কোনও প্রকারে জোগাড় করে কিছু আমোদ করা চাই। আমরা ৬।৭জন জাপানী মিলে একদিন এই পার্কে গিছলাম। আমাদের দেখে জার্ম্মাণরা ত অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে, আর কোথাও একটু দাঁড়ালেই চারিদিকে ভিড় জমে যায়। বুড়ো থেকে আরম্ভ করে ছোট ছেলে অবধি দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে দেখে। এই ব্যাপার জার্ম্মাণীর সব জায়গাতেই ঘটে থাকে। কৃষ্ণবর্ণের লোক দেখে ওরা অবাক্ হয়ে যায়, কারণ ওরা কৃষ্ণবর্ণের লোক খুব কমই দেখেছে এবং ওদের অনেকেই হয়ত একেবারেই দেখেনি। এতে অবশ্য আমাদের খারাপ লাগতো, কারণ এটা বড় অসভ্যতা; লোকে এতে বড় অপ্রস্তুত হয়ে পরে। কিন্তু এ বিষয়ে জার্ম্মাণদের আবার আর একদিকে খুব সাদাসিদা বলা যায়, কারণ তারা তাদের ভাব লুকাবার চেষ্টা করে না। এ বিষয়ে ইংরাজরা অন্য প্রকার, তারা কৌতূহলবশতঃ দেখলেও এরূপভাবে নয়। তাদের উপরের সভ্যতাটা খুব বেশী।

আগেই বলেছি যে ভাল ভাল হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রভৃতি বিদেশীদের আড্ডা। জার্ম্মাণদের পক্ষে সে সব জায়গা খুব খরচের হলেও আমাদের কাছে বেশ সস্তা, কারণ তখন জার্ম্মাণ মুদ্রার দাম খুব কমে গেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতী ১টি পাউণ্ডে (আমাদের দেশে ১৫ টাকায়) ৩০টি জার্ম্মাণ মার্ক পাওয়া যেতো, আর আমরা যখন গিছলাম তখন ১ পাউণ্ডে ২০০০/২৫০০ মার্ক হয়েছে। কাজেই ভেবে দেখুন কত কম। আমরা গিয়ে বেশ সস্তায় ওদের জিনিষ সব খেয়ে যাচ্ছি আর ওদের অধিকাংশ লোকেই ভাল খেতে পাচ্ছে না এই দেখে জার্ম্মাণদের বড় রাগ ও ক্ষোভ হোত। এইজন্য দেখতাম যে কোনও রেস্তোরাঁতে ঢুকলেই জার্ম্মাণরা যে ভাবে কটমট করে চেয়ে রয়েছে কোনদিন মেরে না বসে! একদিন জার্ম্মাণীর একটি উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ ভদ্রলোক আমার এক বন্ধুর নিকট বলেন যে দেখ, আমি যখন দেখি যে তোমাদের দেশের লোকেরা আমাদের রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে বেশ ভাল ভাল জিনিষ আহার করছে, তখন আমার ইচ্ছা হয় যে গলায় ধাক্কা দিয়ে তাদের বাহির করে দিই। তার উত্তরে আমার বন্ধুটি বলেন যে, আমাদের দেশের লোকদের আপনাদের জিনিষ সস্তায় উপভোগ করতে দেখলে আপনার এত গাত্রদাহ, আর আপনার দেশের লোক যখন আমাদের দেশ থেকে কত জিনিষ লুটে পুটে এনে এখানে বেশ ভোগ করে তা দেখে আপনার কিরূপ মনোভাব হয়? এর উত্তরে আর কথা নেই! এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই ওদের মনোভাব বেশ বুঝা যায়।

জার্ম্মাণীতে দেখলাম জিনিষপত্রের দামও খুব কম। যে সব জিনিষ জার্ম্মাণীকে অন্য দেশ থেকে আমদানী করতে হোত না সে সব জিনিষের দাম খুবই কম ছিল। কাগজ পত্র; সাদা কাপড়ের জিনিষ, খেলনা পত্র, ফটোগ্রাফের জিনিষ, প্রভৃতি খুব সস্তা ছিল, কিন্তু চামড়া ও পশম প্রভৃতির জিনিষ সস্তা ছিল না, কারণ ঐ সকল জিনিষ জার্ম্মাণীকে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হোত। জিনিষপত্র এত সস্তা দেখে জার্ম্মাণীতে আমাদের যাঁরাই যেতেন তাঁরাই ফটোগ্রাফের ক্যামেরা ও তার সাজ সরঞ্জাম, দুর্ব্বিণ, প্রভৃতি নানা জিনিষ কিনে বসতেন, কিন্তু জার্ম্মাণী থেকে আসবার সময়ে অনেককেই বিপদে পড়তে হয়েছিল, কারণ ঐ সব জিনিষ জার্ম্মাণীর বাহিরে নিয়ে যেতে গেলেই duty দিতে হোত, এবং সে duty ও বেশ বেশী রকমের। কিন্তু তা দিয়েও অনেক লাভ থাকত। আবার কাহারও কাহারও কাছ থেকে জিনিষপত্র চেয়েও নিয়েছিল। কাজেই যাঁরা ঐ সব জিনিষ নিয়ে ওদের হাত এড়িয়ে পালাতে পেরেছিলেন তাঁরাই সৌভাগ্যবান। জার্ম্মাণীতে একটি জিনিষ কিনতে যা দাম পড়ত সেই জিনিষটি জার্ম্মাণীর বাহিরে নিয়ে যেতে হ'লে প্রায় তার তিন গুণ পড়ে যেতো। আমি যখন বার্লিনে যাই তখন

প্রায় ১০০৲ টাকা চাইল, কিন্তু যখন বললাম যে ভারতবর্ষে পাঠাব তখন বলল যে ৩০০৲ টাকা লাগবে। কিন্তু তা হলেও অনেক সস্তা দেখলাম। কলিকাতায় এসে সেইরূপ একটি জার্ম্মাণ অর্গ্যানের দাম দেখলাম ১০০০৲ টাকা। জার্ম্মাণরা কি করে এত সস্তায় জিনিষ দিত এইটাই আশ্চর্য্য। এত সস্তায় পৃথিবীর কোথাও জিনিষ পাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা যে যুদ্ধের সময় শুনেছিলাম যে ইংলণ্ডের অধিকাংশ জিনিষ জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত হয়ে আসে এবং ওঁরা সেটিতে নিজেদের ছাপ দিয়ে অনেক বেশী দামে এখানে বিক্রয় করেন সেটি সত্য। কারণ একদিন আমার এক বন্ধু বার্লিনের একটি দোকানে ১ জোড়া হাতের দস্তানা ক্রয় করেন এবং হঠাৎ তাঁর নজর ঐ দস্তানার বোতামের উপর পড়াতে দেখেন যে লেখা আছে "English made"। এতে তাঁর বড় আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে দোকানদারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তার উত্তরে দোকানদার বলে যে, এসব জিনিষ জার্ম্মাণীতেই প্রস্তুত তবে এগুলি ইংলণ্ডে রপ্তানির জন্য। এই থেকেই ব্যাপারটি সব বোঝা গেল। এ বিষয়ে অধিক লিখবার দরকার নেই, অনেকেই এর কিছু জানেন। জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের বাজারে যে সব খেলনা প্রভৃতি বিক্রয় করত তার যা দাম তা ইংলণ্ডে ঐ সব জিনিষের উপকরণের (raw materials) দাম অপেক্ষাও কম। বার্লিনে বেশ বড় বড় অনেক দোকান আছে এবং তাতে নানারকমের জিনিষপত্র বিক্রী হয়। এই সব দোকানে আমাদের জিনিষপত্র কিনতে গেলে কোনও অসুবিধায় পড়তে হোত না, কারণ দেখতাম জার্ম্মাণীর এই বিশেষত্ব যে প্রত্যেক বড় দোকানেই ইংরাজী জানা লোক থাকে এবং আমরা গেলে এঁরা এসে আমাদের সব বন্দোবস্ত করে দিতেন। জার্ম্মাণীতে ইংরাজি জানা লোক অনেক আছে, যাঁরাই একটু লেখাপড়া শিখেছেন তাঁরাই ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শী। এ বিষয়ে জার্ম্মাণরা সকলের অগ্রণী এবং এইজন্য জার্ম্মাণরা বড় ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলে খ্যাতি আছে।

গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণদের খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে কিরূপ দুর্দ্দশা হয়েছিল আগেই বলেছি। এই দুর্দ্দশা যে কেবল মানুষের হয়েছিল তা নয়, পশু প্রভৃতিরও যথেষ্ট হয়েছিল। বার্লিনের zoo-gardenএতে গিয়ে তার বেশ পরিচয় পাওয়া গেল। দেখলাম খাদ্যাভাবে অনেক ত মরেই গেছে, আর যেগুলি অবশিষ্ট আছে সে গুলিও উপযুক্ত খাদ্যাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর। মানুষেরাই যখন উপযুক্ত খাদ্য পায় না তখন জীবজন্তুরা আর কোথা থেকে পাবে? এই zoo-gardenটি দেখলে মনে হয় যে একসময়ে এর অবস্থা বেশ ভাল ছিল ও বেশ একটা দেখবার জিনিষও ছিল। এত দুর্দ্দশার ভিতরও দেখলাম যে, তখনও বেশ একটি সুন্দর দেখবার জিনিষ রয়েছে, তা হচ্ছে aquarium, অর্থাৎ জলের নীচে যে নানা প্রকারের মৎস্য নানাভাবে বাস করে সেগুলি কৃত্রিম উপায়ে সেই ভাবে রাখা হয়েছে। দেখলাম এর সংগ্রহ খুব সুন্দর এবং বাস্তবিকই একটি দেখবার জিনিষ। আমাদের ভারতবর্ষে মান্দ্রাজে গভর্ণমেণ্টের এরূপ একটি aquarium আছে, কিন্তু জার্ম্মাণির কাছে তাহা অনেক ছোট ও ওরূপ সুন্দর নয়। মনে হোল যে ঐ aquariumটিই যেন এখনও ঐ zoo-gardenএর সুদিনের পরিচয় জাগিয়ে রেখেছে! এই সব দেখে বাস্তবিকই মনে বড় কষ্ট হোল।

বার্লিনে যে সব কলেজ, টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রভৃতি আছে সেগুলিও দেখবার জিনিষ এবং এগুলি যে এককালে শিক্ষাবিস্তারের বড় বড় কেন্দ্র ছিল একথা অনেকেই বোধ হয় জানেন। কিন্তু যুদ্ধে জার্ম্মাণদের এরূপ দুর্দ্দশা হওয়ায় আর সেরূপ সুদিন নেই। অর্থকষ্টে সব জিনিষেরই দুরবস্থা। কিন্তু তাহলেও জার্ম্মাণরা বড় বিদ্যোৎসাহী, এত দুর্দ্দশার ভিতরেও তারা বিদ্যাচর্চ্চায় পশ্চাৎপদ নয়। জার্ম্মাণীর বিষয় যাঁরাই কিছু জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ইউরোপের মধ্যে জার্ম্মাণিতে শিক্ষিতের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট রাজস্বের অধিকাংশই বিদ্যা-শিক্ষার জন্য ব্যয় করতেন। এককালে আমাদের ভারতবর্ষ হ'তে অনেক ছেলে জার্ম্মাণির নানা ইউনিভার্সিটিগুলিতে অধ্যয়ন করতে যেতো, কিন্তু যুদ্ধের সময় হ'তেই তাহা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, এবং এখন

কিছু কিছু গেলেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। এজন্য জার্ম্মাণরা বড় দুঃখিত। তাঁরা চান যে আমাদের ভারতবাসী ছেলেরা আবার দলে দলে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁদের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করতে যায়। এ বিষয়ে এরূপও ঘটেছে যে, কোনও ভারতবাসী ছেলে ওঁদের কোনও ইউনিভার্সিটি দেখ্‌তে গেলে অতি যত্ন সহকারে সব দেখিয়েছেন ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তোমরা আমাদের এখানে আর পূর্ব্বের ন্যায় আস না কেন? এখানে এলে আমরা তোমাদের অতি যত্ন সহকারে শিখাব, ইত্যাদি। এটি বাস্তবিকই ওদের আন্তরিক ভাব! সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম যে জার্ম্মাণীতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ওঁরা আমাদের তিনজন ভারতবাসীকে বৃত্তি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁরা যে একটি চিঠি বাহির করেছেন তাতে ভারতবর্ষকে জার্ম্মাণী কিরূপ সুনজরে দেখে প্রভৃতি অনেক কথাই আছে। এটি বাস্তবিকই বড় সুখের বিষয়। ইয়োরোপে জার্ম্মাণীর সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কারণ আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্র প্রভৃতির চর্চ্চা জার্ম্মাণীতেই প্রথম আরম্ভ হয় ও তার ভাবের দ্বারা জার্ম্মাণ চিন্তার ধারাও অনেক প্রভাবান্বিত হয়েছে। এখন ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে আমরা সংস্কৃত প্রভৃতির বহুল চর্চ্চা দেখতে পাই তার মূলে জার্ম্মাণীই। জার্ম্মাণরা ভারতবর্ষকে বাস্তবিকই সম্মানের চক্ষে দেখেন। অনেকেই নিশ্চয় জানেন যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ জার্ম্মাণীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও আদর পেয়ে থাকেন। তিনি জার্ম্মাণীতে গেলে লোকে যে তাঁকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেত না। দেখলাম বার্লিনের প্রায় সমস্ত পুস্তকালয়েই রবীন্দ্রনাথের পুস্তক ও ছবি বিক্রয়ার্থ আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীতে অনেক পুস্তকই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন কিছুদিন পূর্ব্বে একবার জার্ম্মাণীতে গিছলেন তথায় ওঁরা এই সমস্ত পুস্তক তাঁর শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীতে রাখবার জন্য উপহার দিয়েছিলেন। ওটা বাস্তবিকই বড় গৌরবের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের জন্য আমাদেরও ওখানে খাতির। ওরা ভারতবাসী দেখলেই মনে করে যে, রবীন্দ্রনাথের দেশ কলিকাতা থেকে আসছে, কারণ অনেক জায়গাতেই দেখেছি যে আমাদের দেখে ওখানকার ছোট লোকেরাও জিজ্ঞাসা করছে যে আমরা কলিকাতা থেকে আসছি কি না। এতে বাস্তবিকই মনে বড় আনন্দ হোত ও গৌরব বোধ হোত। রবীন্দ্রনাথের কথা এখানকার কুলি-মজুরেরাও জানে!

বার্লিনের কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি গুলিতে প্রবেশ করে আর ভাল করে দেখা হয়ে উঠে নি, কিন্তু বাহির হ'তে দেখেই অনেকটা ধারণা হোল। ওখানকার national library যেটি সেটিও বেশ বৃহৎ ব্যাপার, কিন্তু পয়সার অভাবে এগুলির আর সে পূর্ব্বশ্রী নেই। এই national libraryটি জগতের বৃহত্তম লাইব্রেরীগুলির অন্যতম এবং এখানে পাঠ করবার জন্য জগতের নানা দেশ হ'তে মনস্বী ব্যক্তিরা এসে থাকেন। জার্ম্মাণীতে কিছু অধিক দিন বাস করিলে ও ওখানকার কোনও ইউনিভার্সিটিতে পড়লে ওখানকার বিষয় অনেক জানা যেতো, এবং খুব ইচ্ছাও ছিল যে ওখানে অন্ততঃ এক বৎসরকাল থেকে বিদ্যাভ্যাস করে দেশে ফিরব, কিন্তু সে ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত হয়ে উঠে নি।

বার্লিনে যে মিউজিয়মগুলি আছে সেগুলিও এক দেখবার জিনিষ। কিন্তু পূর্ব্বের অবস্থা বা শ্রী আর তার নাই। আর্ট মিউজিয়ম দেখতে হ'লে জার্ম্মাণির Dresden ও Munich সহরেই যেতে হয়। সেখানকার আর্ট মিউজিয়ামগুলি নাকি জগৎ-বিখ্যাত। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার আর সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। বার্লিনে মিউজিয়ামগুলি দেখতে হ'লে সামান্য কিছু পয়সা দিয়ে টিকিট কিন্‌তে হয়। বার্লিনে কাইজর ও যুবরাজের যে প্রাসাদগুলি আছে সেগুলিও এখন মিউজিয়ম বললেও চলে। জনসাধারণের দেখবার জন্য এখন সেগুলি মুক্ত। এখানেও প্রবেশ করতে হ'লে পয়সা দিয়ে টিকিট কিন্‌তে হয়। এই রাজপ্রাসাদগুলির প্রায় সমস্তই আমরা দেখলাম। একটি গাইড সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালো। কাইজর ও তৎ-পত্নীর শুইবার ঘর, বৈঠকখানা, নাচঘর, মন্ত্রণা-গৃহ, প্রভৃতি সবই দেখা গেল। কত সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র সেখানে দেখবার তার আর কি বর্ণনা করব! এ সমস্ত

দেখে মনে বাস্তবিকই বড় দুঃখ হ'তে লাগল যে কাইজরের এত ঐশ্বর্য্য ছিল আজ তিনি কোথায়? ভাগ্যচক্রে পড়ে আজ তিনি বনবাসী বললেও চলে!

কাইজরের আর একটি রাজ প্রাসাদ আছে পোষ্টডামে। পোষ্টডাম একটি ছোট সহর বললেও চলে, বার্লিন হ'তে ২০/২৫ মাইল ট্রেনে যেতে হয়। একটি পরিচিত, ইংরাজী জানা জার্ম্মাণের সঙ্গ পাওয়ায় আমার পোষ্টডাম দেখার বড় সুবিধা হয়েছিল। আমরা সকলে আহারাদি করে ট্রেণ ধরলাম। আগেই বলেছি যে জার্ম্মাণিতে ট্রেণ প্রভৃতির ভাড়া আমাদের কাছে খুবই কম, কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে যেতে আমাদের মাত্র কয়েকখানা পয়সা খরচ হোল। আমাদের গাড়ীতে কয়েকটি আমেরিকান টুরিষ্ট ছিলেন। পোষ্টডাম পৌছাতে আমাদের প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগল। ওখানে আমাদের দেশের ফিটনের মত ভাড়া গাড়ী পাওয়া যায় দেখলাম, এবং ট্রামও আছে। আমরা ট্রামে উঠে পড়লাম। যেখানে ট্রাম থামে সেখান থেকে নেমে একটু হেঁটে অগ্রসর হলেই রাজ পরিখায় এসে পৌছান যায়। জায়গাটি বেশ সুন্দর, কিন্তু পূর্ব্বের সে শ্রী আর নেই। বড় বড় প্রাসাদ, আর তার চারিদিকে বাগান। বাগানগুলি বেশ সুন্দর ও নানারকম ফুলের সমাবেশ। আমরা যখন গিছলাম তখন গ্রীষ্মকাল, কাজেই অনেক ফুল ফোটাতে বাগানগুলি বড় শোভা ধারণ করেছিল। একটি বাগান দেখে কাশ্মীরের কথা মনে পড়ল। শুনেছি কাশ্মীরে নাকি অনেক বাগান আছে যা স্তরে স্তরে উঠেছে এবং তাতে বহু সুন্দর সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত। এখানেও দেখলাম সেইরূপ একটি বাগান রয়েছে। এর মধ্যে আবার স্থানে স্থানে ফোয়ারাও আছে। যদিও এই বাগানগুলি এখনও রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু পূর্ব্বের সে শ্রী কোথায়? এখানে যুবরাজেরও একটি প্রাসাদ আছে। আমরা প্রথমতঃ যুবরাজের প্রাসাদ প্রভৃতি দেখতে গেলাম। এই প্রাসাদ দেখতে হ'লে কিছু পয়সা দিয়ে টিকিট কিন্‌তে হয়। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর টিকিট কিন্‌তে পেলাম এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি গাইড এসে পরিমিত সংখ্যক দর্শক নিয়ে প্রাসাদের সব ঘরগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগল। আমার সঙ্গে সেই জার্ম্মাণটি সাথী থাকাতে আমার বড় সুবিধা ছিল, যাহা জানবার দরকার হচ্ছিল তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে সব জেনে নিচ্ছিলাম।

কাইজরের প্রসাদখানি আলাদা ও এখান থেকে একটু তফাতে। আমরা যুবরাজের প্রাসাদ দেখা শেষ করে কাইজরের প্রাসাদ দেখতে চল্‌লাম। দেখলাম মস্ত কম্পাউণ্ডের ভিতর কাইজরের প্রাসাদখানি। প্রাসাদটি সুন্দর, কিন্তু জার্ম্মাণদের দুরবস্থার চিহ্ন এখানেও জাজ্বল্যমান। পয়সার অভাবে প্রাসাদখানিরও দুর্দ্দশা হয়েছে। আমাদের দেশে পুরাতন জমিদার বাটি দেখতে গেলে যেমন দেখা যায় যে, তার অনেক জায়গাতেই শেওলা প্রভৃতিতে ছেয়ে ফেলেছে, এখানে কাইজরের প্রাসাদখানিরও অনেকটা সেইরূপ অবস্থা দেখলাম। মনে বড় কষ্ট হোল, যে সব জিনিষ ও স্থান কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতই না সুন্দর ও জাঁকজমকের ছিল আজ তাহা হতশ্রী! প্রাসাদ দেখবার জন্য আলাদা দরজায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, নির্দ্দিষ্ট সময়ে দরজা খুললেই ঢুকব। দেখলাম এক এক batch করে লোক নিয়ে একটি গাইড ঢুকছে ও তাদের সব দেখা শেষ হ'লে আবার আর এক batch এসে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমাদের পালা এল। আমরা টিকিট কিনে ঢুকলাম। গাইডটি আমাদের নিয়ে চল্‌ল এবং সব জিনিষ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগল। আমার যেখানে দরকার হচ্ছিল সেখানে আমার সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছিলাম। দেখলাম আমাদের দলে অনেকগুলি আমেরিকান টুরিষ্ট আছে। তাদের হালচাল দেখলেই আমেরিকান বলে বুঝা যায়। এদের হালচালগুলি কেমন একটু অমার্জ্জিত ধরণের। ইয়োরোপে আমেরিকানদের কেহই পছন্দ করে না, কারণ ওদের পয়সার একটু গরম আছে বলে আচার-ব্যবহারগুলিও কেমন কেমন ধরণের। আমাদের দেশে এক পুরুষের বড় লোকের চালচলনগুলি যেমন মার্জ্জিত ও সেরূপ সভ্য নয়, আমেরিকানদের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ। এই কথা বললেই বোধ হয় জিনিষের অনেকটা বোঝান হবে। কিন্তু মনে মনে তাদের পছন্দ

না করলেও উপরে খাতির করতে হোত, কারণ পয়সার কদর সব জায়গাতেই। তখন জার্ম্মাণীতে আমেরিকান ডলারের মূল্য ও কদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। যাক্, কাইজরের শয়নগৃহ, বৈঠকখানা, নাচঘর প্রভৃতি একে একে আমরা সবই দেখলাম। দেখলাম এসব স্থানগুলি আর সেরূপ ভালভাবে রক্ষিত হয় না। যখন এই প্রাসাদটি দেখছিলাম তখন একটি ঘটনা ঘটে। ইউরোপে এইরূপ নিয়ম যে কোনও প্রাসাদ প্রভৃতি দেখতে ঢুকুলে মাথার টুপি খুলতে হয়, কিন্তু আমি যখন এই প্রসাদটি দেখতে ঢুকি তখন আমার আর টুপিটি খোলা হয়নি এবং আমার খেয়ালও ছিল না যে টুপিটি মাথায় রয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে আমাদের দল থেকে একটি ভদ্র জার্ম্মাণ মহিলা আমার নিকট এসে বিরক্ত হয়ে আমাকে কি সব বল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি ত সে ভাষার কিছুই বুঝলাম না, কেবল 'না' 'না' করে ঘাড় নাড়লাম। এতে তিনি খুব বিরক্ত হয়ে একটু সরে গিয়ে আর কয়েকটী জার্ম্মাণ ভদ্রলোকের সঙ্গে কি সব রাগারাগি করতে লাগ্‌লেন ও তাঁরা আমার প্রতি কটাক্ষপাতও করতে লাগ্‌লেন। আমিও প্রথমটায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম এবং ব্যাপারটী কি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি, তারপর হঠাৎ আমার খেয়াল হোল যে আমার মাথার টুপিটী খোলা হয় নি এবং সেইজন্যই বোধহয় এরা আমার উপর রাগ করছেন। এই কথা ভেবে আমি আস্তে আস্তে নিজের মান বাঁচিয়ে যেন আমার মাথার গরম হচ্ছে এই ভাব করে টুপিটী খুল্‌লাম এবং তাতে তাঁরাও যেন বাঁচলেন। আমার মনে হ'তে লাগল যে এঁদের উপরের সভ্যতাটা কত কম, তা না হ'লে ভদ্রলোক হয়ে এরকম করে আমাকে বলে! পরে আমি আমার জার্ম্মাণ সাথীটীকে ব্যাপারটীর বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি যেরূপ ভেবেছিলাম ঠিক সেইরূপই তিনি বললেন। তখন আমি বল্‌লাম যে, আপনার এ বিষয়ে আমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল; আমি ত কাইজরের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার জন্য টুপি পরে থাকি নি, ভুলক্রমেই ঐরূপ ঘটে ছিল, এবং টুপি খোলাই যদি নিয়ম থাকে ত তিনি আমাকে গোড়াতেই বললে পারতেন। এর উত্তরে তিনি বল্‌লেন, "কেন, আজকাল সকলে ত টুপি খোলে না; তোমারই কি কেবল দোষ হয়েছে! এখন কাইজর কোথায়? ওঁরা royalist দলের লোক বলেই এঁদের এত গাত্রদাহ। ওঁরা অনেকক্ষণ থেকেই তোমার বিষয়ে নানাকথা বলাবলি করছিল যে তুমি কিরূপ অসভ্য, সভ্যতা জান না, ইত্যাদি, এবং ওঁদের উপর আমারও বড় রাগ হয়েছিল ও আমি ঝগড়া করতে যাচ্ছিলাম, ইত্যাদি।" যাক্, ব্যাপারটী তখন সব বুঝলাম ও ভাবলাম এটী স্মৃতিপটে বহুকাল মুদ্রিত থাক্‌বে। প্রাসাদটী দেখা শেষ হ'তে বেলা হয়ে গেল। আমরা বেরিয়ে একটী রেস্তোরাঁতে কিছু চা, কেক্, প্রভৃতি আহার করে তৃপ্ত হয়ে ষ্টেসনাভিমুখে চল্‌লাম। ঠিক্ সময়ে ট্রেণ ধরে বার্লিনে পৌছাতে রাত্রি হয়ে গেল।

বার্লিনে অবস্থানকালে আমার একজন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে যায়। আমি ওখানে যাবার প্রায় ২ বৎসর আগেই তিনি ওখানে যান। বহুদিন তাঁর কোন খবরাদি না পাওয়ায় তাঁর সঙ্গে যে আর দেখা হবে এ আশা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ তাঁর একদিন সাক্ষাৎ পাওয়ায় মনে বড় আনন্দ হয়। তিনি কয়দিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে বার্লিনের অনেক স্থান দেখালেন। দেখ্‌লাম তিনি জার্ম্মাণীর অনেক জায়গা ঘুরেছেন ও জার্ম্মাণ ভাষায় বেশ দখল হয়েছে, কাজেই তাঁকে সঙ্গী পেয়ে আমার বড় সুবিধা হয়ে গেল। তিনি একদিন আমাকে বললেন যে, তিনি শীঘ্রই লাইপ্‌জিগে যাবেন, সেখানে তাঁর ঘরভাড়া করা আছে, এবং ইচ্ছা করলে আমিও তাঁর সঙ্গে যেতে পারি। লাইপজিগ্ জার্ম্মাণীর একটী উত্তম সহর এবং বার্লিন হ'তে একশত মাইলের কিছু উপরে। এরূপ সুযোগ আর ঘটবে না ভেবে আমি তখনই তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে পড়লাম। ২।১ দিনের মধ্যেই আমরা লাইপজিগ যাত্রা করলাম। বলা বাহুল্য যে ট্রেণ ভাড়া খুবই কম। আমরা সন্ধ্যার পর লাইপজিগে পৌছালাম। লাইপজিগ ষ্টেসনটী খুব বড় ইয়োরোপের মধ্যে বৃহত্তম ষ্টেশনগুলির মধ্যে এটি একটি। দেখলাম ষ্টেশন বিল্‌ডিংটী বেশ বড়, তবে সাদাসিদা ধরণের। বাহির থেকে ষ্টেশনটি একবার দেখে নিয়ে আমরা আমাদের বাসাভিমুখে যাত্রা করলাম।

বাসাটি ষ্টেসন থেকে বেশী দূরে ছিল না, আমরা অল্পক্ষণের ভিতরেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমার বন্ধুটি বাড়ীতে পৌঁছেই গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার থাক্‌বার সব বন্দোবস্ত করে দিতে বল্লেন। তাতে গৃহকর্ত্রী খুব খুসী হয়ে সব ঠিক্‌ঠাক্ করে দিলেন। আমাদের সেই বাসাটীতে আর একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক থাক্‌তেন। তিনি ওখানকার ইউনিভার্সিটীতে রিসার্চ করতেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাসায় ফির্‌লে সব আলাপ পরিচয় হয়ে গেল।

লাইপজিগে আমরা যখন যাই তখন ওখানকার হোটেল প্রভৃতির waiterদের ধর্ম্মঘট হয়েছে, কাজেই সব হোটেল প্রভৃতিই বন্ধ। আমরা ত একটু মুস্কিলে পড়লাম যে কোথায় আহারাদি করা যায়। আমরা একদিন ত অনেক খুঁজে খুঁজে এক ছোট রেস্তোরাঁতে গিয়ে হাজির হ'লাম। জার্ম্মাণীতে একে "বিয়ারহালে" বলে, অর্থাৎ এখানে বিয়ার ও মদ খাবার আড্ডা, তবে সঙ্গে সঙ্গে আহারাদিও পাওয়া যায়। জার্ম্মাণীতে এরূপ অনেক আছে। গত্যন্তর না থাকায় আমরা ত সেইখানেই ঢুকে পড়লাম। আমাদের কৃষ্ণবর্ণ দেখে ত সেখানকার সকলেই অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল ও কি সব বলাবলি করতে লাগল তার ত কিছুই বুঝলাম না। আমরা আহারাদি শেষ করে যখন বেরিয়ে আসছি তখন দেখি তাদের মধ্য থেকে একজন আমাদের জিজ্ঞাসা করছে 'কালকুত্তা', 'কালকুত্তা'? অর্থাৎ তোমরা কি কলিকাতা থেকে আসছ? জার্ম্মাণরা কলিকাতাকে কালকুত্তা বলে। আমরা ত ঘাড়নেড়ে 'ইয়া', 'ইয়া', অর্থাৎ 'হাঁ', 'হাঁ', বলতে বলতে বেরিয়ে এসে যেন বাঁচলাম। আমি আগেই বলেছি যে উহারা ভারতবাসী দেখলেই মনে করে যে আমরা সকলেই রবীন্দ্রের দেশবাসী এবং ওদের ধারণা যে রবীন্দ্রের দেশ কলিকাতায়। কাজেই কলিকাতার কথাই জিজ্ঞাসা করে।

এইরূপে আহারের বড় অসুবিধা হওয়ায় আমার বন্ধুটি তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে আহারের বন্দোবস্ত করলেন। এ ভদ্রলোকটি একজন ভারতবাসী, জাতিতে মুসলমান ও যতদূর স্মরণ আছে পশ্চিমদেশীয়। ইঁনি ওখানে ব্যবসা করতেন ও এক জার্ম্মাণ পরিবারে থাকতেন এবং সেই পরিবারের একটী মেয়ের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হ'বার জন্য engaged। আমরা জিনিষপত্র কিনে নিয়ে ত সকালবেলা তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লাম। দেখলাম আমার বন্ধুটির সঙ্গে এই জার্ম্মাণ পরিবারের পূর্ব্ব-ব্যক্তির বেশ আলাপ আছে। তিনি ত গিয়ে আমার সঙ্গে তাঁদের সব পরিচয় করে দিলেন। সেই পরিবারটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বামী, স্ত্রী ও ২।৩টি মেয়ে সেই পরিবারে। তাঁরা ত আমাদের পেয়ে ভারি খুসী, এবং তখনই মা, মেয়ে সকলে মিলে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করতে লেগে গেলেন। দেখে বড় আনন্দ হোল এবং মনে হ'তে লাগল যেন কত পরিচিতের বাড়ীতেই এসেছি! জার্ম্মাণরা বড় মিশুক এবং অল্প পরিচয়েই নিজের প্রাণের কথা খুলে বল্‌তে কোনই কুণ্ঠা বোধ করে না। ইয়োরোপ মহাদেশের লোকের স্বভাবই এরূপ, যদিও ইংরাজরা এর বিপরীত। এতে অবশ্য আমাদের খুবই ভাল লাগে, কারণ আমাদের স্বভাবও ঐরূপ, কিন্তু এটা দোষ কি গুণ তার বিচারের ভার পাঠক-বর্গের উপরেই দিলাম। তাঁরা ত আমাদের জন্য কি করবেন ভেবে পান না। তাঁদের মেয়েরা খুব সামান্য ইংরাজি বল্‌তে পারতেন; তাঁদের একজন আমাকে এসে ধরে বসলেন যে আমাদের দেশীয় কথা শোনাতে হ'বে। আমি তাঁকে নিরাশ না করে তাঁদের একটী পিয়ানো ছিল সেইটি নিয়েই ২।১টি গান জুড়ে দিলাম, কারণ ভয় ছিল না যে আমার বিদ্যা ধরতে পারবেন! আমাদের গলাগুলি ওঁদের কাণে একটু একঘেয়ে (monotonous) লাগে। ইয়োরোপের গানের ধারা অন্যরূপ।

আমরা ওঁদের বাড়ীতে বসে গল্প স্বল্প করছি ইতিমধ্যে আমাদের আগমনবার্ত্তা পাড়ায় প্রচার হয়ে গেছে। দেখি যে কিছুক্ষণ পরেই পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে হাজির। আমরা বাহিরের যে ঘরে বসেছিলাম তার জানালা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারে ও বাড়ীর ভিতর ঢুকে এসে "গুড্ মর্ণিং" করে ও আবার handshake ও করতে চায়। আমরা যখনই কোথাও বেরিয়ে আবার বাড়ী ফিরতাম তারাও এসে

হাজির হোত। এটি বেশ লাগত যে এরা কত simple। দেখ্তাম তাদের অবস্থা ভাল নয়, খালি গা ও পোষাকের অবস্থাও তদ্রূপ। তবে দেখা যায় এরা বেশ সুস্থ সবল; ইয়োরোপের মধ্যে জার্ম্মাণরাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলবান্। এদের ছোট ছেলেদের দেখে আমার পেশোয়ারী ছেলেদের কথা মনে হোত। এরাও যেন তাদের মত মোটা সোটা ও মাথা প্রায় ন্যাড়া বললেও চলে। এইরূপ গল্প গুজব করতে করতে আমাদের আহার প্রস্তুত হয়ে গেল। সেই পরিবারের সকলে ও আমরা তিন জন ভারতবাসী মিলে একটি টেবিলে বস্‌লাম। দেখলাম আমাদের জন্য তাঁরা ভাত, মাংসের তরকারি প্রভৃতি রন্ধন করেছেন। সেই ভারতবাসীটি তাঁদের এই সব রাঁধতে শিখিয়েছেন। খুব আমোদ প্রমোদ করে ত খাওয়া যেতে লাগ্‌ল। ইতিমধ্যে আমার বন্ধুটি গৃহকর্ত্রীকে বলে বসলেন যে আমি অমুক জিনিষটি খেতে ভালবাসি। সেই জিনিষটি তাঁদের যে একটি দোকান সেই বাড়ীতেই ছিল তাতে ছিল। তাঁরা ত সেই কথা শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে সেই জিনিষটি আনন্দ সহকারে দোকান থেকে এনে হাজির করলেন, আমার শত মানাও শুনলেন না। আমি ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম ও আমার বন্ধুটিকে বকৃতে লাগলাম। যাক্, আর কি করা যায়, যখন এত আনন্দ করে তাঁরা জিনিষটি এনেছেন তখন তাহা প্রত্যাখ্যান করাটা বড়ই অসভ্যতা, কাজেই আমিও তার সৎকার করে ফেল্‌লাম। এ থেকে পাঠকবৃন্দ বুঝুন জার্ম্মাণরা কি প্রকারের লোক!

আহারাদি সমাপন করে নানারূপ গল্প গুজবে দুপুর কেটে গিয়ে বিকাল হয়ে গেল। প্রায় সন্ধ্যার সময় ঐ বাড়ীর একটি মেয়ে আমার বন্ধুটির কথাতে আমাকে নিয়ে ওখানকার একটি variety show দেখতে চললেন! পথে তিনি লাইপজিগের সহরের কিছু কিছু দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। উপর থেকে দেখে লাইপজিগ সহরটি বেশ লাগল। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বড় বড় বাড়ী আছে, যথা টাউন হল প্রভৃতি, এবং এক সময়ে যে এর বেশ সমৃদ্ধি ছিল তা বেশ অনুভব করা গেল, যদিও এখন সেদিন নেই। Variety showতে দেখলাম বেশ লোকজন হয়েছে, তবে অধিকাংশই অল্প পয়সার সিটে গেছে। আমরা দুই জনে একটু বেশী পয়সার সিটেতে বসেই দেখলাম। Show দেখে ফিরতে রাত প্রায় ১০/১১টা হয়ে গেল। বাড়ীতে এলে তাঁরা কিছুতেই ছাড়বেন না বলেন যে ওখানে খেতে হবে ও রাত্রিতে থাকৃতে হ'বে। অবশ্য তাঁদের এই সহৃদয়তা দেখে বড় আনন্দ হোল, কিন্তু তাঁদের সেরূপ ভাল অবস্থা না থাকায় তাঁদের আর খরচ করান উচিত নয় ভেবেই আমরা কোন মতেই রাজী হ'লাম না। তখন অগত্যা আমাদের বিদায় দিতে হোল।

তাঁদের অত যত্ন ও সহৃদয়তার একটা প্রতিদান দেওয়া কর্ত্তব্য ভেবে আমরা ঠিক করলাম যে তাঁদের আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত কর্‌তে হ'বে এবং রন্ধনাদি নিজেরাই করা যাবে। আগেই বলেছি যে জার্ম্মাণিতে জিনিষপত্র খুবই সস্তা ছিল, বাজে খরচের দিক থেকে আমাদের ভয় পাবার কিছু ছিল না। কাজেই পরদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের বাসাতে এসে আহারাদি করতে হবে বলে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে আনা গেল এবং আমাদের গৃহকর্ত্রীদেরও হোল। আমার বন্ধুটির রন্ধন কার্য্যে বেশ একটু দখল ছিল, কাজেই তাঁর উপরেই রান্নার ভার পড়ল। জিনিষপত্র জোগাড় করে বিকালেই রান্না আরম্ভ করে দেওয়া গেল। গৃহকর্ত্রী মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে লাগলেন আমরা কি রাঁধি, কারণ পূর্ব্বে আর কখনও বোধ হয় তিনি এরূপ রান্না দেখেন নি। আমাদের গৃহকর্ত্রীর যে ছোট ছেলেটি ছিল, আহা, সে বেচারার কি আনন্দ! ভাল ভাল জিনিষ রান্না হচ্ছে দেখে ও তাই খাবে ভেবে সে আনন্দে খুব লাফালাফি লাগিয়ে দিয়েছে। আগেই বলেছি জার্ম্মাণদের বড় দুর্দ্দশা, মাংস প্রভৃতি ভাল খাদ্য ভাগ্যে খুব কম জোটে, কাজেই তার ওরূপ আনন্দ হওয়াটা স্বাভাবিক। তার কাণ্ড দেখে আমরা এক দিকে খুব হাসছিলাম ও ঠাট্টা করছিলাম বটে, কিন্তু ওদের অবস্থা ভেবে আমার খুব কষ্টও হচ্ছিল। যাক্, অভ্যাগতেরা আসবার আগেই আমাদের দেশী রান্না শেষ হয়ে গেল, এবং ঠিক সময়ে তাঁরা এলে সকলে মিলে একটি বড় টেবিলে বসে খুব হাসি গল্প করতে করতে আহারক্রিয়া

সম্পন্ন করা যেতে লাগল। আমাদের দেশীয় রান্না এঁদের অনেকে পূর্ব্বে খায় নি বলে সেইরূপ উপভোগ করতে পারলেন না। সেই ছোট ছেলেটির যে অত লাফালাফি খাবার জন্য হয়েছিল, কিন্তু খেতে বসে বেচারা বিশেষ কিছু খেতে পারল না ও সেরূপ আমোদও পেল না। আহারাদি সমাপনান্তে যে যার স্ব-স্থানে প্রস্থান করলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হ'লাম।

আমরা ২১ দিন পরেই বার্লিনে ফিরে এলাম। জার্ম্মাণির অন্যান্য বিখ্যাত দেশগুলি দেখবার খুবই ইচ্ছা ছিল এবং পয়সার দিক দিয়ে খুব কমেতেই হোত, কিন্তু সে যাত্রায় তা আর ঘটে উঠল না। ইংলণ্ডে গেছি লেখাপড়া করতে, পরীক্ষাগুলি সবই বাকী রয়েছে, কাজেই তার ভাবনাতে বেড়ানটা আর ভাল লাগছিল না, মন উতলা হয়ে উঠছিল, আবার কবে ইংলণ্ডে ফিরে যাবো। তাই স্থির করলাম এ যাত্রা এইখানেই শেষ করে ফিরে যাই, এবং পরীক্ষাগুলি শেষ করে ফেরবার পথে আবার এই দেশগুলি ভাল করে দেখে যাব। মনে মনে এইরূপ স্থির করে ২।৪ দিনের ভিতরেই বার্লিন ত্যাগ করার সঙ্কল্প করে ফেললাম। একবার খোঁজ করে দেখলাম যদি কোনও সঙ্গী জোটে, কিন্তু কাহাকেও পেলাম না। তাই একলা যাওয়াই স্থির করলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। যে ট্রেণখানিতে যাব সেখানি বেলজিয়ম হয়ে যাবে, কোথাও বদ্‌লি করতে হবে না, কাজেই অনেকটা ভরসা ছিল। ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ট্রেণ এসে হাজির হোল এবং আমিও মালপত্র নিয়ে উঠে পড়লাম। তখন প্রায় বিকাল। ট্রেণে উঠে দেখি আরও ২১টি ভারতবাসী লণ্ডনে ফিরছেন। তাঁরা অপরিচিত হলেও তখনই আলাপ হয়ে গেল এবং সঙ্গী পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই নানা কোলাহলের মধ্য দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দিল আর বার্লিনকে বিদায় দিয়ে যেতে প্রাণে কেমন একটা অজানা বেদনা এসে ঘিরে ফেল্‌তে লাগ্‌ল!

স্বর্গীয় অমৃতলাল দে

ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)

গত ভাদ্র সংখ্যার "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" আমরা "নিউজ অব্ দি ওয়ার্লড্" পত্রের প্রথম বর্ষে প্রকাশিত অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের তালিকা প্রদান করিয়াছি। প্রবন্ধগুলির শিরোনামা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালী সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে কিরূপ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের আলোচনা হইত। তালিকাভুক্ত প্রবন্ধসমূহের মধ্য হইতে আমরা নিম্নে কতিপয় অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রবন্ধের মর্ম্মাভাস প্রদান করিতেছি :—

৩

ভারতে ও মার্কিণে কৃষি

প্রকাশ,—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চাষ করিবার উপযোগী জমির পরিমাণ ১০০ কোটি একর ; তন্মধ্যে শতকরা ১১॥০ একর (এক একর প্রায় তিন বিঘা) জমি চাষ করা হইয়া থাকে। গত বৎসর ১০,৫৯,৮৩,৬০৫ একর জমি চাষ করা হইয়াছিল এবং সেই জমি হইতে ২৫৮,৬৪,৬১,৩২০ বুসেল (এক বুসেল ৯॥০ সেরের সমান) গম, ভুট্টা, জৈ, যব, শ্বেত সরিষা, বাক্‌হুইট্ (Buckwheat) ও আলু জন্মিয়াছিল। ইহা

হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান পদ্ধতিতে চাষ করিলে নয় গুণ ফসল লাভ করা যাইতে পারিত।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের চাষের অবস্থা একবার দেখা যাউক। ব্রিটিশ ভারতে (অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যসমূহবাদে) ৬০ কোটি একর চাষের উপযোগী জমি আছে। উহার অর্দ্ধেকও যে চাষ হয়, ইহা আমরা মনে করি না। আবার কর্ষিত জমিও ভাল করিয়া চাষ হয় না। জমিতে ভাল করিয়া লাঙ্গল দেওয়া হয় না, জল সেচ হয় না ও ভাল সার দেওয়া হয় না বলিয়া জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া উচিত তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সরকার নূতন কৃষি বিভাগ খুলিয়াছেন। আশা হইতেছে, অতঃপর চাষের অবস্থা ক্রমে ভাল হইবে।

ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সংক্রান্ত গোলযোগ

ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে বাণিজ্যসম্পর্কে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার মিয়াদ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরে শেষ হইবার কথা। কিন্তু ইংরেজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও ফরাসী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও এই সন্ধি পুনরায় নূতন করিয়া বলবৎ করিতে চেষ্টা করে নাই। এই সন্ধির একটা সর্ত্ত ছিল এই যে, বিশেষ প্রয়োজন মনে করিলে এই সন্ধির মিয়াদ তিন মাস বাড়াইতে পারা যাইবে। মনে করুন, ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত দুই গবর্ণমেণ্টের মতের মিল হইল না। অথচ তখন আর মোটে ৭দিন মাত্র বাকী। এই ৭ দিনে নূতন সন্ধি সম্বন্ধে সকল সর্ত্ত স্থির হইয়া যাইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সন্ধির মিয়াদ তিন মাস না বাড়াইয়া উপায় নাই। কিন্তু দুই গবর্ণমেণ্টের যে মতের মিল হইবে এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং ফরাসী সরকার সন্ধির মিয়াদ না বাড়াইলে আর নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপন করা অসম্ভব হইবে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন,—আমরা ত সন্ধি বজায় রাখিতে চাই ; কিন্তু ইংলণ্ড এই সন্ধি অসঙ্গত কারণে স্থগিত রাখিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে, ৮ই নভেম্বর হইতে ফ্রান্সের অতিরিক্ত শুল্কের জন্য ফ্রান্সের হাটে ইংরেজের পণ্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে ইংরেজের মাল আর ফ্রান্সের হাটে বিকাইবে না। ইহাতে অবশ্য ইংলণ্ডের পণ্যশিল্প খুব ধাক্কা খাইবে বটে ; তবে সে জন্য ইংলণ্ডের উৎকণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। কারণ, ইংলণ্ডে পণ্য-শিল্পের রপ্তানি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীর বহু স্থানে ইংলণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রী চালান হইতেছে। সুতরাং এখন ফ্রান্সের হাটে ইংরেজের পণ্য না বিকাইলে ইংরেজের ক্ষতির সম্ভাবনা বড় নাই। তবে ইয়োরোপের বাজারে ইংলণ্ডের পণ্যশিল্প যে বিশেষরূপ ঘা খাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফ্রান্সের বাজার ত বন্ধ হইতেছে ; জার্ম্মাণী, স্পেন, রুশিয়া প্রভৃতি দেশেও ইংলণ্ডের শিল্পসামগ্রী বিকাইতেছে না। অবশ্য ইহাতে এই সকলদেশের ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্টই হইতেছে ; কিন্তু সেদিকে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। তাহারা এরূপ নিপুণতার সহিত শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী করিতেছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংল্যণ্ডের এবং তাহার অধিকারভুক্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাজারে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে।

মার্কিণের শুল্কের হার অত্যধিক বটে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মার্কিণের বাজারে ইংরাজের শিল্প-সামগ্রীর চাহিদা খুব এবং মার্কিণ ইংরেজের পণ্য কিনিয়াও থাকে অনেক বেশী। ইহার কারণ আর কিছু নয়, প্রয়োজন বুঝিলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট শুল্কের হার কিছুদিনের জন্য কমাইয়া দেয় এবং ইংলণ্ডের মাল তখন সে দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।

তারপর সেই প্রকার চাহিদা কমিয়া যায়, দরও কমে, তখন শুল্ক বাড়াইয়া ইংলণ্ডের মাল আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মার্কিণের এই শুল্কের উঠানামাতে উত্তর ইংলণ্ড ও পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের শিল্পীদের অবস্থার ভালমন্দ সূচিত হইয়া থাকে। বাকি রহিল আফ্রিকা, তুরস্ক সাম্রাজ্য, চীন ও ভারতবর্ষ—এই গুলিই ইংরাজের প্রধান বাজার। কিন্তু এগুলির একটিও নিরাপদ বাজার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। কারণ, আফ্রিকা অজ্ঞাত দেশ, তুরস্ক সাম্রাজ্য একরূপ অরাজক বলিলেই চলে। চীনদেশ সকল দেশ হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চাহিতেছে ; ভারত-

বর্ষের সংরক্ষণ-শুল্ক আংশিকভাবে উঠাইয়া দিলেও বিশেষ সুবিধা হইবে কিনা সন্দেহ। বোম্বাই ও কলিকাতায় ম্যাঞ্চেষ্টারের যে সকল ব্যবসা-ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জয় লাভ করাও সহজ নহে।

ফরাসীর সহিত তুলনায় ইংরেজের অসুবিধা সব দিকেই আছে। ফরাসীরা মনে করে—ইংরেজ প্রার্থী, ভিক্ষুক। বাণিজ্য-সংক্রান্ত সন্ধিটা বজায় রাখিবার দায় যেন তাহাদের নয়, ইংরেজের। ইংরেজের কর এত অল্প যে, তাহা আর নামাইবার উপায় নাই। ইংরেজ বহুকাল যাবৎ এরূপ দৃঢ়তার সহিত অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে যে,ফরাসী নিশ্চিন্তভাবে ভাবিতে পারে— ইংরেজ প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যেও কখনও শুল্ক বাড়াইবে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি আবার নূতন করিয়া সন্ধি না হায়, তবে আর কি করা যাইতে পারে? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ত এইভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না। আধুনিক অর্থনীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, অবাধ বাণিজ্যবিদের বন্ধু সর্ব্বদেশেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই বন্ধুরা ইংরেজের কোন উপকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। সুতরাং বর্ত্তমান বাণিজ্য-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে। ফ্রান্স প্রচুর পরিমাণে বিলাস-দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ফ্রান্সের রেশম-শিল্পে, মদ্য তৈয়ারীর কাজে, প্যারিসের বহু পণ্য নির্ম্মাণের ব্যাপারে বিস্তর লোক খাটিয়া থাকে। ইহারা ও অন্যান্য ফরাসী-শিল্পীরা একরূপ অবাধ বাণিজ্য-নীতিরই পরিপোষক। ইহারা যদি একবার বুঝিতে পারে, ইংরেজের বাজার বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তদ্দ্বারা ইহাদের আর্থিক ক্ষতি হইবে, কারণ ফ্রান্সের এই সমস্ত পণ্যের চাহিদা ইংলণ্ডেও খুব অধিক। সন্ধি যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে ফ্রান্সের টাকার বাজার ওলোট পালোট হইলে শিল্পীদিগের অর্থকষ্ট হইবে। শিল্পীরা ইহা ভালরূপই জানে।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের দায়িত্ব

ব্যাঙ্কিং সম্প্রদায়ের রিজার্ভ-রক্ষকরূপে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের গুরু দায়িত্ব আছে। ব্যাঙ্ক যদি সেই দায়িত্ব রাখিতে না চায়, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই—এক্ষণে যে ঘোর স্বর্ণাভাব ঘটিয়াছে তাহার ঘটিবার অগ্রেই জানাইলে ভাল হইত। ইংলণ্ডের মত একটি দেশ—যে দেশে বিস্তর ব্যাঙ্ক রহিয়াছে সে দেশে নগদ ১ কোটি পাউণ্ড গচ্ছিত রাখা অর্থাৎ ক্যাশ রিজার্ভ ত কিছুই নয়। কারণ, দেনা মিটাইতে হইলেই যে উহার ৫০ গুণ লাগে। তবুও ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড ছাড়া আর কোনও ব্যাঙ্ক প্রতিদিনকার চাহিদা মিটাইবার মত টাকা রাখিবার পরও এত বেশী টাকা রিজার্ভ রাখিতে পারে না। প্রত্যেক মাসে এবং প্রত্যেক তিন মাস অন্তর দেশের দেনা শোধের সময়ে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে লইয়াই সেই টাকা শোধ করা হয়। অবশ্য ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে সাধারণের টাকা মিটাইয়া দেশের এই দেনার টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড যে এই টাকা দিতে পারে—ইহার একমাত্র কারণ যে সেখানে বিস্তর অখাটানো টাকা মজুত রাখা হয়। সকলের চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশীদেরও চাহিদা মিটাইতে হয় এই ব্যাঙ্ককে এবং যখন বিদেশীরা টাকা লয় তখন তাহারা স্বর্ণ মুদ্রাই লইয়া থাকে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত দেশের বা বিদেশের টাকা মিটাইবার পক্ষে খুব অল্প টাকাই ব্যাঙ্কে মজুত রাখিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থা ভাল নয়। ইহাতে ব্যাঙ্কের পতন হইতে পারে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড যদি রিজার্ভ রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে টাকার বাজারের উপরও যাহাতে উহা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিলে বা বন্ধক রাখিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে।

সেভিংস ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস আমানত

১৮৭০-১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আমানত ২ কোটি আশী লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে এবং পোষ্টাফিস ব্যাঙ্কসমূহে আমানত ১,৫০.০৯,০০০ পাউণ্ড হইতে ৩,৩৭,৪৪,০০০ পাউণ্ড হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট মোট ৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের

উপর ধার পাইয়াছেন। এই টাকাটা দেশের ধনকুবেরগণ বা বড় বড় অর্থশালী মহাজনেরা দেয় নাই, দিয়াছে দেশের বহু সংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তি। ইংলণ্ডের অনুকরণেই ভারতে এই প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাতে অনেক সুবিধা আছে—যথা, জন সাধারণের টাকা লগ্নী করা থাকে বলিয়া দেশের শাসন কার্য্যের দিকে সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী প্রভৃতির ভিতর সঞ্চয়ের অভ্যাস জন্মে; খুব অল্প সুদে টাকা ধার পাইয়া সরকার বেশী সুদে সেই টাকা খাটাইতে পারেন। এই ব্যবস্থার ফলে বহু দরিদ্র ব্যক্তির টাকা সরকারে জমা থাকিতেছে বলিয়া শাসন কার্য্যের প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, ইহার ফলে সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা বাড়িয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্টের হস্তে এইরূপে যে টাকা আসিয়া সঞ্চিত হইবে, তাহাতে দেশের নানা হিতকর কার্য্য হইতে পারিবে; যেমন— রাস্তাঘাট তৈয়ারী, খাল ইত্যাদি খনন, দরিদ্র কৃষকদিগকে সুদখোর মহাজনদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করা, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন ইত্যাদি। দুইটি কার্য্যের উপর গভর্ণমেণ্টের সাফল্য নির্ভর করিতেছে, (১) জনসাধারণের হাতে নিজ নিজ খরচ মিটাইয়া যদি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। (২) যদি সেই টাকা যোগাড় করিবার জন্য খরচ খুব কম হয়। দেশের লোকের হাতে যদি টাকা অকেজো হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উন্নতির লক্ষণ বলা যায় না। দেশের টাকা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকা জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক নহে। দেশের উন্নতিমূলক কাজে দেশের টাকা যতই প্রযুক্ত হইবে, দেশের লোকের পক্ষে ততই মঙ্গল। ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানতী টাকায় দেশের বহু কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই আমানতী টাকা নষ্ট হইবার উপায় নাই, কারণ ইহা গভর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিবার ব্যবস্থায় ভারতবাসীর বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

ভারতে পোষ্ট অফিস সেভিংসব্যাঙ্ক

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্ণমেণ্ট এই সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইবে। যে সমস্ত দিন-মজুর উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া জমাইয়া রাখিবার স্থানের অভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করে, তাহারা সে সমস্ত অর্থ সঞ্চয়ের সুবিধা পাইবে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত নরনারীর পক্ষে সেভিংস ব্যাঙ্ক অশেষ উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। ডাঃ ব্রেয়ার বলিয়াছেন—"যেখানে একটি তৃণ জন্মায়, সেখানে যিনি দুইটি তৃণ জন্মাইতে পারেন, তিনি মনুষ্য জাতির অশেষ উপকারক।" ডাঃ ব্রেয়ারের সঙ্গে একমত হইয়া বলা যাইতে পারে যে, যে গভর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়শীলতা, মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশের চেষ্টা করেন, সে গভর্ণমেণ্ট আদর্শবাদীদের অপেক্ষা বহুগুণে ধন্যবাদার্হ। নিম্নে সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী প্রদত্ত হইল:—

প্রত্যেক পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইল। পুরুষ, নারী যে কোন লোক এখানে টাকা জমা রাখিতে ও উঠাইয়া লইতে পারিবে। এক সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা উঠান চলিবে না।

প্রথম আমানতের সময়ে নাম, বাসস্থান ও সহি বা টিপসহি দরকার হইবে। তৎপরে টাকা উঠাইবার ফরমে সহি করিয়া পাঠাইতে হইবে অথবা নিজে আসিতে হইবে। প্রতিবারে।০ আনা হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫০০৲ পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত জমা রাখা চলিবে। বৎসরে ৫০০৲ টাকার বেশী জমা লওয়া হইবে না।

প্রত্যেক আমানতকারীকে একটি পাস বুক দেওয়া হইবে। প্রত্যেকবারের জমা ও টাকা উঠান ঐ পাস বুকে লিপিবদ্ধ থাকিবে। পাস বুক না আনিলে টাকা জমা লওয়া বা উঠান চলিবে না।

আমানতী টাকার উপর শতকরা ৩৷৷ টাকা সুদ দেওয়া হইবে। কিন্তু ৫৲ টাকার কম জমা থাকিলে সুদ দেওয়া হইবে না। প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ্চের পরে ঐ সুদ জমা করা হইবে।

পাস বুক ইংরেজী বা দেশীয় যে ভাষায় আমানতকারীর ইচ্ছা সে ভাষায় লিখিত হইবে।

যদি পাস বুক হারাইয়া যায় তবে উহার জন্য ১৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। কিন্তু উহা ফুরাইয়া গেলে বিনা খরচে নূতন পাস বুক দেওয়া হইবে।

নাবালকের অভিভাবক নাবালকের পক্ষে টাকা জমা রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর নামে স্বামী টাকা জমা রাখিতে পারেন; কিন্তু স্ত্রী যদি স্বোপার্জ্জিত অর্থ জমা রাখেন, তবে নিজের নামে ভিন্ন হিসাব খুলিতে পারেন।

২।৩ জনের নামে টাকা জমা রাখা চলিবে না কিংবা একজন ২।৩টি হিসাব খুলিতে পারিবে না।

যদি সাব আফিসে টাকা জমা দেওয়া যায়, তবে হেড্ আফিস হইতেও ভিন্ন স্বীকৃতি-পত্র দেওয়া হইবে।

যে পোষ্ট অফিসে সেভিং ব্যাঙ্ক নাই, সেখানে টাকা জমা লওয়া বা উঠান চলিবে না।

ক্রমশঃ

নিশ্চিন্ত

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

বলিয়ো কেবল একটি ললিত বাণী
বারেক ললাটে রাখিয়ো কোমল পাণি
　　তার পরে যাবো দূরে।
ওগো প্রিয়, চিরবাঞ্ছিত বঁধু
ক্ষণিকের সেই কথা পরশের মধু
　　বুক মোর রবে পূরে।
আনন্দ মোর রহিবে তোমারি ধ্যানে
চেতনা আমার জাগিবে তোমারি জ্ঞানে
　　রূপ রবে আঁখি আগে;

বিধাতারে শুধু এই করি নিবেদন
সুখে দুখে যেন ভরিয়া আমার মন
　　তোমরি প্রতিমা জাগে।
তোমারে দেখিব অন্তর দিয়া যে গো
আঁখির আড়াল, বাধা নহে মোর সে গো
　　ক্ষোভের কারণ কিবা?
ছিলে, আছো, তুমি রহিবে সতত মোর
রহিবে অটুট প্রাণের সোহাগ-ডোর
　　মরমে রজনী-দিবা।

গৃহিণীর কাণ্ড

শ্রীমতী তমাললতা বসু

সে যেদিন প্রথম অতিথির বেশে এসে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিল, সেদিন ঘন-ঘোর বর্ষা, মেঘে আকাশ অন্ধকার। তখন রাত্তির ১০টা।

আমি সেই অপরিচিত অতিথিটিতে সাদরে বরণ করে নিয়ে, আতিথ্য সৎকার করে, অশন-বসন দিয়ে লালনপালন ক'ত্তে লাগ্‌লুম। সে এমনি আমার অনুগত হয়ে উঠ্‌লো, যে প্রায়ই গৃহিণী বল্‌তেন, "শেষে খাওয়া নাওয়া ভুলে যে ওকে নিয়ে মসগুল হয়ে গেলে আমার দিকে চেয়ে দেখবারও অবসর নেই!" আমি হাসতুম।

কিন্তু শেষে দেখি এর উল্টাই দাঁড়িয়ে গেল; সে পুরোমাত্রায় গৃহিণীকেই দখল ক'রে নিয়ে বস্‌লো। গৃহিণীও দেখি ইদানীং তার সেবা, খাওয়া দাওয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে প'ড়েছেন যে, আমি সময়ে কিছু পাই না। আমি এ বিষয়ে অনুযোগ ক'রলে হেসেই উড়িয়ে দেন, সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছে বাপু।

অতিথিটিও বেশ মৌরসী পাট্টা নিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছেন। নির্ব্বিকার গম্ভীরভাবে তিনিই যেন এবাটীর সর্ব্বেসর্ব্বা আর আম্‌রাই তাঁর তাঁবেদার প্রজা, এমনিই তাঁর ধরণ-ধারণ।

গৃহিণীর তার প্রতি ও তার গৃহিণীর প্রতি দিন দিন ভালবাসার বৃদ্ধি দেখে হিংসায় পুড়ে মরি, রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। তবু মুখ ফুটে কিছু বল্‌তেও পারি না, এম্‌নিই আমি দুর্ব্বলচিত্ত!

যাই হ'ক্, সে দিন কাছারীর বিশেষ কাজ না থাকায় একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরে নিঃশব্দ পদে উপরে উঠে ঘরের রুদ্ধ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ফাঁক দিয়ে দেখি, গৃহিণী ঘরের মেজেতে ব'সে আছেন, আর তার সেই অতিথিটি তাঁর গলা ধ'রে—আঃ ছি! ছি! ছি!

দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলুম। গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠে মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে দরজা খুলে হেসে ব'ল্‌লেন "এত শীগগীর যে।"

"এলুম।" ব'লে গম্ভীরভাবে চারিদিকে চাইলুম, কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না, এর মধ্যেই লুকিয়ে প'ড়েছে। দেখ্‌লুম খাটের নীচে অবধি বিছানার চাদরটা ঝুল্‌ছে, বুঝ্‌লুম তারই তলায় অতিথিটি লুক্কায়িত।

আমিও চেয়ারে না ব'সে খাটে গিয়ে ব'সলুম, বল্‌লুম "আজ সকাল সকাল এলুম ব'লেই না তোমাদের কীর্ত্তি-কলাপ সব ধ'রে ফেলেছি।"

তিনি গম্ভীরভাবে ব'ল্‌লেন "কি কীর্ত্তি কলাপ ক'রেছি শুনি।"

"এখনি বামাল শুদ্ধ গ্রেপ্তার ক'রে দিচ্ছি, তখন টের পাবে, আমি বেচারা সারাদিন থাকি কাচারীতে পড়ে তোমরা বাড়ী বসে কর এই সব কাণ্ড!"

"কাণ্ডটা কি বলনা বাপু খুলে, অত ভণিতা কেন?"

"এই যে দিনে দুপুরে আমার ঘরে ডাকাতী এর মানে কি?"

"কোথায় আবার ডাকাতী দেখ্‌লে?"

"না দেখ্‌লে কি আর ব'ল্‌ছি, আমি বুড়ো হ'য়েছি ব'লেই কি ফেল্‌না না কি, যে যাকে তাকে নিয়ে এম্‌নি ক'রবে?"

তিনি মুখ খানি কাঁচু মাচু ক'রে ব'ল্‌লেন "কাকে নিয়ে কি ক'রেছি বাপু তাই খুলে বলনা?"

"এই যে, আমার দুষ্মনকে নিয়ে।" ব'লেই হেঁট হ'য়ে চাদরটা টেনে সরিয়ে দিয়ে খাটের নীচে থেকে দুহাত ধ'রে তাকে অর্থাৎ আমার দু বছরের পৌত্রটিকে টেনে তুলে নিয়ে কোলে ক'রলুম। সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো, গৃহিণী তো ধুলোয় লুটিয়ে প'ড়ে হেসে গড়াগড়ি, তোমরা সবাই বল দেখি বাপু, এসব কি অন্যায় কথা নয়?

এঙ্গাস ওয়াট্‌সন

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম্ এ

মহাকবি সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন—

"There is a tide in the affairs of men,
Which taken at the flood leads on to fortune ;"...

বাস্তবিক মানুষের জীবনে এমন এক একটা সুযোগ উপস্থিত হয়, যাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের দ্বারা মানুষের সৌভাগ্যের রুদ্ধ পথ মুক্ত হইয়া যায়। তবে সে সুযোগ সব সময়, প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে আসে না; মাহেন্দ্রক্ষণ যেমন দিবসের একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এই সুযোগ-সুবিধাও জীবনের একটা বিশিষ্ট অংশেই উপনীত হয়। আবার সুযোগ উপস্থিত হইলেই হয় না; সেই সুযোগকে আঁকড়িয়া ধরিবার মত শক্তি ও সজাগ বুদ্ধি-বৃত্তি থাকা প্রয়োজন নতুবা সুযোগ উপস্থিত হইয়া চলিয়া যায়, কোন কার্য্যকরী সুফল প্রসব করে না।

শৈশবের দারিদ্র্য

জগতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যাঁহারা জীবনে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে প্রতিপালিত, প্রতি পদে যাঁহাদিগকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দেহে হতাশ প্রাণে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হয়, নৈরাশ্যের ঘনীভূত অন্ধকার জীবনের বাল্যাবস্থায় যাঁহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে, পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারাই কি ব্যবসাবাণিজ্যে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি সমরভূমিতে, কি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে—সর্ব্বত্রই বিজয়লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে গৌরব-মাল্য লাভ করিয়া ধন্য হন। পৃথিবী-বিখ্যাত ধনকুবের বা রাষ্ট্রপতির বাল্যজীবনেও দেখা যায় যে, কখনও হয়তঃ তাঁহারা দুইটি পয়সা একত্রে দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ; কিন্তু ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ-পালঙ্কের পরিবর্ত্তে প্রকৃতির মহীয়সী অনুকম্পায় তাঁহারা এমন কিছুর অধিকারী ছিলেন, যাহার সাহায্যে পরবর্ত্তী জীবনে তাহারা জগৎকে বিচলিত করিয়া উন্নতি-সোপানে আরোহণ করেন। লর্ড ক্লাইব যদি কেরাণীরূপে ভারতবর্ষে না আসিয়া লর্ডের গৃহে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতেন, তবে আজ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইত কি না কে বলিবে? পাঠান সম্রাট্ সেরসাহকে বাল্যে দারিদ্র্যের কঠোরতায় নিষ্পিষ্ট হইতে হইয়াছিল।

বাণিজ্য-ধুরন্ধর এঙ্গাস ওয়াট্‌সনও বাল্যে দারিদ্র্যের কশাঘাত নীরবে অবনত মস্তকে সহ্য করিয়াছেন। ঐ দারিদ্র্যের কঠোরতাই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তিকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী গ্রেটবৃটেনের রাইটন-অন্-টাইন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই পিউরিটান ভাবাবলম্বী ছিলেন, এবং নৈতিক ও ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে স্কচ দেশীয় পরিবার যে ভাব পোষণ করিত, তাঁহারাও সেই ভাব পোষণ করিতেন।

তিন বৎসর বয়সে এঙ্গাস রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং শৈশব হইতেই তাঁহার খেলাধুলায় অতিশয় আসক্তি ছিল। সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শারীরিক শ্রমবিশিষ্ট ক্রীড়ায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং এই উৎসাহই পরবর্ত্তী জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে প্রযুক্ত হইয়া তাঁহাকে বাণিজ্য-ধুরন্ধররূপে জগতে পরিচিত করিয়াছিল।

পিতৃ-বিয়োগ

অতি অল্প বয়সে এঙ্গাসের পিতার মৃত্যু হয়। এই সময় হইতে তাঁহার ঘাড়ে সব দায়িত্ব নিপতিত হয়, এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থোপার্জ্জনে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হন। অবিলম্বে তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং স্থানীয় সহরে যে ৪টি চাকরী খালি আছে বলিয়া

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার জন্য দরখাস্ত করেন। এই ৪টি চাকরীর একটি কয়লা ব্যবসায়ীর নিকটে, ২য়টি পাইকারী মুদির দোকানে, ৩য়টি মৎস্য ব্যবসায়ীর অধীনে ও ৪র্থটি শস্য-বিক্রেতার নিকটে ছিল। তিনি ঐ শস্য-বিক্রেতার অধীনে সপ্তাহে ৫ শিঃ বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন।

এঙ্গাসের প্রথম চাকরী

এই চাকরী অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ছিল, প্রাতে ৮-৩০টায় কাজ আরম্ভ করিতে হইত এবং অনেক সময় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খাটিতে হইত। তখন এঙ্গাসের বয়স ১৫ বৎসরও হয় নাই, এই অল্প বয়সে এত কঠোর পরিশ্রম করা কি অমানুষিক শক্তির পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এঙ্গাস হাসি মুখে এই কঠোরতা বরণ করিয়া লইলেন। দীর্ঘ এক বৎসর কাজ করার পর, তাঁহার অর্থাভাব বাড়িয়া গেল, সপ্তাহে ৫ শিলিংএ ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব হইয়া উঠিল; সুতরাং তিনি অন্য একটি চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন, যেখানে অধিক অর্থ পাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সপ্তাহে ৯ শিলিং বেতনে টিনের কৌটায় সুরক্ষিত মৎস্য ব্যবসায়ীর কমিশন এজেন্টের বুক-কিপার নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি বুককিপিং জানিতেন না, তথাপি নিরুৎসাহ হইলেন না। ভাবিলেন—অপরাহ্নে বা রাত্রে বুককিপিং শিখিয়া লইবেন এবং যদি সম্ভব হয় স্বীয় বুদ্ধি-বলে কমিশন এজেন্টের কাজ শিখিয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারিবেন! এই ব্যবসায়ের সংশ্রবে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, এই দীর্ঘকালব্যাপী কাজে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী জীবনে উন্নতির পথে বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

উন্নতির পথ

বাস্তবিক যাহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়; বিশ্বের বাজারে তাহার উন্নতি দ্রুত হয় না। বহু বাধা, পর্ব্বত-প্রমাণ দুঃখরাশি অবলীলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া তাহাকে সংসার-পথে অগ্রসর হইতে হয়। নিজের সুখ-সুবিধা, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া লোক উন্নতির পথে প্রধাবিত হইলেও, অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনের সুখ-সুবিধা উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ উপস্থিত হয়। নির্ভরশীল পরিবারবর্গের সুখ-সুবিধা না দেখিয়া স্থির থাকা চলে না। এঙ্গাসের জীবনেও সেই সমস্যা উপস্থিত হইল। একদিকে উন্নতির সোপানে উঠিতে হইবে, বাল্য জীবনের স্বপ্নরাজ্য করায়ত্ত করিতে হইবে, জীবনকে সফলতায় বিমণ্ডিত করিতে হইবে; কিন্তু অপরদিকে গর্ভধারিণী দুঃখিনী জননীর কষ্টও মানুষ হইয়া তিনি কি প্রকারে সহ্য করিবেন? স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর সুখ-সুবিধা বিধান তাঁহার জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য, সুতরাং এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি স্বীয় উন্নতি-পথের বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। বাস্তবিকই দেখা যায়, যাঁহারা পৃথিবীর বুকে অক্ষয়-কীর্ত্তি-সৌধ গঠন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মাতৃভক্ত। মহাবীর নেপোলিয়ান, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতির জীবন মাতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি বাঙ্গালায় প্রবাদ বাক্যে পরিণত।

যখন এঙ্গাসের বয়স ১৮ বৎসর, তখন তিনি নিউক্যাসেল-অন্-টাইনে একটি প্রিজার্ভড্ মৎস্য আমদানীকারকের বিক্রেতার কাজ করিতেন। একদিন একটি খরিদ্দারের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, সেই খরিদ্দার তাঁহাকে একটি কৌটা বাহির করিয়া সার্ডিন জাতীয় এক প্রকার রজত-ধবল প্রিজার্ভড্ মৎস্য প্রদর্শন করেন। উহা নরওয়ে হইতে আসিয়াছে। নরওয়ের ফিয়র্ড্সমূহে ঐ মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ষ্ট্রাভ্যান্জার নামক স্থান হইতে একটি বৃদ্ধ জাহাজের অধ্যক্ষ পরীক্ষাস্বরূপে এই মৎস্যের কয়েক টিন আমদানী করিয়াছিল। উহা জলপাইর তৈলে রক্ষিত।

এঙ্গাস অবিলম্বে ঐ পোতাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব নির্ণয় করিলেন। সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার কল্পনা-প্রবণ হৃদয়ে আশার নবীন আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, যদি ঐ মৎস্য ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা যায়, তবে এই মৎস্যের কাটতি বেশী হওয়া কিছুমাত্র

আশ্চর্য্য নহে। অমনি আনন্দে তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কল্পনার নবারুণরাগে সুরঞ্জিত ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত রূপে তাঁহার চোখের সামনে প্রতিভাত হইল। তিনি অবিলম্বে ঐ মৎস্য আমদানী করিবার জন্য তাঁহার মনিবকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অখণ্ডনীয় যুক্তি, দূরদর্শিতার জ্বলন্ত প্রমাণ, ভবিষ্য ঐশ্বর্য্যের মনোমোহিনী বর্ণনা মনিবের চিত্তজয়ে সমর্থ হইল। মনিব স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকেই ঐ বিষয়ে বন্দোবস্ত করিবার জন্য নরওয়ে যাইতে আদেশ করেন।

প্রিজার্ভড্ মৎস্য আমদানীর জন্য এঙ্গাস নিশীথ সূর্য্যের দেশ নরওয়ে যাত্রা করেন। একে সিদ্ধির অভ্যুদয়ের আশায় উৎফুল্ল হৃদয়, অপরদিকে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির আনন্দ-দুহিতা পর্ব্বত-ফিয়ড্-পরিশোভিতা তুষারমৌলি নরওয়ের নিশীথ সূর্য্যানুরাগ-বিরঞ্জিত দৃশ্যাবলীও এঙ্গাসের প্রাণে নবীন ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিল। এইরূপ আনন্দের মধ্যে এঙ্গাস নরওয়ে পৌঁছিয়া একজন প্রসিদ্ধ মৎস্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে বৎসরে এক হাজার পেটী মৎস্যের জন্য একটি চুক্তি করেন। পাছে এঙ্গাসের অল্প বয়স দেখিয়া ব্যবসায়ীরা বিশ্বাস না করে, এইজন্য তিনি যাহাতে নিজের বয়স বেশী দেখা যায় তজ্জন্য রেশমী টুপি ও ফ্রক কোট ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু মৎস্য ব্যবসায়ী তাঁহার পোষাক দেখিয়া বিজ্ঞ বলিয়া মনে করে নাই—মনে করিয়াছিল ঐ পোষাকের অন্তরালে অবস্থিত অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া। এখনও ঐ ব্যবসায়ী এঙ্গাসকে আন্তরিক ভালবাসে এবং সেই প্রথম বয়সের সৌহৃদ্য আজও সমভাবে বর্ত্তমান।

নূতন উদ্যম

ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া এঙ্গাস পুনরায় বিক্রেতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নূতন পথে প্রধাবিত হইল। তিনি ইংলণ্ডের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সহরে গমন করিয়া প্রত্যেক দোকানে ঐ মৎস্যের নমুনা দেখাইয়া অর্ডার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রথমবার ইংলণ্ড পরিভ্রমণের পর যখন তিনি অর্ডার বুক খুলিয়া দেখিলেন—আশার বিমল আভা হৃদয়ের নিভৃত কন্দর আলোকিত করিল—তাঁহার কল্পনা অমূলক নহে—ইংলণ্ডের বাজারে নরওয়ে দেশীয় মৎস্যের বিশেষ কাট্‌তি হইবে।

লণ্ডনে প্রথম দিন

এই উদ্দেশ্যে যখন তিনি লণ্ডনের মত বিশাল সহরে আসিয়া উপস্থিত, যেখানে অসংখ্য লোকজন, অগণিত যানবাহন অবিশ্রাম জল-প্রবাহের মত ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন তিনি কি প্রকারে কাজ আরম্ভ করিবেন, তাহা ভাবিয়া একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। কারণ, এখানে বড় বড় দোকানে কি ভাবে নমুনা দেখাইয়া অর্ডার সংগ্রহ করিবেন, এবং কোন রাস্তায় ঐ সমস্ত মৎস্য-ব্যবসায়ীর দোকান, কিছুই তিনি জানেন না, রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু তিনি একেবারে হতাশ হইলেন না। কে যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে বলিয়া দিল—"মাভৈঃ"। বাস্তবিক দেখা যায়, যখন মানুষ জাগতিক সহায়-সম্পদে বঞ্চিত হইয়া ভগবানের উপর নির্ভর করে, তখন নীল আকাশের গোপন বক্ষ ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারার মত ভগবানের করুণা মানবের উপর বর্ষিত হয়। ভগবান্‌ই তখন তাহাকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যান।

অনেক কষ্টে বহু ক্ষুদ্র দোকান ঘুরিয়া মাত্র ৪টি অর্ডার তিনি সংগ্রহ করেন এবং কয়েকটি হেড অফিসের ঠিকানা জানিতে পারেন। কিন্তু ক্ষুদ্র হইতেই মহতের উদ্ভব; যে বিশাল বটবৃক্ষ আজ শাখা-বাহু-পল্লব মেলিয়া যোজন-বিস্তৃত দেহে পথগামী পথিকের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য শীতল ছায়া দান করিতেছে, ঐ বট বৃক্ষের উদ্ভব ক্ষুদ্র বীজ হইতে। কাজেই এই ক্ষুদ্র অর্ডারই এঙ্গাসের বৃহৎ অর্ডারের পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

হেড অফিস হইতে ঠিকানা লইয়া তিনি একজন বড় বণিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি সেখানে প্রথমে বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন নমুনা বাক্স বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন এঙ্গাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"অবশ্য আপনি আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আমি আপনার সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত বিষয়

জিজ্ঞাসা করব। আপনার নাম শুনে আমার একজন সুবিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়ারের কথা মনে পড়ছে, স্কুলে পড়বার সময় আমরা তাঁর বিষয় প্রত্যহই কাগজে পড়তাম, আপনি কি তিনি ?"

সহাস্যে বণিক্ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমিই সেই লোক।"

ইহার পর উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তৎপরে তিনি পুনরায় নমুনা দেখিলেন ও তাঁহার অধীনস্থ ১৬০টি শাখায় প্রত্যেক শাখার জন্য এক পেটি করিয়া মৎস্যের অর্ডার দিলেন। অতঃপর অন্য একটি বড় ব্যবসায়ীর নিকট নিজে লইয়া গিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহার আরো অধিক সংখ্যক শাখা-কার্য্যালয় ছিল। মোট ১ দিনে ৮০০ পেটির অর্ডার তিনি পাইলেন। সামান্য ক্রিকেট খেলার ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে এঙ্গাসের এরূপ বৃহৎ কার্য্যসিদ্ধি সম্ভব হইল।

কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংরেজের খাদ্য তালিকায় নূতন মৎস্য সন্নিবেশিত হইল। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এঙ্গাস আবার নূতন ব্যবসা-রাজ্য আক্রমণের কল্পনায় মনোনিবেশ করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন ব্যবসা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অমনি তিনি সুবিখ্যাত সাবান প্রস্তুতকারক লিভার্স কোম্পানীর সঙ্গে মিলিয়া তাহাদের কাজে যোগ দিলেন এবং নিউক্যাসেল ত্যাগ করিলেন।

এঙ্গাসের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা

লিভার ব্রাদার্সের সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি কাজে প্রমোশন পাইলেন ইহাতে তাঁহার জীবনে একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল। এই সময়ের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ষ্ট্যামফোর্ডহ্যাম নর্থহাম্বার্ল্যাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রাম গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পত্র-পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করে; তখন এই গ্রামের দৃশ্য বাস্তবিকই স্বর্গের নন্দন কাননের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিবার উপযুক্ত। কিন্তু শীতের সময় মধ্য এশিয়ার কিরঘিজ ষ্টেপের মত ইহা তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া [illegible]

পথিকের চলাচল দূরে থাকুক ডাক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। এইরূপ শীতকালের এক অধিকতর শীতল প্রভাতে, যখন তুষারাচ্ছন্ন পথে পথিকের চলাচল নাই, পশুসকল রুদ্ধ গৃহে আরাম উপভোগে অভ্যস্ত; গৃহস্থ স্বীয় কুটিরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া আরামে বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত,—ষ্ট্যাম্‌ফোর্ডহ্যামের একটি মুদি বিস্মিত নয়নে দেখিল ভীষণ তুষারপাতকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি মনুষ্য মূর্ত্তি তাহারই দোকানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যখন ঐ লোকটি দোকানে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, সে নিউক্যাসেল হইতে আসিতেছে এবং তাহার বিক্রেয় দ্রব্যের নমুনা বাহির করিল, তখন ঐ দোকানদার এই বালকের অসম সাহসে প্রীত হইয়া প্রত্যেক দ্রব্যের কিছু কিছু অর্ডার দিল। ঐ লোক বালক এঙ্গাস।

বাস্তবিক জগতে যাহারা প্রকৃতির কুটিল ভ্রূকুটি-পূর্ণ রুদ্র মূর্ত্তিকে ভ্রূকুটি দেখাইয়া উপেক্ষা করিতে পারে, ঝড় বৃষ্টি তুষারপাতেও যাহারা কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ নহে, তাহারাই জগতে উন্নতি লাভে সমর্থ হয়, প্রকৃতি তাঁহাদেরই দাসী হইয়া সেবা করে। ইংরেজ নৌ-সেনাধ্যক্ষ নেল্‌সনের বাল্য জীবনেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, যখন তিনি ভীষণ তুষারপাত অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন।

মনিবের সুনজর লাভ

এই অর্ডারের বিষয় সৌভাগ্যক্রমে সেল ম্যানেজারের জ্ঞান-গোচর হয়। তিনি অন্যান্য বিক্রেতাগণকেও এঙ্গাসের মত কাজ করিবার জন্য একটি সার্কুলার জারী করেন। এইরূপ বিশেষ সার্কুলার দেখিয়া তদানীন্তন সত্ত্বাধিকারী উইলিয়ম লিভার সেল ম্যানেজারকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সেল ম্যানেজার সমস্ত বিষয় উইলিয়মকে জ্ঞাত করান।

এঙ্গাসের পদোন্নতি

এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া উইলিয়ম এঙ্গাসকে কোম্পানীর গ্লাসগো অফিসের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। এঙ্গাসের বয়স তখনও কুড়ি অতিক্রম করে নাই। তৎপরে 'হাল্'

'হাল'এ কার্য্য করিতেছেন, তখন কোম্পানীর আমেরিকার নিউইয়র্ক জেলায় অফিস খুলিবার প্রয়োজন হয় এবং এঙ্গাসই এই কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। এঙ্গাসের জীবনে এই আর একটি উন্নতির সোপান। বাস্তবিক এঙ্গাসের জীবন কয়েকটি ক্রমোন্নতির সমষ্টি মাত্র। একটির পর পর একটি ক্রম বা সোপান অতিক্রম করিয়া আজ তিনি ব্যবসা-রাজ্যের একজন স্বাধীন ভূপতিরূপে পরিচিত—তাঁহার জীবন দৃষ্টান্তস্থানীয়।

কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

ষ্ট্যামফোর্ডগ্রামে যে উপায়ে কার্য্য করিয়া তিনি উন্নতি লাভ করেন, ও লণ্ডনে প্রথম যে ভাবে কাজ করিয়া মৎস্যের অর্ডার সংগ্রহ করেন, ঠিক সেইরূপ ভাবের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাই তাঁহাকে আরও উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া যায়। তিনি নিউইয়র্কে আসিয়া দেখিলেন, আমেরিকাবাসীরা বৃটিশ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে না, কিন্তু আগুন যেমন ভস্মের চাপে নিবিয়া যায় না, সময়ে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হয়, এঙ্গাসও তেমনি এ বিফলতায় ক্ষুণ্ণ হইলেন না। তিনি অদম্য উৎসাহে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ফোর্টল্যাণ্ডের একটি দোকানদারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে এমনভাবে মুগ্ধ করিলেন, আর বৃটিশ-নির্ম্মিত সাবান যে বাস্তবিকই আমেরিকাবাসীর ব্যবহারোপযুক্ত সে বিষয়ে এমন দৃঢ় বদ্ধমূল ধারণা উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন যে, সে দোকানদার এত অধিক সাবানের অর্ডার দিল যে, সেই অর্ডার দেখিয়া কর্তৃপক্ষ বিস্মিত হইয়া গেল। এই ব্যাপারও কোম্পানীর সভাপতির নজরে আসিল এবং টাইন প্রদেশের দরিদ্র বালক এঙ্গাস লিভার কোম্পানীর স্যান ফ্র্যান্সিস্‌কো সহরের শাখা কার্য্যালয়ের সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাহাকে যে বেতন দেওয়া হইল, তাহা এখন বেশ মোটা মাহিনা বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।

এই বাল্য জীবনের অদম্য কর্ম্মশক্তি প্রভাবে, লিভার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং বৃটিশ শিল্পের একজন ধুরন্ধর লর্ড লিভার হুলমের সঙ্গে এঙ্গাসের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ডেভিড্‌ ও জোনাথানের মত এ বন্ধুত্বও সাধারণের শিক্ষা ও শ্রদ্ধার বস্তু।

প্রলোভন ত্যাগ

যদিও সুযোগ এঙ্গাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, যদিও কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি দারিদ্র্যের তীব্র পীড়নে নিপীড়িত হইয়াছেন, তথাপি তিনি এ পদ গ্রহণ না করিয়া আমেরিকা ত্যাগ করেন এবং টাইন প্রদেশে ফিরিয়া আসেন। এত অধিক অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করা খুবই দুরূহ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পদ গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় পড়িয়া থাকিলে এঙ্গাসের বর্ত্তমান উন্নতি হইত কি না কে বলিবে? বাস্তবিক ভগবান্‌ মানুষকে দিয়া যাহা করান, যদিও অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে তাহাতে ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু পরিণামে তাহাই সুফলপ্রসূ হইয়া তাহাকে উন্নতির সোপানে টানিয়া লইয়া যায়। হেন্‌রী ফোর্ড যদি এডিসন কোম্পানীর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কার্য্য গ্রহণ করিতেন, তবে বোধ হয় আজ জগতের অদ্বিতীয় ধনকুবের বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না।

স্বাধীন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ

লিভার কোম্পানীর কাজ ত্যাগ করিয়া তিনি নিজে ব্যবসা করিতে মনস্থ করিলেন এবং নরওয়ে গিয়া মৎস্যের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এত অধিক অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করায় তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বিস্মিত হইয়া গেল এবং তাঁহার মনিব এত বড় একজন কর্ম্মঠ কর্ম্মচারীকে হারাইয়া কিছু বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু সেই বাল্যের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করিতে আজ এঙ্গাস বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, যাহা এতদিনে সঞ্চয় করিয়াছেন, হয় তাহার প্রত্যেক আধলাটি পর্য্যন্ত তিনি খোয়াইবেন, নতুবা এই ব্যবসায়ই তাঁহাকে উন্নতির উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিবে।

সাহায্য প্রাপ্তি

এই সময় হেন্‌রি বি সেইণ্টের সঙ্গে এঙ্গাসের বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্বের প্রভাব তাঁহার জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। পরে সেইণ্ট তাঁহার ব্যবসায়ের অংশীদার হন।

এই দুই জনের সমবেত চেষ্টার ফলে ২০০০ পাউণ্ড মূলধনে নূতন কোম্পানী গঠিত হয়। তন্মধ্যে এঙ্গাস নিজের সঞ্চিত ১০০০ পাউণ্ড দেন। এঙ্গাস যখন প্রথম শস্ত ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করিতেন, তখনও তিনি প্রতি সপ্তাহে কয়েকটি পয়সা জমাইতেন। এই জমান অভ্যাস ছিল বলিয়াই তিনি অতি সহজে ব্যবসার জন্ম ১০০০ পাউণ্ড বাহির করিতে সমর্থ হন।

বৃটিশজাতির বিশেষত্ব

বৃটিশ জাতির দুইটি বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়—সাহস ও কল্পনাপ্রিয়তা। হতাশা কাহাকে বলে, বৃটিশ জাতি তাহা জানে না। কল্পনার শুভ্র চন্দ্রালোকে ঐশ্বর্য্যের মহতী ছবি হৃদয়ের পটে অঙ্কিত করিয়া বৃটিশ জাতি পৃথিবী জয়ে সমর্থ হইয়াছে। যে কল্পনা ও দুঃসাহসিকতা ড্রেকের পৃথিবী ভ্রমণের কারণ, ক্লাইভের ভারত জয়ের মূলভিত্তি, লিভিংষ্টোনের আফ্রিকার জঙ্গলে প্রবেশের উদ্বোধক, সেই কল্পনা ও দুঃসাহসিকতাই বর্ত্তমানে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া বৃটিশ জাতির জীবনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ও কণ্ঠে সৌভাগ্যের মণিমুক্তাখচিত কণ্ঠ-মালা পরাইয়া দিতেছে। এঙ্গাসের এ ব্যবসা-গঠনের মধ্যেও সেই কল্পনা ও দুঃসাহসিকতাই পরিদৃষ্ট হয়।

ব্যবসার আরম্ভ

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নিউ ক্যাসেলের রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র একখানি ঘরভাড়া লইয়া এঙ্গাস ও সেইন্ট—একজন বালক ও যুবক—নবীন উদ্যমে নূতন বৃটিশ শিল্পের পরিকল্পনায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। নিউ ক্যাসেলের যে মৎস্য ব্যবসায়ীর অধীনে তিনি কাজ করিতেন, সেই ব্যবসায়ী, তিনি চলিয়া যাওয়ায় বিশেষ কোন উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ যে দূরদৃষ্টি এবং কর্ম্ম-ক্ষমতা এঙ্গাসকে আমেরিকার কার্য্য ত্যাগ করিয়া শুভ্র-সার্ডিন-মৎস্য-ব্যবসায়ে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, এই ব্যবসায়ীর সেই দূরদৃষ্টি ছিল না। বাস্তবিক কার্য্যসিদ্ধির পুরোভাগে চাই ধ্যান—যে ধ্যান লেবেল মণ্ডিত সাবানের আকারে উইলিয়ম লিভারকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, যে ধ্যান মটর কারের আকারে হেন্‌রী ফোর্ডকে উদ্বোধিত করিয়াছিল, তাহাই মৎস্যের আকারে এঙ্গাসকে বিশ্ব-সংসার, মোটা মাহিনার চাকরী প্রভৃতি ভুলাইয়া দিয়া নিউক্যাসেলের কাপড়ের বাজারে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

নূতন কর্ম্মপ্রণালী

তিনি দ্বিতীয় বার নরওয়ে যাত্রা করেন এবং যাহাতে টিনের আকার বৃটিশ বাজারের উপযোগী হয়, অধিকন্তু মাল ভাল হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। বিশেষতঃ এঙ্গাসকে সত্বাধিকারী জানিয়া এবং তাঁহার অদম্য উৎসাহ, কর্ম্মক্ষমতা ও ব্যবসা-বুদ্ধি দেখিয়া নরওয়েজিয়ান কোম্পানী প্রত্যেক বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু তিনি নিজে যে সুবিধা পাইবেন, পূর্ব্বে যে মৎস্য ব্যবসায়ীর অধীনে তিনি কাজ করিতেন এবং যাহার খরচে তিনি প্রথমবার নরওয়েতে আসেন; তিনিও যাহাতে সেই সুবিধা পান, তাহার ব্যবস্থা করেন—বাস্তবিক বৃটিশ জাতি অকৃতজ্ঞ নহে।

কর্ম্মের উন্নতি

প্রথম শ্রেণীর মাল, নূতন কর্ম্ম-কৌশল ও অবিরাম পরিশ্রমের বলে এই ক্ষুদ্র কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কাজেই ২ বৎসর পরে ১৯০৫ সনে কোম্পানী এক হাজার পাউণ্ডের বিজ্ঞাপনের চুক্তি করিলেন।

ট্রেড মার্ক

একদিন নটিংহামের রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে এঙ্গাস একটি সুন্দর জেলের ফটোগ্রাফ দেখিতে পান। ইহা দেখিয়া ঐ জেলের ফটোর ট্রেড মার্ক করিবার জন্ম তাঁহার ইচ্ছা হয়। তিনি কয়েক পাউণ্ড দিয়া ঐ ফটোগ্রাফের কপি রাইট কিনিয়া লন এবং "Skipper Sardines" এই নামের ট্রেডমার্ক দিয়া বাজারে বাহির করেন। বর্ত্তমানে এই ট্রেডমার্কের মূল্য আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের বেশী বলিয়া অনুমিত। পরে এঙ্গাস ঐ ফটোগ্রাফের আসল লোককে

খুঁজিয়া বাহির করেন এবং যাঁহার চেহারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের নিকট পরিচিত তাহাকে বেতন দিয়া নিজের কোম্পানীর দলভুক্ত করেন। তাহার নাম ডানক্যান্ এণ্ডার্সন্; সে একজন পেন্সানপ্রাপ্ত নৌ-সৈনিক। বিগত যুদ্ধের পর তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার পুত্রকে বিক্রেতা নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কর্ম্মের প্রসার

অতঃপর এঙ্গাস 'স্যামন্ মৎস্য' যাহাতে কোটা খুলিয়া পাতে দেওয়া যায় (ready-to-serve), সেইরূপভাবে প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। প্রথমতঃ এই ব্যবসায় বৃটিশ কলাম্বিয়ায় আরম্ভ করেন, কিন্তু এক্ষণে প্রাচ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ হইয়াছে—বর্ত্তমানে পৃথিবীর বাজারের সমস্ত 'স্যামন' প্রাচ্য সমুদ্রে ধৃত হয়। অতঃপর অন্যান্য 'অবিলম্বে খাওয়ার উপযুক্ত' খাদ্য দ্রব্যের বিক্রেয় তালিকায় যোগ হইতে থাকে। তাহার ফলে, যে ব্যবসায় একটি বালক মাত্র সততা ও উৎসাহের পুঁজি লইয়া আরম্ভ করিয়াছিল, আজ তাহার মূলধন ২০০০,০০০ পাউণ্ড এবং সেই ব্যবসায় পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারীকে প্রত্যহ তৃপ্তিকর খাদ্যে পরিতৃপ্ত করিতেছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে টিনে ও বোতলে রক্ষিত সমস্ত খাদ্য প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। ইহাতে এক লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়।

কিন্তু এত উন্নতির মধ্যে, বহু বিলাস-সামগ্রীর প্রস্তুতির মধ্যেও এঙ্গাস ওয়াট্সন সেই 'Skippers' মার্কা মৎস্যকে পরিত্যাগ করেন নাই। বরং যে ব্যবসায়ে তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, সেই ব্যবসায়ের আরও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। আজও তাহা পৃথিবী ব্যাপিয়া সহস্র সহস্র দোকানে দৈনিক বিক্রীত হয়, এবং গৃহিনীগণ পরম পরিতোষ সহকারে আত্মীয়-পরিবারের পাতে পরিবেশন করেন। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে যাহার মোট প্রস্তুতি মাত্র বৎসরে ২ হাজার কোটা ছিল, আজ তাহা ১০ লক্ষ কোটারও অধিক —ফলে নরওয়ের মৎস্য ব্যবসায় বাড়িয়া গিয়াছে এবং ধীবরগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে এবং বহু বেকার ইংরেজ কাজ পাইয়াছে।

উপাধি

কেহ উপাধি লাভের জন্য লালায়িত, আবার কেহ উপাধি ব্যাধি বলিয়া পরিহার করিতে সচেষ্ট। এঙ্গাস্ ওয়াট্সনও নাইট্ উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; কিন্তু নরওয়ের মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্য নরওয়ের রাজা আমাদের মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অনুমতি লইয়া তাহাকে "Order of St. Olap" উপাধি দিয়াছেন। তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক যাহারা কর্ম্মী, তাহারা উপাধি ভাল বাসে না—তাহাদের উপাধি—কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান—বিপুল জন-সঙ্ঘের অন্ন-কষ্ট দূর।

কৃত-কর্ম্মের তালিকা

এঙ্গাস এই ২৫ বৎসর ব্যবসায়ে কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন এবং কিরূপ লাভবান্ হইয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

		বিক্রীত পেটী
১৯০৩	মূলধন ১০০০ পাউণ্ড	২৫,০০০
১৯২৭	,, ২,০০০,০০০ পাউণ্ড	৭৫,০০০,০০০
১৯০৩	কর্ম্মচারী—২ জন	
১৯২৮	,, ১০,০০০ জন	

এই ২৫ বৎসরে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ৮০,০০০ পাউণ্ড লভ্যাংশ স্বরূপ বিতরিত হইয়াছে।

এঙ্গাস ওয়াট্সনের উপদেশ

জীবনের উন্নতি-পথে চরিত্র, সাহস এবং কর্ম্মক্ষমতা— এই তিনটি গুণই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই তিনটি গুণ বর্ত্তমান থাকিলে সিদ্ধি অনিবার্য্য। উন্নতি পথের নিয়মাবলী বোঝা কঠিন নহে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করাই শক্ত। (১) মানুষ যাহা দেয়, তাহাই পায়; (২) আত্মসংযমই আত্মোন্নতির মূল; (৩) সিদ্ধিলাভ হঠাৎ হয় না—ইহা সুচিন্তিত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা, উদ্দিষ্ট বস্তুর ধ্যান দ্বারাই লভ্য। নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, জীবনের শুভ পরিণতির উপর বিশ্বাস কর, এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রমে সাহসী হও—

তবেই সৌভাগ্য দেবী কমলদলে সুখ-শয্যা রচনা করিবে।

পরিশেষে বলা যাইতে পারে উন্নতির সীমা নাই; আকাশের সঙ্গে ধরণীর চক্রবালে মিলন যেমন ক্রমশঃ দূরে দূরে সরিয়া যায়, তেমনি উন্নতিও যেন একটির পর একটি করিয়া আরো দূরে আরো দূরে বলিয়া পথ দেখায়—"Achievement is but another milestone along the highway of progress—the end of the journey lies ever beyond."

সুবর্ণবণিক্

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ

(১)

বিত্তের হেতা ছিল না মূল্য, চিত্তই ছিল দামী,
তুমি ছিলে ধনী বিরাট্ বালক নিত্য অর্থকামী।
কার্য্য তোমার ডিঙ্গা সাজাইয়া সপ্তসাগর ফিরা,
পর্ণ বদলে স্বর্ণ আনিতে, জিরার বদলে হীরা।
দেশে দেশে তব ধনভাণ্ডার, প্রতিবন্দরে ভোজ
মায়াময় এই জগৎ তাহার কিছুই রাখনি খোঁজ!
কাঞ্চন ছিল ঘৃণার বস্তু, কোথা ত্যাগী দেশ হেন,
তুমি কাঞ্চন-কারবারী সেথা পতিত না হবে কেন?

(২)

ধুলামুঠি তব কড়িমুঠা হল হে নিপুণ ব্যবসায়ী
গেলে সিংহল আরব মিশর তোমার পণ্য বাহি।
শিল্প-কলায় দেশে ও বিদেশে করিয়াছ মাথামাথি
জাতি যাইবার ভয় কর নাই, এটা কত বড় ফাঁকি!
অর্থ যে হায় কত অনর্থ একথা ভাবনি কভু,
ক্ষণিক জীবন তাহারি অমিয়া আঁকড়ি পিয়েছ তবু;
কাঞ্চন ছিল ঘৃণার বস্তু কোন ত্যাগী দেশ হেন,
তুমি কাঞ্চন-কারবারী সেথা পতিত না হবে কেন?

(৩)

কোথায় সে দিন! কোথায় তোমার ভাবুক সেদেশ গেল?
গৌরব চেয়ে তোমার সে শুভ কলঙ্ক ছিল ভাল।
দৈন্তের আভিজাত্যের কাছে নমিত তোমার মাথা
হে ধনী তোমরা সবাকার নীচে পেতেছিলে নিজে পাতা।
'সুবর্ণরেখা' নিরঞ্জনার চরণে কাঁদিত পড়ি,
'গোলকুণ্ডা' যে 'প্রয়াগে'র পায়ে প্রেমে দিত গড়াগড়ি।
কাঞ্চন ছিল ঘৃণার বস্তু, কোথা ত্যাগী দেশ হেন,
তুমি কাঞ্চন-কারবারী সেথা পতিত না হবে কেন?

উন্নতি না অবনতি ?

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল, সাহিত্যরত্ন কবিভূষণ

একদিন আমাকে কোন স্বজাতি বন্ধু কহিলেন "আমরা পৈতা লইয়া জাতে উঠিলাম, তোমরা পড়িয়া রহিলে।" আমি হাসিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলাম "অবশ্য তোমাদের বিদ্যার দৌড়টা আমাদের অপেক্ষা বেশী, নতুবা প্রমোশন হইল কি প্রকারে ?" স্কুলের ছাত্র ক্লাসে উঠিলে যেরূপ-ভাবে হাসে, তিনিও তদ্রূপ হাসিয়াছিলেন, প্রভেদ এই যে স্কুলের ছাত্রের হাসি সরলতা-পূর্ণ, তাঁহার হাসি দাম্ভিকতা-পূর্ণ। তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি সান্ধ্যভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলাম "বাস্তবিক পৈতা-ধারী সুবর্ণবণিকের কিছু উন্নতি হইল কি না ?" সঙ্গে সঙ্গে কথামালার সেই ময়ুর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের উপাখ্যানটা মনে পড়িল।

যে সকল সুবর্ণবণিক্ উপনয়ন ধারণ করিয়া ভাবিলেন তাঁহাদের উন্নতি হইল, আমি ভাবিতেছি তাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবনে অবনতি হইল, কারণ ধর্ম্মকে তাঁহারা এই প্রথম ফাঁকি দিলেন। বহু পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মে ফাঁকি চলিয়াছে ; সমাজে ধর্ম্মের নামে অনেক অসঙ্গত বিধান প্রচলিত হইয়াছে। ইহার অনিবার্য্য ফলে নৈতিক জীবনে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের প্রতি সাধারণের যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, এক্ষণে উহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এতকাল সুবর্ণবণিক্‌গণ খাঁটী বৈষ্ণব ছিলেন, বৈদিক ধর্ম্মের মারপ্যাঁচ বুঝিতেন না, এবার কর্দ্দমাক্ত পথে পদার্পণ করিলেন,—দ্বিজ সাজিয়া বৈশ্যের গুণ এবং কর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা ঐ বর্ণভেদের গোলক-ধাঁধায় প্রবেশ করিলেন ! স্মৃতি শাস্ত্রের বিধান না মানিয়া, শুধু কুলগর্ব্বের জন্য, বা ১৫ দিনে অশৌচান্ত করিবার জন্য, বা শুধু গায়ত্রী জপ করিবার জন্য, সুবর্ণবণিক্ এবার বৈদিক ধর্ম্মের আশ্রয় লইলেন ! ধর্ম্মে এক নম্বর ফাঁকি চলিল। তাঁহারা ভাবিলেন—"A Daniel is come to judgment !" বলাইবাবু Daniel সাজুন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি তাঁহার judgment এর প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ৮০০ বৎসর পরে জাতে উঠিবার বিধান হিন্দুর কোন শাস্ত্রেই নাই, অথচ তিনি বিধান দিলেন ! ২ নম্বর ফাঁকি চলিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মূর্খ ছিলেন না, বা ধর্ম্মে আস্থাহীন ছিলেন না। আত্ম-গৌরববোধ যে কম ছিল এমতও নহে, অথচ তাঁহারা বারবার চেষ্টা সত্বেও জাতে উঠিতে পারেন নাই কেন ? তাহার কারণ শাস্ত্রে কোন ধর্ম্মবিধান নাই। বল্লালসেন আমা-দিগকে পতিত করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু বল্লালের পরবর্ত্তী রাজা লক্ষণসেন সুবর্ণবণিক্ জাতির প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার অমাত্য উমাপতি ধর একজন সুবর্ণবণিক্ ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রকাশ আছে। অথচ সুবর্ণবণিক্ জাতে উঠিতে পারিলেন না কেন ? ইহার কারণ, প্রাচীন স্মৃতি ইহার অন্তরায় হইয়াছিল।

লক্ষণসেনের পর আরো দুইজন হিন্দুরাজা বাংলার সিংহাসনে আরোহন করিলেন। অথচ সুবর্ণবণিকের জাতে উঠা হইল না ! মুসলমানকালেও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ প্রাচীন স্মৃতিতে জাতে উঠার কোন বিধান পাইলেন না। ঐ যুগে রঘুনন্দনের নূতন বিধানও তাহার অন্তরায় হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্নহৃদয় সহচর ছিলেন। তিনি উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে কৃপার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনন্দন মহাপ্রভুর সহপাঠী ছিলেন। তথাপি সুবর্ণবণিক্ জাতে উঠিতে পারিলেন না ! স্মৃতিকে ঠেলিয়া রাখিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় থাকে না, কাজেই অনন্যোপায় হইয়া সুবর্ণবণিক্ জাতি শ্রীচৈতন্যদেবের পদে শরণ লইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আর অন্য গতি ছিল না, এখনও নাই। আজ আমরা ধর্ম্মে ফাঁকি চালাইয় সহজেই জাতে উঠিয়া পড়িলাম ! উন্নতি হইল বটে !

প্রাচীন স্মৃতিগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরাকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে স্ব স্ব বৃত্তি পালন করিতে হইত। বৃত্তিপালনে অসমর্থ হইলে রাজা তাহাকে নিজবৃত্তি পালনে সহায়তা করিতেন। বারবার বৃত্তিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বিপদ্‌কালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। বিপদ হইতে উন্মুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিজ বৃত্তিতে ফিরিয়া যাইতে হইত। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন কালে ব্রাহ্মণকে অনেক দ্রব্যের ব্যবসা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে. কৃষিকার্য্যই তখন জীবকানির্ব্বাহের সহজ উপায় ছিল। এখন আর সে রামও নাই, যে অযোধ্যাও নাই! আছে শুধু এক অর্থহীন উপনয়ন-প্রথা! বৈদিক ধর্ম্ম ও বৃত্তি বহুকাল আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি! প্রাচীন স্মৃতিগুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়নকাল ছিল ৮ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে; ক্ষত্রিয় সন্তানের ১০ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে; এবং বৈশ্য সন্তানের ১২ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে। ঐ ১৬, ২০, এবং ২৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের আর উপনয়ন হইত না। তাহার গায়ত্রী জপে অধিকার থাকিত না। ঐ ব্যক্তি স্ব-সমাজে পতিত এবং নিন্দিত হইত। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে যদি সে ব্রাত্যস্তোম বা উদ্দালক ব্রত করিত, তবে তাহার উপনয়ন হইয়া স্ব-সমাজে বিবাহ হইত, নতুবা অনুপনীত অবস্থায় শূদ্র কন্যা বিবাহ ব্যতীত তাহার আর কোন পথ ছিল না, এবং জাতে উঠিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন স্মৃতিতে জাতে উঠিবার নিয়ম ছিল দ্বিজাতির উত্তীর্ণোপনয়ন কাল হইতে বিবাহ কালের মধ্যে; বিবাহের পরে নহে। অর্থাৎ এক পুরুষের জীবনের কয়েক বৎসরের মধ্যে। আধুনিক স্মৃতিতে রঘুনন্দন যদি ৪ পুরুষের মধ্যে জাতে উঠিবার বিধান দিয়া থাকেন, তাহা হইলেও বহু পূর্ব্বে ঐ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ৫০ পুরুষ বাদে জাতে উঠিবার বিধান হিন্দুর কোন স্মৃতি শাস্ত্রেই নাই।

যায় না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ধনী ছিলেন, তাঁহারা প্রচুর অর্থ দিয়াও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের অনুকূল মত পান নাই। আজ বলাইবাবু বিনা ব্যয়ে স্মৃতিকে দলিত করিয়া আমাদিগকে জাতে তুলিয়া দিলেন! আমরা বৈশ্য ছিলাম, এ কথা অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন; কিন্তু ৮০০ বৎসর পরে আবার বৈশ্যাচার গ্রহণ হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত কি না ইহার মীমাংসায় হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের প্রতিকূল। সেই জন্য ৩ নম্বর ফাঁকি চালাইতে হইল। দ্বিজাতির দশটি সংস্কার পর পর অবশ্য পালনীয়, তাহার মধ্যে ৯ম সংস্কার উপনয়ন এবং ১০ম সংস্কার বিবাহ। বিবাহের পর উপনয়ন কোন দ্বিজ বংশে হয় না, ইহা শাস্ত্রানুমোদিতও নহে। আমাদের মধ্যে তাহা হইতেছে। ইহা ৪ নম্বর ফাঁকি। জানি না, বলাইবাবুর বংশে কেহ বিবাহের পর পৈতা লইয়াছেন কি না, কিন্তু ইহা যে ঘোরতর অশাস্ত্রীয় কার্য্য তাহা সুনিশ্চিত; কারণ সন্তান-সন্ততির পিতা হইবার পর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার প্রয়াস ভণ্ডামী মাত্র। বর্ণ ও আশ্রম লইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম। একের উচ্ছেদ করিয়া অন্যের পালন করিবার বিধান হিন্দুর কোন শাস্ত্রেই নাই। হয় শাস্ত্র-বিধান বজায় রাখিয়া দুইটিই পালন কর, নতুবা দুইটিই ত্যাগ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকে নূতন করিয়া গঠন কর। আস্থা না থাকিলে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যদি প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রে আস্থা না থাকে, তাহা বরং ত্যাগ করা ভাল, তথাপি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাহার মধ্যে ফাঁকিচালাইবার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। ঐরূপ কার্য্যে নৈতিকজীবনে অধঃপতন হওয়া বিচিত্র নহে। প্রাচীন ধর্ম্মকে বরং সময়োপযোগী করিয়া লওয়া ভাল, কিন্তু তাহার মধ্যে ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা উচিত নহে! যাহাকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহাকে লঘুভাবে দেখা উচিত হয় না। ধর্ম্মের নামে আমরা যে সকল ফাঁকি চালাইতেছি, তাহা ভগবানের অগোচর নহে। একদিন ধিক্কার দিয়া অবশ্যই আক্ষেপ করিতে হইবে,— "কেন ফাঁকি দিয়াছিলাম?"

ইচ্ছামৃত্যু!

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১

জীবন-তরণী থাক্ চিরস্থির সংসার-বন্দরে—
এইতো প্রধান ইচ্ছা নরনারী সবার অন্তরে।
সে চায় রোধিতে জরা, জীবনেরে ধরিয়া রাখিতে,
যৌবনের জয়গর্ব্বে সর্ব্বকাল বাঁচিয়া থাকিতে!
আত্মরক্ষা ধর্ম্ম তার প্রকৃতির অমোঘ বিধানে,
মানবের যুদ্ধ তাই মৃত্যু সনে নিয়ত নিদানে!
নহে কিছু মূল্যবান তার কাছে প্রাণের অধিক;
পদ্মপত্রে জলবিন্দু—এ জীবন অস্থায়ী-ক্ষণিক—
এ কথা বুঝিয়া যারা প্রয়োজনে দিয়ে গেছে প্রাণ
জগত করেছে জানি যুগে যুগে তাদের সম্মান!
দুর্ভিক্ষে দেখেছি পুন অনশনে ক্ষুধার্ত্ত মানব
পশুসম হ'য়ে ওঠে সর্ব্বভুক্ নৃশংস দানব!
নিরন্ন জননী বাঁচে কেড়ে নিয়ে সন্তানের গ্রাস—
চরাচরে ক্ষুন্নিবৃত্তি—জীবনের আদিম প্রয়াস!

২

সে কোন্ প্রাচীন যুগে দ্বাপরের দীপ্ত গোধূলিতে
এঁকেছিল ঋষি কবি চিত্র এক বিচিত্র তুলিতে,
ভুবনে অজেয় বীর ব্রহ্মচারী শান্তনু নন্দন,
নিত্যমুক্ত চিত্ত যাঁর সত্যাশ্রয়ী চির-অবন্ধন!
প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম তিনি, সুকঠোর কর্ত্তব্যে নির্দয়,
বাক্য তাঁর বজ্র-দৃঢ়, সর্ব্বনাশে অটল হৃদয়!
ইচ্ছা-মৃত্যু করি পণ শর-শয্যা বরিল ধরায়,
কীর্ত্তি যাঁর অতুলন সর্ব্বমন শ্রদ্ধায় ভরায়!
প্রতি রোমকূপে তাঁর তীক্ষ্ণশর বিঁধিল অর্জ্জুন
তথাপি সত্যের লাগি স্পর্শ আর করেনি যে তূন,
অকাতরে সয়েছিল অকরুণ অসংখ্য আঘাত,
গাঙ্গেয় সে অদ্বিতীয়, দেবব্রত, দেবতা সাক্ষাৎ!
বীরত্ব অপূর্ব্ব তাঁর, সত্যনিষ্ঠ চরিত্র মহান্
মৃত্যুরে করিয়া তুচ্ছ মৃত্যুঞ্জয়ী রেখে গেছে প্রাণ!

৩

সে যুগের সে দ্বাপর কালগর্ভে হয়েছে অতীত,
কলির কলুষে আজি বীর্য্যহীন এ জাতি পতিত!
কে জানিত দেখা দিবে তাহাদেরি মাঝারে আসিয়া
এ সময়ে হেন বীর—মৃত্যুরে যে জিনিবে হাসিয়া!
রণবাদ্যে উত্তেজিত মদমত্ত সৈনিক বাহিনী
ছোটে বটে মৃত্যুমুখে, এতো নহে তাদের কাহিনী!
তিলে তিলে চলা এযে প্রতিদিন অটল চরণে
কারার আঁধার কক্ষে অনশনে মরণ বরণে!
এ কোন্ অতুল বীর সত্যপণে আজি অভিনব,
ইচ্ছা-মৃত্যু নিল বরি' ভীষ্ম-কীর্ত্তি করিয়া নিষ্প্রভ!
দিনেকের শরাঘাত প্রতি অঙ্গে সয়েছে গাঙ্গেয়
এ বীর যে বহুদিন প্রতিক্ষণে হয়েছে বিদেহ!
বিন্দু বিন্দু রক্ত দানে আপনারে করেছে অর্পণ
সার্থক এ আত্মদান—বিজয়ীর অমর তর্পণ!

কণ্টকে গড়িল বিধি

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্রের ভরা নদীর বুকে তুফান উঠেচে!

সাঁই সাঁই ঝড়—ঝম্ ঝম্ বাদলধারা···বিরাম নেই!

নদীর কূলে কূল ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ে,—কেউ হাসে, কেউ কেঁদে ফিরে যায়, কেউ পাগলা হাতীর মত সুমুখে যা পায় ভেঙ্গে ফেলে।

তীরের উপর জীর্ণ এক দেউল, চারি ধারে জঙ্গল, এই বুনো গাছগুলোই যেন তার প্রহরী। মন্দিরের মধ্যে মহাদেব,—পাষাণ মূর্ত্তি তাঁর!

হাজার হাজার লাখোলাখ ঢেউ উন্মাদের মত মন্দির সোপানের গায়ে ধাক্কা দেয়,—জীর্ণ গৃহ খাড়া থাকবার শক্তি হারিয়ে ফেলে।......তুফান ও থামেনা, ঢেউগুলোর ও পাগ্‌লামি বন্ধ হয় না। নদীর অথৈ জলে মহাদেবের পাষাণ দেহ সমাধিস্থ হ'তে আর দেরী নেই।......

ভক্ত পূজারীর বুকেও তুফান উঠ্‌লো।······ঠাকুরকে বাঁচাবে সে কি করে আজ!······যে নিজে বাঁচলে বাঁচতে পারতো, সে যে আপন ইচ্ছায় চ'লে যেতে বসেচে! এ যাওয়ার গতি কে রোধ করবে!

পূজারীর বুক ভেসে যায় অশ্রুধারায়, প্রাণ ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে!—দুহাতে পাষাণ দেবতার প্রতিমা আঁক্‌ড়ে কাঁদে—ঠাকুর! ঠাকুর! নিজের হাতে লক্ষ প্রাণীকে সৃষ্টি করছো, খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌চো, মরণের আহ্বান শোনাচ্ছো, আজ তোমার ভাগ্য কেন এমন হ'ল!......পাষাণের মুখে সজীব হাসি ফুটে ওঠে! অবোধ ভক্ত ভাবে—দেবতার রোদন।......অশ্রু প্রবাহ!

*　　*　　*　　*　　*

এক মাইল তফাতে গ্রাম আছে। ষোল আনা অধিবাসী অস্পৃশ্য চণ্ডাল, নয়তো ডোম বাগ্দী। ব্রাহ্মণে

বীভৎস জল-কল্লোলের হুঙ্কারে পূজারী ব্রাহ্মণ আকুল হয়ে ছুটে গেল—সেই 'পায়ে ঠেলে রাখা' নগণ্য অধিবাসীর কাছে।

—ওরে বাঁচা বাঁচা রক্ষা কর্!—সবংশে ধ্বংশ হ'য়ে যাবি।......ঠাকুরকে বাঁচা, তিনি চলে গেলে তোদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বেনা। দেবতার শাপে নির্ব্বংশ হতে চাস্ কেন?......উঠে আয়! কোদাল নে! কাটারী নে!......ঠাকুরের মন্দির রক্ষা কর্!......

অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেছে! আজ স্বয়ং বামুন ঠাকুর দোর গোড়ায় এসে ডাক দিয়েছে,—শিব ঠাকুরের ঘর বাঁচাতে হবে!......সাজো সাজো রব প'ড়ে গেল।

ছেলে বুড়ো মিলে, গ্রামখানা খালি করে সব ছুটে এলো সেই মন্দিরের পাশে!

······মুহুর্মুহু গর্জ্জন, অবিশ্রাম বর্ষণ......তুফানের বিরাম নেই!

ছোটলোকের দল প্রকৃতির অত্যাচারে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।—পূজারী হাঁক্‌লো—হতভাগারা! মরণের পথ সাফ্ করিস নি, যদি বেঁচে থাক্‌তে চাস—মাটি কেটে নিয়ে আয়! ঝোপ জঙ্গল কেটে নিয়ে আয়!—মন্দিরের সুমুখে চাপিয়ে দে।······ভেঙ্গে পড়লে প্রলয় হবে। কেউ বাঁচবিনে।

ভক্তি আছে, কিন্তু ভয় লক্ষগুণ বেশী। ঠাকুরের অভিশাপের ভয়ে, অবুঝ চণ্ডালের দল প্রাণপণে মন্দির রক্ষায় নিযুক্ত হয়ে পড়লো।

পূজারী মন্দির ঘরের সোপানটায় দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিলে—সাবাস্ বাবা সকল! আজ তোরাই ঠাকুরের

নদীর কবল থেকে মন্দির বাঁচালে!......দেহে আর বল নেই; পা, দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলেচে!······বিশ্রাম—বিশ্রাম চাই!

পূজারীর গম্ভীর কণ্ঠ থেকে ঘন ঘন আশীষ বাণী শোনা যাচ্ছে—মঙ্গল হবে! বড় লোক হবি তোরা! বাবা ভোলানাথ আশীর্ব্বাদ করেছেন।......

···ঝড় জলের মাতন সমানে চলেছে।

...অন্ধকার রাত্রি! কোলের মানুষ নজরে আসে না। মন্দির রক্ষা করেছিল যারা তাদের মধ্যে অনেকে গ্রামে ফিরে গেছে। জন কতক যেতে পারে নি, তার কেউ বুড়ো, কেউ কেউ ছেলে।

মন্দিরে আলো জ্বলে উঠ্‌লো।···পূজারী দ্বার খুলে ডাক্‌লে—কে কে আছিস রে!...মাথায় তার তালপাতার ছাতা, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে প্রসাদের থালা।

চণ্ডালদল—চীৎকার করে উঠ্‌লো—বাঁচাও ঠাকুর! সারা দেহ জমে গেল যে!...কত সইবো আর?—তারা দ্বার পথে এগিয়ে চ'ল্‌লো।

পূজারী চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—ওরে ওরে—এগিয়ে আসিস্ নি! মন্দিরের গা ছুঁলেই হাত পুড়ে যাবে। ঠাকুর ত্রিশূলের ঘায়ে মেরে ফেল্‌বেন! পালা পালা!

আকাশ-ভুবন তোলপাড় করে, দূরের বৃক্ষশাখায় বাজ পড়লো। চণ্ডালের দল আর্ত্তনাদ করে কাঁদলে—বাবা-ঠাকুর বাবাঠাকুর! আর যে পারি না!···এই সব অবুঝ ছেলেরা আর আমাদের মত বুড়ো—কেমন করে সহ্য করবে? তোমার পায়ে পড়ি বাবাঠাকুর। ঠাঁই দাও, মাথা গুঁজে জান্ বাঁচাই।

প্রসাদের থালা খানা ঝনাৎ করে ফেলে দিয়েই পূজারী ঠাকুর মন্দির-দ্বার বন্ধ করে দিলে।

ভিতর থেকে তাঁর প্রচণ্ড নিষেধাজ্ঞা শোনা গেল—ধ্বংস হ'য়ে যাবি! চণ্ডাল হয়ে বাবার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নি! তোরা সব অস্পৃশ্য—ছোট জাত!...সর্ব্বনাশ হবে।

অবুঝের দল বুকফাটা আর্ত্তনাদ করছিল। প্রকৃতির সর্ব্বনাশী লীলা—করাল মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে, তাদের ক্লান্ত নয়নের পুরোভাগে ভয়াবহ নাচন জুড়ে দিয়েছে!

—বাবা ঠাকুর একটিবার দোর খোলো আমরা বাঁচি।

সাড়া এলো—ছুঁলে কেউ বাঁচবিনে! সাবধান!

সুবর্ণ-বণিক্‌তত্ত্ব

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বণিক্‌ ইতিহাসের নূতনতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় 'সুবর্ণবণিক্‌ সমাচার' পত্রিকার ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের কয়েক সংখ্যায় 'বণিক্‌ ইতিহাসের কিয়দংশ' ও 'গৌড়ে সুবর্ণবণিক্‌' প্রবন্ধদ্বয়ে সুবর্ণবণিকের প্রাচীন ইতিহাসের যে সকল নূতনতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে সংক্ষেপে সেগুলির আলোচনা করা যাইতেছে।

সুঃ বঃ সঃ ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা—শীল মহাশয় সূর্য্যবংশীয় ববস্বত মনু হইতে একটী বংশলতা বাহির করিয়া সুবর্ণবণিকের আদি পুরুষ স্থির করিয়াছেন। বংশলতাটী এই—

বৈবস্বত মনু

ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ

|

হর্য্যশ্ব—পত্নী মধুমতী

|

যদু

|

মুচুকুন্দ | পদ্মবর্ণ | মাধব | সারস | হরি

মাধব → রেবত

|

বৈরতঋক্ষ

|

বিশ্বগর্ভ

|

বসু | বভ্রু | সুষেণ | সভাক্ষ

সুষেণ → প্রেষেণ

|

সণক—পত্নী বরাটিনী
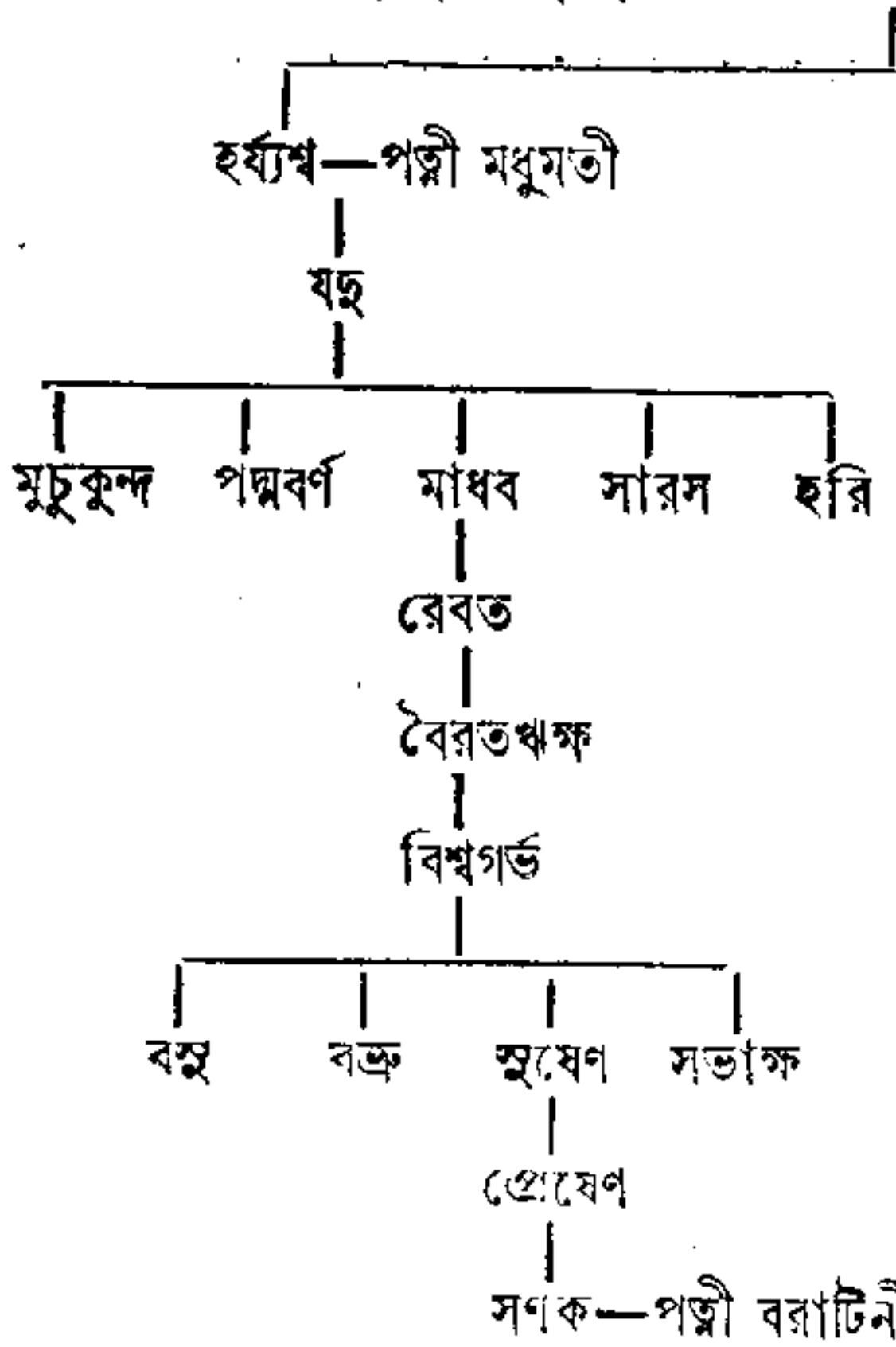
শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—"হরি বংশ হইতে জানা গেল সূর্য্যবংশীয় হর্য্যশ্ব ভার্য্যা মধুমতী ও অল্প পরিবার সহিত অযোধ্যা হইতে মধুপুর বা মথুরায় গমন করেন" সুঃ বঃ সঃ ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা। পুনশ্চ সুঃ বঃ সঃ ৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যায়—"বসু গুজরাট দেশে রাজত্ব করেন। সুষেণ ও সভাক্ষ স্বজনগণের সহিত বাণিজ্যার্থ মথুরায় গমন করেন।"

হর্য্যশ্চ সপরিবারে অযোধ্যা হইতে মথুরায় গমন করেন এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এখন আবার তাহার অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ সুষেণ ও সভাক্ষ কোথা হইতে মথুরায় আগমন করিলেন ?

"কালান্তরে সুষেণ, স্বজনবর্গের সহিত মথুরা হইতে হৈমবত দেশে কণকক্ষেত্রে গমন করিয়া রাজত্ব করেন। * * * * ইক্ষাকু সন্তান ক্ষেত্রী ও বণিক্‌গণ কণকক্ষেত্রে বাস করিতে করিতে কণকক্ষেত্রের অধিকার সূত্রে 'কণকক্ষেত্রী' এই নাম পাইলেন। এই স্থানে একটী প্রাচীন সূত্রের পূর্ব্বাংশ ধৃত করিতেছি—আদৌ আখ্যান কণকক্ষেত্রিণাম্‌। অর্থ—আদিকাল হইতে যে আখ্যান প্রচলিত, তদনুসারে আমাদের নাম কণকক্ষেত্রী।"

যদি সুষেণ কণকক্ষেত্রে রাজত্ব করিয়া থাকেন তবে কণকক্ষেত্রবাসী অন্য বণিক্‌গণ কেন কণকক্ষেত্রী হইবেন ? আর কণকক্ষেত্রবাসী ব্যক্তি মাত্রই যদি কণকক্ষেত্রী আখ্যা লাভের অধিকারী হন তবে বণিক্‌ ভিন্ন কণকক্ষেত্রবাসী অন্য জাতিও কণকক্ষেত্রী হইতে পারেন। শীল মহাশয় যে প্রাচীন সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার রচয়িতা কি সূত্রটী কণকক্ষেত্রবাসী বণিক্‌গণকে বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন, যদি তাই হয়, তবে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য জানিবার পক্ষে কি কোন উপায় আছে ? ইক্ষাকু সন্তানেরা ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য সে বিষয়ে শীল মহাশয় কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ইক্ষাকু সন্তানেরা যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"বৈবস্বত মনু ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করায় তৎ-

সন্তানেরা ক্ষত্রিয় হইয়াছিল। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষাকু হইতে সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রকুল উৎপন্ন হইয়াছে।"

সুঃ বঃ সঃ ৪র্থ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় আরও শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—" * * * * প্রেষেণের তিরোভাব হইলে কণকা সনকের শৈশবত্ব হেতু, রাজ্য অধিকার করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন—এই নিমিত্ত তাঁহার রাজধানীর নাম হয় নারীপুর।" শীল মহাশয় এই নারীপুর বা স্ত্রীরাজ্য বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনৎ সং বর্ণিত ব্রহ্মপুর রাজ্য অভিন্ন বলিয়া অনুমান করেন, এ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"Our traveller (Hiuen Tsiang) goes right into the Sub-Himalayas and speaks of a kingdom Brahmapura (identified with Gharwal and Kumaun), which produced gold and where for ages a woman has been the ruler and so it is called the kingdom of women. 'The husband of the reigning woman is called king, but he knows nothing of the affairs of the state. The men manage the wars and sow the lands and that is all' (Book iv, p. 199)."

শীল মহাশয় কণকার রাজধানীর নাম 'নারীপুর' বলিয়া উহাকে 'স্ত্রী রাজ্য' বা 'ব্রহ্মপুর রাজ্য' অভিন্ন অনুমান করিতেছেন, রাজধানীর নাম অপেক্ষা রাজ্যের নাম সুবিশাল ভূখণ্ডের নাম বলিয়া জানা যায় এবং রাজ্যের মধ্যেই রাজধানী থাকে। নারীপুর যদি রাজধানীর নাম হয় তবে উহাকে রাজ্যের নামে অভিন্ন স্থান বলিয়া কিরূপে ধরা যাইতে পারে। যদি রাজধানীর নামও রাজ্যের নাম এক হইত তাহা হইলে এ প্রশ্ন উঠিত না। হুয়েনৎসাংএর উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা ব্রহ্মপুর রাজ্যের অধিশ্বরী কাহারও শৈশব হেতু যে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে না, পরন্তু তাঁহার স্বামীর ষ্টেটের কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হেতু যে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আর 'which produced gold' বলিলে যে কনকক্ষেত্র বুঝায় এবং ইহাই যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দেশের নাম এমত বোধ হয় না।

সুঃ বঃ সঃ ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 'গৌড়ে সুবর্ণবণিক্' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"সনকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বংশধরদের নাম জানিবার উপায় নাই। বহুকাল পরবর্ত্তী তাঁহার উত্তর পুরুষদের নাম হইতে জানি তাঁহারা বংশানুক্রমে চন্দ্রান্ত নাম চন্দ্র উপাধি ধারণ করিয়া রোহিতগিরির চন্দ্র নামে খ্যাত হইয়াছেন।"

শিববাবু সনকের উত্তর পুরুষের নাম হইতে কিরূপে রোহিত গিরির চন্দ্রবংশ সনক বংশধর বলিয়া জানিলেন তাঁহার সেই গবেষণার কিয়দংশ কি এস্থলে প্রদান করা উচিত ছিল না?

পুরাণ দিল্লীর বিষ্ণুধ্বজ বা লৌহ স্তম্ভের গাত্রে খোদিত প্রাচীন লিপি উদ্ধৃত করিয়া শিববাবু বলিয়াছেন—"প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের মতে উদ্ধৃত লিপির রাজার নাম 'চন্দ্র, * * * কেহ বলেন ঐ চন্দ্র রাজা গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত আবার কেহ বলেন উনি মরু প্রদেশের পুষ্করণ নগরের অধিপতি চন্দ্র বর্ম্মা! * * * শাস্ত্রী মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালার বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্ব্বত গাত্রে যে চন্দ্র বর্ম্মার শিলালিপি আছে এবং যিনি সিংহ বর্ম্মার পুত্র ও চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক, সেই চন্দ্রবর্ম্মা ও লৌহ স্তম্ভের চন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি। ঐতিহাসিক রাখালদাস বাবুও ঐ মত পোষণ করেন। চন্দ্রকে চন্দ্রবর্ম্মা মনে করা বা চন্দ্রবর্ম্মা স্থির করা উচিত বোধ হয় না। আমার মনে হয় এই ভূমিপতি চন্দ্র ক্ষেত্রপতি বা কনক-ক্ষেত্রপতি সনকের বংশে জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতেই তাঁহার বংশে চন্দ্রান্ত নাম রাখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।"

উল্লিখিত চন্দ্র রাজা সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিকদ্বয় শাস্ত্রী মহাশয় ও রাখালদাস বাবু যখন এক মত প্রকাশ করিয়াছেন তখন শীল মহাশয় সর্ব্বাগ্রে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দ্বারা তাঁহাদের মত খণ্ডন পূর্ব্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিলে ভাল হইত। উক্ত লৌহ স্তম্ভে খোদিত ভূমিপতি চন্দ্রকে কনক-ক্ষেত্রপতি চন্দ্র বলিয়া মনে করা ও তাঁহাকে

সনক বংশধর বলিয়া অনুমান করা শীল মহাশয়ের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড ২৮৯—৮০ পৃঃ) হইতে তিব্বতীয় লামা তারানাথের বিবরণ পুনরুদ্ধৃত করিয়া শীল মহাশয় ১৯ জন চন্দ্র রাজার নাম করিয়াছেন—"১ হরিচন্দ্র, ২ অক্ষয়চন্দ্র, ৩ জয়চন্দ্র, ৪ হেমচন্দ্র, ৫ পণিচন্দ্র, ৬ ভীমচন্দ্র, ৭ মলচন্দ্র, ৮ শ্রীচন্দ্র, ৯ ধর্ম্মচন্দ্র, ১০ কনকচন্দ্র, ১১ কর্ম্মচন্দ্র, ১২ বৃক্ষচন্দ্র, ১৩ কামচন্দ্র, ১৪ বিগম (বিক্রম) চন্দ্র, ১৫ সিংহচন্দ্র, ১৬ বলচন্দ্র, ১৭ বিমলচন্দ্র, ১৮ গোবিচন্দ্র ও ১৯ ললিতচন্দ্র। তারানাথের মতে চন্দ্র বংশীয় প্রথম ৭ জনই সপ্ত চন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পূর্ব্বদেশে এই ৭ জনই বৌদ্ধ ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। * * * গোবিচন্দ্রের পুত্র ললিতচন্দ্রের সহিত চন্দ্ররাজ বংশের অবসান হয়। কিছুদিন অরাজকতা চলিতে থাকে। রাজবংশীয়দিগের মধ্যে যাঁহাকেই নির্ব্বাচন করা হয় তিনিই চন্দ্র বংশীয় এক রাণীর কৌশলে রাত্রিকালে নিহত হইতে লাগিলেন, অবশেষে রাণীর করাল-কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গোপাল, প্রজা সাধারণ কর্ত্তৃক নৃপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।''

রাখালদাস বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্য ভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্য খণ্ডে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত লইয়াছিল। এই অরাজকতাকে 'মাৎস্য ন্যায়' বলে। ইহা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মগধের গুপ্ত বংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পর এই 'মাৎস্য ন্যায়' বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রজা সাধারণ পাল বংশীয় গোপালকে গৌড়ের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। রাখালদাস বাবু লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসকার লামা তারানাথ গোপালদেবের রাজ্য লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড় বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 'প্রতিদিন একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপাল দেব রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।" লামা তারানাথ বর্ণিত ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী কে? চন্দ্রবংশীয় ললিতচন্দ্রের পত্নী না গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তের পত্নী? এই প্রশ্ন দ্বারা একটা সংশয় উপস্থিত হয়। কারণ গৌড়-মগধের অধিপতি গুপ্তরাজবংশের অধঃপতনের সহিত অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয়েরা পূর্ব্ববঙ্গের অধিপতি ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কখন গৌড় ও মগধের সিংহাসন লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানা যায় না। এসব অবস্থায় পূর্ব্ব বঙ্গের এক বিধবা রাণী বিশাল গৌড় ও মগধ সাম্রাজ্যে প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিলেন কেন? পক্ষান্তরে জীবিত গুপ্তের বিধবা পত্নীর এ কার্য্য বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীচন্দ্র দেবের রামপাল তাম্রশাসনে লিখিত আছে 'এইস্থানে (১) রোহিতাগি (রি) ভোগী মহা শ্রীমান চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণচন্দ্র তুল্য শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র বিখ্যাত হইয়া ছিলেন।" এই উদ্ধৃতাংশের (১) চিহ্নিত টীকায় শীল মহাশয় লিখিয়াছেন, 'এইস্থানে' বলিতে বীরভূম জেলার অযোধ্যায়। আর রোহিতাগিরি সংযুক্ত বন্ধনিযুক্ত 'রি' ও শীল মহাশয়ের দ্বারা সংযোগ করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই স্থানে বলিতে যে বীরভূম জেলার অযোধ্যা আর রোহিতাগি বলিতে রোহিতাগিরি তাহা কেবলমাত্র অযোধ্যাবাসী বণিক্ শ্রীজয়পতি চন্দ্রকে টানিয়া আসিয়া উহার সহিত সংযোগ করিবার উদ্দেশ্যে কি? এই তাম্রশাসনোক্ত শ্রীচন্দ্র রাজা বা পূর্ণচন্দ্রের সহিত পূর্ব্বোক্ত লামা তারানাথ বর্ণিত চন্দ্ররাজবংশের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা সে বিষয়ে শীল মহাশয় নীরব।

সুঃ বঃ সঃ ৫ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা গৌড়ে সুবর্ণবণিক্ প্রবন্ধে শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসন ও

গোবিন্দচন্দ্র গীত হইতে শ্রীচন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্রের এইরূপ বংশলতা পাওয়া যাইতেছে—

পূর্ণচন্দ্র	
সুবর্ণচন্দ্র	সুবর্ণচন্দ্র
ত্রৈলোক্যচন্দ্র	ধাড়িচন্দ্র
শ্রীচন্দ্র	মাণিকচন্দ্র
	গোবিন্দচন্দ্র
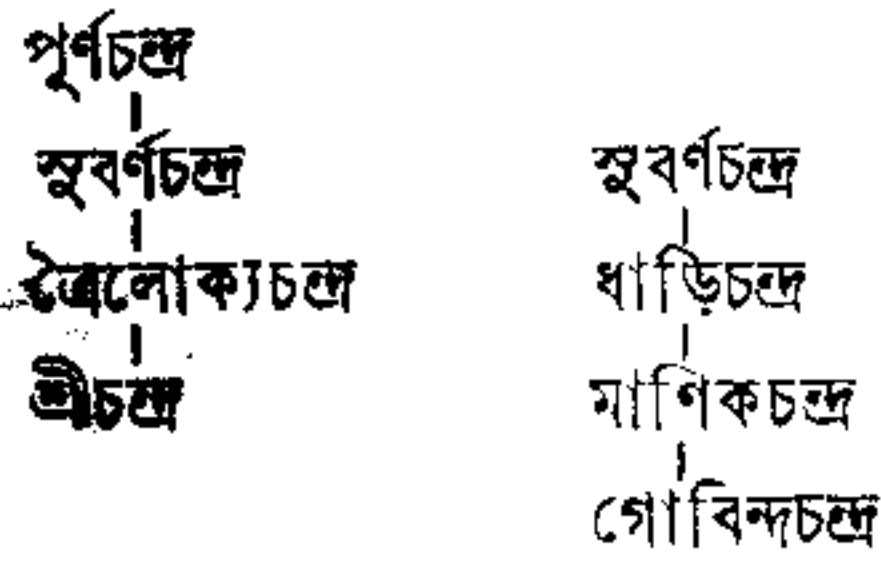
শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় জানিতে পারিয়াছি যে, চন্দ্রগণ রোহিতাগিরি ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই বংশে পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।”

রাখালদাস বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—“বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্য কাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু রামপালের তাম্র-শাসন হইতে এবং ময়নামতী ও গোপীচাঁদের পুঁথি হইতে চন্দ্র বংশের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন—

পূর্ণচন্দ্র	
সুবর্ণচন্দ্র	সুবর্ণচন্দ্র
ত্রৈলোক্যচন্দ্র	ধাড়িচন্দ্র
শ্রীচন্দ্র	মাণিকচন্দ্র
	গোবিন্দচন্দ্র
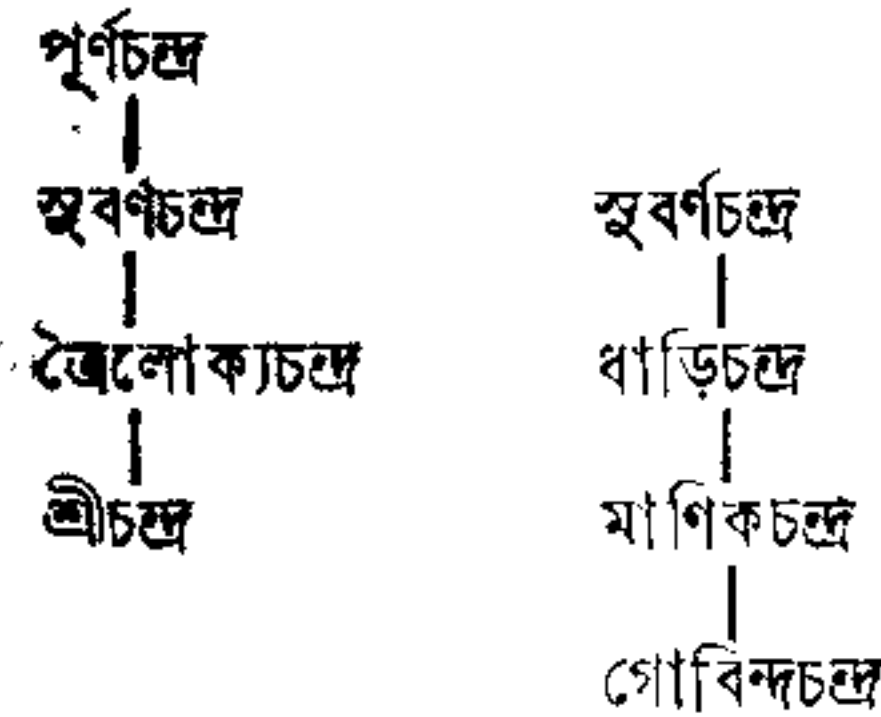
বসুজ মহাশয় বলেন—‘উদ্ধৃত বংশলতা হইতে শ্রীচন্দ্রও গোবিন্দচন্দ্রকে একই বংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। যদি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ডাক নাম ধাড়িচন্দ্র হয় তাহা হইলে শ্রীচন্দ্রকে সম্পর্কে গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত বলিয়া ধরা যায়, কিন্তু উত্তর বঙ্গে ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ময়নামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতী রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র বা তিলোক চাঁদের কন্যা বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। উভয় ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র ময়নামতীর পিতা না হইয়া শ্বশুর হইয়া পড়েন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্য কাণ্ড ২৬১ পৃঃ। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে চন্দ্রবংশের সহিত ময়নামতী বা গোপীচাঁদের গানে উল্লিখিত রাজগণের কোন সম্পর্কই এখনও পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে না।”

শীল মহাশয় শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসন দৃষ্টে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, রোহিতাগিরি চন্দ্রবংশীয় পূর্ণচন্দ্র অযোধ্যায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এখন চন্দ্র বংশীয়দিগের অযোধ্যা নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—“অনুমান পঞ্চম শাকশতকে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহাগণ (রোহিতাগিরি শ্রীজয়পতিচন্দ্র আদি বণিক্‌গণের পূর্ব্ব পুরুষগণ) রোহিতাগিরি হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিকে আগমন করেন এবং বন জঙ্গল কাটিয়া দুইটী পুরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা আপনাদের আদিম বাসস্থানের নামকরণ করিয়া এই দুইটী পুরীর নাম রাখেন অযোধ্যা। এই দুইটী অযোধ্যার মধ্যে একটী বীরদেশ (বীরভূম জেলা) ও অপরটী বাঁকুড়ামণ্ডলে (বাঁকুড়া জেলায়) বিদ্যমান আছে।”

উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমকেশরীর আহ্বানে উল্লিখিত অযোধ্যাবাসী ১৬ জন প্রধান বণিক্ এবং তাঁহাদের অনুগত ৩০ জন বণিক্ সপরিবারে উজ্জয়িনীতে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে জয়পতিচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। এই জয়পতি চন্দ্রের খ্যাতিবন্দ রোহিতাগিরি। অপর ১৫ জন প্রধান বণিকের মধ্যে কাহারও খ্যাতিবন্দ কিরণাকর, কাহারও বসনাসন, কাহারও কনকাঙ্কুর ইত্যাদি পৃথক পৃথক খ্যাতি-বন্দ। শীল মহাশয় প্রণীত ‘গৌড়ে সুবর্ণবণিক্’ পুস্তক হইতে এ সংবাদ জানিতে পারি। চন্দ্রবংশীয়গণের রোহিতাগিরি ভোগ করিবার জন্য যদি রোহিতাগিরি খ্যাতিবন্দ হয় আর রোহিতগিরি শ্রীজয়পতি চন্দ্র আদি বণিক্‌গণের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি আমাদের (অর্থাৎ সুবর্ণবণিক্ জাতীয়গণের) পূর্ব্ব পিতামহগণ হন তবে অপর বণিক্‌গণের পৃথক পৃথক খ্যাতিবন্দ কেন হইল ? সুবর্ণবণিক্‌কুলের এক রোহিতাগিরি খ্যাতিবন্দ হওয়া উচিত ছিল না কি ? আর রোহিতাগিরি শ্রীজয়পতি চন্দ্র বলিতে যে পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনোক্ত রোহিতাগি-ভোগী শ্রীচন্দ্র রাজার বংশকে বুঝায় তাহার কোন বংশলতা আবিষ্কার হইয়াছে কি ? শ্রীচন্দ্র রাজা ছিলেন কিন্তু জয়পতিচন্দ্র বণিক্। চন্দ্ররাজ বংশের বণিক্‌বংশে পরিণত হইবার কোন ইতিহাস শীল মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন কিনা জানা যায় না। আর রোহিতাগিরি চন্দ্রবংশীয়গণ কর্তৃক অযোধ্যা-নির্ম্মাণ ঐতিহাসিক সত্য কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।,

ক্রমশঃ

২৫ মাইল সন্তরণ

বাঙ্গালী বালকের কৃতিত্ব

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চাটার্জ্জি হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় গঙ্গার ভীষণ স্রোতোবেগপূর্ণ কর্দ্দমাক্ত জলরাশির মধ্য দিয়া ২৫ মাইল ৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে সন্তরণ করিয়া মেজারোডে গিয়া উঠেন। যেখানে টন্‌স্ নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, সেখানে একটি ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল। কয়েক মিনিট ধরিয়া তিনি তলাইয়া যান। তখন নৌকাস্থ সকলে মনে করিল বুঝি তিনি ডুবিয়া গেলেন। পরে বদ্ধ হস্তদ্বয় ও মস্তক জলের উপরে ভাসিয়া উঠে, তদনন্তর তিনি অধিকতর বেগে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু পূর্ব্ব হইতে উৎকৃষ্ট সন্তরণকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৯½ ঘণ্টায় তিনি ৪৩ মাইল সাঁতার দিয়া অতিক্রম করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আবর সাগরের ৩০ মাইল ১২½ ঘণ্টায় সাঁতার দিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া একবার অত্রস্থ সন্তরণকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর।

ইংলিশম্যান্

আকাশ-যান-চালক ওয়াগ্ হরণের সম্বর্দ্ধনা

মাননীয় সম্রাট্ ওয়াগ্ হরণকে Air force Cross উপহার দিবেন। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত Schneider Trophy, team-সকলের ভোজে আকাশবিভাগীয় মন্ত্রী লর্ড থমসন উহা ঘোষণা করিয়াছেন। ইটালিয়ান আকাশ-যান-চালকগণকেও তিনি বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। ইটালিয়ান কাপ্তেন বলেন যে, ইটালি ঘণ্টায় ৪০০ মাইল পথ অতিক্রমের চেষ্টা করিবে। বৃটিশ আকাশযান-চালকেরাও ক্রমাগত গতিবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা আশা করেন অবিলম্বে তাঁহারা ঘণ্টায় ৩৮০ মাইল পথ অতিক্রমে সমর্থ হইবেন।

ইংলিশম্যান্

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন

বম্বেতে অনুন্নত ও অস্পৃশ্য জাতিরা যাহাতে হিন্দু মন্দিরে অন্যান্য উন্নত ও স্পৃশ্য জাতির সহিত এক সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং উহা কংগ্রেস ও অন্যান্য দেশীয় নেতাদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। সমিতি হিন্দুমন্দিরের ট্রাষ্টীগণের সঙ্গে দেখা করিয়া যাহাতে অস্পৃশ্য জাতিদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা সত্যাগ্রহ করিবেন এবং এই সত্যাগ্রহে বম্বের কলের মজুরগণ যোগদান করিবে। সোসিয়েল ইকুয়েলিটি লিগের দ্বারা সমর্থিত হইয়া বিগত সার্ব্বজনিক গণেশ উৎসবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের সহিত অস্পৃশ্য জাতিরাও যোগ দিয়াছিল।

ইংলিশম্যান্

ইটালিয়ান চিত্রশিল্প-প্রদর্শনী

লণ্ডন পিকাডেলি বার্‌লিংটন হাউসে ইটালিয়ান চিত্র-শিল্পের প্রদর্শনী আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইয়া ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। ইটালির প্রত্যেক সহর মহামতি মুসোলিনীর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাহাদের শিল্প-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নসমূহ প্রদর্শনীক্ষেত্রে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মেণী, হাঙ্গেরী, হল্যাণ্ড, সুইডেন, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি সকলেই এই প্রদর্শনীকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীরূপে পরিণত করিয়া জগতের

বিস্ময় উৎপাদনে সচেষ্ট। ছবি, খোদিতমূর্ত্তি, আসবাব প্রভৃতি ইটালিয় শিল্পের নিদর্শনীভূত প্রত্যেক বস্তু আগ্রহ সহকারে প্রেরিত হইতেছে। আমাদের মহামান্য সম্রাট্ও প্রদর্শনীর জন্য, বাকিংহাম প্যালেশ, উইণ্ডসর ক্যাসেল্ ও হ্যামটন্ কোর্ট হইতে ৮ খানা ছবি প্রদর্শনীকে ধার দিবেন। বেসরকারী লোকেরাও তাহাদের মহামূল্য চিত্ররাজি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। ৩৫০ খানা ছবি প্রদর্শিত হইবে। এতদ্ভিন্ন ইটালীর শিল্পকলার নমুনাস্বরূপে খোদিত-মূর্ত্তি, কাচের দ্রব্য, আসবাব প্রভৃতিও প্রদর্শনীক্ষেত্রে লোক-চক্ষুর তৃপ্তিবিধান করিবে। এই প্রদর্শনীর বিশেষত্ব এই যে প্রাচীন চিত্রশিল্পী, মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির অঙ্কিত চিত্র প্রচুর পরিমানে প্রদর্শিত হইবে। আশা করা যায়, এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে বহু দর্শক লণ্ডনে সমাগত হইবে; কারণ ঐ সমস্ত পৃথক পৃথক ভাবে দেখিতে গেলে দর্শককে বহুদেশ পর্যটন করিতে হইত; কিন্তু এখানে এক লণ্ডনেই দর্শক সমস্ত দেখিতে পাইবে।

২৮ ঘণ্টা সন্তরণ

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ ২৮ ঘণ্টা সন্তরণ করিয়াছেন। তিনি প্রাতে ৬টার সময় হেদুয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ করেন এবং পরদিন বেলা দশটার সময় কোন সাহায্য ব্যতিরেকে উঠিয়া আসেন। বহু লোক হেদুয়া পুষ্করিণীতে তাঁহার সন্তরণ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কলিকাতায় এত অধিকক্ষণ সন্তরণ আর কেহই করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি ২৮ ঘণ্টায় ২৭৮ বার পুষ্করিণী পার হইয়াছিলেন। শেষ বারে তিনি তিন মিনিটে পার হন।

নিউইয়র্কে অর্থোপার্জ্জন

নিউইয়র্কে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জের গ্যালারিতে বসিলে দেখা যায়, কি বিরাট্ উত্তেজনা অর্থ-জগতের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, আর তাহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সম্মিলিত ধ্বনি বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত নিউইয়র্কের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। এইখানে সমগ্র পৃথিবীর আর্থিক সমস্যার মীমাংসা হয়। এই স্থানের সংবাদের উপর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের হর্ষ-বিষাদ বিজড়িত। সামান্য গ্রাম্য কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া কোটিপতি পর্য্যন্ত সকলেই এই স্থানের দৈনিক সংবাদের জন্য লালায়িত! কোথায় কাহার ভাগ্য কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এই স্থান হইতেই তাহা জানা যায়। শুধু যে আমেরিকার অর্থ-সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বা উঠা নামা এখান হইতে সংসাধিত হয়, তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির নরনারীর আর্থিক সমস্যাও এই স্থানের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ইয়োরোপের এক্সচেঞ্জের বাজার অনেক সময় স্থির থাকে, বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, কিন্তু নিউইয়র্কের বাজার চির পরিবর্ত্তনশীল। অথচ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একটা সাম্যের ধারা, একটা স্থিরতার রেখা বর্ত্তমান। সেই স্থিরতার সূত্র ধরিয়া যে কোন বুদ্ধিমান লোক সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। দেখা যাইবে, এই বিষয়ে নিউইয়র্কে যেরূপ সুযোগ বর্ত্তমান, পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহা নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে সুপরিস্ফুট। প্রথমতঃ আমেরিকার মূলধন নষ্ট হইবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার সম্পদ্ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ পূর্ব্বে লোক সঞ্চিত অর্থ গবর্ণমেণ্টের বণ্ডে নিয়োজিত করিত; কিন্তু এখন আমেরিকাবাসী বুঝিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটান অধিক লাভজনক। এখন লোক শতকরা ৫৲ টাকা সুদের বণ্ড অপেক্ষা ২৷৹ টাকা লাভের কারবারের অংশ ক্রয় করিতে উৎসুক, এখন লোকের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর লোক ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে ভয় পায় না। ফলে আমেরিকার ধন-সম্পদ্ বাড়িয়াই চলিয়াছে, বটবৃক্ষের অঙ্কুরের মত শাখা-বাহু-পল্লব মেলিয়া। যদিও ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে কোম্পানীর অংশসমূহ বেচাকেনা হয়, কিন্তু ধনবান হইবার প্রকৃষ্ট উপায় অংশ ক্রয় করা—বিক্রয় করা নহে। আমেরিকার দালালের কমিশন খুব কম এবং গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প ফি

প্রভৃতিও নাম মাত্র। কাজেই নিউইয়র্কের ষ্টক্ এক্সচেঞ্জে অংশ বেচা-কেনার যত সুবিধা পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ নাই।

ইংলিশম্যান

লণ্ডনের সর্ব্ব প্রথম টেলিফোন

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে সর্ব্ব প্রথম টেলিফোন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় মিঃ জেমস্ ব্যাণ্ডই সর্ব্ব প্রথম টেলিফোন নিজ বাড়ীতে আনয়ন করেন। তিনি কোলম্যান ষ্ট্রীট এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং লণ্ডনে সর্ব্ব প্রথম 'পাবলিক কল্' দেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল গোরোড নিজে প্রাইভেটভাবে তাঁহার অফিসের সঙ্গে ইকুইটেবেল্ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অফিস্ টেলিফোন দ্বারা সংযুক্ত করেন। কিন্তু মিঃ জে হারুজ্ বলেন যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম "পাবলিক্ কল্" দাতা।

ইংল্যাণ্ডে পূর্ণবয়স্কের চেয়ে বালকের সংখ্যাধিক্য

স্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার সার জর্জ্জ নিউম্যান তাঁহার বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডে পূর্ণ বয়স্কের অপেক্ষা বালকের সংখ্যা অনেক অধিক হইবে। মৃত্যুর হারে জীবিত বালকের অপেক্ষা বৃদ্ধের সংখ্যা বর্ত্তমানে অধিক। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বালকের সংখ্যা শতকরা ১১·৪ জন; ৫৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক বৃদ্ধের সংখ্যা শতকরা ১০·৬ জন; কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বালকের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং বৃদ্ধের সংখ্যা শতকরা ১১·৬ জন দাঁড়ায়। বিগত যুদ্ধের ফলে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় বালক শতকরা ৮·১ ও বৃদ্ধ শতকরা ১৫·৮ জন। কিন্তু মৃত্যুর হার যেরূপ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জন্ম সংখ্যার অনুপাতে বালক ও বৃদ্ধের সংখ্যা সমান দাঁড়াইবে এবং তৎপরে ক্রমশঃ জন্ম সংখ্যা বাড়িয়াই যাইবে। বিশেষ কারণ এই যে বর্ত্তমানে গর্ভধারণোপযোগী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক; দ্বিতীয়তঃ ৪১৫০০

হার বর্ত্তমানে হাজার করা মাত্র ৬৫ জন। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ বয়স্কের অপেক্ষা শিশুই বেশী হইবে।

রাস্তার উন্নতি

সার বি এন্ মিত্রের প্রস্তাব

রোড্ কমিটির আলোচনার জন্য সার বি এন্ মিত্র নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন—

মটর স্পিরিটের উপর আমদানী শুল্ক চারি আনা হইতে ছয় আনা বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ বৃদ্ধি ৫ বৎসর রাখা হউক। ঐ শুল্ক হইতে যে অতিরিক্ত আয় হইবে তাহা রাস্তার উন্নতিকল্পে ব্যয় করা দরকার, এবং তজ্জন্য স্বতন্ত্র হিসাব খুলিয়া সেই হিসাবে জমা করা হউক। তৎপরে নিম্নলিখিত ভাবে বার্ষিক গ্র্যাণ্ট প্রদত্ত হউক:—

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কিছু অংশ রিজার্ভ রাখা হউক। ঐ অংশ ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত যাহা আয় হইবে, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা। অবশিষ্টাংশ হইতে প্রতি প্রদেশে যে পরিমাণ পেট্রোল খরচ হয়, সেই পরিমাণে টাকা রাস্তার উন্নতির জন্য দেওয়া হউক। যদি কোন প্রদেশের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, উহা পর বৎসরে ব্যয়িত হইবে। সপারিষদ্ গভর্ণর জেনারেল রোড্ কমিটির পরামর্শানুযায়ী কোন্ প্রদেশে কত টাকা দেওয়া হইবে, তাহা ঠিক করিবেন।

প্রতি বৎসর রাস্তার উন্নতির জন্য একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হউক। লেজিস্লেটিভ্ অ্যাসেম্লি হইতে একজন মনোনীত সভ্য, অন্য একজন মনোনীত সভ্য, কাউন্সিল অব্ ষ্টেট হইতে তিন জন নির্ব্বাচিত সভ্য, লেজিস্লেটিভ্ অ্যাসেম্লি কর্তৃক নির্ব্বাচিত ছয় জন সভ্য, এই কমিটিতে থাকিবে। এই কমিটির অধীনে একটি ফিনেন্স সাব কমিটি গঠিত করা দরকার। এই কমিটি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন রাস্তার উন্নতিমূলক কার্য্যের রিপোর্ট আলোচনা করিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উপস্থাপিত রিপোর্ট সমূহের আলোচনাও এই কমিটির কার্য্য। সাময়িক রোড্ কন্ফারেন্সের কার্য্য-বিবরণী, কেন্দ্রীয়

রাস্তার উন্নতিমূলক কার্য্যের আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করাও এই কমিটির কার্য্য।

কুটির-শিল্প

বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এ টি ওয়েষ্টন বলেন যে, যদিও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে টেক্‌নিক্যাল স্কুল খুলিয়া দেশে কুটির-শিল্প সংরক্ষণের চেষ্টা চলিতেছে, এবং মৃতপ্রায় কুটির-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় জনগণের মধ্য হইতে প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গকে নিয়োজিত করা হইতেছে, তথাপি কর্ম্মিগণের স্বভাবজাত আলস্য ও শিক্ষাহীনতা বশতঃ নৈপুণ্য ও কৌশলের অভাব না থাকিলেও কুটির-শিল্পের উন্নতি হইতেছে না।

কর্ম্ম বন্ধ

যে কোন তামাসা বা বিবাহ কার্য্যোপলক্ষে কর্ম্মিগণ কাজ বন্ধ রাখে, যাহাতে উপার্জ্জনের হানি হয়। পরন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিমান লোক মহাজনের কার্য্যে কিম্বা বেপারীর কাজে সন্তুষ্ট। যদি বেপারীর কার্য্য প্রস্তুতির কার্য্য হইতে ভিন্নরূপে পরিকল্পিত হয়, তবে তাহা আগাছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু যদি বেপারির কার্য্য প্রস্তুত কার্য্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিশেষ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ঘটে। কিন্তু বর্ত্তমানে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত শ্রেণীর লোককে কুটির-শিল্পের প্রস্তুতি-কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুব কম দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ বৈষম্য

কিন্তু কুমিল্লায় কতিপয় ভদ্র যুবক 'হাউস্ অব্ লেবারার্স' নাম দিয়া একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ক্ষুদ্র এঞ্জিন লইয়া তাহারা কার্য্য আরম্ভ করে; ও শিল্পবিভাগের পরামর্শানুযায়ী কতিপয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করে; তাহারা প্রথমতঃ চা বাগানের ছুরি কাঁচি ও গৃহ এবং সেতু নির্ম্মাণের উপযোগী লৌহ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, আর আজ কুমিল্লা রেল ষ্টেসনের পাশে তাহাদের বিরাট্ কারখানা সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কারখানা ৫ লক্ষ টাকার মাল প্রস্তুত করিয়াছে। এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতাগণ কেবল যে মিস্ত্রীগণকে পরিচালনা করিতে সমর্থ তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেকেই কারখানার ধূলি-মাটির মধ্যে বসিয়া মিস্ত্রীগণের সহিত সমভাবে কাজ করিতে অভ্যস্ত—এই বৈষম্যই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

সাবান প্রস্তুত

দেশের সর্ব্বত্র অল্পবিস্তর সাবান প্রস্তুতের কারখানা আছে, কিন্তু যন্ত্রপাতি আধুনিক নহে এবং জিনিষ বিশুদ্ধ ও ভাল করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না।

বাসন-শিল্প

পিতল কাঁসার কদর থাকিলেও বর্ত্তমানে এলুমিনিয়াম বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে, যদি এই শিল্পিগণ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও বিজ্ঞানের কৌশল অবলম্বনে চেষ্টা না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্পও লুপ্ত হইবে। অধিকন্তু প্রত্যেক শিল্পেই শিক্ষিত লোকের প্রবেশ করা দরকার।

বয়ন-শিল্প

বয়ন শিল্প দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যমান; বিশেষতঃ নদীয়ার শান্তিপুর, নোয়াখালির চৌমোহনী, বাঁকুড়ার সোনামুখী বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থান বয়ন-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্থানের হাটে বৎসরে বহু লক্ষ টাকার কাপড় ও সূতা বিক্রীত হয়। দেশবাসিগণ ঐরূপ কাপড় পছন্দ করে বলিয়া এবং শিল্পিগণের কৌশল থাকাতে এখনও ঐ শিল্প টিকিয়া আছে। যদিও শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয় বয়নশিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে তথাপি দেশের অধিকাংশ শিল্পী অজ্ঞ। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রচলন বাঞ্ছনীয় এবং আরও সমবেতভাবে চেষ্টা করা দরকার।

ট্যানিং শিল্প

ইহা সাধারণতঃ মুচি ও চামারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহারা যে উপায়ে চামড়া পরিষ্কার করে, তাহা প্রাচীন-কালের উপযোগী ও অর্থোৎপাদক নহে। যদি শিক্ষিত লোক আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই কার্য্যে অবতরণ করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে বহু লক্ষ টাকার মালিক হইতে পারিবে।

পরিশেষে মিঃ ওয়েষ্টন বলেন যে, দেশীয় শিল্পে যাহাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, এবং শিল্পিগণ শিক্ষিত ও কর্ম্মকুশল হয় তাহার চেষ্টা করা শিল্প-বিভাগের কর্ত্তব্য।

লণ্ডনের ডক

কিছুদিন আগে আমাদের দেশে কিং জর্জ ডক নির্ম্মাণ ব্যাপার লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। কলিকাতায় খিদিরপুর ও কিং জর্জ এই দুইটি মাত্র ডক। কিন্তু লণ্ডনের ডকের সংখ্যা অনেক বেশী। ইংরেজের বহির্বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ডকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে ও একের পর অন্য ডক নির্ম্মিত হয়।

প্রাচীন কাহিনী

ভৌগোলিক সংস্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় লণ্ডনের টেম্‌স নদী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এক সময়ে প্রাচ্য দেশসমূহ হইতে বিলাস-দ্রব্যাদি ভূমধ্যসাগরের ভিতর দিয়া ইয়োরোপে আনীত হইত। কাথে ও ইষ্ট ইণ্ডিজ্ হইতে উটের গাড়ীতে বোঝাই হইয়া রেশম, মণিমাণিক্য ও মসলা আলেকজেন্দ্রিয়ায় আসিত। তুরস্ক কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপল অধিকৃত হইলে এই পথ বন্ধ হইয়া যায়। তখন আরব দেশীয় বণিকেরা সুয়েজ খালের মুখে আনিয়া জিনিষ যোগাইত ও ভেনিস্‌-বাসীরা সমগ্র বাণিজ্য দখল করিয়া লইয়াছিল। ধনিদের বিলাস সামগ্রী যোগানই তখনকার বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। লোহা ও কয়লার তত আদর ছিল না। আজ-কালকার মত কল-কারখানাও গড়িয়া উঠে নাই। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ্‌রা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রাচ্যে যাইবার পথ আবিষ্কার করে। পর শতাব্দীতেও ওলন্দাজরা এই পথে যাতায়াত করিতে লাগিল। ১৫৭৮ সন হইতে স্পেনিশরা ও ইংরেজরা পশ্চিম পথে যাতায়াত আরম্ভ করে।

এইরূপে বাণিজ্যের গতি ভূমধ্যসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে স্থানান্তরিত হইল ও ভেনিসের পূর্ব্ব গৌরব লুপ্ত হইয়া গেল। মধ্য ইয়োরোপের এন্টোয়ার্প

ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জগতের রাজনৈতিক ব্যাপারে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিল, ষ্টীম এঞ্জিন, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ্ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইল, অবশেষে শিল্প-বিপ্লব ইংল্যাণ্ডে দেখা দিল। ইহার ফলে ইংল্যাণ্ডের স্থান খুব উচ্চ হইয়া গেল। দেশে লোহা ও কয়লা ছিল, বাহিরে উপনিবেশ,—ইংল্যাণ্ড ধনীদের বিলাস দ্রব্য না যোগাইয়া সাধারণ লোকের সাধারণ অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং সাধারণ লোক সংখ্যায় অনেক বেশী বলিয়া লাভও বেশী হইতে লাগিল।

ডকের সৃষ্টি কেন হইল ?

এই নূতন বাণিজ্য এইরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল যে পুরাতন রাস্তা ও বন্দর উভয়ই আর পর্য্যাপ্ত রহিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডকহীন টেম্‌স নদীতে বাণিজ্য-তরী-সমূহ গাদাগাদি হইয়া থাকিত। তাহাতে কাজের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল, জাহাজসমূহের আগমন ও নির্গমন কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, নদী শুকাইয়া যাইতে থাকিল। এই সব কারণে নদীতে চোর-ডাকাতের উপদ্রব খুব বাড়িয়া গিয়াছিল ; হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ সময়ে বৎসরে প্রায় ৮ লক্ষ পাউণ্ড বা ১২ কোটি টাকা ক্ষতি হইত। উল্লিখিত অসুবিধা দূরীকরণার্থ ডক নির্ম্মাণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ডক নির্ম্মিত হইলে এই অসুবিধা ও ক্ষতি অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল।

লণ্ডনের বিভিন্ন ডক

১৮০২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের জাহাজ ও মালের জন্য প্রথম ডক খোলা হয়। ইহার নাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া। ইহার সহিত একটি মালের গুদামও ছিল। ইহার পর ব্রান্‌স্‌উইক বেসিন্‌কে ডকে পরিবর্ত্তিত করা হয়—ইহা পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজ বোঝাইর স্থান ছিল। তারপর ক্রমে

ভিক্টোরিয়া, মিলওয়াল, রয়্যাল আলবার্ট, টিলবারি ও সর্ব্বশেষে পঞ্চম জর্জ্জ ডক নির্ম্মিত হয়।

১৮৬৯ সনে সুয়েজ খাল খুলিবার পর হইতে লণ্ডন বন্দরসমূহের নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের খেয়াল হইল যে, তাঁহাদের বন্দরগুলি নেহাৎ সেকেলে ও তাঁহারা সেগুলির উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

১৯০৯ সন

লণ্ডনের ডকের ইতিহাসে ১৯০৯ সন স্মরণীয় বৎসর। কারণ, এই বৎসর হইতে বিভিন্ন ডক কোম্পানীসমূহ টেম্‌স্ কনসারভেন্সির সহিত যুক্ত হইয়া পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটিরূপে পরিচিত হইতে থাকে। ঐ সময়ে লণ্ডনের ৬৫ লক্ষ অধিবাসীকে স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য টেম্‌স নদীর উপর নির্ভর করিতে হইত। অথচ সমগ্র নদীটিকে বিভিন্ন কোম্পানী ভাগ করিয়া লইয়া শুধু নিজেদের লাভের দিকে চাহিয়া চলিয়াছিল।

১৯০৯ সন হইতে ঐ প্রথার পরিবর্ত্তন হয়। সমস্ত শাসনভার একটি কেন্দ্রে স্থাপিত করায় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও সুবিধা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডকের অবস্থান

লণ্ডন ব্রিজ হইতে টিল্‌বারি পর্য্যন্ত ২০ মাইলব্যাপী আঁকাবাঁকা নদীপথের দুই ধারে লণ্ডনের ডকগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সার জোসেফ্ প্রণীত দুই খণ্ড পুস্তক হইতে লণ্ডন বন্দরের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য লাভ করা যাইতে পারে।

লণ্ডন বন্দরের বিশেষত্ব

লণ্ডন শুধু সামুদ্রিক বন্দর নহে, দুনিয়ার বাজারও বটে। পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটির গুদাম ঘরগুলিতে কতপ্রকার দ্রব্য যে সাজান রহিয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যাইবে না। ধুতি হইতে আরম্ভ করিয়া হরীতকী পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি এখানে সাজান রহিয়াছে দেখা যাইবে। লণ্ডনে আসিয়া কেহ যদি পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটি হইতে ছাড়পত্র যোগাড় করিয়া এই ঘরগুলি দেখিতে আসেন, তবে তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনের বাণিজ্য-সম্ভার সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। দুনিয়ার বাজারে এক কালে আলেকজেন্দ্রিয়া বা ভেনিসের যে স্থান ছিল আজ লণ্ডনের সেই স্থান। যে সকল লোক এই স্থানে কাজ করে তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। হাতীর দাঁত, মণিমুক্তা, পশম, রবার, এসেন্স, তুলা প্রত্যেক জিনিষ গুণানুক্রমে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে।

তরণীর প্রচলন

প্রতিদিন লণ্ডন বন্দরে বড় বড় বাণিজ্য-জাহাজ আসিয়া ডকে লাগে, এই বাণিজ্যের অর্দ্ধ ভাগের জন্য দায়ীত্ব পোর্ট অব্ লণ্ডন অথরিটির। বাকী ভাগের কাজ হয় নৌকা দ্বারা। টেম্‌স্ নদীতে দেখা যাইবে যে মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া নৌকা চলাচল করিতেছে। এগুলি ক্ষিপ্রগতিতে মাল জাহাজ হইতে নামাইয়া থাকে অথবা জাহাজে উঠাইয়া দেয়। লণ্ডনের ডকগুলির সম্বন্ধে আলোচনা কালে এই নৌকাগুলির কার্য্যকারিতার কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এগুলির সাহায্যে প্রতিদিন বহু লক্ষ লোকের অন্নের সংস্থান হইতেছে।

মোসাফের

জাতীয় সংবাদ

শ্রীপাট পানিহাটিতে

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শুভাগমন মহোৎসব ও বিরাট্ বৈষ্ণব প্রদর্শনী

আগামী ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার. ইংরাজী ৩রা নভেম্বর দিবসে শ্রীপাট পানিহাটিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ৺পুরীধাম হইতে শুভাগমন স্মরণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এজন্য পতিতপাবন গৌরভক্তবৃন্দের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন, উপরিউক্ত পুণ্য দিবসে আপনারা স্ববান্ধবে ও স্বসম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের আনন্দলীলা-নিকেতন চির আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীপাট পানিহাটীতে শুভাগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের পরিতৃপ্ত করিবেন, আমাদের উদ্ধার করিবেন। এই পরমোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা অধমতারণ ভাগবতগণের প্রত্যেককেই করজোড়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঞ্ছাকল্পতরু ভাগবতগণ আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থী
দীন শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী (ভাগবতরত্ন)
কাঙ্গাল শ্রীরামদাস বাবাজী
(প্রভৃতি)

সুবর্ণবণিক্ যুবকের কৃতিত্ব

বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের ঢাকা অধিবেশনে সমাগত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ময়মনসিংহ বিবেকানন্দ সমিতির কতিপয় সুবর্ণবণিক্ যুবক শারীরিক ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ভারোত্তোলন প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া সকলেরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছে।

শোক-সংবাদ

৺জগদীশচন্দ্র সেন

আমরা অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতা সুবর্ণবণিক্ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভ্য মাণিকতলা ষ্ট্রীট নিবাসী জগদীশচন্দ্র সেন মহাশয় গত ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। জগদীশ বাবু স্বজাতির এবং সমাজের উন্নতিবিষয়ে সদা চেষ্টাবান ছিলেন এবং অনেক দরিদ্র ছাত্রকে বিদ্যাশিক্ষার সহায়তা কল্পে গোপনে অর্থসাহায্য করিতেন। তিনি মুখে যাহা বলিতেন কাজে তাহাই সাধন করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। এই প্রকার অকপট সমাজসেবকের সহসা তিরোধানে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত-চিত্ত। আমরা জগদীশ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেসে, শ্রীরঘুনাথ শীল, বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।